দুর্য্যোগের দিনে

বাংলা দেশের উপরে যে দুর্য্যোগ ঘনাইয়া উঠিল তাহাতে বাঙালীর প্রাণ ও বাঙালীর জাতিধর্ম্ম—দুইয়েরই সম্বন্ধে নিদারুণ আশঙ্কা নানা আকারে মনকে অভিভূত করিতেছে। প্রাণরক্ষার ভাবনাই উপস্থিত একমাত্র ভাবনা হইলেও, এবং সেজন্য আর সকল চিন্তা লোপ পাইলেও, আমরা এতদিন ধরিয়া বাঙালী-জীবনের যে দিকটির ভাবনা ভাবিয়াছি—জাতি-হিসাবে তাহার বৈশিষ্ট্য, আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তাহার দান, অতিশয় বর্ত্তমানে তাহার আত্মভ্রষ্টতার যে সংস্কৃতি-সংকট—সেই সকলের ভাবনাও আজ এমন দিনেও সম্পূর্ণ দূর করিতে পারিতেছি না; কারণ, যদিও জানি এবং বিশ্বাস করি যে, সমগ্র ভারতের ভাগ্য শেষ পর্য্যন্ত শুভই হইবে—এই পৃথিবীব্যাপী মহামারীর শেষে মানুষের সমাজে যে ধর্ম্মবিধির উদ্ভব হইবে অর্থাৎ "যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ", সেই পক্ষের জয়লাভে যে শান্তি ফিরিয়া আসিবে ভারতবাসী তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে না। তথাপি, বাংলা দেশ ও বাঙালীর ভিতর-বাহিরের যে অবস্থা তাহাতে বাঙালীর নিজ ভাগ্য সম্বন্ধে একটু পৃথক চিন্তার কারণ আছে। ভারতবাসীর মধ্যে বাঙালী ও অ-বাঙালী ভেদ যতই অবাঞ্ছনীয় হউক এবং সেজন্য বাঙালীই যে পরিমাণ অপরাধী হউক—ঐ ভেদটা যে সত্য তাহা অস্বীকার করিলে মিথ্যাচরণ হয়। বাঙালীর বোধ-বুদ্ধি, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার সাধন-পন্থা বা আত্মবিকাশের ধারা যে স্বতন্ত্র, তাহা গত একশত বৎসরের বাংলার ইতিহাসে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে; এবং গত বিশ বৎসর রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাঙালী যে তাহার প্রাণের উৎসাহ হারাইয়া নির্জ্জীব ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভারতের ভাগ্যের সহিত বাঙালীর ভাগ্য যে ভাবেই জড়িত থাকুক, সে যেন ভারতের পক্ষে একটা বোঝা বা উপসর্গ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের আর সকল জাতি পরস্পরকে সহজেই বোঝে, বাঙালীকে কেহ বোঝে না; বোঝে না বলিয়া তাহাকে দোষী করে—যদিও আমরা সেজন্য তাহাদিগকে দোষী করিব না। ভারতের

এই পূর্ব্বদেশের ভৌগোলিক প্রকৃতি অথবা জাতি-বর্ণের এক অভিনব মিশ্রণ যে কারণেই হউক, আমাদের ভাবনা-কামনা, আমাদের আচার ও বিচার, আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও কর্ম্মপদ্ধতিতে এমন একটা বিভিন্নতা আছে যাহা লক্ষ্য না করিবার উপায় নাই। এইজন্যই আশঙ্কা হয়, আজিকার দিনে সমাজে বা রাষ্ট্রে বাঙালীকে তাহার স্বধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিবার একটিমাত্রও নেতা যখন নাই, তখন এই মন্বন্তরের সময়ে হাল ধরিবে কে? পাছে আমরা একেবারে ডুবি বা ভাসিয়া যাই সেই ভয়ও অল্প নহে। আজ আর কিছুতেই আশ্বাস পাইতেছি না, তাই মনে মনে সেই সকল মহাপুরুষের নাম জপ করিতেছি, যাঁহারা একদিন এই জাতির প্রাণসমুদ্র মন্থন করিয়া নবযুগের ধন্বন্তরীরূপে অমৃত-ভাণ্ড তুলিয়া ধরিয়াছিলেন; সে অমৃত আমরা পূর্ণমাত্রায় পান করিবার অবসর না পাইলেও সেই ঘটনাতেও মৃত্যুঞ্জয়ের আশ্বাস আছে। আর কিছু না হউক, এইটুকু আশা করিতে পারি যে, আসন্ন ভবিষ্যৎ যতই অনিশ্চিত হউক—জাতি-হিসাবে আমরা যাহা যেটুকু অর্জ্জন করিয়াছি—যে পথে যতটুকু অগ্রসর হইয়াছি—তাহার সমাপ্তি এত শীঘ্র ঘটিবে না। কে বলিবে, আগামীকালেও এই বাঙালীর দেহভস্ম হইতেই সেই স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইবে না, যাহা দ্বারা সমগ্র ভারতের নবজীবন-যজ্ঞে অগ্ন্যাধান-কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে।

২

আজ যে ক্ষণে লিখিতে বসিয়াছি, সেই ক্ষণ কল্পনা করিয়াই বোধ হয় একদিন আমাদের কবি গাহিয়াছিলেন—

মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন-মন্তরে,
  দিক দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
  এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা। ......
এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্ব্বরী
  ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত অচলে,
বিশ্বজগৎ নিঃশ্বাস বায়ু সম্বরি
  স্তব্ধ আসনে প্রহর গনিছে বিরলে।

যেন এমন দিনের নিদারুণ নৈরাশ্যই প্রাণকে আরও দুর্দ্দম করিয়া তোলে,

ঘোরতর অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রাণ-বিহঙ্গ ঊর্দ্ধতম গগনে পক্ষবিস্তার করিতে চায়, মৃত্যুর পাত্রেই অমৃত আস্বাদন করে—

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে' ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির আঁকা,
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।

ইহারই সঙ্গে কবি-কণ্ঠোচ্চারিত আর এক মন্ত্রবাণী আজিকার দিনেই জপ করিতে হয়—

শ্যেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন করে' ঊর্দ্ধে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে
মহান মৃত্যুর সঙ্গে মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

কিন্তু আজ সে বাণীর সেই বজ্রদীপ্তি সহ্য করিবার সামর্থ্য আমরা হারাইয়াছি; বাঙালীর দেহ-মনের আর সে শক্তি নাই, আজ আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট, আত্মভ্রষ্ট; আমাদের মধ্যে আজি এমন কেহ নাই, যে এই মৃত্যুভয়ভীত জনগণের গড্ডলিকাবৃত্তি নিরস্ত করিতে পারে। তবুও এমন অবস্থাতেও আশা করি—আমরা নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া যাইব না; তাহার কারণ, এমন সকল বাণী আমাদের রসনায় আবির্ভূত হইয়াছিল, যাহার ছন্দে অমৃতের প্রেরণা আছে, আমাদের বংশে এমন সব কবি ঋষি ও মনীষী জন্মিয়াছেন, যাঁহাদের জন্ম মৃত্যুতেই শেষ হইতে পারে না। আমরা তাঁহাদিগকে ভুলিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু কাল তাঁহাদিগকে ভোলে নাই, ভুলিতে পারে না।

আমরা সাহিত্য-ব্যবসায়ী সাহিত্যজীবী; বাঙালীর যাহা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আমরা তাহারই গৌরব করিয়া থাকি। তাই যখন সকলই নষ্ট হইতে বসিয়াছে, তখনও আর সব ছাড়িয়া কেবল ঐটুকু হারাইবার ভয়ে আমরা

আকুল হইতেছি। যে যুগকে আমরা ব্রিটিশ যুগ বলিয়া থাকি, সেই যুগে আমরা, যে প্রকারে যে উপায়ে হউক, আমাদের শক্তি ও অশক্তি দুইয়েরই একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম, আমাদের জাতিগত স্বরূপ দর্শনে ভয় ও অভয় দুই-ই অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের সমাজে এই কালে পুরুষপরম্পরায় যে মনীষা ও প্রাণশক্তি—জ্ঞান ও কর্ম্মের যে জীবনাদর্শ বিকাশ হইতে দেখিয়াছিলাম, তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া পারি নাই যে, অতঃপর বাঙালী জাতির দ্বারাই আধুনিক ভারতের পুনরুজ্জীবন হইবে—বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, এবং আরও কত ভাবুক ও কর্ম্মী একদা যে সমাজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সমাজের দ্বারা যুগবিধাতার একটা অভিপ্রায় নিশ্চয় সাধিত হইবে; জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, এই তিনেরই একটা যুগোচিত আদর্শ আমাদেরই জীবনেই নবরূপ পরিগ্রহ করিবে।

বাংলা সন হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই যে শতাব্দী শেষ হইয়াছে, তাহাতে যে নবজীবন-সাধনার উপক্রম আমরা দেখিয়াছিলাম, তাহার সম্বন্ধে নিষ্ফলতার সম্ভাবনা কুত্রাপি থাকিবার নয়; তাহার পর আজ এই অর্দ্ধশতাব্দী শেষ না হইতেই সে সম্বন্ধে যে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা আধুনিক শিক্ষিত-সমাজে প্রবল হইতে দেখি, তাহাতেও আমরা নিরাশ্বাস হই নাই; তাহার কারণ, সত্য এবং শক্তি এই দুই একাত্মক শক্তি—যদি প্রকৃত শক্তি হয়, তবে তাহার সহিত সত্য যুক্ত থাকিবেই;—অপর পক্ষে, যেখানে ও যে কালে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শক্তির ও আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব প্রকট হইয়া উঠিতেছে, সেখানে কোন চিন্তাতেই যে সত্য নাই ইহা নিশ্চিত। অনেকে এমনও প্রশ্ন করিতে পারেন, যদি এত শীঘ্র এতখানি অধঃপতনই ঘটিল, তবে সেকালের সেই মনীষা ও প্রতিভা এ জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে একটা সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছিল, এমন কথা বলা যায় কেমন করিয়া? এই যে দারুণ দুর্গতির অবস্থা, ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, সেই সকল পুরুষের দৃষ্টি ও সৃষ্টি নিতান্তই ভ্রান্ত; তাঁহারা এই মন্বন্তরের আভাসমাত্র অবগত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি অতিশয় সংকীর্ণ ছিল; মানব-কল্যাণের নবযুগ-প্রয়োজনকে তাঁহারা ধারণা করিতেই পারেন নাই। সে যুগের ভাবনা-চিন্তায় একটা নিশ্চিন্ত আত্মপ্রসাদ, "বাস্তববিমুখ

কল্পনাবিলাস, অপ্রকৃত আদর্শবাদ এবং মরণোন্মুখ য়ুরোপীয় সভ্যতার সহিত আপস করিয়া এক অতিশয় জীর্ণ গলিত সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থনমূলক যুক্তিশীলতাই ছিল। গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া দেশে যাহা ঘটিতে দেখিয়াছি, তাহাতে মন মাঝে মাঝে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়াছে, উপরি-উক্ত মতবাদের যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু তথাপি অন্তরের আস্তিক্যবুদ্ধি কিছুতেই তাহা স্বীকার করিতে দেয় নাই, প্রত্যক্ষকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। প্রত্যক্ষ যে কত মিথ্যা, তাহা এই দুই-তিন বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রমাণে বুঝিতেছি; যাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাহাই বাস্তবে মূর্ত্তি ধরিতেছে; যে কল্পনাকে নিতান্তই পৌরাণিক বা অতিচারী বলিয়া মনে করিতাম, তাহাই মানুষের অদৃষ্ট-রহস্য ভেদ করিয়া সেই অতি পুরাতন শাশ্বত সত্যকেই যেন চাক্ষুষ করিয়া তুলিতেছে! দিকে দিকে মনুষ্যসমাজের বুদ্ধিভ্রংশ এবং সেই বুদ্ধিভ্রংশ হইতেই যে নানাপন্থী মতবাদের তুমুল কোলাহল পৃথিবীব্যাপী রণক্ষেত্রের ঝড়ঝঞ্ঝাকেও অগ্রাহ্য করিয়া বিনাশকেই ধ্রুবতর করিয়া তুলিতেছে, তাহাতে মন স্বভাবতই এমন একটি স্থানে দৃঢ়াসন করিয়া বসিতে চায়, যেখানে এই মৃত্যুপাগল জনতার—এই 'নিহতা পূর্ব্বমেব'—বলির পশুগণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, যাহা চিরজীবী, যাহা সকল ধ্বংসের শেষেও ধ্বংস হইবে না, সেই মানুষ এবং মানুষের সত্যকে উপলব্ধি করিয়া আশ্বস্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? সেইরূপ নির্ম্মম ও নিরাসক্ত ভাবে আত্মসাক্ষাৎকার করিবার শক্তি কি আমাদের আছে? আজ আমরা সকলেই মহাকালের যজ্ঞভূমিতে বলির যূপে বদ্ধ রহিয়াছি। এক দিকে ভীত-চীৎকার ও আর্ত্ত-কোলাহল এবং অপর দিকে অতিশয় আধিভৌতিক দেহসুখ-সাধনের যে সমানাধিকার-ঘোষণা এই উভয়ের দিকে চিত্তনিরোধ করিয়া আজ কেবল সেই সব মহাপুরুষের বাণী শ্রদ্ধাসহকারে পুনর্ব্বার শ্রবণ ও মনন করিতে পারি, যাঁহারা যুগের সহিত সনাতনকে, মানবধর্ম্মের সহিত জাতির ধর্ম্মকে, বিদ্যার সহিত অবিদ্যাকে, আত্মার স্বাতন্ত্র্যের সহিত বশ্যতাকে, একই সত্যের আলোকে বুঝিয়া লইয়া আমাদিগকেও তাহা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। এই বাংলা দেশের জল-মাটিতেই দেহ-ধারণ করিয়া সেই বাঙালী কবি ও মনীষীগণ জাতির অতীত-বর্ত্তমানকে

যেরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা যদি ভ্রমাত্মক না হয়, তবে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে যে আশা তাঁহাতে সূচিত হইয়াছিল, তাহাও মিথ্যা হইতে পারে না। ইতিমধ্যে আমরা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া এই যে পথে বিপথে ছুটাছুটি করিয়াছি, যেন অন্তরেরই কোন এক অসহনীয় উৎপাতের বশে অস্থির হইয়া নৈরাশ্য ও লাঞ্ছনার সর্ব্ববিধ দুর্গতি ভোগ করিয়াছি, তাহাও একেবারে নিষ্ফল হইতে পারে না। তৎপূর্ব্বে বাঙালী-জাতির গভীরতম চেতনা যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল, তাঁহাদের সেই তপস্যা কি একেবারেই ব্যর্থ হইবে? আমি এখানে জাতিসাধারণের কথা বলিতেছি না; বৃক্ষের প্রতি শাখায় ফুল বা ফল হয় না, তথাপি, বৃক্ষকে যে অর্থে ফলবান বলা যায়, অতিশয় অল্পসংখ্যক মহাত্মার আবির্ভাবেই জাতির জীবন তাহা অপেক্ষা আরও সত্য অর্থে ফলবান হইয়া থাকে। কেবল মন নয় বা বুদ্ধি নয়—আত্মার অসংশয় প্রকাশ যে সমাজে দিবা দীপ-শিখার মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যে সমাজে অত্যল্পকালের জন্যও জীবন্মুক্ত পুরুষেরা বিচরণ করিয়াছে, সে সমাজ বা সে জাতির জীবন-পুষ্পে অমৃতের রেণু কোন না কোন ক্রমে সঞ্চারিত হইবেই—এ যজ্ঞের ন্যূনতম অনুষ্ঠানও ব্যর্থ হয় না, কারণ, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। সত্যের কোন নির্দ্দেশক লক্ষণ নাই, তর্কবুদ্ধির দ্বারা মিথ্যাকেই প্রতিষ্ঠিত করা যায়, কিন্তু সত্যকে কেবল প্রকাশের দ্বারাই জানা যায়; এবং সেই জানা বা জ্ঞান কেবল সংশয়চ্ছেদ করে না, তাহা একটি অপূর্ব্ব মহিমাবোধের দ্বারা, জীবনের যত গাণিতিক লাভ-ক্ষতির ভাবনা, চিত্তের কার্পণ্য দূর করিয়া মৃত্যুভয় নিবারণ করে। আত্মারই এইরূপ প্রকাশ আধুনিক কালে আমাদের দেশে এই বাঙালী-সমাজের একাংশে দেখা গিয়াছিল, এমন আর কোথাও দেখা যায় নাই। "Deep calls unto deep"—জন্ম-মৃত্যু, ইহকাল-পরকাল, পাপ-পুণ্যকেও বিদারণ করিয়া, ঊর্দ্ধের অসীমাকাশ হইতে নিম্নের এই অগাধ-সিন্ধু পর্য্যন্ত যে বিদ্যুৎময় আহ্বান ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, একটি পুরা শতাব্দী ধরিয়া তাহার জন্য এ জাতির চিত্তে যে কর্ষণ ও মন্থন চলিয়াছিল, তাহা আজ এই চরম ক্ষণেও বিস্মৃত হইতে পারি না। যাহাদের আত্মা আছে তাহারা যেমন আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না;

তেমনই যাহাদের এতটুকু জাতীয়তাবোধ আছে তাহারা জাতির সেই পরিচয় বিস্মৃত হইতে পারে না। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের তিরোধানের পর এই কালের মধ্যেই আমাদের অনেকবার স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছে, তাহাতে জাতির শক্তি ও অশক্তি সম্বন্ধে আমরা যেমন দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি, তেমনই শক্তি অপেক্ষা অশক্তির পুঞ্জীভূত প্রমাণে মুহ্যমান হইয়াছি। তথাপি এই বর্ত্তমানেরই ইতিহাসে যাঁহারা জাতির আত্মচৈতন্য প্রবুদ্ধ করিয়া তাহা হইতেই মৃত্যুভয়নাশক মহৌষধি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সাধনা কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।

তাই আজ জাতির জীবন-মৃত্যুর এই মহাসন্ধিক্ষণে—১৩৩৯ সালের বৈশাখেও বাঙালী আমি বাঁচিবার আশা রাখি। এই যুগে বিধাতা আমাদিগের উপরে অশেষ-যন্ত্রণার যে ক্রুশ-ভার চাপাইয়াছেন—পলে পলে, রক্ত মাংস মেদ মজ্জা ও শেষে অস্থি পর্য্যন্ত আহুতি করিয়া আমরা যাহার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, তাহা কি একেবারে মিথ্যা হইবে? আমাদের জাতির যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা বণিক-ধনিকের পুরুষার্থকেই বরণ করিতে পারেন নাই—ইহা সত্য। যে আধিভৌতিক সুখবাদের সভ্যতা আজ জলে স্থলে আকাশে বহ্নিবিস্ফোরণ-হাহাকারে দশদিক বিদীর্ণ করিতেছে, তাহার জ্বালা আমাদের দেহেও সঞ্চারিত হইয়াছিল; তথাপি তাহার তাপটুকু মাত্র আমাদের হিমশীতল দেহে জীবন-সঞ্চার করিয়াছে—প্রাণকে স্পর্শ করে নাই। তাই বাঙালী আজিও 'বানিয়া' হইতে পারিল না। বরং সেই পরধর্ম্মের অনুশীলনে অর্জ্জন অপেক্ষা তাহার ক্ষতিই অধিক হইয়াছে; সে অর্থের সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া অর্থলোভে মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়াছে। তাই ভারতের আর সকল জাতি হইতে সে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে—একটি স্পষ্ট ভেদরেখায় তাহার যাত্রাপথ চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। আজ আর সর্ব্বভারতীয় নেতৃসভায় তাহার স্থান নাই—তাহার শুভাশুভ চিন্তায় কাহারও প্রয়োজন নাই—ভারতের রাষ্ট্রনীতি তাহাকে একরূপ বর্জ্জন করিয়াই চলে। বাহিরের দিক দিয়া এ অবস্থাও কম আশঙ্কাজনক নয়।

আমরা কখনও রাজনীতির চর্চ্চা করি নাই; তাই জাতির যে জীবনচরিত তাহার নানা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার কাহিনীরূপে সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে, তাহারই সাহায্যে আমরা আমাদের অদৃষ্ট গণনা করিয়া থাকি। যাহার কেহ নাই, আত্মাই তাহার একমাত্র সহায়। কেমন করিয়া কি হইবে জানি না, কেবল ইহাই জানি যে আমরা যেমন তপস্যা করিয়াছি তেমন তপস্যা এ যুগে অন্য কোন ভারতবাসী করে নাই—সে তপস্যার মধ্যে আত্মার সত্যকার আকুতি ছিল, এজন্য তাহা মিথ্যা বা নিষ্ফল নহে। জাতির হইয়া যাঁহারা সে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই রাজনৈতিক আলেয়ার আলোকে দিক্‌ভ্রান্ত হন নাই—মানুষ, তথা জাতির জীবনে যাহা সত্য ও শাশ্বত তাহার আরাধনায় তাঁহারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। পরে যত ভুল আমরা করিয়াছি—আত্মবিসর্জ্জনের মোহে যে সকল আত্মঘাতী অতিচার বা অনাচার করিয়াছি—এমন কি যদি আমরা 'পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কূপ খনন'ও করিয়া থাকি, তাহাতেও আমরা ডুবিব না, কারণ সর্ব্বজ্ঞ কাল পূর্ব্ব-পর সেই সকলেরই হিসাব রাখিয়াছে। স্বধর্ম্ম যতই ভয়াবহ হউক, স্বানুষ্ঠিত পরধর্ম্ম আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারিবে না; বাংলার জল-মাটির গুণ ও খাঁটি বাঙালী-প্রাণের প্রবৃত্তিকেই আমরা বাঙালীর অদৃষ্টনিয়ামক বলিয়া বিশ্বাস করি। কোনও সার্ব্বভৌমিক মতবাদ—কোনও বিশ্বমানবীয় আদর্শ যতই সুবিচারিত বা ভাবসমৃদ্ধ হউক, তাহাতে আমাদের জাগরণ বা উজ্জীবন হইবে না, কারণ, বাঙালী শেষ পর্য্যন্ত বুদ্ধিব্যবসায়ী নয়, সে ভাবের পূজারী; এবং সে ভাবও নির্ব্বিশেষের নয়—বিশেষের, অর্থাৎ, তাহার একটা স্পষ্ট রূপ চাই। সকল চিন্তা, সকল ভাব, সকল উৎকৃষ্ট নীতিও আমাদের পক্ষে নিষ্ফল—যতদিন না তাহাকে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্পর্শযোগ্য করিয়া তুলিতে পারি। এমন একটা কিছু আমরা দুই বাহুর অতি সন্নিকটে চাই, যাহাকে সারা প্রাণ ঢালিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি; অর্থাৎ যাহার মধ্যে অসম্ভবকে সম্ভব, স্বপ্নকে বাস্তব করিয়া তুলিবার সত্য আশ্বাস আছে।

৫

বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এই তিন বাঙালীকেই আজ আমি বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতেছি। দেশের যে সমাজ ও বিদেশের

যে সাধনা তাঁহাদের ভয় বা ভরসার কারণ হইয়াছিল—এই অর্দ্ধশতাব্দী-কালের মধ্যে তাহার প্রায় আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের সেই দৃষ্টি মিথ্যা হইয়া যায় নাই। আমি এক্ষণে তাঁহাদের সেই বাণীর বহিরঙ্গের কথাই ভাবিতেছি না, তাহার অন্তরালে প্রাণের যে প্রত্যভিজ্ঞা ছিল—জাতির প্রতিনিধিরূপেই যে আত্মসাক্ষাৎকার ছিল, তাহাই চিন্তা করিয়া, এখনও আশান্বিত হইতে পারি। নূতনের প্রতি আমাদের যেমন লোভ, তেমনই প্রাচীনের যাহা পরম সম্পদ তাহাকেও উদ্ধার করিয়া আমরা তাহাকে আধুনিকের জীবনের উপযোগী করিয়াছি; আমরাই প্রাচীনের সাহিত্য ও প্রাচীনের অধ্যাত্মবিদ্যাকে যে ভাবে আমাদের ভাষার ও আমাদের ধ্যানধারণার অঙ্গীভূত করিয়াছি, তাহাতেই ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন হইয়াছে। সেই আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক তত্ত্বকেই আশ্রয় করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একালের আধিভৌতিক আদর্শকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন—মনুষ্যচরিত্র ও মনুষ্যভাগ্যের কয়েকটি মূল সমস্যাকে তিনিই, সেই সংস্কৃতির কিছুমাত্র গৌরবহানি না করিয়া, মানুষের হৃদয়শোণিত ও নয়নাশ্রুপ্রবাহে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও—মানবজীবনঘটিত সমস্যার সেই কাব্যকল্পনাতেও—তিনি বাঙালীর চরিত্রই বিশেষ করিয়া ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহারই প্রকৃতিগত শক্তি ও অশক্তির বীজকে অঙ্কুরিত ও পূর্ণবিকশিতরূপে দেখিয়া, তাহার মনুষ্যত্বের সীমা নির্ণয় করিয়াছিলেন। সত্য বটে, যে সমাজ ও সংস্কার-বন্ধনের মধ্যে তিনি জীবনকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া দেখিয়াছিলেন, সে গণ্ডি তখনই অপসৃত হইতেছিল, তথাপি তাঁহার পশুপতি-সীতারাম, ভবানন্দ-গোবিন্দলাল, দেবেন্দ্র-অমরনাথ মূলে একই পুরুষের বিভিন্ন আত্মবিড়ম্বনার প্রতীক,—তাহাদের মধ্যে তিনি সর্ব্বকালের বাঙালী-চরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্বটিকে, যেন নিজের চেতনাগহনে, উৎকৃষ্ট কবি-দৃষ্টির বলে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দৃষ্টির শেষ সৃষ্টি সীতারাম; ইহার পরে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই; তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, শেষে তিনি আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিকের দ্বন্দ্বে, কেবল বাঙালীর নয়—মানুষের শক্তির সীমাকেও স্বীকার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচরিত্র-রচনাকালেও তিনি পুরুষের চরিত্রকে যে মহিমায় মণ্ডিত দেখিয়াছিলেন,

অথবা "'দেবী চৌধুরাণী'তে তিনি যে তত্ত্বের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন—শেষে ভগবদ্গীতার গূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া—তিনি আর জীবনকে ঠিক সেই পূর্ব্বের দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। তাই এই উপন্যাসে বাঙালী গঙ্গারাম বুদ্ধিমান ও শক্তিমান হইয়াও প্রবৃত্তির অনলে নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া গেল। বীর সীতারামও তেমনই আরও গভীরতর দ্বন্দ্বে, উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া পূর্ণ-পরাজিত হইয়াছে; এবং 'শ্রী'র ভূমিকায় শক্তিরূপিণী নারীও আত্মজয় করিতে গিয়া—যে দাম্পত্য-প্রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র এত উচ্চে স্থান দিয়াছেন—তাহাকেও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত নিজেই যেন পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, অথবা জীবনের আদি-অন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাণের প্রবলতম প্রবৃত্তির উপরে, কোন দিক দিয়াই আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, তাই পূর্ব্ববর্ত্তী নায়কদিগের মত সীতারামের পুরুষ-প্রবৃত্তি পরাজয়েও জয়লাভ করে নাই—অগৌরবের ধূলিশয্যায় বিলীন হইয়াছে। সীতারাম পশুপতিরই আর এক দিক; বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী-চরিত্রের এই দিকটিকে কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; শেষে বুঝিয়াছিলেন, প্রকৃতিই সর্ব্বত্র প্রবল, এবং জাতির প্রকৃতিকে ব্যক্তিও অতিক্রম করিতে পারে না। এক দিকে যেমন শ্রীভগবানের সেই উক্তি—

> যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
> ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ। (২।৬০)

তেমনই, গীতাকার ও সোপেনহায়রের উক্তি মিলাইয়া তিনি নিঃসংশয় হইয়াছিলেন যে—

> সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
> প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। (৩।৩৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই বিবেকানন্দ—বাঙালী-চরিত্রের আর এক অভিনব বিকাশ! এ বাঙালী ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্যকে মানিবে না—আত্মার বন্ধন-ভয় একটা কুসংস্কার মাত্র। ভোগ ও ত্যাগ, কোনটারই পৃথক মূল্য নাই, সেই ভোগ ও ত্যাগ যাহার সেই পুরুষের আত্মমর্য্যাদাবোধ ভিন্ন আর কিছুরই কোন মূল্য নাই। পুরুষের সেই পৌরুষই প্রকৃতিকে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তিনী করিয়া রাখে। যে ভাবাতিরেক বা ইন্দ্রিয়মোহ বাঙালী-চরিত্রের একটি শোচনীয় বৈশিষ্ট্য, যাহা

বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যুচ্চ ভাবদৃষ্টিকেও কখনও নিশ্চিন্ত হইতে দেখি নাই, বিবেকানন্দের জীবনে সেই ভাবাতিরেকের সঙ্গে জ্ঞানের দুর্জ্জয় সাহস যুক্ত হইয়াছিল, তাঁহার হৃদয়বৃত্তি যেমন প্রবল—আত্মজয়ের আগ্রহও তেমনই দুর্দ্ধর্ষ ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া, হৃদয়দৌর্ব্বল্যকে পদাঘাত করিয়া, এই বাঙালী সন্ন্যাসী হৃদয়াবেগকে আত্মিক শক্তির পর্য্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, এবং বীরের মত ভোগ করিবার নীতিকে, সমুদ্র-শোষণ-পিপাসার শক্তিকেই আত্মার মুক্তি-সাধনার প্রথম সোপান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাও বাঙালীর স্বধর্ম্ম-সম্মত সাধনা—শাক্ত ও বৈষ্ণবতন্ত্রের অপূর্ব্ব সমন্বয়!

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, যেমন বিবেকানন্দের আবির্ভাব, তেমনই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দের তিরোভাবের প্রায় অব্যবহিত কালে ১৯০৪৫ হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত উদয় আরম্ভ হইয়াছিল। তখন দেশের আকাশে বাতাসে কালবৈশাখীর ছায়া ঘনাইতে শুরু করিয়াছে, রাজনীতির আগুন খেলা আরম্ভ হইয়াছে। সেই আগুনে রবীন্দ্রনাথ ক্ষণিকের জন্য যে আলোক যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই, আগুনই বাড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার তাপে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মন্ত্র কেবল বাষ্প-বেগের সৃষ্টি করিতেছিল, রবীন্দ্রনাথের অতিশয় সাত্ত্বিক শুভ ও সত্যের আদর্শ সেই অবশ আত্মহারা ভাবের আবেগ দমন করিতে পারে নাই। শেষে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার মোহ ত্যাগ করিয়া যখন বিশ্বাত্মীয়তার ভাব-সাধনায় মগ্ন হইলেন, তখন বাঙালীর স্বধর্ম্মকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আর কোন কর্ম্মযোগী নেতার আবির্ভাব হইল না। সেই কালের যজ্ঞক্ষেত্রে যে আর এক পুরুষের আকস্মিক আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনিও অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পর্ব্বতগুহায় অদর্শন হইলেন। কেবল রবীন্দ্রনাথই শেষ পর্য্যন্ত সম্মুখে বিদ্যমান রহিলেন, কিন্তু তাঁহার সাধন-মন্ত্র এ যজ্ঞের উপযোগী না হইয়া বরং তাহার প্রতিবাদী হইয়া উঠিল, যজ্ঞও ক্রমে দক্ষযজ্ঞে পরিণত হইল। অবশেষে বাহির হইতে এমন এক ব্যক্তির ডাক আসিল যাহার সহিত বাঙালীর স্বভাবের সগোত্রতা নাই; সে বাণী একপ্রকার সন্ন্যাসের বাণী, সে বাণী—আত্মপ্রতিষ্ঠার নয়, আত্মনিগ্রহের বাণী। কিন্তু তখন বাঙালীর সেই পোলিটিক্যাল আগুন-

খেলার নিষ্ফল পরিণাম প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, অতএব সেই নৈরাশ্য হইতে মুক্তিলাভের আশায় এবং এক অভিনব আধ্যাত্মিক সংগ্রামের দুর্দ্দমনীয় কৌতূহলে, সে আবার আর এক বিপথে যাত্রা করিল, এবং প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া স্বধর্ম্মের প্রতিকূলে দেহ-মন নিয়োগ করিয়া অবশেষে যখন জড়তাগ্রস্ত হইয়া পড়িল, যখন জাতি-হিসাবে আত্মজ্ঞান আর এতটুকুও অবশিষ্ট রহিল না, তখন সে এক দৃঢ়তর পরধর্ম্মকেই একমাত্র মুক্তি-পন্থা মনে করিয়া, পূর্ণ নির্ব্বাণের মোক্ষলাভ করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; শুধুই হিন্দুত্ব নয়, বাঙালীত্ব বর্জ্জনের জন্যও সে অধীর হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে স্রোতের আবিলতা পরিহার করিতে গিয়া স্রোতকেই অস্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে স্রোতও আর নাই, সামান্যতম প্লাবনেও নিম্নভূমির মত সমগ্র বাঙালী-জীবন যেন একাকার হইতে চলিয়াছে।

তথাপি আশা করি এই আত্মঘাতের প্রবৃত্তি স্থায়ী হইবে না। সত্য বটে, এ যুগের শেষ বাঙালী ঋষি-কবি জাতির পরিবর্ত্তে বিশ্বমানবের বন্দনাগান গাহিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও যে ভাবতান্ত্রিক আদর্শবাদ রহিয়াছে তাহা বাঙালী ভিন্ন আর কাহারও কণ্ঠে এমন অধ্যাত্ম-গভীর উদাত্ত স্বরে উদগীত হইতে পারিত না। রবীন্দ্রনাথ যজ্ঞকালের নয়, যজ্ঞ-শেষের স্নান-মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। সেদিন এখনও আসে নাই; বঙ্কিমচন্দ্র এ স্নান-মন্ত্র কখনও বিস্মৃত হন নাই, বিবেকানন্দ এই মন্ত্রকেই হোমমন্ত্র করিয়াছিলেন; অতএব ইহা বাঙালীর স্বধর্ম্মের পরিপন্থী নয়। তথাপি রবীন্দ্রনাথ কোনরূপ তান্ত্রিক-সাধনার পক্ষপাতী না হইয়া এই যে বৈদান্তিক যোগসাধনাকেই একমাত্র মুক্তিপন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি তাঁহার জন্মগত বাঙালী-সংস্কার বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। বৈদান্তিক হইলেও তিনি বৈষ্ণব, তাই তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনার ফল যেমনই হউক, তিনি বাঙালীর জন্য বাংলা ভাষায় ভাবের যে রূপ-বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন তাহাতেও এ জাতির সম্যক আত্মবিস্মৃতি কখনও ঘটিবে না, কারণ, সে ভাষা শীঘ্র মরিবে না। এই ভাষাই প্রাণের নিশ্বাস-বায়ুকে সঞ্জীবিত রাখিয়া বাঙালীর আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের উপায় হইয়া থাকিবে। যে জাতি এহেন ভাষার অধিকারী হইয়াছে, জীবিত জগজ্জন-সভায় তাহার আসন কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

উদ্যোগ-পর্ব্বের কাব্য

১। বন্দনা। মরণ যখন ঘনিয়ে এল মনের মানুষ কইছে তখন কথা,
রহস্যময়, এ বিচিত্র লীলা তোমার বুঝতে পারি না কো।
ভয়ে যখন ভাঙছে স্বপন তখন কেন স্বপ্ন-ব্যাকুলতা,
শ্মশান-ভূমির ধূসরতা শ্যামল-শোভায় মিথ্যা কেন ঢাকো?
আজো দেখি কল্পলোকের দূতেরা সব করছে আনাগোনা,
আকাশ-পথে ছিপ ফেলে কি আজকে তারা-ধরার সময় হ'ল—
ছিঁড়েছে জাল এখন কেন নতুন ক'রে চলেছে জাল বোনা?
নগ্ন যাহা সত্য যাহা দেখাও তাহা, মোহাবরণ তোল।
অপরূপকে দেখেছি যে সবুজ ধানে, নীলের গভীরতায়,
দেখেছি তায় তুষারধবল আকাশ-ছোঁওয়া হিমাচলের চূড়ে,
দেখেছি তায় নিশীথরাতে বধূর যখন ঘোমটা খসে যায়,
সদ্যমুকুল-আমের ডালে কোকিল ডাকে ব্যাকুল-করা সুরে।
দেখেছি তায় মেঘলাদিনে পেখম-মেলা অধীর শিখীর নাচে,
মধ্যদিনের প্রখর দাহে আলিসাতে কপোত-কূজন মাঝে,
মায়ের স্তনে মুখটি রেখে দেখেছি তায় শিশু যেথায় বাঁচে,
দেখেছি তায় পাখীরা সব ফেরে যখন ক্লান্ত পাখায় সাঁঝে।

বজ্রানলে পৃথ্বী জ্বলে, বহ্নিজ্বালা ছড়ায় দিকে দিকে,
এমন দিনেও মনের মানুষ কইবে কথা সেই পুরাতন ভাবে?
রহস্যময়, বাণী তোমার রক্তধারায় যেতেছ আজ লিখে,
শূন্যপথে কানে আমার সেই বাণীরই আভাস যেন আসে।
ভাঙাগড়ার লীলায় তোমার রুদ্রবীণা শুনতে আমায় দাও,
তোমার শান্ত মধুর লীলা জীবন ভ'রে অনেক দেখিলাম—
আজকে প্রভু, সেই আবরণ কঠিন হাতে তুমিই তুলে নাও,
নয়ন ভ'রে দেখি এবার সেই মধুরের ভীষণ পরিণাম।

২। "পরিস্থিতি"। এমনই করিয়া দিন যাবে কি?
ফাঁকা ফাঁকা খালি খালি ভয়ে ভয়ে চালাচালি,
চলিছে না কোনো চাল সাবেকী।
থমথম করিতেছে গমগমে রাস্তা,
কাঁপিছে সমান ভয়ে শাসিত ও শাস্তা,
তেছরা কাটিয়া মাটি কত আপনারে ঘাঁটি,
বালিতে হালেতে পানি পাবে কি?

এই হাল কত কাল থাকবে ?
এল এল, ওই ওই, হেথা থুই, হোথা রই—
শাক দিয়ে কত মাছ ঢাকবে ?
শাশ্বত কিছু নয় দৃশ্যত বুকেও,
ঢাকছ ও পোড়ামুখ পাউডার রুজেও ;
মুছবে চোখের জলে তার আয়োজন চলে,
বার বার কত আর মাখবে ?

দৈন্য স্বীকারে নাই লজ্জা,
সোহাগহুজি দাও বলে, "কোল টানি নিজ কোলে,
রাখতে আপন মেরু মজ্জা।"
আমরা বৃথাই থাকি তোমাদের ভরসায়,
না মেলে ছাতাই যদি রৌদ্রে ও বরষায়
ভাল আর নাহি লাগে পুরাতন অনুরাগে
প্রিয়-রুচি-অনুযায়ী সজ্জা।

মিথ্যা তোমায় বঁধু দুষছি,
মাংস খাইতে চাই, সুতরাং আমরাই
জোড়া জোড়া পাঁঠা কিনে পুষছি।
প্রয়োজন হ'লে ধ'রে বলি দিই খড়্গে,
পাঠারে ভুলায়ে বলে, "চলিয়াছ স্বর্গে"—
কভু কি বলেছি কেহ দর্শিত মোদের স্নেহ,
ছলে বলে নিজেদেরি তুষছি ?

অসময়ে বৃথা অনুশোচনা,
আজো প্রিয় তোমরাই, তোমাদেরই মুখ চাই—
মোদের নয়ন-জল মোছ না।
তাই দাও যা এনেছ আমাদের ভোলাতে,
দাঁড়ে বাঁধা কাকাতুয়া তুষ্ট যে ছোলাতে
যাই তার দাও নাম, পারি না হইতে বাম—
রৌদ্র না হয় কভু জ্যোছনা।

৩। আবগারি। এস নেশা করি, বুঁদ হয়ে যাই, হাত-পা-মাথার যা খুশি হোক,
আসছে মুক্তি, এই তো সময়—হয়ে নাও আগে বিগতশোক।
ব্র্যাণ্ডি হুইস্কি নাই যদি মেলে, যোগাড় হবেই প্রচুর তাড়ি
খেনো খাঁটি আর সিদ্ধি মোদক—তুরিতানন্দে পেলে কি ছাড়ি ?

এ "পরিস্থিতি"তে মোদের মাত্র এক পথ অতি সরল সোজা—
রূঢ় বাস্তব শক্তের হাতে ন্যস্ত করিয়া চক্ষু বোজা।
আমরা দেখিব স্বপ্ন রঙিন নেশার রাজ্যে ভ্রমণ করি,
কালাচাঁদ যদি হ'য়েন সদয় পলকে বাঁচি—ক পলকে মরি।
অথবা কোকেন যদি বা রাখেন, অবতারণ তিনিই ভবে,
দুর্যোধনের ভাঙলেও উরু, এঁদের কৃপায় রাজাই রবে।
শাস্ত্রে কোথাও নাই মানা, দেখ নার্ভাস হ'লে ব্র্যাণ্ডি খেতে
ডাক্তারে দেয়, মৃত্যুশীতল বক্ষ চ'কিতে ওঠে যে তেতে।
এমন সুযোগ পাব কি কখনো, না যদি অদ্য সদ্য করি
সাদা চোখে দাদা কাদায় টেকে কেমনে বা শোব বক্ষ 'পরি?
ভেঙেচুরে ছ'ড়ে যাবেই অঙ্গ, ব্যঙ্গ করিব তাহারে কিসে—
তেলের সঙ্গে জল তবু মেশে, নেশার সঙ্গে ভয় না মিশে।
অতএব এস, বুঁদ হয়ে যাই, এ সুযোগে কেন পস্তে মরি;
রেস্ত নেই কো? রোস তো বন্ধু, গুলি-ওলাদের স্মরণ করি।
দম দিয়ে নাও ভ্রম হবে তুমি তখ্ত-তাউস জাহাঙ্গীর,
এই তো অসার খলু সংসার, নেশা আশ্রয়, নেশাই থির।

৪। সমাধানী। মাগো! আমরা পালিয়ে এলাম চ'লে,
বাবা কেন রইল কলকাতায়।
কখন দেখ নিলে আমায় কোলে,
এল না ঘুম চোখের দুই পাতায়।
ঝাপসা চোখে ঘুমুই কেমন ক'রে,
যতই কেন দোলাও মাগো জোরে;
মিথ্যেমিথ্যি বকছ তুমি মোরে
বুদ্ধি তোমার একটুও নাই মাথায়,
নইলে তুমি আসবে কেন চ'লে,
বাবা যখন রইল কলকাতায়।

বলছ, মোদের মাথায় পড়ত বোমা,
বোমারা সব দোষী কি মা বাবার?
আমরাই কি দোষ করেছি ওমা,
বোমা কি ছাই আমাদেরই খাবার!
ওরা কি মা শুধুই ছেলেধরা,
ওদের নামে বেঁধেছে কেউ ছড়া?
তুমি কেন পালিয়ে এলে ত্বরা
নেই কো তাড়া আজো ফিরে যাবার

তেমন যদি ভীষণ হয় মা বোমা,
বোমারা সব পোষা নয় তো বাবার।

এসেছি মা, কত দিন যে হ'ল,
প্রথম প্রথম লেগেছিল ভালো,
এখন কেবল দুচোখ ছলোছলো
চোখের জলে ভিজছে মীরার গালও।
সকাল-সন্ধ্যা ব'সে ঘরের কোণে
বাবার কথাই পড়ছে খালি মনে,
ডাকছি তাঁকে সমানে দুই বোনে,
টেলিফোনে বলছি, হালো হালো।
পাই নে জবাব, দুচোখ ছলোছলো
চোখের জলে ভিজছে মীরার গালও।

দাদা দিদি—ওরাই আছে বেশ,
বই পড়ছে, করছে কেবল সাজ,
আমি ভাবছি, কবে হয় মা শেষ,
জ্ব'লে পুড়ে সর্ব্বনেশে বাজ।
দিন রাত্তির মন যে কেমন করে,
চল মা যাই আবার ফিরে ঘরে—
তুমি দেখো বাবায় পেলে পরে
নষ্ট একটু করব না তাঁর কাজ—
দাদা দিদি—ওরাই আছে বেশ,
বই পড়ছে, করছে কেবল সাজ।

হ্যাঁ মা, ওদের নেই কি মীরা রমা,
তাদের ছেড়ে আসছে কেমন ক'রে?
দেখলে মোদের তাদের ভাববে তো মা
দেখব তখন বোমা কেমন ছোঁড়ে।
ফিরে চল কলকাতাতে যাই,
আমরা থাকলে একটুও ভয় নাই,
রেখেই দেখ আমার কথাটাই
রওনা হয়ে চলই না কাল ভোরে।
অবাক হয়ে বাবা বলবে, রমা,
কলকাতাতে এলে কেমন ক'রে।

ছোট গল্প

১

চৈত্র মাস। রৌদ্রের তেজ বেশ বাড়িয়াছে। দ্বিপ্রহরে উত্তর দিকের বারান্দার কোণটা শীতল। ভূরিভোজনান্তে একটি কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া সেই কোণটি আশ্রয় করিয়াছি। হস্তে খবরের কাগজ আছে, তন্দ্রাবিষ্ট-নয়নে মনুষ্যজাতির পাশবিকতার কথা পাঠ করিয়া বর্ত্তমান সভ্যতার ভব্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিতেছি, মনে হইতেছে, আমরা ভারতবাসীরা কোন কারণেই বোধ হয় এমন নৃশংস বর্ব্বর হইয়া উঠিতে পারিব না, যে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের শোণিতধারায়—। হঠাৎ কাগজটা হাত হইতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ঢুল ধরিয়াছিল। উঠিয়া বসিতেই নজরে পড়িল, সম্মুখের তপ্ত পথ দিয়া জীর্ণ মলিন বসন পরিহিত একজন পথিক একটা প্রকাণ্ড বস্তা মাথায় করিয়া পথ অতিবাহন করিতেছে। দুঃখ হইল। এই দারুণ রৌদ্র, মাথায় অতবড় বস্তা! নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। লোকটি আমার বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া আর পারিল না, বস্তাটা মাথা হইতে নামাইয়া রাখিয়া হাঁপাইতে লাগিল। অদ্ভুত চেহারা! মাথায় রুক্ষ চুল, মুখময় কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি, চোখে নিকেলের চশমা, মাথায় পাগড়ি, গায়ে জামা নাই, খালি পা।

হঠাৎ এ কি! খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলাম। শেষটা উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। বস্তাটা নড়িতেছে! বেশ, নড়িতেছে। গেট খুলিয়া বাহির হইয়া গেলাম। কাছে গিয়াও দেখিলাম, সত্যই নড়িতেছে। বস্তার মুখ কষিয়া বাঁধা, ভিতরে কি আছে দেখা যায় না।

কি আছে ওর ভেতর?

কুকুরবাচ্ছা।

কুকুরবাচ্চা ?

হ্যাঁ। কুড়িটা কুকুরবাচ্চা।

বেশ নির্বিকারভাবে উত্তর দিল।

বস্তায় কুকুরবাচ্চা পুরেছ কেন ?

রাত্রে ঘুমুতে দেয় না, বড় বিরক্ত করে। গঙ্গায় ফেলে দিতে যাচ্ছি।

বল কি ?

বস্তাটা আর একবার নড়িয়া উঠিল।

পাগল নাকি তুমি ? খুলে দাও।

বড্ড বিরক্ত করে বাবু।

বস্তাটা আবার নড়িল।

দম বন্ধ হয়ে ম'রে যাবে যে এই গরমে। খুলে দাও শিগগির।

নিজেই হেঁট হইয়া বস্তার মুখটা খুলিতে লাগিলাম। লোকটা বাধা দিল না। কোমরে হাত দিয়া ঘাড়টা একটু কাত করিয়া স্মিত মুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। রাস্তায় লোক জমিয়া গেল। দুই-একজন বলিল, লোকটা সত্যিই পাগল। ভিন্ন গ্রামে থাকে।

কাঁই কাঁই কাঁই কাঁই—কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ—

কুড়িটা কুক্কুরশাবকের আর্ত্তকণ্ঠ নৈশ অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিতেছে। প্রত্যেক শাবকটিই সবেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সজোরে ভূমিতে নিপাতিত হইতেছে। নিপাতিত করিতেছি আমিই। শুইতে গিয়া দেখি, কুড়িটাই আমার বিছানায় কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে! কি আপদ!

"বনফুল"

ভয়

অন্ধকারের কুক্ষি চিরিয়া পন্থা চলেছ কেউ ?
সঙ্গবিহীন শঙ্কাকঠিন পথ ?
ত্রাসে নীরন্ধ্র অন্ধকারেরো বক্ষ সঘনে উঠিতেছে কেঁপে কেঁপে—
চিন্তার শ্বাস আসিছে রুদ্ধ হয়ে ;
অবশ চরণ প্রতি বিক্ষেপ গতির পক্ষাঘাতে
কঠিন কাঁকর-পাথরের বুকে আছাড়ি আছাড়ি পড়িছে ছন্দহারা,
পদাহত ধুলি রুখিয়া উঠিছে বুকে মুখে মস্তকে,—
কবর ফুঁড়িয়া যেন পিশাচেরা সবেগে হানিছে মৃত্যুর পিচকারি।
ত্রস্ত পথিক চলেছে বিপদ-বন্ধুর দূর পথ।
জনবাসহীন ধুধু প্রান্তর আবরি অঙ্গ নিষ্ঠুর কালো বাসে
ত্রাসদুর্ব্বল পথিকে টানিছে—বক্ষে তাহার অক্টোপাসের ক্ষুধা।
শনশন করে রাত্রি দুপুর সম্মুখে কালো পথ—
অবশ পথিক আগাইয়া চলে মরণের মুখে যেন ;
দাঁড়ায়ে ভাবিতে নাহি তার অবসর,
পশ্চাতে তার শঙ্কার দল গ্রাসিবার লাগি করিছে অনুসরণ।

সম্মুখে ঐ 'অগেয়ার সাঁকো' নয় ?
দিন দুপুরেও যার পাশে যেতে ছমছম করে দেহ।
লক্ষ প্রবাদ উঠেছে যাহারি বক্ষ কেন্দ্র করি ;
খুনে 'মানুষুবে' যত
হেথায় করিয়া আত্মগোপন কত প্রাণ নিয়ে খেলিয়াছে ছিনিমিনি.
খুনে খুনে এর বুক হয়ে আছে রাঙা ;
যুগ যুগ ধ'রে ডাকাত-দলের প্রিয় এই স্থান জমায়েত-বস্তির।

পথের দুধারে জাম-অর্জ্জুন মাথায় মাথায় ঠেকায়ে দাঁড়ায়ে আছে,
তারি মাঝখানে ছোট্ট একটি সাঁকো.

সড়কের বুকে যেন তুলিতেছে মড়কের হাহাকার !
মাথার উপর জড়িত-কণ্ঠে সাড়া দিল এক তন্দ্রিত দাঁড়কাক।
তারও কি কঠিন কণ্ঠ হয়েছে কুণ্ঠিত শঙ্কায় !
বুঝি আসন্ন বিপদবার্ত্তা জানাইল সঙ্কেতে !
পথের নিম্নে বনতলে ও কি খসখস করে নয় ?
খুনেরা কি তবে ?—লুপ্ত হইল সাহসের শেষ বিন্দুটি পান্থের,
পাশে চাহিবার শক্তি নাহিক তার,
চক্ষু দুটিরে মুদি
ভয়-মুমূর্ষু পথিক চলিল প্রাণপণ দ্রুতপদে ;
নিঃসাড়ে যেতে চাহে,
শঙ্কা-বেতাল চরণ তাহার অস্বাভাবিক শব্দই তুলে শুধু ;
টুঁটির পার্শ্বে স্পর্শের হাওয়া করিতেছে যেন স্পষ্ট সে অনুভব।
মাতালের গতি পথিক চলেছে পথে।

'অগেয়ার সাঁকো' পিছনে পড়েছে—ভরসায় করি ভর
নয়ন মেলিয়া দেখিল পান্থ সম্মুখে তার উদাস তেপান্তর ;
তরুগুল্মের চিহ্নও সেথা নাই,
দুটি পঞ্জর যেন প'ড়ে আছে অতিকায় কোন পুরানো বঙ্কালের,
তারি মাঝখানে সরু সে সড়ক মেরুদণ্ডেরই অস্থিখণ্ড যেন।
পিছনের দিকে চাহি একবার, সাবধানে ফেলি একটি দীর্ঘশ্বাস
লঘুতরগতি পথিক সমুখে হইল অগ্রসর।
নৈশ শৃগাল মন্থরগতি সম্মুখ দিয়া পথ হয়ে গেল পার,
থমকি পান্থ দাঁড়াইল সন্ত্রাসে ;
পথের পার্শ্বে দাঁড়ায়ে শৃগাল চাহি ক্ষণকাল রহিল তাহার পানে,
দরদরবেগে ছুটিল ঘর্ম্ম পথিকের সারা দেহে ;
শৃগাল বটে তো ?—চলিল পান্থ যন্ত্রচালিতবৎ।

চিরকুখ্যাত বটতলা ঐ সামনে 'সুঁদিপুরে'র ;
অতি পুরাতন বট—
নির্ম্মূল নিষ্কাণ্ড, কেবল ঝুরির স্কন্ধে শাখা পল্লবে ধবি
দাঁড়ায়ে রয়েছে তারি বক্ষের কাহিনীগুলিব মত ;
পিশাচ-দানার আবামেব আস্তানা।
শঙ্কাব ঘুঁটি দুটিই পড়েছে পিছে ;
চলিল পথিক আরো লঘুতবগতি।
দূরে সাঁওতাল-পাড়ার কুকুর নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে হানিল সাড়া,
একটা ঝলক শীতল বাতাস ব'য়ে চ'লে গেল প্রেত-ফুৎকাববৎ,
শিববাত্রির ব্রতদুর্ব্বল ভীতি-বিহ্বল পথিক কাঁপিল ভয়ে।

পথ বেশি দূর নাই,
রাত্রি মাত্র দণ্ড কয়েক বাকি,—
পথিক থমকি দাঁড়াল তাহার চিরপরিচিত শ্মশানের পাশে আসি ;
নগ্নবক্ষ মহাশ্মশানের গুরুগম্ভীর নিথর পড়িয়া আছে।
দূরে 'লা-ঘাটা'র ঘাটে
শিবরাত্রিব যাত্রী কে যেন বলিয়া উঠিল, জয় শিবশঙ্কব !
শুষ্ক একটা অর্জ্জুন-ডালে শকুনি-মিথুন ঝটপট করে পাখা,
শ্মশান-শিবার কণ্ঠে জাগিল সাড়া,
পথিকের বুক সবেগে উঠিল কাঁপি,
সারাদেহে উঠে ঘন ঘন তার রোমাঞ্চ-শিহরণ ;
শুষ্ক কণ্ঠ চিরিয়া তাহার অস্বাভাবিক উঠিল উচ্চধ্বনি—
জয় শিবশঙ্কর !
শঙ্কা আসিল শঙ্কর-রূপ ধবি,
সঙ্কটে হ'ল সঙ্কটত্রাণ শঙ্কাবারণ শিব।

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ

উনপঞ্চাশ নম্বর মেস

[Mess No. 49]

—চরিত্র—

অক্ষয় হালদার—অবিবাহিত প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক।	বিশুদ্ধ বক্সী	অতি-আধুনিক সাহিত্যিক-দল
ম্যানেজার—উনপঞ্চাশ নম্বর মেসের পরিচালক।	কেতন নন্দী	
চিদ্‌ঘনানন্দ—সন্ন্যাসী ও মেসের অধিবাসী।	মদন মিত্তির	
গোবর্দ্ধন—মেসের চাকর।	ফুলু চাটুজ্জে	
বিরূপাক্ষ—পূর্ব্ববঙ্গীয় ভদ্রলোক।	চপলা ঘোষ	

ক্ষেমঙ্করী—পাশের বাড়ির দাসী

প্রাণায়াম, ধ্যানেশ্বর, তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি

মেসের কক্ষ—ম্যানেজারের অফিস

দুইখানি চেয়ার, একটি ভাঙা টেবিল, দেয়ালে ক্যালেণ্ডার, টেবিলের উপর রাশিকৃত পুরাতন ফাইল, একটি কোণে একটি কুঁজা ও জলের গেলাস এবং নানাপ্রকারের জিনিস-পত্র পড়িয়া আছে। ম্যানেজার কি লিখিতেছিল, সহসা লেখা বন্ধ করিয়া সম্মুখের আসনে অবস্থিত অক্ষয়বাবুর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল

ম্যানে। সেসব কোন-কিছু অসুবিধে আপনার হবে না অক্ষয়বাবু। বাড়িতে আপনি যে সুবিধে না পান, আমাদের এই ৪৯ নম্বর মেসে দিন তিনেক থেকে দেখুন, মনে হবে, যেন জমিদারি করতে করতে মহল তদারকে এসেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ঘূর্ণায়মান বা অঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে অল্পক্ষণের জন্য অভিনয় করা চলিবে। স্থিত-রঙ্গমঞ্চে পরে পরে চারিটি দৃশ্য থাকিলেই চলিবে—দৃশ্যান্তরের সময় আলো নির্ব্বাপিত করিয়া যন্ত্র-সঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়—রঙ্গমঞ্চের সম্মুখের পর্দ্দা ধীরে ধীরে টানিয়া অতি দ্রুত দৃশ্যের মালপত্র সরাইয়া ফেলিলে দর্শকের দেখিবার ও অভিনয়ের সৌকর্য্য-বৃদ্ধির সুবিধা হইবে। যে-কোন দল যখন তখন এই রঙ্গ-নাট্য অভিনয় করিতে পারেন। ভদ্রতার খাতিরে শঃ চিঃ সম্পাদককে একবার জানাইলে ভাল হয়।

কথাটা শুনিয়া অক্ষয়বাবু একটু দেঁতো হাসির সহিত সলজ্জভাবে বলিলেন

অক্ষয়। না না, ম্যানেজারবাবু, সেসব অসুবিধের কথা আমি ভাবছি না, আমি শুধু ভাবছি যে,—দেখুন, আমি একটু নির্জ্জনতা-প্রিয় লোক, নিজে একটু ধর্ম্মটর্ম্ম চর্চ্চা করি, তাই—সকাল বিকেল অবশ্য অফিসটাতেই কেটে যাবে,—বেশি ডিস্টার্বেন্স না হ'লেই আমি খুশি।

ডিষ্টার্বেন্স কথাটা শুনিয়া ম্যানেজার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ফেলিল

ম্যানে। ডিস্টার্বেন্স! কি বলছেন? আপনার ধর্ম্মচর্চ্চার সঙ্গী আপনি এখানে যা পাবেন, কলকাতার কোন ধর্ম্মশালায় আপনি তা খুঁজে পাবেন না—এ আমি জোর গলায় আপনাকে ব'লে দিতে পারি—হ্যাঁ।

অক্ষয়। এখানে সে রকম লোকও সব আছেন নাকি?

ম্যানেজার আরও যেন বিস্মিতভাবে কহিল

ম্যানে। আছেন মানে? ঠাসা। পাটের গুদোমের মত একটা ঘরে সব ঠেসে রেখে দিয়েছি। এয়ার-রেড হ'লে সব যদি মরে, তবু ও ঘরের লোকগুলো বেঁচে থাকবে। আমি রীতিমত স্ট্রং-রুমে সবাইকে পুরে রেখে দিয়েছি। আমাদের আর কি আছে বলুন ধর্ম্মটি ছাড়া? ওইটি যদি যায়, তা হ'লে তো ভারতবর্ষই গেল!

অক্ষয়। যাক্, শুনে বড় খুশি হলুম ম্যানেজার মশাই।

ম্যানে। খুশির এখন হয়েছে কি অক্ষয়বাবু! এর পরে তিন দিন থাক, আপনি আর এ জায়গা ছাড়তে চাইবেন না। কৃচ্ছ্রসাধন করতে চান তার ব্যবস্থা আছে, সাহিত্য-সাধন করতে চান তার আয়োজন প্রচুর, যেসব বই লাইব্রেরিতে আমরা রেখেছি, তার কপি আর অন্য কোথাও খুঁজে পাবেন না—দু-একখানা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ছিল, বোধ হয় এদ্দিনে সেসব উড়ে-পুড়ে গেছে।

অক্ষয়। বলেন কি?

ম্যানে। বলি যা, তা ঠিক। আপনার যে ঘরে থাকবার ইচ্ছে আপনি থাকতে পারেন। জীবনে—ওই তো বললুম আপনাকে—

ভুলতে পারবেন না মশাই, এই মেস নম্বর ফর্‌টিনাইনকে। ধর্ম্মচর্চ্চা, সাহিত্যচর্চ্চা, রাজনীতিচর্চ্চা, শরীরচর্চ্চা, মায় প্রেমচর্চ্চা সমস্ত পাশাপাশি চলছে, অথচ মনে করুন, কারুর সঙ্গে কারুর ক্ল্যাশ হচ্ছে না। শুরু হচ্ছে এক সঙ্গে, শেষ হচ্ছে এক টাইমে। শুধু চাকররা গিয়ে মাঝে মাঝে দরজায় শেকল দিয়ে আসে।

অক্ষয় বিস্মিত হইলেন

অক্ষয়। শেকল কেন?

ম্যানে। ওটা ডিফেন্সের জন্যে করতে হয়েছে। কারণ মানুষের ভাবের আতিশয্য হ'লে মাঝে মাঝে সব ঘুলিয়ে যায় কিনা! এক ঘরের লোক আর এক ঘরে পট ক'রে চ'লে গেলেই বিপদ! দু-একবার তা হয়েছেও মশাই। একবার একটি ধর্ম্মের লোক সাহিত্যের ঘরে ঢুকে পড়লেন, ওঃ, সে এক বিপদ! আজকালকার সাহিত্য, সে ধর্ম্মকে মানবে কেন? সে যাচ্ছে-তাই ক'রে ব'কে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে ঢুকলেন দাড়িওলা ধর্ম্ম—যখন বেরিয়ে এলেন, দেখলুম, কোন রকমে ভদ্রলোকের টিকিটা বেঁচেছে, দাড়ির একগাছিও নেই। সেই থেকে দরজা বন্ধ করবার নিয়ম হ'ল। ভাল করেছি কি না বলুন?

অক্ষয়। নিশ্চয়। গোলমালটা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় বইকি।

ম্যানে। যাক, তা হ'লে মাসের ভাড়াটা—আপনার হ'ল একুশ টাকা ক'রে একশো ছাব্বিশ, আর ধরুন ভর্ত্তি হওয়ার দরুন পনরো—একশো একচল্লিশ, তিন টাকা বাথ-রুম রিজার্ভের আর ছ টাকা স্টোর-রুমে আপনার জিনিসপত্র রাখার ভাড়া। মোট দেড়শো টাকা—দিয়ে দিন, তারপর চেপে বসুন। মনে হবে, রাজার গদিতে উঠে ব'সে আছেন।

অক্ষয়। দেখুন, বাথ-রুমের জন্যে আবার আলাদা ভাড়া ধরছেন, এটা কি রকম?

ম্যানে। মশাই, বাথ-রুমের ভাড়া না দিলে আপনার বিপদই যে সবচেয়ে বেশি। খালি পাবেন কি ক'রে? এক-একজন ঘরে ঢুকলে আর বেরুতে চান? তিনজন ধার্ম্মিক ঢুকলে জটা ভিজতেই তো লাগবে

দুই ঘণ্টা, তারপর স্নান, তারপর গা-মোছা, চৌবাচ্চায় অবগাহন—পূজো আহ্নিক ইত্যাদিতে হয়ে গেল আপনার অফিস যাওয়া!

অক্ষয়। তা আর দু-চারটে তো বাড়াতে পারেন?

ম্যানে। যখন আধ ডজনে পারি নি, তখন পুরো এক ডজন করলেও পারব না। বাঙালী কলঘরে ঢুকলে, মদ খেতে শিখলে, আর লোকের পেছনে লাগতে পেলে অভ্যেস ছাড়তে পারে না। এ যা ব'লে দিলুম লাখ কথার এক কথা—হ্যাঁ।

অক্ষয়। রিজার্ভ করলে কি আমি কোন স্পেশাল সুবিধে পাব?

ম্যানে। আলবৎ। আপনি আগে বেরিয়ে এলে তবে এঁরা ঘরে ঢুকতে পাবেন।

অক্ষয়। তা ওঁদেরও তো কাজ থাকতে পারে?

ম্যানে। কাজ কচু। বাড়ির সবাইকে এয়ার-রেডের ভয়ে পাঠিয়ে দিয়ে এসে এখন সব ধর্ম্ম নিয়ে পড়েছে।

অক্ষয়। তবে এই যে বললেন, বহু ভাল ভাল লোক এখানে—

ম্যানে। আহা! আপনি কথাটা বুঝছেন না। ধার্ম্মিকেরও তো শ্রেণী আছে? আমার এখানে বকধার্ম্মিকদের জন্যেও তো ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। পাঁচ রকম না রাখলে খদ্দের আসবে কেন? উপরন্তু মনে করুন, এ বাড়ি মন্ত্রপূত করা—

অক্ষয়। কি রকম?

ম্যানে। যতই বিপদ আসুক না কেন, এ বাড়ির কিছু হবে না। যদিও বা মন্ত্র কেউ কাটায়, তা হ'লে অপর ঘর উড়তে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের ঘর ঠিক থাকবে। এ ছাড়া মনে করুন, ওপরে পাঁচ থাক বালি—চারিধারে ইয়া মোটা পাঁচিল, প্রত্যেক চৌকির তলায় পাঁচ হাত ক'রে গর্ত্ত। আধ্যাত্মিক, জাগতিক, সান্নিপাতিক সব রকমের প্রিকশান নিয়েছি মশাই। এতেও যদি মারা যান, তা হ'লে আপনার নামে যম ঠিক দিয়ে রেখেছেন বুঝতে হবে।

অক্ষয়। বোধ হয় এই সব করার জন্যেই এই মেসটায় এত ভিড়?

ম্যানে। ভিড় মানে? বায়স্কোপের নতুন ছবির ম্যাটিনী শোতেও এত ভিড় হয় না, ফুটবলের মাঠেও এত ভিড় জমে না—একদিন

তো ভিড় সরাবার জন্যে কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করতে হ'ল। তাই তো বলছি, আর দেরি করবেন না—এইবেলা ফর্মে সই ক'রে দিন।

অক্ষয়। দিন, যখন থাকতেই হবে, তখন ভাল জায়গায় থাকাই ভাল। বাড়ির সব বিদেশে—এখানকার বাড়িও ছেড়ে দিয়েছি, সেইজন্যে আমার মনে হয়, আমার পক্ষে বোধ হয় এই মেসটাই সুবিধের হবে।

ম্যানে। সে আর বলতে। নিন মশাই, সই করুন।

অক্ষয়বাবু সই করিলেন

থ্যাঙ্ক ইউ। টাকা?

অক্ষয়। এই যে।

ম্যানেজারের হাতে টাকা দিলেন

ম্যানে। মেনি থ্যাঙ্কস। আজ থেকেই তা হ'লে—

অক্ষয়। হ্যাঁ, আজ থেকেই।

ম্যানে। ওরে গোবর্দ্ধন, বাবুকে নিয়ে যা—একতলা ৪৬ নম্বর ঘর—ধর্ম্মমহল।

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ

এই যে এর সঙ্গে যান, সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে। আর আপনার জিনিসপত্তর সব ঠিক জায়গায় থাকবে আমাদের ভাঁড়ারে, কিছু ভয় নেই। শুধু দরকারগুলো পাঠিয়ে দোব 'খন।

অক্ষয়। আচ্ছা, চলি।

অক্ষয়বাবু গোবর্দ্ধনের পিছু পিছু গিয়া একটি কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইলেন

ধর্ম্মমহল

অন্ধকার কক্ষে তিনটি চৌকি পাতা, এক কোণে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। চারজন ব্যক্তি কক্ষে আছেন—চিদ্‌ঘনানন্দ, ধ্যানেশ্বর, তুরীয়ানন্দ, প্রাণায়াম ইত্যাদি। অক্ষয়বাবু ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে কিছু দেখিতে পাইতেছিলেন না, হাতড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন

গোবর্দ্ধন। বাবু, এই ঘরে চ'লে যান। দরকার হ'লে দরজায় টোকা দেবেন, আমি শেকল খুলে দোব।

অক্ষয়। ওহে, এ যে বড় অন্ধকার!

গোব। পিদ্দিম আছে, এখন আলো থেকে এলেন কিনা, সেইজন্যে ঝাপসা দেখছেন। ও স'য়ে যাবে। আমি বাবু, দরজা বন্ধ ক'রে দিই।

অক্ষয়। ওহে, খাব কি?

দরজায় শিকল দিতে দিতে গোবর্দ্ধন বলিতে লাগিল

গোব। সে ফোকর দিয়ে দিয়ে যাব 'খন। আপনি কোণের তক্তাপোশে এখন শুয়ে পড়ুন।

প্রস্থান

অক্ষয়বাবু হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, সহসা একটি চৌকিতে উপবিষ্ট জটাজূটধারী সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলেন। সন্ন্যাসীর নাম চিদ্‌ঘনানন্দ

চিদ্। কস্ত্বং?

অক্ষয়বাবু চমকিয়া উঠিলেন, কথা কহিলেন না

সাড়া দিচ্ছ না যে, কে তুমি?

অক্ষয়। আজ্ঞে, আমি একজন নতুন লোক, আজকে এখানে এসেছি।

চিদ্। নাম?

অক্ষয়। শ্রীঅক্ষয়কুমার হালদার।

চিদ্। সব খুইয়েছ বুঝি? রেঙ্গুন থেকে আসছ তো?

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি কলকাতার লোক।

চিদ্। [উচ্চৈঃস্বরে] কভ্ভি নেই। কলকাতার লোক এতবড় আহাম্মক হতে পারে না।

অক্ষয়। কি বলছেন মশাই?

চিদ্। বলছি খাঁটি কথা। এখানে আসার চেয়ে সাইরেন বাজলে রাস্তায় বা ছাতে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে চট ক'রে গুলি খেয়ে মরতে পারিতে। এখানে যে হাঁপিয়ে মরবে!

অক্ষয়। আপনি এসব কি বলছেন মশাই?

চিদ্। তোমায় এখানে আসতে কে পরামর্শ দিলে?

অক্ষয়। আমার এক বিশেষ বন্ধু বললে যে, এটা খুব ভাল জায়গা।

বাড়ির সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছি বিদেশে, তাই সে আমায় বললে, সস্তায় ভাল জায়গা এই ৪৯ নম্বর মেস—এখানে যাও। তা ছাড়া ম্যানেজার মশাই বললেন যে, এখানে বেশ ভালভাবে থাকা যাবে, কিন্তু যা দেখছি—

চিদ্। সবই মায়া, না? আরে বাপু, মায়াময় জগৎ—এ কথা বোঝাই কাকে? আজ সাত দিন ধ'রে একটা লোক পাচ্ছি না যাকে ছুটো কথা বলি! ঐ দেখ না, তিনটি প্রাণী তিনটি তক্তাপোশে ব'সে আছেন, সাড়া নেই! একজন করছেন ধ্যান, একজন গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে কোণে ব'সে আছেন, আর একজন নাক টিপে প্রাণায়াম আরম্ভ করেছেন, আর আমি চিদ্‌ঘনানন্দ একবার চিতপাত হয়ে শুচ্ছি আর ইয়া বড় বড় ছারপোকার কামড়ে উঠে উঠে বসছি।

অক্ষয়। এখানে আবার ছারপোকা আছে নাকি?

চিদ্। একবারটি শুয়ে দেখ না। যার নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা তাকেও জব্দ ক'রে রাখে। সময় সময় সেগুলো ছারপোকা কি আরসোলা বোঝা যায় না, এমনই বড়। এক প্রাণায়াম ছাড়া আমাদের সব কটাকে তক্তাপোশ থেকে নীচে নাবিয়েছে। কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে হে, কম্বলের ফাঁকে ফাঁকে ঠিক ঢুকে ব'সে চার্জ ক'রে যাচ্ছে।

অক্ষয়। তা আপনি এখানে কি ক'রে এলেন?

চিদ্। কি ক'রে এলুম? ম্যানেজার ব্যাটাকে জিজ্ঞেস কর। আমি যা কিছু শিষ্যদের কাছে আদায় করেছিলুম, ঐ ব্যাটাই ধাপ্পা দিয়ে খেলে।

অক্ষয়। সে কি?

চিদ্। আর সে কি! যা বলছি আগে শোন, ব'স। [অক্ষয় বসিলেন] গোটা পঞ্চাশ টাকা ব্যাটার হাতে দিয়ে বললুম, বাবা, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, বোমার ভয়ে নির্জ্জনে একটু জপতপ করতে পারছি না, তুমি যদি ব্যবস্থা ক'রে দাও আর ছুবেলা খাবারের বন্দোবস্ত ক'রে দাও, তা হ'লে আমি দিনকতক এখানে থেকে যাই। দেখ, ব্যাটা কোথায় আমায় পুরেছে, এখন প্রাণ যায়!

অক্ষয়। তা চ'লে যাচ্ছেন না কেন?

চিদ্। কোন্ চুলোয় যাব বলতে পার? চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, চোর, ডাকাত; বোমা—এ সময় যাই কোথা? অতএব ব্যোম ব্যোম ক'রে এইখানেই ব'সে আছি।

অক্ষয়। তা হ'লে আর ম্যানেজারের দোষ দিচ্ছেন কেন?

চিদ্। দোষ দোব না, বল কি? আমার থাকবার কথা ৩৭ নম্বর ঘরে, আমায় কিনা বেটা ৪৬এ পুরে দিলে! এটা তো কৃচ্ছ্রসাধনের মহল, কিন্তু আমি তো যাব ধর্ম্মমহলে।

অক্ষয়। সে কি? এটা কৃচ্ছ্রসাধন-মহল নাকি?

চিদ্। এই মরেছে। তোমাকেও ফাঁদে ফেলেছে তা হ'লে?

অক্ষয়। ফাঁদে ফেলবে কি মশাই? আমি এখুনি একবার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করব।

চিদ্। দেখা করলেও কিছু ফল হবে না—এক্ষুনি টাকা চেয়ে বসবে। তা ছাড়া আজ রাত্তিরে কোন উপায় নেই—হয় ছারপোকার কামড় খাও, নয় গাঁজায় দম দিয়ে দুটো যুদ্ধের কথা বল শুনি। ঐ নাও, ঘুলঘুলি দিয়ে তোমার খাবার দিয়ে গেল, নিয়ে এসে খাও।

অক্ষয়। প'ড়ে মরুকগে খাবার। আপনি তো আমায় বড় ভাবিয়ে দিলেন মশাই, আমি কি একটা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়লুম নাকি?

চিদ্। সন্দেহের কিছু নেই, তবে সান্ত্বনার কথা হচ্ছে এই যে, এ সংসারে কে জোচ্চোর নয় ভাই? তুমি আমি সকলে। তুমি বাড়ি-ভাড়া কমাবার জন্যে কলকাতায় বাসা তুলেছ, কিন্তু বিদেশে যাদের বাড়ি আছে তারা দুগুণো রোজগার ক'রে নিচ্ছে, তোমারই ঘাড়ে ভর ক'রে। তুমি পুত্রপরিবারকে দূরে পাঠিয়ে হালকা থাকবার মতলবে আছ, তোমার ঘাড়ে এই মেস চেপে বসেছে। তোমার মনের মধ্যে যে জোচ্চুরি তা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এই ফাঁসই তো মায়া, সেই মায়াতীত ব্রহ্ম ছাড়া তোমার তো মুক্তি নেই দাদা। তুমি বোমাকে এড়াতে চেয়ে দুঃখের লাঘব করতে চাও, কিন্তু দুঃখ তোমাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবে প্রতি পদে। পৃথিবীতে প্রতি-নিয়ত এই সুখ-দুঃখের কিতকিত-খেলা চলছেই।

অক্ষয়। আরে থামুন মশাই, ওসব আর ভাল লাগছে না।

চিদ্। রাগ করছ? আমি সন্ন্যাসী, আমার ওপর রাগ ক'রে কোন ফল নেই বৎস। মান অপমান আমার সমান, তা না হ'লে কোন ভদ্রলোক এই গোয়ালঘরের অধম জায়গায় থাকে? তা ছাড়া সবই তো আমি ত্যাগ করেছি ভাই, এখন শরীরটাকে ত্যাগ করলেই হয়, তবে মনে হচ্ছে, আর মাসখানেক এই মেসে থাক্‌লে তা হতে আর বেশি দেরি হবে না।

অক্ষয়। যাক মশাই, আমার আর আপনার সঙ্গে বকতে ভাল লাগছে না। আপনি বলছেন এক, আর দুঃখ করছেন অন্য। কি রকম সন্ন্যাসী আমি বুঝি না।

চিদ্। শহরের সন্ন্যাসীদের বোঝবার চেষ্টা ক'রো না বাবা। আমরা যোগীও বটে, আবার ভোগীও সত্য—ভোগ কমলেই রোগীদের পর্য্যায়ে পড়ি। আমাদের কাজ গৃহীদের ঘাড় ভেঙে ভাল ক'রে থাকা। তাতে অসুবিধে ঘটলেই তোমাদের চেয়ে বেশি মেজাজ খারাপ হয়।

অক্ষয়। নিজের মত সবাইকে মনে করেন কেন মশাই?

চিদ্। বাবা অক্ষয়, আমি অনেকদিন এই লাইনে আছি বাবা, এর কায়দা-কানুন সব জানা আছে। অধিকাংশ এই; ব্যতিক্রম যে কজনা, তা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। সন্ন্যাসী হয়েছি কেন জান? যা-কিছু পুঁজি-পাটা ছিল, গুরুদেবের উদরে সমর্পণ ক'রে মাত্র কৌপীনটি সার ক'রে ব'সে আছি। তাঁর ভাগ্য ভাল ছিল, আমার মত কয়েকটি শাঁসালো শিষ্য পেয়েছিলেন, কিন্তু আমি যে কটি পেলাম, সে কটি স্রেফ আঁটি। তারা ধর্ম্মতেও কন্‌সেশন চায়। বুড়ো বুড়ো মদ্দ হাফ-টিকিটে স্বর্গে যাবার মতলব ক'রে ব'সে আছে। আমিও তেমনই ব্যবস্থা দিচ্ছি। ধর্ম্ম অত সোজায় পাওয়া যায় না বাবাজী।

অক্ষয়। কিছু মনে করবেন না চিতপাতানন্দ স্বামী, আপনি—

চিদ্। ভুল হচ্ছে বাবাজী। আমি চিতপাত নই, চিদ্‌ঘন।

অক্ষয়। ঐ হ'ল ঘনদুধানন্দ স্বামী—

চিদ্। চিদ্‌ঘন।

অক্ষয়। হ্যাঁ, চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী, আমি একজন ধর্ম্মপিপাসু, কিন্তু আপনার মত বোগাস্ সাধু আমি দেখি নি।

চিদ্। আমার আর কতটুকু দেখেছ বাপু? আমি জানি, আমি খাঁটি কথা বলি ব'লে আমার স্থান হয় রাঁচিতে, নয় এই উনপঞ্চাশ নম্বর মেসে। কিন্তু তোমরা কি? তুমি ধর্ম্ম করতে বেরিয়েছ কি হিসেবে শুনি? বিয়ে করেছ?

অক্ষয়। না।

চিদ্। কারণ?

অক্ষয়। বিবাহে বহু বাধা, জোর ক'রে ঘাড়ে ঝঞ্ঝাট নেওয়া।

চিদ্। ও, ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যেই বিবাহ কর নি? সংসারে তবে আছ কেন? দার্জ্জিলিং পেরিয়ে চ'লে গেলে না কেন সিধে? নিশ্চয় নানারকম হাঙ্গামার ভয়ে? ধর্ম্মকে পেতে চাও ফাঁকি দিয়ে? ইয়াকি! প্রাণের ভয়টা আছে ষোল আনা, নিজের দেহের ভোগ-প্রবৃত্তি আঠারো আনা, তবু চাও ধর্ম্ম করতে? তুমি স্লিট-ট্রেঞ্চে ঢুকেও মরবে।

অক্ষয়। সে কি?

চিদ্। হ্যাঁ, এতে আর সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে এত ধ্বংস হচ্ছে, কেন জান?

অক্ষয়। কেন বলুন তো?

চিদ্। সব ধর্ম্মের ঘরে ফাঁকি মারবার চেষ্টা করেছিল ব'লে। আমরা ধর্ম্ম করি তখন, যখন জীবনের সব চান্স নষ্ট হয়ে যায়, দুঃখের সাবমেরিন যখন জীবন-জাহাজকে কাত ক'রে ফেলে, তখন আমরা ধর্ম্মের লাইফ-বোটে উঠে নিজেদের বাঁচাতে চাই। যদি ধর্ম্ম চাও, আমার কাছ থেকে দীক্ষা নাও। আমি দুনিয়ার অনেক-কিছু দেখেছি, আমি তোমায় আলো দেখাব, তুমি খুশি হবে।

অক্ষয়। জীবনটাকে আপনি সত্যি দেখেছেন বুঝছি। সত্যি আপনি আমায় আলো দেখাতে পারবেন?

চিদ্। নির্ঘাত। আগে কিছু বার কর দেখি বাবা, কত আছে?

অক্ষয়। গোটা পাঁচেক।

চিদ্। ওতেই আপাতত চলবে। দাও। [টাকা লইলেন] ঠিক হ্যায়। শোন আমি যা বলি, জীবনটাকে আগে দেখে এস, নিজে বোঝ, ধর্ম্মের জন্যে কতখানি সত্যিকারের আবেগ জেগেছে মনের মধ্যে, তারপর আমি দীক্ষা দোব।

অক্ষয়। জীবনকে কোথায় দেখব?

চিদ্। বেশিদূর যেতে হবে না। আপাতত এই ধর্ম্মগুহার বাইরেটায় গিয়ে দুপাক মেরে এস, আগে ধর্ম্ম কোন্ ধাতু থেকে হয়েছে জেনে এস। ৪৮ নম্বর ঘরে বড় বড় সব আধুনিক সাহিত্যিক আছেন, ওঁদের কাছে জিজ্ঞেস ক'রে এস, জিনিস পাবে।

অক্ষয়। কি ক'রে বেরুব?

চিদ্। কাল সকালেই বেরিয়ে প'ড়ো, যখন দরজা খুলে দেবে। আর এ ঘরে চট ক'রে ঢুকো না, ম্যানেজারকে ব'লে সাহিত্যিক-মহলে জায়গা ক'রে নেবে। আপাতত খেয়ে শুয়ে পড়।

অক্ষয়। বোধ হয় ঘুম হবে না, কারণ এ তক্তাপোশে বড্ড বেশি ছারপোকা, আমি বসতেই পারছি না।

চিদ্। ছারপোকার কামড় সহ্য করতে পার না ছোকরা, তা হ'লেই ধর্ম্ম করেছ! আমি নিজের দেহটিতে রক্ত-চলাচল করাবার জন্যে খাবার খাই, আর ওদের রক্ত খাওয়াবার জন্যে রোজ পোয়াটাক ক'রে আমায় অতিরিক্ত রাবড়ি খেতে হয়। আমার টাকা কম হ'লে ব্যাটা ম্যানেজার আমায় এই কৃচ্ছ্রসাধন-ঘরে পুরে দিয়েছে। তবে মাঝে মাঝে তোমাদের মত দু-একটা লোককে পুরে দেয় এই যা রক্ষে—দু-এক পয়সা যা পাই, তাতে বাজে খরচগুলো চ'লে যায়। নাও, খেয়ে শুয়ে পড়। ঘুম না হয় 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' জপ করতে থাক, ঘুম আসবে। যাক, অনেক বকেছি, কাল আবার এর জন্যে বোধ হয় আধসেরটাক রাবড়ি যাবে।

চিদ্‌ঘনানন্দ শুইয়া পড়িলেন, অক্ষয়বাবু "উঃ-আঃ" করিতে করিতে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। ক্রমশ ভোর হইয়া আসিল। বেলা নয়টার ঘণ্টা বাজিল, দরজা খুলিয়া গোবর্দ্ধন ডাকিতে আসিল। বাহিরে হাস্যমুখে ম্যানেজার দাঁড়াইয়া আছে

গোবর্দ্ধন। বাবু, বেরিয়ে আসুন, ভোর হয়েছে।

অক্ষয়বাবুকে দেখিয়াই ম্যানেজার বলিল

ম্যানে। কি রকম সার্? কোন কষ্ট হয় নি? আপনি যা চেয়েছেন, পাচ্ছেন কি না?

অক্ষয়। পেয়েছি খুব বড় জিনিসই মশাই, কিন্তু আপনি তক্তাপোশে যা জমিয়ে রেখেছেন, ওঃ! একজিমা না হ'লে বাঁচি।

ম্যানে। হেঃ-হেঃ-হেঃ, ছারপোকার কথা বলছেন? আচ্ছা, ও বেচারারা যায় কোথায় বলুন তো? আপনাদের পাঁচজনের খেয়েই তো ওদের থাকতে হবে। তা ছাড়া মেরে ফেলতুম, কিন্তু ধর্ম্মের স্থানে হত্যা-কাজটা খারাপ হয়। উপরন্তু কীট-পতঙ্গ-দুঃখ-নিবারণী সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ কানকাটারাম মিচির মশাই এর জন্যে প্রতি মাসে আমাদের মোটা রকম চাঁদা দিচ্ছেন। আমরা কি তা হ'লে করতে পারি বলুন?

অক্ষয়। যাক, সেসব হিসেবে আমার দরকার নেই। আমায় আপনি একটু ভাল দেখে ঘর দিন।

ম্যানে। নিশ্চয় দোব। আপনি ধর্ম্মচর্চ্চার জন্যে একটু ভাল দেখে ঘর চেয়েছিলেন, তাই আমি ঐটির ব্যবস্থা করেছিলুম। কোথায় যেতে চান বলুন? কেরানী-মহল—আর্টিস্ট-মহল—সাহিত্য-মহল সবই তো রয়েছে।

অক্ষয়। আমায় সাহিত্য-মহলেই দিন।

ম্যানে। ভেরি গুড। গোবর্দ্ধন, ৪৮ নম্বর সাহিত্য-মহলে বাবুকে ঠেল।

গোব। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

ম্যানে। যান আপাতত কলে। গোবর্দ্ধন, অক্ষয়বাবুর কলঘর।

গোব। [নেপথ্য থেকে] কলঘরে যে লোক রয়েছেন।

ম্যানেজার চটিয়া বলিয়া উঠিল

ম্যানে। লোক রয়েছেন মানে? ৪ নম্বর কলঘর অক্ষয়বাবুর জন্যে রিজার্ভ করা, সেখানে আবার কে ঢুকল?

গোব। আজ্ঞে, পাকড়াশিবাবু।

ম্যানে। তুই আলসে দিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে যে অবস্থায় বাবু আছে সেই অবস্থায় ধ'রে বার ক'রে দে।

গোব। যে আজ্ঞে।

অক্ষয়বাবু সঙ্কোচের সহিত বলিলেন

অক্ষয়। না না, থাক, আমি না হয় একটু পরে—

ম্যানে। তবে থাক। ততক্ষণ কেনেস্তারা বাজিয়ে ওয়ার্নিং দে, তা হ'লে আপনি বেরিয়ে আসবে। চলুন ততক্ষণ আমার ঘরে, একটু চা-টা খাবেন, তারপর আপনাকে আমি সাহিত্য-মহলে নিয়ে যাব।

অক্ষয়। চলুন।

ম্যানেজার অক্ষয়বাবুকে লইয়া চলিয়া গেল

সাহিত্য-মহল

চার-পাঁচজন সাহিত্যিক বসিয়া আছে—অধিকাংশ তরুণ ও ললিত-লবঙ্গ-লতা ভাব। কেহ বই পড়িতেছে, কেহ লিখিতেছে, কেহ ফাউন্টেনপেনের ডগা নাকে ঠেকাইয়া ভাবিতেছে, একজন ঈজি-চেয়ারে শুইয়া আছে। একখানি চেয়ার খালি পড়িয়া আছে। ম্যানেজার অক্ষয়বাবুকে লইয়া ঘরে ঢুকিল

ম্যানে। মশাই, এঁরই কথা আপনাদের বলছিলুম। অক্ষয়বাবু—বড় ভাল লোক, আপনাদের ভয়ানক ভক্ত, আপনাদের ঘরেই থাকবেন, আলাপ-পরিচয় ক'রে নেবেন। আমি একটু শুধু এঁদের পরিচয় দিয়ে যাই, এঁর নাম বিশুষ্ক বক্সী, ইনি কেতন নন্দী, ফুলু চাটুজ্জে, চপলা ঘোষ, মদন মিত্তির—এঁরা সব একালের দিগ্বিজয়ী সাহিত্যিক; মস্ত বড় বড় পণ্ডিত, বাংলা দেশের অর্দ্ধেক কলেজের অধ্যাপক এঁরা কলেজ বন্ধ হওয়াতে সব এইখানেই এসেছেন, নিন, সব আলাপ-সালাপ করুন, আমি চলি। শেকল দিয়ে যাচ্ছি তা হ'লে।

ম্যানেজার ঘরে শিকল দিয়া চলিয়া গেল। অক্ষয়বাবুর নমস্কার ও সাহিত্যিকদের প্রতি-নমস্কার শেষ হইল। বিশুষ্ক বক্সী দুই হাত প্রসারিত করিয়া অক্ষয়বাবুকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইল

বিশুষ্ক। এস হে অতিথি মোদের গৃহেতে
তোমারে বরণ করি। নেবুলার মত
জ্যোতিষ্কপথে ঘুরিতে ঘুরিতে তুমি,
বোমার মতই ব্যোমপথ বেয়ে, বোঁ বোঁ ক'রে পাক খেয়ে,
হঠাৎ যখন এসেছ মোদের ঘরে,
চুম্বনে তবে রাঙা ক'রে দেব গাল!

অক্ষয়বাবুকে বিশুদ্ধ জড়াইয়া ধরিল। অক্ষয়বাবু চটিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া কহিলেন

অক্ষয়। আরে মশাই, ছাড়ুন। ও কি?

বিশুদ্ধ। রাগ করছেন সার্! আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকদের রীতি সম্ভাষণ করার যা, তা পাবেন না খুঁজে কোথাও। কাননে কান্তারে বস্তিতে, বেণুবনে, ম্যালেরিয়াবিধ্বস্ত কচুরি-পানার ঝাড়ে, ব্রতচারী নৃত্যে, বসন্তের বিকশিত বিকচ পুলিনে।

চপলা। আগন্তুক—আনন্দ—চেয়ার—বসা।

অক্ষয়। আপনারা কি বলছেন, এর তো মানে বুঝতে পারছি না!

বিশু। পারবেন তবু আমাদের বুঝতে মানে, কিন্তু পারবেন না ওঁর, ভাব বিরাট প্রচ্ছন্ন, সাহিত্যের অনাগত যুগের স্টাইল আমদানি করছেন উনি।

অক্ষয়। উনি টেলিগ্রাফিক ভাষায় কথা কন নাকি?

বিশু। মাথা আপনার। বুদ্ধি থাকলে বুঝতেন, উনি আপনাকে দেখে, প্রকাশ ক'রে আনন্দ, বসতে বললেন চেয়ারে আপনাকে। বসুন।

অক্ষয়বাবু হতভম্বের মত বসিলেন

অক্ষয়। কিন্তু এ রকম কথাবার্ত্তা বেশিক্ষণ চালালে আমি তো পেরে উঠব না সার্, যদি কিছু বুঝতেই না পারলুম—

মদন। অধিশ্রয়ণের তরে অভাগা অর্জ্জিনী
এনে দিতে পারে উপস্কর, কিন্তু যদি অশনায়া
না থাকে কাহারও, ব্যর্থ হয় সব আয়োজন।
ভাষার পাকাল্যা ব্যর্থ, বাঙ্গালা সাহিত্য
যদি তাহা পড়া হয়, অনড়ান বর্ব্বরের পাশে।

অক্ষয়। বাপ, এ যে সব গুলিয়ে গেল! এসবের মানে কি?

ফুলু। মানেই বুঝবেন যদি, তা হ'লে এসেছেন কেন সাহিত্যিক-ঘরের আধুনিক দরজায়? যান না কেন ফিরে বঙ্কিমের সীতার বনবাসে, বিদ্যাসাগরের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের মন-ভোলানো ভেদ-ভেদে মধ্যে কবিতার।

অক্ষয়। কি সর্ব্বনাশ, আপনারা সাহিত্যিক হয়ে সাহিত্যের যা পরিচয় দিচ্ছেন, এতে তো তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি মশাই! তার ওপর এ কি কথাবার্ত্তা বলছেন, তাও তো বুঝছি না!

কেতন। বুঝবেন কি ক'রে, পড়েন অতি-আধুনিকতম সাহিত্যিকদের লেখা?

অক্ষয়। পড়তুম, মানে না বুঝতে পেরে ছেড়ে দিয়েছি।

বিশু। না পারবেন বুঝতে জীবনে আমাদের লেখা, না যদি থাকে মনে দরদ, না সহানুভূতি থাকে যদি সবুজের কচি ডাঁটাগুলির ওপর।

অক্ষয়। সহানুভূতি করি কি ক'রে, যদি বুঝতেই না পারি? আপনারা ভাষার আইনটা মানুন।

কেতন। আমরা মানি না কোন আইন ব্যাকরণের, মানি না ভাষার, আমাদের গোমুখী থেকে নিঃসৃত হয় যে ভাষা, সেই ভাষা তৈরি করে তার আইন, নিজের পথ চলার জন্যে কেটে কেটে।

অক্ষয়। মশাই; আমাদের কথা ছেড়ে দিন, আপনাদের নিজেদের কথাও তো নিজেরা বুঝবেন?

চপলা। বুঝতে হয় না—জগৎ—কাজ দেওয়া—হাততালি সবাই—আনন্দ।

অক্ষয়। ওঃ, অসহ্য! মশাই, এসবের অর্থ কি?

চপলা। অর্থ—ব্যাঙ্ক—ফাঁক—সাহিত্য।

অক্ষয়। মশাই, আজকাল বাজারে এও চলছে? কেউ কিছু বোঝে?

বিশু। বোঝবার তো দরকার নেই। বুঝতে পারছে না যত, ক্ষেপছে আনন্দে তত। বঙ্কিম শরৎ রবির যুগ উঠেছি কাটিয়ে আমরা।

অক্ষয়। রবিবাবুর যুগও শেষ হয়ে গেছে?

বিশু। রবিবাবুর যাবার আগেই। তাই তো সরালুম তাঁকে আমরা।

অক্ষয়। আপনারা সরালেন মানে?

বিশু। মানে অসুখটা উপলক্ষ্য, সরলেন তিনি ভয়ে লাঞ্ছনার আমাদের। করলে কি ইচ্ছে, বেঁচে বেঁচে এদ্দিন, আর কটা দিন থেকে গিয়ে, খবরটা নিয়ে যুদ্ধুর, পারতেন না যেতে মারা? আমাদের ভয়ে চ'লে গেলেন থেকে জগৎ।

অক্ষয়। মশাই, আমাকে বাঁচান। এই ভাবে যদি কথা কন, মাথা ধ'রে

উঠবে আর মিনিট খানেক পরে। আমি আপনাদের শরণাগত হচ্ছি।

ফুলু। বললেন কথাটা আপনি মত যেন নিশীথা চ্যাটার্জীর।

অক্ষয়। সে আবার কে ?

কেতন। কে সে ? সে এই তরুণদলের প্রেয়সী বিশ্বের। দুবেলা ভাত নিয়ে হাঁটত প.থে, আমরা তাকে—

অক্ষয়। আপনারা বুঝি চাঁদা ক'রে এখন তাঁর ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন ? তা হ'লে বাকি আর কিছু নেই ? তিনি আবার এখানে আসবেন নাকি ?

ফুলু। আসবেন, পাবেন দেখতে তাঁকে, কিন্তু সাধনা করতে হবে তাঁকে পেতে হ'লে !

অক্ষয়। গলায় দড়ি আমার—

ফুলু। যে সে মেয়ে তিনি নন। মদন—

মদন। সুন্দরী এপোলোপিকার মত বৈভীষণিক তাঁর লালসা।

কেতন। প্যারীর সেরা রাঁদেভূঁর মাখনের চেয়ে নরম তাঁর গাল।

ফুলু। কিন্তু ডিউসেল্‌ডরফের ইস্পাতের কাঠিন্যতার চেয়ে কঠিনতম তাঁর মন। তাঁকে গলাতে যথেষ্ট চাই উত্তাপ হৃদয়ের।

অক্ষয়। মশাইরা কি সবাই ক্ষেপে গেছেন ? আমি তো মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।

মদন। আপনার মত ঠিক এই রকম ব'লে উঠেছিল বেল্‌জিয়মের কবি ভেরহিরেনকে তাঁর ফরাসী গুপ্তপ্রণয়িনী ম্যানাজুলা। উত্তরে তার বলেছিলেন তিনি "Verbum sat sapienti"।

অক্ষয়। মানে ?

মদন। মানে, যথেষ্ট একটা কথাই জ্ঞানী লোকের পক্ষে।

অক্ষয়। কিন্তু আমার যে এদিকে জ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হচ্ছে মশাই।

মদন। ল্যাটিনে একটা আছে প্রবাদ "Sic transit gloria mundi" পৃথিবীর যায় গৌরব নষ্ট হয়ে এই ভাবেই।

অক্ষয়। মশাই, এর চেয়ে পুস্তুতে কথা বললে বুঝতে পারতুম। এ কি বাংলা? এ যে একেবারে অবোধ্য!

বিশু। বোঝবার কিছু নেই। তাই আমরা সবুজের দল অবুঝের রাস্তা ধরেছি। আমরা একটা কেলেঙ্কারি ক'রে তবে যাব। আমরা হলুম সাহিত্যের ফ্যাসিস্ট, নবভাষা, নবসাহিত্যের সৃষ্টি করতে আমরা মাতৃগর্ভে এসেছিলাম।

অক্ষয়। আমায় তা হ'লে ছেড়ে দিন দয়া ক'রে, আমার বয়েস হয়ে গেছে আপনাদের সঙ্গে বোধ হয় খাপ খাব না।

বিশু। কে বললে খাবেন না খাপ? বয়সের সঙ্গে আছে কি যোগ মনের? তা হ'লে থাকত না অস্তিত্ব আমাদের কারুর। আমার বয়েস একুশ, আমার প্রণয়িনীর বয়েস সাঁইত্রিশ, বয়েসের জন্য কই কিছুই তো আটকাচ্ছে না, এসব ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

অক্ষয়। ছিঃ ছিঃ, মেয়েটার'ও একটু হায়া হ'ল না আপনার সঙ্গে মিশতে!

বিশু। সে যে মোর হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে গড়া—
ঈথরের বিশৃঙ্খ প্রতিমা!
এ দেহের ঘর্ম্ম নিয়ে নর্ম্মসখী মোর—
চর্ম্ম ফেটে ফুটে ওঠ ফোড়ার মতন।
সাংঘাতিকা, সর্ব্বনাশী আরাধ্যা আমার।
এস সখি অন্ধক রাতেতে,
এস মোর নিদ্রাহীন নিমেষ-পাতেতে,
দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা হয়ে—
বিবসনা শশার মতন লবণাক্ত অশ্রু মেখে
আমার লোলুপ ওষ্ঠ 'পরে।

মদন। এক্সেলেণ্ট!

অক্ষয়। সাংঘাতিক!

চপলা। কচ্‌কচ—ছিটকিনি—খাওয়া—নিশ্বেস বন্ধ—স্যাঁতসেঁতে—পাণ্ডুর—অল-ক্লিয়ার!

অক্ষয়। রাম রাম রাম, এ কোথায় এলুম!

বিশু। মশাই, আপনি রামনাম করেন? বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান এখান থেকে। যারা ওসব নাম করে তাদের ঘর ধর্ম্মমহলে, একতলায়, নীচে। যান শিগগির।

দরজায় ধাক্কা দিল

গোব। কে বেরুবেন?

অক্ষয়। আমি অক্ষয়।

গোব। চট ক'রে চ'লে আসুন বাবু, এর পর আজ রাত্তিরে আর এ ঘর খোলা হবে না।

দরজা খুলিতেই অক্ষয়বাবুর দৌড়াইয়া বাহিরে প্রস্থান

বাহির

অক্ষয়। বাপ, এ কি কাণ্ড! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এ কোথায় এলুম? চ'লে যাব? তাই বা যাই কি ক'রে? অতগুলো টাকা আগাম নিয়েছে, এ তো মহা মুশকিলে পড়লুম দেখছি। এই যে ম্যানেজার মশাই, ওঃ, খুব জায়গায় দিয়েছিলেন মশাই!

ম্যানে। কেন?

অক্ষয়। ওঃ, আর কিছুক্ষণ থাকলে শেষে একটা খারাপ ব্যায়রাম ধরত।

ম্যানে। বনল না বুঝি? আমি জানতুম, ও আপনার সঙ্গে ওঁদের ঠিক খাপ খাবে না, ওঁরা একটু হাই-ক্লাসের; তবে আপনি বললেন, তাই তো ও মহলে আপনার জায়গা ক'রে দিলুম। ব্যস্ত হবেন না, পাঁচ জায়গায় ঘুরিয়ে আপনাকে আমি ঠিক সেট ক'রে দিচ্ছি, দেখুন না।

অক্ষয়। না মশাই, এখন আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে—আমায় একটু খোলা জায়গায় দিন।

ম্যানে। [ভাবিয়া] খোলা জায়গা, খোলা জায়গা, হ্যাঁ, তেতলায় যাবেন—প্রীতিমহলে? বোধ হয় জায়গাটা আপনার স্যুট করবে। আপনি কি আন্ম্যারেড—অবিবাহিত?

অক্ষয়। হ্যাঁ।

ম্যানে। ওঃ। তা হ'লে আর দেখতে হবে না, ঠিক জায়গায় পাঠাচ্ছি; চাঁদের আলো, দখিন হাওয়া প্রাণ ভ'রে খেয়ে বাঁচবেন।

অক্ষয়। কোন অসুবিধে নেই তো?

ম্যানে। বিন্দুমাত্র নয়। গোবর্দ্ধন!

গোব। [নেপথ্যে] আজ্ঞে।

ম্যানে। তেতলা ৪৯ নম্বর ঘর। খালি আছে তো?

গোব। আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই খালি, শুধু বিরূপাক্ষবাবু একটা চৌকিতে আছেন।

ম্যানে। যান মশাই, তেতলায়, একদম ফাঁকা। বিরূপাক্ষবাবু অতি সজ্জন লোক, উপরি উপরি তিনটি স্ত্রী মারা গেছেন, বেশ চুপচাপ থাকেন, আপনার সঙ্গে বনবে ভাল।

অক্ষয়। তাই যাই।

গোবর্দ্ধন আসিয়া দাঁড়াইতে অক্ষয়বাবু তাহার সহিত চলিয়া গেলেন

প্রীতিমহল

একটি তক্তাপোশে বিরূপাক্ষ দত্ত বসিয়া আছেন, বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, গোঁফদাড়ি কামানো, বাংলা পাঁচের মত মুখখানি, মাথায় টাক, অতি ভালমানুষের মত চেহারা, কিন্তু চাহনি দেখিলে হাসি পায়। অক্ষয়বাবু ঘরে ঢুকিয়া একটি চৌকিতে বসিলেন

বিরূ। মশয় কি নবাগত? আজ আইছেন?

অক্ষয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, এখানে আর কেউ আছেন নাকি?

বিরূ। আছিলেন, ছয়জন হাসপাতালে গেছেন, তিনজন আলিপুর জেলে, আর আমি মশয়, বর একলা পইরা গেছি। আপনি আইলেন, তবু একটা সঙ্গী পাওন গেল।

অক্ষয়। সে কি মশাই? এখানে এলে এই রকম বিপদ ঘটে নাকি?

বিরূ। সেটা নির্বর করে আপনগোর নিজের উপর। চান্দের আলো হাওয়া বাতাস সইহ্য করা বর কঠিন মশয়, এই গরম দেশে। ফুরফুর করল, অমনি দেহে যেন যৈবনের জোয়ার আসল। বলেন, কথাড়া সইত্য কি না?

অক্ষয়। কি জানি মশাই, ওসব বুঝিটুঝি না।

বিরূ। আপনি কি বিপত্নীক ?

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি বিয়েই করি নি।

বিরূ। তবে তো মরছেন।

অক্ষয়। মরছি মানে ?

বিরূ। এহানে দুদিন থাকেন, প্রাণ-হিরিহিরাইয়া উঠব। যদি ভাবটারে ছাপ্রেস করেন থাইসিস অইব, নয় একডা এমন কিছু করবেন যে শহরে আর মুখ দেখান যাইব না।

অক্ষয়। আপনি এসব কি বলছেন, আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।

বিরূ। বোঝবেন, বোঝবেন, দুই তিনটা দিন যাইতে দেন, বোঝবেন। মশয়, জীবনটারে আপনি একেবারে মাটি করছেন। জগতে এ জিনিস যে কি তা বোঝলেন না! বর দুঃখ লাগ্‌ছে আপনার লইগ্যা।

অক্ষয়। বুঝে তো থাইসিস হবে আর জেলে যেতে হবে।

বিরূ। মশয়, তাতেও আনন্দ। আমাদের বাঙ্গালীর পেটে ভাত নাই, কিন্তু বুকে প্রেম আছে। বোমা পরুক আর যাই হোক, প্রেমের হাতে ছারান নাই। এই দেখেন, পরশু দিন একটা ছবি দেইখ্যা আসছি, আইজো তার নায়িকারে শয়নে স্বপনে ভোল্বার পারছি না। একবার যদি তারে কোনমতে পাইতাম, তা অইলে বোমার সামনে বুক চিতাইয়া মরতে ডরাইতাম না। দেখেন, তার কথা স্মরণ কইরা চোখে জল আসতেছে। সে যদি একবারও এই ব্যথাটা জানবার পারত।

কাঁদিয়া ফেলিলেন

অক্ষয়। এ কি মশাই, কাঁদছেন কেন ? তা, তাঁকে গিয়ে দেখা ক'রে একবার ব'লে দেখতে পারতেন। হয়তো—

বিরূ। আর মশয়, সে দুঃখের কথা না কওনই ভাল। গিয়েছিলাম, কুকুর লেল্রাইয়া দিল। ওরা ছায়ার লগে প্রেম করতে চায়,

রক্ত-মাংসের শরীর যাগো, তাগো আর ওদের পাওনের আশা নাই। আমি তো আর সইহ্য করতে পারি না মশয়।

কাঁদ-কাঁদ হইলেন।

অক্ষয়। তা আমি আর কি করতে পারি বলুন ?

বিরূ। আপনার কেউ নাই ?

অক্ষয়। [চটিয়া] তার মানে ?

বিরূ। আহা, কথাডা খারাপভাবে ধরবেন না। মানে, যদি কেউ ফ্যামিলিতে বিয়া দিবার মত থাকে, তা হ'লে আমি একবার চেষ্টা কইর‍্যা দেখতাম।

অক্ষয়। [আরও চটিয়া] আজ্ঞে না, আমি চলি। [উঠিলেন]

বিরূ। দারান দারান, রাগ করছেন ? মরার উপর খারার ঘা দিয়া কোন লাভ নাই। আমারও তো থাইসিস অইব। দুঃখের কথা কি বলি মশয়, পাশের বারি একটি বর সুন্দরী মাইয়া আছে। কতবার যে শিস দিয়া ডাকছি, তবু সারা দেয় না। পাচিলের ফাক দিয়া একবার উকি মাইরা দেইখ্যা আসেন, আপনি আর নিজেরে সামলাইতে পারবেন না, হয়তো লাফ দিয়া খুনখারাপি হইবেন। একটা চিঠি লিইখ্যা রাখছি, জুতমত দিবার তাল পাইতেছি না।

অক্ষয়। আপনি দেখছি অতি ইতর লোক !

বিরূ। ইতর সব হালাই, আমি শুধু মুখে কইয়া ফেলাই। [সহসা পাশের বাড়ির ছাতের দিকে চাহিয়া] মশয়, অয় ছাদে ওঠছে, তাকান-তাকান। দেই চিঠিটা এই ফাকে ছুরে।

একটি কাগজ পাকাইয়া ছুঁড়িলেন

অক্ষয়। আপনি তো মশাই সাংঘাতিক লোক ! ছি ছি ছি, পট ক'রে পাশের বাড়িতে একটা কাগজ ছুঁড়ে মেয়েটিকে মেরে দিলেন ?

বিরূ। আরে মশয়, ও কাগজ নয়, ও আমার হৃদ্‌পিণ্ডের তাল পাকাইয়া মারছি—ও পরলে বোঝবে।

ক্ষেমঙ্করী। [পাশের বাড়ির ছাদ হইতে] কে রে, কে রে পোড়ারমুখো, কাগজের গুলি পাকিয়ে আমায় মারলি ? খেংরে বিয়ং ঝেড়ে দোব

না! এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয় না হতচ্ছাড়, দেখি মুরদ! ভেবেছিস এটা মগের রাজত্ব! যা খুশি করবি! মেরে গাল তুবড়ে দোব না! বেরিয়ে আয় না, সাহস যদি থাকে! না হ'লে আলসে ডিঙিয়ে আমি যাব বলছি—হঁ্যা।

অক্ষয়। ছি ছি, কি করলেন বলুন তো? আমি এখন ছাদ দিয়ে নীচেই বা নাবি কি ক'রে?

বিরু। মশয়, সইত্যই যে আইলসা পার হইয়া আইতে আছে। কারে মারতে গিয়া কারে মারলাম মশয়, আমি চলি।

দৌড়াইবার উপক্রম

অক্ষয়। আরে মশাই, আমি কি করি?

বিরু। পিছু পিছু দৌরাইয়া আসেন।

দৌড়াইয়া ছাদের দরজায় শিকল দিয়া প্রস্থান। অক্ষয়বাবু দরজায় বৃথা ধাক্কা মারিতে লাগিলেন

অক্ষয়। 'ও মশাই, কি সর্ব্বনাশ, ছাতে শেকল দিয়ে গেলেন কেন? ও মশাই—

ক্ষেমঙ্করীর ঝাঁটা হস্তে প্রবেশ

ক্ষেম। এই যে পোড়ারমুখো, তুই বুঝি পালাতে পারিস নি? আমার হাতে বাঁচবি? এই নে, এই নে।

খ্যাংরা প্রহার; অক্ষয়বাবু লাফাইতে লাগিলেন

অক্ষয়। ওরে বাপ রে! গেছি রে!

ক্ষেম। রোজ রোজ দিদিমণি তাই আমায় বলে—মেস-বাড়ির ছোঁড়াগুলোর জ্বালায় ছাতে ওঠবার জো নেই। কেন, তা আমি এখন বুঝছি। হ্যাঁরে, তোদের ঘরে কি মা-বোন নেই? গেরস্থর মেয়েছেলের সঙ্গে কি ভাবে ব্যাভার করতে হয় জানিস না?

খ্যাংরা প্রহার

অক্ষয়। উঃ, গিছি, গিছি, দোহাই, দোহাই, মা লক্ষ্মী, আমি তোমার সন্তানের মত, এই নাকে কানে খত, আজই মেস ছাড়ছি, আর জীবনে এখানে আমায় দেখতে পাবে না।

ক্ষেম। সত্যি বলছিস?

অক্ষয়। গুরুর দিব্যি। বাবা ঘনতুর্ব্বানন্দের নামে বলছি, আর আমায় কখনও এ বাড়িতে দেখতে পাবে না।

ক্ষেম। মনে থাকে যেন—হ্যাঁ।

অক্ষয়বাবু দরজা ভাঙিয়া দৌড়াইলেন

পথ

চিদ্। কে যায়? অক্ষয় না? তুমিও পথে বেরিয়ে পড়েছ তা হ'লে?

অক্ষয়। [হাঁপাইতে হাঁপাইতে] হ্যাঁ।

চিদ্। হাঁপাচ্ছ কেন?

অক্ষয়। ওঃ, যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে! ওঃ, ৪৯ নম্বরের মেসই বটে! বাব্বাঃ! এতগুলো বদমায়েস একসঙ্গে জুটেছে—এ আমার জ্ঞানে ছিল না গুরুদেব। শেষ পর্য্যন্ত পাশের বাড়ির এক ঝিয়ের হাতে ঝাঁটা খেতে হ'ল!

চিদ্। এমনই ক'রেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয় বৎস।

অক্ষয়। কিন্তু আপনি বেরিয়ে এলেন কেন গুরুদেব?

চিদ্। সজ্ঞানে মরবার ইচ্ছে ছিল না ব'লে।

অক্ষয়। সে কি?

চিদ্। বিস্ময়ের কিছু নেই বাবাজী। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে অনেক সহ্য করেছিলুম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর পারলুম না।

অক্ষয়। আরও ছারপোকা বাড়ল বোধ হয়?

চিদ্। হুঁ, ছারপোকা তো তুচ্ছ এর কাছে, তোমাদের ম্যানেজারও কিছু নয়, আমায় এরা এতদিন কিছুই করতে পারে নি, আমায় তাড়ালে সেই ব্যাটা প্রাণায়াম।

অক্ষয়। প্রাণায়াম!

চিদ্। হ্যাঁ, ব্যাটা ইদানীং রাত তিনটে থেকে "অসার খলু সংসারে কর ব্রহ্মনাম সার ব'লে পেট থেকে এমন বিটকেল আওয়াজ বার করতে লাগল যে, আমি আর সহ্য করতে পারলুম না। তৃতীয় দিন আমি হাতজোড় ক'রে বললুম, রাতটা কাটতে দিন স্যর্; ব্যাটা বলে, ব্রহ্মনাদ প্র্যাক্‌টিস করছি, ডিস্‌টার্ব করবেন না। ঠাঁয় কম্বল গুটিয়ে জেগে ব'সে রইলুম। ভোর নাগাদ হঠাৎ ব্যাটা একটা গমক

মারলে, তার ঠেলায় ছাদ না ফেটে দরজার ছিটকিনিটা খুলে বেরিয়ে গেল। আমিও সেই তক্কে স'রে পড়লুম।

অক্ষয়। কি সর্ব্বনাশ!

চিদ্। আপসোসের কিছু নেই, সংসারে থাকলে এসব আপদ আসবেই বাবাজী। তুমি এখন কি করবে ভাবছ?

অক্ষয়। যে কোন একটা ভাল জায়গায় চ'লে যাব ভাবছি।

চিদ্। রোজগার?

অক্ষয়। কিছু ব্যাঙ্কে টাকা আছে, তাতেই চ'লে যাবে।

চিদ্। খুব সৎবুদ্ধি করেছ বল! আমারও তাই মত, তোমার সঙ্গে থাকলে আমারও চ'লে যাবে এক রকম ক'রে। এখানে দেখলে তো, ধর্ম্মেতে ফাঁকি, সাহিত্যে ফাঁকি, পলিটিক্সে ফাঁকি, প্রেমেতে ফাঁকি; ব্যবহারে ফাঁকি, প্রাণায়ামে ফাঁকি, অতএব এ ফাঁকির রাজ্য ছেড়ে ফাঁকা রাস্তায় বেরিয়ে পড়াই ভাল। এদেশে যাবার কোথাও নেই, সারা দেশই আজ মেস নম্বর ফরটিনাইন।

অক্ষয়। তা হ'লে কি এদেশের আর উদ্ধারের আশা নেই বলছেন?

চিদ্। আছে, তবে ঠেঙানি না খেলে জ্ঞান হবে না। আজ তুমি মার খেয়ে তবে ঐ মেস থেকে বেরিয়েছ। মার খেয়ে তবে তোমার চৈতন্য হয়েছে যে, কি সাংঘাতিক জায়গায় এতদিন তুমি ঢুকে বসেছিলে; তেমনই ঐ জিনিসটা যদি দেশের লোককে আরও দিতে পারা যায়, তবে জায়গাটা ভদ্রলোকের মত হবে। আপাতত কিছু আছে?

অক্ষয়। আজ্ঞে, বেশি নয়।

চিদ্। কত?

অক্ষয়। আনা ছয়েক।

চিদ্। যথেষ্ট। বেশ, সব সমেত আধসেরটাক রাবড়ি কিনে নিয়ে এস ততক্ষণ, তারপর তোমার দীক্ষার আয়োজন করব।

চিদ্বনানন্দ বসিলেন, অক্ষয়বাবু তাঁহার মুখখানাকে একবার গোবেচারার মত দেখিয়া ধীরে ধীরে দোকানের দিকে অগ্রসর হইলেন

—যবনিকা—

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

চিত্র

১

চ'লে গেল ম্লান হেসে ?
শব্দ হ'ল দ্বারদেশে,
খুলে দেখি এসেছে সে।

২

সরু গলি পচা নালা ঠিক তার পাশে
কিশোর অশথচারা পরম আশ্বাসে…
হর্ন দিয়ে মোটর কি আসে ?

৩

নীলাকাশ আছে দিগ্‌দিগন্ত জুড়ি,
হয়তো বা আছে, বলাকা চলেছে উড়ি,
আমার আকাশে উড়িছে আমার ঘুড়ি।

৪

গায়ে ছেঁড়া ময়লা সাজ
মনে ভয় হতাশা লাজ—
হলাম সুখী—দোল যে আজ !

৫

মুচকি হাসি সেলাম করি ঘৃণায় প্রেমে আত্মহারা
লৌহ-কারা !
উঠবে যারা, ফুটবে যারা, ছুটবে যারা, কোথায় তারা ?

৬

আকাশে উঠেছে চাঁদ, বাগানে ফুটেছে ফুল,
লক্ষ লহরী তুলি নদী বহে কুলুকুল…
খুঁজিছ কি ? ভুল ?

খড়ি দিয়ে ছোট খোকা লেখে 'ঔ'টি
রোদে ব'সে বড়ি দেয় রাঙা বৌটি
পুকুরেতে ডোবে ওঠে পানকৌটি ।

আছে হিমালয় তুঙ্গ শির,
আছে সারমেয় ভক্ত বীর,
পাইলট শুধু যুধিষ্ঠির ।

৯

সেই লেখা, সেই নীল খাম ।
সাগ্রহে হাত বাড়ালাম,
মিলিল না, অপরের নাম ।

১০

থেমো না থেমো না, কাছে সরে এস রাণী
করুণ বেহাগে কাঁদুক সেতারখানি
কই ? কোথা তুমি ? শুধুই বেতারবাণী !

১১

ব্যস্ত দিবস, শান্ত রাত্রি,
নীড়ের জননী জীবনদাত্রী
অসীম পন্থা পুরুষ যাত্রী।

১২

চর্ব্বণ করছি কিছু—মনে হচ্ছে খাওয়া,
দু হাত পেতে নিচ্ছি—মনে হচ্ছে পাওয়া,
বইছে একটা কিছু—মনে হচ্ছে হাওয়া।

১৩

অবলুণ্ঠিতা শ্যামলী আলুলায়িত কৃষ্ণকুন্তলভার,
কে তুমি অভিমানিনী ছিন্নভিন্ন করেছ মুক্তাহার,
ইতস্তত-তারা-বিক্ষিপ্ত সুন্দর অন্ধকার।

১৪

সময় নাই ?
সময় চাই।
প্রতীক্ষা তাই।

"বনফুল"

পিতা-পুত্র

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কঙ্কণার গ্রাম্যপথ। মধ্যরাত্রি। কিন্তু গাছের মাথায় প্রচণ্ড আলোর রক্তাভ আভা জ্বালারূপে জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার ছটায় নীচেও অস্পষ্ট রক্তালোক ফুটিয়া উঠিয়াছে। যবনিকা অপসারিত হইবার পূর্ব্বেই মানুষের ভয়ার্ত্ত চীৎকার শোনা যাইবে—"আগুন! আগুন! আগুন!"

কতকগুলি লোক ছুটিয়া চলিয়া যাইবে। কয়েকজন প্রৌঢ় মাতব্বর ধীরগমনে চলিতেছিল। নেপথ্যে চীৎকার হইতেছিল—"জল! জল! জল!"

১ম প্রৌঢ়। কোথায় হে? আগুন কোথায়? অ হেরম্ব!

দ্রুতচলমান হেরম্ব। মহাভারত—মহাভারত—মহাভারতের ঘরে।

প্রস্থান

২য় প্রৌঢ়। মুকুন্দ, ফেরো।

১ম প্রৌঢ়। একবার দেখতে যাবে না?

২য় প্রৌঢ়। না। এস, বাড়ি এস।

১ম। তবে দাঁড়াও। বেতো পায়ে, আগুন শুনে চ'লে এসেছি, কিন্তু যেতে আর পারছি না। একটুকুন দাঁড়াও।

২য়। বব্বরের নাই পেমাদের ভয়; হাজারবার বললাম—মহাভারত, পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয়; পাথরে মাথা ঠুকিস না; বাবুদের সঙ্গে তুই সব মিটিয়ে নে; আগে না হয় ছুটুবাবু ছিল; এখন সেই যখন ফেরার, তখন মিটিয়ে নে; দু-তিন বছরের মধ্যে কি অবস্থা কি হ'ল ভেবে দেখ; পাথরে মাথা ঠুকিস না। বললে কি জান—পাথরে মাথা ঠুকলেও পাথর শক্ত, পেণাম করলেও পাথর শক্ত, পাথর গুঁড়ো করলে তবে সে নরম হয়।—ব'লে হা-হা ক'রে হাসলে, ক্ষ্যাপার মতন।

১ম। লোকটার মাথা চিরকাল খারাপ। নইলে কি অবস্থা কি হ'ল বল দেখি! মুটু মুখুজ্জের পাঠশালা বাড়ি সব পুড়ল চোখের ওপর দেখলে। দেখে আক্কেল হওয়া, দূরের কথা, জেদ ক'রে মাস্টারনী, তার মেয়ে আর মাতাল ভাইটাকে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিলে। তখনই আমি বুঝেছিলাম, বুঝেছ—লাল ঘোড়া ছুটল ব'লে।

অত্যন্ত দ্রুত অরুণের প্রবেশ

অরুণ। Thou art my Father, Oh Lord! Shew Thy mercy! আর্ত্তবিপন্নকে রক্ষা কর প্রভু। কে? কারা তোমরা?

১ম। এই গাঁয়েরই আমরা, খোকাবাবু। যেতে যেতে পায়ে বাত চাগিয়ে উঠল, তাই বসলাম একটুকুন।

অরুণ। মহাভারতের ঘরে আগুন না?

২য়। আজ্ঞে হ্যাঁ গো। ভারী জোর আগুন গো।

অরুণ। বাড়ির লোকজন সব রক্ষা পেয়েছে তো? তোমরা জান? মমতা, কল্যাণী-পিসীমা, এঁরা সব?

১ম। যেতেই পারি নাই আজ্ঞে, বাতের কামড়ে পথেই ব'সে পড়েছি।

অরুণ। রক্ষা কর ভগবান, রক্ষা কর।

দ্রুত প্রস্থান

১ম। মুটু মুখুজ্জের বেটা। ভারী জবর ছেলে হে। এর ছোটজনা, সেও তোমার আচ্ছা ছেলে। দুই বেটাতেই অবিকল বাপ।

২য়। তা হ'লেই কচুপোড়া খেয়েছে, লক্ষ্মী কোনকালে হবে না। এখন বাড়ি চল দিকিনি; আগুন নিবে এল লাগছে, আঁধার হয়ে এল।

১ম। একবার যাবে না? খবরটা একবার নেবে না? পাড়া-প্রতিবেশী নোক—জাত জ্ঞাত। আগুন নিবে এল. এখনও তোমার গোলমাল উঠছে, ব্যাপারটা কি দেখবে না?

২য়। রস না হ'লে বাত হয় না, এ একবারে খাঁটি কথা; বেতো পা নিয়ে রস তো তোমার খুব! যাও তুমি। কাল বাবুদের কানে

উঠবে—মুকুন্দ ঘোষ গিয়েছিল, এই বলেছে, ওই বলেছে, তা বলেছে। আমি চললাম বাড়ি।

প্রস্থান

১ম। যাও তুমি। আমি একবার ঘুরেই আসি। ঘুঁটে পুড়লে গোবরকে হাসতে নাই।

বিপরীত দিকে প্রস্থান

শূন্য রঙ্গমঞ্চে সন্তাপিত দ্রুতপদে প্রবেশ করিল গোপী, আপাদমস্তক ঢাকা, পিছনের দিকে চাহিতে চাহিতে সে চলিয়া গেল

দৃশ্যান্তর

মহাভারতের বাড়ি

বাড়িখানা পুড়িয়া গিয়াছে—চারিপাশে ক্ষুদ্র জনতা

মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত রক্তাক্ত মহাভারত কালী বাগদীর বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। কল্যাণী দাঁড়াইয়া আছে। অরুণ মমতার সংজ্ঞাশূন্য দেহ মাটিতে নামাইল। সুশোভনও এক দিকে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বগলে তাহার বেহালার বাক্স

১ম ব্যক্তি। ছেড়ে দাও মহাভারত, ছেড়ে দাও, ম'রে যাবে। ছেড়ে দাও।

মহা। ছাড়ব, ছাড়ব। যে চিতে বেটা নিজের হাতে জ্বেলেছে, সেই চিতের ওপর দিয়ে ছাড়ব

অরুণ। (কল্যাণীর প্রতি) আপনি মমতাকে দেখুন পিসীমা। (তাড়াতাড়ি মহাভারতের কাছে আসিয়া) মহাভারত, মহাভারত!

মহা। কে? অরুণখুড়ো! হা-হা-হা, খুড়োঠাকুর, বেটা নিজের চিতে নিজের হাতে জ্বেলেছে।

অরুণ। ছেড়ে দাও মহাভারত, ওঠ বুক থেকে।

মহা। উঠব? ছেড়ে দোব?

অরুণ। (আকর্ষণ করিয়া) ওঠ, ওঠ।

মহা। তুমি বলছ?

অরুণ। হ্যাঁ, আমি বলছি, ওঠ।

মহাভারত উঠিল, উঠিয়াও একদৃষ্টে কালীর দিকে চাহিয়া রহিল

মহা। আমি বুঝেছিলাম খুড়োঠাকুর যে, এমনই কিছু হবে। কাল গোপী মিত্তির আমাকে শাসিয়ে লোক পাঠিয়েছিল। আমি জেগেই ছিলাম। আগুন দিয়ে পালাবার আগেই আমি পথ আগলে ছিলাম। বেটা গিয়ে ঢুকে পড়ল গোয়াল-ঘরে। আমি শেকল দিয়ে দিলাম। মরত বেটা পুড়ে। তুমি এসে বাঁচালে। তখনও কি ছুট, আমি না ধরলে বেটা পালিয়েছিল।

অরুণ। (কল্যাণীর প্রতি) মমতা সুস্থ হয়েছে পিসীমা ?

কল্যাণী। হ্যাঁ বাবা। মহাভারতের মাথাটা ধুয়ে বেঁধে দিতে হবে। তুমি ওকে একটু শান্ত কর।

লোকজন একে একে চলিয়া গেল

কালী। (ক্ষীণকণ্ঠে) জল !

অরুণ। পিসীমা, একটু জল।

মহাভারত। (খানিকটা পোড়া খড় লইয়া) নে, খা।

অরুণ। (খড় কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া) ছি মহাভারত !

কল্যাণী। (কালীর মুখে জল দিল) আর খাবে ?

অরুণ। মমতা, ফার্স্ট এডের বাক্সটা দেখ দিকি পাওয়া যায় কি না ? চল, আমিও বরং সঙ্গে যাই।

মহা। ছেলম-খানেক তামাক কেউ দেবে হে ? তামাক খাই একবার।

সুশোভন। (এতক্ষণ বসিয়া সে হাঁপাইতেছিল, এবার উঠিল, পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া) নাও। You are a brave man। (নিজেও একটা সিগারেট মুখে দিল)

নেপথ্যে মমতা। মা, এখানে এস একবার।

কল্যাণীর প্রস্থান

সু। দেশলাইটা ? (পকেট খুঁজিল) এঃ, দেশলাইটা গেছে।

মহা। (হাসিয়া উঠিয়া একখানা পোড়া কাঠ আনিয়া) নাও। (সুশোভনকে ধরাইয়া দিল, নিজেও ধরাইল। তারপর বেহালার বাক্সটা দেখাইয়া প্রশ্ন করিল) ওটা কি গো ছোটদাদাঠাকুর ?

সু। বেহালার বাক্স। বহুকষ্টে বাঁচিয়েছি ওটা।

মহা। কই, বাজনা খানিকটা শোনাও দিকি দাদাঠাকুর।

সু। (বেহালা বাহির করিয়া) খুব একটা করুণ রাগিণী শোনাই শোন।

পকেট হইতে মদের শিশি বাহির করিয়া খানিকটা খাইল, তারপর বেহালা বাজাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মধ্যখানেই মহাভারত উঠিয়া পড়িল

মহা। উঁহু। বেটাকে আগে পুলিসে দিয়ে আসি। (কালীকে ধরিয়া) উঠে আয় বেটা বাগদী।

টানিয়া লইয়া প্রস্থান

সুশোভন বেহালা বাজাইয়া চলিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

কঙ্কণার বাবুদের বাড়ি। বড়বাবুর খাস-কামরা।

বড়বাবু আজ সোজা দাঁড়াইয়া ধীর পদক্ষেপে চিন্তিতমুখে পদচারণা করিতেছেন। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেবনারায়ণ ও গোপী মিত্তির

দেব। কেউ কেউ বলে—সুটু কলকাতায় ওকালতি পড়তে গেছে। আমার তা বিশ্বাস হয় না। এতদিন হয়ে গেল, সে দেশে পর্য্যন্ত আসে নি। আমার মনে হয়, সে চাকরি-টাকরি পেয়েছে। ভরসার মধ্যে ওই—সুটু এখানে নেই।

শিব। সুটুর স্ত্রী আছে। দেবনারাণ, লখিন্দরকে কামড়াবার জন্যে দু পহরে এল দুই মহানাগ। তাদের নিশ্বাসের গর্জ্জনে বেহুলা সতর্ক হ'ল, দুধ দিলে, তারা মাথা নোয়াল; বেহুলার হাতে বন্দী হয়ে তারা ভগবানকে ধন্যবাদ দিলে যে, এমন নিষ্ঠুর কাজ তাদের করতে হ'ল না। তৃতীয় প্রহরে এল এক নাগিনী। বেহুলার একেই ঘুম পাচ্ছিল, তার ওপর নাগিনীর মৃদু মৃদু নিশ্বাসের বিষে সে ঘুমে ঢ'লে পড়ল। নাগিনীর নিজেরও সন্তান ছিল, কিন্তু তবু সে লখিন্দরকে কামড়ালে। মেয়ে-জাতটাকেই তোমরা চেন না,

তার ওপর সুটুর বউয়ের মত মেয়ে। ও বাঘিনী, সাপিনী— একাধারে সব।

গোপী। এবার হুজুর, বিবেচনা করুন, কেস ভারী খারাপ। হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। ঘরে আগুন লাগানো কেস। দায়রার বিচার। তবে বিবেচনা করুন, মামলা সাক্ষীর মুখে। আর বিবেচনা করুন, পৃথিবীটা কার বশ? না, পৃথিবী টাকার বশ। টাকা খরচ ক'রে দশ দিক দেওয়াল দিয়ে গেঁথে দেন, দিন রাত হয়ে যাবে; জ্বেলে দেন বাতি লাখে লাখে, রাত দিন হয়ে যাবে।

শিব। কত টাকা খরচ করলে তুমি কালীকে বাঁচাতে পারবে?

গোপী। আজ্ঞে, তা বিবেচনা করুন, একটা এষ্টিমেটো না ক'রে কি ক'রে বলি বলুন?

শিব। দেবনারাণ, গোপী যত টাকা চাইবে দিতে না-ক'রো না? হিসেব চেও না, কৈফিয়ৎ চেও না। আর গোপী, এ মামলায় যদি কালীকে খালাস করতে পার, তবে তোমার হাতে যতগুলো ধরে মোহর আমি বকশিশ দেব।

গোপী। যে আজ্ঞে হুজুর, আমি তা হ'লে এই বেরুলাম। জয় বামন-দেব! গমনে বামনং চৈব, সর্ব্বকার্য্যেষু মাধব—সু-মাধব! সু-মাধব! আগে একবার থানা ঘুরে আসি হুজুর।

[প্রস্থান ,

দেব। তুমি ভুল করছ বাবা। ঐ রকম খোলা হুকুম দিলে গোপী বাকি রাখবে না কিছু। পুকুর চুরি ক'রে ফেলবে।

শিব। তখন মহাভারত যেমন ক'রে কেলে বাগদীর বুকে চেপে বসেছিল, তেমনই ক'রে চেপে বসবে। এখন আর একটা কথা। অত্যন্ত সাবধানে চলতে হবে এখন। কাউকে মিষ্টি কথা ছাড়া বলবে না; একটি পয়সা কারও কাছে জোর ক'রে আদায় করবে না। যার যার নামে নালিশ চলছে, তাদের ডেকে কিস্তিবন্দী ক'রে মিটিয়ে নাও। কিন্তু ধীরে ধীরে, লোকে যেন বুঝতে না পারে।

দেব। কালী বাগদীর স্ত্রী আবার আজ এসে বলছে—খরচ নেই। এই সেদিন—

শিব। কালী গোপী মিত্তির নয় দেবনারাণ, ওদের কাছে হিসেব চেও না—খরচ দাও।

দেবনারায়ণ প্রস্থানোদ্যত

শিব। আর একটা কথা দেবু। আমীর-উল-উমরা ছোটে নবাবকে কয়েদ করো। তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও।

দেব। আমি আর একটা কথা বলছিলাম বাবা।

শিব। বল।

দেব। রাগ না কর তো বলি।

শিব। (হাসিয়া) আরে হুজুর, ফরমাইয়ে পহেলে। গোঁসা কেঁও করেঙ্গে ?

দেব। আমি বলছিলাম, ন্যুটুর পাঠশালার যে মাস্টারনীটি রয়েছে, তার মেয়েটি বড় চমৎকার। আমি দেখেছি। ওর সঙ্গে ছোটখোকার বিয়ে দিয়ে দাও। মেয়েটি যে রকম ভাল, তাতে ছোটখোকা হয়তো শুধরে যাবে। আর মাস্টারনী, ওর ভাই, মেয়েটিও বোধ হয় মামলায় সাক্ষী হবে—প্রধান সাক্ষী। ওদেরও মুখ বন্ধ হবে।

শিব। পার, চেষ্টা কর। কিন্তু ও মেয়ে ঘোরবার-মেয়ে নয় দেবু। মিছে চেষ্টা করবে। তাকে বাদ দিয়ে বরং ওর মাতাল ভাইটাকে দেখ হাত করতে পার কি না।

গোপী মিত্তিরের ব্যস্তভাবে প্রবেশ

গোপী। হুজুর, ন্যুটু মোক্তার—

শিব। ন্যুটু মোক্তার ?

গোপী। ফিরে এসেছে হুজুর।

শিব। ন্যুটু ফিরে এসেছে ?

গোপী। বিবেচনা করুন, উকিল হয়ে ফিরে এসেছে।

শিবনারায়ণ গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন

এসেই মহাভারতকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল।

উকিলের প্রবেশ

উকিল। জামিন হ'ল না কর্ত্তাবাবু।

শিব। দেবনারাণ!

দেব। বাবা!

শিব। মহেন্দ্র জ্যোতিষীকে ডাক তো। আমার কোষ্ঠীখানা একবার দেখাবার প্রয়োজন হয়েছে। (চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিলেন) একটা কথা গোপী, মুটুর সঙ্গে দেখা হ'লে আমাকে যেমন সম্মান কর, তেমনই সম্মান করবে। দেবনারাণ, তোমাকেও কথাটা বলছি। আমাকে "তুমি তুমি" ব'লে কথা বল, মুটুকে বলবে "আপনি", দেখা হ'লে আগে তুমি নমস্কার করবে।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মুটু মোক্তারের শহরের বাসা

ঘরের মধ্যে নির্গমনপথে আমের শাখা দেওয়া পূর্ণ ঘট। বিমলা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরনে লালপেড়ে শাড়ি, হাতে একটি থালায় আশীর্ব্বাদী ফুল, সে পূজা করাইয়া ফিরিয়াছে। চুল এলো; এলো চুলের উপর অল্প ঘোমটা। উকিলের বেশে গাউন পরিয়া মুটু বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল

মুট। (সবিস্ময়ে) আরে বাপরে! এসব কি?

বিমলা। পূজো দিয়ে এলাম ঠাকুরদের।

মুট। (হাসিয়া) ভাগ্যে তোমরা আছ বিমলা, তাই তো দেবলোক আজও বেঁচে আছেন। নইলে বেচারারা শুকিয়ে ভারতলোকের অধম অবস্থায় উপনীত হতেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। তারপর, কি কামনা করলে?

বিমলা। তোমার জয় কামনা করলাম, আর কোন্ কামনা করব?

মুট। কত টাকা মানত করলে?

বিমলা। মানত করেছি, তবে সে টাকা নয়।

মুট। বল কি?

বিমলা। আজ তোমায় আমি কটু কথা বলব না প্রতিজ্ঞা করেছি। কটু কথা বলছি না, ঠাট্টাও করছি না—সত্যি কথাই বলছি, টাকা

মানত করি নি, টাকা কামনা করি নি—এমন কি লক্ষ্মীর পূজো পর্য্যন্ত করাই নি। এতে লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ নেই।

মুট। (অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া) তবে কি মানত করলে?

বিমলা। বুকের রক্ত। মানত করেছি, বুক চিরে রক্ত দিয়ে পুজো করাব।

মুট। তোমার জয় হোক বিমলা, তোমার জয় হোক।

বিমলা। না, চিরদিন যে পরাজয় মেনেই এসেছে, হঠাৎ তার জয় সহ্য হবে না। (পরমুহূর্ত্তেই হাসিয়া) ওই দেখ, স্বভাব যায় না ম'লে; যা বলব না বললাম, তাই ব'লে ফেললাম। বেশ, আমার জয় হোক; কিন্তু তোমার জয়েই তো আমার জয়।

মুট। দাও, আশীর্ব্বাদ দাও।

মাথা নত করিল

বিমলা। কি মানুষ তুমি! আমায় কি তোমার মাথায় হাত দিতে আছে? অ ঠাকুরঝি—কল্যাণী-ঠাকুরঝি! অ ভাই!

কল্যাণীর প্রবেশ

মুট। এ কি কল্যাণী? এ কি বোন? তোমার এই ময়লা বেশ-ভূষা, জীর্ণ একখানা—

কল্যাণী। কদিন কাপড়-চোপড় ক্ষারে কাচা হয়ে ওঠে নি দাদা।

মুট। কেন? তুমি কাপড়-চোপড়—

বিমলা। দেখ, তুমি কাপড় কাচার নাম ক'রো না বলছি। শুভ কাজে যাচ্ছ। না।

মুট। যারা তোমার সঞ্চয়-করা মালিন্য পরিষ্কার ক'রে তোমার সংসার পরিচ্ছন্ন পবিত্রতায় ভ'রে দেয়, তাদের নাম কখনও অশুভ নয়

বিমলা। তুমি কি কাপড়-চোপড় ধোপা-বাড়ি দাও না কল্যাণী?

কল্যাণী। নিজেই ওগুলো ক'রে নিই দাদা। কেন মিছে—

মুট। না, মিছে নয় বোন। তুমি আমার বোন, এতে যে আমার নিন্দে হবে কল্যাণী।

বিমলা। বেশ তো, মামলা জিতে একখানা কাশীর গরদ এনে দিও ঠাকুরঝিকে। অন্য কিছু না নিক ঠাকুরঝি, গরদ আমি নেওয়াব।

এখন মাথা নামাও। ও ঠাকুরঝি, আশীর্ব্বাদী দাও তো তোমার দাদার মাথায়।

কল্যাণী। ওরে বাপরে! আমি কি দাদার মাথায় হাত দিতে পারি বউদি?

বিমলা। বোনে সব পারে ঠাকুরঝি। ব্রাহ্মণের বোন, পৈতের চেয়েও বড়, পৈতে থাকে গলায়, বোনের ঠাঁই মাথায়।

মুট। (বিমলার দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা নত করিল) দাও কল্যাণী, আশীর্ব্বাদ দাও।

কল্যাণী কুণ্ঠিতভাবেই আশীর্ব্বাদী মাথায় ঠেকাইয়া দিল

বিমলা। ও শ্যামা, ও মমতা! তোরা কি করছিস সব? অরুণ কোথায়?

নেপথ্যে শ্যামা: আসছি মা।

শ্যামা, মমতা ও অরুণের প্রবেশ, অরুণের কপালে চন্দনের ছাপ, পরনে গেঞ্জি ও নূতন কাপড়

বিমলা। অরুণের আজ জন্মদিন। তোমার তো কাল থেকে অবসরই ছিল না। প্রণাম কর অরুণ।

শ্যামা। দাদাকে কি দেবেন বাবা?

অরুণ মুটুকে প্রণাম করিল

মুট। কি দেব? দেব শুধু আশীর্ব্বাদ। জীবনে যেন আদর্শচ্যুতি তোমার না ঘটে। আদর্শের সত্যকেই যেন সকলের চেয়ে বড় করতে পার।

অরুণ মাকে প্রণাম করিল

বিমলা। আমি আশীর্ব্বাদ করি বাবা, সংসারে তুই সুখী হ'স; তোর স্নেহে তোর স্ত্রীপুত্র যেন সুখী হয়।

সুশোভনের একটা মাছ লইয়া প্রবেশ। মাছটা ফেলিয়া দিয়া

সু। মুটুদার শুভযাত্রা অ্যাণ্ড অরুণের বার্থ-ডে ফীস্ট। Both the purposes will be served।

মুট। আজও তুমি মদ খেয়েছ সুশোভন? কোর্টে আজ তোমায় সাক্ষী দিতে হবে!

সু। অল্প একটু হুটুদা, অল্প—মাইরি বলছি। তবে ইউ সী, ভোড্‌কার গন্ধটাই খারাপ।

হুট। এ মাছ তুমি কোথায় পেলে?

সু। সে ভারী মজার কথা হুটুদা। তোমার শত্রু—ওই বাবুদের পুকুরের মাছ, তোমায় জয়যাত্রা দেখাতে নিয়ে এসেছি।

হুট। নিয়ে যাও এ মাছ।

সু। মাইরি বলছি, চুরি করি নি। আমায় দিলে, মাইরি বলছি।

হুট। দিলে? কে দিলে?

সু। বুড়ো বড়বাবু হঠাৎ বেহালা শোনাবার জন্যে ডেকেছিল। The old man is really amusing—a darling! আমায় দুটো টাকা দিলে। ঠিক সেই সময় ওদের মাছ ধ'রে নিয়ে এল; আমি বললাম, টাকা চাই না, আমায় একটা মাছ দিন। He gave me both money and fish।

হুট। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত সুশোভন, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। আরও একটা কথা। তুমি তোমার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। (হাতঘড়ি দেখিয়া)

চলিয়া যাইতে যাইতে মাছটা পায়ে ঠেলিয়া স্থানচ্যুত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল

কল্যাণী মমতা বিবর্ণ হইয়া গেল

সু। এটা কি হ'ল? অ্যাঁ? What is this? চুরি করি নি, ভিক্ষে নিই নি, সে আমায় দিলে। আগে বাদশারা একখানা গান শুনে কত জায়গীর দিয়ে গেছে, এ তো একটা মাছ!

বিমলা বাহিরে গিয়া মাছটা লইয়া আসিল

বিমলা। ওঁর মেজাজই ওই রকম ভাই। কিছু মনে ক'রো না।

কল্যাণী। না বউদি, হুটুদা রাগ করবেন।

বিমলা। ছেলে কি ওঁর একার ঠাকুরঝি? আমার কি কোন অধিকার নেই? এই মাছের মুড়ো দিয়েই অরুণ আজ ভাত খাবে।

সু। That's like you বউদি! মাইরি বলছি বউদি, আমাকে সম্মান ক'রে দিলে। আমিই বরং বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছি। আমায় বললে কি জান? মমতার সঙ্গে ওদের বাড়ির মাতাল

ছেলেটার বিয়ের কথা বললে। আমি বললাম, সে অসম্ভব। আমি নিজে মাতাল, কিন্তু আই হেট দি মাতালস্। তার ওপর আপনাদের ছেলে, আন্‌কাল্‌চার্ড মূর্খ।

সুটুর মুহুরীর প্রবেশ

মুহুরী। সুশোভনবাবু, আপনি শিগগির চলুন। এখুনি হয়তো ডাক পড়বে। আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। আসুন মশায়, সুশোভনবাবু।

সু। (পকেট হইতে শিশি বাহির করিয়া মদ খাইল) ওয়ান মিনিট প্লীজ; একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে নিই। চলুন এইবার।

মুহুরী ও সুশোভনের প্রস্থান

কল্যাণী। এক এক সময় ইচ্ছে করে বউদি—

বিমলা। সে ইচ্ছে কি বউদিদিরই হয় না ভাই? কিন্তু ও ইচ্ছে দমন করতে হয়।

কল্যাণী। ছোড়দার জীবন বেশিদিন নয়, তাই আমি ওকে বলতে পারি না—তুমি যাও।

বিমলা। তা যদি বলতে ঠাকুরঝি, তবে আমি তোমাকে ঘেন্না করতাম। এস ভাই; রান্নার আজ অনেক বাকি, এস, একটু হাত দেবে এস।

বিমলা ও কল্যাণীর প্রস্থান

শ্যামা দাদা, মমতা তোমার জন্যে কি এনেছে দেখ।

অরুণ আগে তোরটা দেখি। তুই কি দিচ্ছিস?

শ্যামা আমি কার্পেটের জুতো তৈরি ক'রে রেখেছি।

অরুণ শ্রীচরণে শু—এস-এইচ-ও-ই!

শ্যামা দাদার জুতোয় হাত দিতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু অন্য কারও বেলা বড় জোর জামা কাপড়টার ভার নিতে পারি। তাই তো মমতা এনেছে নিজের হাতে কাটা সুতোয় তৈরি কাপড়। আর—আর যা এনেছে মমতা, সে শুধু একা তোমার নয়, আমারও ভাগ আছে—গান।

মমতা। না ভাই, গান আমি গাইতে পারব না।
অরুণ। সে হয় না মমতা। গাও—গাও। না গাইলে আমি দুঃখিত হব। "সেই অগ্নিশিখা, জ্বালো—জ্বালো!"

মমতার গান

নেপথ্যে বিমলা। শ্যামা!
শ্যামা। যাই বাবা! আসছি।

প্রস্থান

মমতা। আমার আরও কিছু দেবার আছে।

গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিল

অরুণ। বিজয়িনী হও।
নেপথ্যে সুটু। বিমলা, বিমলা!
অরুণ। (দরজার দিকে অগ্রসর হইল) বাবা!

মমতা বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল

সুটু ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল

সুটু। একখানা বই, আর নোট-করা কয়েকখানা কাগজ—

ব্যস্তভাবে বাড়ির ভিতরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অরুণও গেল। পুনরায় বিমলা ও সুটু প্রবেশ করিল

সুশোভনের এজাহারে কোর্টের মধ্যে লজ্জায় আমার মাথাটা কাটা গেল বিমলা।

বিমলা। ছিঃ, ও কথা তোমার মুখে সাজে না। বড় বড় গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে; কত পাখি আশ্রয় নেয়—আবার সাপও থাকে। তাতে কি গাছের মাথা হেঁট হয়? সে চিরদিন আকাশ-মুখেই বাড়ে। ও কথা ব'লো না। কল্যাণী-ঠাকুরঝি শুনলে কি মনে করবে বল দেখি?

সুটু। কল্যাণী আমার নীলকণ্ঠের বিষ বিমলা, কল্যাণী আমার নীল-কণ্ঠের বিষ।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

আদালত-সন্নিকটবর্ত্তী শহরের চৌমাথা। খবরের কাগজের হকার হাঁকিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে কানে কলম, হাতে কাগজের তাড়া, আদালতের টাউট চলিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে কোর্টের পিওনের হাঁক শোনা যাইতেছে—

কঙ্কণা গাঁয়ের মুকুন্দ ঘোষ—হাজির হো! মুকুন্দ ঘোষ, কঙ্কণা গাঁয়ের মুকুন্দ ঘোষ!

দুইজন টাউট কথা বলিতেছে

১ম। ওরে বাপ রে, বাপ রে! মুটুবাবু আগুন ছুটিয়ে দিলে। বাবুদের সাজানো খোলস পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

২য়। রুদুবাবুও ছাড়ে নাই। ওই যে মাস্টারনীর ভাইকে জেরা ক'রে বেশ একহাত নিয়েছে মুটুবাবুকে। পয়েণ্টোটি ভারী ধরেছিল, বলে—তুমি মুটুবাবুর হবু-বেয়াই!

১ম। তা সে যাই হোক, মাতাল হোক আর ছ্যাচড়ই হোক—আসল মামলায় ওর সাক্ষী খারাপ হয় নাই। মুটুবাবুর সাহস বটে—দু-তিনটে সাক্ষী ছাড়া, সব সাক্ষীকে হস্টাইল ব'লে জেরায় সব ঠিক বার ক'রে নিলে! তুমি দেখো, মুটুবাবু এই মামলাতেই বড় উকিল হয়ে গেল। হিরণপুরের বাবুদের দাঙ্গার মামলা দেবার জন্যে বাবুদের লোক ঘুরছে।

নেপথ্যে কোর্ট-পিওন। হেরম্ব পাল, হেরম্ব পাল, হাজির হো! হেরম্ব পাল!

২য়। ওরে বাবা, এ যে আমার মক্কেল হে! হেরম্ব, ও হেরম্ব!

প্রস্থান

১ম। ও মশায়, ও মশায়, ও হিরণপুরের সরকার মশায়! শুনুন, শুনুন।

গোপী ও দেবনারায়ণের প্রবেশ

দেব। এ যে সব বিপরীত হয়ে গেল গোপী! সাক্ষীদের একটাও টিকল না! এক-একজনকে এক এক মুঠো টাকা, সব বরবাদ গেল! বেইমানি করলে সবাই!

গোপী। আজ্ঞে না, জেরায় টিকল না। বিবেচনা করুন সচক্ষে দেখলেন, জেরায় টিকল না। হুটু মোক্তার হ'ল অনর্থের মূল। সব হস্টাইল ব'লে জেরা আরম্ভ করলে! আর বিবেচনা করুন, সত্যি জিনিসটাই পাজি জিনিস, বিবেচনা করুন, পারার মতন পাজি জিনিস, কিছুতেই হজম হয় না, ফুটে বেরুবেই।

দেব। এখন উপায়?

গোপী। হাইকোর্টে আপীল করব, ভাবছেন কেন? বিবেচনা করুন, বাবারও বাবা আছে।

দেব। এই সব এজাহারের পর হাইকোর্টে কোন ফল হবে না।

গোপী। ওই কথাটি বলবেন না হুজুর। তবে বলি শুনুন, এই আপনার ১৩১৪ সালে—ইংরিজী ১৯০৮, লাট কমলপুরের দখল নিয়ে দাঙ্গা, ১৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, বিবেচনা করুন, আমি বার বার বারণ করলাম, যদি পাই রাজ্যদেশ, তবু না যাবে বৃহস্পতির শেষ। বারণ করলাম—আজ থাক। তা সেজোবাবু—

দেব। (বাধা দিয়া) গোপী, তুমি একবার মহাভারতকে দেখ, হুটুবাবুর সঙ্গেও দেখা কর। মামলা মিটমাট কর।

গোপী। মিটমাট করবেন?

দেব। হ্যাঁ। মিটমাট করব। স্যয়েব-স্থবোর কাছে আমাদের সুনাম একেবারে নষ্ট হবে। ওই মহাভারত যাচ্ছে। তুমি ডাক ওকে। আমি একটু স'রে যাই। ভয় নেই, তোমার পুরস্কার তুমি পাবে। ডাক মহাভারতকে। কথা বল।

প্রস্থান

গোপী। মহাভারত! ওহে মহাভারত! বলি শোন হে, শোন।

মহাভারতের প্রবেশ

মহা। মিটমাট আমি করব না হে। আর কিছু বলবে তো বল।

গোপী। আরে শোন—শোন।

মহা। (গোপীর মুখের কাছে বুড়া আঙুল নাড়িয়া) খট খুট লবডঙ্কা!

খট খট লবডঙ্কা! জমি নাই, কাড়বি কি? ঘর নাই আগুন লাগাবি কিসে? খট খট লবডঙ্কা! আর আমার করবি কি?

গোপী। জমি ফিরে পাবে, ঘর তৈরি ক'রে দেব। নগদ টাকাও কিছু আদায় ক'রে দেব। (চুপিচুপি) বারো আনা তোমার, সিকি কিন্তু আমাকে দিতে হবে।

মহাভারত। (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ডাকিল) দাদাঠাকুর! ও দাদাঠাকুর!

হুটু ও তাহার মুহুরীর প্রবেশ

হুট। কি মহাভারত? আরে, আপনি যে? মিত্তির মশাই!

গোপী। প্রণাম।

মহা। দাদাঠাকুর, মিত্তির বলছে মিটমাট করতে।

হুট। মিটমাট!

গোপী। আজ্ঞে হাঁ, বিবেচনা করুন, মিটমাট।

হুট। (গোপীর দিকে চাহিয়া) দুটি শর্ত্তে মিটমাট হতে পারে মিত্তির মশাই।

গোপী। আজ্ঞে, বিবেচনা করুন, দুশো শর্ত্ত মানতে রাজি আছি। কর্ত্তাবাবু বললেন কি জানেন, বললেন—হুটুবাবু হলেন আমাদের গাঁয়ের গৌরব।

হুট। কর্ত্তাবাবু বয়স্ক লোক, আমার বাপের বয়সী, তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন।

গোপী। আপনার শর্ত্ত কি বলুন?

হুট। প্রথম শর্ত্ত, এই মিটমাটের কথা, বাবুদের, অবশ্য কর্ত্তাবাবুকে বাদ দিয়ে, ঢাক কাঁধে বাজিয়ে, শহরে জানাতে হবে। আর মহাভারতের পোড়া ঘর এখনও ছাওয়ানো হয় নি, সেই চালে উঠে বাবুদের ছাওয়াতে হবে।

গোপী। (হাতজোড় করিয়া) আজ্ঞে বিবেচনা করুন, হাইকোর্টের পরে সে কথা বিবেচনা করা যাবে। প্রণাম তা হ'লে।

প্রস্থান

মুট। সুশোভন কোথায় জান মহাভারত?

মহা। ছোটদাদাঠাকুর আপনার তালে আছে দাদাঠাকুর। আদালত থেকে দু টাকা খোরাকি পেয়েছে, আজ পাকী মদের দোকানে ব'সে গিয়েছে। মদ খাচ্ছে আর তালপাতা নিয়ে কি বুনছে।

মুট। একবার ডাক তো তাকে।

মহাভারতের প্রস্থান

মুহু। তিনটে মামলার কাগজ নিয়ে লোক ব'সে আছে।

মুটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিল

মুট। মামলা?

মুহু। একটা দায়রা। হিরণপুরের জমিদারদের—

মুট। জমিদারদের?

মুহু। আজ্ঞে, শরিকে শরিকে দাঙ্গা।

মুট। শরিকে শরিকে? ভাল।

মুহু। আমি ফী বলেছি চার টাকা।

মুট। ব'লে দাও, দশ টাকার কম আমি কাগজ ছোঁব না।

মুহু। আজ্ঞে, বেশি টানলে ছিঁড়ে যাবে বাবু।

মুট। ছিঁড়ে যায়, ফেলে দাও।

মুহু। আর দুটো এস. ডি. ও.-র কোর্টের মামলা। মক্কেল গরিব, তাদের তা হ'লে—

মুট। তাদের কেস আমি নিলাম। যা ফী দেবে তাই নেব আমি।

মুহু। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

একজন উকিল আসিয়া মুটুর করমর্দ্দন করিল

উকিল। My hearty congratulations, মুটুবাবু। ব্রিলিয়াণ্ট—ব্রিলিয়াণ্ট জেরা হয়েছে। এইবার আর্গুমেণ্ট।

মুট। থ্যাঙ্কস।

উকিল। গভর্মেণ্ট প্লীডার বলছিলেন কি জানেন?

নেপথ্যে সুশোভন। (মত্তকণ্ঠে) লং লিভ মুটুদা।

উকিল। ও লোকটাকে কেন আশ্রয় দিয়েছেন মুটুবাবু? না না, আপনার মত—

হুট। আশ্রিতের চরিত্র কি বিচার করা চলে? রাজা পরীক্ষিৎ কলিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমাকে মার্জ্জনা করবেন পাঁচ মিনিটের জন্যে।

উকিল। ওদিকে টিফিনের সময় পার হয়ে গেল প্রায়।

প্রস্থান

সুশোভন ও মহাভারতের প্রবেশ। সুশোভনের বগলে বেহালা। হাতে তালপাতার মুকুট

সু। You are glorious, you shall be victorious, there is no doubt। আমি তোমার জন্যে ক্রাউন তৈরি ক'রে এনেছি হুটুদা, crown made of palmleaves, here it is।

তালপাতার তৈরি একটা মুকুট বাহির করিল

হুট। জান সুশোভন, আমার সন্তান যদি তোমার মত হ'ত, তবে তার মুখে আমি নিজের হাতে বিষ তুলে দিতাম।

সু। (চমকিয়া) কেন হুটুদা?

হুট। কেন, সেই কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ সুশোভন?

সু। (শ্রাগ করিয়া) Of course I know my defects, আমি মাতাল। কিন্তু আমি তো কারু কোন ক্ষতি করি না হুটুদা। দু-চার পয়সা, দু-চারটে জিনিসও চুরি করি, কিন্তু তোমার আর কল্যাণীর ছাড়া অন্য কারু নয়। আপন গড, তোমার দিব্যি—

হুট। সুশোভন, তোমার মরণই মঙ্গল। তোমার আত্মহত্যা করা উচিত।

প্রস্থান

সু। মহাভারত!

মহা। দাদাঠাকুর।

সু। বেহালা বাজাব শুনবে?

মহা। এই রাস্তার ওপর দুপুর রোদে?

সু। শোন, শোন।

বেহালা বাজাইতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ থামিয়া গেল

জান মহাভারত, পটাসিয়াম সায়ানাইড ব'লে এক রকম বিষ আছে, সে জিবে ঠেকাবামাত্র মানুষ ম'রে যায়। কোন যন্ত্রণা হয় না।

মহা। না না দাদাঠাকুর, ও কথা তুমি মনে ঠাঁইও দিও না। বড়-দাদাঠাকুরের রাগ এমনিই বটে।

সু। অনেক সময় ভাবি, এখান থেকে চ'লে যাই। কিন্তু ভয় হয় কি জান, মরবার সময় বড় কষ্ট পাব। এখানে মরবার সময় কল্যাণী সেবা করবে, কাঁদবে, তুমি কাঁদবে, মমতা কাঁদবে, অরুণ কাঁদবে, বউদিও কাঁদবে মহাভারত, সবচেয়ে বেশি কাঁদবে বউদি, তাতে আমি ম'রেও সুখ পাব।

মহা। দাদাঠাকুর, আজ থেকে তুমি আমার ঘরে থাকবে দাদাঠাকুর। বড়দাদাঠাকুর রাগ করে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ আমি চুকিয়ে দেব।

ব্যস্তভাবে গোপী মিস্ত্রিরের প্রবেশ

গোপী। বাবু! বাবু! (চারিদিক চাহিয়া) বাবু!

প্রস্থান

দুইজন টাউটের প্রবেশ

১ম। অদ্ভুত! অদ্ভুত আর্গুমেণ্ট করছে সুটুবাবু! অদ্ভুত! চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

২য়। বলছ কি?

১ম। আগুন ছুটিয়ে দিলে। এস, শুনবে তো এস।

প্রস্থান

সুটুর মুহুরীর প্রবেশ

মু। মহাভারত, শিগগির এস।

মহা। আমি আসছি দাদাঠাকুর।

উভয়ের প্রস্থান

গোপী ও দেবনারায়ণের প্রবেশ ও ব্যস্তভাবে অন্য দিক দিয়া প্রস্থান

সু। (উঠিয়া) "আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ।" কবি, তোমাকে আমি প্রণাম করি।

বলিতে বলিতে প্রস্থান

দৃশ্যান্তর

কোর্ট-রুম

জজ—জুরিগণ—উকিল—আসামী—দর্শক
স্নুটু আর্‌গুমেণ্ট করিতেছে

স্নুটু। ইওর অনার, সমস্তই আমি নিখুঁতভাবে প্রমাণিত করেছি ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে, এক অত্যাচারী ধনীর অ'রাধে, তারই একজন অনুগ্রহপুষ্ট দুর্ব্বলের ওপর দণ্ডবিধান করা ছাড়া ধর্ম্মাধিকরণের গত্যন্তর নেই। অবশ্য সে বিচার একজন করবেন। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিরাজমান, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, তিনি এর বিচার করবেন। তাঁর দরবারে যে অভিযোগ-পত্র দাখিল হবে, তাতে মাত্র এই অভিযোগটুকুই থাকবে না। ভগবানের পুত্রকে ক্রুসে বিদ্ধ করার অপরাধ তাতে যোগ হবে। ভগবানের পুত্র একবারই মাত্র ক্রুসে বিদ্ধ হন নি। বার বার তিনি বিদ্ধ হচ্ছেন। মানুষ ভগবানের সন্তান, তার মনুষ্যত্ব যেখানে এই কালী বাগদীর মনুষ্যত্বের মত পিষ্ট হয়, সেখানেই ভগবানের সন্তান ক্রুসবিদ্ধ হন। এর বিচার ভগবান করবেন। সে বিচারের রায়ের সামান্য অংশ আমরা জানি, ঈশ্বরের পুত্র মহামানব যীশুখ্রীষ্ট আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছেন—It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a richman to enter into the kingdom of God। সর্ব্বশেষে বিচারকের কাছে ঐ নির্ব্বোধ হতভাগ্য অপরাধীর জন্যে করুণা প্রার্থনা ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

উপবেশন

জজ। (জুরিদের প্রতি) জেণ্ট্‌লমেন !

জুরি। আমাদের পরামর্শ করবার প্রয়োজন নেই হুজুর, প্রত্যেকেই একমত—আসামী দোষী। We find him guilty।

জজ। I accept your verdict and condemn the accused to five years R. I.

ক্রমশ

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামের মেয়ে

বিলক্ষণ ছোটাছুটির পর ট্রেনটা ধরা গেল।

বাক্স-বিছানাগুলো ঠিকঠাক গুনে নেবার পর এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। রুমাল দিয়ে ঘর্মাক্ত কপালটা মুছে ফেলে রঞ্জন বললে, এইজন্যেই শাস্ত্রকারেরা লিখেছেন, 'পথি নারী বিবর্জিতা'।

রেণু ফোঁস ক'রে উঠল, বা-রে, এখন সব বুঝি আমার দোষ হয়ে গেল! কেন মশাই, আর দু ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বেরোলে কি হ'ত?

গাড়ি ততক্ষণে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে পড়েছে। লোহায় লোহায় যান্ত্রিক শব্দ শুরু হয়েছে এবং দুজনের নিভৃত আলাপের পক্ষে প্রচুর সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। কামরাটাকেও মোটামুটি নিরিবিলিই বলা চলে।

রঞ্জন বললে, তা হ'লে মোগলসরাই স্টেশনের মেড়ো-যাত্রীর মত লটবহর নিয়ে ব'সে থাকতে হ'ত। প্রিয়ে, যদি তুমি ইংরেজ-মহিলা হতে, কিছুতেই এতবড় কথাটা—

রেণু নিদারুণ চ'টে গেল। এক 'প্রিয়া'-সম্বোধনই তাকে ক্ষেপিয়ে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট।

হুঁ। লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটে না এলে বুঝি সোয়াস্তি হয় না?

তা কেন? তারা চলতি ট্রামে উঠতে জানে, দরকার হ'লে ট্যাক্সি, নিদেন রিক্‌শ নিয়ে স্টেশনে চ'লে আসতে পারে। তারা তো আর সচল লগেজ নয় যে, তাদের ঠেলাঠেলি ক'রে গাড়িতে তুলতে গিয়ে স্বামী-বেচারাকে গলদঘর্ম হতে হবে! নেহাতপক্ষে আধুনিক মেয়ে হ'লেও—

আগুনে আরও খানিকটা ঘৃতাহুতি পড়ল।

ওঃ, আমি বুঝি তোমার সচল লগেজ, না? তা হ'লে একটা বেরালচোখী মেমসায়েব কিংবা আধুনিক মেয়ে বিয়ে করলেই তো আপদ চুকে যেত।

রেণু জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে বসল।

বিপন্ন হয়ে রঞ্জন বললে, ভুল যখন ক'রেই ফেলেছি, তখন তো আর চারা নেই। আপাতত ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম মরণং, তারপর—তারপর—

রেণু রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেললে।

না, সত্যি বড্ড বিশ্রী লাগে আমার। রাস্তায় বেরুলে লোকগুলো কি রকম করে দেখেছ? এমন হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে!

দেখবার জিনিস পেলেই মানুষের লোভ হয়। তা ছাড়া হাঁ ক'রে থাকে, থাক না। ওই যখন ওদের স্বভাব—

বেজায় অসভ্য স্বভাব। গাড়ি-চাপাই পড়বে, না পাশের লোকের সঙ্গে ধাক্কা খাবে,—বেহায়াপনারও তো একটা সীমা আছে বাপু!

ওইজন্যেই তো ওদের সঙ্গে খানিকটা বেহায়া হওয়া দরকার। আধুনিক মেয়ে হ'লে কি করত জান? সোজা গিয়ে চ্যালেঞ্জ করত, অমন অসভ্যের মত চেয়ে আছেন কেন মশাই; নয় তো প্রশ্ন করত, আপনি কি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান?

রেণু শিউরে বললে, মাগো, এ আবার কোন্ দেশী অসভ্যতা! থাক না তাকিয়ে, খালি চাউনিতেই তো আর গায়ে ফোসকা পড়ে না।

রেণুর উলটোপালটা কথায় রঞ্জন হেসে ফেললে।

ফোসকা যখন পড়েই না, তখন আর একটু স্মার্ট হবার চেষ্টা করলে ক্ষতি কি? এ হচ্ছে গতির যুগ, তোমরা এমন জবুথবু হয়ে থাক ব'লেই না দেশটার কিচ্ছু হচ্ছে না! জান না, কবি লিখে গেছেন—'না জাগিলে সব'—

রেণু বললে, থাম, থাম। কবিরা কিই বা না লেখে! এই তো একজন বিদ্রোহী কবি লিখেছে, 'ধরি বাসুকীর ফণা জাপটি'—কই, ধরুক তো একটা ঢোঁড়া সাপের ল্যাজ, বোঝা যাবে তা হ'লে!

রঞ্জন বিপন্ন হয়ে বললে, আঃ, এ কি নাবালিকার পাল্লায় পড়লাম! ওটা ইয়ে, মানে রূপক, ওর আইডিয়া তুমি বুঝবে না।

থাক, বুঝেও দরকার নেই। আচ্ছা, তুমিও বেশ কবিতা লিখতে পার, কিন্তু ছাপাও না কেন?

রঞ্জনের মনে এল, তোমার মত রসবোধ যদি সম্পাদকের থাকত! এবং সেইজন্যেই সে প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে ফেললে।

এমনিই, সে থাক। কিন্তু বাস্তবিক, একবার ভেবে দেখ, তোমরা গাঁয়ের মেয়েরা আজ কোথায় অন্ধকারে প'ড়ে আছ! মেয়েরা হবে পুরুষের সহধর্মিণী, কর্মী মানুষের পাশে পাশে পা ফেলে চলবে তারা। সাহস চাই, বল চাই।

রেণু ভুরু কুঁচকে বললে, আই. এ., বি. এ. পাস করলেই বুঝি মেয়েদের খুব সাহস বাড়ে?

উত্তর দিতে রঞ্জনের একটু দ্বিধা করতে হ'ল, হ্যাঁ, অনেকটা তাই বইকি।

রেণু অত্যন্ত মনোরম ভঙ্গিতে ঠোঁট দুটি বাঁকিয়ে বললে, ইঃ, তাই বইকি! আমার পুঁটিদি তো বি. এ. পড়ে, গতবার পূজোর সময় দেশে এসে সে কি কাণ্ড! রাত্তিরে ঘরের পেছনে শেয়ালের ডাক শুনেই পুঁটিদির ফিট। শেষে নাকে সেরটাক লঙ্কা আর গোলমরিচের ধোঁয়া দিতে, তবে তার জ্ঞান হয়।

তোমারই তো পুঁটিদি, তার দৌড় আর কত হবে! তা ছাড়া হয়তো তার মিরগি রোগ ছিল, ওটা উপলক্ষ্য মাত্র।

মিরগি না আরও কিছু। পুঁটিদির স্বাস্থ্য তোমার চাইতে ঢের ভাল, দারুণ বাস্কেটবল খেলতে পারে। জ্ঞান হ'লে পর কি করেছিল জান? বার পাঁচ-সাত কেবল বিড়বিড় ক'রে বলছিল, হাউণ্ড অব বাস্কারভিল, হাউণ্ড অব বাস্কারভিল! আর যে কদিন বাড়িতে ছিল, শেয়াল ডাকলেই ছুটে এসে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরত।

ওটা ব্যতিক্রম মাত্র, একজনকে দিয়েই সমস্ত শিক্ষিতা মেয়েকে বিচার করতে নেই। এই ছবিটা দেখ, মিস ন্যান্সি বার্টন। উইম্বলডেন টেনিসে দারুণ নাম করেছে।

হাতে একটা 'ইলাস্ট্রেটেড ইয়োরোপ' পত্রিকা ছিল। রেণুকে পরাস্ত এবং বশীভূত করবার জন্যে রঞ্জন এইবার সেটা ব্যবহার করলে।

অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে রেণু ছবিটা দেখতে লাগল।

বাব্বাঃ, কি চোয়াড়ে চেহারা মেয়েটার! যেন একটা ষণ্ডা পুরুষ দাড়িগোঁফ কামিয়ে শেমিজ প'রে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সংশোধন ক'রে রঞ্জন বললে, শেমিজ নয়, ওটা ওর ফ্রক।

ও একই কথা। আচ্ছা, ও যেন কি করেছে বলছিলে?

যা করেছে, তা ভীষণ। ওদেশের সেরা টেনিস খেলার জায়গা হচ্ছে উইম্বল্‌ডেন ক্লাব। সেখানকার সব ঝানু ঝানু খেলোয়াড়কে হারিয়ে দিয়েছে।

রেণুর মনোযোগ গভীরতর হ'ল, বোধ হয় মেয়েটির কৃতিত্বে সে মুগ্ধ হয়েছিল। উৎফুল্ল হয়ে রঞ্জন জিজ্ঞেস করলে, কি দেখছ?

রেণু আরও খানিকটা অভিনিবেশসহকারে ছবিটা লক্ষ্য ক'রে বললে, দেখছি একটা জিনিস। ফোটোতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ওর নাকটা বেশ খ্যাঁদা ব'লে মনে হচ্ছে না তোমার?

এত মনোযোগ দিয়ে সে খ্যাঁদা নাকটা পর্যবেক্ষণ করছিল?

উইম্বল্‌ডেন টেনিসের মর্ম রেণু বুঝবে না, সুতরাং রঞ্জন ক্ষুণ্ণ হয়ে বিষয়ান্তরে এল। পৃষ্ঠাটা উলটে বললে, এই দেখ জার্মান মেয়ে মিস এমিলিয়া স্মিট—নাম-করা এরোপ্লেন-পাইলট। আটলাণ্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় যাওয়ার কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে। আর এই দেখ ডোরা প্যাংক্রিজ, ফ্রান্সের সেরা নাচিয়ে—

কিন্তু রেণু এবার লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

ছি ছি, কি অসভ্য! কোন্ লজ্জায় এমন ক'রে ছবি তুলেছে বল তো? গায়ে আর একটু কাপড় জড়ালে কি ওর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত নাকি?

তুমি অসভ্য বলছ কাদের? জান, ওদের আদর্শ অনুসরণ ক'রেই আমরা আজ সভ্যতার পথে এগিয়ে চলেছি?

রক্ষে কর বাপু, দরকার নেই আমার অমন সভ্যতায়। জন্ম জন্ম যেন এমনই গেঁয়ো থাকতে পারি, সেই ঢের ভালো আমাদের পক্ষে।

রঞ্জন মৃদু হেসে বললে, ওইখানেই তো ভারতীয় মেয়েদের ট্র্যাজেডি।

যাত্রাপথ রীতিমত দীর্ঘ। বেলা চারটে থেকে আটটা পর্যন্ত ট্রেন, সেখান থেকে শেষ রাত্রি অবধি স্টীমার। কিন্তু সেখানেও শেষ নয়।

নৌকা ক'রে আরও অন্তত পাঁচ-ছ ঘণ্টা পাড়ি জমালে গোটা বারোর মধ্যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো যাবে।

পথ রঞ্জনের চেনা নয়, কিন্তু রেণুর কণ্ঠস্থ। প্রত্যেকটি স্টেশনে সে গলা বাড়িয়ে দেখতে লাগল, খুলনা আর কতদূরে। আমনধানের ঘন সবুজ ক্ষেতের ওপর মন্থর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে লাগল, চতুর্দশীর উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় দূর বনান্তের ওপর স্বপ্নরোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়ল। রেল-লাইনের বাঁধের নীচে চাঁদ ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল এবং জ্যোৎস্নায় রেণুর আগ্রহব্যাকুল মুখখানাকে বিচিত্র দেখাতে লাগল।

কিন্তু অসুবিধের একশেষ হ'ল খুলনা ঘাটে পৌঁছোবার পরে। কুলির সঙ্গে বিস্তর দরকষাকষি ক'রে যখন স্টীমারে ওঠা গেল, তখন দেখা গেল, তিলার্ধ জায়গা নেই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা নিয়ে অনেকেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন, বিস্তর তোষামোদ এবং মহিলার ওজর দেখিয়ে কোনওক্রমে একটুখানি ঠাঁই ক'রে নেওয়া সম্ভব হ'ল। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। ঠিক নীচেই আবার স্টীমারের বয়লার। কিছুক্ষণ বাদেই সেখান থেকে এমন তাপ উঠতে লাগল যে, বিছানা ছেড়ে ট্রাঙ্কের ওপর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় রইল না।

রেণু হেসে বললে, রাতটা কোনমতে এভাবেই কাটাতে হবে। নৌকোয় ওঠবার আগে আর ঘুমোবার জো নেই বাপু।

রঞ্জন বিরস মুখে বললে, তোমাকে নিয়েই তো আরও হাঙ্গাম। তোমার ওই পেল্লায় ট্রাঙ্কটা তুলতেই প্রায় পনরো মিনিট কেটে গেল, নইলে আগে এলে বেশ জায়গা পাওয়া যেত।

এইবা নেহাত মন্দ কি!

অগত্যা। কিন্তু মেয়েদের কেবিনে দিয়ে আসব তোমাকে? এখানে এই ভিড়ের চাইতে—

রেণু ত্রস্ত হয়ে বললে, না না, কেবিনে আমার দরকার নেই। অতটুকু ঘরের ভেতর যা ভিড়, আমার তো একেবারে দম আটকে আসে। তা ছাড়া পুরুষেরা তবু ভদ্রতা ক'রে মেয়েদের জায়গা ছেড়ে দেয়, মেয়েদের তো আর সে বালাই নেই। সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে এমন ঝগড়া করে যে, শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

রঞ্জন খুশি হয়ে বললে, এই তো তোমাদের কাল্‌চার! একটু স্বাধীনতা-স্পৃহা নেই, মনের জোর নেই, তোমরা আবার পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবি কর! এক পা পথ চলতে দিয়েও তোমাদের মত মেয়েদের বিশ্বাস করা চলে না।

রেণু স্বীকার ক'রে নিয়ে বললে, বটেই তো।

বাড়ির মাঝী জলিল ওদের নিতে এসেছিল, সুতরাং স্টীমার-ঘাটে নৌকো করবার জন্যে বিব্রত হতে হ'ল না। ছোট খালটি দিয়ে নৌকোটি যখন যাত্রা করল, আকাশ তখন প্রথম সূর্যের আরক্ত আভায় রঙিন হয়ে উঠেছে। খালের ধারে ধারে গ্রামগুলির ওপর জাগরণের ছোঁয়াচ লেগেছে, দুদিকের শিশির-ভেজা বন-জঙ্গল থেকে সোঁদা মাটি আর লতাপাতার বিচিত্র গন্ধ নাকে আসছিল। খালের ধারে কোথায় একটা শিউলি-ফুলের গাছ শরতের স্পর্শে মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। তারই দু-চারটি ফুল জোয়ারের স্রোতে ভেসে চলেছিল।

ভাল ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে রেণু বললে, বাবাঃ, এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। একেবারে ঠিক দেশের আমেজ লাগছে। মামা আমাদের দেখে কি যে খুশি হবেন, তাই ভাবছি এখন।

তোমার মামারা বুঝি খুব বড়লোক?

তা মন্দ নয়, ঢের জমিদারি আছে। চর থেকে বিস্তর ধান আসে বছরে।

হঠাৎ রঞ্জন চকিত হয়ে উঠল।

আচ্ছা, এই—তোমার মামার বাড়ির দেশে ম্যালেরিয়া নেই তো?

রেণু বললে, ইস, ম্যালেরিয়া! এদেশের জল-হাওয়া পুরী-দার্জিলিঙের চাইতে একটুও খারাপ নয়। ছ মাস তুমি কাটাও না এখানে, তোমার মাথা-ধরা কিংবা ডিস্পেপ্‌সিয়ার ধাত কেমন ভাল হয়ে যায় দেখ।

রঞ্জন বললে, দুর্ভাগ্য, সে সুযোগ হবে না। তা ছাড়া পুরো ছ মাস পাড়াগেঁয়ে নারীবৃন্দপরিবৃত হয়ে কাটাব—ওঃ, সে অসম্ভব!

রেণু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, আচ্ছা, পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের সম্বন্ধে তুমি সর্বদাই কেন এমন ক্ষেপে থাক বল তো? শহরের মেয়েদের চাইতে তারা কোন্ অংশে কম?

সব অংশেই। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে পুরুষের সহধর্মিনী হতে পারে না, পাশে এসে দাঁড়াতে পারে না কোন দিন। তাদের সীমা অন্দর এবং ভাঁড়ার পর্যন্ত, তার বাইরে বাইরে তারা অনাবশ্যক বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হুঁ।—ব'লে রেণু চুপ ক'রে রইল।

দু পাশের বাঁশবনের আড়াল দিয়ে সূর্যের আলো খালের জলে এসে পড়ল, সুপারির কাঠ ফেলা খালের ঘাটে ঘাটে একটি একটি ক'রে নরনারীর আবির্ভাব হতে লাগল। ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে কৌতূহলী চোখগুলি এই নৌকোর দিকে তাকিয়ে রইল, দু-একটা অস্পষ্ট মন্তব্য ভাল ক'রে শোনা গেল না।

গোটা কয়েক বাঁক ঘুরে খালটা যেখানে গিয়ে পড়ল, সেটাকে ছোটখাটো একটা নদী বলা চলে। সেই বড় খালের মুখে ঢোকবা-মাত্র অনুমান করা গেল, ভাঁটার প্রখর টানে খালের জল ঠিক ওদের বিপরীত দিকে নেমে চলেছে।

হাতের দাঁড়টা তুলে নিয়ে জলিল বললে, দিদিমণি, মুশকিল হ'ল।

দুজনেই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, কেন রে?

দেখছেন না, ভাঁটার টান দিয়েছে? লগি ঠেলে গেলেও তো সাঁঝের আগে পৌঁছোবার জো নেই।

রেণু বললে, নৌকোয় গুন আছে না?

তা তো আছে। গুন টেনে গেলে অবিশ্যি তাড়াতাড়িই হয়, কিন্তু হাল সামলাবে কে?

রেণু রঞ্জনের মুখের দিকে তাকালে, তুমি পারবে না? তোমার তো এসব অভ্যেস আছেই।

সেই মুহূর্তে মেয়েদের আশ্চর্য স্মরণ-শক্তি অনুধাবন ক'রে রঞ্জন মুগ্ধ হয়ে গেল। বিয়ের অনেক আগে কবে একদিন সে নিজেকে আহিরী-টোলা রোয়িং ক্লাবের মেম্বার ব'লে পরিচয় দিয়েছিল এবং তিন আনা

সত্যে তেরো আনা খাদ মিশিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিল। আজ প্রায় এক বৎসর পরেও রেণু সে কথা মনে রেখেছে।

পারব না কেন, তবে অনেক দিনের অনভ্যাস—

রেণু আশ্বাস দিয়ে বললে, অনভ্যাস তো কি হয়েছে, হাল ধ'রে বসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর এসব এমন জিনিস, একবার শিখলে তো আর ভোলা যায় না।

মনে বিপন্ন বোধ করলেও এক্ষেত্রে সেটাকে প্রকাশ করা চলে না। রঞ্জন মনে করলে, কোন রকম একটু এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করলেই হালটাকে সামলে রাখা যাবে, কাজটা এমন কিছু শক্ত নয়।

কিন্তু গঙ্গার স্রোতে আরও আঠারোজনের সঙ্গে বাচের নৌকোর দাঁড় টানার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের খালে এক মাল্লাই নৌকোর হাল ধরাতে যে কত তফাত, সেটা সে তখনও অনুমান করতে পারে নি।

গুনের দড়ি-দড়া ঠিক ক'রে নিয়ে জলিল নৌকো পাড়ে ভিড়িয়ে আনলে। তারপর গুন ঘাড়ে ক'রে নেমে পড়ল। খালের ধারে ধারে কাশবন আর বেতঝোপের আশেপাশে গুন-টানা মাঝীদের পায়ে পায়ে সরু একটি পথের রেখা প'ড়ে গিয়েছে, সেই পথ ধ'রে সে এগিয়ে চলল।

রঞ্জন হাল ধ'রে বসল।

রেণু বললে, ও কি? ওভাবে বোটে ধরে নাকি কেউ?

বাঁ হাতটা ওপরে দিয়ে সংশোধন ক'রে নিয়ে রঞ্জন সপ্রতিভভাবে বললে, জানি, জানি। ঠিক ক'রেই নিচ্ছি সব, এই দেখ না।

কিন্তু স্বামীর বিদ্যার পরিমাণ যাচাই ক'রে নিতে রেণুর পাঁচটি মিনিটও সময় লাগল না। বিচিত্র নৌকোটার ব্যবহার! জলিলের কাছে তো দিব্যি ভালই চলছিল, কিন্তু হস্তান্তর ঘটবামাত্র তার মেজাজ বেঠিক হয়ে গেল। খামকা ভদ্রলোককে অপদস্থ করবার ষড়যন্ত্র ছাড়া একে আর কি বলে!

জলিল অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, তাই পেছনের ব্যাপারটা সে বেশ ক'রে লক্ষ্য করতে পারে নি। কিন্তু নৌকোটার গতিবিধি রঞ্জনের কাছে ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগল। খালের মাঝখানে বার দুই-তিন সে বোঁ বোঁ ক'রে পাক খাওয়ার চেষ্টা করলে। তারপর রঞ্জনের

সহস্র শাসনকে অমান্য ক'রেই এক গোঁ। মেরে সোজা বেতবনের মধ্যে গিয়ে ভিড়ল।

রেণু বললে, বাঃ, এ করছ কি ?

আর এ করছ কি ! রেণু না হয় ছইয়ের মধ্যে ব'সে ছিল, কিন্তু রঞ্জনের অবস্থা ততক্ষণে রীতিমত করুণ হয়ে উঠেছে। বেত-কাঁটার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা তখন তাকে নিবিড় প্রেমে আঁকড়ে ধরেছে, জামা-কাপড় এবং নাক-মুখের ওপর ছরছর ক'রে কাঁটার আচড় লাগতে লাগল।

রেণু শিউরে বললে, ইস, কাঁটায় তোমার সারা গা ছিঁড়ে গেল যে ! লগি ঠেলে বেরিয়ে এস না শিগগির।

কিন্তু লগি ঠেলে বেরোনোরই কি জো আছে ! বেতবনের নীচে নরম চটচটে পলিমাটি, লগি তাতে আটকেই রইল। টেনে আর তোলা যায় না।

গাছ-কোমর বেঁধে রেণু বেরিয়ে এল, হয়েছে হয়েছে, বুঝেছি তোমার দৌড়। স'রে যাও, আমি নৌকো বের ক'রে নিচ্ছি।

অপমানিত বোধ ক'রে রঞ্জন বললে, দাঁড়াও না।

প্রচণ্ড এক ধাক্কায় নৌকোটা আট দশ হাত ছিটকে বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু লগিটাও হাত থেকে খ'সে গেল। কাদার মধ্যে সেটা আঁটকে রইল তো রইলই।

প্রচুর কৌতুক এবং প্রচুরতর বিদ্রূপ নিয়ে রেণু রঞ্জনের মুখের দিকে তাকালে।

এই বুঝি তোমার রোয়িং ক্লাবের বিদ্যে ? দাও তুমি বোটে আমাকে, দেখ, আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি।

তোমার চাইতে আমি বুঝি কম পারব ?

কিন্তু বেশি পারবার পরিচয়ও সে দিতে পারলে না। নৌকো যদিবা কোনক্রমে আবার খালের মধ্যে ফিরে এল, তার স্বেচ্ছাচারের কোনও পরিবর্তন ঘটল না।

রেণু এবার এক রকম জোর ক'রেই তার হাত থেকে বোটে কেড়ে

নিলে। বললে, হুঁ, তোমার মতন মানুষ হাল ধরলেই হয় আর কি! তা হ'লে এই খালেই আজ সারা রাত্তির কেটে যাবে।

রঞ্জন বিস্মিত হয়ে বললে, কিন্তু তুমি হাল ধরতে পারবে?

রেণু মুখ টিপে হাসলে: পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তো। আমাদের স্মার্টনেস নেই বটে, কিন্তু এসব একটু আধটু জানা আছে।

রেণু সত্যি সত্যিই হাল ধরলে, এবং সবচাইতে এটাই বিস্ময়কর যে, রঞ্জনের বহু চেষ্টাতেও যে-নৌকোটা কিছুতেই বাগ মানতে চাইছিল না, রেণুর হাতে সে নিতান্ত সুবোধ ছেলেটির মতো ব'য়ে চলল এবং ভাঁটার বিপরীতমুখী জল লঘু তরল কৌতুকের হাসির মত ছলাৎ ছলাৎ ক'রে নৌকোর গায়ে আঘাত করতে লাগল।

রঞ্জন বললে, ছিঃ ছিঃ, লোকে কিছু একটা মনে করবে!

রেণু তার মুখের ওপর স্নিগ্ধোজ্জ্বল চোখ রেখে বললে, মেয়েরা মোটর-এরোপ্লেন চালালে সেটা যদি গৌরবের হয়, তা হ'লে নৌকোর বেলাতেই কিছু একটা মনে করবে কেন?

কথাটার ভেতরে যে ছোট্ট একটু খোঁচা ছিল, এই মুহূর্তে সেটুকু রঞ্জনকে স্পর্শ করল না। প্রভাতের রৌদ্রে বিস্তৃত খালের জল উল্লসিত হয়ে উঠেছে, তীরে তীরে শরতের কাশবনের প্রসন্ন শুভ্রশ্রী। দুদিকে বরিশালের অকৃপণ ধানক্ষেত, একটু একটু ক'রে তাতে রঙ ধরতে শুরু হয়েছে। সজল পরিপূর্ণতার একটা বিচিত্র বর্ণে গন্ধে বাতাস যেন মন্থর হয়ে উঠেছিল। এক পাশে জলের ওপর দিয়ে বন্যাফলের ঝোপ যেন আয়নায় মুখ দেখবার জন্যে নত হয়ে পড়েছে, তারই ডালে পাতায় কয়েকটা দোয়েল নাচানাচি করছিল। খালের এখানে ওখানে নলখুরি ফুলের লতা জলের মধ্যে নেমে এসেছে, রাশি রাশি ফুলে লতাগুলি সমৃদ্ধ।

কিন্তু এমন অপরূপ প্রকৃতির রূপজগতে রেণুকে অস্বাভাবিক সুন্দরী দেখাল। নৌকোর গলুইয়ে সে হাল ধ'রে বসেছে, খালের জলে সূর্যের যে আলোকদীপ্তি প্রতিফলিত হচ্ছিল, তারই আভাতে রেণুর গলার হার এবং হাতের আংটি চিকচিক ক'রে জ্বলতে লাগল। এতক্ষণের অসংস্কৃত ও অপেক্ষাকৃত অসংযুত চুলগুলোকে সে অযত্নে

খোপা ক'রে জড়িয়ে রেখেছে, প্রচুর বাতাসে তারই কয়েকটি অবাধ্য চুল গালে-কপালে ছড়িয়ে পড়ল। হালটাকে এলোমেলোভাবে আলোড়ন করানোর সঙ্গে সঙ্গে হাতের চুড়িগুলো ঠুনঠুন ক'রে বাজতে লাগল, যেন জলের কল-কল্লোলের সঙ্গে চুড়ির মিষ্টি শব্দটা একতানে মিলে গিয়েছে।

রঞ্জন অনুভব করলে: মনের ওপর দিয়ে যেন একটা অভিনব মুগ্ধতা নেমে আসছে। এতদিন পরে রেণুকে যেন তার সহজ পরিমণ্ডলটির মধ্যে ঠিকমত চিনে নেওয়া গেল। মনে হ'ল, আধুনিক ড্রয়িংরুমের জাপানী ফুলদানিতে বন-গোলাপকে মানায় নি ব'লেই তার মূল্য ক'মে যায় না। তারও নিজস্ব জগতে নিজস্ব পরিচয় আছে, সেখানে সে মহীয়সী।

রঞ্জন মৃদুকণ্ঠে বললে, কিন্তু তোমাদের মাঝিটা কি ভাবছে বল তো?

রেণু বললে, জলিল? ও আবার কি ভাববে? আজ বিশ বছর এ বাড়িতে চাকরি ক'রে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছে, কিছু ভাববার মত মানুষ ও নয়।

সত্যিই সে কিছু ভেবেছে বা ভাবতে পারে ব'লে মনে করা গেল না। প্রশান্ত দৃষ্টিতে একবার এদিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে গুন টেনে চলল। রঞ্জনের এইটুকু সান্ত্বনা রইল যে, তার অক্ষমতাটা সে দেখতে পায় নি। নৌকো যখন বেতঝোপে ঢুকে পড়ে, সে তখন হিজলবনের আড়ালে ছিল।

রঞ্জন বললে, সত্যি, এবার সরো। আমি এখন বেশ ঠিক ক'রে নোব।

রেণু হেসে বললে, থাক, আর বীরত্ব দেখাতে হবে না তোমাকে। তুমি একটু চুপটি ক'রে ব'সে থাক তো লক্ষ্মীটি, নইলে তোমার ছবি-ওলা বিলিতী পত্রিকাটা বের ক'রে যা হয় একটা গল্প-টল্প পড়। তুমি পড়লে আমি অনেকটা বুঝতে পারি, যেটুকু না পারব, সেটুকু তুমি বাংলা ক'রে বুঝিয়ে দিও।

কিন্তু গল্প পড়া হ'ল না। বাইরের পৃথিবীকে আর কখনও এত মধুর এবং মনোরম ভাবে আস্বাদ করেছে ব'লে রঞ্জনের মনে পড়ল না।

রেণুর কাছে হার মানতে হয়েছে সত্যি, কিন্তু সেজন্যে এতটুকু পরাজয়ের বেদনা সে বোধ করলে না। বরং সমস্ত চিন্তার ওপর দিয়ে একটা কথাই বার বার ঘুরে যেতে লাগল, আজ এ না হ'লে পরস্পরের অনেকখানি পরিচয়ই পরস্পরের কাছে অজানা থেকে যেত।

ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই খালের আর একটা বাঁক এল। এখান থেকে নৌকো পাশের আর একটা ছোট-খালে নেমে পড়ল। কিন্তু এবার আর রেণুকে হাল ধরতে হ'ল না—জল এবার ওদের গতিপথের অনুকূলেই চলেছে। গুনের দড়ি গুটিয়ে জলিল স্বস্থানে ফিরে এল।

এতক্ষণে আবার কূজনালাপের নির্বিবাদ অবকাশ এল। রঞ্জন বললে, তোমার এ বিদ্যেটার কথা আগে জানতুম না কিন্তু।

রঞ্জনের সম্পর্কে রেণুর মনে বোধ হয় এক ধরনের সহানুভূতি এসেছিল। তার ডানহাতখানা নিয়ে সে অন্যমনস্কের মত নাড়াচাড়া করতে লাগল।

যাঃ, এ আবার একটা বিদ্যে! এ তো খুব সোজা, গাঁয়ের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েই এসব পারে। সত্যি, আর এক বছর পড়লে ঠিক ম্যাট্রিকটা পাস করতে পারতুম। আচ্ছা, তুমি আমাকে বাড়িতে পড়াবে?

রঞ্জন উত্তর দিলে না।

নৌকোর মন্থর প্রশান্ত গতি, তার ওপর দিয়েই দুপুরের অলস-রৌদ্র ম্লান হয়ে এল। প্রচুর বাতাস আর রেণুর স্নেহ-কোমল-স্পর্শ-মধুর উপস্থিতি, এর মধ্যেই কোন এক সময় রঞ্জনের চোখে ঘুম নেমে এসেছিল। যখন চমক ভাঙল, রেণু তখন আস্তে আস্তে ডাকছিল, এই ওঠ, ওঠ, এসে গেলুম যে।

ধড়মড় ক'রে সে উঠে বসল। খালের ধারে ধারে ততক্ষণে সুপারি বন আর তার আড়ালে আড়ালে টিনের চালা চোখে পড়ছে বাঁড়ুজ্জেদের বাঁধা ঘাটের সামনে এসে যখন ডিঙি থামল, তখন বিকেলের রাঙা আলো খালের জলে কচুরি-পানার বেগুনী ফুলের চূড়োয় চূড়োয় ঝিকমিক করছিল।

ঘাটের ওপরেই ঠিক বাড়িটা নয়,—পরপর তিনখানা বাগান পেরি

তারপর বাঁড়ুজ্জেদের চকমিলান চণ্ডীমণ্ডপ। জলিল বললে, নামুন দিদিমণি।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে এবং চপলতায় রেণু অপরূপ হয়ে উঠেছে। রেণু বললে, তুই যা, খবর দিয়ে আয় আগে। কেউ নিতে না এলে গিয়ে উঠব, কুকুর নাকি আমরা!

জলিল সহাস্যে বললে, আচ্ছা।

কলকাতার ধূলি-ধূসরতার বাইরে এসে মুক্তির যে আনন্দে রেণুর মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সে আনন্দ এই মুহূর্তে বোধ হয় একটু মাত্রাহীন হয়ে পড়েছিল। দুষ্টু কৌতুকের আলোয় রেণুর কালো চোখ জলজল ক'রে উঠল। রঞ্জন ততক্ষণে নৌকোর পেছনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক ক'রে নিচ্ছে, এ অবস্থায় এ প্রসাধনটুকু অপরিহার্য।

রেণু বললে, দেখবে, তোমাকে একটু জব্দ করব?

রঞ্জন চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, কি জব্দ করবে আবার?

প্রশ্ন করতে দেরি আছে, উত্তর দিতে নেই। ঠিক সেই মুহূর্তেই ছোট্ট ডিঙ্গিতে প্রচণ্ড একটা দোলা লাগল এবং চুলের মধ্যে চিরুনি চালাতে চালাতেই মিষ্টি একটা খিলখিল হাসির সঙ্গে রঞ্জন জলে প'ড়ে গেল।

শরতের জোয়ারে খাল কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে, যেখানে সে পড়ল, জল সেখানে মাথার ওপর। রেণুর কাছে সুইমিং ক্লাব কিংবা রোয়িংয়ের যত গল্পই সে করুক, সাঁতারটা ভাল জানা ছিল না। দুর্ভাগ্য আবার একাও আসে না। সময় বুঝেই আটচল্লিশ বহরের কোঁচা তার পায়ে জড়িয়ে গেল এবং—

এবং পরক্ষণেই রঞ্জন টের পেলে, সে ডুবে যাচ্ছে। আঁকুপাঁকু ক'রে

ওঠবার যত চেষ্টাই করে, তীরের থেকে সে ততই আরও দূরে স'রে যায়।

তৎক্ষণাৎ ঝপাং ক'রে একটা শব্দ কানে এল এবং তারপরেই চুড়ি-ওয়ালা দুখানা কোমল হাত তাকে আঁকড়ে ধরল। গ্রামের মেয়ের হাত, তাই কেবল ললিত-লবঙ্গলতাই নয়, রীতিমত যে শক্তি রাখে তারও পরিচয় পেতে দেরি হ'ল না। জড়াজড়ি করতে করতে রেণু তাকে বুক-জলে ঘাটের সিঁড়ির ওপর এনে ফেললে।

হাঁপাতে হাঁপাতে রেণু বললে, সত্যি, ওখানে যে অত জল, তা আমি বুঝতে পারি নি। হাসতে হাসতে এখুনি কান্নার জো ক'রে নিয়েছিলুম। তা ছাড়া এই বা কেমন ক'রে জানব যে, দু বছর আহিরীটোলা রোয়িং আর সুইমিং ক্লাবের মেম্বার থেকেও তুমি ভাল ক'রে সাঁতারটা অবধি শেখ নি?

রঞ্জন সে কথার উত্তর দেবার আগেই দেখা গেল, সুপুরি-বাগানের ভেতর দিয়ে মেয়ে-পুরুষে প্রায় তিরিশজন কলকণ্ঠে তাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে আসছে।

রেণু লজ্জায় লাল হয়ে বললে, এখন কি ক'রে এইভাবে ওদের সামনে জল থেকে উঠব বল তো?

রাত্রে শোওয়ার সময় রেণু বললে, তোমার সেই বিলিতী পত্রিকাটা কোথায় গেল? মেম-সায়েবদের ছবিগুলো একটু দেখাও না।

রঞ্জন তাকে কাছে টেনে এনে বললে, সেটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তরবারি

যায় যাক সব যাক, উড়ে পুড়ে হোক খাক
সামলিয়ে পারি নেকো চলতে—
ফাঁকা নয় শুধু ঘর, থাঁথাঁ-করা এ শহর
ফুঁ দিয়ে নেবায় মন-পলতে।
কি দোষ করেছি মোরা দেবতা,
বলি চাও, যাহা চাও দেব তা;
যাহা নেবে নাও নাও, রবে যা তা রেখে দাও,
বিচারের মোহজালে পারি না যে প্রতিদিন
মনে মনে আপনারে ছলতে।

মানুষ করেছে পাপ, দেবতার অভিশাপ
নেমে আসে মানুষের স্কন্ধে,
যাহা ছিল ফুলহার, হয় হোক তরবার,
শির পাতি লব মহানন্দে।
শোণিতে হউক পূত ধরণী,
মৃত্যুই জগতের সরণি—
তুমিই ভুলায়ে রাখো, ফুলসাজে অসি ঢাকো
যূপকাষ্ঠের বলি তাহারে শঙ্কাহীন
কর বহু ছলনা-প্রবন্ধে।

হান তরবারি তব, সে আঘাত বুকে লব,
শুধু রাখিও না দ্বিধাগ্রস্ত,
প্রলয়-পরশ লাগি কত বল আর জাগি—
কভু নির্ভয় কভু ত্রস্ত!
হে দেবতা, ক্রূর তব কুঠারে
করায়ো না বৃথা নামা-উঠা রে—
মৃত্যুর মুখামুখি পারি যেতে তাল ঠুকি
তূর্য্যের ধ্বনি কর, বাজায়ো না মৃদুবীণ
বিপন্নে করি আশ্বস্ত।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ আচার্য্য

সরোজিনী

১

পরের দিন সন্ধ্যার পরে মনু চক্রবর্ত্তী আসিয়া হাজির হইল। হাঁকিয়া কহিল, মাস্টার আছ নাকি?

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া কহিলাম, কি ব্যাপার? এত হাঁকাহাঁকি করছ কেন?

মণীন্দ্র কপাল কুঁচকাইয়া কহিল, কেন? কাউকে ভয় করি নাকি?

কহিলাম, তুমি হয়তো কর না, আমাকে তো করতে হয়। ঘরে এসে ব'স, যা বলবার বল এখানে।

কঠোর কণ্ঠে মণীন্দ্র কহিল, দেখ মাস্টার, ডুগড়ের চ্যাং-লোকগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না; এত ভয় তো কাল রাতদুপুরে সলা-পরামর্শ করতে গিয়েছিলে কেন?

শুনুন দেখি কথা! যেন আমি আমার নিজের গরজে সাধিয়া যাচিয়া গিয়াছিলাম।

কড়া গলায় কহিলাম, দেখ, মনুদা! বোকার মত যা-তা ব'লো না।

মনু দমিয়া গিয়া আহত স্বরে কহিল, আমি বোকা! এতবড় জমিদারি চালাচ্ছি—

খুব চালাচ্ছ তুমি! ভাগ্যে দারোগাবাবু আর আজিজ সাহেব ব'লে-ক'য়ে দিচ্ছে।—বলিতে বলিতে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। মনু পিছুপিছু আসিয়া কাঁধে হাত দিয়া কহিল, মা কালীর দিব্যি বলছি, দারোগা-বাবুদের কিছু করতে হয় না, সব আমি একাই করি।

বসিয়া কহিলাম, ভাল কথা। দারোগাবাবুকে তাই বলব।

মনু ভয় পাইয়া কহিল, দারোগাবাবুকে কি আবার বলতে যাবে?

বলব, তুমি বলেছ, দারোগাবাবু কিছু করে নি, তুমি একাই সব করছ।

মন্নু ঢোঁক গিলিয়া কহিল, হ্যাঁ, তাই তো। দারোগাবাবুরা প্রথমে সবাইকে ডেকে ব'লে দিয়েছিলেন, তারপর তো যাঁবামাত্র সব বাকি-বকেয়া মিটিয়ে দিচ্ছে, ওঁদের তো আর কিছু বলতে হয় নি।

তা হ'লে দারোগাবাবু কিছু করে নি বলছ কেন?

মন্নু ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, বাঃ রে! তা আবার কখন বললাম? আর যদি মনের ভুলে কিছু ব'লেই ফেলেছি, তা দারোগাবাবুকে বলতে যাবার কি দরকার? তুমিও দেখছি, হেরো-রেধোর জুড়ি হচ্ছ দিন দিন। চুপ করিয়া রহিলাম। আমার হাঁটুর উপর হাত দিয়া কহিল, দেখ ভায়া, গাঁয়ের মধ্যে তোমাকেই আপনার লোক ব'লে জানি; তাই মনের কথা সব খুলে বলি তোমাকে। তুমি যদি আবার তাই ঢাক পেটাতে থাক, তা হ'লে তো কথাবার্ত্তা বন্ধ ক'রে পেট ফেঁপে মরা ছাড়া উপায় থাকে না। ঢোক গিলিয়া কহিল, তার ওপর দারোগাবাবু সম্প্রতি যেন একটু খিঁচড়ে যাচ্ছে ব'লে মনে হয়।

প্রশ্ন করিলাম, কারণ?

মণীন্দ্র কহিল, কারণ একটু আছে।

প্রশ্ন করিলে মণীন্দ্রের দর বাড়িয়া যাইবে, সহজে বলিতে চাহিবে না। কাজেই অন্যমনস্কের মত বসিয়া রহিলাম। মণীন্দ্র একটু ঘেঁষিয়া আসিয়া নীচু গলায় কহিল, কারণ শুনবে তবে? আর একটু কাছে এস, কাউকে ব'ল না, মায় বউমাকে পর্য্যন্ত না। মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মণীন্দ্র ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, যা যেখানে পাওনা ছিল, প্রায় সব আদায় হয়ে গেছে; তাই সরোজিনী বললে, দারোগা-বাবুকে পান খাবার জন্যে কিছু দেওয়া দরকার। তাই সেদিন একটা একশো টাকার নম্বরী নোট নিয়ে দারোগাবাবুকে দিতে গেলাম। দারোগাবাবু নিতে চাইলে না, বললে, পাগল হয়েছেন নাকি! কি এমন করেছি যে, এসব হাঙ্গামা করছেন। আপনার বোনের হাতে একদিন খাইয়ে দেবেন, তা হ'লেই হবে।

কহিলাম, বেশ ভাল কথাই তো বলেছেন।

মণীন্দ্র গরম হইয়া উঠিয়া কহিল, বেশ ভাল কথা বলেছেন?—বলিয়া ঘাড়টা কাত করিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ কটমট করিয়া তাকাইয়া

রহিল; তারপর ঘাড়টা সোজা করিয়া বার দুই লম্বভাবে নাড়িয়া কহিল, মাস্টারী বুদ্ধি কিনা! বামুনের বিধবা হয়ে একটা মেলেচ্ছকে বাড়িতে বসিয়ে খাওয়াবে? জাত-জন্ম রসাতলে যাবে না?

কহিলাম, এখন আর তাতে দোষ কি? শুভদৃষ্টি—.

মণীন্দ্র খ্যাঁক করিয়া উঠিল, কি?

মানে চোখোচোখি তো হয়ে গেছে?

মণীন্দ্র কহিল, মানে?

সরোজিনী দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে থানায় গিয়েছিল না?

মণীন্দ্র ঠাণ্ডা হইয়া কহিল, গিয়েছিল তো।

তবে তাঁকে বাড়িতে এনে খাওয়াবার দোষ কি? তাতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন, একশোটা টাকাও বেঁচে যাবে।

মণীন্দ্র কহিল, সত্যি বলছ, দোষ নেই?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, দোষ নাই।

মণীন্দ্র অনেকক্ষণ কপাল কুঁচকাইয়া, চোখ দুটা ছোট করিয়া, নাক চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিয়া কহিল, সরোজিনীকে একটু ব'লে দিতে পার?

কহিলাম, পাগল নাকি? আমি আবার কি বলতে যাব! তুমি বল গিয়ে।

মণীন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিল, তুমি বল গিয়ে! আমি বললে শুনবে? তা ছাড়া—। বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

তা ছাড়া কি?

মণীন্দ্র মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, টাকাটা তো আর ফেরত দেওয়া হয় নি, সব খরচ হয়ে গেছে।

বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, দারোগাবাবু যে টাকা নেন নি, তা বলেছ ওকে?

মণীন্দ্র মুদ্রিত চক্ষে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তারপর চোখ খুলিয়া কহিল, ওদিকে দারোগাবাবু তাগাদা দিচ্ছে দেখা হ'লেই। কাল মনে হ'ল, একটু চটেছে।

মণীন্দ্র রাগিয়া উঠিয়া কহিল, চটবে কেন? কেউ যদি তার বোনকে যার তার সামনে বার না করে, তাতে চটবার কি আছে? চুপ করিয়া রহিলাম। মণীন্দ্র কহিল, চুপ ক'রে রইলে যে, জবাব দাও?

কহিলাম, জবাব কি দোব? বরাবর সাচ্চা থাকলে তো তোমার কথাই সত্যি। তবে তখন এক রকম, এখন আর এক রকম করলেই তো গোলমাল কিনা। তা ছাড়া তোমার নিজের গলদ রয়েছে।

মণীন্দ্র অনুযোগের স্বরে কহিল, গলদ তো আমার সবটাই, তোমরা আর কখন আমার ভালটা দেখ! কিন্তু কি করা যায়, একটা পরামর্শ দিতে পার?

কহিলাম, আমার কথায় কাজ হবে না, তিনকড়িকে ধর গিয়ে।

মণীন্দ্র কহিল, ঠিক বলেছ, তিনকড়িকেই ধরিগে, ওর সঙ্গেই আজকাল খুব দহরম-মহরম, রাতদিন গুজগাজ। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কি পরামর্শ হ'ল কাল—অ্যাঁ?

কহিলাম, তুমি জান না?

ঘাড় নাড়িয়া মণীন্দ্র কহিল, জানি, জানি, সব জানি। আমার কি কিছু অজানা থাকে? একটু বেয়াড়া রকমের নিশ্বাস ফেললেও আমার কাছে খবর আসে।

কহিলাম, বল কি? গোয়েন্দা রেখেছ নাকি?

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে, মণীন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হুঁ।

প্রশ্ন করিলাম, কে?

মণীন্দ্র নাক উঠাইয়া কহিল, বলব কেন?

চুপ করিয়া রহিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, ফুল্টি সব বলেছে আমাকে। পয়সা সস্তা হয়েছে কিনা! তা বই কেনবার টাকাটা কাকে দেওয়া হচ্ছে শুনি?

কহিলাম, তিনকড়ির হাতে। ওই বই কিনে নিয়ে আসবে। আঁতকাইয়া উঠিয়া মণীন্দ্র কহিল, পাগল হয়েছে নাকি! একসঙ্গে দশটা টাকা যে চোখে দেখে নি, তার হাতে অতগুলো টাকা! একেবারে হজম ক'রে দেবে। বলিয়া মুখ হাঁ করিয়া—হাত দিয়া খাইবার ভঙ্গি

করিয়া, চোখ ও মুখ বুজিয়া গিলিবার ভঙ্গি করিল। কহিলাম, তা ছাড়া কে আর কিনতে যাবে, আমার সময় নেই।

ছুই চোখ চাড়াইয়া মণীন্দ্র কহিল, কেন, আমি?

কহিলাম, বেশ, তুমিও যেও। বই কি কি কিনতে হবে, আমি লিস্ট ক'রে দোব। দারোগাবাবুর টাকার মত যে গাফ ক'রে দেবে, তা হবে না।

মণীন্দ্র মর্ম্মাহত হইয়া কহিল, তুমিও ঐ কথা বলছ! মেলেচ্ছের নামে টাক্কা বামুনের বাক্সে তুলতে নেই, তাই নিয়েছি। না হ'লে সাধারণের টাকা আমি নিতে পারি? হাতে যে কুঠ হবে।—বলিয়া ছুই হাতের আঙুল প্রসারিত করিয়া ছুমড়াইয়া দিল।

হাসিয়া কহিলাম, তুমি কি বামুন নও নাকি, তুমি তুললে কি ক'রে?

পাগল! আমি তুলতে পারি? মেলেচ্ছের টাকা মেলেচ্ছকেই দিয়েছি—

বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, সে কি!

ঐ যে বুড়ো কাবলীওয়ালা, ওর কাছে ধার করেছিলুম আর বছর, তা বেটার চোখের চামড়া মোটেই নেই কিনা, তাগাদার চোটে একেবারে অস্থির ক'রে দিয়েছিল। সেই একশোটা টাকা বেটা কাবলী-ওয়ালার কবলেই দিলাম। কিন্তু দেখো, এসব কথা যেন সরোজিনীকে বলতে যেও না। তা হ'লে তোমার সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দোব বলছি।

যেন তাহার মুখদর্শন করিবার জন্য দিবারাত্র ছটফট করিয়া মরিয়া যাইতেছি! কহিলাম, পাগল হয়েছ নাকি!

ঘাড় নাড়িয়া কড়া গলায় মণীন্দ্র কহিল, ঠাট্টা নয়, সত্যি! সাবধান ক'রে দিচ্ছি। মনু চক্রবর্ত্তীকে জান তো—এক কথা, পাহাড় টলে, তবু মনুর কথা টলে না।—বলিয়া ঘাড়টি ঘন ঘন নাড়িতে লাগিল।

১০

দিন চার পরে সন্ধ্যাবেলায় গাঙুলী মশায়ের বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলাম, মস্তবড় এক মজলিস বসিয়া গিয়াছে। গাঙুলী মশায়, হারাণ,

রাধানাথ, দোলগোবিন্দ, আরও জনকয়েক পাড়ার লোক, এবং সকলের মাঝখানে বসিয়া আর একজন, যাহাকে ইহার পূর্ব্বে আমি সজ্ঞানে কোন দিন আমাদের গ্রামে দেখি নাই। ইহার বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে, দেহ শীর্ণ ও লম্বা, মুখে মাংস বলিতে কিছুই নাই, হাড়ের উপর কোনমতে চামড়া দিয়া ঢাকা; গাল দুইটিতে গভীর গর্ত্ত, চোখ দুইটি কোটরস্থ; নাকটি খাঁড়ার মত উঁচু ও চিলের ঠোঁটের মত বাঁকা; মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া চারিদিকে সমানভাবে ছাঁটা; মাথার ঠিক মধ্যস্থলে কুকুরের অর্দ্ধকর্ত্তিত লেজের মত খাটো ও খাড়া টিকি। পরিধানে পাড়হীন ধুতি ও কেটের গলাবন্ধ কোট, এই ভ্যাপসা গরমেও গায়ে চাপাইয়া রাখিয়াছে। দরজার বাহিরে কর্দ্দমভারাক্রান্ত দেশী জুতা জোড়াটি যে ইহারই, তাহা বুঝিলাম; কারণ অন্য কেহ জুতা পরিয়া আসে নাই। ভদ্রলোক চাপিয়া বসিয়া আছে, হাতে হুঁকা। রাধানাথ পাশে বসিয়া একটি কলিকায় ফুঁ দিতেছে।

আমাকে দেখিয়া গাঙুলী মশায় অভ্যাসমত কহিলেন, এস ভায়া।—বলিয়া তাঁহার পাশে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

হারাণ মুচকি হাসিয়া কহিল, মাস্টার যে! এদিকের রাস্তাটা ভুলেই গেলে দেখছি।

রাধানাথ কলিকাটি হুঁকার মাথায় চাপাইয়া দিয়া কহিল, রাত দিন পরামর্শ দিতে দিতে সময় পায় না বেচারা।

অপরিচিত ভদ্রলোক দুই ভ্রূ নাচাইয়া প্রশ্ন করিল, কে?

গাঙুলী মশায় কহিলেন, আমাদের গাঁয়ের এম. এ. পাস, গাঁয়ের স্কুলের হেডমাস্টার।

অপরিচিত ব্যক্তি হুঁকায় প্রাণপণে টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল, এম. এ. পাসের কথা আর বলবেন না, রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে আজকাল, আমাদের গাঁয়েই পাঁচ পাঁচ জন।—বলিয়া বাঁ হাতের পাঁচটি আঙুল প্রসারিত করিল।

চুপ করিয়া রহিলাম, আমার দিকে তাকাইয়া ভদ্রলোকটি স্বাভাবিক কর্কশ স্বরে কহিল, পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে পচছ কেন? চাকরি-বাকরি আর জোটে নি?

বিনীতভাবে কহিলাম, আজ্ঞে না। হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিলাম, একটা জুটিয়ে দিতে পারেন ?

ভদ্রলোক কহিলেন, কি? চাকরি? ঘাড়টি কাত করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুইটি বুজিয়া কহিল, পারি।

হারাণ কহিল, ওঁকে যে-সে লোক মনে ক'রো না। ঝাকড়দা স্কুলের ফিফ্থ মাস্টার। কত জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ওঁর হাত দিয়ে পেরিয়ে গেছে।

ভদ্রলোক প্রসন্ন হাসি হাসিয়া কহিল, সত্যি। বিদেশে বেরোবার জো নেই, তুপাশাড়ি সব লটলট মাথা নামাচ্ছে। কেউ কেউ আবার পায়ের নীচে গড়াগড়ি। সেবার দেখুন না, কোথায় যাচ্ছিলাম, কি কাজে পানাগড় ইষ্টিশানে যেমনই নেমেছি, দেখি কোট-প্যাণ্ট-টুপি-পরা একজন বাঙালী সাহেব এসে পায়ের কাছে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের ওপরেই লুটিয়ে পড়ল। শশব্যস্ত হয়ে বললাম, কে, কে? উঠে দাঁড়াতেই দেখি, আমার ছাত্র গদাধর, ঐ ইষ্টিশানের মাস্টার। তারপর কি টানাটানি! একটু পায়ের ধূলো দিতেই হবে। বললাম, আরে, তা কি হয়! মোটে দু মিনিট গাড়ি দাঁড়ায়। গদাই বললে, তার জন্যে আপনার চিন্তা নেই। আমি না হুকুম দিলে গাড়ি ছাড়বার সাধ্য কি? তারপর ইষ্টিশানের ভেতরে নিয়ে গিয়ে, বসিয়ে খাবার-দাবার খাইয়ে যখন ছাড়লে, তখন প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। ভ্রূ দুইটি যুক্ত করিয়া রাধানাথের দিকে চাহিয়া, ঘাড় নাড়িয়া কহিল, মনে কর, শুধু আমারই জন্যে গাড়ি আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল। গাড়িসুদ্ধু লোক অবাক। এ লাট-সাহেবের খাতির তো!

গাঙুলী মহাশয় কহিলেন, সত্যি। স্কুল-মাস্টারদের মত খাতির কারও নেই। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পর্য্যন্ত মাথা নোয়ায়। আমাদের মাস্টারেরই দেখুন না; ও জুরি না হ'লে জজ-সাহেবের পছন্দই হয় না।

রাধানাথ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, কার সঙ্গে কি! বদনগঞ্জ, আর ঝাকড়দা! কতবড় স্কুল ঝাকড়দার! নিজের চোখে তো দেখে এলাম।

ভদ্রলোক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সত্যি। অতবড় স্কুল প্রায় দেখা

যায় না। আমার হাতে গড়া স্কুল তো। হেডমাস্টার পর্য্যন্ত মুখের সামনে কথা কইতে পারে না।

দোলগোবিন্দ আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, ভায়া বোধ হয় ওঁকে চিনতে পারছ না? উনি প্রবোধ গাঙুলীর মামা। ওঁকে তোমরা দেখ নি। আজকাল তো আসা-যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন; আগে প্রায়ই আসতেন।

ভদ্রলোক কহিল, কতবার। দোলগোবিন্দর দিকে চোখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, কত ফুর্ত্তি করা গেছে তখন। কি সব দিনই গেছে!

সত্যি।—বলিয়া দোলগোবিন্দ সেই টানেই কাসিতে শুরু করিল।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, প্রবোধের স্ত্রী ম্লেচ্ছ নিয়ে যা কাণ্ড-কারখানা করছে, তাতে তো তার সঙ্গে জাত-জন্ম বাঁচিয়ে কোন বামুনের বিধবার বাস করা চলে না। তাই উনি ওঁর দিদিকে নিয়ে যেতে এসেছেন।

প্রশ্ন করিলাম, উনি খবর পেলেন কি ক'রে?

রাধানাথ ধমক দিয়া কহিল, তা তোমার জানবার কি দরকার?

তাহাকে উপেক্ষা করিয়া গাঙুলী মশায়ের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, রাধানাথ নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে।

রাধানাথ কহিল, কে খবর দিয়েছে, কে নিয়ে এসেছে, ওসব আলোচনার দরকার কি? প্রবোধ গাঙুলীর স্ত্রী যে দারোগার সঙ্গে মাখামাখি করছে, তা কি কেউ জানে না, না দেখে নি? পেটে খাবার লোভে অনেকের তা মনে পড়তে না পারে, কিন্তু যাদের সমাজের ওপর সত্যিকার দরদ আছে, দুপাতা ইংরিজী প'ড়ে যারা মেলেচ্ছ ব'নে যায় নি, তারা তা সহ্য করতে পারবে না।—বলিয়া ড্যাবডেবে চোখ দুইটার জ্বলন্ত দৃষ্টি, কলিকাতার রাস্তায় হোস-পাইপ হইতে যেমন করিয়া জল ছড়ায়, ঠিক তেমনই ভাবে সারা মজলিসের লোকগুলার উপরে বুলাইয়া দিল।

হারাণ উচ্চকণ্ঠে কহিল, নিশ্চয়। বিষবৃক্ষ তো কেটে ফেলতেই হবে। তা ছাড়া আশেপাশে যারা আছে, তাদেরও বাদ দিলে চলবে না।—বলিয়া আমার দিকে কটাক্ষ করিল।

ইহা যে আমাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইল, তাহা বুঝিলাম। তবু না বুঝিবার ভান করিয়া কহিলাম, নিশ্চয়। তাই তো করা উচিত। কিন্তু যারা কাটতে যাবে, তারাও যেন নিজেরা একটু সাবধান থাকে, কারণ—

রাধানাথ ও হারাণ একসঙ্গে ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, কি কারণ?

গাঙুলী মশায় আমাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, থাম ভায়া। হারাণকে কহিলেন, তুমি থাম দেখি। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি ক'রো না। শুভকার্য্যের গোড়াতেই যদি এই গোলমাল হয় তো কোন কাজই হবে না। এখন সবাই মিলে পরামর্শ কর দেখি, কি ক'রে বুড়ীকে ঘর থেকে আনা যায়!

প্রবোধ গাঙুলীর মামা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক কথাই বলেছেন, বাজে কথায় সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি? একটা সংসারে সব লোক সমান হয় না, তা এ তো একটা সমাজ, কেউ ভাল, কেউ মন্দ। যারা সমাজের মাথা, তাদের সব সামলে, সকলকে ভাল পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।—বলিয়া হুঁকায় মুখ দিয়া মৃদু মৃদু টানিতে লাগিলেন।

রাধানাথ কহিল, সত্যিই তো! কার সঙ্গে কার তুলনা! শুনছ সব, কেমন দামী দামী কথা! একেই বলে—মাস্টার। না হ'লে যত সব—। বলিয়া আমার দিকে একটি দৃষ্টিশেল নিক্ষেপ করিল।

মাতুল মৃদু হাসিয়া কহিল, এ তো সাধারণ কথা। মাঝে মাঝে এক-একটা এমন কথা বলি, শুনে বড় বড় হাকিম পর্য্যন্ত হাঁ ক'রে থাকে, থই পায় না।

হারাণ কহিল, সত্যি, এই যা বলেছেন, তাই কি সবাই বুঝতে পেরেছে? ঐ মাথার চামড়া পর্য্যন্ত, ভেতরে আর ঢোকে নি।

গাঙুলী মশায় কথাটা চাপা দিবার জন্য কহিলেন, তা হ'লে কি করা যাবে? মাতুলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আপনি নিজে গিয়ে দেখা করবেন?

মাতুল ঘন ঘন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, পাগল! ও ম্লেচ্ছানীর বাড়িতে আমি পা দিই! আপনারা আমার কাছে দিদিকে পৌঁছে দিন, তারপর যা করবার আমি করব।

রাধানাথ সায় দিয়া কহিল, ঠিক তাই। আমাদের হাতে একবার পেলে, তার পরের ব্যবস্থা করবার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না।

গাঙ্গুলী মশায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাধানাথের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, হাতে এনে দেবে কে? তুমিই যাও না।

রাধানাথ কহিল, আমার দ্বারা হবে না, এমনই তো আমার ওপর হাড়ে চ'টে আছে।

হারাণ কহিল, তা হ'লে মাস্টার চল, আমি বরং সঙ্গে যাচ্ছি।

সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল, সেই ভাল।

রাধানাথ ভ্রূ নাচাইয়া কহিল, তাই যাও হে। খুব তো ভাব দুজনে, বুঝিয়ে-শুঝিয়ে আনতে পারবে; তা ছাড়া একবার দেখাও হয়ে যাবে।

কহিলাম, না না। এসবের মধ্যে আমাকে টানবেন না।

রাধানাথ খ্যাঁক করিয়া উঠিল, মানে? সমাজে বাস কর না তুমি? এম. এ. পাস ক'রে হেড-মাস্টারি কর ব'লে কেউ তোমাকে রেয়াত করবে না; না যাও তো সামাজিক শাস্তি হবে।

গাঙ্গুলী মশায়ের দিকে তাকাইলাম, তিনি কোন প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বুঝিলাম, সরোজিনীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতার জন্য ইঁহার মনেও আমার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব জমিয়া উঠিতেছে; সকলে যদি আমাকে সামাজিক শাস্তি দিবার সিদ্ধান্ত করে, তাহা হইলে ইনিও সায় দিতে ইতস্তত করিবেন না। ইহাই সমাজ। সমাজের সাধারণ ব্যক্তিদের কোন নিজস্ব মত ও পথ নাই; জনকয়েক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জোট বাঁধিয়া যে পথ স্থির করে, বাকি সকলে ভেড়ার মত দল বাঁধিয়া সেই পথে তাহাদের পাছু পাছু চলিতে থাকে। কেহ যদি নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনা মত ভিন্নপথে চলিবার চেষ্টা করে, সকলে টানাটানি করিয়া তাড়না করিয়া, নিজেদের পথে আনিতে চেষ্টা করে; আনিতে না পারিলে তাহাকে একেবারে সমাজ-দেহ হইতে ছাঁটিয়া বাদ দেয়।

যাইতেই হইল। কিন্তু হারাণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। আর তো কেহ এ প্রস্তাব করে নাই! তাঁহারই মাথায় এই দুর্বুদ্ধি জাগিয়াছে। কাজেই তাহাকে পিছনে ফেলিয়া, লম্বা চালে

চলিতে লাগিলাম। হারাণ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া, সঙ্গ লইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, মাস্টারের যে আর তর সইছে না দেখছি! চুপ করিয়া চলিতে লাগিলাম। হারাণ কহিল, চন্দ্রবদন দেখবার জন্যে যে একেবারে ঘোড়দৌড় শুরু করেছ! থমকিয়া দাঁড়াইলাম। হারাণ আঁতকাইয়া উঠিয়া কাহিল, কি হে, সাপ নাকি?

কহিলাম, না। কিন্তু কোন ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে যা-তা বলতে তোমার লজ্জা হয় না? তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া হারাণ কহিল, ভদ্রমহিলা! দারোগা, কনেস্টবল থেকে আরম্ভ ক'রে গাঁয়ের ছেলে-ছোকরাগুলোর সঙ্গে পর্য্যন্ত—। বাধা দিয়া কহিলাম, দেখ হারাণ, তুমি একটি আস্ত পশু। আমি যাব না।—বলিয়া ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হারাণ খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, মাইরি আর কি! কেবল পালিয়ে যাবার মতলব! তোমাকে না নিয়ে আমি যাচ্ছি না।

রাগতস্বরে কহিলাম, ছেড়ে দাও আমাকে। তোমার সঙ্গে আমি তার কাছে যেতে পারব না। তোমার মুখের ঠিক নেই; হয়তো যা-তা ব'লে তাকে অপমান ক'রে বসবে। আর সে ভাববে, আমি তাকে অপমান করাবার জন্যে তোমাকে নিয়ে গেছি।

হারাণ মুচকি হাসিয়া কহিল, ভাবলেই বা হে! একটানা প্রেম কি ভাল? মাঝে-মাঝে রাগ-অভিমান না থাকলে প্রেমের কোন স্বাদ থাকে না। দুই বার বিবাহ করিয়া হারাণ প্রেমশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি। কঠোরকণ্ঠে কহিলাম, আবার ঐসব কথা! ছেড়ে দাও আমার হাত, ছেড়ে দাও। হারাণ আমাকে জাপটাইয়া ধরিয়া কহিল, আরে পাগল নাকি! কি আর বলেছি যে, এত রাগ! মাস্টার মানুষ কিনা, তাতেই; আমাকে বললে তো আমি সন্দেশ খাওয়াতাম।

হঠাৎ হাতকয়েক দূর হইতে টর্চের আলো গায়ে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ হিন্দুস্থানী গলায় প্রশ্ন হইল, কে মারামারি করছ? হারাণ আমাকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। হিন্দুস্থানী লোকটা ডবল মার্চ করিয়া কাছে আসিয়া টর্চের আলো আমার মুখে ফেলিয়া বিস্মিতস্বরে কহিল, মাস্টারবাবু! আপনাকে মারছে এই লোকটা?—বলিয়া তাড়িয়া যাইতেই হারাণ কহিল, কনেস্টবল-সাহেব, আমি হারাণ।

অনতিবিলম্বে যিনি আসিয়া হাজির হইলেন, তিনি স্বয়ং দারোগাবাবু। লজ্জিত হইয়া উঠিলাম, হারাণও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দারোগাবাবু কহিলেন, আরে! মাস্টারমশায় যে! কন্‌স্টেব্‌লটা তখন হারাণের সামনে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে; দারোগাবাবু তাহাকে সামলাইবার জন্য কহিলেন, এই লছমন সিং, থাম। হারাণকে কহিলেন, হারাণবাবু কি মাস্টারমশায়ের সঙ্গে মারামারি করছিলেন নাকি? কি ব্যাপার? আপনারা গাঁয়ে দেখি যা-তা করতে আরম্ভ করেছেন।

হারাণ শঙ্কিতভাবে কহিল, আজ্ঞে না হুজুর। আমি মাস্টারকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

কোথায়?

আজ্ঞে, ওর বাড়িতে।

তা, এত জাপটা-জাপটি করছিলেন কেন? মাস্টারমশায় তো আর কচি খোকা নন যে, কোলে তুলে নিয়ে যেতে হবে!

হারাণ কহিল, যেতে চাচ্ছিল না যে।

আমার দিকে তাকাইয়া দারোগাবাবু বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন, বাড়ি যাবেন না কেন?

কহিলাম, আজ্ঞে তা নয়, তা নয়। ওর সমস্ত—

হারাণ বাধা দিয়া কহিল, বাড়িতে ঝগড়া করেছে।

কহিলাম, মিথ্যে কথা।

হারাণ আমার কথা চাপা দিয়া কহিল, ওর বউ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে এখনই বললে, যেমন ক'রে হোক ওঁকে ধ'রে নিয়ে এস।

দারোগাবাবু সহাস্যে কহিলেন, মাস্টারমশায়ের তো কপাল ভাল। দেখছি, রাগ করলে এখনও ডাকায়। আমাদের তো ফিরেই তাকায় না।

কন্‌স্টেব্‌লটা হাসিতে হাসিতে বলিল, আমাদের তো হুজুর, বাপের বাড়ি চ'লে যায়। উল্টে রাগ ভাঙাতে জান হয়রান।

দারোগাবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, চলুন।

চলিতে চলিতে বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলাম, কোথায় চলেছেন?

দারোগাবাবু কহিলেন, মণীন্দ্রবাবু নিমন্ত্রণ করেছেন। অনেকদিন থেকেই বলছিলেন, আজকাল শরীরে এসব সহ্য হয় না ব'লে রাজি

হই নি। আজ তাঁর বোন নিজের হাতে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করলেন; ভদ্রমহিলার অনুরোধ না রাখা তো অত্যন্ত অভদ্রতা, কি বলুন?

হারাণ কনুই দিয়া গুঁতা মারিল; সামলাইয়া লইয়া কহিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। তা ছাড়া আপনি তাদের যা উপকার করেছেন, তাতে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়ানো শুধু নয়; আপনার পায়ের কাছে প'ড়ে থাকা উচিত। আপনি না থাকলে—

দারোগাবাবু বিনয়সহকারে কহিলেন, ছিঃ, ওসব কথা বলবেন না। কি আর আমি বেশি করেছি? গ্রামের লোকের বিপদে-আপদে সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্য যে।

চলিতে লাগিলাম। দারোগাবাবু হঠাৎ কহিলেন, আপনাদের গ্রামটা কিন্তু ভাল নয়। আমি সাহায্য করেছি ব'লে গাঁয়ের লোক নাকি মণীন্দ্রবাবু আর তাঁর বোনকে বয়কট করেছে।

কহিলাম, আমি তো এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না, হারাণকে জিজ্ঞাসা করুন।

হারাণ সন্ত্রস্তভাবে কহিল, আজ্ঞে, আমিও কিছুই জানি না, আমাদের রাধানাথ—

দারোগাবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, জানেন বইকি হারাণবাবু। মীটিং করেছেন, বোনকে বাড়ি পাঠিয়ে অপমান করিয়েছেন, সম্পত্তি নেবার জন্যে এক মামা আমদানি করেছেন।

হারাণ আর্ত্তকণ্ঠে কহিল, আজ্ঞে, আমি কিছুই জানি না, মা কালীর দিব্যি বলছি।

লছমন সিং কড়া গলায় হাসিয়া উঠিয়া কহিল, হারাণবাবু সব জানেন।

প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, বাড়ির সামনে মণীন্দ্র লণ্ঠন হাতে দাঁড়াইয়া আছে, পাশে তিনকড়ি। মণীন্দ্র কতকটা আগাইয়া আসিয়া কৃতার্থম্মন্যতার হাসি হাসিয়া কহিল, আসুন আসুন। সরোজিনী অস্থির হয়ে গেছে—। হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া কহিল, কে, মাস্টার নাকি? কোত্থেকে জুটলে হে?

কহিলাম, জুটি নি, এমনই বাড়ি চলেছি।

দারোগাবাবু কহিলেন, উনি রাগ ক'রে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন, হারাণবাবু ধ'রে নিয়ে যাচ্ছেন।

হারাণের নাম শুনিয়া মণীন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিল, আসুন, আসুন। তিনুকে কহিল, তিনু, সরোজকে খবর দাওগে। আমাকে কহিল, মাস্টার, তুমিও এস হে।—বলিয়া আগাইয়া চলিল। বাড়ির সামনে আসিতেই দারোগাবাবুকে কহিলাম, নমস্কার, আমরা আসি তা হ'লে।

দারোগাবাবু খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, বিলক্ষণ! যাবেন কোথায়?

হাঁকিয়া কহিলেন, মণীন্দ্রবাবু, মাস্টার মশায় পালিয়ে যাচ্ছেন।

মণীন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মাস্টার, খবরদার বলছি। সরোজ জানতে পারলে ঘাড়ে ধ'রে টেনে নিয়ে আসবে।

হারাণের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, অপমানে ও, বোধ করি, হিংসায় মুখটা কালো হইয়া উঠিয়াছে। হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, দারোগাবাবু, আমি তা হ'লে আসি, নমস্কার।

দারোগাবাবু কহিলেন, ও মণীন্দ্রবাবু, হারাণবাবু অভিমান করছেন যে, ওঁকেও ডাকুন।

মণীন্দ্র কহিল, ডাকলেও ওর কি আসা চলবে? জাত যাবে যে।

সরোজিনী আসিয়া হাজির হইল। পাউডারের প্রলেপে মুখখানি অতিরিক্তভাবে সাদা দেখাইতেছে; কেশে সদ্যপ্রসাধনের চিহ্ন পরিস্ফুট; পরিধানে আজ আর গরদের থান নয়, এক ইঞ্চি কালাপাড় শান্তিপুরে ধুতি। হাতে চার গাছি করিয়া চুড়ি, আসিতেই এসেন্সের সুমিষ্ট গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। সরোজিনী যুক্তকরে নমস্কার করিবামাত্র দারোগাবাবু বিগলিতপ্রায় হইয়া উঠিয়া কহিলেন, ভাল আছেন?

সরোজিনী মারাত্মক মুচকি হাসি হাসিয়া কহিল, আসুন।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

সংবাদ-সাহিত্য

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৮৬৪, বাংলা সন ১৩৪৯, ইংরেজী ১৯৪২।৪৩, সংবৎ ১৯৯৯। ২০০০, হিজরী ১৩৬১।৬২, ফসলী ও আমলী ১৩৪৯।৫০, মগী ১৩০৪।০৫, বগড়ী সন ১৩৫০, ত্রিপুরাব্দাঃ ১৩৫২, শ্রীচৈতন্যাব্দাঃ ৪৫৬।৫৭, কামরূপীয় শ্রী৺শঙ্করাব্দাঃ ৪৯৩।৯৪, বুদ্ধাব্দ ২৪৮৫।৮৬, ব্রাহ্মাব্দ ১০২।৩, রবীন্দ্রাব্দ ৮১।৮২ এবং তরুণাব্দ ১৭।

চেতাবনী এবং অন্যান্য বহু প্রাচীন ও আধুনিক মতে কলিযুগ শেষ হইতে আর মাত্র এক বৎসর চার মাস বাকি; ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট সত্য-যুগোৎপত্তি। অর্থাৎ যাঁহারা কোনও কৌশলে আর ষোলটা মাস কায়ক্লেশে টিকিয়া থাকিতে পারিবেন, তাঁহারা কেল্লা প্রায় মারিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের অন্যূন তিন শত বৎসর পরমায়ু হইবে, তাঁহারা রোগ শোক জরার কবলে পড়িবেন না; তাঁহাদিগকে ইন্‌কাম-ট্যাক্স দিতে হইবে না এবং তাঁহারা তখন কোনও জিনিস খরিদ করিলে সেল্‌স-ট্যাক্স লাগিবে না।

* * *

কিন্তু এই ষোল মাস টিকিয়া থাকাই সমস্যা—কঠিন সমস্যা। বোমা একটা অজ্ঞাত অনিশ্চিত পদার্থ; অনেকে ইহার বহু সাংঘাতিক ও ক্ষিপ্র শক্তির বর্ণনা দিয়াছেন। প্রত্যেকটি বর্ণনাই পরস্পরবিরোধী। বোমা সম্বন্ধে 'যুগান্তর' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' যাহা বলিয়াছেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' না হয় স্বভাবধর্ম্মেই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন; কিন্তু 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' যাহা বলিতেছেন, এ. আর. পি. পুস্তিকায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা থাকে কেন? রাজাগোপালাচার্য্য ও মহাত্মা গান্ধীর মতবিরোধ হয় কেন? সুতরাং অনিশ্চিত ও অজ্ঞাত বলিয়া বোমার ফলে আঘাত ও অপঘাতের প্রসঙ্গ নাই তুলিলাম। তা ছাড়া, বোমা-সমস্যা সমাধানের জন্য কলিকাতার সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা সরকারী এবং বেসরকারী তহবিল হইতে লক্ষ

লক্ষ সিন্দুক বা ব্যাঙ্কবদ্ধ মুদ্রার মুক্তি দিতেছেন; ইহাতে সকলের না হউক, কাহারও কাহারও সমস্যার সমাধান হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের সাহায্য পাইলেও বোমা-বিষয়ে কতকটা নিশ্চিত ও স্পষ্ট কথা বলা চলিত। কলিকাতার সমগ্র এরিয়া (area), কলিকাতার বর্ত্তমান জনসংখ্যা × অ্যাভারেজ মাথার পরিধি, জাপানী ও ব্রিটিশ বমারের সংখ্যা × প্রতি সেকেণ্ডে বোমাপাতন ক্যাপাসিটি ইত্যাদি ডেটা (data) লইয়া সহজেই কষিয়া বলিয়া দেওয়া যাইত, বোমায় আহত বা নিহত হইবার চান্স ও প্রব্যাবিলিটি কলিকাতার প্রত্যেক অধিবাসীর কতটা আছে। দুঃখের বিষয়, আধুনিক গণিত ও বিজ্ঞানের কাজ সম্প্রতি জ্যোতিষে করিতেছে। আমরা বিজ্ঞানের অত্যধিক প্রসারে বিভ্রান্ত হইয়া করকোষ্ঠী এবং ললাট-লিখনে এমনই বিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছি যে, ভারতবর্ষের মকররাশি এবং জাপানের মঙ্গল তুঙ্গী গণনা করিয়া বা করাইয়া যুদ্ধের গতি নির্দ্ধারণ করিতে চাহিতেছি।

* * *

বোমার সমস্যা চুলায় যাক, অন্য সমস্যা অর্থাৎ অন্নসমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইয়া দেখা দিতেছে; এ দেশের জনসাধারণের পক্ষে এই ষোল মাস খাইয়া পুরিয়া বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব হইবে। কিছুদিন হইতেই পাপচক্রের আবর্ত্তন শুরু হইয়া গিয়াছে; দোকানী ব্যবসায়ীরা স্ব স্ব ব্যবসাস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করাতে বহু লোকে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না এবং পলায়নকারীরাও কিছুকালের মধ্যে সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ করিয়া অনাহারে মরিতে বসিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক আহত হইয়াছে বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়। তাহাদের আয় কমিয়াছে, ব্যয় বাড়িয়াছে; উপর নীচ—দুই দিকের চাপে তাহারা অচিরকালমধ্যে যে ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যে গিয়া পড়িবে, বোমার আতঙ্ক-উত্তেজনার ভিতরে তাঁহারা তাহা ঠাহর করিতে পারিতেছে না বলিয়া চতুর্দ্দিকে উত্থিত আর্ত্তনাদে এখনও গগন বিদীর্ণ হইতেছে না। বামার চাউল বন্ধ হইয়াছে; দেশরক্ষার নামে আমাদিগকে যাঁহারা ঝাঁকে ঝাঁকে ঘিরিয়া ধরিতেছেন, নিয়মিত তাঁহাদের আহার যোগাইতে গিয়া ইতিমধ্যেই আমাদের

াড়ারে টান ধরিয়াছে; ময়দা আটা দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে—আরও হবে। মধ্যবিত্তদের অপেক্ষা তথাকথিত নিম্নশ্রেণী যাহারা, জননী ভারতবর্ষের জলতা, সুফলতা ও শস্যশ্যামলতার দরুন অনশন ও অর্দ্ধাশনে তাহারা অনেকটা াভ্যস্ত। তা ছাড়া, গণজাগরণ-আন্দোলনের সুযোগে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যন তেন প্রকারে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিবে। মরিতে মরিব আমরা। জনতার সহিত এক হইয়া গিয়া আমরা ব্যক্তিগতভাবে বাঁচিতে পারি, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হইয়া গিয়াছে।

* * *

এই মিশ্রণের কাজে বাধার সৃষ্টি করিবেন আমাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী-সম্প্রদায়। মিলনের প্রথম ধাপ হইল বাহুল্য ও বিলাসিতা বর্জ্জন। আমরা সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি, পাঞ্জাবি ছাড়িয়া ফতুয়া গেঞ্জি সহজেই ধরিতে পারিব; কিন্তু তাঁহারা গহনা-শাড়ি-সাবান-স্নোর আবর্জ্জনা বর্জ্জন করিয়া ঢেঁকিতে পাড় দিতে আর রাজি হইবেন না। অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, যুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে বাগে আনা যায় না; তাঁহারা সর্ব্বদাই এ-বাড়ি ও-বাড়ির নজির দিয়া যুক্তি খণ্ডন করিয়া থাকেন, সুতরাং পাপচক্রের আবর্ত্তন থামিতে পারে না। এখন কেবলমাত্র তাঁহাদের সহৃদয়তার উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা অনেকটা ব্রিটিশ রাজসরকারের মনোবৃত্তিসম্পন্ন, তাঁহাদের নিকট বাৎসরিক বা মাসিক আবেদন-নিবেদনে কোনই ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগকে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে; সে ব্যবস্থা যে কি, তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই।

* * *

সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা পুরুষেরা গত চার মাসের "বাধ্যতামূলক" কৃচ্ছ্র-সাধনের দ্বারা মিলনের পথ অনেকটা সরল করিয়া আনিয়াছি। প্রথমত, মানসিক অবস্থার দিক দিয়া আমরা এখন প্রায় প্রত্যেকেই শাপগ্রস্ত যক্ষের মত "রিক্তশ্রীকোষ্ঠঃ"—ঘরে গৃহিণীও নাই, আসবাবপত্রও নাই, বর্ষাৎ প্রায় আসিয়া

পড়িল। জনগণের সহিত বেমালুম মিশিয়া যাইবার এই সুবর্ণ-সুযোগ। দুই-একটি প্রকোষ্ঠে আভিজাত্য-অভ্যস্ত ঝিয়েরা এখনও নয়নানন্দ বিধান করিতেছে বটে, তবে শুনিতেছি তাহারাও নোটিশ দিয়াছে। সুতরাং—

এগারো বৎসর পূর্ব্বের বাংলার তরুণতম কবি* শ্রীবুদ্ধদেব বসু অবিরত কৃচ্ছ্র-সাধনার ফলে পথের ভিখারিণীর অদম্য যৌবনের বন্দনাগান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেখাদেখি অন্যত্রও অনুরূপ উত্তেজনা লক্ষ্য করিতেছি। এই গেল মনের দিক। দেহের দিক দিয়াও আমরা সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিতেছি; শহরের ধোপা-নাপিতদের এস্‌কেপিষ্ট-মনোবৃত্তির দরুন মার্ক্সীয় ডায়লেক্‌টিক্‌স আমাদের অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে। ময়লা জামাকাপড় অথবা খোঁচা খোঁচা দাড়ি—পূর্ব্বে যাহা বাধা ছিল, এখন তাহাই বহুবিধ সুযোগের সৃষ্টি করিতেছে। নিজের অথবা চৌকাবর্ত্তনী চাকরের হাতের রান্না যাহারা নিয়মিত খাইয়া হজম করিতেছে, তাহারা যে সাধনমার্গে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আমাদের গৃহিণীরা না বুঝিলেও আমরা পরস্পর উপলব্ধি করিতেছি। যাহা ব্যক্তিগতভাবে ঘটিতেছে, ব্যষ্টিগতভাবে তাহা ঘটিলেই বাংলা দেশে পেতি-বুর্জোয়া-আশ্রিত পাপ চিরতরে ধ্বংস হইবে এবং প্রোলিটারিয়েট বাংলা দেশ লাল ঝাণ্ডা উঁচাইয়া ভারতের নবজাগরণের পথপ্রদর্শক হইতে পারিবে। সম্ভবত গণকেরা এই অবস্থাকেই সত্যযুগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মফস্বলের আরাম-আশ্রয়ের মধ্যে, বিলাসিতার ক্লেদ ও পঙ্কের মধ্যে আমাদের অর্দ্ধাঙ্গ সমাজ যদি ইহার পরেও বদ্ধ থাকিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বেই তাহা করিবেন; আমাদের অগ্রগতি তাঁহারা ব্যাহত করিতে পারিবেন না। আমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা যদি মেদাদি সকল বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া আমাদের সহায়তায় অগ্রসর হন, তাহা হইলে আমরা খুশি হইব সন্দেহ নাই; যুগপরিবর্ত্তনের কাজ তাহাতে সহজ হইবে।

* "দশ বছর আগে বাংলার তরুণতম কবি ছিলাম আমি।"—শ্রীবুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা', পৌষ, ১৩৪৭, পৃ. ২৫।

তাঁহারা না আসিলেও ক্ষতি নাই ; ভারতবর্ষের পুরুষ কখনই প্রকৃতিপরবশ নহে।

* *

অরবিন্দের কার্য্যকলাপ দেখিয়া কেহ কেহ আমাদের উপরের উক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করিবেন ; তাঁহারা বলিবেন, পণ্ডিচারীতে গড দি ফাদার, গড দি মাদারের প্ররোচনায় সম্প্রতি ভারতীয় পলিটিক্সে মাথা গলাইয়াছেন। আমরা বলিব, তাহা হইলে অরবিন্দের সাধনা ভারতীয় সাধনা নহে ; ভারতীয় ঋষি কখনও প্রকৃতিপরবশ হইতে পারেন না, হইলে তিনি ভ্রষ্ট হন। আমাদের মনে হয়, দীর্ঘকাল নীরবতার পর অরবিন্দ প্রথম মুখ খুলিতে গিয়া অনভ্যাসের দরুন হঠাৎ বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, যথাসময়ে আত্মস্থ হইলেই তিনি পুনরায় পলিটিক্স বর্জ্জন করিবার উপায় অনুসন্ধান করিবেন ; ততদিন পর্য্যন্ত আমরা দুঃখিত থাকিব।

যুদ্ধের সংবাদের মধ্যে দেখিতেছি, আমাদের ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকজন জাপানী আসামীকে সুকৌশলে আন্দামানজাত করিয়াছেন ; তাহারা সেখানে যাবজ্জীবন থাকিবে কি না, জানি না ; কিন্তু এই ভাবিয়াই আমাদের আনন্দ হইতেছে যে, ইহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেসন্স-কোর্টে অথবা হাইকোর্টে কোনও বিচারের ভড়ং করিতে হয় নাই। এত সহজে এরূপ কাজ হাঁসিল হইবার কথা ইতিহাসে নাই।

এতক্ষণ বাংলা দেশের মধ্যবিত্তীয় স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে যাহা বলিলাম, তাহা ফিরিয়া পাঠ করিয়া নিজেই আনন্দলাভ করিতেছিলাম, এমন সময় চৈত্রের 'কবিতা' হাতে আসিল। সম্পাদক মহাশয় ছন্দোবদ্ধভাবে "ছিন্ন সূত্রে"র সন্ধান দিয়াছেন। পড়িয়া মনটা আরও প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সদ্যগড়া থিওরি যখন দৃষ্টান্তের আশ্রয় পায়, তখন "ইউরেকা, ইউরেকা" বলিতে বলিতে উলঙ্গ অবস্থায় পথে দৌড়িতেও বাধে না। এ যুগে তাহার উপায় নাই, সুতরাং উদ্ধৃত করিয়া উত্তেজনা দমন করিতে হইতেছে।

"চৈত্রমাসে দুপুর বেলায় পাতা-ঝরা গাছের তলায়" "যুবতী বেদেনী"র "পরিশ্রমে ঈষৎ হাঁপানো বুকের কাঁচুলি" দেখিয়া কবি বলিতেছেন—

মনে-মনে বলি, আমি ঢের ভালো আছি
নিয়মিত পানাহারে, নিশ্চিন্ত আরামে
শিক্ষিতের শৌখিনতায়।
জীবনের অবরুদ্ধ ক্ষীণতায়
ওরাই কৃপার পাত্র, প্রবৃত্তির আবর্তে ওরাই
বন্দী হ'য়ে আছে ; চিন্তার চড়াই-উৎরাই
ওদের অনধিগম্য, সভ্যতার বিচিত্র রম্যতা
ওরা তার কিছুই জানে না। ওরা একান্তই দেহী।...
তবু কেন আমার হৃদয়ে
যেন কোন অতীতের স্মৃতি ব'য়ে
বাজায় মাতাল বাঁশি দক্ষিণের হাওয়া।
রক্তে বাজে গান,
জাগে ঢেউ অশান্ত উচ্ছল
সেখানে বেদের দল
অশিক্ষিত কলোচ্ছ্বাসে উচ্চহাসে
তোলে তোলপাড়।
মনে হয় আমি কবি, আমার আসন
ওদেরই ধূলায় ছিলো, কবে হ'লো নির্বাসন
সে-সহজ, স্বাধীন জীবন থেকে
গম্ভীর, সুস্থির
ধুতি-পাঞ্জাবির
ইস্ত্রি-করা ভদ্রতায়।
আমারে যে পলে-পলে বেঁধে ক্ষুদ্রতায়
আমার স্বজাতি যারা ; কেরানি কি ইস্কুলমাষ্টার হ'য়ে

ছদ্মবেশে চলাফেরা করি, আসলে আমি যে কবি
সেই পরিচয়
প্রাণপণে লুকায়ে-লুকায়ে
জীবনের রসস্রোত ক্রমেই শুকায়।
ঐ যে বেদের দল
ওরি মধ্যে আমার আদিম বাসা।
যারা কবি যারা গান গায়,
ওরা যে তাদেরে চায়,
তরুণীর তীক্ষ্ণ চোখে আছে পুরস্কার,
শিশুর উদ্দাম নৃত্যে অজস্র উৎসাহ,
আছে নেশা ঘাঘরার রঙে,
আছে খুশি আকাশে-বাতাসে।
ওদের সমাজে
কবিত্ব লজ্জার নয়, ছদ্মবেশ কবিকে হয় না নিতে.
অলজ্জ প্রাচুর্য নিয়ে উন্মুক্ত খুশিতে
একান্তই কবি হ'তে পারে যে সে
এই তো পূর্ণতা তার।

এই যে মধ্যবিত্তীয় স্বীকারোক্তি, ইহার জন্য কবিকে ধন্যবাদ। আধুনিক [স]ভ্যতার দোষই এই যে, আমরা এখন মনে এক মুখে আর হইয়াছি। মন্বন্তরের [মু]খে আমাদের মনের মুখোশ যে খসিয়া পড়িতেছে, আমরা যে নির্ভীকভাবে [স]ত্য কথা বলিতে পারিতেছি, ইহাব দ্বারাই প্রমাণ হয়, সত্যযুগ আসিতেছেন। [তি]নি আসুন, ইহাই আমরা চাই। শ্রেণীস্বার্থ আঁকড়াইয়া ধরিয়া আমরা [পর]জীব মধ্যবিত্ত-সমাজ বাঁচিয়া থাকিব, শুধু বাঁচিয়া থাকা নয়, বুদ্ধির চমক [এ]বং ছন্দ-মিলের গমক দেখাইয়া এতদিন বিভ্রান্ত জনগণের উপর প্রভুত্ব করিব [এ]মনটি আর হইতে পারিবে না। ড্রইং-রুমের—ভদ্রলোকের কবি-সাহিত্যিক [হ]ইয়া অনেক দেখা গেল, এবারে ভিখারী-ভিখারিণী, বেদে-বেদেনীদের লইয়া

নূতন সাহিত্য গড়িবার পালা। এই পরিবর্ত্তনের মুখে তাই 'এক পয়সায় একটি' কাব্যের প্রকাশ অতিশয় সমীচীন ও সময়োচিত হইয়াছে। আধুনিক কবিকুল যে দো-দো-পয়সা দামের ছুঁচ, মাথার কাঁটা অথবা হাতে-মাটি সাবানের চাইতেও সস্তায় কবিতা ছাড়িতে পারিতেছেন, সমাজের পক্ষে ইহা কম কল্যাণকর নয়। বুর্জোয়ামির উঁচু মাথা এই এক চালেই প্রোলিটারিয়েটের ধূলায় লুণ্ঠিত হইল; এই নামের দ্বারাই আহার-ওষুধ দুইয়েরই ব্যবস্থা হইয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অভিজাত ব্যক্তিরাও অতি-আধুনিক সাম্যবাদের এই চালে ভূমিসাৎ হইলেন। চৈত্রের 'প্রবাসী' দ্রষ্টব্য। কাব্য ও সাহিত্যের দ্বারা এতদিন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছিল, এই তেলেভাজাগন্ধী নামের রজ্জুতে সে ব্যবধান দূর হইল; এবার এই আদর্শে স্ত্রী-কন্যার নামের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিলেই অন্যান্য ব্যবধান দূর হইতে পারিবে।

*

আমাদের দুঃখ এই যে, রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিয়া বাংলা কাব্যের এই নব-চূড়াকরণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতে পারিলেন না। নাতি কামাক্ষীপ্রসাদের চালে রামানন্দবাবু মাত হইয়াছেন; লেড়ি-অমিয় চক্রবর্ত্তীর নামে রবীন্দ্রনাথও মাত হইতেন। তিনি নিজে 'মহুয়া' পর্য্যন্ত নামিয়াছিলেন; 'এক পয়সায় একটি' তাঁহার কল্পনারও বহির্ভূত ছিল। যাহা হউক, এই নামের দ্বারা অতি-আধুনিক উন্নাসিক কবিকুল যে জনতাকে স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।

কবি ও সাহিত্যিকদের মুখোশ ধীরে ধীরে খসিয়া পড়িলেও সাংবাদিকরা নির্ব্বিকার; তাঁহাদের সত্য মিথ্যা ভাবনার বালাই নাই। আজ যাহা বলিতেছেন, কাল তাহা জোর গলায় খণ্ডন করিতেছেন; কাল যাহা বলিবেন, পরশু তাহা খণ্ডিত হইবে। তাঁহারা আপাত-প্রয়োজনকেই জানেন এবং মানেন; দূরদৃষ্টির ধার ধারেন না। আমাদের বিশ্বাস, এই বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের পরে যদি সত্যসত্যই সত্যযুগের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে এই মন্বন্তরে সংবাদপত্ররূপ

অসুর নিঃশেষে ধ্বংস হইবে; না হইলে সত্যযুগ আসিতে পারে না। সংবাদ-পত্রে প্রতিদিন যে পরিমাণ লোকক্ষয়ের সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা একত্র করিলে যুদ্ধরত জাতিসমূহের একটি প্রাণীরও আর অবশিষ্ট থাকিবার কথা নয়। জাহাজ, এরোপ্লেন, কামান, বন্দুক সম্বন্ধেও সেই কথা; অথচ আমরা প্রত্যহ প্রাতে নব্বই ডিভিশন, আশি ডিভিশনের হিসাব নূতন করিয়া গণনা করিতেছি এবং মিথ্যা কথা গলাধঃকরণের জন্য প্রত্যহ পয়সা হাতে উন্মুখ হইয়া আছি।

* * *

শুধু যুদ্ধ-ব্যাপারে নয়, অতি সাধারণ ঘটনা লইয়াও সংবাদপত্রে কিরূপ মিথ্যার বেসাতি হয়, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত ১৫ চৈত্র রবিবারের 'যুগান্তর' পত্রিকায় "আত্মপ্রচারের আতিশয্য" শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে অতিশয় আত্মপ্রচারলোলুপ কয়েকজন নিরীহ ব্যক্তিকে নামধামসহ নাস্তানাবুদ করিয়া সংবাদপত্রের স্থানাভাব দেখাইয়া সাধারণকে বলা হইয়াছে, তাঁহারা যেন এই সময়ে সম্পাদকীয় বিভাগকে এই জাতীয় প্রচার-মূলক সংবাদ ছাপিবার জন্য অনুরোধ না করেন। অথচ ১৭ চৈত্র তারিখের 'যুগান্তরে' দেখিতেছি, ফরিদপুর জিলার একটি গ্রামে 'যুগান্তরে'র সম্পাদক মহাশয় সুদূর বাল্যকালে স্কুলসঙ্গীসহযোগে কবে কোন্ গাছের কুল খাইয়াছিলেন, তাহারই একটি দীর্ঘ তিন-কলমব্যাপী মনোজ্ঞ বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই দোষে শুধু 'যুগান্তর'-সম্পাদক মহাশয়ই দোষী নন, 'আনন্দবাজার', 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাসমিতি ও বক্তৃতার (প্রায়শই অসার) ঠেলায় অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও চাপা পড়িয়া যায়। এইরূপ মিথ্যাচার ও নির্লজ্জতা এই দেশেই সম্ভব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃভাষায় শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ যে দিন দিন উন্নততর হইতেছে, তাহা তাঁহাদের পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন হইতেই প্রতীয়মান হয়। যাঁহারা এই নির্ব্বাচন করেন, আশুতোষ মুখুজ্জে রোড ও বালীগঞ্জে

ছুটাছুটি করিতেই তাঁহাদের প্রাণান্ত হয়; ইহার পরে তাঁহারা যদি বই পড়িবার অবকাশ না পান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। বালীগঞ্জ বলিলাম এইজন্য যে, ইহাদের প্রায় প্রত্যেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মা সরস্বতীর পরীক্ষার খাতা দেখা ও প্রত্যহ কলেজে হাজিরা দেওয়া-রূপ সেবা করিয়া কায়ক্লেশে ঐ অঞ্চলে এক এক টুকরা জমি সংগ্রহ করিয়াছেন; এ-পাড়ায় প্রাত্যহিক সেলাম দিবার পরও ও-পাড়ায় ইট-গণনা, মিস্ত্রীর রোজ-হিসাব ইত্যাদি কঠিন কঠিন কাজ তাঁহাদিগকে করিতে হয়। ইহার উপরে পাঠ্যপুস্তক লেখা অথবা লেখানো, পাব্‌লিশার ধরিয়া সেগুলির মুদ্রণ, নির্ব্বাচন-কমিটি নামীয় প. পি. চু. স.র সভ্যদের গাত্রকণ্ডূয়ন এবং তারপরে বখরার বন্দোবস্ত ইত্যাদি নানা হেপাজতে শীত এবং গ্রীষ্মের ছোট বড় দিনগুলি অতিবাহিত হইয়া যায়—সুতরাং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বি. এ.-পরীক্ষার্থী ছাত্রদের তৃতীয় পেপারের জন্য যদি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জ্জন্ম' প্রহসনখানি নির্ব্বাচিতই হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি?

সত্যই তো, দোষ কিছুই নাই, দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকার হিসাবে নাম আছে, এবং বইটিও ছোট। ছেলেদের অসুবিধা হইবার কথা নয়। একাক্ষরিক কতকগুলা প্রশ্নোত্তর ছাড়া ইহাতে নাই থাকিল কিছু; কিন্তু গ্রন্থকার "ভূমিকা"য় তো লিখিয়াছেন, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাতে নীতিকথার অভাব হইবে না। ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তক—একটু নীতিকথা থাকিলেই হইল! তা ছাড়া উহাতে "বুড়ো মরেছে" শীর্ষক কীর্ত্তন গান (দোহাই খোলন্দাজ!) এবং "আরে আরে সেঁইয়া" শীর্ষক বাইজী-সঙ্গীতটিও আছে, সুতরাং প্রশ্নপত্রেরও অসুবিধা হইবে না। আমাদের দুঃখ এই, ইহার চাইতেও ভাল বই দুই-একটি ছিল—সেগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। 'প্রেমের জেপলিন' অথবা 'ক্রিসক্রস' পাঠ্যপুস্তক হিসাবে 'পুনর্জ্জন্মে'র চাইতে নিন্দার হইত না। ১৯৪৫ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে আমরা বোধ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পীরিতের

কাঠপিঁপড়ে' এবং 'বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন'ও দেখিতে পাইব। পোড়া কপাল কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-অধিষ্ঠিত বঙ্গবীণাপাণির!

এবারে একটু কবিতার চর্চ্চা করা যাক। মনটা ভারী হইয়া উঠিয়াছে; "লঘুমুহূর্ত্ত" মন্দ লাগিবে না—

এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরীর
অত্যন্ত প্রশান্ত হ'ল মন;
ধূসর বাতাস খেয়ে এক গাল—রাস্তার পাশে
ধূসর বাতাস দিয়ে ক'রে নিল মুখ আচমন।…
…তারা রামছাগলের মত রুখু দাড়ি নেড়ে
একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব ক'রে নিল এইখানে চায়ের আমেজে
নামায়েছে তারা এক শাকচুন্নীকে।
এ মেয়েটি হাঁস ছিল একদিন হয় তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।
দেখে তারা তুড়ি দিয়ে বার ক'রে দিল তাকে আরেক গেলাস:
'আমাদের সোনা রূপো নেই তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস?'

ইহারা কেহ কাহারও ক্রীতদাস নিশ্চয়ই নহেন, হইলে মনিবের ধূসর চাবুকে ইহাদের কাহারও পিঠের চামড়া থাকিত না। হাঁসকে হাঁসহাঁস করার ইয়ারকি বাহির হইয়া যাইত। পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে, ইহা কোনও ব্যঙ্গকবিতা, অথবা জাল কবিতা। দোহাই আপনাদের, তাহা নয়। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত 'নিরুক্তে'র দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যার (পৌষ ১৩৪৮) প্রথম কবিতা এইটি; যিনি লিখিয়াছেন তিনি গণ্ডারের মতই রসিক, হাসি-ঠাট্টা বরদাস্ত করিতে পারেন না, ঘরে খিল লাগাইয়া থাকেন।

প্রশ্ন করিবেন, তাহা হইলে এ কি ব্যাপার? এই ব্যাপারেরই হদিশ পাইবার জন্য জীবনের বারোটা বৎসর (এক যুগ) ব্যাকুল সাধনায় কাটাইয়া দিলাম; বহরমপুর গেলাম, রাঁচী গেলাম, সেদিনও লুম্বিনী-উদ্যান দেখিয়া আসিলাম, এ সমস্যার কোনও সমাধান করিতে পারিলাম না। গিরীন্দ্রবাবু-সুহৃৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—কেহই হদিশ দিতে পারেন নাই। মিশরের পিরামিডের পাদদেশে রহস্যময় স্ফিংক্স্-এর মত বাংলা কাব্য-সাহিত্যের পাদদেশে এগুলি চিরকাল সুড়সুড়ি দিতে থাকিবে। আমাদের প্রশ্ন এ রচনাগুলি নয়; পাগলা-গারদের অন্তরালে অনেক বিচিত্র ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ঘটা করিয়া এই সকল বীভৎসতাকে বাহিরের আলো-বাতাসের রাজ্যে জনতার মাঝখানে প্রকাশ করিয়া আনন্দ পায়, তাহারা কি—পাগল, না বদমাস, অথবা দুইই?

কিছুকাল যাবৎ বাংলা কবিতার ছন্দ লইয়া কয়েকজন উৎসাহী "ছান্দসিক" 'কবিতা', 'দেশ', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় মহা সোরগোল শুরু করিয়াছেন, অনধিকার-চর্চ্চাই বেশি। পত্রিকাগুলির সম্পাদকেরা ছন্দকানা বলিয়াই এই সকল অর্ব্বাচীন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া নিরীহ পাঠক-সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করিবার সুযোগ পাইতেছে। 'দেশ' পত্রিকায় ঐরূপ একজন ছন্দকানা ব্যক্তি গ্রাম্ভারিচালে ছয় মাত্রা ও পাঁচ মাত্রার চাল লইয়া ওস্তাদি করিয়াছেন; কিন্তু দেখিতেছি, এখনও তাঁহার ছন্দের অক্ষর-পরিচয়ই হয় নাই। ছড়ার ছন্দ যে সাধারণ ছন্দ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন-জাতীয় বস্তু, এ ধারণাই তাঁহার নাই। গায়কের কণ্ঠে সুরের মত ছন্দও কবির সহজাত, কিন্তু ছন্দবিষয়ক জ্ঞান সঙ্গীতবিষয়ক জ্ঞানের মতই গুরু করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। ফুটপাথে-বসা জ্যোতিষীর মত এই সকল সাময়িক-পত্রের "ছান্দসিক"দের পরিহার করিয়া চলাই কর্ত্তব্য।

মেয়ে জ্যাঠা যেমন অসহ্য, কাব্য-জগতে মেয়ে সুধীন্দ্র দত্তও সেইরূপ. সম্প্রতি এই জাতীয় অসহ্য ব্যাপারও ঘটিতে শুরু হইয়াছে। যথা—

উদয় ও অস্তের পরম মিলন-ক্ষণে
ধ্বান্ত পৃথিবীতে ছিলো মনেরও অদেহী তমিস্রা।
বৈজয়ন্তর প্রকোষ্ঠে তখনো নাম না জানা সংবিদ্
বিক্ষিপ্ত হয়েছিলো ইতস্ততঃ।
প্রাতনক্ মানুষী রক্তে ছিল না চেতনার ধ্বান্তারী···

কিন্তু শুধু সুধীন্দ্র দত্ত হইলেও রক্ষা ছিল, মেয়েরা বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশ এবং সমর সেন হইবারও প্রয়াস করিতেছে, কাব্যসঙ্করের মহামারী দেখা দিয়াছে। যথা—

যুগের পর যুগ কেটে গ্যাছে
তার শুভ্র নিচুলে লাগিয়ে প্রহসনের নির্মোক।
এক মানুষ।
রক্তে তার অনেক সূর্য্যেরা ভীড় কোরেছে
চতুরস্র তবুও হয় নি তৃপ্ত।
এখনকার সে, তবু নয় এখনের।
বুকে তার 'প্যাগোডা'র অন্ধকার,
চোখে মিশরের মমির স্বপ্ন,
রক্ত নীল,
কপিশ কামনার চুম্বনে সবুজের অভ্রস্রতা,
মোনালিসাকে ছ্যাখে সে স্বপ্নে।

জাপানী বোমা, তুমি কতদূর ?

পুস্তক-প্রসঙ্গ

মোগল-বিদুষী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পৃ. ৯২, মূল্য দশ আনা। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

এই পুস্তকে গুলবদন বেগম (বাবরের কন্যা) এবং বিখ্যাত জেবউন্নিসার (ঔরংজীব-দুহিতার) বিস্তৃত জীবনচরিত দেওয়া হইয়াছে। সব মৌলিক আধার হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এবং তাহা সদ্যুক্তির সঙ্গে বিচার করিয়া বিশ্বাসযোগ্য অথচ বেশ মনোরম কাহিনী রচনা করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে ঐ যুগের বাদশাহী পরিবারের জীবন ও ব্যবহার বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। জেব সম্বন্ধে কল্পনাপ্রিয় আধুনিক লেখকগণ যে-সব গুজব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সমসাময়িক ইতিহাসের সাহায্যে খণ্ডন করা হইয়াছে। মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাস এইরূপেই সত্য এবং সরস করিয়া আমাদের সম্মুখে আনিতে হয়। এই পুস্তিকাখানি এবার যে তৃতীয় সংস্করণে পৌঁছিল এটা ইতিহাস না হইয়া উপন্যাসের ভাগ্যেই আশা করা যাইতে পারিত। ইহার বহুল প্রচারে আমরা সুখী।

শ্রীযদুনাথ সরকার

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল রচিত। পৃ. ২৫২ এবং ৬ খানি চিত্র, হাফ কাপড়ে বাঁধা। মূল্য দুই টাকা। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙ্গলায় যে নব-জীবন আরম্ভ হয়, তাহার ইতিহাস রচনার পক্ষে এই পুস্তকে অনেক অমূল্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে, এজন্য ইহার চিরস্থায়ী মূল্য আছে। অনেক বৎসর ধরিয়া পুরাতন সংবাদপত্র, গ্রন্থ ও কাগজপত্রের মধ্যে একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম করিয়া যোগেশ-বাবু এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব

প্রভৃতির সম্বন্ধে প্রচলিত মিথ্যা তথ্য ও তারিখ সংশোধন করা, এবং ঠিক সমসাময়িক সাক্ষীর উক্তি পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। ইহাতে নভেলের মত কাহিনী সৃষ্টি করিতে বাধা পড়ে বটে, কিন্তু সত্যের নিক্তিতে গ্রন্থের মূল্য বাড়ে। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' অতি ব্যাপক উপাধি, গ্রন্থখানি ঐ শতাব্দীর কিয়দংশ মাত্রে আলোকপাত করে এবং তাহাও কেবল কয়েকজন লোক লইয়া—রুস্তমজী কাওয়াসজী, রাজা রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং রাধানাথ শিকদার এই সাতজন। কিন্তু প্রতি অধ্যায়েই যাহা কিছু এখন জানিবার উপায় আছে তাহা দেওয়া হইয়াছে; নব বঙ্গের যে-সব দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা নামে মাত্র এত দিন পরিচিত ছিলেন তাঁহাদের এখানে আমরা ভাল করিয়া চিনিতে পারিতেছি। বিশেষতঃ রাধাকান্ত দেবের সমস্ত কীর্ত্তি যে তাঁহার দ্বারা সতীদাহ প্রথা সমর্থনের পাপে এত দিন চাপা দেওয়া ছিল, এই গ্রন্থকার তাঁহার জীবনের সেই দিকটা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। একজন "সংস্কারক" লেখক তাঁহার এক গ্রন্থে ছাপিয়াছেন, "রাজা রাধাকান্তের সতীদাহ নিবারণ বিরোধী আবেদন অগ্রাহ্য হইল।" সার্ রাধাকান্ত যে অন্য কিছুও ছিলেন তাহা পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পর্য্যন্ত ১৮৬৭ সালে প্রকাশ্যে স্বীকার করেন।

শ্রীযদুনাথ সরকার

Poems—রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, মূল্য আড়াই টাকা।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার অসংখ্য বাংলা কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন; সাময়িক-পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং পাণ্ডুলিপি আকারে সেগুলি এদিক ওদিক ছড়াইয়া আছে। ম্যাকমিলান কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত কোনও পুস্তকে এই সব অনুবাদ নাই। বিশ্বভারতী-কর্ত্তৃপক্ষ এগুলিকে চমৎকারভাবে সাজাইয়া প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের পৃথিবীব্যাপী পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। কবিকৃত অনুবাদ বলিয়া মূল কাব্যের দুরূহতা বহু স্থলে স্পষ্ট হইয়াছে। এইভাবে কবির অন্যান্য ইংরেজী রচনা প্রকাশিত হইলে আমরা খুশি হইব।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৪ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ

গত বৎসর প্রায় এই সময়ে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিচয় দিতে গিয়া তাহার উপক্রমণিকা হিসাবে বাংলা ছন্দের একটা সাধারণ পরিচয় লিখিতেই প্রায় চার মাস কাটিয়াছিল; পরে উপলক্ষ্যটা এ পর্য্যন্ত লক্ষ্যকে হটাইয়া রাখিয়াছে। যাঁহাদের পৈত্রিক বসত-বাটী দশ বৎসরেও মেরামত করা হইয়া উঠে না—হয়তো বা শুধু সামর্থ্য নয়, ইচ্ছার অভাবেও—তাহারা যেমন পুত্রকন্যার বিবাহ-উপলক্ষ্যে বাড়িটা মেরামত করিতে বাধ্য হয়, আমি তেমনই অমিত্রাক্ষর ছন্দের দায়ে পড়িয়া বাংলা ছন্দের অপরিচ্ছন্ন ইমারতটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইতে চাহিয়াছিলাম; আদৌ আমার সে সংকল্প ছিল না। কিন্তু সেই কাজে এত সময় লাগিয়া গেল যে, আসল কাজটি এখনও অনারব্ধ রহিয়াছে। আজ এতদিন পরে আবার সেই কাজ আরম্ভ করিলাম, শেষ হইবে কি না জানি না, কারণ বাহিরে যে বড় অমিত্রাক্ষরের বাজনা বাজিতেছে, তাহার যতি-তাল এতই অনিশ্চিত, এবং অক্ষরমাত্রার হিসাব এমনই নিরঙ্কুশ যে, শেষ পর্য্যন্ত আমার এই 'অমিত্রাক্ষর' হয়তো 'অমিতাক্ষর' হইয়াই থাকিবে—ইহার অক্ষর আর শেষ হইবে না, এবং অতি-আধুনিক ছন্দশাস্ত্রীর কথাই সত্য হইবে।

পূর্ব্বের আলোচনায় পয়ার-জাতীয় ছন্দকে (যাহার উপরে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পত্তন হইয়াছে)—অর্থাৎ বাংলার বনিয়াদী ছন্দকে 'পদভূমক' বলিয়া নির্দ্দেশ ও ব্যাখ্যা করিয়াছি, এক্ষণে এই পদভূমক

পয়ারকেই পুনরায় আর এক দিক দিয়া বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কারণ, মধুসূদনের ছন্দ এক হিসাবে যেমন পয়ার, তেমনই আর এক দিকে তাহা পয়ার হইতে অতিশয় বিলক্ষণ। এই পয়ার কেমন করিয়া অমিত্রাক্ষরের উপযোগী হইল—ইহার জাতিকুলশীলের মধ্যে এমন কি নিহিত ছিল, যাহার জন্য মধুসূদন ইহাকে এমন কাজে লাগাইতে পারিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন আছে। এই পয়ারের আদি রূপ বাংলা পদ্যরচনার সঙ্গে সঙ্গেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—ইহার 'পদ-চার' বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক পদ-চারণ। অতএব মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই পয়ারকে আশ্রয় করায় খাঁটি বাংলা ছন্দেরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। এই পয়ারকে বাছিয়া লইতে মধুসূদনের কোনরূপ চিন্তা করিতে হয় নাই, ইহা তাঁহার হাতের কাছেই ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, বাংলা যত বড় কাব্য সকলই এই পয়ার ছন্দে রচিত; প্রাচীন কবিগণ যখনই "কোন টানা" বর্ণনা, কাহিনী বা পালা-গান রচনা করিতে বসিয়াছেন, তখনই পয়ারের ডাক পড়িয়াছে; আবার যখনই একটু বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে, বা একটু লিরিক ভাবের আমদানি করিতে চাহিয়াছেন, তখনই অন্য ছন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন। আর একটি বড় ইঙ্গিতও তিনি পাইয়াছিলেন, এই পয়ার ছন্দেই সহজ বাচন-ভঙ্গির অবকাশ আছে, বাংলা বাক্যরীতি এই পয়ারের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তথাপি মধুসূদনকে আরও ভিতরে দৃষ্টি করিতে হইয়াছিল; এ দৃষ্টিও তিনি কানের সাহায্যে লাভ করিয়াছিলেন,—পয়ারের অন্তর্নিহিত ছন্দশক্তিকে তিনি যেন এক আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; বাংলা অমিত্রাক্ষরের মূল উপাদানগুলিকে, তিনি সেই দৃষ্টির দ্বারা, ঐ পয়ারের মধ্যেই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন; নতুবা,

ইংরেজী অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখকের এই উক্তি বাংলার সম্বন্ধেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইত না।—

"And so was the music of the blank verse, or unrhymed five-stress lines of Marlowe and Shakespeare and Milton ; and as we listened, it was easy to believe that 'stress' and 'quantity' and 'syllable' all playing together like a chime of bells are concordant and not quarrelsome in the Modern English Verse."

বাংলা পয়ারের ঐতিহাসিক বিকাশধারা একটু লক্ষ্য করিলে, তাহার জাতিকুলশীলের যে লক্ষণের কথা বলিয়াছি, তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাহাতে দেখা যাইবে, ভাষার সেই আদি রূপ হইতেই তাহার যে ছন্দপ্রবৃত্তি—শেষে যতই তাহার রূপান্তর হউক, ভাষার প্রকৃতি যতই স্বতন্ত্র হইয়া উঠুক—তাহার অঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ ঘোচে নাই; এজন্য—মাত্রা (Quantity), অক্ষর বা বর্ণ (Syllable), এবং শব্দের উচ্চারণ-ঘটিত যে স্বর-বৈষম্য (Stress), এই সকলকেই মিলাইয়া লইয়া, তাহাকে তাহার স্ব-প্রকৃতি ও কুলধর্ম্মের সমন্বয় করিতে হইয়াছে।

অতঃপর, আমি বাংলা পয়ারের সেই ইতিহাসগত প্রবৃত্তির একটু পরিচয় দিব, তাহাতে দেখা যাইবে, বাংলা ভাষাও যেমন ক্রমে একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে, তেমনই তাহার ছন্দও উত্তরোত্তর স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেছে। সে আর্টের ক্ষেত্রেও কোন শাস্ত্রশাসন মানিবে না; প্রাচীন ছন্দবিধির বাঁধা রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া সে মাঠেঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইবে; বীণা ফেলিয়া বাঁশের বাঁশীকে আশ্রয় করিবে। ফলে, প্রায় একই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া, সে তাহার জ্ঞাতি-ভগিনী হিন্দী হইতে এই ছন্দ-পথে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে!

ভারতচন্দ্রের পয়ারকেই যদি পুরানো রীতির শেষ পরিণতি বলিয়া ধরা যায়, এবং তাহার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ এইরূপ হয়—

লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ।
মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ।

শুন ওগো এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও।
কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও।
মেনকা নারদবাক্যে দুনা মনোদুখে।
পলাইয়া গোবিন্দের পড়িল সম্মুখে।
দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায়।
আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায়।

তাহা হইলে কে বলিবে যে, এই ছন্দের আদি রূপের সন্ধান মিলিবে নিম্নের দুই পংক্তিতে ?—

কাআ • তরুবর / পঞ্চ বি • ডাল।
চঞ্চল • চীয়ে / পইঠো • কাল। (চর্য্যাপদ)

দেখা যাইতেছে যে, ভগ্ন-প্রাকৃত অবস্থার এই আদি বাংলা ভাষার ছন্দে, বংশানুক্রমিক স্বভাব-ধর্ম্মে, সংস্কৃত লঘুগুরু মাত্রার নিয়ম প্রায় সম্পূর্ণ বজায় আছে; এবং সে কারণে ছন্দস্পন্দ বা Rhythm-সৃষ্টি অতি সহজ হইয়াছে। তথাপি, এখন হইতেই ভাষার উচ্চারণপদ্ধতি ও ছন্দ-পদ্ধতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়াছে—শব্দকে ছন্দোবদ্ধ করিবার সময়ে অনেক স্থলেই স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ যথানিয়মে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ঐ একই কবিতার আর একটি পংক্তি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে, সেই আদিকালেই এ ভাষার ছন্দে মাত্রাবৃত্তের নিয়মনিষ্ঠা কিরূপ দুরূহ হইয়াছিল—

ভণই লুই আম্হে সাণে দিঠা

—এ চরণেরও মাত্রাসংখ্যা ১৬, এবং পদভাগও সমান; কিন্তু ইহাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা কষ্টকর; চার মাত্রার পদচ্ছেদ বজায় রাখিলে পংক্তিটির ছন্দচিত্র এইরূপ দাঁড়ায়—

ভণই / লুই আম্হে / সাণে / দিঠা

তাহাতে দ্বিতীয় পর্ব্বটির মাত্রা বেশি হইয়া পড়ে—ঐ 'লুই'কে বাদ না দিলে ছন্দ রক্ষা হয় না। অতএব পড়িবার সময়ে, নিশ্চয়ই হ্রস্ব-দীর্ঘের

নিয়ম রীতিমত ভঙ্গ করিয়া, ভাষার কথ্য-ভঙ্গির হসন্ত, এবং তজ্জনিত ঝোঁক প্রভৃতির সাহায্যে এই গহ্বরটি উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

উপরি-উদ্ধৃত বৌদ্ধ চর্য্যাপদটিই বাংলা ছন্দের আদ্যতম নমুনা কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় না থাকিলেও—ছন্দের প্রকৃতি হইতেই, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিকে ইহার পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে বাঙালী কবির কান যে তাহার ভাষার ধ্বনিচ্ছন্দে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেজন্য রীতিমত মাত্রাবৃত্তে পদ্যরচনা করিতে বসিয়াও তাহার নিজের ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ-প্রবৃত্তি যে তাহাকে বার বার নিয়মভ্রষ্ট করে, তাহার প্রমাণ ইহাতে আছে।—

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশঘাণ্ট করহুঁ বিআলী।

পদটি আরম্ভ হইয়াছে এইরূপ বৃত্তগন্ধী মাত্রা-ছন্দে, ইহাতে 'গণ'ভাগের আমেজ পর্য্যন্ত রহিয়াছে! কিন্তু তাহার পরেই—

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।

—পড়িলে সন্দেহ থাকে না, কবির রসাবস্থা যেমন একটু ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে—ভাবের ঘোরে কবি যেই একটু বেসামাল হইয়াছেন, অমনই ছন্দে ও ভাষায় তাঁহার জাতি-কুল ধরা পড়িয়াছে; এ যেন সেই "শড়া-অদ্ধা"র অবস্থা। এই দ্বিতীয় শ্লোকটির ছন্দ প্রায় সম-চতুর্মাত্রিক; আধুনিক বাংলায় অনুবাদ করিলে, ভাষা বা ছন্দের অল্পই পরিবর্ত্তন হয়, যথা—

জোইনি / তঁই বিনু / খনহিঁ ন / জীবমি।

এবং—

তোমা বিনা / যোগিনী / ক্ষণেক না / বাঁচিব।

জয়দেবের—

চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং

—ঠিক এই চার মাত্রার চাল—কেবল অক্ষরগুলি সমমাত্রার নয়। শেষের পর্ব্বটিকে খণ্ডপর্ব্ব ধরিলে, ভারতচন্দ্রের—

কি বলিলি / মালিনী / ফিরে বল্ / বল্

যে ছন্দ, ঐ প্রাচীন পংক্তিটির ছন্দ তাহার ঠিক এক ধাপ মাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী। যথা,—জোইনি / তঁই বিনু—তোমা বিনা / যোগিনী—কি বলিলি / মালিনী।

এই যে পর্ব্বগুলি, শুধু চার মাত্রা নয়—চারিটি অক্ষরে, সমান মাত্রায়, বিস্তারিত হইতেছে, ইহার কারণ অবশ্য মাত্রার হ্রস্বদীর্ঘ-ভেদের লোপ; অতএব, ছন্দের উপরে ভাষার নিজস্ব ধ্বনি-প্রকৃতির প্রভাব যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্বরের দীর্ঘত্ব ঘুচিলেও প্রত্যেক বর্ণ স্বরান্ত; এজন্য এ ছন্দে মাত্রাধ্বনি অতিশয় স্পষ্ট; এবং ইহার লয় মন্থর নয়, দ্রুত। কিন্তু, আর একটি যে চর্য্যাপদের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে খাঁটি বাংলা পয়ারের ছাঁদটি যেন স্পষ্ট উঁকি দিতেছে—এজন্য এ পদটি যে কালহিসাবে বেশ একটু পরবর্ত্তী, তাহা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যায়।

নগর বাহিরিরে ডোম্বি / তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই যাইসো / বাহ্ম নাড়িয়া॥

একটু সামান্য ঘষিয়া লইলেই ইহার চেহারা দাঁড়ায় এইরূপ—

নগর বাহিরে ডোম্বি (ডোম্নী) / তোমার কুঁড়িয়া।
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও যে গো / ব্রাহ্মণ নাড়িয়া॥

দেখা যাইতেছে, এই পংক্তি দুইটিকে খাঁটি পয়ারের ছাঁদে যেমন সহজেই ফেলা যায়, তেমনই একটু সুর করিয়া পড়িলে যেখানে যেমন আবশ্যক অক্ষরের মাত্রা হরণ বা পূরণ করিয়া লওয়া যায়। অতএব খাঁটি বাংলা পয়ারের পূর্ব্বাভাস এইরূপ পংক্তিতে এখনই দেখা দিয়াছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, খাঁটি মাত্রাবৃত্তের চারি মাত্রার পর্ব্বপ্রবাহে

যে দ্রুততর গতি থাকে (যেমন পূর্ব্বোদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে), এখানে তাহা নাই ; তাহার কারণ, এখানে মাঝের যতিটি আরও স্পষ্ট—পয়ারের ৮৷৬ পদভাগের মধ্যস্থিত যতির মত ; অর্থাৎ ছন্দ ক্রমে পর্ব্বভূমক হইতে পদভূমকে পরিণত হইতেছে।

ইহার পর প্রাচীন পয়ারের আর কয়েকটি উদাহরণ দিব, প্রথমটি 'শূন্যপুরাণ' এবং পরেরগুলি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' হইতে।

'শূন্যপুরাণ'—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥

—ইহার প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির সহিত দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির তুলনা করিলে দেখা যাইবে ছন্দ এখনও টলিতেছে, আট ও ছয়ের পদভাগ এখনও স্থির হয় নাই ; অথচ, ৮৷৬-এর পদভাগ অস্পষ্টও নয়। পয়ারের ক্রমপরিণতির একটা বড় চিহ্ন—মাত্রাবৃত্ত বা বর্ণবৃত্তের মধ্যে দোল খাইয়া শেষে বর্ণবৃত্তে আসিয়া স্থিতিলাভ করা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, এই ষোল মাত্রা যখন চৌদ্দটি সমান মাত্রার অক্ষরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনই বাংলা পয়ার ছন্দের জন্ম হইয়াছে। আমি এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, এখানে তাহার কিছু সংশোধন আবশ্যক। পয়ারের চরণ-শেষে স্বরের টান থাকিলেও তাহা মাত্রালোপের জন্য নয়। যখন এই চরণ মাত্রাবৃত্ত ছিল, তখন ৮+৮ পদভাগই ছিল ; এবং চরণের মাত্রাসংখ্যা কম হইলে অক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া তাহা পূরণ করা যাইত ; তাহাতে স্বরের টানের সঙ্গে মাত্রার টানও ছিল। পরে যখন ছন্দ মাত্রাবৃত্তের পরিবর্ত্তে একরূপ বর্ণবৃত্তে পরিণত হইল, তখনও স্বর অবশ্য রহিয়া গেল ; কিন্তু তখনকার

শেষের পদটি সমান মাত্রার ছয়টি অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়; পয়ারের চরণে ঐ চৌদ্দটি বর্ণের অতিরিক্ত আর কিছু নাই। যতদিন তাহাকে ষোল মাত্রা পূরণ করিতে হইয়াছে, ততদিন তাহার জাতিই ছিল ভিন্ন; ততদিন সে খাঁটি বাংলা পয়াররূপে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। ৮+৮ শেষে ৮+৬ হইয়াছে—পয়ারের জন্মের ইতিহাস তাহাই বটে; কিন্তু ঐ ছয় যে আট নয়, ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য, এবং ইহাঁর জন্যই সে পরে অনেক কাজ করিতে পারিয়াছে।

এই লক্ষণের দিক দিয়াই 'শূন্যপুরাণে'র এই পংক্তিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। এখানেও সেই আদিম ষোল মাত্রার ঝোঁক বিদ্যমান—প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে চার মাত্রার চারিটি পর্ব্বভাগ সহজেই হইতে পারে—স্বরমাত্রা দীর্ঘ করিয়া, অথবা এখনও সুরের সাহায্যে মাত্রাসংখ্যা পূরণ করিয়া লওয়া চলে। তথাপি দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে এরূপ পর্ব্বভাগ করিয়া ১৬ মাত্রা পূরণ করিতে একটু বেগ পাইতে হয়—একটু বেশি টানিতে হয়; কিন্তু, পয়ারের চৌদ্দ, ও ৮+৬ ধরিলে, ছন্দটি অতিশয় সহজ হইয়া উঠে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, ভাষার প্রকৃতিবশে সেই প্রাচীন ছন্দের ১৬ মাত্রার চরণ ক্রমে কি আকার ধারণ করিতেছে, এবং কেনই বা তাহা করিতেছে।

ইহার পর, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' পয়ার যেরূপে দেখা দিয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এতদিনে ছন্দটি বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, না হইবে কেন? 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'ই যে বাংলা ভাষায় প্রথম কবিতার জন্ম হইয়াছে। ইহার ভাষাও যেমন সুপরিস্ফুট ভাব ও অর্থের ভাষা, ছন্দও তেমনই সেই ভাষারই অনুবর্ত্তী। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র কবি শুধুই বাংলার আদি কবি নয়, বড় কবি। তাই তাঁহার হাতে পড়িয়া ভাষা ও ছন্দ দুই-ই আপন রূপটি পাইয়াছে। রূপরসবিহ্বলতার সহিত যে

ধ্যান-গভীর ভাবুকতা বাঙালীর কাব্যসাধনা ও ধর্ম্মসাধনাকে এককালে অভিন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, সেই বিশিষ্ট প্রতিভার যুগব্যাপী বিকাশধারার এক প্রান্তে যেমন রবীন্দ্রনাথ, তেমনই তাহার অপর প্রান্তে চণ্ডীদাস। অতএব, এই প্রান্ত হইতেই বাংলা কবিতার সঙ্গে বাংলা ছন্দও যাত্রা সুরু করিয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পয়ারে যে লক্ষণ দুইটি নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই।—প্রথম, অক্ষরের উচ্চারণে দীর্ঘ-স্বরের প্রয়োজন আর নাই বলিলেই হয়; যেখানে সেরূপ আছে বলিয়া মনে হয়, সেখানে বস্তুতঃ তাহা দীর্ঘ-স্বর নয়—গানের সুরের অবকাশ মাত্র। দ্বিতীয়, পদভাগের মধ্যে নানা আয়তনের শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে, ভাষারই প্রয়োজন অনুসারে, চার ছাড়াও, দুই ও তিন মাত্রার পদচ্ছেদ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—অর্থাৎ ছন্দের উপরে ভাষার প্রভাব দেখা যাইতেছে; ইহারও কারণ, ভাষা এতদিনে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দের নমুনা এইরূপ—

> নিতম্ব জঘন ঘন পীন তন ভার।
> দেহে তুলি দিল বিধি যৌবন তাহার।
> *   *
> দধি দুধ ঘৃত ঘোল হাটে না বিকায়।
> এবেঁ গোয়ালার গেল জীবন উপায়।
> *   *
> সুন্দর কাহ্নাই তোর শুনিয়া যুকতি।
> সদয় হৃদয় হৈল রাধিকা যুবতী।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পয়ারে ৬+৮ এবং ৭+৭ পদভাগও দেখা দিয়াছে।

কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র এই ছন্দে পয়ারের ছাঁদটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলেও, ইহার পদগুলি গীতিপ্রধান বলিয়া শেষে এই ধারা ভিন্নমুখী হইয়াছে। কৃত্তিবাস হইতে পয়ার একটু ভিন্ন কাজে ভিন্ন ধারায় চলিতে সুরু করিয়াছে; 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ছন্দের গীতিসুর, তাহার কাব্য-মন্ত্রের মতই, বাংলা পদাবলী-সাহিত্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু,

তথাপি বাংলা পয়ারে এখন হইতে যে একটি নূতনতর স্থরের টান যুক্ত হইল, তাহার প্রভাব সে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

ইহার পর, কৃত্তিবাস-কাশীদাসের যুগে, পয়ারের আর বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই যুগে ভাষার উপরে সংস্কৃতের পালিশ আরম্ভ হইয়াছে; তাহার ফলে, ছন্দের দুইটি দোষ দূর হইয়াছে। প্রথম, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ছন্দেও খাঁটি বাংলা শব্দেরও অন্তবর্ণ স্বরান্ত হওয়ায়, ছন্দ যেমন একটু আড়ষ্ট বোধ হয়, ভাষার শ্রীও তেমনই কতকটা নষ্ট হয়; এখন ভাষার সাধু রীতির জন্য (আমি প্রচলিত পাঠের কথাই বলিতেছি) বর্ণের স্বরান্ত উচ্চারণ আর তেমন শ্রুতিকটু নয়: দ্বিতীয়তঃ, যুক্তবর্ণের বহুলতর ব্যবহারে, এবং অনুপ্রাসের গুণে, ছন্দের ধ্বনিঝঙ্কার বাড়িয়াছে। আজিও এমন সকল পংক্তি পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়—

রতন রঞ্জিত তাঁর পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংসগতি যেন, নূপুরের রব।
করে শঙ্খ-কঙ্কণ কিঙ্কিণী কটি মাঝে।
রতন নূপুর তার রুনুঝুনু বাজে।
পৃষ্ঠে লোটে স্বর্ণরূপে প্রস্থুলের ঝাঁপা।
গৌর গায় গন্ধ করে গন্ধরাজ চাঁপা।
ছড়া ছড়া বাজুবন্দ অঙ্গের উপর।
যে অঙ্গে যে শোভা করে পরেছে বিস্তর।

ভাষার এই রীতিসংস্কারের ফলে, সুর কিছু সংযত এবং পয়ারের দ্বৈমাত্রিক লয় আরও বিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ, পদের শব্দগত অক্ষর-সজ্জা যেমনই হউক, ছন্দের গতিভঙ্গিতে দুই মাত্রার পদক্ষেপ রহিয়াছে। এজন্য ছন্দের গতি যেমন মন্থর, তেমনই পদভাগের যতি

দীর্ঘতর হইয়াছে, এই যতির স্থানে থামিয়া, প্রথম পদের অন্তেও সুরের টান দেওয়া চলে। এইজন্য, পদভাগ যেখানে ৭।৯, যেমন—

করে শঙ্খ কঙ্কণ / কিঙ্কিণী কটিমাঝে

—সেখানে যতি স্থানভ্রষ্ট হওয়ায়, এই সুর বাধা পায়, এবং ছন্দে বেশ একটু দোল লাগে।

ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর পয়ার। এই কালে ভাষা আর একটা মোড় ফিরিয়াছে—ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' তাহার প্রমাণ। এতদিনে ভাষার স্টাইলের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, রচনাকার্য্যে শিল্পী-মনোবৃত্তির উন্মেষ হইয়াছে। এখন হইতে কেবল শব্দ-চয়নের সাধু রীতিই নয়, আলঙ্কারিকতার দিকেও বিশেষ মনোযোগ লক্ষিত হয়। আরও এক লক্ষণ এই যে, পদমধ্যে শব্দগুলি কেবল ছন্দের ছাঁচে ঢালাই হইতেছে না, পদচ্ছেদগুলি বাঁধা চার মাত্রার দিকে না ঝুঁকিয়া শব্দের আয়তনের উপরেই অধিকতর নির্ভর করিতেছে। ইহার একটি কারণ, শব্দের অন্ত্যবর্ণ হসন্ত হইলে, তাহার স্বরান্ত উচ্চারণ আর গ্রাহ্য হইতেছে না। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে এই সকল লক্ষণই আছে—

পরম পুরুষ বটে পিতামহ মোর।
হরিপদ-নখ-বিধু-সুধায় চকোর॥

(দ্বিতীয় চরণ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের রচনা বলিয়া মনে হয়)

* *

অঙ্গের আভায় ভয় মানিল তিমির

* *

শোকে-জরা জননী সরণি-মুখ চেয়ে

* *

কিন্তু এই অসির অসীম গুণ আছে।
শঙ্কায় সবল শত্রু কাছে নাহি আসে॥

এ ভাষাও মার্জ্জিতরুচি শিক্ষিত সাহিত্যিকের ভাষা। "অঙ্গের আভায় ভয় মানিল তিমির" এই উচ্চাঙ্গের কবি-ভাষা, এবং "শোকে-জরা

জননী সরণি-মুখ চেয়ে"—পংক্তিটির ৭।৭ পদভাগ, ও তাহাতে মিলযুক্ত শব্দের অনুপ্রাস—বাংলা কাব্যকলারও একটি বিশেষ স্তর নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয়, কেবল রচনার এই আলঙ্কারিকতাই নয়, সেই সঙ্গে ঘনরামের ভাষায় খাঁটি বাংলা বুলির প্রাচুর্য্য। তাঁহার ভাষায় দুই স্তরের শব্দই সমান মর্য্যাদা ও প্রয়োগ-সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ, ভাষার রসবোধ থাকায়, তাঁহার রচনা স্টাইলহীন নয়। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে ভারতচন্দ্রের রচনারীতির পূর্ব্বাভাস আছে—

সমাপন-বন্ধন যখন হইল মা।
বাবা কন গোঁসাই ভোজনে তোল গা॥

* *

ভ্রাতার বচনবাণে বিদরিছে বুক।
খেতে শুতে বসিতে উঠিতে নাই সুখ॥

* *

মোরে আঁটকুড়া বলে তোরে বলে বন্ধ্যা।
পাপ বাড়ে বদন দেখিলে তিন সন্ধ্যা॥

এই পংক্তিগুলিতে পয়ারের শেষ পরিণতির আভাসও পাওয়া যায়। ইহাতে নিয়মিত চার মাত্রায় পর্ব্বচ্ছেদ আর নাই, কারণ, পদের মধ্যে শব্দগুলি একটু পৃথক আসন দাবি করিতেছে, যথা—

খেতে, শুতে, বসিতে/ উঠিতে, নাই সুখ

তেমনই, ছন্দমধ্যে বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এ ভাষায় বাংলা শব্দগুলি আর কেবল শব্দমাত্র নয়—সেগুলি খাঁটি বাংলা 'বুলি' হিসাবেই বিশেষ অর্থ ও বিশেষ রসের দ্যোতনা করিবার জন্য কবিকর্ত্তৃক সজ্ঞানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবি যে 'হসন্ত'কে ভয় করেন না, তাহার প্রমাণ, তিনি উপায় থাকিতেও 'কন'-এর হসন্তবর্ণ বজায় রাখিয়াছেন। আসল কথা, বাংলা ভাষা এতদিনে সাবালক হইয়া বাঙালী কবির নিকটে সকল বিষয়ে পূরা অধিকার দাবি করিতেছে।

অষ্টাদশ শতকে বাংলা ভাষা যে একটি প্রৌঢ় সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হইতে চলিয়াছে, ঘনরামের কাব্যে তাহার যেমন সূচনা, ভারতচন্দ্রের কবিতায় তেমনই তাহার পূর্ণ-পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্র বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্য-শিল্পী, এবং বৃটিশ-পূর্ব্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যকার। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর সহিত তুলনা করিয়া অনেকে তাঁহার কবিশক্তির ন্যূনতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র যে বাংলা ভাষার কে, এবং ভাষা যে কাব্যের পক্ষে কি, এই জ্ঞান যাঁহাদের নাই তাঁহারাই প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রের স্থান কোথায় তাহা বুঝিতে ভুল করেন। ভারতচন্দ্রের কবিতার প্রধান রস তাহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, এবং তাহাও বাংলার ভাষারই। তিনি বাংলা ভাষা-তরুর, শুধুই ফুল নয়—পাতাগুলি পর্য্যন্ত লইয়া, সেই তরুরই আশ্রিত গুল্মলতার ডোরি দিয়া সাহিত্যের যে রূপকর্ম্ম করিয়াছেন, সেকালে বাঙালীর পক্ষে তাহা এক অভাবনীয় বস্তু। ভারতচন্দ্র ভাষাকে যেন একখানি শান্তিপুরী শাড়ি মাত্র পরাইয়া—পায়ের মল কয়গাছির স্বর ঠিক করিয়া, এবং মাথার চুল একটু ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিয়া—তাহার শ্রী যেরূপ বাড়াইয়াছেন, এবং কেবল তাহারই কারণে সেই সুচতুরা স্বল্পভাষিণী যুবতীর চোখে যে কটাক্ষ, এবং অধরে যে হাসির ভঙ্গিমা ফুটিয়াছে—সে যে কত বড় প্রতিভার কাজ, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? ভারতচন্দ্রের ছন্দ এই ভাষারই একটি অন্তরঙ্গ উপাদান; বাংলা ছন্দের গীতিধ্বনিকে তিনি যে কত রূপে লীলায়িত করিয়াছেন, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক; কিন্তু পয়ার ও ত্রিপদীকে তিনি যে ছন্দ-গৌরব দান করিয়াছেন, তাহাতেই বাংলা কাব্য প্রাণ পাইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, তখন বাংলা গদ্যরীতির সৃষ্টি হয় নাই; ছন্দ তখন কেবল কবিতারই অঙ্গ

ছিল না, তদ্দ্বারা বাক্যরচনারীতিও নিয়ন্ত্রিত হইত। পয়ারের ঐ স্বল্প আয়তনেই (স্বল্প হইলেও অন্য ছন্দের তুলনায় উহার চরণের গতি কিছু মুক্ত) বাক্য (sentence) গড়িয়া উঠিবার সামান্য অবকাশ মিলিত; পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ছন্দে বাক্য বেশ স্বচ্ছন্দ নয়, এমন কি, অঙ্গহীন হইতেও দেখা যায়—যেন কোন প্রকারে ছন্দের মধ্যে একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। ভারতচন্দ্র এই স্বল্প পরিসরকেই যেন সানন্দে স্বীকার করিয়া ভাষার যে মিতাক্ষর-গাঢ়তা, বা বাক্‌সংযমের বাক্‌পটুতা, দেখাইয়াছেন, তাহাতে অতি সরল সহজ ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট ক্ল্যাসিক্যাল স্টাইলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার রচনায় যেমন বাগ্‌বাহুল্য নাই, তেমনই একটি শব্দও প্রয়োগ-দোষে দুষ্ট নয়—এ কথা বাংলার আর কোন কবির সম্বন্ধে খাটে না। ভারতচন্দ্রের রচনার এই বাক্‌সংযম ও বাক্‌শুদ্ধির উদাহরণস্বরূপ আমি তাঁহার গ্রন্থ হইতে যে কোন একটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম।—

তুমি বাড়াইলে প্রীতি, মোর তাহে নাহি ভীতি,
রহে যেন রীতি নীতি—নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেয়ো, আর দিকে নাহি ধেয়ো,
সদা একভাবে চেয়ো এই রাধিকায়।
তুমি হে প্রেমের বশ, তেঁই বৈনু প্রেমরস,
না লইও অপযশ বকিয়া আমায়।
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে না কহিও কার কাছে,
ভারত দেখিবে পাছে—না ভুলায়ো তায়।

এখানে প্রায় সর্ব্বত্র আটটি মাত্র অক্ষরে এক একটি বাক্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল তিনটি চরণে কবি পূরা চৌদ্দ অক্ষরই লইয়াছেন। বাক্যের এই ক্ষুদ্র আয়তনের প্রতি কবির যে লোভ, সেজন্য তিনি সংস্কৃত শব্দ ও সন্ধি-সমাসের শরণাপন্ন হন নাই, বাংলা ভাষাকেই, যেন চাঁচিয়া ছুলিয়া সর্ব্ববাহুল্যবর্জ্জিত করিয়াছেন; অর্থাৎ এই স্টাইল সম্ভব হইয়াছে

খাঁটি বাংলা বুলির অতিশয় সতর্ক নির্ব্বাচন ও নিপুণ যোজনায়। এখানে অতিশয় অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমি এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা-শিল্পীর স্টাইল ও কবিশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিয়া পারিলাম না—ছন্দের কথা পরে হইবে।

প্রথমে 'অন্নদামঙ্গলে'র "হরগৌরীর কোন্দল" হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম—তাহাতে ভারতচন্দ্রের হাতে বাংলা কাব্যের ভাষা কি রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং পয়ারকে কবি 'গীতি' হইতে 'কথা'র ছন্দে কেমন রূপান্তরিত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলিবে।

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট লোচনে।
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল।
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে প'ড়ে নাম হৈল চণ্ডী।
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক।
সম্পদের সীমা নাই—বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা-সিন্দুকের কুঁজি।
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্নবস্ত্র দিয়া।
কেনি সব কটুকথা কিসের লাগিয়া।

পড়িবার সময়ে কোন্দলকারিণী শিবগেহিনীর শুধু মুখঝামটাই নয়, মুখভঙ্গিটি পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। এইবার একটি অতিশয় পরিচিত কবিতার কিংয়দংশ উদ্ধৃত করিব, ইহাতে কেবল ভাষা নয়, ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার প্রায় সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা সেই অপূর্ব্ব "অন্নদা-পাটুনী-সংবাদ"। দেবী ছদ্মবেশে পারঘাটায় আসিয়া ঈশ্বরী পাটনীকে পার করিয়া দিতে বলিলেন, তখন—

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী—
একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি?

কথা কয়টিতে পাটনীর মুখের সন্ত্রস্ত ভাব, দেবীর চোখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত ধরা পড়িয়াছে।

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফেরফার॥

দেবী যখন "বিশেষণে সবিশেষ" পরিচয় দিলেন, তখন—

পাটনী কহিছে মাগো বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল॥

দেবীর কথা হইতে ওইটুকু মাত্র বুঝিয়া তাহার সন্দেহ দূর হইয়াছে। কুলীনের সংসারে অমন ঘটিয়া থাকে, বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই অসহ্য হইয়াছে! পাটনী দুঃখী মানুষ, খাটিয়া খায়; বড়লোকের দুঃখে দুঃখ করিবার সময় তাহার নাই, বরং কুলবধূর এই আচরণে সে যেন খুশি হয় নাই, তাই দেবীকে তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল—

শীঘ্র আসি নায়ে চড়, কিবা দিবা বল।
দেবী কন্ দিব, আগে পারে লয়ে চল॥

এমন সহজ ভাষায় এত স্বল্পাক্ষরে আর কেহ এমন কাহিনী-রস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে? 'কিবা দিবা বল'—ভাষার এই অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই চরিত্রও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্রের রচনায় শব্দার্থের এই যাদুশক্তির কারণ—তিনি যেমন বাক্সংক্ষেপের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তেমনই কথ্যভাষার জীবন্ত বুলিগুলির মাধুর্য্য তিনিই প্রথম পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এমন অল্প কথায় গল্পের সকল রস ফুটাইয়া তোলা এবং অতি সূক্ষ্ম হিউমার (humour) সহযোগে কেবলমাত্র নিপুণ বাক্ভঙ্গির দ্বারা, এই যে চিত্রাঙ্কন—ইহা একজন শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষেই সম্ভব। তাই এই অতি ক্ষুদ্র কাহিনীটির মধ্যেই একটি সম্পূর্ণ চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষ; বয়স হইলেও প্রাণের সারল্য যায় নাই; গরিব অথচ ধর্ম্মভীরু; অতি অল্পে

সন্তুষ্ট; পারের মাঝি হিসাবে তাহার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাই একটু বেশি সতর্ক; তাহার উপর, যে বিশেষ হিন্দু-কাল্‌চার সমাজের নিম্নস্তরেও সঞ্চারিত হইয়া এককালে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রকে যেন—একপ্রকার ভক্তির—আত্মসমর্পণের ভাবে, শান্ত ও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের এই ঈশ্বরী পাটনী তাহারই একটি চমৎকার নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

কবিতায় ভাবোদ্রেকের ব্যাপারেও এ কবির কবিস্বভাবের সংযম বিস্ময়কর; এই কাহিনীতেও তাহার যে সুযোগ ছিল, তিনি তাহা অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছেন; কেবল দুইটি মাত্র পংক্তিতে কবির প্রাণ সহসা উদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং তাহাতেই তাঁহার সব কথা বলা হইয়াছে।

> যাঁর নামে পার করে ভব পারাবার।
> ভাল ভাগ্য পাটনী তাঁহারে করে পার।

তারপর আবার সেই পাটনী—

> বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
> কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ।
> পাটনী বলিছে, মাগো বৈস ভাল হয়ে।
> পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে।

—এ কথা একেবারে খাঁটি পাটনীর কথাই বটে; কিন্তু সেঁউতির উপরে সেই পা দুইখানি রাখিতে দেখিয়া কবিও আর একবার একটু ভাববিহ্বল না হইয়া পারেন নাই; কিন্তু তাহাতেও বাগ্‌বিস্তার নাই; পাটনী কিন্তু এসব কিছুই বুঝিতেছে না—এই না বুঝিবার ক্ষমতাই তাহার চরিত্রটিকে এমন বাস্তব অথচ রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। শেষে যখন সে দেবীর আসল পরিচয় পাইল, তখনও বর চাহিতে বলিলে, নির্ব্বোধ পাটনী আর কিছু চাহিল না, কেবল—

> আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

সাক্ষাৎ-আবির্ভূত দেবতার কাছে এমন ক্ষুদ্র প্রার্থনা কি আর কেহ করিয়াছে? পাটনীর কল্পনায় ইহা অপেক্ষা বড় সৌভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না—চরিত্রের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি কি চমৎকার! কিন্তু এই পাটনীর জবানিতেই কবি যে একটি তত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে অতি নির্ব্বোধ পাটনীকেও আর এক হিসাবে অতিশয় বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হয়। পাটনীর প্রার্থনায় যে ভক্তজনোচিত নৈরাকাঙ্ক্ষ্য আছে,

তাহা ভক্ত খ্রীষ্টানের "Give us this day our daily bread" এই প্রার্থনারই মত। ভারতচন্দ্রের ছন্দ আলোচনার পূর্ব্বে তাঁহার ভাষা ও কবিত্বশক্তির এই সামান্ত পরিচয়টুকু না দিয়া পারিলাম না। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে বাংলায় গান ছিল, গানেব উপযুক্ত ভাষাও ছিল; কিন্তু এমন কাব্যও ছিল না, কাব্যের উপযুক্ত ভাষাও ছিল না। কবিত্ব ভাষা ও ছন্দ—এই তিনের সমান মিলনে—বা, পরস্পরের নিখুঁত উপযোগিতায়—বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সেই প্রথম একজন বড়দরের কবিশিল্পীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। কেবল ভাবকল্পনার মহার্ঘতা বা কাহিনীকুশলতাই কবিশক্তির নিদর্শন নয়; ভাবকল্পনার উপযোগী ভাষা বা বাণীর প্রকাশসুষমাই যে কাব্যের প্রধান রসহেতু, বাঙালী ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তাহা সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের পর প্রায় এক শত বৎসরের মধ্যে এমন আর একজন কবিরও আবির্ভাব হয় নাই বলিয়া সে কাব্য এতদিনেও একটু পুরাতন হয় নাই। পুরাতন না হওয়ার অরও কারণ এই যে, এ ভাষা সত্যকার কবিভাষা; কাব্য যেমন উৎকৃষ্ট হয় ভাষার গুণে, তেমনই ভাষার গুণেই কাব্য বাঁচিয়া থাকে। তাই মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা সাহিত্যে অমর, ভারতচন্দ্রও তেমনই চিরজীবী হইয়া আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি বাঙালী কবি হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের বন্দনা করিয়াছেন; এবং নব্য আদর্শে উজ্জীবিত বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরতিশয় আশান্বিত হইয়া, পুরাতন কবিতার প্রতি মমতা সত্ত্বেও, তিনি তাহার সেই আদর্শের প্রসার কামনা করেন নাই। প্রাচীন কবিতার প্রসঙ্গে তিনি ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করেন নাই; তাহার কারণ নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় সেই পুরুষ ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্যখানির অশ্লীলতা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই; এজন্ত তাঁহার নামোচ্চারণ করিতেও বাধিত। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা শ্রদ্ধার সহিত বুঝিবার ও বিচার করিবার প্রবৃত্তি যে তাঁহার হয় নাই—সে যেমন তাঁহারও দুর্ভাগ্য, আমাদেরও তেমনই।

৪

এইবার ভারতচন্দ্রের পয়ারের কথা বলিব। আমরা এতদূর পর্য্যন্ত পয়ার ছন্দের যে বিকাশধারা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে ভাষার ধ্বনি-

প্রকৃতির সঙ্গে ছন্দের পূর্ণ সাযুজ্য ঘটে নাই, অর্থাৎ কাব্যচ্ছন্দের সঙ্গে ভাষার উচ্চারণপদ্ধতির যে সম্পর্ক না থাকিলে ছন্দ একটা কৃত্রিম বস্তু হইয়া দাঁড়ায়—সেই সম্পর্ক সহজ হইয়া উঠে নাই। ছন্দ যে একটা বাহির হইতে গড়া যন্ত্রবিশেষ নয়—যাহার ছাঁচে বাক্যকে ফেলিয়া একটা বাজনা বাজাইলেই হইল—ইহা আমরা এখন যেমন বুঝি (ছন্দশাস্ত্রীরা এখনও বুঝেন না), পূর্ব্বে, কাব্যে সেই অলঙ্কারপ্রিয়তার যুগে, কেহ তেমন বুঝিত না। আদি বাংলার সেই প্রাকৃত-গোত্র হইতে যে ছন্দের উদ্ভব হইয়াছিল—ভাষার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও যে রূপান্তর হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছন্দের প্রয়োজন, ভাষার প্রয়োজন অপেক্ষা বড় হইয়া থাকায়, সেই আদি ছন্দের ভূত নূতন ভাষার স্কন্ধ হইতে নামে নাই; ভাষার প্রকৃতি যেমন হউক, স্বাভাবিক উচ্চারণ যেমন হউক—বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ নিষিদ্ধ ছিল; কারণ, তাহা হইলে, ছন্দের নিয়ম ভালমত রক্ষা হয় না। ইহারই জন্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র অমন চমৎকার দেশী শব্দগুলি ছন্দের চাপে জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। কবিতা পাঠ যেমন ছন্দের অনুযায়ী হইয়া থাকে, তেমনই ছন্দও পাঠভঙ্গির দ্বারাই স্পন্দিত বা তরঙ্গিত হয়, এবং তাহাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রুতিমাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে। ভাষা ও ছন্দ—দুইই ভাবের যথার্থ প্রকাশে সাহায্য করে; ভাষার প্রত্যেক বর্ণ তাহাদের বিশিষ্ট ধ্বনিসঙ্কেতে ভাবের কণ্ঠস্বরাশ্রিত রূপকে, আমাদের শ্রুতিগোচর করে; এবং ছন্দ সেই ধ্বনির প্রবাহকে একটি সুবলয়িত সুষমা দান করে। কিন্তু ছন্দ যদি একটা পৃথক বাদ্যধ্বনি হইয়া, ভাষা, এবং ভাষা যাহার রূপ, সেই ভাবকে একটা কৃত্রিম সুরযুক্ত করে, শব্দের কণ্ঠস্বরজাত কোন ধ্বনিবৈচিত্র্য তাহাতে ফুটিয়া উঠিতে না পায়, তবে কাব্যও যেমন রসোজ্জ্বল হয় না, ছন্দও তেমনই একটা শৃঙ্খল হইয়া দাঁড়ায়। ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির সঙ্গে ছন্দের অন্তরঙ্গতা না থাকিলে এমনই ঘটিয়া থাকে। এইজন্য বাংলা পয়ার শেষে সর্ব্ববিধ শিল্পগুণ হারাইয়া একটা রচনারীতি-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ভাব যেমন হউক, ভাষা যেমন হউক—বিষয়বস্তু যতই কবিত্ববর্জ্জিত হউক—এই পয়ার হইয়াছিল তাহাকে কোন রকমে লিপিবদ্ধ করিবার একটা ঠাট মাত্র; বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাক্যের

পংক্তিগত মিল বা যতি-তালের দূরতম সম্পর্কও নাই, তথাপি ছন্দের ঐ কাঠামোটার বড় প্রয়োজন,—শব্দগুলাকে একটু সাজাইয়া দিবার উহাই একমাত্র উপায়, একটু সুর করিয়া পড়িবার মত হইলেই হইল।

ভারতচন্দ্রের ভাষার পরিচয় দিয়াছি—এই ভাষা যাঁহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য—এই ভাষার রস যাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে—তাঁহার হাতে ছন্দ এই ভাষার ধ্বনিধর্ম্মকে অস্বীকার করিতে পারিল না—

> শুনিলি, বিজয়া জয়া, বুড়াটির বোল ?
> আমি যদি কই, তবে, হবে গণ্ডগোল !

কিংবা—

> পরিচয় না দিলে, করিতে নারি, পার।
> ভয় করি, কি জানি, কে দেবে ফেরফার।

এখানে পয়ারের বাঁধা-চালের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই, ছন্দের তলে তলে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিমা পর্য্যন্ত ফুটিয়া উঠিতেছে। ভারতচন্দ্রের ছন্দে, যথাস্থানে বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ না মানিয়া উপায় নাই; এতদিনে ভাষার চাপে ছন্দ দোরস্ত হইয়া আসিয়াছে। সুর এখনও আছে, কিন্তু তাহা ছন্দকে একটু দোল দেওয়ার মত, যেমন—

> অন্নপূর্ণা উত্তরিলা—আ / গাঙ্গিনীর তীরে—এ

আমি সুরের স্থানে কেবল চিহ্নস্বরূপ—'আ' এবং 'এ' বসাইয়াছি; এই সুর দুইটি যতি-স্থানেই আছে—প্রথমটিতে একটু কম, দ্বিতীয়টিতে একটু বেশি; ভারতচন্দ্রের ভাষায় ইহার অধিক সুরের অবকাশ নাই। এই সুর ঈশ্বর গুপ্তের যুগে শিক্ষিত সমাজের কাব্যরচনায় আর ছিল না। ঈশ্বর গুপ্ত যমক-অনুপ্রাসের সম্মার্জ্জনী-প্রয়োগে এই সুরকে কাব্য-ছাড়া করিয়াছিলেন; তাহার প্রমাণ—

> বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে।
> আহা তায় রোজ রোজ কত 'রোজ' ফোটে।
>
> * *
>
> আনা দরে আনা যায় কত আনারস।
> অনায়াসে করি রসে ত্রিভুবন বশ।

অতএব, ভারতচন্দ্রের পয়ারকে—কেবল বাংলা বুলির প্রাধান্য নয়, কথ্য-ভাষার বাচন-ভঙ্গিও, চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে; প্রত্যেক বাক্যে, ভাব

ও অর্থের অন্বয়রীতিকে আশ্রয় করিয়া শব্দগুলি স্ব স্ব মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে—ছন্দের মধ্যে কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বরভঙ্গিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর পয়ারের পূর্ব্বাবস্থা।

বাংলা ছন্দের উৎপত্তি ও বিকাশের এই অতি স্থূল বিবরণ হইতেও যে একটি তত্ত্ব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, এখানে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। সংস্কৃত হইতেই যে ছন্দ-প্রকৃতি আদি অপরিণত বাংলা ভাষায় সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহার কৌলীন্যও যেমন, তেমনই তাহার কলা-কৌশলও অসামান্য। এই ছন্দই প্রাচীন কাব্যরীতি-সম্মত; অর্থাৎ, ছন্দ কবিতার একটা বহির্গত অলঙ্কার বা প্রসাধন—বাক্যকে রসাত্মক করিবার একটা অতিরিক্ত উপায়। এজন্য, বাক্যকে ছন্দোবদ্ধ করিবার সময়ে ছন্দের পৃথক মূল্যের দিকেই দৃষ্টি থাকিত, বাক্‌প্রকৃতির দিকে নয়। এই কৃত্রিমতার বিলাস বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতের ছন্দপদ্ধতিতে—তাহার সেই নানা ভঙ্গিমার গণ-বৃত্ত ছন্দে। বাংলা ভাষা প্রথম হইতেই এই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে; সে যে তাহার পদ্যের পদচারণায় ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য কত চেষ্টা করিয়াছে, এবং তাহা করিতে গিয়া একুল ওকুল—কোন কুল রক্ষা করিতে পারে নাই—বাংলা পয়ার ছন্দের উদ্বর্তনের ইতিহাসে সেই তত্ত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তির ফলে তাহার প্রাচীন ছন্দ-সম্পদ কিরূপ দীন ও নানাদোষদুষ্ট ছিল—হিন্দীর সহিত তুলনা করিলে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শ বা কাল্‌চারকে ধরিয়া থাকার ফলে, মধ্যযুগে হিন্দী কবিতার যে উৎকর্ষ হইয়াছিল, বাংলা তাহার তুলনায় সর্ব্বাংশে গ্রাম্য বলিতে হইবে। কিন্তু বাঙালী, তাহার জাতির মত, ভাষারও স্বাতন্ত্র্য-বোধ ত্যাগ করিতে পারে নাই—রাজপ্রাসাদের পায়সান্ন-প্রসাদ অপেক্ষা আপনার পর্ণকুটীরে স্বাধীন শাকান্নের আয়োজনে সে অধিকতর তৃপ্তি অনুভব করিয়াছে। ভাষায় ও ছন্দে প্রাচীনের সেই অধীনতা-শৃঙ্খল শিথিল করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই, সে এত সহজে সাহিত্যে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছে। হিন্দী ভাষা বা সাহিত্যের জ্ঞান আমার নাই বলিলেও হয়, তথাপি, তাহার যে ছন্দরীতি

এখনও—ভাষার আধুনিকতা সত্ত্বেও—হিন্দী কবিতার আশ্রয় হইয়া আছে, তাহার পরিচয় পাইয়া, বিস্ময় বোধ করিয়াছি। মনে হয়, সেখানে এখনও ভাষার সঙ্গে ছন্দের সাযুজ্যবিধান হয় নাই, সেই আদি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ এখনও সগৌরবে প্রভুত্ব করিতেছে! আমাদের পয়ারের সমস্থানীয় হিন্দী 'চৌপাই' আজিও এই চাল বজায় রাখিয়াছে—

(১) চরণ শরণ কেহি কারণ ত্যাগিহৌ।
জগ জনমত সোই মারণ ভাগিহৌ॥

কিংবা—

(২) ভক্তি বিনু যুক্তনর নাহক পধারী।
শক্তি নহি ভক্তি বিনু জ্ঞান নহি ভারী॥

ইহাদের ছন্দপদ্ধতি এইরূপ—

(১) চ র ণ শ র ণ কে হি কা র ণ ত্যা গি হৌ

(২) ভ ক্তি বি নু যু ক্ত ন র না হ ক প ধা রী

—বলা বাহুল্য, ইহার সকল বর্ণই স্বরান্ত; প্রত্যেক চরণে বাংলা পয়ারের মত চৌদ্দটি অক্ষর আছে, এবং দ্বিতীয় শ্লোকটি বাংলার মত করিয়া পড়াও যায়। কিন্তু তাহা চলিবে না; কারণ, ইহার মাত্রা কেবল লঘুগুরু নয়, তাহাদের স্থান পর্যান্ত নির্দ্দিষ্ট আছে—নিয়মিত গণ-ভাগও আছে! এই অক্ষর আমাদের পয়ারের অক্ষর নয়; অক্ষর-সংখ্যা ১৪ হইলেও, ইহার মাত্রাসংখ্যা বেশি। আর একটি ষোল মাত্রার (অক্ষর নয়) হিন্দী চরণ এইরূপ—

বন্দৌ রাম নাম রঘুবর কৌ।

ইহার প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রা না ধরিয়া, প্রয়োজনমত হ্রস্ব-দীর্ঘ করিয়া পাঠ করিলে, এই পংক্তিটিতেও খাঁটি চার মাত্রার চাল মিলিবে, যথা—

বন্দৌ • রাম নাম • রঘুবর • কৌ •

এবং তাহাতে পয়ারের পদভাগও থাকিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, হিন্দী প্রাচীন বাংলার খুব দূর জ্ঞাতি না হইলেও সে তাহার সেই প্রাচীন ছন্দরীতি এখনও ছাড়ে নাই, বরং

তাহাকেই খুব পাকা করিয়া তুলিয়াছে—সে তাহার ছন্দপদ্ধতিতে এখনও নিজস্ব স্বাভাবিক বাক্‌ভঙ্গিকে আমল দেয় নাই। বাংলা যে শীঘ্রই ভিন্ন পথে চলিয়া, শেষে পয়ারের মত একটা স্বকীয় ছন্দ গড়িয়া লইয়াছে, তাহাতে বাংলা ভাষার মতই, বাঙালীর জাতিগত স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহার পরিচয় আছে।

প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে, পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমি বাংলা পয়ারের ক্রম-বিবর্ত্তনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এইখানে সন্নিবিষ্ট করিলাম।—

প্রথম স্তর। সংস্কৃতের মত অক্ষরমাত্রিক হ্রস্ব-দীর্ঘের প্রভাব। চরণের মাত্রা-সংখ্যা ১৬, পদভাগ—৮+৮। লয় দ্রুত—এজন্য মাঝে যতিটি ছন্দভাগের নির্দ্দেশক মাত্র। Rhythm বা ছন্দস্পন্দ প্রচুর।—

কাআ / তরুবর ॥ পঞ্চবি / ডাল (চর্য্যাপদ)

দ্বিতীয় স্তর। ঐ একই চরণের পর্ব্বগুলি প্রায় সমমাত্রার চার অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। এজন্য একটি ভিন্নতর গীতিসুরের সৃষ্টি হইয়াছে। ছন্দস্পন্দ অনেকটা আধুনিক দ্বৈমাত্রিক গীতিচ্ছন্দের মত।—

জোইনি। তঁই বিনু ॥ খনহিঁ ন / জীবমি (চর্য্যাপদ)

তৃতীয় স্তর। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ও 'শূন্যপুরাণে'র—পয়ারের আদি রূপ। ভাষার স্বতন্ত্র রূপ ছন্দে ফুটিয়া উঠিতেছে। পদভাগের যতি আরও সুস্পষ্ট। মাত্রাবৃত্তের সুর কথার সুরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং দ্বিতীয় পদভাগের ৮ মাত্রা ৬ মাত্রার দিকে ঝুঁকিতেছে।—

নগর বাহিরিরেঁ ডোম্বি। তোহোরি কুড়িআ (চর্য্যাপদ)

চতুর্থ স্তর। পয়ারের পূর্ণ প্রকাশ।—

(১) দধি দুধ ঘৃত ঘোল / হাটে না বিকায় (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)

(২) মেরু মন্দার ন ছিল / ন ছিল কৈলাস (শূণ পুরাণ)

পঞ্চম স্তর। কৃত্তিবাস হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। ভাষা (প্রচলিত পাঠ) সাধু বা সাহিত্যিক হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে বর্ণগুলি অনায়াসে স্বরান্ত হইবার সুযোগ পাওয়ায় ছন্দধ্বনি আরও শিষ্ট ও স্বাভাবিক হইয়াছে; এবং ছন্দের দ্বৈমাত্রিক লয়ও আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। খাঁটি বাংলার উপরে সংস্কৃতের পালিশ ছন্দের ধ্বনিকে

আর এক প্রকারে সমৃদ্ধ করিয়াছে, যুক্তবর্ণের মূল্য বাড়িয়াছে। কিন্তু ছন্দের আর কোন বিশেষ উন্নতি হয় নাই—

পৃষ্ঠে লোটে • স্পষ্ট রূপে / প্রবালের • ঝাঁপা।

* *

মহা ভার • তের কথা / অমৃত স • মান।

ষষ্ঠ স্তর। ভারতচন্দ্রের পয়ার। এতদিনে ছন্দের সঙ্গে সহজ বাগ্-বিন্যাসের আপোস ঘটিয়াছে—ছন্দ ও ভাষার চারি চক্ষুর মিলন হইয়াছে। শব্দের-বাক্য ও অর্থঘটিত অন্বয় এবং তজ্জন্য শব্দ সকলের পৃথক মর্য্যাদা, এই দুইয়ের প্রভাবে, পদমধ্যে বাক্যের ভাবানুযায়ী কণ্ঠস্বরভঙ্গিও ধরা পড়িতেছে।—

শুনিলি, বিজয়া জয়া, বুড়াটির বোল ?
আমি যদি কই—তবে, হবে গণ্ডগোল।

ছন্দের পদভাগের যে যতি, তাহাও এখানে বাক্যের স্বাভাবিক পদচ্ছেদের অনুগত হইয়া উঠিয়াছে ; এজন্য নিম্নোদ্ধৃত চরণের মধ্য-যতি আটের পর না পড়িয়া ছয়ের পরে পড়িলেও ক্ষতি নাই—

দেবী কন, দিব—আগে পারে লয়ে চল।

এই কারণেই পয়ার এক্ষণে যতদূর সম্ভব স্বরমুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর চরণের পক্ষে পয়ার যে কেন এমন উপযোগী হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মধুসূদন তাঁহার ছন্দের অমিত্রাক্ষর চরণের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নিকটে কতখানি ঋণী, তাহা বুঝিবার জন্য বাংলা পয়ারের ক্রমবিকাশ ও পরিণতির এই ইতিহাসটুকুর প্রয়োজন ছিল। আমি ভাষাতত্ত্ববিদ্ নই, ধ্বনি-বিজ্ঞানও আমার পক্ষে একটি বিভীষিকা ; তথাপি, কেবল সাধারণ ছন্দজ্ঞান এবং ছন্দরসপিপাসু কান, এই দুইয়ের দুঃসাহসে, আমি পণ্ডিতগণের এই অতিশয় দৃঢ়রক্ষিত এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি, তাহার একমাত্র কৈফিয়ৎ—গরজ বড় বালাই। আমি জানি যে, প্রাচীন কবিদের যে ভাষাকে যতখানি প্রাচীন মনে করিয়া, আমি বাংলা পয়ার ছন্দের এই কালক্রমিক স্তর ভাগ করিয়াছি, তাহা ঐতিহাসিকের অনুমোদিত হইবে না, জানি, 'শূন্যপুরাণ'কে আমি যে-কালে স্থাপন করিয়াছি, অথবা যে ভাষাকে আমি কৃত্তিবাসের ভাষা

বলিয়া, তাহা হইতেই, ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী এক স্তরের সন্ধান করিয়াছি, তাহার কোনটাই গ্রাহ্য হইবে না। আসলে, আমি ইতিহাসকে ততটা অনুসরণ করি নাই যতটা ছন্দের বিকাশধারায় তাহার পরিণতির পৌর্ব্বাপর্য্যটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। প্রচলিত কৃত্তিবাসের ভাষা যদি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক, কিংবা পরবর্ত্তীও হয়, তবু তাহার ছন্দ ভারতচন্দ্রের তুলনায় অপরিণত—সেই স্তরটিকেই আমার প্রয়োজন। সকল প্রতিভাশালী কবিই তাঁহাদের যুগের বহু অগ্রবর্ত্তী, এজন্য এরূপ কবির পরবর্ত্তী কোনও লেখকের রচনার রীতি-পদ্ধতি পূর্ব্বতর যুগের জের টানিয়া চলিতে পারে, অতএব তাঁহাকে সেই যুগের লক্ষণযুক্ত মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। 'শূন্যপুরাণে'র কবিও ঠিক সেই হিসাবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র কবির পূর্ব্ববর্ত্তী। চণ্ডীদাসের মত কবির সঙ্গে পাল্লা দিবার শক্তি—'শূন্যপুরাণ'-রচয়িতার মত কবির পক্ষে তো কথাই নাই, অন্য কোন কবির পক্ষেও সম্ভব নয়। 'শূন্যপুরাণ' যত পরবর্ত্তী কালেরই হউক, কবি যে ওই ছন্দ ও ওই ভাষার উপরে উঠিতে পারেন নাই, তাহাতে আমার বড় সুবিধা হইয়াছে—আমি বাংলা পয়ারের একটা বিশিষ্ট স্তর খুঁজিয়া পাইয়াছি। খাঁটি ঐতিহাসিক কাল-নির্ণয় ভাষার বিষয়ে যে কারণে প্রয়োজন, এবং ভাষার সেই ইতিহাস ধরিয়া, ছন্দেরও রূপ-বিবর্ত্তন যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়া লইতে হয়, আমার প্রয়োজন তেমন নয়; সে প্রয়োজন ইহাতেই সিদ্ধ হইবে। অতঃপর, মধুসূদনের ছন্দনির্ম্মাণে এই পয়ারের কিরূপ উপযোগিতা ছিল, এবং মধুসূদন ঐ পুরাতন ছন্দটিকে কি উপায়ে এই আধুনিকতম রূপ দিয়াছিলেন, সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

৬

আমি পয়ারের যে আদি রূপ, এবং তাহা হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পর্য্যন্ত ছন্দের যে ছাঁদ, ও ভাষার যে গতি-প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছি, মধুসূদনের সময়ে তাহার সংবাদ কেহ রাখিত না; রাখিলেও, মধুসূদনের মত পণ্ডিত ও ভাষাজ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে তাহা কতটুকু কাজে লাগিত বলা যায় না। কিন্তু সেকালের বাঙালী-সন্তান বলিয়া মধুসূদনের একটা সুবিধা হইয়াছিল—তিনি কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির

কাব্য বাল্যকালেই পড়িয়াছিলেন, এবং সেজন্য খাঁটি বাংলাও যেমন আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তেমনই তাহার ছন্দেও তাঁহার কান অভ্যস্ত ছিল। ইহার পর, ভারতচন্দ্রের কাব্যে সেই বাংলা ভাষা ও ছন্দের যতখানি শিল্পোৎকর্ষ হইয়াছিল, তাহা তিনি নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কার্য্যতঃ তিনি তৎকালপ্রচলিত কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কাব্য হইতেই তাঁহার ছন্দের চরণ আহরণ করিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্র হইতে তিনি, ছন্দের মধ্যে বাংলা বাক্‌ভঙ্গির সমাবেশ সম্বন্ধে, বিশেষ ইঙ্গিতও পাইয়াছিলেন। চৌদ্দ অক্ষরের ওই চরণ, এবং ভাষার কথঞ্চিৎ মার্জ্জিত সাধুরীতি, এবং ছন্দের মধ্যে বাক্‌ভঙ্গির কিছু কিছু ইঙ্গিত—ইহার বেশি কিছু তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের নিকট হইতে পান নাই, এবং ইহাই সম্বল করিয়া তিনি বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—'যে খেলিতে জানে সে কানাকড়িতেও খেলে', মধুসূদনকেও প্রায় সেইরূপ খেলিতে হইয়াছিল; তফাত এই যে, তিনি এই কানাকড়ির মধ্যেই স্বুবর্ণদ্যুতি দেখিতে পাইয়াছিলেন—যাহা সেকালে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। মধুসূদন নিজে তাঁহার এই ছন্দের নির্ম্মাণকৌশল সম্বন্ধে বেশি কিছু বলেন নাই—যেখানে যেটুকু উল্লেখ করিয়াছেন, পরে তাহা বলিতেছি। তিনি যে মিল্‌টনের ছন্দের আদর্শেই এই বাংলা ছন্দ গড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? মিল্‌টনের পূর্ব্বে যেমন—Marlowe, Shakespeare, বাঙালী কবির গুরুও তেমনই মিল্‌টন! বাংলা ছন্দের আদর্শ সন্ধান করিতে হইবে ইংরেজী কাব্যে! এমন কথা কে কবে শুনিয়াছে!

মিল্‌টনের সেই 'five-stress line'-এর মাপে বাংলা পয়ারের মাপ যে অনেকটা মেলে, তাহা বুঝি, কিন্তু তাহার সেই 'five-stress', আর এই একটানা সুরের এক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছন্দ—ইহাদের মধ্যে মিল কোথায়? তবু মধুসূদন তাহাতে হটিলেন না; তিনি নাকি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন—বাংলার পশ্চাতে তাহার জননী (বা মাতামহী) রূপে দাঁড়াইয়া আছে সংস্কৃত; অতএব ফরাসী ভাষার মত ভাষাতেও যাহা সম্ভব হয় নাই, বাংলায়

সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনায়াসে সম্ভব হইবে। ইহাতে, না হয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার—সুন্দর ও সুগম্ভীর শব্দরাজি আহরণ করিবার উপায় হইতে পারে; কিন্তু ইংরেজী 'five-stress line'-এর সেই rhythm কেমন করিয়া আমদানি করা যাইবে?

বাংলা ছন্দের ওই মাপটি বড়ই সুবিধাজনক হইয়াছিল এবং সম্ভবত এই মাপটিই তাঁহার সবচেয়ে বড় ভরসার কারণ হইয়াছিল। ইংরেজী blank verse-এর চরণে যে দশটি অক্ষর (syllable) আছে, তাহা বাংলা বর্ণমাত্রিক অক্ষর নয়, তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে যে একটি করিয়া হসন্ত বর্ণ থাকে, তাহার জন্য, কালের হিসাবে সে চরণের মাপ আমাদের পয়ারের মাপ অপেক্ষা বরং একটু বেশিই হইবে। অতএব এই মাপটি বড়ই ভাল পাওয়া গিয়াছিল। আমার মনে হয়, ঠিক ঐ চৌদ্দ অক্ষরের ছন্দ তৈয়ারি না থাকিলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ-রচনা সম্ভব হইত না। বাংলায় যে এই ছন্দ সম্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ—ভাষার প্রকৃতিবশে পয়ার ক্রমে সেই ১৬ মাত্রার সকল উপসর্গ দূর করিয়া খাঁটি চৌদ্দবর্ণের চরণে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। এই চরণকে লইয়া মধুসূদন তাহার ছন্দকে তরঙ্গিত, এবং সেই তরঙ্গিত ছন্দপ্রবাহকে কূলপ্লাবী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ওই মাপ একটা বড় কথা; চৌদ্দ অক্ষরের তটসীমা লঙ্ঘন করিয়া যে স্রোত প্রবাহিয়া চলিয়াছে, তাহা ওই Rhythm বা তরঙ্গেরই স্রোতোবেগ। ছন্দ সেই তটবন্ধন স্বীকার করিয়াই এমন মুক্তগতি লাভ করে। ইহাই এ ছন্দের সবচেয়ে বড় রহস্য। ঐ মাপ যদি ঠিক না থাকে তবে, এ ছন্দের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়; তখন তাহা গদ্য, কিংবা অন্য কোন ছন্দ হইয়া দাঁড়ায়। মধুসূদন এসব কিছুই বলিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই, তিনি কেবল মিল্টনের ছন্দ পড়িতে বলিয়াছেন, এবং এ ছন্দও পড়িবার সময়ে সেইমত কেবল যতিগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, তাহা হইলেই আর সব ঠিক হইয়া যাইবে। তিনি যদি জানিতেন যে, একদিন তাঁহার এই ছন্দের নামকরণ হইবে "অমিতাক্ষর", তাহা হইলে বোধ হয় শিহরিয়া উঠিতেন। অথবা তাঁহারি ছন্দ লইয়া এতবড় পাণ্ডিত্য যে কেহ করিবে, তাহা তিনি

ভাবিতে পারেন নাই, তাই এ বিষয়ে দেশবাসীর মাথা ঘামাইতে চান নাই, কেবল যাহাতে তাহারা একটু তাল-মান রাখিয়া পড়িতে পারে তাহারই জন্য চিন্তিত মাত্র হইয়াছিলেন। মধুসূদনের ছন্দে যতির স্থান নির্দ্দিষ্ট নয় বলিয়া, তাঁহার ছন্দ 'অমিতাক্ষর'! অর্থাৎ তাহার অক্ষর-সংখ্যাও ঠিক নাই—সে চরণ মাপহীন! কোন ছন্দ যে অমিতাক্ষর হওয়া সত্ত্বেও গদ্য না হইয়া পদ্য হইতে পারে, এমন সিদ্ধান্ত মৌলিক বটে! কিন্তু কিছু বলিবার যো নাই, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের বৈদিক শ্রাদ্ধ-হোম করিতে সুরু করিয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঋত্বিকগণেরই একজন এই অমূল্য তত্ত্বটি উদ্ধার করিয়াছেন। মিল্‌টনের ছন্দকে কেহ এখনও 'অমিতাক্ষর' বলিতে সাহস পায় নাই, তাহার কারণ বোধ হয়, সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও মিল্‌টনের কাব্য পাঠ্য হয় নাই। এই নামকরণের পক্ষে, সেই দুর্দ্দান্ত ছন্দপণ্ডিত যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা হইতে কেবল ইহাই বোধগম্য হয় যে, মধুসূদন তো কেবল ছন্দটাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু ছন্দের যে নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই ছন্দোহীন, অর্থাৎ বেশ মোলায়েম নয়; অতএব, ঐ নামটা আর একটু 'তানপ্রধান' করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এ ছন্দে যতির কাজ যে স্বতন্ত্র, তাহার সঙ্গে চরণের অক্ষর-সংখ্যার যে কোন বিরোধ নাই, এবং যে কোন যতিস্থান পর্য্যন্ত পদচ্ছেদের মাত্রাসংখ্যা যেমনই হোক, মিল্‌টনের Iambic pentameter বা five-stress line-এর মত এই ছন্দও যে মূলে পয়ারের ৮+৬ প্রকৃতিসম্পন্ন, এবং ওই চৌদ্দ মাত্রার মাপটিই যে উহার প্রাণ—ইহা যে না বুঝিয়াছে, সে কেন হেমচন্দ্র পর্য্যন্ত দৌড় দিয়াই ক্ষান্ত হইল না? মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দে যতির কাজ কি তাহা পরে বলিব; কিন্তু যাহার চরণগুলির ওই ৮+৬, এবং ১৪—Law of gravitation-এর মতই একটা দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম, তাহাকেও 'অমিতাক্ষর' নাম দিতে বাধিল না! ইংরেজী 'blank-verse'-এর 'blank'-এর অর্থ কি? মধুসূদন তাহার যে বাংলা করিয়াছেন, তাহা কি তদপেক্ষা সার্থক হয় নাই? যে ছন্দতত্ত্ব অনুসারে ইহারও ভুল সংশোধন করিতে হয়, তাহাকেই ধিক! ক্রমশ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

রামমোহন রায় যে-সকল বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি তালিকা সংকলন করিয়া দিলাম। এই তালিকায় প্রকাশ-কাল-সমেত প্রথম সংস্করণের পুস্তকেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশ পুস্তকেরই মূল সংস্করণ দেখিয়াছি, কিন্তু দু-একখানি ছাড়া কোনখানিরই আখ্যা-পত্র নাই; আদৌ ছিল কি না সন্দেহ। এরূপ ক্ষেত্রে প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে পুস্তকগুলির যে নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

রামমোহনের অধিকাংশ পুস্তকেই গ্রন্থকার-হিসাবে তাঁহার নাম ছিল না; কতকগুলি আবার অপরের নামে বা ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। তবে এগুলি যে তাঁহারই রচনা সে-বিষয়ে সমসাময়িক সাক্ষ্য আছে। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (১৮১৯-২০) দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর যে তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি পুস্তকের গ্রন্থকার-হিসাবে রামমোহনের নামের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ যে আলোচনা করিয়াছেন (pp. xvii-xviii) তাহাও দ্রষ্টব্য।

আর্বী-ফার্সী

১। **তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদিন।** ইং ১৮০৩-৪।

এই পুস্তিকার ভূমিকাটি কেবল আর্বীতে রচিত। ঢাকা গবর্মেণ্ট মাদ্রাসার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মৌলবী ওবেদুল্লা (Obaidullah El Obeide) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ইহা *Tuhfat-ul-Muwahhidin*, or, *A Gift to Deists* নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাহার পর আরও কেহ কেহ করিয়াছেন।

'তুহ্‌ফাৎ' সম্পর্কে একটি কথা বলিবার আছে। রামমোহন এই পুস্তকের শেষে লেখেন :—

> "এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আমি 'মনাজিরাৎ-উল্-আদ্ইয়ান' বা 'নানা ধর্ম্মের বিচার' নামে আমার আর একখানি পুস্তকে করিব।"

ইহা হইতে অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে, রামমোহন এই পুস্তকখানিও প্রকাশিত করিয়াছিলেন।, ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। রামমোহন হয়ত 'তুহ্‌ফাৎ' লিখিবার সময়ে আর একটি পুস্তক লিখিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এমন কি অংশ-বিশেষ রচনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-পুস্তক কখনও প্রকাশিত হয় নাই সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত। কেহ এ-পর্য্যন্ত 'মনাজিরাৎ'-এর এক খণ্ড আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া পরজীবনে রামমোহন তাঁহার দ্বারা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আর্বী বা ফার্সী ভাষায় লিখিত একখানি মাত্র পুস্তকেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছদ্মনামে *Appeal to the Christian Public* নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন; উহাতে তিনি লেখেন:—

> "রামমোহন রায়...ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও অতি অল্পবয়সে পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করেন এবং সেই সময়ে আর্বী ও ফার্সী ভাষায় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।"

'তুহ্‌ফাৎ' ভিন্ন তাঁহার রচিত অন্য কোন আর্বী ও ফার্সী পুস্তক থাকিলে তিনি একাধিক গ্রন্থের নাম করিতেন।

বাংলা ও সংস্কৃত

১। **বেদান্তগ্রন্থ**। ইং ১৮১৫। পৃ. ১৭+১৬৬।

The / Bengalee Translation / of the / Vedant, / or / Resolution / of all the / Veds ; / the most celebrated and revered work / of / Brahminical Theology, / establishing the unity / of / the Supreme Being, / and / that He is the only object of worship. / Together with / a Preface, / By the Translator. / Calcutta : / From the Press of Ferris and Co. / 1815. /

রামমোহন 'বেদান্ত গ্রন্থ' হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন—ইহার উল্লেখ *Translation of an Abridgment of the Vedant* পুস্তকের ভূমিকায় আছে।

সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজ হইতে *Rammohun Roy and America* নামে Adrienne Moore-লিখিত একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানির বিশেষত্ব—রামমোহন রায়ের গ্রন্থপঞ্জী এবং রামমোহন-সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি যাহা দেশী বিদেশী সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার তালিকা। শ্রীমতী মূরের পুস্তকে কতকগুলি মারাত্মক ভুল আছে। রামমোহনের বেদান্ত

গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি যে-ভুলটি করিয়াছেন, এখানে কেবল তাহারই উল্লেখ করিতেছি। তিনি তাঁহার পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষে প্রকাশিত রামমোহনের "ইংরেজী" পুস্তকের তালিকায় প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন :—

> C. *In English* :
> (1815) 1. The Bengalee Translation of the Vedant [or rather, an English version by Rammohuna Raya of his Bengali essay, founded upon select passages cited from the Vedanta-Sutras of Badarayana], or Resolution of all the Veds ; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology, with a preface by the translator. Calcutta, Ferris and Company, 1815.

ইহা যে রামমোহন রায়ের বাংলা বেদান্ত গ্রন্থের আখ্যা-পত্রের নকল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমতী মুর বেদান্ত গ্রন্থখানি উল্টাইয়া উহা বাংলা কি ইংরেজী তাহা দেখিবার কষ্ট স্বীকার করেন নাই; তিনি কেবলমাত্র উহার ইংরেজী আখ্যা-পত্রটি দেখিয়াই উহাকে ইংরেজী পুস্তক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন; নতুবা উপরি-উদ্ধৃত আখ্যা-পত্রে বন্ধনীমধ্যস্থ অংশটি যোগ করিতে গেলেন কেন, এবং "In English"—এই পর্য্যায়ের মধ্যেই বা উহার নামোল্লেখ করিলেন কেন?

২। **বেদান্তসার**। ইং ১৮১৫ *। পৃ. ২২।

'বেদান্ত গ্রন্থে'র ন্যায় 'বেদান্তসারে'র হিন্দুস্থানী অনুবাদও রামমোহন প্রচার করিয়াছিলেন।

৩। **তলবকার উপনিষৎ** (কেনোপনিষৎ)। ইং জুন ১৮১৬। পৃ. ১৭।

৪। **ঈশোপনিষৎ**। ইং জুলাই ১৮১৬। পৃ. ২০+৪+১৩।

৫। **মহামহোপাধ্যায় উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার**। ইং ১৮১৬।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (১৮১৯-২০) ২য় পরিশিষ্টে দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর যে তালিকা আছে, তাহাতে

---

* সকলেই ইহার প্রকাশকাল "১৮১৬" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া আসিতেছেন। রামমোহনের *Translation of an Abridgment of the Vedant* ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় (১ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখে *The Government Gazette* পত্রে ইহার সমালোচনা দ্রষ্টব্য)। 'বেদান্তসার' যে ইহার পূর্ব্বেই বাংলায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ এই ইংরেজী পুস্তিকার ভূমিকায় আছে। সুতরাং 'বেদান্তসারে'র প্রকাশকাল "১৮১৫" ধরাই সঙ্গত হইবে।

উৎসবানন্দ ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার-সম্পর্কীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই তিনখানি পুস্তিকার উল্লেখ পাওয়া যায় :—

SANSKRIT

Reply to the observations of
Ootsobanund Bhuttacharjya...Rammohun Roy...Lulloo Jee [Sunscrit Press]

Answer of the said Ootsobanund
to the above...Ootsobanund Bhuttacharjya Ditto

Rejoinder to the above answer of
the said Bhuttacharjya...Rammohun Roy Ditto

রামমোহনের ইহাই প্রথম শাস্ত্রীয় বিচার। ইহা ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। শ্রীরামপুর কলেজে এই বিচারপুস্তকগুলি আছে (N. 80. 3. 090)।

৩১ আশ্বিন ১২২৩ (১৫ অক্টোবর ১৮১৬) তারখে আত্মীয় সভায় "পূর্ব্বের প্রাপ্ত প্রত্যুত্তরের এই উত্তর শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র দত্তের দ্বারা দেওয়া যায়।" রামমোহনের এই প্রত্যুত্তরটির বঙ্গানুবাদ ১৩৩৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে (পৃ. ১০৪-১১০) প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকার

রাত্রি দুপুর হ'ল। চোখে ঘুম নাই,
ঘুম নাই চোখে আজ। রাতের আকাশে
টুকরা তারার কুচি জ্বলে আর নেভে,
নেভে আর জ্বলে শুধু মুমূর্ষুর মত,
অতল আঁধারে যেন ডুবিছে তাহারা।
বিবর্ণ কাহারো জ্যোতি নীলাভ কঠিন
শেষরক্তোচ্ছ্বাসস্ফীত আরক্ত কেহবা
শ্বাসরোধত্রাসত্রস্ত হায় রে তারকা!
যতদূর দৃষ্টি যায় নিশ্ছিদ্র আঁধার
কঠিন নির্ম্মম দৃঢ়—বিষাক্ত জিহ্বার
লালায় করিছে জীর্ণ পৃথিবী আকাশ।
মূঢ় তারকার দল, এ মিথ্যা প্রয়াস
কেন তবে? এতটুকু জ্যোতির কণিকা
হাসে অন্ধকার মেলি জিহ্বা লেলিহান

শ্রীউমা দেবী

পিতা-পুত্র

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নুটুবাবুর অট্টালিকার সুদৃশ্য ড্রয়িং-রুম

নুটুবাবু এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার চার-পাঁচ বৎসর পর। ইতিমধ্যেই সে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল এবং অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছে। ড্রয়িং-রুমে মূল্যবান আধুনিক আসবাব। দেওয়ালে কয়েকখানি অয়েল-পেন্টিং—রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু। প্রাচীন জিনিসের মধ্যে সেই সূচীশিল্প, It is easier for a camel—সেইখানি রহিয়াছে। নুটুর পরনে মূল্যবান মিহি খদ্দর। পায়ে দামী শুঁড়-তোলা চটি। গায়ে শাল। মাথায় টাকের চিহ্ন। মুখে সিগার। একমনে নুটুবাবু খবরের কাগজ পড়িতেছে

চাকর আসিয়া প্রবেশ করিল এবং একখানি স্লিপ দিল। নুটু সিগার অ্যাশ-ট্রের উপর রাখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল

নুট। কোথায়? কোথায় তিনি?

চাকর। আজ্ঞে, বাইরে চেয়ারে বসতে দিয়েছি।

নুট। আঃ, ইডিয়ট কোথাকার!

ব্যস্তভাবে বাহিরে গেল, চাকরও গেল, পুনরায় নুটু এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে লইয়া প্রবেশ করিল

আসুন, আসুন। কাশী থেকে কবে ফিরলেন? বসুন।

নিজে দামী আসন আগাইয়া দিল

বৃদ্ধ। ফিরেছি আজ চার-পাঁচ দিন হল। শুনলাম সব। ভারী আনন্দের কথা। তুমি এত বড় বাড়ি করেছ, অ্যাসেম্ব্লির মেম্বার হয়েছ, তোমার ছেলে এম. এ.-তে ফার্স্ট হয়েছে। ভাবলাম, বেটার লেট দ্যান নেভার, যাই, একবার নুটুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। এখন বল, কি জানাব—অভিনন্দন, না আশীর্ব্বাদ?

নুট। (প্রণাম করিয়া) সমস্তই আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

বৃদ্ধ। বার থেকে যখন তোমাকে সাপোর্ট ক'রে আপীলটা আমার সইয়ের জন্যে পাঠালে, তখন প্রথমটা একটু আশ্চর্য্য হলাম। মুটু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে! কংগ্রেস মুটুকে নমিনেশন দিলে না! যাক, বার-লাইব্রেরির এককালে প্রেসিডেণ্ট ছিলাম, তুমি হ'লে বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট, আমি সঙ্গে সঙ্গেই সই ক'রে পাঠিয়ে দিলাম।

মুট। আপনার নামে অনেক কাজ হয়েছে। আপনার নাম—

বৃদ্ধ। না না। বড় উকিল ব'লে পসার ছিল; তাকে কি আর নাম বলে! তুমি কর্ম্মী, কীর্ত্তিমান পুরুষ, উদ্যোগী পুরুষসিংহ; তোমার নিজের গুণেই কংগ্রেস-ক্যাণ্ডিডেটকে হারানো সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু কেন? কংগ্রেস তোমাকে নমিনেশন দিলে না কেন?

মুট। পার্টি পলিটিক্স তো জানেন! পার্টি পলিটিক্স আর কি! আমি যথাসর্ব্বস্ব কংগ্রেসের প্রয়োজনে ঢালতে পারছি না; এবারকার সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভ্‌মেণ্টে আমি জেলে যাই নি।—এই আমার অপরাধ।

বৃদ্ধ। সত্যি কথা বলতে কি মুটু, মডার্ন পলিটিক্স, এই সব আন্দোলন আমি বেশ বুঝতে পারি না বাপু। জেলেই যদি সবাই যাবে, তবে কাজ করবে কে হে বাপু?

মুট। (হাসিয়া) জানেন, পার্টির মুভ্‌মেণ্টের সময়, আমার ছেলেকে আমি সেই কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, দেশের অন্নবস্ত্রের আগে সংস্থান কর। জেলে যাওয়ার চেয়ে সেটা বড় কাজ। মুখে সে প্রতিবাদ করলে না, কিন্তু সেই দিনই বিকেলে সে অ্যারেস্টেড হ'ল। থার্টি থার্টি-ওয়ান, দু বছর মাটি ক'রে এবার সে এগ্‌জামিন দিলে। আমার ছোট ছেলে আরও প্রগতিশীল, সে এখনও দেউলীতে। আমার বড় ছেলে, ইলেক্‌শনের সময় কলকাতায় গিয়ে ব'সে রইল, পাছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমার জন্যে তাকে কাজ করতে হয়।

বৃদ্ধ। ছেলের বিয়ে দাও হে, ছেলের বিয়ে দাও। সব সেরে যাবে ওসব হ'ল এক ধরনের হিস্টিরিয়া।

মুট। বিয়ে তো হয়েই যেত এতদিনে, কিন্তু জেলে তো আর ছাঁদনাতলা

পাতা যায় না! এইবার বিয়ে দেব। কিন্তু ছেলে বলে কি জানেন, উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করব না।

বৃদ্ধ। ভাল কথা হুটু। তুমি কি ছেলের বিয়ে কোথাও ঠিক ক'রে রেখেছ?

হুট। হ্যাঁ। (ইতস্তত করিয়া) মানে, অনেকদিন আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমার স্ত্রী; আমিও অবশ্য—

বৃদ্ধ। দেখ, কয়েকদিন আগে, আমার বাড়ির সামনেই নর্দ্দমার ধারে একটা মাতাল প'ড়ে ছিল, লোকে বললে—হুটুবাবুর বেয়াই! আর আবার দেখলাম, সে একটা অতি ইতর জাতের মাতালের সঙ্গে মাতলামো করছে। আজও লোকে বললে—হুটুবাবুর বেয়াই একটি দরিদ্র বিধবা এসেছিল আমাদের বাড়ি, হাতে তৈরি জামা টেবিল-ক্লথ বিক্রি করতে। মেয়েরা বললে—তোমার বেয়ান। প্রতিশ্রুতি কি তোমার এদের কাছে?

হুট। (মাথা হেঁট করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি আমার ওঁদের কাছেই। এ আমার হয়েছে নীলকণ্ঠের বিষ।

বৃদ্ধ। এ বিষ উদরস্থ হ'লে কিন্তু মারাত্মক হবে হুটু। না না, তুমি এ কাজ ক'রো না। কঙ্কণার ন্যায়রত্ন-বংশ তোমরা, তুমি নিজে কীর্ত্তিমান হয়েছ ওই বংশের পবিত্রতায়। এ কাজ তুমি ক'রো না।

মহাভারতের প্রবেশ। ভঙ্গি তাহার সঙ্কুচিত, পূর্ব্বের মত স্বচ্ছন্দ নয়

হুট। কি মহাভারত?

মহাভারত প্রণাম করিল

মহা। আজ্ঞে, দিদি-ঠাকরুণ এলেন, সঙ্গে এলাম। তাই বলি, আপনাকে পেনাম—

হুট। কল্যাণী এসেছে?

মহাভারত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ। এটি তোমার সেই চাষী-বীর নয়? যাকে নিয়ে তোমার কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়?

মুট। (হাসিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ। সবচেয়ে বড় কীর্ত্তির কন্‌গ্রাচুলেশনই তোমাকে দেওয়া হয় নি মুটু। ওইটেই তোমার সবচেয়ে বড় কীর্ত্তি হে। কঙ্কণার বাবুদের মত দাম্ভিক অত্যাচারী বাবুদের তুমি জব্দ কর নি, সংশোধন করেছ। কঙ্কণায় আমি গিয়েছিলাম, আমায় পুরনো মক্কেল তো, ওঁদের এলাকায় জমি-জেরাত আমার আছে। দেখলাম, সে আমলই আর নেই, ধারা-ধরন সব পাল্টে গেছে। কর্ত্তাবাবু বললেন, এসব হ'ল মুটু উকিলের শিক্ষা রাজেনবাবু। ব'লে হা-হা ক'রে হাসলেন। স্বীকার করলেন, আগে যা করতেন, সেসব অন্যায়। তোমার অ্যাসেম্ব্লি ইলেক্‌শনে ওঁরা তো তোমাকে সাপোর্ট করেছিলেন শুনলাম। বড়বাবু বললেন, মুটুর ওপর রাগ তো নেই-ই, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, কত বড় লোক মুটু, আমাদের গ্রামের গৌরব; তাকে আমরা সাপোর্ট করব না!

মহা। আমি বাইরে যাই দাদাঠাকুর।

সসম্ভ্রমে প্রস্থান

মুট। (মহাভারতের যাওয়াটা গ্রাহ্যই করিল না) হ্যাঁ, ওঁরা আমাকে সত্যিই লজ্জা দিয়েছেন রাজেনবাবু। অল্প বয়সে মানুষ এক দিকই দেখে, দু দিক সে দেখতে চায় না। দিনে আলোকেই ভাবে একমাত্র সত্যি, আলোই থাকবে চিরকাল, আবার রাত্রে অন্ধকারকেও ভাবে তাই। দোষগুণ নিয়ে মানুষ, কঙ্কণার বাবুদের দোষটাই সে বয়সে আমার চোখে পড়েছিল, দোষ ছাড়া কিছু দেখতে পাই নি; কিন্তু আজ দেখছি, গুণও যথেষ্ট আছে ওঁদের।

বৃদ্ধ। কর্ত্তাবাবু তোমার এখানে আসবেন একদিন।

মুট। কর্ত্তাবাবু?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ। কর্ত্তাবাবু রসিক লোক তো, বললেন, যাব একদিন মুটুবাবুর ওখানে। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তা বললেন, মুটু শুনেছি মস্ত উকিল, এ-জেলা ও-জেলা থেকে ডাক আসে; আমি একবার তার সঙ্গে সওয়াল জবাব করতে যাব রাজেনবাবু। নিজের নাতি, দেবনারাণবাবুর ছেলেকে দেখালেন, ছেলেটি এবার বি. এ.

পাস করেছে। ভাল ছেলে। বল্লেন, একেও আমি উকিল করব। তা তোমার ছেলেটি কই ? আমাদের দেশের ভাবী উজ্জ্বল নক্ষত্র ?

নুট। অরুণ !

প্রবেশ করিল শ্যামা

শ্যামা। দাদা বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি।

বৃদ্ধ। এটি তোমার মেয়ে ?

নুট। প্রণাম কর শ্যামা।

শ্যামা প্রণাম করিল

বৃদ্ধ। রাজরাণী হও ভাই। বাঃ, চমৎকার মেয়ে ! (শ্যামা ভিতরে চলিয়া গেল) মেয়ের বিয়ের ঠিক কিছু করলে ? এইবার বিয়ে দাও।

নুট। পাত্র খুঁজছি, কিন্তু মনের মত যে পাচ্ছি না ! বর পাচ্ছি তো ঘর পাচ্ছি না, ঘর মিলছে তো বর মনের মত হচ্ছে না।

বৃদ্ধ। এক কাজ কর না, দেবনারাণের ছেলেটিকে দেখ না ! ছেলেটিকে আমার বড় ভাল লাগল হে।

নুটু চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল

তবে আজ উঠলাম নুটু। তোমার ছেলেকে একদিন পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। আলাপ করব।

নেপথ্যে জড়িত কণ্ঠে সুশোভন বলিতেছে—

"মরণ রে ! তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।"

বৃদ্ধ। ওই সেই লোকটি না ?

নুট। (গম্ভীরভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ। না নুটু, তুমি এ কাজ ক'রো না। না না না, তোমার মত লোকের—ছি ! ছি ! ছি !

নুটু চুপ করিয়া রহিল। প্রবেশ করিল সুশোভন

আচ্ছা, আমি আজ আসি।

প্রস্থান। নুটু তাঁহাকে আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল ; ক্রুদ্ধ গম্ভীর তাহার মূর্ত্তি

নুট। দারোয়ান !

সু। (অত্যন্ত বিমর্ষভাবে) আমার মুখ দিয়ে আজ রক্ত উঠল ঘুটুদা। আমায় দশটা টাকা দেবে? ডক্টর সেন আট টাকার কম দেখেন না।

দারোয়ানের প্রবেশ। অভিবাদন করিল

ঘুট। ইসকো নিকাল দো বাড়িসে।

দারো। হুজুর?

সে বিস্মিত হইল

ঘুট। নিকাল দো ইস্‌কো।

সুশোভনকে আঙুল দিয়া দেখাইল

সু। আমাকে নিকাল দেবে ঘুটুদা?

ঘুট। (দারোয়ানকে) খাড়া হোকে কেয়া দেখতা তুম?

সু। আমি যাচ্ছি ঘুটুদা। I have no desire to live। রোগের যন্ত্রণা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। Still I wanted to live for কল্যাণী। সে বড় আঘাত পাবে। That is the reason why I came abegging for money। আমি যাচ্ছি। মরণ রে! তুঁহু মম শ্যাম সমান।

প্রস্থান

ঘুট। আওর কভি ইনকো বাড়িমে ঘুষনে মত দো। নেহি তো তুমহারা নোকরি চলা যায়েগা। যাও।

দারোয়ানের প্রস্থান

মুহুরীর কয়েকটা ফাইল লইয়া প্রবেশ

এখন নয়, পরে। যাও এখন।

ফাইল রাখিয়া মুহুরীর প্রস্থান

শ্যামা!

শ্যামার প্রবেশ

শ্যা। বাবা?

ঘুট। মহাভারত বললে, কল্যাণী এসেছে!

শ্যা। হ্যাঁ। মায়ের সঙ্গে গল্প করছেন।

স্টুট। পাঠিয়ে দাও এখানে।

শ্যামা চলিয়া যাইতেছিল

এক্ষুনি। বলবে, আমি অপেক্ষা ক'রে রয়েছি। এক্ষুনি।

শ্যামার প্রস্থান

স্টুট্ দীর্ঘ দৃঢ় পদক্ষেপে পায়চারি করিতে লাগিল। কল্যাণীর প্রবেশ

স্টুট। (স্থির হইয়া দাঁড়াইল) কল্যাণী! আমি সুশোভনকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিয়েছি। আর কোন দিন আমার বাড়ি ঢুকতে তাকে বারণ ক'রে দিয়েছি।

কল্যাণী। (মাথা হেঁট করিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল) আপান দাদা, শাসন আপনি করবেন বইকি স্টুটুদা।

স্টুট। না, শাসন নয়। তার সঙ্গে কোন আত্মীয়তা আমার নেই। হতে পারে না। তোমাকেও ওকে ত্যাগ করতে হবে কল্যাণী।

কল্যাণী। (শিহরিয়া) স্টুটুদা! ছোড়দার মুখ দিয়ে মধ্যে মধ্যে রক্ত ওঠে। উনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না।

স্টুট। তার মরবার জায়গার অভাব হবে না কল্যাণী। হাসপাতাল আছে, গাছতলা আছে, পথ আছে।

কল্যাণী। আপনি কি বলছেন স্টুটুদা!

স্টুট। সত্য চিরদিন নিষ্করুণ কঠোর। জ্ঞানহীন শিশু আগুনের শিখায় হাত দিলে, জ্ঞানহীন ব'লে আগুন তাকে ক্ষমা করে না। বিধাতার বিচার আগুনের মতই দীপ্ত পবিত্র, অথচ নিষ্ঠুর। সে বিচারের দণ্ড থেকে অপরাধীকে রক্ষা করতে গেলে, তার আঁচ তোমাকেও লাগবে। আরও একটা কথা। তোমাকেও কতকগুলো জিনিস ছাড়তে হবে।

কল্যাণী। (স্থিরভাবে স্টুটুর দিকে তাকাইয়া, ধীর স্বরে) বলুন।

স্টুট। দারিদ্র্যকে আমি শ্রদ্ধা করি কল্যাণী; কিন্তু সে দারিদ্র্য মর্যাদাহীন নয়, সে দারিদ্র্য মহত্ত্বহীন নয়, তাতে মালিন্য নেই।

কল্যাণী। সেই দীক্ষাই তো আপনার কাছে—

স্টুট। আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি নিতে পার নি। কল্যাণী, তুমি জামা তৈরি ক'রে বিক্রি করতে যাও ভদ্রলোকের বাড়িতে, তারা

তোমাকে করুণা ক'রে জিনিস কেনে, দাম বেশি দেয় দয়া ক'রে। সেটা বিনিময় নয়, দান। তোমার বেশভূষার দিকে চেয়ে দেখ, সেখানে মালিন্যের ছাপ। ওসব তোমায় পরিত্যাগ করতে হবে।

কল্যাণী। আর কিছু আমায় বলবেন দাদা?

হুট। তোমার উত্তর শুনতে চাই বোন।

কল্যাণী। না।

হুট। সময় চাচ্ছ? উত্তর এখন দিতে পারবে না?

কল্যাণী। না। আমার উত্তরই দিচ্ছি। না। আপনার যুক্তি আমি স্বীকার করি না। দয়া আমি কারও কাছে নিই না। আমার দারিদ্র্য আমার অহঙ্কার। আর ছোড়দা আমার রুগ্ন ভাই। তা ছাড়া হুটুদা, আপনি যখন তাকে আত্মীয় ব'লে স্বীকার করতে পারছেন না, তখন মমতার বাপকেই বা আত্মীয় ব'লে স্বীকার করবেন কি ক'রে? মমতা তো তার বাপকে অস্বীকার করতে পারবে না হুটুদা।

হুট। (মুখের দিকে চাহিয়া) তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমি সকল সংস্রব ত্যাগ করলাম কল্যাণী। ভবিষ্যতেও—

কল্যাণী। মমতাকে ছোড়দাকে নিয়ে আজই আমি এখান থেকে চ'লে যাব।

প্রস্থানোদ্যত

হুট। অপেক্ষা কর। (কল্যাণী দাঁড়াইল) (হুটু আলমারি খুলিয়া গহনার বাক্স বাহির করিয়া কল্যাণীকে দিল) মমতার গহনা, আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলে। আর একটা কথা।

কল্যাণী। বলুন।

হুট। সম্বন্ধ ছাড়বার আগে যদি মমতার মামা হিসেবে, তার বিবাহে কিছু যৌতুক দিই, সে কি তুমি নেবে না?

কল্যাণী। (একটু ভাবিয়া) মাথা পেতে নেব হুটুদা।

হুটু চেক-বই বাহির করিয়া একটা চেক লিখিল

হুট। এই নাও। মমতার বিয়েতে যৌতুক দিও।

কল্যাণী। (চেক মাথায় ঠেকাইয়া) শ্যামা, অরুণের আমি পিসীমা।

তাদের বিয়েতে আমাকেও কিছু দিতে হয় দাদা। গরিব বোন ব'লে ফিরিয়ে দেবেন না।

প্রণাম করিয়া চেকখানি পায়ে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল

নুটু চেকখানি কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে ছিঁড়িয়া ফেলিল। চেয়ারে বসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সিগার ধরাইল। মুহুরীর প্রবেশ

মুহুরী। যে মকদ্দমাটায় আমরা হেরেছি, সেইটার রায়। (রায়ের কাগজ নামাইয়া দিল) হাইকোর্টে আপীল করবে পার্টি। তাই বলে, পয়েণ্টগুলো একবার দেখে—

নুট রায়খানা তাহার হাত হইতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল

মুহুরীর প্রস্থান

নুট। (পড়িতে পড়িতে উত্তেজিতভাবে) অ্যান ইডিয়ট! গর্দ্দভে বিচারকের আসনে বসলে চীৎকারের মূল্য থাকে, যুক্তি হয় মূল্যহীন! (রায়খানা সক্রোধে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল) পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার!

উঠিয়া পদচারণা আরম্ভ করিল। বাহিরে মোটরের হর্ন বাজিল

মুহুরীর পুনঃপ্রবেশ

মুহু। (ব্যস্তভাবে) বাবু! কঙ্কণার বাবুরা, কর্ত্তাবাবু, দেবনারাণবাবু এসেছেন।

নুট। (চকিত হইয়া উঠিল) কে? কঙ্কণার বড়বাবু?

ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। মুহুরী রায়খানা কুড়াইয়া ফাইল সমেত গুছাইয়া লইল। নুটু, শিবনারায়ণ ও দেবনারায়ণের প্রবেশ। মুহুরীর প্রস্থান

নুট। আসুন, আসুন, আসুন। মহাভাগ্য আমার আজ। বসুন।

বড়বাবুকে প্রণাম করিল, দেবনারায়ণকে নমস্কার করিল

শিব। সে তো তুমি না বলতেই এসেছি হে! এখন তাড়িয়ে দেবে কি না বল?

নুট। (পুনরায় প্রণাম করিয়া) তা বলতে পারেন? আপনাদের কাছে আমার অনেক অপরাধ। তবে আমি অমানুষ নই।

শিব। একশো বার, হাজার বার। শুধু মানুষ নয় হে, তুমি একটা মরদ। মরদ পুরুষ সংসারে বড় দুর্লভ হে—তুমি একটা মরদ।

দেব। অপরাধ আপনার নয় হুটুবাবু, দোষও আমাদের অনেক ছিল।

শিব। (চারিদিক দেখিয়া) তাই তো হে হুটু, এ যে তুমি ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছ দেখছি! বা-বা-বা! বলিহারি বলিহারি! হুঁ, তুমি মরদ বটে!

হুট। এখন বসুন।

শিব। শোন হে হুটু, কি জন্যে এসেছি শোন। তোমার সঙ্গে সওয়াল করতে এসেছি। দেশের মধ্যে তো তুমি সবচেয়ে বড় উকিল। এ-জেলা ও-জেলা ক'রে বেড়াচ্ছ। আজ আমি তোমার সঙ্গে সওয়াল করব।

হুট। (হাসিয়া) বেশ, বসুন।

শিব। ধর, তোমার বাড়িতে ভিখিরী এসেছে। তাকে বসতে ব'লে আর কি আপ্যায়িত করবে, যদি ভিক্ষেই না দাও তাকে?

হুট। এ যে বড় অসম্ভব কথা—আশঙ্কার কথা। আমার কাছে আপনারা ভিক্ষা চাইবেন, এ যে বলির দ্বারে বামনদেবের ভিক্ষা চাওয়া। বেশ, আগে বসুন।

শিব। হুঁ। উপমাটা তুমি বড় ভাল দিয়েছ হুটু। তবে দেখ, বিবেচনা ক'রে দেখ। পাতালে থাকতে যদি ভয় হয় তো ভেবে দেখ। (হা-হা করিয়া হাসিলেন)

হুটু। বসুন আগে।

শিব। উঁহু। আগে তুমি দেবে বল; তবেই বসি, নইলে যাই।

হুট। বেশ, মাথাই পাতলাম আপনার পায়ে। এইবার বসুন।

শিব। (বসিয়া) তোমার বড় ছেলেটিকে আমাকে ভিক্ষে দিতে হবে; আমার নাতনীকে তোমায় আশ্রয় দিতে হবে। দেবনারাণের মেয়ে—

দেব। (হুটুর হাত চাপিয়া ধরিল) আমাকে কন্যাদায় থেকে আপনি উদ্ধার করুন।

শিব। তোমার ছেলে খুব ভাল, বি. এ. এম. এ.-তে ফাস্টো হয়েছে। তুমি নিজে একটা মরদ; দেশ-বিদেশে নামডাক। টাকাও করেছ অঢেল, কিন্তু কঙ্কণার বাবুদের বাড়ির মেয়ে, ধনে, কুলে, মানে,

তোমার বাড়ির অযোগ্যি হবে না। আর নাতনীর আমার লক্ষণ ভারী ভাল হে। রূপের কথা আর বলব না, তুমি নিজেই দেখবে। আমি তো মুটু, ম'জে আছি নাতনীর রূপে। দেবুর যে আমার জামাই পছন্দ হ'ল না, নইলে—(হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন)

দেব। মুটুবাবু?

মুট। (হাসিয়া) ছাড়ুন। কর্তাকে আগে প্রণাম করি। (প্রণাম করিয়া) ভিক্ষে আমি দিচ্ছি, কিন্তু ভিক্ষে তো শুধু দিতে নেই—সে তো আপনাকে বলতে হবে না। দক্ষিণে সমেত ভিক্ষে দোব আমি। "না" বললে শুনব না। আমার কন্যাও বিবাহযোগ্যা। সেইটিকে দক্ষিণেস্বরূপ আপনাদের নিতে হবে—দেবুবাবুর বড় ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে।

শিব। বলিহারি, বলিহারি, বলিহারি! এই না হ'লে উকিল! ওরে বাপ রে! উল্টো ছাঁদে গেরো! ও দেবু, মুটু যে হারিয়ে দিলে রে! (হা-হা করিয়া হাসিলেন) আচ্ছা, তাই হ'ল।

মুটু। ছেলে-মেয়েকে আমি ডাকি।

শিব। না। আজ থাক। দেখাশোনা দিন দেখে। আজ নয়। আচ্ছা, আজ তা হ'লে উঠলাম।

মুট। সে কি, একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যেতেই হবে।

শিব। আজ নয় বাবা। আগে তুমি যাবে কঙ্কণার বাড়ি, আমার বাড়ি পায়ের ধুলো দেবে, তবে। আজ ঝলো না। সে আমার প্রতিজ্ঞা আছে মুটু। উঁহু, সে হবে না।

মুট। (হাসিল) বেশ, আজ বিকেলেই যাব আমি।

শিবনারায়ণ দেবনারায়ণ অগ্রসর হইলেন, মুটু অনুসরণ করিল। মুটু ফিরিল

মুট। বিমলা! বিমলা!

শ্যামার প্রবেশ

শ্যা। মা কঙ্কণায় গেছেন।

মুট। কঙ্কণায়? এ কি, তুই যেন কেঁদেছিস মনে হচ্ছে শ্যামা?

শ্যা। না বাবা, না।

প্রস্থান

মুট। শ্যামা!

অনুসরণোদ্যত মহাভারতের প্রবেশ

মহা। দাদাঠাকুর!

মুট। এস মহাভারত। বাবুরা আজ কি জন্যে এসেছিলেন জান? দেবু-বাবুর মেয়ের সঙ্গে—

মহাভারত প্রণাম করিল

মহা। আমি চললাম দাদাঠাকুর।

মুট। না। ওবেলায় আমার সঙ্গে যাবে। আমি ওবেলা বাবুদের ওখানে যাব, তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

মহা। না।

মুট। তুমি অরুণের খুড়ো, দেবনারাণবাবু তোমাকে বেয়াইয়ের মত সম্মান করবেন।

মহা। না দাদাঠাকুর। দিদি-ঠাকরুণ কাশী যাচ্ছে, আমিও তেনার সাথে কাশী যাচ্ছি। আর কটা দিন বলেন, ই কটা দিনের তরে বাবুদের বেয়াই হতে লারব। (চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আপুনি শেষটা এই করলেন দাদাঠাকুর?

প্রস্থান

মুট। (দৃঢ়ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া) মহাভারত! মহাভারত!

অগ্রসর হইল, দরজার মুখেই অরুণ প্রবেশ করিল, মুটু থমকিয়া দাঁড়াইল

অরুণ। সে চ'লে গেল।

মুট। ডাক তো তাকে।

অরুণ। সে ফিরবে না বাবা।

মুট। (হাসিয়া) সে আমার ওপর রাগ করেছে। একজন লোক পাঠাতে হবে ওর বাড়িতে। যাক, তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে অরুণ।

অরুণ। আপনার কাছে আমারও কিছু বলবার আছে।

মুট। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরুণের আপাদমস্তক দেখিয়া) অরুণ!

অরুণ। বলুন।

নুট। আমার মনে হচ্ছে, আমার বক্তব্যের সঙ্গে তোমার বক্তব্যের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। নয় কি?

অরুণ চুপ করিয়া রহিল

নুট। বল, কি বলবে বল? তোমার বক্তব্যই আগে শুনব আমি।

অরুণ। আপনি কি কল্যাণী-পিসীমাকে—

নুট। কল্যাণীর সঙ্গে আমি সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছি।

অরুণ। ত্যাগ করেছেন?

নুট। তুমি কি আমার কাছে তার জন্যে কৈফিয়ৎ চাও?

অরুণ। না। ও কথা আর জিজ্ঞাসা করব না। আমার আর একটা কথা জানবার আছে। আপনি কি কঙ্কণার গাঙ্গুলীদের বাড়িতে আমার বিবাহের সম্বন্ধ করেছেন?

নুট। লজ্জাহীনতা কি মডার্নিজ্‌মের প্রধান ধর্ম্ম অরুণ?

অরুণ। জীবনের অতি গুরুতর সমস্যায় আপনার মত ব্যক্ত করা কি লজ্জাহীনতা বাবা? সে হ'লে আপনার কথা সত্য, আমি স্বীকার করছি।

নুট। ভাল। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই অরুণ।

অরুণ। বলুন।

নুট। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইণ্ডিভিজুয়াল হিসেবে তোমার অধিকার আমার চেয়ে কম নয়। তোমার সে অধিকার আমি স্বীকার ক'রে এসেছি। কিন্তু আমার ঘর, আমার গ'ড়ে তোলা সাম্রাজ্য, সেখানে আমি সম্রাট।

অরুণ। দেশের শাসনতন্ত্রের মধ্যে যদি আপনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বাধীনতার অধিকার থাকে, সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি বিদ্রোহ করবার অধিকার আপনার থাকে, তবে আপনার সাম্রাজ্যের মধ্যে—

নুট। তুমি বিদ্রোহ করবে অরুণ? তুমি আমাকে অমান্য করবে?

অরুণ। গাঙ্গুলীদের বাড়িতে আমি বিয়ে করতে পারব না বাবা, এই কথাটা আপনার পায়ে ধ'রে বলতে এসেছি।

স্টু। (সরিয়া গিয়া) থাক, আমার পা তুমি স্পর্শ ক'রো না।

অরুণ নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

তোমার বক্তব্যের বোধ করি আরও কিছু বাকি আছে। সেটা বোধ করি এই যে, মমতাকেই তুমি বিবাহ করতে চাও ?

অরুণ নীরব হইয়া রহিল

স্টু। (আপন মনেই আবৃত্তি করিল)

I tax not you, you elements, with unkindness ;
I never gave you kingdom, called you children
You owe me no subscription ; then let fall
Your horrible pleasure ; here I stand your slave,

অরুণ, আজ কিং লিয়ারকে আমার মনে পড়ছে। অবশ্য কিং লিয়ারের মত সর্বস্বান্ত ইমোশানাল নই আমি। (অরুণের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া) তুমি বিদ্রোহ করতে চাও অরুণ ?

অরুণ। (নতজানু হইয়া আবেগভরে) আপনার কাছে আমি মিনতি করছি। আপনার গৌরবে আমি যে বিশাল সৌধ গ'ড়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে আছি, সে সৌধ আপনি ভেঙে দেবেন না। আপনার আদর্শ—

স্টু। ইউ মীন টু সে কঙ্কণার বাবুদের বাড়িতে তোমার বিয়ে দিলে আমি আদর্শচ্যুত হব ?

অরুণ। কল্যাণী-পিসীমাকে, সুশোভনবাবুকে, মমতাকে পরিত্যাগ করলে আপনি আদর্শচ্যুত হবেন, সে কি আপনি বুঝতে পারছেন না ?

স্টু। আমার আদর্শবোধে তোমার সন্দেহ জেগেছে অরুণ ? এত বড় ইম্পার্টিনেন্স তোমার ? এত বড় স্পর্দ্ধা ? গেট আপ, উঠে দাঁড়াও।

অরুণ উঠিল

এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার ?

অরুণ নীরব

উত্তর দাও। এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার ?

অরুণ। না, স্পর্দ্ধা আমার নয়, স্পর্দ্ধা আমার আদর্শের, যে আদর্শে আপনি আমায় দীক্ষা দিয়েছেন। স্পর্দ্ধা আমার শিক্ষার, যে শিক্ষা আমাকে দিয়েছেন আপনি।

মুট। সে শিক্ষার আরও কিছু বাকি আছে। শোন। অবাধ্য সন্তান আর দুষ্ট অঙ্গের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। দুষ্ট অঙ্গের মতই তাকে পরিত্যাগ করতে হয়।

অরুণ বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল

তুমি জান অরুণ, কত বড় আঘাত তুমি আমায় দিয়ে যাচ্ছ?

অরুণ একবার দাঁড়াইল। তারপর চলিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই সে ফিরিয়া আসিল

অরুণ। ওইটে আমি নিয়ে যাব। কার্পেটের ওপর লিখেছিলাম আমি বুনেছিলেন মা। ওটা আমি নিয়ে যাব।

It is easer for a camel লেখা সূচীশিল্পের দিকে অগ্রসর হইল

মুট। (সক্রোধে) অরুণ!

অরুণ। না, ওটা আর এখানে থাকবে না। থাকতে পারে না. ওটা রাখবার আপনার অধিকার নেই।

মুট। অরুণ!

অরুণ। আপনি আজ ধনী, দারিদ্র্যকে আজ আপনি ঘৃণা করেন। মিথ্যা মর্য্যাদার মোহে মানুষকে আপনি আত্মীয় স্বীকার করতে লজ্জা পান। বীর্য্যে সাহসে গৌরবান্বিত অতীতকে স্বীকার করতে আপনার আজ সঙ্কোচ হয়। এ আপনার কাছে থাকবে না, এ আমি নিয়ে যাব।

মুট। ওটা তোমার মায়ের হাতের কাজ অরুণ, ওটা তুমি রেখে যাও। তোমার মা আমাকে পরিত্যাগ করেন নি।

অরুণ। আমার আগেই আমার মা চ'লে গেছেন।

মুট। চ'লে গেছেন?

অরুণ। কল্যাণী-পিসীমা চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চ'লে গেছেন।

অরুণ চলিয়া গেল

মুট। রেখে যাও, ওটা রেখে যাও, অরুণ! ওটা রেখে যাও।

(থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) বিমলা! অরুণ! মহাভারত! (দরজার সন্ধান করিতে করিতে) দরজা! দরজা! দরজা কই? দরজা! গেট অফ হেভেন্স কি বন্ধ হয়ে গেল? স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল? বিমলা! বিমলা! (কাঁপিতে কাঁপিতে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া সোফায় পড়িয়া গেল)

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। বাবা! বাবা! বাবা! এ কি! দাদা! দাদা!

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষান্তর

অরুণ চলিয়া যাইতেছে, শ্যামা প্রবেশ করিল

শ্যামা। ফেরো দাদা, ফেরো। বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

অরুণ। অজ্ঞান হয়ে গেছেন?

শ্যামা। হ্যাঁ। শিগগির ডাক্তার ডাক—শিগগির।

অরুণ। এইটে—এইটে, শ্যামা, এইটে নিয়ে যা। আমি পাশের বাড়ির ডাক্তারকে ডাকি।

শ্যামা। মায়ের কাছে লোক পাঠাও দাদা, শিগগির।

সূচীশিল্পটিকে লইয়া সে চলিয়া গেল

অরুণ। মুহুরীবাবু, শিগগির পাশের ডাক্তারবাবুকে ডাকুন। বাবার অসুখ। অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

নেপথ্যে শ্যামা। জল ঢাল, কেষ্ট, মাথায় জল ঢাল।

অরুণ। দারোয়ান, দারোয়ান!

দারোয়ানের প্রবেশ

শিগগির তুমি কঙ্কণায় যাও। মাকে গিয়ে বল, বাবার বড্ড অসুখ, শিগগির।

দারোয়ানের প্রস্থান। অরুণ ভিতরে গেল। পুনরায় ফিরিয়া আসিল

বরফ। বরফ। মুহুরীবাবু! মুহুরীবাবু! ডাক্তারবাবু কি এখনও এলেন না?

প্রস্থান

নেপথ্যে স্থুট। দরজা, দরজা। বিমলা, দরজা খুলে দাও। বিমলা!

নেপথ্যে অরুণ। এই যে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ও অরুণ ঘর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই অরুণ প্রবেশ করিল

অরুণ। মুহুরীবাবু! হরিশ! মুহুরীবাবু কি এখনও বরফ নিয়ে ফেরেন নি?

প্রস্থান

নেপথ্যে স্থুট। বন্ধ হয়ে গেল—বন্ধ হয়ে গেল।

নেপথ্যে শ্যামা। সব দরজা-জানালা খুলে দিয়েছি বাবা।

বরফ লইয়া মুহুরী ভিতরে গেল

বিমলা ও অরুণের প্রবেশ

বিমলা। রাস্তায় দরোয়ানের সঙ্গে দেখা হ'ল। কি হয়েছে অরুণ? কোন আশাই কি নেই। ওরে, ওদের তুই নিয়ে আয়। আমি—

নেপথ্যে স্থুট। মাই লর্ড!

বিমলা ও অরুণের বিপরীত দিকে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ড্রয়িং-রূম

সোফার উপর স্থুট্ শায়িত। ডাক্তার, শ্যামা, চাকর। ডাক্তার ইন্‌জেক্‌শনের সিরিঞ্জ ধুইতেছে

বিমলা প্রবেশ করিল এবং স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে তাহাকে দেখিল

স্থুট। (প্রলাপ বকিতেছে) It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God!

বিমলা। (কঠিন সংযমে নিজেকে সংযত করিয়া ধীরভাবে) ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার। উতলা হবেন না। ধৈর্য্য ধরুন মা। এ তো উতলা হবার সময় নয়। আইসব্যাগটা ভাল ক'রে ধরুন। (শ্যামা আইসব্যাগ ভাল করিয়া ধরিল)

বিমলা। ধৈর্য্য কি আমি হারিয়েছি ডাক্তারবাবু? (স্বামীর পাশে বসিল)

ডাক্তার মাথা নত করিল

কোন আশাই কি নেই?

ডাক্তার। চিকিৎসককে নিরাশ হতে নেই মা। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ ক'রে তবে মৃত্যুর কাছে আমরা হার মানি।

বিমলা। (স্বামীকে আর একবার দেখিয়া) একবার কি জ্ঞানও হবে না?

ডাক্তার। মৃত্যুকে প্রতিরোধ করা যায় না, সে অপ্রতিহতগতি। কিন্তু তাকেও বিজ্ঞানকে সম্মান দেখাতে হয়। পরিণাম যাই হোক, জ্ঞান হতেই হবে। (ব্যাগ গুছাইয়া লইল) আমি পাশের ঘরেই রইলাম। জ্ঞান শিগগির হবে। বোধ হয় জ্ঞান হচ্ছে, দেখুন।

যাইতে যাইতে মুহুরীর সঙ্গে কথা হইল জনান্তিকে। ওদিকে বিমলা, শ্যামা মুটুর উপর ঝুঁকিয়া ব্যাকুল আগ্রহে চাহিয়া রহিল

মুহুরী। কি রকম বুঝছেন? অ্যাপোপ্লেক্সি নাকি?

ডাক্তার। (ঘাড় নাড়িলেন) হার্টের অবস্থা বড় খারাপ। অ্যাপোপ্লেক্সি নয়।

উভয়ের প্রস্থান

মুটুর চেতনা হইল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বিমলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল

বিমলা। আমায় চিনতে পারছ?

মুট। বিমলা, আমার স্বর্গদ্বার বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

বিমলা। না না, তোমার সে দ্বার কি বন্ধ হয়? না, হতে পারে?

মুট। বন্ধ হয়ে গেছে। আমি সুশোভনকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কল্যাণীর সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করেছি। মমতাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। মহাভারত চ'লে গেছে। অরুণ—; কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে—; আমার স্বর্গদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে বিমলা। অন্ধকার আমি দেখতে পাচ্ছি।

বিমলা। না, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, খোলাই আছে। আমি নিজে খুলে দিয়েছি। কঙ্কণার বাবুদের আমি নিজে জবাব দিয়ে এসেছি। কল্যাণী, মমতা, সুশোভনকে ফিরিয়ে এনেছি। মহাভারত ফিরে এসেছে।

এই মুহূর্তেই অরুণ সকলকে লইয়া প্রবেশ করিল, কেবল সুশোভন নাই

ওই দেখ, সকলে এসেছে।

মুট। এসেছে? এসেছে?

নেপথ্যে বেহালা বাজিয়া উঠিল

কল্যাণী!

কল্যাণী। দাদা!

মুট। মার্জ্জনা, বোন, মার্জ্জনা—

কল্যাণী কথা বলিল না, কেবল প্রণাম করিল

মহাভারত। দাদাঠাকুর!

মুট। এসেছ? সুশোভন কই?

মহা। ছোট দাদাঠাকুর বারান্দায় ব'সে আছেন দাদাঠাকুর। বললেন, আপনার যন্ত্রণা তিনি দেখতে পারবেন না।

স্টুট। বেহালা বাজাচ্ছে নয়? আঃ, চমৎকার!

অরুণ পায়ে ধরিয়া

অরুণ। বাবা!

স্টুট। কে?

বিমলা। অরুণ। মাফ চাচ্ছে তোমার কাছে।

স্টুট। না। অপরাধ তার নয়।

বিমলা। তাকে আশীর্ব্বাদ কর।

স্টুট। আমি থামলাম, তোমার যাত্রা শুরু হ'ল। সে যাত্রায় তোমার জয় হোক। তবে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা হারিও না। (অকস্মাৎ ব্যস্তভাবে) তোমায় একটা কথা বলব বিমলা, তোমায় একটা কথা বলব।

বিমলা। বল।

স্টুট। না, কারও সাক্ষাতে নয়—কারও সাক্ষাতে নয়। যেতে বল সব—যেতে বল।

সকলে চলিয়া গেল

বিমলা। বল, কি বলছ বল?

স্টুট। বলবার কিছু নেই। দিচ্ছি, তোমায় দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ কর।

বিমলা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

আমার মন, আমার হৃদয়, আমার সব—আমার সব—আমি দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ কর।

বিমলা পাথরের মত উপরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে বেহালা বাজিয়া চলিতেছে

যবনিকা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল

নারী

১

আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করিব রচনা
সে মাধুরী আর নাই,
অলীক স্বপনে অতিশয়োক্তি করিতে চাহে না রসনা,—
তুমি যাহা, তুমি তাই।
তুমি নারী, তুমি যৌবনময়ী—ওষ্ঠে বক্ষে সুধা,
আমার রক্তে বাবা আদমের চির-অতৃপ্ত ক্ষুধা;
বিদ্যুৎশিখা তব কটাক্ষে, অয়ি কামাকুললোচনা,
দেহে রতি-রোশনাই।
অলীক স্বপনে অতিশয়োক্তি করিতে চাহে না রসনা,—
তুমি যাহা, তুমি তাই।

২

অর্দ্ধেক তুমি নারী আর বাকি অর্দ্ধেক কল্পনা—
কহিছে রোম্যান্টিক;
পুরুষের মনে তোমার সৃষ্টি! হায় মূঢ় জল্পনা!
তুমি কি কাল্পনিক!
পুরুষের অভিশাপের প্রতাপে অহল্যা হবে শিলা!
পুরুষেরি পদ-পরশ-ধন্য হবে সে পুণ্যশীলা!
পাঁজর-খসানো-ঋণ-পরিশোধ হয়েছে তো অল্প না!
—এবার মুক্তি দিক।
পুরুষের মনে তোমার সৃষ্টি! হায় মূঢ় জল্পনা!
তুমি কি কাল্পনিক!

৩

স্বর্গের দেবী নহ, তুমি নহ স্বপ্নের সঙ্গিনী,—
দিগন্ত-নভচারী

সৃষ্টির বুকে নহ প্রহেলিকা, বাস্তব-শরীরিণী
তুমি মর্ত্ত্যের নারী।
পুরুষের ক্ষণ-স্বপনে বিকশি নহে তব সম্মান,
শিল্পীর চোখে তব সত্যের নাহি পাবে সন্ধান।
তোমারি দেহের দর্পণে আজ তোমারে লইব চিনি
—উদ্বোধ কর তারি।
সৃষ্টির বুকে নহ প্রহেলিকা, বাস্তব-শরীরিণী
তুমি মর্ত্ত্যের নারী।

৪

তোমার তড়িতে আমার রক্ত হোক লীলা-চঞ্চল,
দূর কর মোহপাশ;
মোক্ষ-লাভের নিগ্রহ-পথে কৌপীন সম্বল—
মিথ্যা সে সন্ন্যাস।
পাশে তুমি আছ, এ পাশ কাটায়ে আকাশেতে উড়ে যাওয়া,
যারে পাই তারে ভুলিয়া কেবল না-পাওয়ার পিছে ধাওয়া,
ভীরু-মানসের এ পলায়নের প্রবঞ্চনার ছল—
করে তোমা পরিহাস;
মোক্ষলাভের নিগ্রহ-পথে কৌপীন সম্বল—
মিথ্যা সে সন্ন্যাস।

৫

শত-চুম্বনে চেতনা নিবাও, ঘন-আশ্লেষে বাঁধি
কর মোরে মদালস,
নগ্ন বুকের যুগ্ম-শিখরে মাদন-মন্ত্র সাধি,
পৌরুষে কর বশ।
ঘন-সন্নিধি রতি-রমণীয় দেহের বন্ধ দ্বারে
স্বপন-বিলাসী মন ডুবে যাক অতল অন্ধকারে,

কল্পনা-নভে ঘনীভূত হবে অমাবস্যার আঁধি,
তনু হবে তামরস ;
নগ্ন বুকের যুগ্ম-শিখরে মাদন-মন্ত্র সাধি
পৌরুশে কর বশ ।

৬

ভুজ-বন্ধনে বাঁধিবে যখন মনে যেন নাহি ভাবি
আত্মসমর্পিলে,
প্রণয়ে তোমার রক্তধারার সৃষ্টির চির-দাবি
জানাইছ তিলে তিলে ।
আলিঙ্গনের প্রতি ইঙ্গিতে তুমিই আপ্তকাম,
সুরত-প্রিয়ের নিপীড়ন সহ—সেই তো তাহার দাম
প্রেম যার নাম সেই প্রাণারাম বাসনা রসস্রাবী
তুমিই জন্ম দিলে ।
প্রণয়ে তোমার রক্তধারার সৃষ্টির চির-দাবি
জানাইছ তিলে তিলে ।

৭

এই পৃথিবীর দুলালী কন্যা, মন্মথ-মনোজয়ী
মৈথুন-মনোরমা,
রক্ত-মাংসে পঞ্চেন্দ্রিয়া সুললিত তনুময়ী
পুরুষের প্রিয়তমা ।
অবগুণ্ঠন টানো ক্ষতি নাই, ঢাকিও না মুখখানি,
পুরুষের হাতে মিলাও তোমার চল-বিদ্যুৎ-পাণি ;
মনসিজা নহ, আপন স্বরূপে হও তুমি চিন্ময়ী,
তন্বী বহ্নিসমা ।
রক্ত-মাংসে পঞ্চেন্দ্রিয়া সুললিত তনুময়ী
পুরুষের প্রিয়তমা ।

"কলেজ বয়"

দৈনিক

১

রাতারাতি একজন আত্মত্যাগী বীর হইয়া পড়িয়াছি, ইংরেজীতে যাহাকে বলে—হিরো।

ব্যাপারটা নিতান্ত আকস্মিকভাবে ঘটিয়া গেল। সামান্য বিলম্বের জন্য পারের স্টীমারটা হাতছাড়া হইল। দুই ঘণ্টা বসিয়া না থাকিয়া নৌকাতেই যাওয়া স্থির করিলাম। প্রায় জন আষ্টেক আরোহী হইলাম আমরা, তাহার মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। বৃদ্ধই বলা উচিত, তবে বয়স হইলেও বেশ সবল চেহারা। গায়ে নামাবলি, পায়ে কটকী চটি, হাতে মালা জপিবার একটি পুরানো মখমলের ঝুলি। শুচিতা রক্ষা করিয়া এক দিকে একটু ধার ঘেঁষিয়াই বসিয়াছেন। দুই-একজন বলিল, তাহাতে মৌনভাবেই একটু হাস্য করিলেন মাত্র।

জোর ভাঁটার টান, পার হইতে সময় লইবে। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, বেশ একটি ঝিরঝিরে বাতাস উঠিয়াছে। এখানে ওখানে বীচিকুঞ্চিত গঙ্গাবক্ষে আলোর প্রতিবিম্ব দোল খাইতেছে। অভ্যাসের দোষে একটু ভাবের আবেশে পড়িয়া গেলাম। একটু বাড়াবাড়িও হইয়া গেল,—নীচে সন্তুষ্ট না হইয়া একেবারে নৌকার ছইয়ের উপর গিয়া বসিলাম যখন মাঝামাঝি আসিয়াছি, এবং গুনগুনানির মধ্যে একটা গান স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, কোথা হইতে কি হইল বলিতে পারি না, নৌকাটা হঠাৎ একপেশে হইয়া গিয়া ছইয়ের পিচ্ছিল তেরপলের গা বাহিয়া নীচে পড়িয়া গেলাম। যখন সম্বিত হইল অনুভব করিলাম, আমার হাতে একগোছা কাহার চুল, আর কে যেন দৃঢ়মুষ্টিতে আমার বাঁ হাতটা ধরিয়া

আছে। এইটুকু বুঝিতেছি যে, যতই উঠিবার চেষ্টা করিতেছি, ততই ঢেউয়ের উপর ঢেউ আসিয়া অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে এবং এই ভাসা-ডোবার ক্ষণিক আলো ও ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে কতকগুলা ত্রস্ত মিশ্র কলরোল ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে।

ইহার পরের ব্যাপার যাহা আমার মনে পড়ে তাহা এই যে, আমি বাবুঘাটের একটি রানার উপর চিত হইয়া শুইয়া আছি। আমাকে ঘিরিয়া একটি বেশ বড়গোছের ভিড়। কাছে সিক্তবসনে, পা মুড়িয়া পণ্ডিতমশাই বসিয়া আছেন।

প্রথম সংলগ্ন কথা কানে গেল—ঐ চোখ খুলেছেন! কেমন আছেন মশাই? আর একটু ব্র্যাণ্ডি হ'লে হ'ত। কোথায় গেলে হে, দেখ না আর একটু পার কি না যোগাড় করতে—

একজন সরিয়া আসিয়া মুখের কাছে ঝুঁকিয়া একটু জোরেই বলিল, ঠিকানাটা দিন, না হয় খবর দিই, অবিশ্যি ভয় নেই, মা-গঙ্গাকে ডাকতে থাকুন।

আশা করিয়াছে, প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছি। কোন রকমে ঠিকানাটা দিয়া ক্লান্তির বশে আবার চক্ষু বুজিলাম। শুনিতেছি, পেলে? ওঁকেও দাও একটু ব্র্যাণ্ডি। খেয়ে নেবেন ঠাকুরমশাই ঢুক ক'রে একটু। ওষুধ, ওতে দোষ নেই।

একটা ক্লান্ত স্বরে উত্তর হইতেছে, না না বাবারা, আমি হবিষ্যাশী ব্রাহ্মণ, আমায় শুনতে নেই ও কথা। দাও নি তো আমায় খাইয়ে-টাইয়ে? দুর্গা দুর্গা! তা হ'লে আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। একটু জিরিয়ে আমি বেশ যেতে পারব 'খন, একটা গাড়ি ডেকে দিও বরং।

ভাঙা ভাঙা হিন্দী-বাংলায় কে বলিতেছে, না মহারাজজী, আপনার মুহমে কিছু না দিয়েছে, আপনি তো বরাবর জাগিয়ে ছিলেন। শুধু

একবার দু মিনিটকা বাস্তে বেহোস হয়ে গেলেন। যেই বাবু ওপর থেকে গঙ্গাজীমে গিরিয়ে পড়ল কি—

স্মৃতিটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। স্বরটা যেন চেনা, খুব সম্ভবত মাঝি পণ্ডিতমশায়ের শক্তির পরিচয় পাইয়াছে, সংযমের পরিচয় পাইয়া ওর মনটা শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছে। আসল ঘটনাটা সবাইকে বুঝাইতে চায়, কিন্তু বৃদ্ধ যুবাকে বাঁচাইবে, এ কথাটা যেন কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে না। ওরই নৌকায় দুর্ঘটনা হইয়াছে, সুতরাং ওর সত্য মিথ্যা কোন কথাই গ্রাহ্য হইতেছে না। আমি যে পণ্ডিতমশায়ের টিকি যথা-পদ্ধতিতে বাগাইয়া ধরিয়াছিলাম আর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, এইগুলা আমার পক্ষে মস্ত বড় প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

কি একটা বলিবার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করিতেছি, কিন্তু শক্তি হারাইয়া যেন কোথায় তলাইয়া চলিয়াছি। গলায় একটা উগ্র জ্বালা অনুভব করিলাম, আবার যেন অতল হইতে ভাসিয়া উঠিতেছি, যা হোক চলিয়া যাইতে পারিব। কেমন একটা অস্পষ্ট আনন্দে আমায় উপরে ঠেলিয়া তুলিতেছে, কোথাও বহুদিনের জন্য যাইবার আগে সবচেয়ে দরকারী কথাটা বলিয়া যাইবার একটা অস্পষ্ট নিশ্চিন্ততা, একটা দায়-মুক্তির ভাব, হাতটা বাড়াইলাম, গোলমালটা হঠাৎ নাড়িয়া কোথায় যেন বিলীন হইয়া গেল।

দ্বিতীয় বার যখন সংজ্ঞা হইল, তখন পূর্ব্বের চেয়ে বল পাইয়াছি মনে হইল। ঘটনাটাও পূর্ব্বাপর যেন স্পষ্টতরভাবে মনে পড়িতেছে। কনুয়ের উপর ভর দিয়া একটু সোজা হইয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছি, চারিদিকে আতঙ্কসূচক একটা বারণের কলরব উঠিল, আপনি একটু শুয়ে থাকুন মশাই, অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, ততক্ষণ—

বলিলাম, অ্যাম্বুলেন্সে দরকার নেই। পণ্ডিতমশাই কোথায়?

একসঙ্গে উত্তর ও অভিমত আরম্ভ হইয়া গেল, তিনি চ'লে গেছেন গাড়ি ক'রে, তাঁর তো বিশেষ কিছু হয় নি, আপনি সমস্ত ভারটা নিজের ওপর তুলে নিয়েছিলেন কিনা, কি রকম বোধ করছেন এখন?

আপত্তি সত্ত্বেও উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম, ভালই বোধ হচ্ছে; আপনারা স'রে গিয়ে একটু হাওয়া ছাড়ুন দয়া ক'রে।

অগ্রণী কয়েকজনের ঠেলাঠেলি আর অনুরোধে ভিড়টা একটু পিছনে সরিয়া গিয়া জায়গা ছাড়িয়া দিল। মিনিটখানেকের জন্যও নয়, তখনই আবার বীরের মুখের কথা শুনিবার আগ্রহে আরও চাপ বাঁধিয়া ঘিরিয়া ফেলিল; নানাবিধ প্রশ্ন, মন্তব্য—কি হয়েছিল মশাই? আচ্ছা দোরস্ত হাত, এসা বজ্রমুষ্টিতে পণ্ডিতমশায়ের টিকিটা ধরেছিলেন মুঠিয়ে। আপনি যখন ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, তখন উনি বুঝি একেবারে তলিয়ে গেছেন?

মাঝিটা কি বলিতে যাইতেছিল, চারিদিক হইতে আবার মারমুখো হইয়া উঠিল সকলে, তোম চোপ রও, পুলিসমে হ্যাণ্ডোভার করেগা। বল কি তোর নৌকোর নম্বর, ব্যাটার লাইসেন্স কন্‌ফিস্‌কেট করিয়ে দাও, যত সব আনাড়ী মুল্লুক থেকে জুটেছে, হাল ধরতে পারে না, রোজ একটা না একটা—

বলিলাম, ওকে বলতে দিন মশাই, কি হয়েছিল আসলে ওই জানে, আমার ঠিক গুছিয়ে মনে আসছে না।

একটি বয়স্থগোছের লোক আগাইয়া আসিলেন, বলিলেন, গুছিয়ে মনে পড়া মানে? তুমি তো আর যাত্রার মহলা দিচ্ছিলে না বাপু যে, পড়া মুখস্থর মত সব মনে ক'রে ক'রে বলবে! দেখলে, একটা বুড়ো মানুষ যেতে বসেছে, যেমন ছিলে তেমনটি ঝাঁপিয়ে পড়েছ। সাবাস ছোকরা! বাঃ! তোমার চেহারা দেখলে মনে হয়, জলে পড়লে কুটোর

মত ভেসে যাবে, কিন্তু তুললে তো লাস ডাঙায় টেনে! কোথায় বাড়ি?

বলিলাম, মশাই, আমি তাঁকে টেনে তুলেছি বললে ভুল হয়। আমি তো—

বৃদ্ধ বাধা দিয়া অনুমোদনের ভঙ্গিতে তর্জ্জনীটি বাঁকাইয়া বলিলেন, নিমিত্ত মাত্র। ঠিক ঠিক। সাধু। সব কর্ম্ম তাঁকেই সমর্পণ করবে বাবা, আমি করলাম, আমি ধরলাম, আমি এত বড়, আমি তত বড়, আরে তুই কে? কতটুকুই বা খ্যামতা তোর?

একটা বখাটে গোছের ছোকরা একটা বিড়ির শেষ প্রান্তে টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, তুই তো স্রোতের কুটোটি! কি বলুন ঠাকুরমশাই?

বৃদ্ধ তাহার দিকে একবার আড়ে চাহিয়া লইয়া বলিলেন, নাও, একটা গাড়িটাড়ি ডেকে দাও তোমরা কেউ; ভিড় হ'লেই আবার গাঁটকাটা জোটে। তুমি ঘরে যাও বাবা, ভিজে কাপড়ে আবার বেশিক্ষণ থাকাটা—

ছোকরার দিকে আর একটা বক্রদৃষ্টি হানিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

২

ঘোড়ার গাড়িটা মেট্‌কাফ হলের প্রায় কাছাকাছি আসিয়াছে, 'এই গাড়োয়ান! এই গাড়োয়ান!' করিয়া একটা চীৎকার কানে গেল এবং গাড়োয়ানটা গাড়ি থামাইয়া ফেলিল। গলা বাড়াইয়া দেখি, সেই বখাটে গোছের ছোঁড়াটা আর একজন ভদ্রবেশী যুবক, একরকম ছুটিয়াই চলিয়া আসিতেছে। নিকটে আসিয়া ছোকরা আমায় দেখাইয়া দিয়া বলিল,

এই• ইনি। আমি বিস্মিতভাবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

যুবক যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল, নমস্কার! ডিটেন করলাম, মাফ করবেন। আপনিই আজ একজন জলমগ্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করেছেন?

বলিলাম, আজ্ঞে, আমি তাঁকে উদ্ধার করি নি, আসলে—

ভগবান করেছেন।—বলিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত যুবক পকেট হইতে একটা নোটবুক-গোছের বাহির করিয়া একটা কি টুকিয়া লইল, তাহার পর নোটবই আর পেন্সিলটা হাতে করিয়াই বলিল, সে তো ঠিক, আমরা কে? ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আপনার সঙ্গে খানিকটা যেতে পারি কি? মানে, ওখানে আমি খানিকটা বিবরণ যোগাড় করেছি, তারপর এ বললে, আপনি বোধ হয় বেশি দূর যান নি, তাই ভাবলাম, মানে, আমি হচ্ছি 'দৈনিক সত্যপ্রকাশে'র স্টাফ-রিপোর্টার—

বলিলাম, মশাই, যদি আদত কথাটা রিপোর্টেড হয়, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু—

যুবক গাড়ির দরজার হ্যাণ্ডেলটা ঘুরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, একটি অক্ষর বাদ যাবে না। এইখানেই ব'সে ব'সে স্টোরি ঠিক ক'রে নিয়ে আপনাকে শুনিয়ে নোব। ডাক-এডিশনেই বের ক'রে দোব আপনাকে। এই কোচম্যান, হাঁকো। বাই দি বাই, ফোটো আছে আপনার?

বলিলাম, আছে একটা বোধ হয়।

তবে আর কি। সুইমিং-কস্টিয়ুমে?

না, ধুতি-চাদরে।

যুবক একটু বোধ হয় নিরাশ হইল, কিন্তু তখনই উৎসাহিত হইয়া

বলিয়া উঠিল, হয়েছে, আই হ্যাভ এ ব্রেন-ওয়েভ। আপত্তি না থাকে তো নেমে সরকার কোম্পানির ওখানে আপনার একটা টাটকা-টাটকি ফোটো তুলিয়ে নিই। চমৎকার হবে। এই ভিজে কাপড়-জামা, ভিজে চুল, ক্লান্ত ভাব—

দৈনিক কাগজের রিপোর্টার স্বয়ং স্বশরীরে আমার সামনে! কি রকম একটা যশের মোহ ধীরে ধীরে পাইয়া বসিতেছে। তবুও ক্লান্তিতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, বলিলাম, সিধে বাড়িই যেতে দিন এখন মশাই; সমস্ত জলটা গায়েই শুকোচ্ছে—

এই স্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপর, একটু ভেতরে গিয়েই। বিলেত হ'লে আপনি বোধ হয় এতক্ষণ পঞ্চাশখানা কাগজে উঠে গেছেন—অলরেডি। আমাদের অর্গ্যানাইজেশ্যন তার সিকির সিকিও নয়। তবু—মিনিট পাঁচেকও লাগবে না। আপনার একটু পাব্লিসিটি দরকার মশাই, অমন সব ব্যাপারই তিনিই করিয়েছেন ব'লে ছেড়ে দিলে চলে না। কাল আপনার এই রকম ভিজে কাপড়, ভিজে চুলের ব্লকের সঙ্গে অ্যাকাউণ্ট বেরুবে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ থেকে অসাধারণের কোটায় উঠে পড়বেন। হ্যাঁ, বলতে হবে না, বুঝেছি আপনার ফিলিংস; কিন্তু দেশের সামনে আদর্শ থাকা চাই তো মশাই, সবাই ভাল কাজ ক'রে যদি 'ত্বয়া হৃষিকেশ' ব'লে চুপ ক'রে ঘরে লুকিয়ে থাকেন তো দেশের ইউথরা আদর্শ পায় কোথা? আর ওসব পুরোনো ইয়ে ছাড়ুন মশাই, সাঁতরে আধমরা হলেন আপনি, ক্রেডিটটা নেবেন হৃষিকেশ? উত্তর দিন, চুপ ক'রে থাকলে শুনব কেন? নিন, সিগারেট খান। ও, খান না! এক্স্কিউজ মি—

সিগারেট খাই, বিশেষ দরকারও ছিল। খাই যে তাহার প্রমাণ পকেটে ভিজে গোল্ডফ্লেকের বাক্সের মধ্যে আছে। কিন্তু ভদ্রলোক

নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। ঠিক মুখবন্ধও বলিতে পারি না, স্পষ্ট উত্তর দিলাম, আজ্ঞে না, ওটা অভ্যেস নেই।

যুবক পেন্সিলটা নোটবুকের উপর লাগাইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, মানে, আপনার মত হচ্ছে, ওটা মস্তবড় একটা বদ অভ্যেস? আপনার বক্তব্য—স্মোকিং লাংসকে উইক ক'রে দম নষ্ট ক'রে দেয়?

অথচ প্রশ্নকর্ত্তা স্বয়ং ধূমপান করিতেছে। আমি কতকটা কুণ্ঠিত-ভাবে, পকেটের বাক্সটার উপর হাতটা ধীরে ধীরে চাপিয়া, বলিলাম, একটু করে বইকি অপকার।

একটু না, বিলক্ষণ। আমাদের কথা বাদ দিন, ভবঘুরের দল। পেন্সিলটা চালাইতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া আমার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, নাম?

বলিলাম, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

যুবক পড়িতে পড়িতে লিখিয়া চলিল, শৈলেনবাবু মনে করেন ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিকারক, যেহেতু নিকোটিন নামক বিষাক্ত পদার্থ ফুসফুসযন্ত্রকে দুর্ব্বল করিয়া শেষ পর্য্যন্ত রুগ্ন করিয়া তোলে এবং তাহার দ্বারা পরিশেষে প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করিয়া যাঁহারা ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলাধূলা এবং সন্তরণ বা অন্য কোন প্রকার ব্যায়াম করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ধূমপানের শৈলেনবাবু একেবারেই বিরোধী। তিনি নিজে সমস্ত জীবনে কোন মাদক দ্রব্যই স্পর্শ করেন নাই এবং এ বিষয়ে কাহারও মতের সঙ্গে আপস করিতে একেবারেই নারাজ।

বিনা আয়াসেই বাঁধা গতের মত সমস্তটা লিখিয়া যুবক পেন্সিল

থামাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, কেমন এই আপনার অভিমত তো? অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখুন মশাই।

বেশ অনুভব করিতেছি, মোহটা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে আমায়। কাল এই সময় সমস্ত বাংলা দেশে শৈলেন-বাবুর মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার কোন একটা গলির অখ্যাত অজ্ঞাত শৈলেন নয়, বিখ্যাত সন্তরণবীর, উদারপ্রাণ পরোপকারী শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তবুও কিন্তু পণ্ডিতমশাইয়ের শান্ত নিরহঙ্কার মূর্ত্তিটি মনে পড়িয়া যাইতেছে, বোধ হয় মুখ ফুটিয়া বলেনও নাই যে, তিনিই আমার ত্রাণকর্ত্তা। চিন্তার একটা যেন অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তো এই রকমই ভাবি।

যুবক "সো ফার সো গুড" বলিয়া একটু গুছাইয়া বসিল। সিগারেটটা ধরাইয়া দুইটা আঙুলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এবার আমি এ পর্য্যন্ত যতটা সংগ্রহ করতে পেরেছি লিখে ফেলি। সংগ্রহ করা কি সহজ মশাই? জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে একটা দাঁড় করানো। তা আপনাকে যখন পাওয়া গেছে, শেষ পর্য্যন্ত তখন শুনিয়ে মিলিয়ে নিলেই হবে। একটু রেস্ট নিন, মেলা বকাব না আপনাকে।

মাঝে মাঝে গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে, কখনও বা পেন্সিলটা ঠোঁটে চাপিয়া একটু ভাবিয়া লইয়া গড়গড় করিয়া খানিকটা লিখিয়া ফেলিল। আমার মনটা অকৃতজ্ঞতার অনুশোচনা আর যশের আকর্ষণে তোলপাড় খাইতেছে। একবার সিগারেটটা সরাইয়া সমস্তটা মনে মনে পড়িয়া ও এক-আধটা জায়গা সংশোধন করিয়া লইয়া যুবক বলিল, শুনুন, যেখানটা ঠিক হবে না, বলবেন।—

গঙ্গাবক্ষে নৌকা-দুর্ঘটনা

নদীগর্ভ হইতে নিমজ্জিত অশীতিপর বৃদ্ধের পুনরুদ্ধার

বাঙালী সন্তরণবীরের অসমসাহসিকতা

'কল্য গঙ্গাবক্ষে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা একজন বাঙালী যুবকের সৎসাহস ও আত্মত্যাগের প্রেরণায় নিবারিত হইয়াছে। চাঁদপাল ঘাটের সাতটা বারোর স্টীমার ছাড়িয়া যাইবার পর পরিশিষ্ট কয়েকজন যাত্রী লইয়া শিবপুর ফেরী ঘাট হইতে একটি নৌকা ছাড়ে। যাত্রীদের মধ্যে একজন প্রায় অশীতিপর পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন, আর ছিলেন— আপনার ঠিকানাটা?

ঠিকানাটা দিলাম। যুবক খালি জায়গাটুকুতে ঠিকানাটা বসাইয়া দিয়া পড়িতে লাগিল, আর ছিলেন হাতিবাগানের (১৭নং রামু খানসামা লেন) বিখ্যাত সাঁতারু শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২৬)। পুরোহিত মহাশয় শুচিবায়গ্রস্ত, নৌকায় দুই-একজন ধোপা ও নিম্নশ্রেণীর লোক থাকায় তিনি সকলের নিষেধ সত্ত্বেও এক প্রান্তে গিয়া উপবেশন করেন। নৌকা যখন প্রায় মাঝগঙ্গায়—ভিন্নমুখী দুইটি স্টীমারের ঢেউ লাগিয়া নৌকা হঠাৎ বানচাল হইয়া যায়। পশ্চিমা আনাড়ী মাঝি কোন প্রকারেই সামাল দিতে না পারায়...

যুবক নোটবুক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া বলিল, দুটো লাইন দিলাম মশাই জুড়ে, যত সব আনাড়ী মেড়ো এসে নিত্যুই এই রকম দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। তাও চোখের সামনে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, খোঁজ রাখবে? বলে, সেই বুড়ো আপনাকে তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়ল! ইডিয়ট! অ্যান্ড ইফ ওয়ান কুড সোয়ালো দ্যাট অ্যাব্সার্ডিটি! ঐ যে পুরুত, আর রক্ষে আছে? কত কায়দা ক'রে, আর পাঁচজনকে জিজ্ঞেস ক'রে তবে আসল ব্যাপারটা বের করা গেল। হ্যাঁ, সামাল দিতে না পারায়, বৃদ্ধ টাল সামলাইতে না পারিয়া সেই বিপরীতমুখী জাহাজের ঢেউয়ের মধ্যে পড়িয়া গিয়া একেবারেই তলাইয়া যান। জাহাজে ইতরভদ্র অনেকগুলি লোক, কিন্তু কেহই এই বৃদ্ধের প্রাণরক্ষার্থে অগ্রসর হইল না। শ্রীমান

শৈলেন্দ্র নৌকার ছইয়ের উপর পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিলেন, বোধ হয় স্বভাবত একটু ভাবপ্রবণ হওয়ায় কিছু অন্যমনস্ক ছিলেন, প্রথমটা সেকেণ্ড কয়েক কিছু বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ঘুরিয়া প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করামাত্র যেমনভাবে ছিলেন ঠিক সেই অবস্থাতেই উর্মিমধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া যাওয়ায় ঘটনাটি কোন স্টীমার বা অপর কোন নৌকার গোচরীভূত হয় না এবং বৃদ্ধকে উদ্ধার করা নিরতিশয় দুষ্কর হইয়া পড়ে। তাহার উপর তীব্র জোয়ারের টানে বৃদ্ধ পতনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়—কি বলেন, প্রায় রশিখানেক দূরে গিয়ে পড়েছিলেন ব'লে আপনার মনে হয়?

চমৎকার দাঁড় করাইয়াছে! এত বড় একটা বীরত্বের মূল নায়ক হওয়ার লোভ না হইয়া পারে না। মনে করার ভঙ্গিতে একটু টানিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, তা রশিখানেক হবে বইকি—ইজিলি।

অনুশোচনার দংশনে আর তত্টা জ্বালা নাই; অথবা কোথায় একটা সগর্ব আনন্দ ঠেলিয়া উঠিতেছে, তাহাতেই বিষটা কতকটা নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতেছে; যাই হউক।

তীব্র জোয়ারের টানে বৃদ্ধ পতনের সঙ্গে সঙ্গেই রশিখানেকেরও আগে গিয়া পড়েন। নৌকার আর সকলেই নৌকার আশেপাশে অন্বেষণ করিতেছিল, কিন্তু...এবার আপনি নিজের মুখেই বলুন শৈলেনবাবু, মানে, ঝাঁপ দিয়েই আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অর্থাৎ প্রেজেন্স অব মাইণ্ড হারিয়ে ফেললেন; না, বেশ বুঝতে পারলেন, বৃদ্ধ নিশ্চয়ই হাতের কাছে নেই, তলিয়ে রশিখানেক দূরে ঠেলে উঠে থাকবেন?

একটা যে কুণ্ঠা ছিল, বেশ অনুভব করিতেছি, সেটা দ্রুত অপসৃত

হইয়া যাইতেছে। ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, না, ও সামান্য ব্যাপারে আর মাথা ঠিক রাখতে পারব না?

যুবক যোগাইয়া দিল, ডুবন্তদের উদ্ধার—এ তো রোজই আপনাদের সুইমিং ক্লাবে প্র্যাকটিস করছেন, কি বলেন? হ্যাঁ, বাই দি বাই, কি নাম আপনাদের ক্লাবের?

পাড়ায় কয়টা সাঁতারের ক্লাব আছে, অথবা একটাও আছে কি না, জানা নাই। বলিলাম, আমাদের আহিরীটোলা সুইমিং ক্লাব।

আমারও ঐ রকম একটা আন্দাজ ছিল। এ তো শখের ওয়াটার-পোলো-খেলা হাত নয়, দস্তুরমত স্রোতে প্র্যাকটিসের লক্ষণ। আমার মনে হয়, এর আগে আরও দু-পাঁচটা অ্যাকসিডেণ্টে হাত পাকিয়েছেন আপনি। "না" বললে শুনব কেন মশাই?

একেবারে সোজা "হ্যাঁ" বলাটা বিপজ্জনক, তবে "না"ও বলিতে মন সরিল না। মুখটা নীচু করিয়া লজ্জিতভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলাম।

স্টুডিওর ফ্ল্যাশ-লাইটে ফোটো লওয়া হইল। লিখিতে লজ্জা হয়, ফোটো লইবার পূর্ব্বে টাটকা নদী ছাড়িয়া ওঠার ভাবটা বজায় রাখিবার জন্য মাথায় এক ঘটি জল ঢালিয়া লইতেও রাজি হইলাম। যুবকেরই 'প্রযোজনায়' মুখে দিব্য একটি ক্লান্ত অথচ উদার আত্মত্যাগের ভাবও ফুটাইয়া রাখিতে সমর্থ হইলাম।

৩

পরদিন সকালে ক্লান্তির জন্য একটু বিলম্ব করিয়া উঠিলাম; কিন্তু উঠিয়াই দেখি, এত বিখ্যাত হইয়া গিয়াছি যে নিজেকেই নিজে চেনা দায়।

প্রথমেই পিসীমার সঙ্গে দেখা। অত্যন্ত রাগিয়া আছেন বলিয়া বোধ হইল। কারণ না জানায় প্রশ্ন করিতেই ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, সক্কালবেলায় মুখ খুলব না মনে করেছি শৈল, আমায় বকাস নি। তোর এরকম বিদকুটে বাই কেন শুনি? একটা এঁদো ডোবার কখনও মুখ দেখলেন না, উনি বীরপুরুষ হয়ে গঙ্গায় সাঁতরে—

বুঝিলাম, কালকের জের, খবরটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, একটা লোক ডুবে মরছে চোখের সামনে, চেষ্টা করব না পিসীমা? কি যে বল তুমি! কিন্তু তুমি টের পেলে কি ক'রে?

না, টের পেয়ে কাজ কি! সমস্ত শহরে ঢিঢি প'ড়ে গেছে, কাগজে কাগজে ছবি, আর বাইরে একপাল সব জড়ো হয়ে ব'সে আছে। ও অলপ্পেয়েদের আর কি! হাততালি দিয়ে দিয়ে উস্কে দিয়ে একটা কাণ্ড না ঘটিয়ে ছাড়বে? দাদা আসুন, বলি, আমায় দিন কাশী পাঠিয়ে, নইলে বুড়ো বয়েসে আমায় অনেক কিছু দেখতে হবে। শরীরে এককড়া দম নেই, অথচ গোঁয়ারতুমি ষোলো আনা,—ও ছেলেকে মাদুলি-মানতে কতদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে? জলে ভেজা ছবি দেখলে বুক আঁতকে ওঠে একেবারে!

গরগরানি শুনিতে শুনিতে বাহিরে আসিয়া দেখি, সত্যই প্রায় জন ত্রিশেক ছোকরা বাহিরের ঘরে, বারান্দায় ভিড় করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সবার মুখেই একটি স্তম্ভিত শ্রদ্ধার ছাপ। বাহির হইতেই সকলে কপালে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল। কয়েকজনকে চিনি, তাহাদেরই একজনকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিলাম, যতীন, ব্যাপার কি হে?

যতীনের হাতে একখানি 'সত্যপ্রকাশ', অগ্রসর হইয়া বিনীত হাস্যের

সহিত আমার হাতে কাগজটা দিয়া বলিল, ব্যাপার আপনার পক্ষে কিছুই নয়, কিন্তু আমাদের পাড়ার আজ মুখোজ্জ্বল হয়েছে।

কাগজটার দিকে চোখ পড়িতেই সমস্ত শরীরে একটা রোমাঞ্চ হইয়া গেল,—সিক্ত বস্ত্র, সিক্ত কেশে আমারই ছবি, এমন একটা চমৎকার ক্লান্ত অথচ নিলিপ্ত ভাব, যেন এই জগতের বহু উর্দ্ধে কোন এক ভিন্ন জগতের মানুষ আমি। একবার মনেও পড়িতে দিল না যে, আমি একজন অভিনেতা,—অত ভালও কিছু নয়, একজন প্রবঞ্চক মাত্র। বিবরণীর খানিকটা পাঠ করিলাম, তাহার পর কাগজটা ফিরাইয়া দিতে দিতে বলিলাম, যা অপছন্দ করি তাই, টেরই বা পেলে কি ক'রে? ফোটোই বা নিলে কখন?

যতীন ধীরে ধীরে হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, জানি আপনি পাব্লিসিটি পছন্দ করেন না, নইলে এতদিন এই পাড়ায় রয়েছেন, ঘুণাক্ষরেও কি কেউ জানতে পেরেছে যে···আমরা কিন্তু আজ সন্ধ্যেয় আপনাকে একটা অভিনন্দন দোব ঠিক করেছি···না, মত না দিলে শুনব না।

একটি নতুন জগৎ একেবারে! যশ—অপ্রত্যাশিত যশ;—একটা নবজীবন। একটা চাপা উল্লাসের জোয়ার সত্য-মিথ্যার বিচারকে তৃণখণ্ডের মতই কোথায় যেন ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তবু চকিতে একটা আত্মসমাহিত নির্লোভ ব্রহ্মণ্যমূর্ত্তি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল—আমার এ যশোলোকেরও বহু উর্দ্ধে কোন্ এক লোকে। কি একটা বেদনা—ক্ষণিক, কিন্তু তীব্র, যশোঘাতীর অনুতাপ।

বলিলাম, না, আমি ওসব একেবারেই পছন্দ করি না।

সমস্বরে আপত্তি হইল, সে তো জানিই—তবে, আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে তো। আজ সন্ধ্যেয় আমাদের ক্লাবে···আপনার এই ছবিটা এন্‌লার্জ করিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে এসেছি আর্টিস্টকে।

যাক, বিবেকের কাছে কর্ত্তব্য তো করা হইল। যদি না-ই ছাড়ে এরা তো কি করিতে পারি আমি ?

কি রকম যে একটা স্বস্তি অনুভব করিতেছি !

ঠেলিয়া সামনে আসিল অপর দলের কয়েকজন। চিনি না। একজন অগ্রসর হইয়া বলিল, কাগজে দেখলাম, আপনি আহিরীটোলা ক্লাবের মেম্বার—

বেশ অনুভব করিলাম, আমার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত যেন উঠিয়া গেল এক মুহূর্ত্তে। কপালে কিছু কিছু ঘাম জমিয়া উঠিল। এইবার চোরের যা প্রাপ্য, প্রবঞ্চকের যা পুরস্কার—কিন্তু অদৃষ্ট স্বয়ং যখন একের প্রাপ্য মাল্য অন্যের কণ্ঠলগ্ন করে, তখন আটঘাট বাঁধিয়াই করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপর একজন বলিল, কিন্তু আহিরীটোলায় তো মাত্র একটা সুইমিং ক্লাব নয়, এমন অনেক আছে; তবে আমাদের ক্লাবটাই সবচেয়ে প্রাচীন আর রেস্‌পেক্টেব্‌ল। সাতটা রেকর্ড ব্রেক করা আছে আমাদের—আড়াইশো মেম্বার। কিন্তু আমাদের ক্লাবে আপনার নাম না দেখে—

কপালের ঘামটা মুছিয়া বলিলাম, ক্লাবের নামটা আমি ডিস্‌ক্লোজ করতে চাই না, মাফ করবেন্।

যতীন সহায় হইল, উনি চান না পাব্লিসিটি, তবে আর শুনছেন কি ?···কিন্তু আপনার যা-তা একটা ক্লাবেও প'ড়ে থাকা চলে না শৈলেনদা।

ওদিক হইতে আবার নিবেদন, আমাদের ক্লেমটা আগে···আপনি বরং চলুন একবার আমাদের ক্লাবে একটু সময় ক'রে, দেখবেন—

সাতটা রেকর্ড ভাঙিবার স্পর্দ্ধা রাখে, এমন ক্লাবের দিকে পা বাড়াইব অতটা দুর্ব্বুদ্ধি নিশ্চয় কখনও হইবে না। তাহা হইলে তাহারা এই দুর্ব্বল পা জোড়াটাই কি ছাড়িয়া দিবে ? তবুও বলিলাম, আচ্ছা, আপনাদের রুল্‌স রেগুলেশনগুলো দেখাবেন একবার, তবে তারাও কি ছাড়তে চাইবে শিগগির ?

কিছু লোক পাতলা হইল, কিন্তু বাড়িল আরও বেশি। পাড়াতেই দুইটা সুইমিং ক্লাব আছে, তিনটে হিতকারিণী সভা আছে। একটু দূরে দূরে আড্ডা, খবর পাইতে একটু দেরি হইয়াছে বোধ হয়। আসিয়া উপস্থিত হইল। আরও একটু বেলা হইতে আসিল পাঁচজন রিপোর্টার—তিনটি ইংরেজী ও দুইটি বাংলা কাগজের, একেবারে আপ-টু-ডেট, যায় কাঁধে স্ট্র্যাপ দিয়া ক্যামরা পর্য্যন্ত ঝোলানো।

যশের সৌধ আকাশ লক্ষ্য করিয়া উঠিতেছে—দ্রুত, অব্যর্থ। কিন্তু তাসের সৌধ, একজনের দুটি কথাতেই কি ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে না? উল্লাসের পাশে কোথায় একটা আতঙ্ক জমিয়া উঠিতেছে। যেখানে একটা ক্ষীয়মান শ্রদ্ধা ছিল, সেখানে কি একটা বিদ্বেষের ভাবও ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে! না, কোথাও এখনও একটু অনুতাপ রহিয়াছে জাগিয়া!

এমন সময় গলি ঘুরিয়া সাইকেলে অতি ক্ষিপ্রগতিতে মণিমোহন আসিয়া উপস্থিত হইল। মণি আমার কলেজের অন্তরঙ্গ বন্ধু, থাকে বৈঠকখানা রোডে।

মণিমোহনের দৃষ্টিটা উদ্‌ভ্রান্ত। খুব জোরে ঘণ্টি দিতে দিতে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া বারান্দায় উঠিয়া পড়িল। ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হইতেই উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল, কি রকম আছিস? কি ক'রে পড়লি? পিছলে? তোর আবার আম্বাটুকু আছে কিনা, কবিত্ব ক'রে সূর্য্যাস্ত দেখছিলেন বাবু!

শান্তভাবে বলিলাম, ব'স, কোথায় শুনলি?

স্বয়ং পুরুতমশায়ের কাছে, যিনি বাঁচালেন তোমায়। প্রথমটা অত বুঝতে পারি নি, তারপর যখন তোর নাম শুনলাম, ইস্তক ঠিকানা সুদ্ধ।

আমার অবস্থা বর্ণনাতীত। শুধু এইটুকু হুঁশ আছে যে, যে মিথ্যাকে কুণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্রয় দিয়াছি, এবার তাহাকে বুকে হাতে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে, না হইলে গঙ্গাগর্ভের চেয়েও অতলে ডুবিলাম। সমস্ত দলটা যেন মন্ত্রবলে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে। আমি

প্রসন্ন অবহেলার হাসি হাসিয়া বলিলাম, তিনি বললেন তিনিই আমায় বাঁচিয়েছেন? ভাল। কি বললেন একটু শুনিই না, বেশ ইন্‌টারেস্টিং হবে।

সেই ভাবেই চাহিয়া একবার সবার মুখের উপর দিয়া দৃষ্টিটা ঘুরাইয়া আনিলাম। মণিমোহন অতিমাত্র বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, মানে?

আমি ধীরে ধীরে কাগজটা বাড়াইয়া দিলাম এবং সকলেই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মণিমোহনের পরিবর্ত্তিত মুখভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। উপরে কাগজের নামটা স্পষ্টাক্ষরেই লেখা, মণিমোহন তবুও শেষ করিয়া একবার প্রথম পৃষ্ঠাটা উল্টাইয়া দেখিয়া লইল, ব্লক টাইপে 'সত্যপ্রকাশ' লেখাটা জ্বলজ্বল করিতেছে। মণি ধীরে ধীরে আমার মুখের উপর চোখ তুলিয়া বলিল, আর স্বচ্ছন্দে আমায় উল্টো বুঝিয়ে দিলে! হয়েছিল সন্দেহ ভাই। তুই ষাট বছরের একটা নড়বড়ে বুড়ো, চালকলা খেয়ে জীবন কাটালি, হোক রোগা, কিন্তু তবুও একটা সমর্থ লোক তো? পারিস তাকে তুই তুলতে? লোকটা যে এরকম কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি রে!

দলের মধ্যে কে একজন বলিল, কত রকম লোক আর কাণ্ড দুনিয়ায় দেখবেন মশাই। উই লিভ টু লার্ন।

একজন রিপোর্টার আগাইয়া আসিয়া কহিল, আমাদের অভিজ্ঞতায় এরকম ঘটে মাঝে মাঝে। যশের লোভ। কি করেন ভদ্রলোক?

মণিমোহন চোখ বড় বড় করিয়া উত্তর করিল, আমাদের কুলগুরু মশাই! থাকেন শিবপুরে। কাল রাত্তিরে—

সমস্ত ভিড়ের মধ্য হইতে একটা গুঞ্জন উঠিল, গুরুঠাকুর! ...ফোঁটা-চন্দন!...নো ওয়াণ্ডার!

বুকের কোথায় একটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল। মুখের ব্যঙ্গহাস্যটা কিন্তু বেশ সহজভাবেই ধরিয়া রাখিলাম।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমার ট্রেঞ্চ

আমি বাংলা দেশের মেয়ে, সুতরাং বাঙালী। শুধু বাঙালী নয়, একেবারে যাহাকে বলে 'বাঙাল'। এই বৎসরই দৈবাৎ বিবাহ হইয়া গেল। স্বামী থাকেন বার্মায়, অতএব গেলাম বার্মা দেশে। রেঙ্গুনে নয়, তাহার কিছু এদিকে। গিয়েছিলাম বেশি দিন হয় নাই, আবার বাংলা দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি অল্প কয়দিন আগে।

যুদ্ধ এখন রেঙ্গুন হইতেও অনেক কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। আমিও এ খবর জানি। তখন জানিতাম না। আমি যেখানে ছিলাম, যুদ্ধ এখন সে অবধি আসিয়াছে কি না জানি না, কেন না এখন কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। আশা আছে, অদূরভবিষ্যতে হয়তো শুনিব। যুদ্ধের কাছে থাকিলেও যুদ্ধ বা বোমা দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। যুদ্ধ আমাকে আসিয়া ধরিবার আগেই পলাইয়া আসিয়াছি। আমার স্বামীকে বার্মা গভর্মেণ্ট খুব ভালবাসে, তাঁহাকে তাই আসিতে দেয় নাই। তিনি হয়তো যুদ্ধ দেখিতে পাইবেন, এবং তারপর আমি আবার তাঁহার কাছে শুনিব।

তবে যুদ্ধ ঠিক না হউক, যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারের অভিজ্ঞতা আমি বাঙালও খানিকটা অর্জ্জন করিয়াছি। সে অভিজ্ঞতার একটা অঙ্গ, নিজস্ব ট্রেঞ্চ তৈরি করার কায়দা।

আজকাল যুদ্ধমূলক ও সতর্কতামূলক কথা ও ছবি সিনেমা হইতে আরম্ভ করিয়া রেলগাড়ির কামরা ও মাসিক-পত্রিকার মলাট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইতেছে। পিত্রালয়ে পৌঁছিয়া দেখিতেছি, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও এখানে বোমার নামে ভয় পায় না, তাহারাও

সামান্য একখণ্ড বাঁশের 'চটা' বা কঞ্চি পাইলেই ঘরেচ বাইরেচ মাটি খুঁড়িতে থাকে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'গথ করি, এরোপ্লেলেন আইলে ঢুকুম'। আমরা সেখানে ভয় খুব সম্ভবত পাইয়াছিলাম; পাই বা নাই পাই, 'গথ' আমরাও খুঁড়িয়াছিলাম। এখানে যুদ্ধ আসিতে হয়তো এখনও কয়দিন দেরি আছে। ইতিমধ্যে শিশুরা 'গথ' খুঁড়ুক, তালগাছ ও গরুর গাড়ি সামরিক সার্ভিস দিতে থাকুক, মাতা ধরিত্রী বিদীর্ণ হইয়া আপন সন্তানের জন্য কবর রচনা করিয়া রাখুন। আমি এই ফাঁকে একটু পেটটা হালকা করিয়া লই। ট্রেঞ্চ করিতে গিয়া অনেক রকম সমস্যার দেখা পাইয়াছিলাম, সমাধানও হাতড়াইয়া বাহির করিতে হইয়াছিল। সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলিতেছি। এখানেও নাকি বাড়িতে বাড়িতে ট্রেঞ্চ করার হুকুম হইয়াছে। হুকুম হউক না হউক, বোমা যদি পড়ে ট্রেঞ্চের প্রয়োজন হইবেই। নিজের বাড়িতে ট্রেঞ্চ যাঁহারা করিবেন, আমার অভিজ্ঞতার কথা তাঁহাদের কাজে লাগিয়া যাইতে পারে।

আমি যখন বাংলা দেশ হইতে ওখানে যাই, তখন যুদ্ধ ট্রাঙ্ক-পোর্টম্যান্টো সাজাইতেছিল, বার্মায় রওয়ানা হইবার জন্য। প্রিকশন আগেই নেওয়া দরকার। পৌঁছিবার অল্প দিন পরেই আমাদের উপর নোটিস আসিল—ট্রেঞ্চ কর। আমি বাপু বাঙাল। আমি বলি, ওমা, হেয়া আবার কি? হেয়া ক্যামনে করে? কিন্তু করিতে হইবেই। বাঙাল আমি একা, কিন্তু অভিজ্ঞতা সে সময়ে অনেক অ-বাঙালেরও সেই রকমই ছিল। কয়েক দিন পর্য্যন্ত যাহার সঙ্গে দেখা হয়, ঐ এক প্রশ্ন করি, 'ট্রেঞ্চ ক্যামনে করমু'? জবাব বড় কেহ দেয় না, দিলেও তাহা সন্তোষজনক হয় না। শেষে খবরের কাগজে দেখিলাম, ট্রেঞ্চ মানে হইল এক গর্ত, যেখানে বিমান-আক্রমণের সময় মানুষ আশ্রয়

লইতে পারে। কাগজে তাহার আকৃতি-প্রকৃতিও দেওয়া ছিল। সেটা হইল এই—গর্ত্তটা ছয় ফুট গভীর হওয়া চাই, প্রস্থ উপরে সাড়ে চার ফুট, তলায় সাড়ে তিন ফুট। আকার ইংরেজী বড় হাতের L-এর মত। ইহার এক প্রান্তে এক সিঁড়ি থাকিবে। লম্বাটা প্রত্যেকের পরিবারস্থ লোকের সংখ্যার উপর নির্ভর করিবে। মানে প্রত্যেক লোকের জন্য আঠারো ইঞ্চি জায়গা দরকার; যাহার বাড়িতে যে কয়জন লোক, সে সেই অনুপাতে এবং অতিরিক্ত তিনজন লোকের মত জায়গা তাহার ট্রেঞ্চে করিবে।

শুনিলাম। বাঙাল, বুঝিলাম না কিছুই, করিতেও পারিলাম না। তারপর দ্বিতীয় নোটিস আসিল—তাড়াতাড়ি ট্রেঞ্চ তৈয়ারি কর, তিন দিনের মধ্যে শেষ করিতে না পারিলে জরিমানা হইবে। বাধ্য হইয়া তখন মজুর ডাকিলাম। জানি না কিছুই, তবু করিতে হইবে, কম্পাল্সরি অর্ডার। তারপর আরম্ভ হইল আমার ইঞ্জিনিয়ারিং, আমার স্বামীর টাকা ও মজুরের পরিশ্রমের সমবেত কুস্তি। প্রথম নোটিসের বর্ণনানুযায়ী এক গর্ত্ত হইল বাড়ির সংলগ্ন মাঠের মাঝখানে। ও, একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি, ওখানে আর একটা কথা ছিল যে, ট্রেঞ্চ করিতে হইবে খোলা মাঠে এবং বাসগৃহের উচ্চতা যতটা, গৃহ এবং ট্রেঞ্চের দূরত্ব তাহার চেয়ে বেশি ছাড়া কম হইতে পারিবে না। সেখানে সমস্ত বাড়িই কাঠের; বাড়ি যদি জ্বলিয়া উঠে বা ধসিয়া পড়ে, ট্রেঞ্চ যাহাতে তাহার তলায় না পড়ে, সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। যথাসময়ে আমার গর্ত্ত করা শেষ হইল। আর সদর-দরজার দুই পাশে বালি ও জল ভরা দুইটা কেরোসিনের মঙ্গল-টিন, নারিকেল ও পল্লব-বিহীন মঙ্গল-কলসের মত শোভা পাইতে লাগিল। আমি আসন্ন শাস্তির হাত হইতে রেহাই পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

গেল কয়েক দিন। ইতিমধ্যে রেঙ্গুনে বোমা পড়িল। অনেকে হতাহত হইল। ভাবিলাম, বাঁচাইয়াছে, প্রাণটা আর বিদেশে রাখিয়া যাইতে হইল না। আমার তো গর্ত্তই আছে। আমার বাঙাল মন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করিয়া বসিল, ও গর্ত্তে কি হইবে? এই রকম খোলা, একে তো রৌদ্র লাগিবে মাথায়, আরও ছাদ নাই, অতএব এরোপ্লেনও আমাকে দেখিতে পাইবে। ইহার মধ্যে নামা আর একটা বেশ বড়সড়ো গামলার মধ্যে নামিয়া বসার মধ্যে তফাতটা কোন্ জায়গায়? প্রশ্নটা শুনিয়া হাসিলেন অনেকেই, জবাব কেহই দিলেন না। তা জবাব না দিলেও, রৌদ্রের তাপটা যে গ্রীষ্মে খুব মাথারোচক হইবে না, এ কথাটা অনেকেই স্বীকার করিলেন। পরামর্শের ফলে স্থির হইল যে, "অন্তত রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষার মত একটা শেড করা দরকার।"

তখনও আমাদের চিন্তাধারা—সাইরেন দিনে বাজিলে রৌদ্রের হাত হইতে, রাত্রিতে বাজিলে হিম হইতে আত্মরক্ষার উপায় লইয়াই সীমাবদ্ধ। রেঙ্গুনে যাহারা খোলা ট্রেঞ্চে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ নাকি সরাসরি মেশিন-গানের গুলি খাইয়া মরিয়াছে—এ সংবাদ আমরা তখনও পাই নাই। যাহা হউক, অল্পদিনের মধ্যেই ঐ এল-শেপ ট্রেঞ্চ আবার মজুর-করকবলিত হইল। তখন আমরা আরেকটি তথ্য সংগ্রহ করিলাম, বাঁশ বস্তুটা আতপ-নিবারক—মানে non-conductor of heat। ব্যবস্থা হইল, বাঁশ চিরিয়া বেড়া বুনিয়া সেই বেড়া একখানা খাঁদের গায়ে অর্থাৎ কর্ত্তিত দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইবে। কেহ কেহ ঐ বেড়া নীচে অর্থাৎ খাদের মেঝেয়ও পাতিয়া দিলেন। তারপর খাদের মধ্যে বেড়ার গায়ে খুঁটি পুঁতিয়া তাহার আগায় দড়ি লাগাইয়া সেই দড়ি উপরে দূরে ছোট ছোট খুঁটির

সঙ্গে টানিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। ইহার ফলে বেড়া দেওয়ালের গায়ে চাপিয়া রহিল এবং দেওয়াল ভাঙিলেও তাহার মাটি মধ্যস্থিত মানুষের গায়ে চাপিয়া পড়ার সম্ভাবনা থাকিল না। উপরে গর্ত্তের মাথার উপর দিয়া আড়াআড়িভাবে কয়েকখানা বাঁশের বা কাঠের খুঁটি পাতিয়া তাহার উপর এই বেড়া পাতা হইল; তাহার উপর চাটাই বিছাইয়া বালি ঢালিয়া দেওয়া হইল। উদ্দেশ্য, চারিপাশের মাঠ হইতে ইহাকে যেন পৃথক করিয়া চেনা না যায়। সেখানে মাঠ সমস্তই বালি, বালির রং।

এই পর্য্যন্ত শেষ করিয়া আমরা আপাতত নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু নূতন তথ্য সংগ্রহের দিকেও লক্ষ্য কমাইলাম না। অল্পদিনের মধ্যেই অনেক খবর আমরা যোগাড় করিলাম। অবশ্য এক জায়গা হইতে সমস্ত নয়। ইহা আমাদের 'কলেক্শন'—কতক রেঙ্গুন হইতে পলাতক বোমা-খাওয়াদের নিকট, কতক বার্মা গভর্মেণ্টের প্রচারিত কমিউনিক ও খবরের কাগজের আলোচনা হইতে, অধিকাংশই 'Illustrated Weekly' হইতে।

আবার মনে প্রশ্ন উঠিল, গর্ত্তই যদি নিরাপদ হয়, গর্ত্ত তো যে কোন রকমের হইতে পারে। এল-শেপের উপর জোর দেওয়া হইতেছে কেন? কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম। জবাব পাইলাম, অত কথা জানি না বাপু, করতে কইছে করুইয়া থো। আমি বাঙাল। আদব-কায়দা কম জানি। বলিলাম, হেয়া হইবে না। 'অর্থ' কিছু নিশ্চয়ই আছে। রেডিওতে পর্য্যন্ত সব সময় কয় ঐ কথা, এল-শেপ। জীবন লইয়া যে-হানে কথা, না বুঝইয়া আমি করতেও রাজি না, ঢোকতেও রাজি না।

শেষে একজন বলিলেন, এল-শেপের অর্থ আমি জানি। শুনিলাম,

ট্রেঞ্চের দুইটা দিক থাকা দরকার। তাহার কারণ, যে দিকে সিঁড়ি সে দিকের মুখ খোলা থাকিবে। বোমা যদি সিঁড়ির কাছে কোনখানে পড়ে, তাহার স্প্লিন্টার ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকিবে। কাজেই যে দিকে সিঁড়ি তাহার অন্য দিকটা হইল নিরাপদ আশ্রয়। সেইজন্য ট্রেঞ্চটা ঐ রকম বাঁকা করিতে হয়।

আর একবার ধপাস করিয়া ভাবনার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। কি করিয়াছি আমি? আমি তো লম্বা দিকের উপর সিঁড়ি করিয়াছি। নিরাপদ অংশে তাহা হইলে আমার জায়গা অনেক কম হইল। কি করি এখন? আবার খুলিয়া ফেলিব? সময় কোথায়?

স্বামীকে একদিন সমস্যার কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, খোল আবার সব!

বিশেষ ভরসা কিন্তু আমি পাইলাম না। রেঙ্গুনে তখন বোমা, শুধু বোমাপতন নয়, বোমাবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। এখানেও যে কোন সময় আক্রমণ হইতে পারে। এ অবস্থায়, যেটুকু আশ্রয় যোগাড় হইয়াছে, তাহাও হঠাৎ ভাঙিয়া ফেলিতে সাহস করিলাম না। ভাঙিব যে, বাঁশ কাঠও কিনিতে বিশেষ পাওয়া যাইতেছে না। ভাঙিব তো, আবার বানাইব কি দিয়া?

গেল কয়দিন। খালি ভাবি আর ভাবি, কি করা যায়! শেষে একদিন আমার স্বামী বলিলেন, সব খুলে ফ্যালো, আবার ঠিক ক'রে কর। আমি কাঠ এনে দেব, খুঁটি তক্তা দুইই দেব, যত লাগে। তুমি একেবারে নতুন ক'রে আবার তৈরি কর।

আমি বাঙাল ভাষায়ই কথা বলি। তিনি সাহেব মানুষ, বলেন না। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বলিলাম, কাঠ পাবা কই?

তিনি বলিলেন, কোথায় নাকি অনেক কাঠ-তক্তা মজুত আছে,

তাঁহার জিম্মায়। সেই কাঠ-তক্তা তিনি ব্যবহার করিতে পারিবেন, তাঁহার সে অধিকার আছে। আমি তখন বলিলাম, আচ্ছা, দেখা যাউক। তুমি তোমার কাঠ-তক্তা আনো, আমি দেখি কি কি এডার ডিফেক্ট। তারপর খুলুম।

তিনি কাঠ আনাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। আমি ইতিমধ্যে আমার ট্রেঞ্চের ত্রুটি কি কি আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিলাম। এ বিষয়ে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহায় হইয়াছিল 'Illustrated Weekly', রেঙ্গুনের নানা সময়ের নানা আকারের নানা প্রকার ট্রেঞ্চের ছবি তাঁহাতে বাহির হইতেছিল। প্রত্যেক ছবিতে, ট্রেঞ্চের পোজিশন, নিকটে পতিত বোমা ও তাহার স্প্লিন্টারের পোজিশন, ও রাস্তায় উপস্থিত লোকের পোজিশন দেওয়া থাকিত। কোন্ ট্রেঞ্চের কি ত্রুটি, এবং রেঙ্গুনে কোন্ ত্রুটির জন্য কোন্ রকম ক্ষতি হইয়াছে, তাহারও আলোচনা থাকিত। রেঙ্গুন হইতে তখন প্রত্যহ দলে দলে পলাতক আসিতেছে, কারণ এদিকে আসিবার রাস্তাটা আমাদের শহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। আমরা এই সকল প্রত্যক্ষদর্শী পলাতকের মুখ হইতেও অনেক বর্ণনা শুনিলাম। টোকিও-রেডিওতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইত, তাহাও শুনিলাম।

দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলাম, আমরা যে ট্রেঞ্চ করিয়াছি, তাহা কি ভয়ানক রকম অকর্ম্মণ্য ও ত্রুটিপূর্ণ। তখন সকলে আবার প্ল্যান শুরু হইল, ট্রেঞ্চ নূতন করিয়া বানাইতে হইবে। কিন্তু তাহার অসম্ভব ব্যয়। উপরে স্যাণ্ড-ব্যাগ দিতে হইবে, রক্ষার ব্যবস্থাও যাহা আমরা করিয়াছি, তাহার চেয়ে অনেক মজবুত করা দরকার। বাজারে তখন কোন রকম কাঠ বা বস্তা বা টিন পর্য্যন্ত কিনিতে পাওয়া যায় না। অল্পসল্প যা ছিল, সব গভর্ণমেণ্ট দখল করিলেন, পাব্লিক তাহার কিছুই

পাইল না। প্রাণ বাঁচাইতে হইলে আমাদের ট্রেঞ্চগুলি মেরামত করা দরকার, সেটা সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি, কিন্তু 'র মেটিরিয়াল' তথা কুলি-মজুরের অভাবে কেহই কিছু করিতে পারিতেছি না। তাহার আগের কুড়ি-বাইশ দিনের মধ্যে ওখান হইতে বাহিরে বা বাহির হইতে ওখানে কোন মেল যায় নাই। মালপত্র সবই আসে বাহির হইতে। এদিকে, বোমার নামে কতক, আহত 'ইভাকুই'দের চেহারা দেখিয়া কতক, লোক পলাইতে আরম্ভ করিল। এবং প্রথমেই পলাইল শহরের যত ধোপা নাপিত ও দিনমজুর কুলি, যাহাদের শহরে কোন ভেস্‌টেড ইণ্টারেস্ট নাই, কাহারও সঙ্গে বাধ্য-বাধকতাও নাই। মজুরির হার বহুগুণ চড়িয়া গেল, তাহা দিয়াও লোক পাই না। কাজেই ট্রেঞ্চ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা যখন আমরা অর্জ্জন করিলাম, তখন সেটা কার্য্যে পরিণত করাই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। আরও হতাশ হইলেন আর কিছুদিন পরে, যখন আরও একটা নূতন সমস্যার কথা মনে হইল—বর্ষা। ওখানকার বর্ষা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। সকলেরই ভাবনা হইল, যতই কেন করি, তিন মাস পরে বর্ষা আরম্ভ হইবে, তখন এই আণ্ডার-গ্রাউণ্ড শেল্টারের অস্তিত্বও থাকিবে না। যাঁহারা একটু বিচক্ষণ তাঁহারাও বলিবেন, এটাকে আর মেরামত না করিয়া বরং আর একটা পাকা ট্রেঞ্চ করা হউক—এখনও চলিবে, বর্ষায়ও টিকিবে। কিন্তু বাজারে সিমেণ্ট কিনিতে পাওয়া গেল না। কাজেই পাকাপন্থীরা চুপ করিয়া গেলেন। আমরাও মজুর না পাইয়া বসিয়া থাকিলাম।

ইতিমধ্যে আমি প্রায় প্রত্যহই ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকিয়া (সাইরেন বাজার সময় নয়) মধ্যটা দেখিতাম, আর ভাবিতাম, কি করিয়া এটাকে আর একটু বাসোপযোগী করা যায়। কখন এবং কতক্ষণ এখানে

থাকিতে হইবে কে জানে। এই পরীক্ষার সময় একদিন দেখিতে পাইলাম, উপরে বালি কিছু বেশি দেওয়ার ফলে একটা আড়া ফাটিয়াছে, আর কিছু ভার পড়িলেই একেবারে পড়িয়া যাইবে ছাদসুদ্ধ। তখন আর বিলম্ব করিতে পারি না। পরের দিন বেশি মজুরি দিয়াই মজুর ডাকিলাম। ডাকিয়া ভাবিলাম, যখন খুলিতেছি, তখন এবার এমন করিয়া করিব যেন আর কোনও দোষ না থাকে। তখন একটু দেখি, একটু করি, আবার ভাঙি, আবার গড়ি, আবার ভাঙি, এই রকম করিয়া দিন সাতেক পরে ট্রেঞ্চ সারা হইল। সে ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকিয়া বসিতে পারিলে প্রাণ বাঁচিবে আশা হইল। ডিফেক্ট ও রেমিডির তালিকা পরে দিতেছি।

ট্রেঞ্চ সারা করিয়া ভাবিলাম, এবার একবার এটার মধ্যে ঢুকিয়া সবটা পরিষ্কার করিতে হইবে, বসার জন্যও কিছু একটা পাতিতে হইবে। অনেকেই ঐ বাঁশের বেড়া পাতিয়াছিলেন। আমি পাতি নাই, কারণ ভাবিয়া দেখিলাম, চেরা বাঁশের উপরে বসা খুব আরামপ্রদ হইবে না। আমার চিন্তাধারা ঘুরিত আমার স্বামীকে কেন্দ্র করিয়া। ভাবনা ছিল, আমি তো শুধু না, সাইরেন বাজিলে তাঁহাকেও ইহার মধ্যে আশ্রয় লইতে হইবে, কাজেই আমি তো যেন-তেন প্রকারেণ করিতে পারি না। ইতিমধ্যে আমার কাঠ-তক্তা অনেক আসিয়া গেল। ট্রেঞ্চের তলায় আমি প্রথমে আগাগোড়া তক্তা পাতিলাম, তাহার উপর কয়েক প্রস্থ চাটাই বিছাইয়া দিলাম। ইহার উপর সময়কালে একটা শীতলপাটি বিছাইলেই বেশ মোলায়েম হইবে, বসিতেও কষ্ট হইবে না।

এবার উপর, মানে ছাদ। নির্দেশ ছিল, ছাদের উপর স্যাণ্ড্ব্যাগ দিতে হইবে দুই পুরু করিয়া। অর্থাৎ বালিপূর্ণ বস্তা একটার পাশে

একটা রাখিয়া সমস্ত জায়গাটা ঢাকিয়া দিতে হইবে। তাহার উপরে আর এক সেট দিতে হইবে, দ্বিতীয় সেটের জোড় লাইনগুলা প্রথম সেটের বস্তার মাঝখান বরাবর থাকিবে। ব্যাগের উদ্দেশ্য, যদি ট্রেঞ্চের উপরে বোমা পড়ে, বালি যেন তাহাকে ঠেকাইতে পারে। একটু ভারী বোমা দুই ফুট পর্য্যন্ত মাটি-বালি ভেদ করিয়া মধ্যে ঢুকিয়া যায়। কাজেই বালি দুই ফুটেরও বেশি উঁচু করিয়া লইতে হইবে। সেইজন্যই দুই সেট বস্তা দরকার। আমি বস্তা দিলাম না। বস্তার অসম্ভব দাম, তাহা কিনিতে পাওয়া কষ্টকর। তাহা ছাড়া ভাবিলাম, দুইটা বস্তার মধ্যে যেটুকু ফাঁক থাকে, ঝুরা বালি ঢালিয়া দিলে তো তাহাও থাকিবে না। আমি বালি ঢালিয়া দিলাম, মাঠ হইতে হাত তিনেক উঁচু করিয়া।

তাহার পর থাকিল চেহারা। এল-শেপ একটু জিনিস যদি প্রত্যেক বাড়ির মাঠের মধ্যে দেখা যায়, সন্দেহ সেখানে হওয়ারই কথা। বালি দিবার সময় আমি এল-এর কোণা ভাঙিয়া চতুষ্কোণ করিয়া দিলাম। (আমি অবশ্য মধ্যেও এল-শেপ রাখি নাই।) মাঠ হইতে পৃথক করিয়া না বুঝা যায়, এইজন্য অনেকেই উহার উপর নূতন ঘাস বা ফুলগাছ বসাইয়া দিলেন। বাসিন্দারা ফুল খুব বেশি পছন্দ করে। তাহাদের প্রত্যেকেরই বাড়ির সামনে নূতন একটি এল-শেপ বাগান শোভা পাইতে লাগিল। রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়া প্রত্যেক বাড়িতে একই চেহারা, আমারই মনোযোগ আকর্ষণ করিল। কাজেই মত বদল করিলাম, ফুলগাছ লাগাইব না। পেঁয়াজ লাগাইব, লাউ-কুমড়াগাছ তুলিয়া দিব।

আবার বিপদ, এততেও হইল না। খবর আসিল, রেঙ্গুনে ট্রেঞ্চের মধ্যে সাপ ঢুকিয়া পাঁচ-ছয়জনকে কামড়াইয়াছে। সর্ব্বনাশ, এখন

কি করি? মাঠের মধ্যে ট্রেঞ্চ, সাপ তো সব সময়েই ঢুকিতে পারে। আমারও কখন ঢুকিতে হইবে তাহার ঠিক নাই। আগে গিয়া পরীক্ষা করিয়া ঢোকা সাইরেনের সময় সম্ভব নয়। ইহার পর হইতে আগের মত যখন তখন ছুট করিয়া ঢুকিয়া যাইতে ভয় করিতে লাগিল। অনেক শব্দ-টব্দ করিয়া টোকাটাকা দিয়া তবে ঢুকিতাম। তারপর একদিন কতকগুলি ইট সংগ্রহ করিলাম। মধ্যে যে তক্তা পাতিয়াছিলাম, তাহা আবার তুলিলাম। মাঝে মাঝে আস্ত ইট বসাইয়া দিয়া তাহার উপরে তক্তা আবার পাতিলাম, মাটি হইতে আঙুল আস্টেক উঁচু হইল। ইহাতে লাভ হইল এই, সাপ যদি ট্রেঞ্চের মধ্যে থাকে, তক্তার নীচে লুকাইতে পারিবে। আমি যদি তাহার ঘাড়ে পা না দিয়া ঢুকিয়া পড়িতে পারি, তারপর ধীরে-সুস্থে লঙ্কা পোড়াইবার বা কার্বলিক অ্যাসিড ঢালিবার সময় পাইব।

আমারি ট্রেঞ্চ সম্পূর্ণ হইল। বাকি থাকিল তাহার শেপ, সিঁড়ি ও দরজা। এটা আমার নিজস্ব ট্রেঞ্চ, ইহার গঠনপ্রণালী ও ইঞ্জিনিয়ারিং আমার নিজের। ট্রেঞ্চ সম্বন্ধে আমার ধারণা কোন কালেই ছিল না, নিজের বুদ্ধিমত যেমন বুঝিয়াছি, করিয়াছি। ইহার ত্রুটি যদি কাহারও চোখে ধরা পড়ে, তাহা যেন দেখাইয়া দেন। লোকের হয়তো কাজে লাগিবে।

আমার ট্রেঞ্চের শেপ এল নহে, ডবলুও নহে। কলিকাতার মত উঁচু সাদা বর্ডার লাইন আমার ট্রেঞ্চে নাই। রেঙ্গুনের মত খোলাও নহে। বাম্মিজদের ট্রেঞ্চের মত এল-শেপ কলাবতী * ফুলের বাগান আমার নাই।

আমারি ট্রেঞ্চ প্রথমে ছিল এল-শেপ, খোলা। তারপর রৌদ্রের

* সর্ব্বজয়া।

জন্য করিলাম শেড। লম্বা আড়া কয়েকটা দিয়া, চাটাই দিয়া, উপরে বালি দিলাম হাতখানেক উঁচু করিয়া। সিঁড়ি থাকিল খোলা। তারপর শুনি, বোমা দুই ফুট বালি ভেদ করিবে, কাজেই বালি আরও দেওয়া দরকার। দিতে লাগিলাম। খানিক দেওয়ার পরে আড়া ভাঙিল। আবার খুলিয়া ফেলিলাম। খুলিয়া এবার জায়গা কিছু বাড়াইলাম সেফ সাইডে—এল-এর গায়ে পর পর আরও গোটা দুই এল জুড়িয়া দিলাম। চওড়াটা খবরের কাগজের মাপ হইতে বাড়াইতে পারিলাম না। অথচ পাশে বেড়া দাঁড় করানোর ফলে খাতটা আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল। আর এক আশঙ্কা মাথায় ঢুকিল, সামনে বোমা পড়িলে, স্প্লিন্টারের হাত হইতে বাঁচিতে হইবে সেফ সাইডে যাইয়া, কাজেই সেফ সাইড একটা নয়, অনেকগুলা করিয়াছি। কিন্তু বোমা যদি গর্ত্তের মুখে পড়ে বা পাশে পড়ে, পাশের মাটি ভাঙিয়া যদি দরজা বন্ধ হইয়া যায়, বাহির হইব কি করিয়া? নিজের কবর কি নিজেই কাটিলাম? আবার ভাব। শেষে অন্য প্রান্তেও একটা সিঁড়ি করিলাম। দুইটা দরজা হইল। দুইটা সিঁড়ি হইল। ছাদ করিলাম আগাগোড়া, সিঁড়ি বাদে। তখন দেখিলাম, মধ্যটা বড় অন্ধকার। দুইটা পথ হইল সত্য, দম বন্ধ হইয়া মরিব না, কিন্তু জায়গাটা বড় সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার। তখন ঐ জিগ্‌জাগের জিগ বাদে জাগটা অথবা জাগ বাদে জিগটা কাটিয়া ফেলিলাম, দুই পাশের দুইটা বাহু ও তাহার পাশের দুই বাহুর আধা-আধি ঠিক রাখিয়া, তাহার মধ্যের পাশাপাশি কোণ দুইটা কাটিয়া মিশাইয়া দিলাম। এবার দুই পাশের দরজা দুইটার ব্যবধান কমিল, মধ্যে আলো পাওয়া গেল, সকলের উপরে এমন একটু জায়গা পাওয়া গেল যেখানে দরকারমত দুই-তিনজন লোক বসিয়া অন্তত কিছু টিফিন

খাইতে পারে, স্টোভ থাকিলে চা করিতে বসিতেও কোন অসুবিধা হয় না। এই কামরার এক পাশে ছাদের বাঁশ একটু উঁচু করিয়া সেই ফাঁকে একটা বাঁশের চোঙা উপর পর্য্যন্ত চালাইয়া দিলাম। চোঙার মুখটা রহিল পাশের ঝোপের মধ্যে লুকানো। ইহাতে উপর হইতে চোঙাটা দেখা যাইবে না; ট্রেঞ্চের দুই মুখও যদি একবারে ভাঙে, তবু চোঙা দিয়া কিছু হাওয়া পাওয়া যাইবে, দমবন্ধ হইয়া মরিবার ভয় রহিল না।

এবার সিঁড়ি। সিঁড়ি হইল তিন ধাপ, তৃতীয়টার প্রান্ত পর্য্যন্ত ছাদ বিস্তৃত। দেখিলাম, এ সিঁড়ি হইতে মধ্যে ঢুকিতে হইলে প্রায় নমাজ পড়িতে হয়, উপুড় হইয়া একেবারে পড়িয়া যাওয়ার সুবিধাও খুব বেশি। তখন ছাদটা আবার খানিক কাটিয়া পিছনে সরাইলাম, সিঁড়িটাও আরও কাটিয়া নীচের খাদের সঙ্গে সমান করিয়া মিলাইয়া দিলাম। তখন নামিবার ব্যবস্থা হইল, সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচের খাদে দাঁড়াও, তারপর মাথা নীচু করিয়া হাঁটিয়াই মধ্যে ঢুকিতে পারিবে, ঠিক আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের নৌকার (সাম্পান নহে) ছইয়ের মত। আবার সমস্যা দেখা দিল। সিঁড়ির মুখ ও খাদ বড় করিতেই দেখা গেল, সে প্রকাণ্ড গর্ত্ত উপর হইতে লুকাইবার নয়।

কয়েকজন বাঙালী পাইলট একদিন আমাদের বাসায় বেড়াইতে আসিলেন। উদ্দেশ্য কিছুই নয়, বাঙালী শুনিয়া বেড়াইতে আসিলেন। তাঁহাদের কাছে শুনিলাম, রাস্তায় মানুষের হাঁটা-চলা, ছুটাছুটি করিয়া ট্রেঞ্চে ঢোকা, ট্রেঞ্চের উপর এল-শেপ ফুলবাগান, সমস্তই উপর হইতে দেখা যায়। বুঝিলাম, সিঁড়ির ঢাকনা একটা করা দরকার। কি দিয়া করা যায়? দরজার উপরে চাপা না পড়িয়া যায়, তাহাও তো দেখিতে হইতে হইবে। প্ল্যান করিলাম, দোকানের

ঝাঁপের মত বাঁশ দিয়া ঝাঁপ তৈরি করিব, মধ্য হইতে বাঁশ দিয়া যেন তুলিয়া ধরা যায়।

পরদিন আবার মজুর ডাকিতে পাঠাইলাম। অতিরিক্ত মজুরি দিয়াও তাহাদের পাত্তা পাওয়া গেল না। তখন ঠিক করিলাম, নিজেই তৈরি করিব। চাকরচন্দ্রকে রিহার্সাল দিয়া যথাসাধ্য ঠিক করিয়া লইলাম। সে ভূতটা জানে না কিছুই, বাঁশের কোন কাজ কোন দিন করে নাই। আমিও যে খুব ওস্তাদ ডোম তাহা নয়, তবু দরকার যখন পিটাইয়া কোপাইয়া খাড়া একটা করিতে পারিতামই। চাকরের যা বিদ্যা, তাহাকে লাগাইয়া দিলেও আসলে করিব আমিই, সে নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন ছিল, দা আর হাতে লইতে হইল না। পরের দিন কুলি আসিয়া হাজির হইল। কাজ তাহারা করিল, আমিই অবশ্য ডিরেক্‌শন দিলাম। দুইটা দরজার জন্য দুইটা ঝাঁপ করা হইল। ট্রেঞ্চের মধ্যে আমার হাতে থাকিবে বাঁশের লগি, তাহা দিয়া ঠেলিয়া আমি ঝাঁপ খুলিতে পারিব। আবার ফ্যাসাদ—মাঠের সঙ্গে, ট্রেঞ্চের সঙ্গে, ঝাঁপের রং মিলিল না। একটা চারকোণা জায়গার দুই কোণে দুইটা ঝাঁপ দেখা গেলে সেটা সন্দেহজনক নিশ্চয়ই। তখন বালতিতে করিয়া জলে কাদায় গুলিয়া, ঝাঁপকে বেশ একমেটে দুইমেটে ও তিনমেটে করিয়া লেপিয়া মাঠের সঙ্গে তাহার রং মিলাইয়া দিলাম, ওজনও বিশেষ বাড়িল না।

যেদিন শেষ হইল, তাহার দিন কয়েক পরেই দেখা গেল, এখানে টিকিয়া থাকা আর সম্ভব হইবে না। তখন স্বামীকে বলিলাম, 'তুমি এডার মধ্যে বইও।' বলিয়া আমি স্টীমারে চড়িয়া ভু—উ—স করিয়া পলাইয়া আসিলাম।

"শ্রীমতী"

সরোজিনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হারাণ পিছনে দাঁড়াইয়া সরোজিনীর দিকে, হঠাৎ সামনে কিছু একটা দেখিলে যেমন করিয়া লোকে তাকায়, ঠিক তেমনই করিয়া তাকাইয়া রহিল। কিন্তু হারাণের দোষ কি? গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে যেদিন প্রথম সরোজিনীকে দেখিয়াছিলাম, হয়তো অমনই করিয়া তাকাইয়া ছিলাম। যাহাকে এতটুকু কুঁড়ি অবস্থায় দেখিয়াছেন, তাহাকে যদি হঠাৎ রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-প্রাচুর্য্যে সহস্রদল-মেলা বিকশিত অবস্থায় চোখের সামনে হাজির হইতে দেখেন, তাহা হইলে আপনারাও আমাদের মত এমনই করিয়াই তাকাইয়া থাকিবেন। তবে হারাণের মত বেহুঁশ হইয়া তাকাইবেন না। একটুখানি হুঁশ রাখিবেন।

মণীন্দ্র কহিল, তোমার মাস্টার এসেছে যে।

সরোজিনী পরম আত্মীয়তার সুরে কহিল, তাই নাকি! কই? আগাইয়া আসিতেই আমাকে দেখিতে পাইয়া একেবারে আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ঠিক নিজের ছোট বোনের মত আবদারের সুরে কহিল, দাদা, অন্ধকারে সকলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন যে? কহিলাম, বাড়ি যাচ্ছিলাম, দারোগাবাবু ধ'রে নিয়ে এলেন।

সরোজিনী দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিল, ওঃ! তাই নাকি! না হ'লে আসতেন না!—বলিয়া কৃত্রিম অভিমানে অধর স্ফুরিত করিল। মণীন্দ্র দারোগাবাবুকে কহিল, আসুন আসুন, ওরা আসছে পরে। দারোগাবাবু এতক্ষণ সরোজিনীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তাহার রূপ-সুধা পান করিতেছিলেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থান ত্যাগ করিলেন। রহিলাম আমি, হারাণ আর সরোজিনী।

মণীন্দ্র বাড়ির ভিতর হইতে হাঁক দিয়া কহিল, মাস্টারকে ধ'রে নিয়ে এস।

সরোজিনী আমার ডান হাতটা ধরিয়া কহিল, চলুন। কহিলাম, একজন ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করেছ, তার মধ্যে আমার যাওয়াটা—

সরোজিনী বাধা দিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, আপনাকে আবার নেমন্তন্ন করতে হবে নাকি? কহিলাম, তাই বলছি নাকি! কতদিন খেয়ে গেছি যে! তবে আজ শরীরটা খারাপ, রাত্রে কিছু খাব না ভাবছি, আজকের দিনটা আমাকে রেহাই দাও।

সরোজিনী শান্তকণ্ঠে কহিল, বেশ, না খান তো ওখানে গিয়ে বসবেন চলুন।

হারাণকে দেখাইয়া কহিলাম, একে চেন না?

সরোজিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না তো!

কহিলাম, আমাদের হারাণ, ঐ যে পদ্ম, তার দাদা।

সরোজিনী এক মুহূর্ত্তে মুখ আঁধার করিয়া কহিল, চিনতে পেরেছি। উনি আমার আপনার লোক, কিন্তু কোন দিন তো খবর নেন না। বরং বোনকে পাঠিয়ে অপমান করান।

হারাণ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কই, না।

সরোজিনী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিতে লাগিল, ওঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমার সম্পর্কে দিদি; তাঁর মা আমার খুড়ীমার সাক্ষাৎ খুড়তুতো বোন। তাঁকে নিজের চোখে কোন দিন দেখি নি, বিয়ের সময়ে মার কাছে তাঁর কথা শুনেছিলাম। কিন্তু আর দেরি করবেন না, ওঁরা সব ব'সে রয়েছেন, আসুন। আপনিও আসুন হারাণবাবু।

হারাণ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, আমাকে আর কেন? মানে, আমার আবার একটুখানি কাজ—

সরোজিনী কহিল, কাজ থাক, আপনাকে আসতেই হবে। না হ'লে ছোট শালী, জানেন তো! এমন ক'রে টেনে নিয়ে যাব যে—। বলিয়া হাত বাড়াইবার উপক্রম করিতেই হারাণ শশব্যস্ত হইয়া কয়েক পা পিছাইয়া কহিল, না না, যাচ্ছি।

উঠানে চেয়ার ও টেবিল পাতিয়া, বসিবার ও বোধ হয় খাইবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। টেবিলটি একটি ধবধবে সাদা টেবিল-ক্লথ দিয়া ঢাকা। তাহা ছাড়া একটি টুল ও একটি বেঞ্চি রহিয়াছে। ইতিমধ্যে দারোগাবাবু একটি চেয়ার দখল করিয়াছেন; মণীন্দ্র লণ্ঠনটি টেবিলের

উপরেই রাখিয়া পাশে দাঁড়াইয়া আছে; লছমন সিং অদূরে টুলে উপবিষ্ট। আমাদিগকে দেখিয়া দারোগাবাবু কহিলেন, বসুন আপনারা। হারাণবাবু, আসুন, বসুন এখানে।—বলিয়া নিজের পাশের চেয়ারটা দেখাইলেন। হারাণ আসিয়া চেয়ারে বসিল, আমিও আর একটা চেয়ারে বসিলাম। দারোগাবাবু মণীন্দ্রকে কহিল, আপনি দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন?

মণীন্দ্র সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে, আজ্ঞে, আমার কি বসলে চলে? এত বড় অতিথি আমার বাড়িতে!—বলিয়া সরোজিনী ও তিনকড়ির পাছু-পাছু রান্নাঘরের দিকে চলিল। চেয়ার হইতে উঠিয়া ডাক দিয়া কহিলাম, মনুদা, শোন।

মণীন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কি?

উঠিয়া কাছে গিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলাম, আমাকে খেতে-টেতে দিও না।

মণীন্দ্র প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, পাগল নাকি!

ত্রস্তকণ্ঠে কহিলাম, চুপ কর, আস্তে কথা বলতে জান না নাকি?

মণীন্দ্র মৃদুকণ্ঠেই কহিল, কি, বল?

কহিলাম, আমি কিছু খাব না, শরীর খারাপ, সরোজিনীকে বলেছি। হারাণকেই শুধু খেতে দাও দারোগাবাবুর সঙ্গে।—বলিয়া চক্ষের ইঙ্গিতে উদ্দেশ্যটা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম।

মণীন্দ্র বুঝিয়া, পুলকিত হইয়া কহিল, ঠিক, হেরোকে জব্দ করতে হবে, কিন্তু তুমি কিছুই খাবে না, দুখানা লুচি আর মিষ্টি—

কহিলাম, না না, থাক, পরে একদিন খাব এখন।

কাছে আসিতেই দারোগাবাবু বলিলেন, কি কথা হচ্ছিল?

কহিলাম, শরীরটা খারাপ কিনা, তাই আমার জন্যে খাবার আনতে মানা ক'রে দিলাম। শুধু হারাণের জন্যে—

হারাণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, বাঃ রে! আমারও পেটের অসুখ, কদিন কিছু খাচ্ছি না।

কহিলাম, তোমার আবার পেটের অসুখ হ'ল কখন? এই তো সকালে তেলে-ভাজা খাচ্ছিলে দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এটি হারাণের

অনেকদিনের অভ্যাস, আজ অবশ্য চোখে দেখি নাই, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়িলাম।

হারাণ বলিয়া উঠিল, তেলে-ভাজা তো সকালে খাই, রাত্রে কিছু খাই না।

দারোগাবাবু হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, হারাণবাবুর জাতটা নেহাত গেল দেখছি আজ, ম্লেচ্ছের পাশে ব'সে—

হারাণ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, সে কি হুজুর? আপনার থানায় ব'সে কতদিন খেয়েছি যে!

দারোগাবাবু গম্ভীর মুখে কহিলেন, সে কবে কি খেয়েছেন মনে নেই।—বলিয়া কৃত্রিম অভিমানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

হারাণ কহিল, বেশ, আজও খাব তা হ'লে। মাস্টার, ব'লে দাও। হাঁকিয়া মণীন্দ্রকে জানাইয়া দিলাম।

তিনকড়ি ও মণীন্দ্র দুইজনে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া হাজির করিল। হরেক রকমের খাবার, লুচি, তরকারি, মাংসের কালিয়া, চপ, কাটলেট, ক্ষীর, সন্দেশ, দই ইত্যাদি। বুঝিলাম, সরোজিনী সব নিজহস্তে তৈয়ারি করিয়াছে। না হইলে ফুন্টি—অনেক খাবার জীবনে দেখে নাই, তৈয়ারি করিবে কি!

হারাণ করুণ চক্ষে আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, মাস্টার, তা হ'লে খাই। অসুখ-বিসুখ হ'লে খবর নিও।

মনু কহিল, কিছু ভয় নেই, অসুখ কেন, ম'লেও খবর নেবার লোকের অভাব হবে না। তিনকড়ি সব ভার নেবে বলেছে।

হারাণ তাহার দিকে কটমট করিয়া তাকাইল।

দারোগাবাবুও আশ্বাস দিয়া কহিলেন, কিছু ভয় নেই হারাণবাবু। সরোজিনী দেবীর নিজের হাতে তৈরি খাবার খেয়ে ম'লেও স্বর্গে যাবেন। সরোজিনী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

দারোগাবাবু সসম্মানে কহিলেন, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

মণীন্দ্র শশব্যস্ত হইয়া কহিল, ব'স তুমি, দারোগাবাবু এত ক'রে বলছেন। আমাকে কহিল, তুমিও ব'স না মাস্টার। দুইজনে বসিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, সব সরোজ নিজের হাতে রেঁধেছে।

দারোগাবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তা আর বলতে হবে না, জিবে টের পাচ্ছি, তাই তো হারাণবাবুকে বলছিলাম।

সরোজিনী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি?

দারোগাবাবু কহিলেন, উনি খেতে ভয় করছিলেন।

সরোজিনী শ্লেষের সহিত কহিল, ভয় কিসের হারাণবাবু? দারোগাবাবু খাচ্ছেন। তবে জাত যাবার ভয় হতে পারে বটে, আমরা তো জাতে পতিত কিনা।

হারাণ ভরাট মুখে কহিল, না না। পেটে হাত দিয়া জানাইল, অসুখ।

কহিলাম, অসুখ তো বটে, সাঁটছ তো মন্দ নয়। তিনকড়ি হাসিয়া উঠিল। হারাণ তাহার দিকে কটমট করিয়া তাকাইতেই তিনকড়ি হাসি বন্ধ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

দারোগাবাবু কহিলেন, মাস্টার মশায়ের কিন্তু দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, ওঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। সরোজিনী আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন মুখে তাকাইতেই দারোগাবাবু কহিলেন, উনি বাড়ি থেকে রাগ ক'রে এসেছেন, হারাণবাবু ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

সরোজিনী কহিল, তাই নাকি! বউদিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে? তা হ'লে আজ বোনের বাড়িতেই রাতটা কাটিয়ে যান দাদা। বউদিদি একটু জব্দ হোক।

দারোগাবাবু বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, মাস্টার মশায় আপনার দাদা নাকি?

ঘাড় নাড়িয়া ছেলেমানুষির স্বরে সরোজিনী কহিল, হুঁ, নিজের দাদার চেয়েও ঢের বেশি। হারাণ খাওয়া বন্ধ করিয়া সরোজিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। সরোজিনী তাহার দিকে তাকাইতেই মুখ নামাইয়া আবার খাইতে শুরু করিল।

সরোজিনী তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, হারাণবাবুও আমার দাদা, আমার জামাই-দাদা।

দারোগাবাবু অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন, সত্যি! তবে যে হারাণবাবু আপনার বিপক্ষদলে দাঁড়িয়েছেন!

হারাণ কহিল, আজ্ঞে, আমি তো কোন দলে নেই। লছমন সিং এতক্ষণ নির্ব্বাকভাবে সব শুনিতেছিল; সে এখানে বসিয়া কিছু খাইতে রাজি হয় নাই, বাড়ি যাইবার সময় কিছু লুচি ও মিষ্টি সঙ্গে লইয়া যাইবে; হারাণের কথা শুনিয়া স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, হারাণবাবু সব দলেই আছেন।

হারাণ কাঁচুমাচু মুখে চুপ করিয়া রহিল। সরোজিনী কথাটা চাপা দিয়া কহিল, ওঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমার দিদি, আমার খুব আপনার লোক উনি।

দারোগাবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, সবাই আপনার নিজের লোক দেখছি, আমিই শুধু পর।

মণীন্দ্র কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। সরোজিনী কি কথা বলিতে যাইতেছিল, তাহার কথা লুফিয়া লইয়া কহিল, আপনি আমাদের সকলের চেয়ে আপনার। যা করেছেন আপনি! আপনি না থাকলে সব এতদিন ভূত-ভোজন হয়ে যেত।

সরোজিনী কহিল, সত্যি, আপনি না থাকলে, কি যে হ'ত আমার! হয়তো—। বলিতে বলিতে কণ্ঠ অশ্রুজড়িত হইয়া উঠায় বক্তব্য শেষ করিতে না পারিয়া, বোধ করি, অশ্রু গোপন করিবার জন্য মাথা নত করিল।

দারোগাবাবু তাহার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বীরবিক্রমে বলিয়া উঠিলেন, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি সব এমনই টিট ক'রে দিয়ে যাব যে, আপনি এখানে না থাকলেও, আপনার জমিদারি ঠিকমত চ'লে যাবে।

সরোজিনী নত-মস্তকে থাকিয়াই কোনমতে কহিল, আপনার দয়া।

মণীন্দ্র আগাইয়া আসিয়া মুক্তহস্তে কহিল, তাই ক'রে দিন দারোগাবাবু। সরোজিনী যদি কখনও তীর্থে-টীর্থে গিয়েও থাকে, তা হ'লে যেন আমি একাই জমিদারি চালিয়ে দিতে পারি।

খাওয়া-দাওয়ার পর দারোগাবাবুর সঙ্গেই আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। সরোজিনীও বিদায় দিবার জন্য রাস্তা পর্য্যন্ত আসিতে উদ্যত হইয়াছিল।

দারোগাবাবু তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, থাক থাক, আপনাকে আর যেতে হবে না। এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। আপনার হাতের খাবার খাইয়ে লোভ বাড়িয়ে দিলেন আজ। হয়তো মাঝে মাঝে বিরক্ত করতে আসব।

মণীন্দ্র কহিল, বিরক্ত! বলেন কি? আপনার পায়ের ধুলো পড়লে কৃতার্থ হয়ে যাব আমরা।

কায়দামত বিদায় লইয়া দারোগাবাবু কহিলেন, মাস্টার মশায়, আর দেরি করবেন না। হাসিয়া কহিলেন, হারাণবাবু আজ ম্লেচ্ছের সঙ্গে ব'সে খেয়েছেন, খবরটা গাঙুলী মশায়কে দিয়ে দেবেন।—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মণীন্দ্রর কাছে বিদায় লইয়া চলিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় তিনকড়ি আসিয়া খবর দিল, দিদি ডাকছেন। প্রশ্ন করিলাম, কাকে? তিনকড়ি হারাণের উদ্দেশে চক্ষের ইঙ্গিত করিল।

হারাণ সবিস্ময়ে কহিল, আমাকে?

তিনকড়ি চলিয়া যাইতে যাইতে কহিল, হুঁ।

হারাণ পুলকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, দাঁড়াও হে মাস্টার, কি বলছে শুনে আসি, যাই হোক শালী তো!—বলিয়া চলিয়া গেল।

অন্ধকারে একা দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু মনের কোণে একটি ছোট ঈর্ষার কাঁটা খচখচ করিতে লাগিল। আমি যে অছিলা করিয়া খাইলাম না, তাহা বুঝিয়াও সরোজিনী আমাকে আর একবারও খাইতে অনুরোধ করিল না, আর ওদিকে হারাণকে পেট পুরিয়া খাওয়াইয়াও আবার ডাকাডাকি! আজ আমার চেয়েও হারাণ হইল তাহার আপনার! অথবা ইহা হয়তো সরোজিনীর চাল। স্নেহ-শ্রদ্ধা কিছুই সে কাহাকেও করে না, যাহা করে তাহা স্বীয় কার্যোদ্ধারের জন্যই করে। দারোগার সামনে অভাগিনী অসহায়া বিধবাসুলভ অশ্রুছলছল ভাব, আমার বুকের কাছে ঘেঁষিয়া ছোট বোনের মত আদুরে আবদার, এবং হারাণের সঙ্গে শ্যালিকাসুলভ সরস আত্মীয়তা, সবই তাহার পোজ্। দ্রুতপদে হারাণ আসিয়া হাজির হইল। মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, যেন রাজ্য-জয় করিয়া ফিরিতেছে। কহিলাম, কি বললে হে?

হারাণ গম্ভীর মুখে কহিল, ওসব গোপন কথা। কাউকে বলতে মানা করলে।

চুপ করিয়া গিয়া চলিতে শুরু করিলাম; কিছুক্ষণ পরে কহিলাম, সরোজিনীকে ওর শাশুড়ীর কথা কিছু বললে? হারাণ চিন্তা-সাগরে বোধ করি ডুব-সাঁতার দিতেছিল; হঠাৎ মাথা তুলিয়া কহিল, কি? বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করিলাম।

হারাণ কহিল, পাগল নাকি! আমি তোমাদের ওসবের মধ্যে আর নেই।—বলিয়া আবার ডুব দিল। আবার ডাক দিয়া কহিলাম, গাঙুলী মশায়কে কি বলবে? হারাণ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ইঃ, সমস্ত শরীরটা এখনও সিরসির করছে মাইরি! থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, কি হ'ল হে?

হারাণও থামিয়া কহিল, সে এক ব্যাপার! কাউকে না বল তো বলি।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, পাগল! আমি তোমার কোন কথা কাউকে কখনও বলেছি?

হারাণ আমার হাত ধরিয়া রাস্তার এক পাশে টানিয়া লইয়া গিয়া কহিল, তবে শোন, তিনকড়ির পিছুপিছু তো গেলাম, গিয়ে দেখি মণীন্দ্র খেতে বসেছে, কিন্তু সরোজিনী নেই। তিনু বললে, বোধ হয় ওপরে আছেন। মনুও বললে, ওপরে আছে, যাও। আমি দোতলায় গেলাম, প্রথম ঘরটা তালাবন্ধ, মাঝের ঘরটা দেখি খোলা, কিন্তু অন্ধকার, ভেতরে ঢুকতেই কে বললে, কে? আমি বললাম, আমি হারাণ। সরোজিনী বললে, আপনি জামাইবাবু! তারপর—ওঃ, এখনও গাটা কেমন করছে! সরোজিনী আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, জড়িয়ে ধ'রে, বুকে মাথা রেখে চাপা গলায় কেঁদে উঠল, জামাইবাবু, আপনি দিদিকে একেবারে ভুলে গেছেন? অভাগিনী ছোট শালীটির দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না? আমার যে আপনি ছাড়া এখানে সত্যিকার আপনার বলতে কেউ নেই জামাইবাবু! কি ব্যাপার দেখ দেখি ভাই! আমি তো কোনমতে ছাড়িয়ে—

হারাণের উপর কেন যেন রাগ হইয়া গেল, কড়া গলায় কহিলাম, মিথ্যে কথা। তুমি ছাড়াবার চেষ্টা কর নি।

হারাণ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, তা করি নি, ওই নিজে ছেড়ে দিয়ে, সামনে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগল। কি করি ভাই! মুখ থেকে আঁচল ছাড়িয়ে কান্না বন্ধ করবার জন্যে বললাম, কেঁদো না, তোমার কোন ভাবনা নেই। গাঁয়ের যে যাই করুক, আমি তোমার ধারেই থাকব। বলতেই সে কান্না থামিয়ে বললে, আপনি কিন্তু দিনে একবার ক'রে খবর নিয়ে যাবেন। বললে, ভগ্নীপতি আপনি, স্বামীর পরেই তো আপনার স্থান। কি কথা শোন দেখি ভাই! বুকটা আমার এখনও ধড়ফড় করছে, দেখ।—বলিয়া আমার হাতটা টানিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল।

হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলাম, তবে আর কি! এ পক্ষের বউকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে প্রবোধ গাঙুলীর গদিতে ব'সে যাও এবার।

হারাণ কহিল, দূর! তোমার যেমন কথা! ছোট বোনের মত। কিন্তু তুমি ভাই কাউকে এ কথা ব'লো না। তা ছাড়া আমি যে খেলাম, তাও কাউকে ব'লো না।

কহিলাম, সেজন্যে তোমার চিন্তা নেই, ও খবর যাতে গাঁয়ের সবাই জানতে পারে, মনু চক্রবর্ত্তী তার ব্যবস্থা করবে।

হারাণ চিন্তিত হইয়া উঠিয়া কহিল, সত্যি। একটু পরেই একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া কহিল, করুক গে! আমি কাউকে ভয় করি না। আমি আর তোমাদের দলাদলিতে নেই তো আর কাকে ভয়?

কহিলাম, তা হ'লে গাঙ্গুলী মশায়কে ব'লে এস, তুমি আর এসবে নেই।

হারাণ বেপরোয়াভাবে কহিল, দায় পড়েছে। তুমি ব'লে দিও। আরও ব'লে দিও, আমি সরোজিনীর দলে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি সরোজিনীকে ব'লে দিয়ে এসেছি, তাকে ভুলিয়ে তার শাশুড়ীকে নিয়ে যেতে, গাঙ্গুলী মশায় তোমাকে পাঠিয়েছিল, আমাকে তুমি ধ'রে নিয়ে এসেছিলে। আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিরক্ত স্বরে কহিলাম, তুমি তো আচ্ছা মিথ্যেবাদী! এ কথা তুমি বললে কি ক'রে?

হারাণ হাসিতে হাসিতে কহিল, তা আর কি করব? নিজের ঘাড়ে দোষ নোব নাকি?

রাগিয়া উঠিয়া কহিলাম, বেশ। আমিও এর শোধ নোব। কনে-বউকে সব ব'লে দোব।

হারাণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া ডান হাতের তর্জ্জনীটি আমার মুখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া বীরদর্পে কহিল, সাবধান মাস্টার, এসব কর তো ভাল হবে না বলছি।

কহিলাম, তুমি আমার সম্বন্ধে ও কথা বললে কেন?

হারাণ হাসিয়া উঠিয়া কহিল, মিথ্যে কথা। তুমি কি কর দেখছিলাম। কিছুই বলি নি। তুমিও যেন কাউকে কিছু বলতে যেও না। ডুবে ডুবে দুজনে জল খাব আমরা, কাউকে জানাবার দরকার কি?

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

লাল বনাত

শত্রুপক্ষের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, রায় মহাশয় অদ্ভুত বেশে সজ্জিত হইয়া সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন। গায়ে টকটকে লাল বনাতের কোট, মাথায় ধপধপে সাদা রেশমের পাগড়ি, অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সাক্ষী দিতেছেন। তিন বৎসর আত্মগোপন করিবার পর আজ এই প্রথম তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাতটি ফৌজদারী মকদ্দমায় তিনি আসামী—সাতটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তাঁহার নামে জারি হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাবধি তিনি অধৃত। আজ এই প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার আবির্ভাবের গুরুতর হেতু আছে। স্বয়ং আসিয়া সাক্ষী না দিলে একটি প্রকাণ্ড মকদ্দমায় তিনি পরাজিত হইবেন, তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধেক বেহাত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে।

শত্রুপক্ষের লোকেরা পুলিস সমভিব্যাহারে আদালতের বারান্দায় সাগ্রহে অপেক্ষমান, সাক্ষী দিয়া বাহির হইলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। ঠিক বারান্দার নীচেই একটি তেজস্বী অশ্ব গ্রীবা বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। রায় মহাশয়ের ঘোড়া। পুলিস সাহেবের ঘোড়াও অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

রায় মহাশয় সাক্ষী দিয়া বারান্দায় বাহির হইলেন এবং নিমেষের মধ্যে বারান্দার উপর হইতেই একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া গেল।

পুলিস প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িল, তাহার পর একজন দারোগা পুলিস সাহেবের ঘোড়াটা লইয়া আসামীর অনুসরণ করিলেন। রায় মহাশয় আগাইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই লাল বনাতের কোট গায়ে মাথায় সাদা পাগড়ি অশ্বারোহীকে দেখিতে পাওয়া গেল। অশ্ব তীরবেগে ছুটিতেছে। দারোগাও ঘোড়ার গতিবেগ বাড়াইলেন। বন্ধুর মসৃণ ছোট বড় বহুবিধ প্রান্তর পার হইয়া রায় মহাশয়ের অশ্ব অবশেষে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে দারোগার অশ্বও প্রবেশ করিল। বন অতিক্রম করিয়া আবার একটা মাঠ। মাঠে পড়িয়া দারোগা রায় মহাশয়কে পুনরায় দেখিতে পাইলেন—উদ্দাম বেগে ঘোড়া ছুটিতেছে। তিনিও ঘোড়াকে সজোরে কয়েকবার কশাঘাত

করিলেন। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর দারোগার মনে হইল, বিধি প্রসন্ন হইয়াছেন। রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি খুলিয়া গিয়াছে এবং তাঁহা ঠিক করিবার জন্য তাঁহাকে নামিতে হইয়াছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে দারোগা অকুস্থলে আসিয়া পৌঁছিলেন; রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি তখনও ভাল করিয়া বাঁধা হয় নাই।

দারোগা ঘোড়া হইতে নামিয়া গ্রেপ্তার করিতে গিয়া কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। রায় মহাশয় নয়। দারোগার বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষু দেখিয়া সে নীরবে দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া হাসিল।

"বনফুল"

যাত্রী

কোথা পথ রাচ যুগের আবর্ত্তনে ?
গতিপথে সখা, জমিয়া উঠিছে অতীতের আঁধিয়ার ;
পারায়ে কতই মরু পর্ব্বত বন
যে শ্যামলিমার মিলেছিল সন্ধান,
তারে পিছে ফেলি কোথায় নিয়তি টানে—
সমুখে ঘনায় অতীতের শত ব্যথা।
মরুর তপ্ত অগ্নিসূচিকা বিঁধিছে ক্লান্ত চোখে—
মরীচিকা যেন মেলে সহস্র বাহু।
সেই বিস্মৃত যুগে
নয়নে যখন ভাসিছে কুহেলীছায়া,
তখন বন্ধু, পড়েছিল আসি স্বর্গের জ্যোতিরেখা
ব্যবধান সৃজি আদিম জন্তু সনে ;
তারপর হতে পেয়েছি পাথেয় কত—
কত প্রদেশের ছিঁড়ি রহস্যজাল
গোপনবার্ত্তা ছড়ায়ে দিয়েছি সোনালী আলোর তলে।
আজ কেন সখা, মনে হয় সব ব্যর্থ আবিষ্কার !
সোনার সূর্য্য গাল নিঃশেষ হ'ল,
আদিম জন্তু উঁকি দেয় ফিরে ফিরে,
জ্যোতির পুঞ্জ তাহার নয়ন অন্ধ করে না কেন ?
তাই সখা, আর চরণ চলে না বুঝি—
মরুর তপ্ত অগ্নিসূচিকা বিঁধিছে ক্লান্ত চোখে—
মরীচিকা যেন মেলে সহস্র বাহু।

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার

প্রসঙ্গ কথা

অনেক দিন "প্রসঙ্গ কথা" লিখি নাই। প্রধান কারণ যুদ্ধের দরুন কাগজের দুর্ম্মূল্যতা ও অপ্রতুলতাজনিত স্থানাভাব। এবারে ঐ অভাব সত্ত্বেও বিস্ময় ও কৌতূহলবশত একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া পারিতেছি না। প্রসঙ্গটি অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ঢাকা ষ্টেশন ও বাংলা সাহিত্য। রেডিওর সাহায্যে মুখ্যত স্থানীয় গভর্মেণ্টের অত্যাবশ্যক প্রচারকার্য্য পরিচালিত হইলেও গৌণভাবে জনসাধারণের জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের ব্যবস্থা হইতে পারে। বস্তুত বহুক্ষেত্রে এই ফালতু (by-product) উপকার এত অধিক সাধিত হইয়া থাকে যে, গোপন মূল উদ্দেশ্য একরকম চাপা পড়িয়া যায় এবং রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের মত আমরা বেতারকেও পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি বিরাট দান হিসাবে মান্য করিয়া থাকি। গৌণ বিষয়গুলির মধ্যে রেডিও মারফৎ সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষাদান বর্ত্তমানে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, জনসাধারণের প্রভূত উপকারও হইতেছে। বি. বি. সি. এই ব্যপদেশে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া দূর দূরান্তর হইতে বক্তা বা কথক সংগ্রহ করিয়া থাকেন। দেশের প্রতি প্রীতি আছে বলিয়াই সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ দেশের কল্যাণকর এই সকল ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন না। তাঁহারা জোরের সঙ্গেই বলিতে পারেন—

> Broadcasting in this country has been built up on definite policies of comprehensive and constructive public service. Those connected with the organisation are fully conscious of the new territories which have to be penetrated and opened up, and of the known areas still to be further developed.

কিন্তু এই পরাধীন দেশে আমরা দেখি, সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত মানুষের প্রধান আসক্তি মাস-মাহিনার প্রতি। কোনও ক্রমে দিনগত পাপক্ষয়

হইলেই তাঁহারা খুশি হইয়া উঠেন। কোনও নূতন ব্যাপারে প্রবেশ করিয়া দেশের ও দশের উপকার সাধনের প্রবৃত্তি তাঁহাদের হয় না; গতানুগতিক কাজ কুৎসিততমভাবে নিষ্পন্ন করিয়াই তাঁহারা তৃপ্ত থাকেন; ইহার মধ্যেই যদি নিজের বা আত্মীয়বান্ধবের উপরি কিছু জুটিয়া যায়, সে তো সোনায় সোহাগা! দেশের সর্ব্বত্রই যখন এই ব্যবস্থা, তখন ঢাকা রেডিও ষ্টেশনের বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করি কেন? করিতেছি এইজন্য যে, তাঁহারা এমন কাজে অবহেলা করিতেছেন যাহার জন্য তাঁহাদিগকে বুদ্ধি বা গতর কিছুই খরচ করিতে হইত না। যাহা তাঁহাদের অত্যন্ত হাতের কাছে তাহাই সংগ্রহ করিতে তাঁহারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গাফিলতি করিতেছেন। বর্ত্তমানে বাংলা দেশে বাংলা সাহিত্যের নানা দিক সম্বন্ধে ভাবিবার বা বলিবার খুব বেশি লোক নাই। যে দুই-একজন মাত্র আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার প্রধান। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও ভাষণ বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তিনি ঢাকাতে সুলভ হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা ষ্টেশন হইতে তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক আলাপ-আলোচনা প্রচারিত হয় না কেন, এই প্রশ্নের জবাব কি স্থানীয় দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্ম্মচারীরা দিতে পারিবেন? কবি মোহিতলাল তাঁহার কবিতা আবৃত্তির জন্যও সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আবৃত্তিও তো বহু দিন মাইক-মাধ্যমে আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই! যদি সেখানে সাহিত্যবিষয়ক আলাপ-আলোচনা-আবৃত্তির ব্যবস্থা একদম না থাকিত, তাহা হইলে বিস্মিত হইতাম; কিন্তু এভাবে অভিযোগ করিতাম না। কিন্তু যেভাবে সেখান হইতে দিনের পর দিন অতিশয় নিকৃষ্ট সাহিত্যালাপ দুই-চারিজন বিশেষ বিশেষ কারণে অতিশয় ভাগ্যবান ব্যক্তির কণ্ঠে প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা শুনিয়া এবং ঢাকায় মোহিতবাবুর অস্তিত্বের কথা অবগত হইয়া শুধু বিস্ময় নয়, নানা সংশয়ও মনের মধ্যে উদিত হয়। যত দিন যাইতেছে, এই সংশয় ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সংশয়ের নিরসন করিবে কে?

অথচ সেদিন শুনিলাম, বাংলা কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে কবি মোহিতলালের একটি আলাপ কলিকাতা ষ্টেশন হইতে রেকর্ডযোগে প্রচারিত হইল। কলিকাতায় যাহা গ্রাহ্য, ঢাকায় কি তাহা গ্রাহ্য নয়? অথবা কাহারও কোনও ব্যক্তিগত দুষ্প্রবৃত্তি এরূপ ব্যবস্থার অন্তরালে কাজ করিতেছে? যাঁহারা বাংলা সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী, তাঁহাদের নিশ্চয়ই এ সকল প্রশ্নের জবাব দাবি করিবার অধিকার আছে।

মোহিতবাবু আমাদের লেখকগোষ্ঠীর একজন, আমাদের আপনার জন, শুধু সেই কারণেই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি না; ইতিমধ্যেই বহুলোকে মুখে এবং পত্রে আমাদের নিকট এই বিস্ময়কর ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন। আমরা জবাব দিতে পারি নাই। উপরন্তু উক্ত ষ্টেশনে কতিপয় ভাগ্যবান ব্যক্তির বাংলা সাহিত্যবিষয়ক বিবিধ কণ্ঠকুর্দ্দনের মূলে কোনও গূঢ় কারণ আছে কি না, বহু ব্যক্তির সে প্রশ্নের উত্তরেও আমরা নীরব থাকিতে বাধ্য হইয়াছি।

আর এক কথা, বাংলা কাব্যের রসবিচার, মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলার কবিদের বৈশিষ্ট্য, বাংলার কাব্যধারা, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বাংলা কবিতার ছন্দ ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে বর্ত্তমানে মোহিতবাবু অথরিটি অর্থাৎ অতিশয় নির্ভরযোগ্য মতামত পোষণ করিয়া থাকেন; একমাত্র বেতারযোগেই বাংলা দেশের সকল শ্রেণীর শ্রোতার পক্ষে এই সকল বিষয়ে তাঁহার আলাপ শুনিবার সুযোগ হইতে পারে; লেখায় যত দরদই থাক, ব্যক্তিগত সংযোগের অভাব ঘটে। বেতারের কর্ত্তৃপক্ষ যদি আমাদিগকে অকারণে বা কোনও গুপ্ত কারণে বঞ্চিত করেন, আমরা তাহা হইলেও অনুযোগ করিবার অধিকারী। ধারাবাহিক বক্তৃতা বহু অবাঞ্ছিত লোকেও দিয়া থাকেন, একজন সত্যকার জ্ঞানী ব্যক্তিকে দিয়া বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি ধারাবাহিক আলাপের ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে। ঢাকার কারণ যদি ঢাকাই থাকে, আমরা কলিকাতার বেতার প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হইতেছি।

সংবাদ-সাহিত্য

"এখনো তারে চোখে দেখি নি
শুধু বাঁশী শুনেছি।"

মাঝে মাঝে বাঁশী শুনিতেছি—নাগরের ওষ্ঠনিঃসৃত বংশীধ্বনি নয়, তাঁহার অভ্যর্থনা ব্যপদেশে উত্থিত স্বরলহরী। অনুভব হইতেছে তিনি উত্তরোত্তর সান্নিধ্যে আসিতেছেন। শাস্ত্রমত শৃঙ্গার শেষ করিয়া আমরাও প্রস্তুত হইয়া আছি। এক শত পঁচাশি বৎসর পূর্ব্বে একবার যেমন আম্রকুঞ্জের অন্তরালে বঁধুর লৌহ-আড়বাঁশীর ধ্বনি আচমকা শুনিয়া অপ্রস্তুত অবস্থাতেই তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়াছিলাম, এবার তেমনটি ঘটিতে দিব না। বঁধু শিখাইতেছেন, দুষ্ট নাগরের জন্য আর কিছু না হউক নখদন্ত শানাইয়া রাখিতে, এবার জয়দেবী প্রথায় অভ্যর্থনা করিব। বঁধু যে আত্মরক্ষার জন্য বহুদিন হইল আমাদের মুড়া ঝাঁটাগাছটাও গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছেন; পুরাতন প্রেমের আতিশয্যে নূতন ঝাঁটাও আর সংগ্রহ করা হয় নাই। মধ্যরাত্রে নাগর আসিয়া দরজায় টোকা মারিতেছেন। এখন তাঁহাকে ঠেকাই কি দিয়া? নখদন্ত? তাও কি ছাই এই বুড়া বয়সে আছে?

* * *

তবু আমরা প্রস্তুত হইয়াছি। সেদিন আমাদের কেহ ছিল না, এবারে বঁধু সহায়। স্লিট ট্রেঞ্চের ভরসা এবং বিফল প্রাচীরের আশ্বাস লইয়া আমরা মুহুর্মুহু আস্ফালন করিতেছি—নির্ভর-নিদ্রাসুখে-প্রসুপ্ত বঁধুর ঘুম ভাঙিয়াছে, আর আমাদের ভয় নাই। নাগরের টোকাই শুনিলাম, বোধ হয় আর চোখে দেখিতে হইবে না।

* * *

তবু আজ কেন জানি মনে হইতেছে, বঁটি ঝাঁটা ও নোড়াটা হাতে থাকিলে নিজেও বুকে বল পাইতাম, বঁধুরও কতকটা নিশ্চিন্ত হইবার অবকাশ মিলিত।

কি ছুটাছুটি দৌড়ধাপটাই না বেচারাকে করিতে হইতেছে! এই কাঁচা ঘুম ভাঙা অবস্থায়! মায়া হয় দেখিলে। এক একবার মনে হইতেছে, কোমরে কাপড় জড়াইয়া ফোকলা মাড়ি লইয়াই নামিয়া পড়ি; হাতিয়ারটা-আসটাও তো প্রয়োজনের সময় হাতে তুলিয়া দিতে পারিব; তৃষ্ণার সময় জলের গেলাসটাও তো মুখে ধরিতে পারিব; কিন্তু আবার অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূর দীর্ঘ-কালের অনভ্যাসের লজ্জা আসিয়া বাধা দিতেছে; বঁধু সাহস দিয়াছেন, তবু মন মানিতেছে না। তোমরা এখন বল তো আমি কি করি?

* *

তোমরা ভাবিতেছ, বাড়াবাড়ি হইতেছে, বড় বেশি সতীপনা দেখাইতেছি। এ যুগে মুখ বদলাইতে পাইলে আবার কে ছাড়ে? তা ছাড়া, উনি কি সুখেই না রাখিয়াছিলেন! না, গো না। এ যদি ভাব, তাহা হইলে তোমরা মেয়ে-মানুষের সাইকলজি কিছুই জান না। পুরুষান্তর করিতে মেয়েদের বড় সাধ বা প্রবৃত্তি নাই; তা করুক অনাদর, হউক কাপুরুষ। রাজরাণীর কন্যাকে ঘেঁষেড়ার ঘর করিতে দেখ নাই? একবার যাহাকে বুকে টানিয়া লইয়াছি, তাহাকে ছাড়িতে আমাদের বড় বাজে; তা যাই বলুন আমাদের গান্ধারী দিদি। তাঁহার বড় অভিমান। মেয়েমানুষের অত অভিমান সাজে না। বিধবা হইয়া কাঁদিতে, একাদশী করিতে, মাছ না খাইতেও রাজি ' ছি। কিন্তু পরপুরুষ? ছি!

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের কথা জানি না, যুদ্ধের দরুন আমাদের বাংলা দেশে নিদারুণ অন্নসমস্যা দেখা দিতেছে। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না, আমাদের এই সুজলা সুফলা দেশে সকল অধিবাসীর উপযুক্ত পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হয় না—অনেক কোটি মণ অভাব থাকিয়া যায়। এই অভাব এতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ পূরণ করিয়া আসিত। ব্রহ্মদেশ এখন আমাদের নাগালের বাহিরে, সুতরাং অভাব রহিয়াই যাইতেছে। তা ছাড়া, ব্রহ্মদেশ মালয় প্রভৃতি

স্থান হইতে বহু ভারতবাসী অন্তত কিছু দিনের জন্য বাংলা দেশে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে ; এই সকল দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশপথই বাংলা দেশ। যুদ্ধের জন্য সহস্র সহস্র নূতন লোকেরও আমদানি এখানে হইয়াছে, ফলে অন্নসমস্যা মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে। গভর্মেণ্ট অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, এবং জমিতে সারপ্রয়োগে উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ—এই দুইটিই হইতেছে মুখ্য লক্ষ্য। সারের ব্যাপারে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একটু চেষ্টা করিলেই বাংলা দেশে এতদিন যাহা ক্ষয়ের কারণ ছিল, সেই কচুরিপানা নামক নিতান্ত অনিষ্টকর দ্রব্যটিই উৎকৃষ্ট সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া মঙ্গলের কারণ হইতে পারে। ইহা লইয়া পরীক্ষা সরকারীভাবে শেষ হইয়াছে এবং কচুরিপানাকে সাররূপে ব্যবহার করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য গভর্মেণ্টের লোক সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন।

* * *

উত্তম কথা। তবু আর একটা কথা মনের মধ্যে জাগিয়া থাকে। বাংলা দেশে অনেক হাজার বিঘা জমিতে পাট চাষ হয়। পাট খাদ্যদ্রব্য নয় এবং বর্ত্তমানে বিদেশে পাট চালান দিয়া পরিবর্ত্তে সেখান হইতে কোনও খাদ্যদ্রব্য আনয়নও সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে শুধু শ্রেণীবিশেষের স্বার্থের খাতিরে পাট-চাষ করার কোনও অর্থ হয় না। সমস্ত পাটের জমিকে যদি ধেনো জমিতে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে বাংলা দেশের অন্নসমস্যা দূর হইতে পারে। এ ব্যবস্থা গভর্মেণ্ট একটু চেষ্টা করিলেই হইতে পারে। গভর্মেণ্ট চেষ্টা করিবেন কি ?

যুদ্ধের অজুহাতে স্থানচ্যুতি ঘটাইয়া বহু বাঙালীকে বিপন্ন করা হইয়াছে, গভর্মেণ্ট আর একটু সহৃদয় হইলেই এই সকল স্থানচ্যুত লোকেদের নূতন আস্তানা নির্ম্মাণে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারিতেন। পৈতৃক ভিটামাটি উচ্ছন্নে যাইবার দুঃখের সঙ্গে নিরাশ্রয় হইবার দুঃখ যুক্ত হইয়া অনেকের পক্ষে জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়াছে। গভর্মেণ্টের হাতে অনেক লোক, অনেক পয়সা ;

বসতবাটি নির্ম্মাণের উপযুক্ত জমিও অনেক আছে। অস্থায়ী বসতবাটি নির্ম্মাণ করাইয়া লোকদের সরাইবার ব্যবস্থা হইলে কাতর আর্ত্তনাদ এত অধিক শুনা যাইত না।

—

সাহিত্যের সহিত পলিটিক্স জড়াইয়া বিভিন্ন জেলায় নানা সভাসমিতির অধিবেশন সম্প্রতি অত্যধিক পরিমাণে হইতেছে। তথাকথিত বহু সাহিত্যিক এই সকল ব্যাপারে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। মফস্বলেই এগুলির প্রসার বেশি। সাহিত্য-নামাঙ্কিত হইলেও আসলে এগুলি নিছক পলিটিক্স সংক্রান্ত অনুষ্ঠান। সাহিত্যিক হইয়া এই জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পিছনে এক ধরনের "পলায়নী" মনোবৃত্তি আছে। মানুষ যখন সর্ব্ব বিষয়ে বিফল-প্রযত্ন হয় তখনই মায়ার জাত অথবা গোলে-হরিবোলের সন্ধান করে। সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টির অক্ষমতা যখন পলিটিক্স-প্রবণতা হইয়া দেখা দেয়, তখন সত্যকার পলিটিক্সেরই সাবধান হইবার কথা।

—

রবীন্দ্রনাথের মত্যুর পর প্রথম জন্মদিন উৎসবের নামে সেদিন কলিকাতার "ওভাটুন হলে" যে জলসা হইয়া গেল, তাহাতে অ্যান্টি-ফ্যাসিষ্ট সাহিত্যিকেরা যোগ দিয়াছিলেন। কয়েকজন সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' নাটিকাটি অভিনয় করিয়াছিলেন। উক্ত নাটিকার কবির ভূমিকাটি আসলে রবীন্দ্রনাথেরই ভূমিকা। সেই ভূমিকায় 'এক পয়সায় একটি'র কবি বুদ্ধদেব বসু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গরদের ধুতি, বাসন্তী রঙের ডুবে চাদর এবং পাকা চুলে তাঁহাকে চমৎকার মানাইয়াছিল। বুদ্ধদেববাবু অ্যান্টি-ফ্যাসিষ্ট; রবীন্দ্রনাথকে একদল লোক কেন ফ্যাসিষ্ট বলিত, সেদিন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, রঙে, রূপে, অভিনয়ে, উচ্চারণে একজন আর একজনের অ্যান্টি যতটা হইতে পারে। বুদ্ধদেববাবু যদি এই অনুষ্ঠানের কর্ম্ম-কর্ত্তাদের কেহ হন, তাহা হইলে বলিতে বাধ্য হইতেছি, ঐ ভূমিকায় তাঁহার অবতরণ (আরোহণ!) নিশ্চয়ই ফাসি-মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

গোপালদা বলিলেন, দগ্ধ হইবার প্রাক্কালে স্বর্ণলঙ্কার যে অবস্থা হইয়াছিল, সোনার বাংলারও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। রাবণ রাজা বিস্মিত আতঙ্কে বলিয়াছিলেন, বানরে সঙ্গীত গায়, জলে ভাসে শিলা—এ বড় দুর্লক্ষণ! জলে শিলা ভাসিতে অবশ্য দেখি নাই (শীলাদেবীদের দেখিয়াছি!) কিন্তু অপর দুর্লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। বাঙালী সাবধান!

সনাতন এবং আধুনিকদের মধ্যে তফাত কি, সেদিন কে একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন। চট করিয়া জবাব দিতে পারি নাই। জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষ' হাতে আসার পর সৌরীনদার (শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়) "একই ধারা" পড়িয়া জবাব পাইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রেও নজির মিলিয়াছে। তাঁহাদের ধারা এবং সৌরীনদা'র ধারা একই—সনাতন। সৌরীনদা অবশ্য মহাভারতের অর্জ্জুনের নজির দিয়াছেন। ব্যাপারটা খোলসা করিয়াই বলি। সনাতন ধারায় সবই বন্দোবস্তে হয়; সুভদ্রাহরণ করিতে গিয়া অর্জ্জুন বন্দোবস্ত করেন ভ্রাতা কৃষ্ণের সঙ্গে; উ-বাবুর সহিত ইন্দিরার প্রেমে সুভাষিণীর বন্দোবস্ত থাকে, উ-বাবুকে পূর্ব্ববিবাহিত পতি হইতেই হয়; রমেশের বন্দোবস্ত করিবার কেহ থাকে না বলিয়া শেষরক্ষা হয় না, কমলা পালায় এবং স্বামী নীলাম্বরই ব্যাধিগ্রস্তা ভিখারিণী বিরাজ বউয়ের পা মাড়াইয়া দেয়। এক্ষেত্রেও নায়ক মনোজের বন্দোবস্ত থাকে নায়িকা সুমিত্রার বাবার সঙ্গে—ফলে সুমিত্রার মনের এমন যে অতি-আধুনিক রোমান্স, তাহাও পর্য্যবসিত হয় বিবাহে। 'চরিত্রহীনে'র পশুরাজের মত আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয়, ভগবান এ ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন, এ হতেই হবে।

* * *

আধুনিকের ধারা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর দেখা যায়, মাসী পিসী অথবা সহোদর বোন; শাস্ত্র যত elastic-ই হউক, সামলাইয়া লইবার আর কোন উপায় থাকে না। শৈলজানন্দের 'বানভাসি', নরেশচন্দ্রের

'শুভ্র' অথবা মন্মথ রায়ের 'একাঙ্কিকা'য় শাস্ত্রমাফিক ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়াই এগুলি অসনাতন অর্থাৎ আধুনিক। ইহারাই পায়োনীয়ার, পরে অবশ্য পায়োনীয়াররাই বানে ভাসিয়া গিয়াছেন। ডাকাতি, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন যত বারই ঘটিয়াছে, ততবারই দেখা গিয়াছে, জোর মিলিয়াছে বটে কিন্তু হিসাব মেলে নাই। "তা হোক" বলিয়া টেম্পোরারি কাজ হাঁসিল করিয়া যে যেদিকে পারে কাটিয়া পড়িয়াছে। ইহাই আধুনিকতা।

—

বোমার ভয়ে শহরের মানুষেরাই যে শুধু স্থানত্যাগ করিয়া মফস্বলগামী হইয়াছে তাহা নয়, হালী কবিতারাও ইভ্যাকুয়েট করিয়া এদিকে ওদিকে বাসা বাঁধিয়াছে। নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে যে সকল ভদ্র ব্যক্তি এতকাল মফস্বলীয় শহরের অনাড়ম্বর আরামের মধ্যে বাস করিতেছিলেন, আপাতত শুধু বাজার দর চড়াতেই তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন। দুদিন পরে যখন অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে এই সকল হালী কবিতার তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ হইবে, তখন তাঁহারাই হয়তো ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া পরিত্যক্ত শহরের দিকে ধাওয়া করিবেন। দুর্ভিক্ষের দেশ বাঁকুড়ায় ইতিমধ্যেই ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন শুরু হইয়াছে। তমসার বক্ষ ভেদ করিয়া সেখানকার 'নবীনা' জাগিয়াছেন। প্রাচীন 'প্রবাসী' সেখানে খুঁটি গাড়িলেও শেষরক্ষা হইবে কিনা কে জানে! বাঁকুড়ায় "ধূসর গোধূলী" দেখা দিয়াছে—বাঁকুড়াবাসী টেক কেয়ার! ট্রেনের ভিড়ে চাপাচুপিতে একটু এদিক ওদিক হইলেও এ একেবারে খাঁটি কলকাত্তাই মাল, বেহালার পাঁচন মার্কা—

ধূসর গোধূলি—ঝলসে দিগন্তর!—
দূর অন্তরীক্ষে লক্ষ ইসারা দৃষ্টিহারা হলো
অরণ্যানীর নিভৃত মনোমন্দিরে বনস্পতির মৃত্যু দেখেছো কেউ?
রক্তিম অঙ্কনে হলো রাঙায়িত দিগন্ত অঙ্গন।
ঘন তমিস্রার সুপ্তিকার, নিমেষে অন্তর্হিত
শূন্য ব্যোমে বিমান চংক্রমণ মরণের সংকেত
ধূসর ক্ষুধায় ইনরন্ধ্র অন্ধকার

ঐন্দ্রাতিক কামনার ল্যাবরিন্থ।

তন্বী-তমাল-তালি-তরুণীর দিন গেলো—জীবনের রিম্‌ঝিম্ স্পন্দন
ঝলসে দিগন্তর!

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা যেখানে নিরন্তর রহিয়াছে, সেখানে যদি ধূসর গোধূলিতে দিগন্তর ঝলসিতে থাকে, তাহা হইলে অনেকগুলা কুষ্ঠাশ্রমেও কুলাইবে না।

রবীন্দ্রনাথের "বিচারক" গল্প মনে আছে? ষ্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান জজ মোহিতমোহন দত্ত ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই হতভাগিনীর যে অপরাধের জন্য এই শাস্তি তাহার মূলে যে স্বয়ং তিনি ছিলেন, অঙ্গুরীয়-অভিজ্ঞানে তাহা জানিতে পারিয়া সেদিন বন্দিনীশালার একটি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে তাঁহার মনে কি অনুশোচনা জাগিয়াছিল? শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও আজ বিচারক, তাঁহার যৌবনের ভাষাগত অনাচার এক হতভাগ্য ক্ষীরোদাকে কি ভয়াবহ পরিণামের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহা দেখিলে শাস্তি দিবার জন্য রায় লিখিতে কি তাঁহার হাত কাঁপিবে না? কে জানে, মুন্সেফ-হাকিমের মনোবৃত্তি দেবাঃ ন জানন্তি। হায় নিষ্ঠুর, তোমার কীর্ত্তি একবার তুমিই দেখ—

"সহজ ছন্দেই আসেমা একসময় বোলো ছেড়ে সতেরোয় পা দিতে গিয়ে নিজেকে মূল্যবতী বলে চিনে ফেললো। বয়স্কা কোনো আত্মীয়া না থাকতে আসেমার আঁট-সাঁট গড়ন-স্ফূর্ত-তরুণ্য আর কারুর সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে পড়ছিলো না। তবু একদিন ভাইকে [সহোদর] পান দিতে গিয়ে আয়েশলোভী ভাইকে এক শুভ-মুহূর্তে আসেমা বিস্ফোরণের সংগেই জাগিয়ে দিয়ে এলো।

...একটা পরিষ্কার আনন্দোচ্ছল কাঁতরানি তার মনের প্রত্যেক খাঁজে বিপুল চাঞ্চল্য জাগিয়ে দিলো। নীরব [নায়ক] চোখ বুজে অনুভব করবার চেষ্টা করলো, আসেমা সম্ভবত নিজেই তাকে ঘনিষ্টভাবে ভেঙে চুম্বন করতে আসছে। হয়তো এক্ষুণি সে নীরবকে জড়িয়ে গ্রাস করে ঘন-ঘন চুম্বনে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। কিন্তু আসেমা যখন চুমোও খেলো না, কিংবা তার কোমল শরীরে গ্রাস করেও

ফেললো না,—অথচ খানিকক্ষণ ঝুঁকে থেকে তার অদ্ভুত দৃষ্টি নীরবের মুখ-চোক-নাকের পাশ থেকে সরিয়ে নিলো, তখন নীরব আর আস্ত থাকতে পারলো না, সম্পূর্ণ করে ভেঙে খান্-খান্ হয়ে গেলো। তার সমস্ত স্বামীত্ব একটা নিষ্ঠুর বোবা চীৎকারের সংগে কুঁকড়ে এতোটুকু হয়ে পড়লো।...

নিজের স্পর্শের উত্তপ্ত তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে আসেমা নীরবের ঠোঁটে একটা ছোট্ট তীক্ষ্ণ চুমো খেলো। নীরবের মনে হলো, এবারে সে গলে গড়িয়ে পড়বে। তবু কিন্তু সে প্রকাশিত হলো না।"

নীরব-চূর্ণ কলুটোলার হকিমদের দোকানে অনুসন্ধান করিলে সম্ভবত পাওয়া যাইতে পারে।

—

শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

"মাথাটা হয় নি উর্ব্বর॰
বই-পড়া বর্ব্বর
ধুঁকচি শিক্ষিত সহুরে বিবর্ণ চাক্‌রির বৃত্তে ;

অমিয়বাবু অতিশয় অমায়িক।

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা"র ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ গ্রন্থ যথাক্রমে 'জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার' ; 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত', এবং 'উইলিয়ম কেরী' প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব গঠনে একেবারে প্রথম যুগে যাঁহারা সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহিনী আজ দীর্ঘ দেড শতাব্দীর ব্যবধানে বাঙালী সমাজকে আনন্দদান করিবে।

—

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ১৩শ গ্রন্থ কেরী-সঙ্কলিত 'কথোপকথন' বাহির হইয়াছে। দীর্ঘ ভূমিকায় কেরীর জীবনের বিচিত্র কাহিনী ও বাংলা ভাষা গঠনে তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায়ের কথা বিবৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই 'কথোপকথন' পুস্তকটিকে একটি যুগান্তকারী পুস্তক বলিয়াছিলেন। এক দিকে সেই যুগের (১৮০১খ্রী) ভাষা ও বাক্যরীতি যেমন ইহাতে বিবৃত হইয়াছে, অন্য দিকে আবার তখনকার সামাজিক রীতিনীতির একটা প্রামাণিক পরিচয়ও ইহাতে মিলিবে।

পুস্তক-প্রসঙ্গ

বিবিধ কথা—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। মিত্র ও ঘোষ কোং, কলিকাতা। পৃ. ২৩৫, মূল্য ২॥০।

বিচিত্র কথা—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কলিকাতা। পৃ. ২৫৬, মূল্য ২॥০।

বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে মোহিতলাল কবি-হিসাবে যেমন, সমালোচক-হিসাবেও তেমনই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্ত্তকরূপে একটি একান্ত নিজস্ব আসন দাবি করিতে পারেন। গত সিকি শতাব্দী ধরিয়া তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে যে তত্ত্ব-চিন্তা করিয়াছেন, তাহার ফল-স্বরূপ আমরা ইতিপূর্ব্বেই বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় অপরিহার্য্য দুই-খানি গ্রন্থ—'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য' ও 'সাহিত্য-কথা' লাভ করিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহার 'বিবিধ কথা' ও 'বিচিত্র কথা' বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিল।

'বিবিধ কথা'য় জাতির জীবন ও সাহিত্য, সত্য ও জীবন, অতি-আধুনিক সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন রায়, আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও নবযুগ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, শরৎ-পরিচয়, রবি-প্রদক্ষিণ, মৃত্যু-দর্শন ও বাঙালীর অদৃষ্ট—এই দশটি প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। বইখানির নাম 'বিবিধ কথা' না হইয়া 'আধুনিক বাংলার সংস্কৃতি ও সাধনা' হইলেই এই সংকলনের সত্যকার নাম-পরিচিতি সম্ভব হইত। বস্তুত এই প্রবন্ধগুলিতে রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙালী জাতির সংস্কৃতি ও সাধনার কথাই আলোচিত হইয়াছে। ভক্তের স্তুতিবাচন নহে, আত্মনিরপেক্ষ সত্য-সন্ধানীর দৃষ্টিতে প্রবন্ধগুলি জাতীয় জীবনের গতিপথ নির্ণয়ে বিশেষ মূল্যবান।

'বিচিত্র কথা'য় অতি পুরাতন কথা, পুঁথির প্রতাপ, সংবাদপত্র ও সাহিত্য, সাহিত্যের শিরঃপীড়া, জাতীয় জীবন-সঙ্কটে, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম, সত্যেন্দ্রনাথ স্মরণে, কাব্যে আধুনিকতা, অতি-আধুনিক প্রতিভা, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ও বিচিত্র কথা—এই এগারোটি প্রবন্ধ আছে। তন্মধ্যে প্রথম প্রবন্ধ 'অতি পুরাতন কথা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার

নামকরণ 'জীবন-জিজ্ঞাসা' হইলেই সমীচীন হইত বলিয়া মনে করি। ইহা জীবনরস-রসিকের জীবন-জিজ্ঞাসা। মোক্ষ, নির্ব্বাণ বা স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য নহে; জীবনের মধ্যেই বাঁচিয়া থাকার কোনও সদর্থ পাওয়া যায় কি না, এই জিজ্ঞাসাই প্রবন্ধটির মূল কথা।

'বিচিত্র কথা'র অন্যান্য প্রবন্ধ প্রধানত সাহিত্যের বিচিত্র সমস্যা সম্পর্কিত, এবং মোহিতলালের বৈশিষ্ট্যও সেগুলিতে পূর্ণভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

আমাদের পরিচয়—শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত, বীণা লাইব্রেরি, কলিকাতা। পৃ. ২২২, মূল্য ২৲।

একটি অতিশয় মূল্যবান গ্রন্থ, এই জাতীয় পুস্তক বাংলা ভাষায় খুব কমই আছে। যাঁহারা ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি ধারাবাহিক পরিচয় চান, এই বইটি তাঁহাদের সংগ্রহ করিতে হইবে। অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে একেবারে আধুনিকতম বর্ত্তমান পর্য্যন্ত নানা ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্য দিয়া আমরা আচারে বিচারে ও সংস্কারে বেদপন্থা হইতে এখন কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছি, ইহাতে তাহা চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম সাত অধ্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির এবং শেষের পাঁচ অধ্যায় বিশেষভাবে বাংলা দেশের সংস্কৃতি ও ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাস।

নির্বাণ—শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর, বিশ্বভারতী। পৃ. ৭৬, মূল্য ১৲।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দুই বৎসরের অন্তরঙ্গ পরিচয় 'নির্বাণ'। পড়িয়া বিস্ময় বোধ করিলাম। এটি লেখিকার প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টা, অথচ ইহাতে পাকা হাতের মুন্সিয়ানা আগাগোড়াই। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সাহায্যে পাঠক সমাজ সত্যকার রবীন্দ্রনাথকে পাইবেন; লেখিকা অনেক সুযোগ সত্ত্বেও উৎকট অহমিকার দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করেন নাই, যেমন অন্য অনেকে করিয়াছেন। অতি সামান্য ঘটনাকে তিনি যেভাবে সাহিত্যের উপকরণ করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় 'নির্বাণ' এই জাতীয় রচনার আদর্শস্থল হইয়া থাকিবে।

পাঞ্চজন্য—কাব্য, শ্রীতীন্দ্রমোহন বাগচী। পৃ. ১৫১, মূল্য ১৷৷০।

'রেখা', 'জাগরণী' এবং 'নাগকেশরে'র কবির এখন পর্য্যন্ত শেষ কাব্যফসল 'পাঞ্চজন্য'—শেষ হইলেও গোড়ার সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল আছে। "যৌবন ও জরা"র দ্বন্দ্ব ঘটিলেও কবি-মন এখনও তাজা, কিন্তু উদ'সীন বাউল উঁকি দিতেছে। কবি নিজেই বলিতেছেন—

বর্ষার জল নামিয়া গিয়াছে, জাগিয়া উঠেছে চর।
কাঁচা রোদখানি বালুকার বুকে চিক্কণ ভাস্বর;
নূতন গজানো বাবলার বনে বাসা বাঁধিয়াছে পাখী,
চখাচখীদের চরণ-চিহ্ন তলে কে দিল রে আঁকি!
বুনো ঝাউয়েদের বুকের ঝুরিতে উদাসীন মেঠো হাওয়া
কি ধন খুঁজিতে ঘুরে মরে যেন দিবসে নিশিতে-পাওয়া।

চারিদিকের অ-সুর আবহাওয়ার মধ্যে 'পাঞ্চজন্য' বংশীধ্বনির মত মধুর ঠেকিল:

রজনীগন্ধা—কাব্য, মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। পৃ. ২৫২, মূল্য ১৷৷০।

বাংলা কাব্যের যুগবিভাগ যদি করি, তাহা হইলে বলিব "রজনীগন্ধা"র যুগ শেষ হইয়াছে, এখন উগ্র ছাতিম ও ঘেঁটুফুলের যুগ। শুচিশুভ্র সুগন্ধ রজনীগন্ধা পুরাতন যুগের স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছে। সে সব দিন আর ফিরিয়া আসিবে না।

কোরো না মিথ্যা আশা—
কণ্ঠ আমার আছে গো কেবল, নাই তার কোন ভাষা;
দেবতা সে গেছে চলে
প্রতিমা ডুবেছে জলে
চারিদিকে আজ বেঁধেছে বাঁধন মরণ সর্ব্বনাশা,
ভাঙা হাটে আজ এসেছ গো কেন—মিছে তোমাদের আসা।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৯

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের চরণ কোনখানেই 'অমিতাক্ষর' নয়; অমিতাক্ষর হইলে, উহার ওই পয়ারের কাঠামোটার কোন প্রয়োজন হইত না। এই ১৪ অক্ষরের মাপটিই বাংলা অমিত্রাক্ষরকে যেমন সম্ভব করিয়াছে, তেমনই ওই পদভাগও (৮+৬) অনাবশ্যক হইয়া যায় নাই। চরণের ওই পদক্ষেপ—উহার অবয়বের ওই অঙ্গসন্ধিই—এ ছন্দের স্বাধীন গতিভঙ্গির একটা বড় সহায়; কারণ, freedom-এর সঙ্গে ওই 'form' আছে বলিয়াই, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এমন মহিমা লাভ করিয়াছে। নূতনতর যতিবিন্যাস ইহার সঙ্গীতকে যেমন বৃহত্তর সঙ্গতি (larger harmony) দান করিয়াছে, তেমনই ওই ৮+৬-এর যতি-দুইটি ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়াছে। চরণমধ্যে বা চরণান্তরে ভাব-অর্থের স্বচ্ছন্দ গতিবেগ যেখানে আসিয়া যেমনই বিরাম লাভ করুক, ওই যতি দুইটি কখনও মুছিয়া যায় না। ইহাকেই আমি এ ছন্দের 'Law of Gravitation' বলিয়াছি। ওই মাপ এবং ওই যতি যদি ঠিক না থাকে, তবে ছন্দহিসাবে অমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্যই লোপ পায়—গিরিশ ঘোষের মিলহীন doggerel তাহার দৃষ্টান্ত। এ জ্ঞান যে কাহারও নাই, তাহার প্রমাণ—একালের মহা মহা ছন্দ-ধুরন্ধরগণ, গিরিশ ঘোষের ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের ধাবমান (run on) পয়ার, এবং

'বলাকা'র ছন্দ, এই সকলকেই অমিত্রাক্ষরের সমধর্ম্মী মনে করিয়া, তুলনায় তাহাদের তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এ জ্ঞান এখনও হইল না যে, এই অমিত্রাক্ষর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু—ইহার আত্মাই স্বতন্ত্র। আর সকল ছন্দই গীতিচ্ছন্দ; কেবল ওই একটি ছন্দ তাহা নহে। অমিত্রাক্ষরেরও একটা লিরিক রূপ আছে; উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবিগণের মত আমাদের রবীন্দ্রনাথও তাহার যথেষ্ট চর্চ্চা করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর লিরিক তো নহেই, এমন কি, উহা নাটক-গোত্রীয়-ও নয়—খাঁটি এপিকের অমিত্রাক্ষর; অর্থাৎ, উহা একেবারে নিকষ-কুলীন,—কিন্তু আমাদের দেশের নেড়ানেড়ীর দল তাহা কিছুতেই বুঝিবে না! চৌদ্দ অক্ষরের কম বা বেশি হইলে উহার জাত থাকে না; হয় কোমরে হাত দিয়া নাচিতে থাকে, বা কাঠি বাজায়; নয় তো সুর-মূর্চ্ছনায় ঢলিয়া পড়ে। এইজন্যই ওই চৌদ্দ অক্ষরের মাপটি এত মূল্যবান। ওই মাপের ওই চরণ, বাংলা কবিতায় দীর্ঘকাল কর্ষণের ফলে, শেষে স্বাভাবিক বাক্‌ছন্দের অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই, বাংলা কাব্যে ছন্দের এই সিংহাসন-রচনা আদৌ সম্ভব হইয়াছিল।

চৌদ্দ অক্ষরের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে মিলের কথা বলিব। সকল নামের মত 'অমিত্রাক্ষর' নামটিও এই ছন্দের একটি উপাধিমাত্র—চূড়ান্ত পরিচয় নয়। সেকালের—হেম, নবীন প্রভৃতি কবিগণ, উহার ওই মিলহীনতাকেই আসল লক্ষণ মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু বাংলা ছন্দের পক্ষে মিলহীন হওয়া যে কত দুরূহ—মিলের ঘুঙুর কাড়িয়া লইলে, তাহার পরিবর্ত্তে কোন্ দুর্ল্লভতর ভূষায় ইহাকে ভূষিত করা প্রয়োজন, সে ধারণা তাঁহাদের ছিল না। আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে, মিলের অভাব-পূরণ নয়—যেন সে ভাবনাই নয়,—মিলকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ অনাবশ্যক করিয়া তোলাই এ ছন্দের গৌরব। এইজন্যই স্বচ্ছন্দ যতি, বা অনিয়মিত

পদবিন্যাস সত্ত্বেও, যে ছন্দে মিলের লেশমাত্র প্রয়োজনীয়তা আছে, সে ছন্দ অমিত্রাক্ষরের হাজার মাইলের মধ্যেও আসিতে পারে না,—তুলনীয় হওয়া তো পরের কথা! ঠিক সেই কারণেই, আজকাল যে সব মিলহীন কবিতা রচিত হইয়া থাকে, তাহাদের সহিতও অমিত্রাক্ষরের দূরতম সম্পর্ক নাই—যেমন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার মিলহীন ছন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দ নয়; সে সকল ছন্দও গীতিচ্ছন্দ।

অতএব, আমরা এ পর্য্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের তিনটি বাহ্য লক্ষণ পাইতেছি;—(১) চরণ হিসাবে উহা সেই পুরাতন পয়ার; (২) উহাতে মিল নাই; এবং (৩) ৮+৬-এর সেই যতি ছাড়াও, ইহার নিজস্ব একপ্রকার যতি আছে। কিন্তু এহ বাহ্য; বাংলা ছন্দহিসাবে (ইংরেজী ছন্দে সে প্রশ্নই উঠে না) ইহার প্রথম বা প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য—ইহার Rhythm বা ছন্দস্পন্দ। এই Rhythm-সৃষ্টি মধুসূদন যে উপায়ে করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ আলোচনা পরে করিব; এখন কেবল ইহাই বলিয়া রাখি যে, এই সমস্যা মধুসূদনকে কখনও উদ্বিগ্ন করে নাই; ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! প্রথম হইতেই, মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল—ওই নূতন যতিবিন্যাস বা ছন্দের গতি-স্বাচ্ছন্দ্যের উপরে। অতএব মনে হয়, Rhythm এবং যতি—অমিত্রাক্ষরের এই দুই প্রধান উপকরণের একটির সম্বন্ধে তিনি যেমন সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, অপরটির (Rhythm) সম্বন্ধে তাঁহার কানই সজাগ ছিল, তাঁহাকে সজাগ থাকিতে হয় নাই; একটিকে নানা রকমে সাজাইয়া বার বার পড়িয়া কানের সম্মতি লাভ করিতে হইয়াছে, অপরটিকে, শব্দের ধ্বনিতরঙ্গে—কান আপনিই ঠিক করিয়া লইয়াছে। নতুবা মধুসূদন তাঁহার নূতন ছন্দ সম্বন্ধে পাঠকগণকে (বন্ধুর মারফৎ) কেবল এই কয়টি কথা বলিতেন না—

"So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse, that I have been obliged to think on the subject [ইহার পূর্ব্বে একবারও আবশ্যক হয় নাই!]

and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 10th, 11th and 12th."

ইহাতেও দেখা যায় যে, তখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার অবকাশ বা প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই, এবং এক্ষণে ইহাই হইল তাঁহার বিশেষ চিন্তার ফল! ইহার পূর্ব্বে আর একবার তিনি এই মাত্র বলিয়াছিলেন—

"If your friends know English, let them read the Paradise Lost, and they will find, how the verse in which the Bengali poetaster writes is constructed. Let your friends guide their voices by the pause (as in the English Blank verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the language."

—এই উক্তিটিতেই বরং—যতই অসম্পূর্ণ হউক—মধুস্থদন তাঁহার ছন্দনির্ম্মাণকৌশলের একটা বড় সন্ধান দিয়াছেন; সেই সন্ধান অনুসারেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। মিল্‌টনের ছন্দের যতিবিন্যাস-পদ্ধতির কথাটাই কবি এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলেও, আসলে ইহার মধ্যে সব কথাই আছে; তিনি যে, কেবল যতিই নয়, ছন্দস্পন্দের সর্ব্ববিধ কৌশল উহা হইতেই আদায় করিয়াছিলেন, পরে আমি তাহাও দেখাইব। কিন্তু কবির সে বিষয়ে কোন সজ্ঞান চিন্তাই নাই—এমন একটা সম্পূর্ণ বিজাতীয় ভাষার ছন্দ-কৌশল বাংলা ভাষার উপযোগী হইল কি করিয়া, তাহার কোনও কৈফিয়ৎই নাই; এ যেন—"Let there be light, and there was light!" তথাপি, উপায় নাই, যেমন করিয়াই হউক—এ রহস্যের সমাধান আমাদিগকেই করিতে হইবে।

ইংরেজী ছন্দ পয়ারের মত পদভূমক নয়—পর্ব্বভূমক; তাহার চরণে

যতি পড়ে foot বা পর্ব্বের পরে—অক্ষরের পরে নয়। মধুসূদনের ছন্দে পদভাগেরও পদচ্ছেদ আছে, এই পদচ্ছেদের পরেই যতির স্থান হইয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া পদচ্ছেদগুলিই এক একটি 'foot' নয়। এসব বিচার তিনি করেন নাই। কাজ কি ওসব ব্যাকরণ-সমস্যার মধ্যে গিয়া? ছন্দটি কানে বেশ লাগিতেছে তো? ব্যস্, আর কি চাই? বাংলা পয়ারে ওই সকল হাঙ্গামা সত্যই নাই। পদ বা metrical section আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে নিয়মিত পদচ্ছেদ বা পর্ব্ব নাই, প্রাচীন পয়ার একেবারে নিছক বর্ণবৃত্ত ছন্দই বটে, তাহাতে বর্ণগত কালাংশ (unit), এবং তাহারই মাপে প্রত্যেক শব্দের, তথা পদসমষ্টির কালপরিমাণই ছন্দের ছন্দত্ব বজায় রাখে। ইহাতে যেমন সংস্কৃত গণবৃত্তের মত কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণসজ্জা নাই, তেমনই হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর-পরম্পরার ছন্দস্পন্দও নাই। মিল্টনের ছন্দে পদচ্ছেদের স্থানে foot আছে, এবং প্রধানত, অক্ষর-বিশেষের গুরু উচ্চারণে ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হয়। মধুসূদনের এসব বিচার করিবার প্রবৃত্তিও ছিল না, অবকাশও ছিল না; ছিল না বলিয়াই, তিনি যাহা অভাবনীয় তাহাকেও সম্ভব করিতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদন মিল্টনের ছন্দকে, ইংরেজী ছন্দসূত্রের সাহায্যে, কখনও বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই—তাই, ওই ছন্দের ধ্বনি-সঙ্গীত উপভোগ করিবার কালে, তাঁহার কান কিছুক্ষণের জন্যও ইংরেজী বাক্যরীতি বা বাক্যার্থ, এমন কি, শব্দের অন্বয় পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া, কেবল ধ্বনিটিকে মাত্র গ্রাহ্য করিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার অবকাশ পরে ঘটিবে, এখানে প্রাসঙ্গিক-ভাবে কিছু বলিব; ইংরেজী অমিত্রাক্ষর বাংলা ছন্দে ছন্দান্তরিত হইল কোন্ মন্ত্রে, এখানে তাহার একটু আভাস দিব।

৭

বাংলা অমিত্রাক্ষরের ভিত্তি যেমন পয়ার, তেমনই মিল্‌টনের ছন্দের ভিত্তিও—ইংরেজী পয়ার—Heroic Verse বা Iambic Pentameter। মিল্‌টন ইহাকেই অবলম্বন করিয়া, এবং ইহাকে যতদূর সম্ভব শিথিল করিয়া, তাঁহার অমিত্রাক্ষর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের কানে এই ইংরেজী পয়ারের ধ্বনি কি ভাবে ধরা দেওয়া সম্ভব, তাহা দেখাইবার জন্য, আমি, একেবারে মিল্‌টনের ছন্দে না গিয়া, একটি খাঁটি Heroic Verse-এর চরণ লইব, যথা—

The curfew tolls the knell of parting day

এই চরণটির ছন্দ-ব্যাকরণ এইরূপ—

The cúr—few tólls— / the knéll—of pár—ting dáy

মিল্‌টনের ছন্দ যাহার পড়া অভ্যাস হইয়াছে তাহার কানে, এই পংক্তিটির ছন্দধ্বনি অনায়াসে এইরূপ শুনিতে হইবে—

The cúrfew — tólls ; the knéll — of párting dáy

—অর্থাৎ, পদভাগ ঠিক রহিল, কেবল পর্ব্ব বা foot-এর পরিবর্ত্তে ওই পদভাগের মধ্যে বিভিন্ন আয়তনের পদচ্ছেদ মাত্র দেখা দিল। এখানে মাত্র চারিটি পদচ্ছেদ আছে (অন্যত্র বেশি থাকিতে পারে), এবং তিনটি বড় stress আছে। ইংরেজী ছন্দের এইরূপ শ্রুতি-গুণ নির্ণয় করিয়া, এবং কানে কেবল তাহাই রক্ষা করিয়া, বাংলায় তাহার অনুরূপ ধ্বনিসৃষ্টি করা যে দুরূহ নয়, তাহা আমরা পরে দেখিব। ইহাতে যেমন পর্ব্বের গোলযোগ আর থাকে না, তেমনই ছন্দস্পন্দরীতিরও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। বাংলা ছন্দস্পন্দ বা Rhythm-এর কথাও পরে বলিব। তৎপূর্ব্বে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-রচনার প্রয়াসের একটু ইতিহাস দিব।

মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম তাঁহার 'পদ্মাবতী' নাটকের জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে

কতকগুলি পংক্তি রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটকে এই পংক্তিগুলি আছে—

জন্ম মম দেবকুলে ;—অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর মন্থনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর ; পরদুঃখে সদা আমি সুখী।

এখানে কবির একমাত্র লক্ষ্য—ভাষায় কথ্যভঙ্গিকে, এবং ছন্দে বাক্যরীতিকে প্রাধান্য দিয়া তদনুযায়ী যতিস্থাপন। কিন্তু এই প্রথম প্রয়াস প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে; মিলের পরিবর্ত্তে ছন্দস্পন্দ নাই—সেজন্য নূতনতর যতিবিন্যাসের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। রচনা প্রায় গদ্য হইয়া উঠিয়াছে—ওই 'জন্মিয়াছিল' ক্রিয়াপদটি সে পক্ষে কম বিপদজনক হয় নাই।

ইহার পর, 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র এই পংক্তিগুলিতে মধুসূদনের ছন্দ-সাধনা আর এক স্তরে উঠিয়াছে। যথা—

আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগনমণ্ডল
উজলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি' ফেলি' দুই পাশে তিমির তরঙ্গে
উঠিলা অম্বর পথে ; কিংবা ত্বিষাম্পতি
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্ররথে
উদয় অচলে আসি দরশন দিলা।
* * *
এ সুন্দর প্রভাকর-পরিধি মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই ?
কেমনে, কহ, মা শ্বেতকমলবাসিনী !
কেমনে মানব আমি চাব ওর পানে ?
রবিচ্ছবি পানে, দেবি ! কে পারে চাহিতে ?
এ দুর্ব্বল দাসে কর তব বলে বলী।

—এখানে তেমন ছন্দস্পন্দ, অথবা পদমধ্যস্থ বিরাম-যতির কৌশল না থাকিলেও—মিলের অভাব আর একটা বস্তুর দ্বারা পূরণ হইয়াছে; নিপুণ শব্দযোজনার জন্য পংক্তিগুলির সুরঝঙ্কারে একটি সুললিত কাব্যচ্ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে; অর্থাৎ, ইহাই বাংলা কবিতার প্রথম

Lyrical Blank Verse ; এখানে speech-rhythm-এর পন্থা ত্যাগ করিয়াই কবি কতকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন। উপরি-উদ্ধৃত পংক্তি-গুলিতে ইহাই প্রমাণ হইল যে, মিল ত্যাগ করিয়াও বাংলায় ছন্দসঙ্গীত সম্ভব। কিন্তু এ অমিত্রাক্ষর Epic নয়—Lyric-এর উপযোগী; ইহাতে ভাবের সুরই আছে—প্রাণের সর্ব্ববিধ অনুভূতি ও আকৃতির বিচিত্র কণ্ঠস্বর-সঙ্গীত নাই। তথাপি, ইহাই প্রথম খাঁটি মিলহীন বাংলা কাব্যচ্ছন্দ—ইহাতেই কবি-মধুসূদনের জন্ম হইল। আজ এতকাল পরেও, যখন এইরূপ পংক্তিপর্ব্ব পাঠ করি, এবং ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা ছন্দের তুলনা করি, তখন বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া পারি না। এই Lyric Blank Verse-ই পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে অপূর্ব্ব গীতি-ঝঙ্কার লাভ করিয়াছে। তথাপি, ইহার ছন্দগতিতে যে যতিসংযম আছে—ইহার সুপরিমিত পদক্ষেপে যে একটি ধীর মাধুর্য্য আছে, রবীন্দ্রনাথের ছন্দে তাহা নাই; তাহার কারণ, দুই কবির প্রকৃতিই স্বতন্ত্র,—একজনের প্রকৃতি ক্লাসিকাল, অপরের রোমাণ্টিক।

কিন্তু মধুসূদন শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, গীতিস্বরপ্রধান অমিত্রাক্ষর তাঁহার কাম্য নহে। 'তিলোত্তমা' তাঁহার প্রথম কাব্য, এখানে তিনি নিছক কাব্যপ্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া, ছন্দের মত, কল্পনারও একটা মুক্তি-সুখ আস্বাদন করিতেই ব্যাকুল। ছন্দকে এই পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া তিনি সহসা মহাকাব্য রচনার প্রবল প্রেরণা অনুভব করিলেন—দুঃসাহস বাড়িয়া গেল। কিন্তু পুরানো পয়ারের সেই লিরিক প্রবৃত্তিকে এইরূপ প্রশ্রয় দিয়া মহাকাব্যের ছন্দসৃষ্টি করা যাইবে না—তাই তিনি মিল্টনের ছন্দধ্বনি বাংলায় প্রতিধ্বনিত করিবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিলেন। আমি পূর্ব্বে ইংরেজী ছন্দটিকে বাংলায় ধরিবার একটা সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিয়াছি—একটা স্থূল সাদৃশ্য-বোধ যে সম্ভব, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু আসল সমস্যা ওই ঝোঁকগুলি। সেইরূপ ঝোঁকের আভাস ইতিপূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের পয়ারে দেখা দিলেও—রীতিমত rhythmical accent হিসাবে তাহার পরীক্ষা তখনও হয় নাই। বাংলা উচ্চারণ-রীতিতে, শব্দ বা বাক্যাংশের আদ্য-অক্ষরে যেটুকু ঝোঁক পড়ে, তাহাও এই ছন্দের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ছড়ার ছন্দে, আদ্য-অক্ষরে যে ধরনের

স্বরবৃদ্ধি হয়, তাহা দ্বারাও ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্য-বিধান অসম্ভব; তাহাতে ছন্দ একরূপ স্পন্দিত হয় বটে, কিন্তু তাহার সেই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ছন্দের সুরকে কথার অনুকূল করে না। ঈশ্বর গুপ্তের সুরহীন পয়ারও একপ্রকার ছড়ার ছন্দের মত শুনিতে হয়—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে

—ইহার চার-চার পদচ্ছেদ লক্ষণীয়, এবং ইহাও পড়িবার সময়ে প্রতি পর্ব্বের আদ্য-অক্ষরে একটু ঝোঁক দিলে ভাল হয়; ইহাও যেন—

এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন এক কন্যা খান

—এইরূপ ছড়ার খুব নিকট-জ্ঞাতি। এইরূপ ছক-কাটা ছন্দ, ও নিয়মিত ঝোঁক অমিত্রাক্ষরের পক্ষে যে অচল, তাহার প্রমাণ—মিল্‌টনের ছন্দেও ইংরেজী Iambic foot-এর ঘন ঘন নিয়ম-লঙ্ঘন। মধুসূদনের কান বোধ হয় প্রথম হইতেই এই তত্ত্বটিকে আভাসে বুঝিয়া লইয়াছিল। বাংলা ছন্দে একটু ঝোঁকের অবকাশ আছে বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র আদ্য-অক্ষরের ঝোঁক। তথাপি সেই ঝোঁকের বলেই শব্দগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পদচ্ছেদের সৃষ্টি করে। এই পদচ্ছেদ অনুসারেই ঝোঁকগুলির স্থানসন্নিবেশ হইলে, ছন্দ প্রকৃত অমিত্রাক্ষর-গুণোপেত হইতে পারিবে—ভাব-অর্থের বিচিত্র ধ্বনিময় অভিব্যক্তিকে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে, এই ধারণা তাঁহার মনে উদয় হইতে বিলম্ব হয় নাই। তথাপি 'তিলোত্তমা'র প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'মেঘনাদে'র মেঘনির্ঘোষ ধ্বনিয়া উঠা বিস্ময়কর বটে; ইহাতে প্রমাণ হয়, মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব দ্রুত হইয়াছিল; অর্থাৎ যে অসাধারণ শ্রম-শক্তিকে প্রতিভার প্রধান লক্ষণ বলা হইয়া থাকে, এই অল্প সময়টুকুতে মধুসূদনের ভিতরে সেই শক্তির পূর্ণ ক্রিয়া চলিতেছিল। তিনি যে, এই সময়ে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের ভাষা, এবং ভারতচন্দ্রের পয়ার, এই দুইয়ের সহিত কানের ও মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিতেছিলেন, তাহা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। ছন্দের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষারও আবির্ভাব হয়; তাই, খাঁটি বাংলা বাক্‌পদ্ধতি আরও ভাল করিয়া আয়ত্ত করার পর, তিনি সেই পদ্ধতিতেই প্রচুর পরিমাণে সাধু সংস্কৃত শব্দ যোজনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন—মিল্‌টনের কাব্যের ধ্বনিবৈভবও যে কেন খাঁটি Saxon

ইংরেজীর দ্বারা সম্ভব হয় নাই, তাহা তিনি জানিতেন। 'তিলোত্তমা'র যে পংক্তিগুলি আমি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা বাংলা কাব্যভাষার উপর মধুসূদনের অসাধারণ অধিকারের সাক্ষ্য দিতেছে। সে ভাষা যেমন খাঁটি বাংলা ভাষা, তেমনই তাহাতে যে নূতন ছন্দধ্বনি যুক্ত হইয়াছে, তাহার রূপটিই নূতন—মূল প্রকৃতি নূতন নয়। ইহার পর, এই ভাষারই বাক্‌বৈভব—তথা ধ্বনিগৌরব—বৃদ্ধি করিয়া, মধুসূদন যে কাব্যসঙ্গীত সৃষ্টি করিলেন, তাহারও মূলে রহিয়াছে সেই খাঁটি বাংলা বাচনভঙ্গি ও বাক্যরীতি; এতবড় কাব্যচ্ছন্দ—এমন সুমহান সঙ্গীতরব সহজ ও স্বাভাবিক বাক্যচ্ছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইল! এইবার আমি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের ধ্বনিকৌশল, যতদূর সম্ভব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

৮

আমি পূর্ব্বে পয়ার ছন্দের যে ক্রমবিবর্ত্তন দেখাইয়াছি, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত চার অক্ষরের পদচ্ছেদ প্রকট বা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—ইহাই ছন্দের সেই আদি প্রবৃত্তির জের। এইরূপ চারের ছক-কাটা, এবং সুরযুক্ত ছিল বলিয়াই, পয়ারে ভাষার ধ্বনি-রূপটি কখনও আমল পায় নাই। শেষে ভারতচন্দ্রের যুগে আসিয়া বাংলা শব্দগুলির পৃথক ধ্বনিমূর্ত্তি এ ছন্দে কিছু কিছু দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে—পদগুলি চারের ছক-কাটা না হইয়া, শব্দের আয়তন অনুসারে ভিন্নতর ছেদের সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, রচনা গীতিপ্রধান না হইয়া, বর্ণনা, বিবৃতি ও চিত্রপ্রধান হওয়ায়, এবং তজ্জন্য, ভাব-অর্থকে মূর্ত্তিমান করা—শব্দ-ভাণ্ডারকে চিত্রকরের বর্ণভাণ্ডে পরিণত করা অত্যাবশ্যক হওয়ায়—ছন্দকেও 'গীতি' হইতে 'কথা'র অভিমুখী হইতে হইয়াছিল; কবিগণকে—শুধু ছন্দ নয়, শব্দকৌশলের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল। এজন্য এখন হইতে ছন্দের মধ্যে ২, ৩, ৫, ৬-অক্ষরের পদচ্ছেদ দেখা দিয়াছে। ভারতচন্দ্রের কবিতায় ছন্দের উপরে ভাষায় কথ্যভঙ্গির প্রভাব আরও

বাড়িয়াছে, এবং আবশ্যকমত, একই কবিতায়, পাশাপাশি 'গীতি' ও 'কথা'র সুর স্থান পাইয়াছে, যেমন—

বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ।
পাটনি বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে।

ইহার প্রথম দুই পংক্তির গীতিসুর যেমন স্পষ্ট, তেমনই শেষের চরণ দুইটিতে কথার ছন্দই প্রবল। আমার বিশ্বাস, মধুসূদন এ সকলই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, অথবা অজ্ঞানে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল শব্দ-অনুযায়ী পদচ্ছেদের ভঙ্গিই নয়, মধুসূদনের প্রয়োজন আরও বেশি। নূতন বাংলা গদ্য হইতেই মধুসূদন তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির পক্ষে আরও সুস্পষ্ট সঙ্কেত পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সেই গদ্যের ভাষাও তাঁহার পরিকল্পিত মহাকাব্যের বাগ্‌বন্ধের প্রায় সমধর্ম্মী। সেই গদ্যের বাক্যবিন্যাসে যে একটা ছন্দের আভাস ছিল, তাহা বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন। ইহার সেই বাক্যচ্ছন্দ নির্ভর করে প্রধানত দুইটি বস্তুর উপরে—(১) বাক্যের অঙ্গসন্ধির ছেদগুলি; (২) শব্দবিশেষের উপরে বাক্যরীতি-গত (syntactical) ঝোঁক। মধুসূদন ভারতচন্দ্রের কবিতাও যেমন পড়িয়াছিলেন, তেমনই বিদ্যাসাগর প্রভৃতির গদ্য-রচনাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এই সামান্য সঙ্কেতগুলি হইতেই তাঁহাকে তাঁহার ছন্দের প্রাথমিক উপকরণ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। 'তিলোত্তমা' হইতে 'মেঘনাদে' পৌঁছিয়া তিনি এই ভাব-অর্থের বাক্যচ্ছন্দকেই পয়ারের কাব্যচ্ছন্দের সহিত মিলাইয়া, অমিত্রাক্ষরের সেই আদি রূপটির একটি বড় পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন, তখন—

এ সুন্দর প্রভাকর-পরিধি মাঝারে
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই?

—এই গীতিচ্ছন্দের অমিত্রাক্ষর রূপান্তরিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তুতে পরিণত হইয়াছে;—

গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব,

(দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।

[মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই, একই কারণে, রচনায় কমা-সেমিকোলন কিছু বেশি ব্যবহার করিতেন]

উপরের পংক্তিগুলি পড়িবার সময়ে, কেবল ভাব ও অর্থের অনুযায়ী বাক্যচ্ছেদ করিলেই, এ ছন্দ যেন আপনিই চলিতে থাকিবে; অথচ, প্রত্যেক চরণের ছন্দ-যতিও (৮+৬) ক্ষুণ্ণ হইবে না। কিন্তু পড়িবার সময়ে, নূতন যতিগুলি ছাড়া, আর কি ঘটিতেছে—পদভাগের মধ্যে ভিন্নতর বিরাম-স্থানই শুধু নয়, পদচ্ছেদগুলি কি করিয়া হইতেছে, তাহা আমরা সব সময়ে লক্ষ্য করি না; কিন্তু কবির সেদিকে বিশেষ যত্ন ও দৃষ্টি ছিল। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে যে একটি কৌতুককর সংবাদ আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা সত্যই মূল্যবান। তিনি লিখিয়াছেন, মধুসূদন তাঁহার কাব্য পাঠ করিবার সময়ে, ধীরে ধীরে প্রত্যেক শব্দটির পৃথক উচ্চারণ করিতেন—তাই, তাঁহার পাঠ-ভঙ্গি বড়ই অদ্ভুত বোধ হইত। আমার মনে হয়, ইহা মধুসূদনের কাব্যপাঠ নয়—ছন্দপাঠের বর্ণনা; কবি তখন নূতন ছন্দটিকেই তাঁহার শ্রোতৃবর্গের কানে ভাল করিয়া ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন—মিলহীন চরণগুলিকে স্পন্দিত করিবার রীতিটি বুঝাইবার জন্যই ওইরূপ করিয়া পড়িতেন। উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলি পড়িবার সময়ে, আমরাও—ততটা না হইলেও, কতকটা সেইরূপ করিয়াই পড়ি; অথচ পড়িবার সময়ে তাহা লক্ষ্য করি না; যথা—

গাঁথিব—নূতন মালা,—তুলি—সযতনে
তব—কাব্যোদ্যানে—ফুল;—ইচ্ছা—সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে—ভাষা;—কিন্তু—কোথা পাব,
দীন আমি! রত্নরাজী? তুমি—নাহি দিলে,
রত্নাকর?—কৃপা—প্রভু—কর—অকিঞ্চনে।

উপরে যে ছেদগুলি দেখাইয়াছি, তাহা পদচ্ছেদ মাত্র; কারণ, ওই ছেদগুলি, প্রত্যেক শব্দের আদ্য-অক্ষরে যে ছেদ পড়ে, তাহারই অনুযায়ী;

শব্দও সর্ব্বত্র একক নহে, সমাস বা অন্বয়ের ফলে তাহা যুক্ত হইতেও পারে। তথাপি, এইরূপ পদচ্ছেদ হইতেই বাংলায় ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হইয়াছে; সেখানে ঝোঁকগুলি আরও প্রবল বলিয়া ছেদগুলিও অনুরূপ হইয়া থাকে; যথা—

> গাঁথিব—নূতন মালা; / তুলি—সযতনে
> তব কাব্যোদ্যানে—ফুল; ইচ্ছা—সাজাইতে
> বিবিধ ভূষণে—ভাষা; কিন্তু—কোথা পাব,
> (দীন আমি!)—রত্নরাজী,—তুমি নাহি দিলে,
> রত্নাকর?—কৃপা, প্রভু, কর—অকিঞ্চনে।

উপরে উচ্চারণগত ছোট ঝোঁকগুলি বাদ দিয়া—বাক্যরীতিগত (syntactical) বড় ঝোঁকগুলিই দেখাইয়াছি। এইরূপ ঝোঁকের ঠিক আগেই একটি করিয়া ছেদ পড়িতেছে—পদচ্ছেদও সেই ভাবে হইতেছে। এ সম্বন্ধে পরে আরও বলিব।

মধুসূদনের ছন্দের Rhythm বা ছন্দস্পন্দের প্রাথমিক পরিচয় এই পর্য্যন্ত। এক্ষণে আমাকে বাংলা পয়ারের প্রকৃতি, ও তাহাতে এই ঝোঁকের স্থান এবং মূল্য সম্বন্ধে, পুনরায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে।

৯

'মাত্রা' (Quantity), 'অক্ষর' (Syllable) এবং 'ঝোঁক' বা 'স্বরবৃদ্ধি' (Stress, accent)—ইহাদের কোন-একটা ছন্দের unit বা পরিমাপক হিসাবে, ক্ষুদ্রতম অংশের কাজ করিয়া থাকে। আমাদের বাংলা ছন্দে 'অক্ষর' যে সেই কাজ করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজীতে যাহাকে Syllable বলে, আমাদের অক্ষর তাহাই; যদিও গুণ ও ক্রিয়াহিসাবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে এই অক্ষরের নাম—'বর্ণ'। অক্ষর যে-ছন্দের unit বা মাত্রা (এখানে

'মাত্রা' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি), তাহাতে অক্ষরসংখ্যা কম-বেশি হইবার জো নাই। সংস্কৃত ছন্দও মূলে অক্ষরমাত্রিক; Rhythm বা ছন্দতরঙ্গের জন্য অক্ষরের গুরু-লঘু গুণভেদ, এবং ছন্দে তাহার স্থান যেমনই হউক,—ওই অক্ষরের সংখ্যা সর্ব্বদা ঠিক থাকা চাই। কিন্তু পরে, এই অক্ষর-মাত্রা—যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব-বর্ণ এবং দীর্ঘস্বর-যুক্ত বর্ণের প্রভাব স্বীকার করিয়া—আর এক প্রকার ছন্দের উদ্ভব করিয়াছে; সংস্কৃতে ইহাকে 'জাতিছন্দ' বলে। প্রথমে প্রাকৃত বা ভঙ্গ-সংস্কৃত-ভাষার কাব্যেই সম্ভবত এইরূপ মাত্রাবৃদ্ধিও ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল, এবং শেষে সংস্কৃতেও সেই ছন্দ চলিত হইয়াছিল—সে ইতিহাস আমার জানা নাই; কেবল ইহাই দেখিতেছি যে, বৈদিক ভাষার ছন্দ যেমনই হউক, খাঁটি সংস্কৃত ছন্দ বর্ণবৃত্ত ছিল; এইরূপ Quantity তাহার পরিমাপক ছিল না। বাংলার প্রাকৃত গোত্র-বংশে আদিতে তাহার ছন্দও ওইরূপ মাত্রাবৃত্ত ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি—পরে মাত্রার প্রভাবমুক্ত হইয়া আমাদের ছন্দ খাঁটি বর্ণবৃত্ত বা অক্ষরসংখ্যামূলক হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সংস্কৃত বা অন্য ছন্দের মত তাহাতে ছন্দস্পন্দের কোন উপকরণ রহিল না—অক্ষরগুলি যেমন সমমাত্রার, তেমনই তাহারা মাত্রাগুণবর্জ্জিত। এরূপ ছন্দ, গানে ভিন্ন কবিতায় চলে না। প্রত্যেক অক্ষরকে স্বরান্ত করিয়া একটা কাল-পরিমিত, যতিযুক্ত চরণ, এবং তাহার বিশিষ্ট ছাঁদটির পুনরাবর্ত্তন—ইহাই এই ছন্দের প্রকৃতি। মাত্রা যেমন ইহার উপাদান নয়, তেমনই Stress বা স্বরবৃদ্ধি এ ছন্দের কোনরূপ সহায় নয়। ইংরেজী ছন্দে অক্ষর বা Syllable এর একটা হিসাব থাকিলেও, তাহা Stress-প্রধান; সংস্কৃত ছন্দ বর্ণবৃত্ত হইলেও, তাহাতে অক্ষরের মাত্রা-গুণ ছন্দের একটা বড় সহায় হইয়া আছে। আমাদের প্রাচীন বাংলা ছন্দে ওই বর্ণ ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু আমি পূর্ব্বে পদভূমক ছন্দকে—অর্থাৎ, এই-জাতীয় বনিয়াদী বাংলা ছন্দকে 'মাত্রিক' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, আধুনিক পয়ার-জাতীয় ছন্দ যেমন দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বর্ণেরও একরূপ মাত্রা-গুণ স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা ছন্দেরই প্রয়োজনে—ছন্দস্পন্দের নয়। আমরা এখন হসন্তবর্ণকে স্বরান্ত করিয়া

পড়ি না, অথচ তাহাকেও একটা পূরা unit হিসাবে গণ্য করি ; এবং তাহা সম্ভব হইয়াছে—পূর্ব্ব-বর্ণের ওজন বৃদ্ধি করিয়া। যেমন—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি

ইহার 'সম্‌মুখ' যেমন চার অক্ষর নয়—তিন অক্ষর, তেমনই 'বীর'ও এক অক্ষর না হইয়া দুই অক্ষর। যুক্ত অক্ষরটির কথা ছাড়িয়া দিলাম ; হসন্ত বর্ণটিকেও একটি পূরা unit ধরিতে হয়, এবং সেজন্য পূর্ব্ব-বর্ণের ওজন বা মাত্রা একটু বাড়াইয়া লওয়া হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, আধুনিক পয়ার-জাতীয় ছন্দে, বর্ণসংখ্যার উপরে আর একটা বস্তুর যোগ হইয়াছে ; ইহাকেই আমি একরূপ 'Quantity' বা মাত্রা-স্থানীয় করিয়া এ ছন্দকে 'মাত্রিক' বলিয়াছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, রহস্য এমনই যে, উহাও ঠিক মাত্রাবৃদ্ধি নয় ; অর্থাৎ, ঐ পূর্ব্ব-বর্ণের ওজন বৃদ্ধির দ্বারাই ছন্দরক্ষা হইতেছে না—হসন্তবর্ণটিকেও ঠিক ওই স্থানে চাই ; এই মাত্রাবৃদ্ধির দ্বারা তাহারই মাত্রার অপূর্ণতাটুকু কোনরূপে পূরণ করা হইতেছে ; প্রমাণ—

কাশীরাম্ দাস্ কহে—

এই পদটির হসন্তবর্ণ দুইটি উঠাইয়া দিয়া, কেবল তাহার পূর্ব্ব-বর্ণ 'রা' ও 'দা'-এর মাত্রা বৃদ্ধি করিলে,—একটু টানিয়া পড়িলে,—ছন্দই নষ্ট হইয়া যাইবে ; ওইরূপ দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলা ছন্দের স্বভাব-বিরুদ্ধ ; ওই 'দা' ও 'রা'র পরে হসন্তবর্ণের স্থানটি লোপ পাইলে চলিবে না। বাংলার এই ছন্দকে 'মাত্রিক' বলিবার আরও কারণ এই যে, পদভূমক ছন্দে মাত্রার বিশেষ লক্ষণ না থাকিলেও সাধুভাষায় ওই বনিয়াদী ছন্দেই তাহার প্রাচীন মাত্রাধর্ম্ম যে এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ, ওই ভাষার ধ্বনি হইতেই আধুনিক পর্ব্বভূমক ছন্দের জন্ম হইয়াছে ; এবং তাহাতে মাত্রাবৃত্তের স্পষ্ট আমেজ রহিয়াছে।

এইবার এই খাঁটি বর্ণবৃত্তের বর্ণবিন্যাসে rhythm কি করিয়া সম্ভব হইল তাহাই বলিব। আমাদের উচ্চারণে, শব্দ বা বাক্যাংশের (Phrase) আদ্য-অক্ষরে একটু যে ঝোঁক পড়ে, সে কথা বলিয়াছি। আবার হসন্তবর্ণের জন্য পূর্ব্ব-অক্ষরে যে একটু মাত্রাবৃদ্ধি হয়, তাহাও দেখিয়াছি। এই দুইটির সাহায্যে, বাংলা ছন্দে ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করার

উপায় পূর্ব্ব হইতেই ছিল। তথাপি, এ পর্য্যন্ত বাংলা কবিতার ছন্দে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরভঙ্গি প্রশ্রয় পায় নাই—যেন প্রাণের ভাষা, কাব্যচ্ছন্দে ছন্দিত হইতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাঙালীর প্রাণ যে মুক্তিকামনার আবেগে স্পন্দিত হইয়াছিল—ভাবচিন্তার ক্ষেত্রে, নূতন করিয়া যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে সে অধীর হইয়াছিল, সেই Romantic ভাবোৎসারের ফলে, আর সকল আন্দোলনের মত, কাব্যের আদর্শ-কল্পনায় যে বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিল—মধুসূদন তাহারই প্রথম ও প্রধান নেতা; তিনিই ভাষা অপেক্ষা, যে বস্তুর সহিত কবিতার ভাবগত যোগ অধিক, সেই ছন্দকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বাক্যরীতি ও উচ্চারণরীতির সহিত যুক্ত করিলেন; তাহাতে সেই পুরাতন অক্ষর, বা স্বরান্ত বর্ণ, তাহার ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই, নূতন গুণ-সমৃদ্ধি লাভ করিল—বাংলা বর্ণবৃত্ত সত্যকার ছন্দ-গৌরবের অধিকারী হইল। অক্ষরগুলি পূর্ব্বের মতই পায়ে পায়ে ঠিক চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের মাথা শস্যশীর্ষের মত দুলিতে আরম্ভ করিল, আমাদের বর্ণবৃত্তেও অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি ছন্দকে তরঙ্গিত করিতে লাগিল। এখনও বর্ণই ছন্দের পরিমাপক unit হইয়া আছে, কিন্তু অতঃপর Syllable-এর সহিত স্বরবৃদ্ধিও যুক্ত হইল; দীর্ঘস্বর-জনিত মাত্রা(Quantity)র কথা পরে বলিব।

কিন্তু ইংরেজী ছন্দের মত আমাদের ছন্দে এই স্বরবৃদ্ধি (accent) প্রাধান্য লাভ করে নাই—তাহার দ্বারা বর্ণের প্রাধান্য ক্ষুন্ন হয় নাই। বাংলায় ওই স্বরবৃদ্ধির এমন শক্তি নাই, যাহাতে অক্ষরপরিমাণকে গৌণ করিয়া, ওই স্বর-বৃদ্ধির নিয়মিত বিন্যাসই ছন্দকে ধারণ করিতে পারে। বর্ণের এই প্রাধান্য হেতু আমাদের ছন্দে—ধীর, দ্রুত, মন্থর—কত প্রকার লয় যে সম্ভব হইয়াছে, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ভাল করিয়া পড়িতে জানিলে, তাহা লক্ষ্য করিয়া, মুগ্ধ হইতে হয়। নিয়মিত গুরু-লঘু বর্ণপরম্পরার উপরে নির্ভর করে না বলিয়া, এ ছন্দে কণ্ঠস্বরাশ্রিত ভাবের এমন লীলা সম্ভব হইয়াছে। সংস্কৃত গণ-মুক্ত অক্ষরবৃত্তেও এই কারণে কাব্যের ভাবরূপ এমন সজীবতা লাভ করে। বর্ণ বা অক্ষর, এবং এই স্বরবৃদ্ধি—এই দুইয়েরই সহযোগে মধুসূদনের ছন্দ এইরূপ

সজীব ও শক্তিশালী হইয়াছে। অতএব মিল্‌টন যে উপাদান ও উপকরণ হইতে এমন অপূর্ব্ব ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—'Syllable', 'Accent' এবং 'Quantity', এ সকলকেই ছন্দ-রাসায়নিক যাদুকরের মত তিনি যেরূপ মিলাইয়াছিলেন,—সে বিষয়ে, মধুসূদনের কেবল ওই Syllable-এর সুবিধাই ছিল, অপর সুবিধাগুলি নিজেই করিয়া লইতে হইয়াছিল; মিল্‌টনের কেবল Stress-এর সুবিধাই ছিল। অপর-গুলিও তিনি নিজের শক্তিবলে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। মধুসূদনের ওই Stress, Accent বা Quantity-র সুযোগ ছিল না—বাংলার পক্ষে সে সুযোগ করিয়া লওয়া একরূপ দৈবীশক্তি-সাপেক্ষই বটে। কোথায় সংস্কৃত বর্ণবৃত্তের সেই স্বরতরঙ্গলীলা—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

অথবা—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি / বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ;

[সংস্কৃত ছন্দেও স্বরবৃদ্ধি একজাতীয় নয় বলিয়া দুই রকমের চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি।]

—আর কোথায় সেই বর্ণমাত্রসম্বল নিস্তরঙ্গ পুরানো পয়ার—

রতনরঞ্জিত তার পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংস গতি যেন নূপুরের রব॥

মধুসূদনের কানে অবশ্য সংস্কৃত অনুষ্টুভের বাজনা বাজে নাই—তাঁহার কানে বাজিতেছিল—

Hail—holy light / offspring—of Heaven—first born!

কিংবা-

Then feed on thoughts that voluntary move
Harmonious numbers, as the wakeful bird

Sings darkling, and in shadiest covert hid
Tunes her nocturnal song.

অথবা—

Bright effluence of bright essence in create

[চিহ্নগুলি ছন্দ-ব্যাকরণের চিহ্ন নয়। প্রত্যেক চরণে যে প্রবল স্বরবৃদ্ধি (stress) আছে তাহার স্থানে (") চিহ্ন, এবং যেখানে যেখানে ওই স্বরবৃদ্ধিতে দীর্ঘ স্বরমাত্রার বেগ আছে, সেখানে অক্ষরের নিম্নে (—) এই চিহ্ন দিয়াছি।]

সংস্কৃতের ছন্দস্পন্দ বাংলায় সম্ভব নয়, কিন্তু কতকটা এই ধরনের তরঙ্গ বাংলায় যে সম্ভব তাহার কারণ পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি; এবং ইংরেজী ছন্দের সহিত এই ধ্বনিসাদৃশ্যের সম্ভাব্যতাও পূর্ব্বে উদাহরণসহ উল্লেখ করিয়াছি। উপরে উদ্ধৃত দুই ভাষার কবিতার একটি বর্ণবৃত্ত, অপরটি একরূপ Accent-বৃত্ত—ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির জন্য ছন্দই ভিন্নজাতীয়। আসলে, ওই Accent, Syllable এবং Quantity নামগুলির একটা সাধারণ অর্থ থাকিলেও, ভাষাবিশেষে উহাদের প্রত্যেকটির গুণ স্বতন্ত্র। সংস্কৃত syllable এবং ইংরেজী Syllable যেমন ব্যাকরণ অনুসারে এক হইলেও, কার্য্যত বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধ্বনিরূপ ধারণ করে, তেমনই ইংরেজীর stress ও সংস্কৃতের স্বরবৃদ্ধি এক নয়—বাংলারও নহে। Quantity নামে ছন্দের যে সাধারণ উপাদান বুঝায়—দুই বিভিন্ন ভাষায় সেই Quantity-মূলক ছন্দ একইরূপ ধ্বনির সৃষ্টি করে না। উপরি-উদ্ধৃত সংস্কৃত ছন্দে যে Syllable এবং যে Stress বা স্বরবৃদ্ধি আছে, ইংরেজীতেও সেই দুই নামের দুই বস্তুই আছে, এমন কি দীর্ঘ-স্বরও যেমন আছে, তেমনই, যে স্বরবৃদ্ধি বা Stress আছে, তাহাও সংস্কৃতের যুক্তাক্ষর-পূর্ব্ব বর্ণের প্রায় সমজাতীয়। তথাপি উভয়ের ছন্দধ্বনিতে আদৌ সাদৃশ্য নাই। বাংলা 'অক্ষর' ও সংস্কৃত 'অক্ষর' এক হইলেও, বাংলা পয়ারে যুক্ত বা অযুক্ত হসন্তের ব্যবহার একটু বিচিত্র বলিয়া, অক্ষরের ধ্বনিধর্ম্ম সম্পূর্ণ এক নহে। আবার ইংরেজীর সহিত বাংলা অক্ষরের তুলনা করিলে দেখা যাইবে উহাদের ওজনে কত পার্থক্য রহিয়াছে। ইংরেজী Syllable-এর শোষণশক্তি বাংলা অক্ষরের নাই; বাংলা 'সম্মুখ'-এর 'সম্' যদি এক অক্ষরও হয়, তথাপি তাহা ইংরেজী এক অক্ষর Heaven (Heav'n)-এর সমান নয়; বাংলা 'কবি'র দুই অক্ষর ইংরেজী 'holy'র

দুই অক্ষরের সমান হইলেও, 'offspring'-এর সমান নয়। তথাপি মধুসূদন যে বাংলা অমিত্রাক্ষর রচনায় মুখ্যত ইংরেজীর সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহার কারণ, মিল্‌টনের ছন্দ ইংরেজী ছন্দ হইলেও, তাহার মধ্যেই মহাকবি যে সঙ্গীত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার সেই উদারতর নীতি যেন ভাষার ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়াও অতিক্রম করিয়াছে; তাই, অপর একটি ভাষাতেও সেই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছিল; সে যেন ছন্দেরই প্রতিচ্ছন্দ নয়—সেই সঙ্গীতেরই একটা প্রতিরূপ। মিল্‌টনের ছন্দ মধুসূদনের কানে কিরূপ বাজিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহার আভাস দিয়াছি; তাহাতে দেখা যাইবে যে, ইংরেজী Iambic pentameter-এর বাঁধা foot, এবং নিয়মিত ছোট বড় ঝোঁক-(accent)-এর দিকে দৃষ্টি রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই; তাহা না হইলে, মধুসূদন ইংরেজী ছন্দের বন্ধন হইতে ওই সঙ্গীত-ধ্বনিকে পৃথক করিয়া, বাংলায় প্রতিধ্বনিত করিতে পারিতেন না। ইংরেজী অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

"The lack of fixed syllablic quantities is just what I emphasise. This lack makes definite beat impossible; or at least it makes it absurd to scan English verse by feet."

এবং—

"If the student has a good ear he reads the verses as it was meant to be read, as a succession of musical bars (with pitch of course), in which the accent marks the rhythm, and pauses and rests often takes the place of missing syllables."

মধুসূদনের বাংলা ছন্দের পক্ষে, ওই 'definite beat impossible' বড়ই কাজে লাগিয়াছিল; 'succession of musical bars with pitch of course' তাঁহার কানকে তৈয়ারি করিয়াছিল; এবং বাংলা পয়ারের (৮+৬) পদভাগের succession, তাহারই কতকটা উপযোগী হইয়াছিল। কেবল 'missing syllables'-এর স্থান পূরণ আর কিছু দ্বারা সম্ভব ছিল না—বাংলা বর্ণবৃত্ত তাহা সহ্য করিতে পারে না; তাই মধুসূদনের ছন্দের লয় আরও সংযত ও ধীর-মন্থর—সে তততা মুক্তপক্ষ নয়। এইবার আমি মধুসূদনের পংক্তিগুলির ধ্বনিনির্ম্মাণ-কৌশলের বিশেষ পরিচয় দিব। ক্রমশ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

নারায়ণী সেনা

তোমরা এসেছ ভীরু-পায়ে দূর প্রান্তর হয়ে পার,
সদর-দুয়ার বন্ধ হয়েছে, খুলেছে খিড়কি-দ্বার।
তোমরা এসেছ গোধূলি-বেলায়,
রবি ডোবে-ডোবে ; রঙের খেলায়
কালো ছায়া ফেলে চুপিসারে ওই নামিছে অন্ধকার।
তোমরা এসেছ ভীরু-পায়ে দূর প্রান্তর হয়ে পার।

আপনারে ল'য়ে ব্যস্ত ছিলাম হ'ল যে অনেক কাল,
তোমাদের কথা ভুলে গিয়েছিনু? অতীতের জঞ্জাল
ভেদ করি মোর মন-আঙিনায়
জাগ নি তোমরা কুসুম-শোভায়?
চকিতে কখনো অলস দুপুরে ছেঁড়ে নি অন্তরাল?
আপনারে ল'য়ে ব্যস্ত ছিলাম হ'ল যে অনেক কাল।

বনপথে যেতে কুসুম-গন্ধ-পিয়াসী আমার মন,
আপন তৃপ্তি চেয়ে খোঁজে নাই বহুবিধ আয়োজন;
শুধু ছিলে সখি, তোমরা কজন,
তবু বনপথ ছিল নির্জ্জন,
বাতাসে ভাসিত ফুল-পরিমল অলির গুঞ্জরণ।
বনপথে যেতে কুসুম-গন্ধ-পিয়াসী আমার মন।

গণদেবতার রাজদরবারে পড়ে নি আমার ডাক,
ভক্ত কোথাও থাকেও যদি-বা, ছিল তারা নির্ব্বাক।
তখনো মানিয়া জনতার দাবি,
মনের আগারে লাগাই নি চাবি,
যশোগঙ্গারে ভগীরথ মম আনে নি বাজায়ে শাঁখ।
গণদেবতার রাজদরবারে পড়ে নি আমার ডাক।

কাজের তাড়না বড় হয়ে গেল, খেলা ধীরে ভুলিলাম,
এক এক ক'রে তোমরাও সখি, শুধু হয়ে এলে নাম।
অরণ্যপথে চরণের রেখা
লেপে মুছে গেল, ফিরে এনু একা—
এক দিকে যাহা করিলাম লাভ, আর দিকে দিনু দাম।
কাজের তাড়না বড় হয়ে গেল, খেলা ধীরে ভুলিলাম।

অন্তরে হয়ে নিঃস্ব, বাহিরে বসিলাম সমারোহে,
পিছু ফিরিবার নাই অবসর অবিরাম-গতিমোহে,
হায় রে, আমার সফল সাধনা,
গোপন বেদনা কেহ বুঝিল না;
নিজেও বুঝি নি, বিজয়মাল্য এসেছি কণ্ঠে ব'হে।
অন্তরে হয়ে নিঃস্ব, বাহিরে বসিলাম সমারোহে।

সমুখের ভিড় কমেছে, এবার পিছন ফিরিয়া চাই,
প্রখর দিনের আলোকের জ্বালা বেলাশেষে আর নাই
আবছা আলোয় শোভে ম্লান ধরা,
কঠিন নহে তো তোমাদের ধরা,
একে একে সখি, ফিরিয়া ফিরিয়া তোমাদের গান গাই
সমুখের ভিড় কমেছে, এবার পিছন ফিরিয়া চাই।

হয়তো সকলে পড়িবে না ধরা পুরাতন গৌরবে,
হয়তো কাহারো উজ্জ্বল ছবি খানিকটা ম্লান হবে;
স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন ক'রে
ভুল হবে কেবা আগে কেবা পরে;
ক্ষমিও তোমরা—সবাই সমান রাত্রির উৎসবে।
হয়তো সকলে পড়িবে না ধরা পুরাতন গৌরবে।

*   *

আমি একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম—
বিচিত্র দেশ, এক দিকে তার শ্যামলশোভন মাটি,

ফলফুলশোভা দৃশ্য সে অভিরাম ;
কুলকুল রবে বহে স্রোতোজল, তীরে তার পরিপাটী
নিবিড়-বসতি সম্পদ-ভরা গ্রাম।
বহুদিন আগে আমি একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম।

স্বপ্ন দেখেছিলাম—
আর দিকে ঝলে ধুধু মরুভূমি, তপ্ত বালুকারাশি
সারমেয়-রূপী প্রকৃতির যেন লকলকে জিবখানি—
কাছে দূরে যত সলিলবিন্দু সকলি ফেলিবে গ্রাসি ;
চীৎকার-করা মরুভূমি, নয় জনপদ-কানাকানি ;
ভুলিয়া গিয়াছি কি তার আছিল নাম !

স্বপ্ন দেখেছিলাম—
ভ্রমিতেছিলাম সেই বিচিত্র দেশে,
দেখিতেছিলাম এ-পাশে ও-পাশে দুই রূপ ধরণীর—
কভু উদ্যান, কভু বা শ্মশান-বেশে।
মরু-বালুবুকে জলধারা দেখে চকিতে হলাম থির,
বিস্ময় মানিলাম।

স্বপ্ন দেখেছিলাম—
মনে হয়েছিল মরীচিকা বুঝি হবে,
আমি বুঝি মৃগ, হায় মৃগতৃষ্ণিকা !
কাছে গেলে ফাঁকি সুশীতল বাপী মিলাবে শূন্য নভে,
হবে লেলিহান শ্মশান-বহ্নিশিখা।
জ্ব'লে-পুড়ে-মরা অতিলোভী এই পথিকের পরিণাম !

স্বপ্ন দেখেছিলাম—
ত্যজি জনপদ ক্লান্ত পথিক মরু-জলধারা পানে
ছুটে চ'লে গেল, কি তার আকর্ষণ !
যত কাছে যায়, মায়া না মিলায়, অতি বিস্ময় মানে—

ঝাঁপ দেয় জলে, দেহ সুশীতল, জুড়াল ক্লান্ত মন ;
সাহস-ভুলের মিলে গেল পুরা দাম।

স্বপ্ন দেখেছিলাম—
তারপর কি যে হ'ল, কোথা জল, কোথায় পান্থ সেই,
পথের তৃষায় শুকাল মরুর ধারা ;
বহু ক্লেশ স'য়ে চিহ্ন ধরিয়া পথে ফিরে এল যেই
নূতন লক্ষ্যে পথিক আত্মহারা।
বিপথে বিপথে পথ পেয়ে তার পূর্ণ মনস্কাম।

বহুদিন আগে স্বপ্ন দেখেছিলাম—
মরুজলধার কোথায়, কে তুমি এসেছ ফল্গু আজি,
আতপতপ্ত পথের ক্লান্তি তোমার বক্ষ মাঝে—
রৌদ্রদাহন মূর্ত্তি তোমার শিশিরে কি এলে মাজি,
মরীচিকা এলে সাত-সায়রের সাজে ?
রাতের শান্তি-রূপ ধ'রে এলে দিবসের সংগ্রাম ?

স্বপ্ন দেখেছিলাম—
সেদিন তোমায় দেখি নি সত্য, তুমি ছিলে অনুভূতি,
আজ সেই তুমি এসেছ মোহন বেশে—
বসিবে নিশীথে নায়িকা-আসনে হে মোর দিনের দূতী
দয়া করি যাহা দিয়াছ, আজ তা দিবে তুমি ভালবেসে
ফণী-বেষ্টন হোক সখি আজ কুঞ্চিত কেশদাম।

*　　　*　　　*

ত্যাগের গর্ব্বে ভরিয়া উঠেছে মন,
　　অন্তরবাসী করে তবু হাহাকার।
তোমারে কি আমি দিয়েছি বিসর্জ্জন,
　　কান পেতে গান শুনিতেছি তবে কার ?
শেষ হ'ল খেলা না হইতে আয়োজন,
　　প্রভাত-বেলায় নামিল অন্ধকার।

পূর্ব্ব-অচলে রবির উদয় পানে
গোধূলি-আকাশ চিরদিন চেয়ে থাকে,
বিমূঢ় দাস্তে বিয়াত্রিচেরই টানে
ফিরে ফিরে চায় শূন্য পথের বাঁকে—
তুমি আমি ছাড়া আর কে খবর জানে,
পূর্ণিমা ছুঁয়ে গেল অমাবস্যাকে।

আমি জানি শেষ হয় নাই বোঝাপড়া,
তবুও তোমায় ডাকিব না আর সখি—
যদি ভুল হয়, যদি প'ড়ে যাই ধরা,
যদি হাতে পেয়ে মনে হয় গেছি ঠকি
সেদিন গিয়েছে, দুজনেরই ছিল ত্বরা,
খসেছে কখন হস্তের আমলকী।

তোমারে বিকানু কি মূল্য-বিনিময়ে
আজ মনে হ'লে অনুশোচনায় মরি।
তুমি ভেবেছিলে, এ সাবধানীরে ল'য়ে
সারাটা জীবন কাটাবে কেমন করি।
বুঝি নি সেদিন—ছিলাম অন্ধ হয়ে,
কেটে গেল কত নিষ্ফলা বিভাবরী।

তুমি ছিলে সতী, আমিও ছিলাম সৎ,
পীরিতির নদী বহে নি উজান মেলে,
বন্যায় অতীত, থাকেও ভবিষ্যৎ—
বর্ত্তমানের উপরি পাওনা পেলে।
দুকূলপ্লাবিনী বর্ষার নদীবৎ
পারি নি ছুটিতে তটবন্ধন ঠেলে।

সৌর-আকাশে ঘুরিয়া কক্ষহীন
হঠাৎ মিলিতে পারে দুই ধূমকেতু,

গ্রহদল রয় ম্যাপে-আঁকা-পথলীন,
পরস্পর যে দূরে রয় সেই হেতু।
এ-পারে ও-পারে ব্যবধান চিরদিন,
দুই পারে তবু বন্ধন করে সেতু।

মোদের মাঝারে ছিল না জলের ধারা,
দুই মরুভূমি, মাঝখানে মরীচিকা।
ধুধু প্রান্তর মাঝে রয় সীমাহারা,
দুপ্রান্তে তার যেন আলেয়ার শিখা।
দুই মেঘ ভাসে আকাশেতে ছাড়া ছাড়া,
মাঝখানে তার নাই বিদ্যুৎলিখা।

আস নি যখন, আর আসিও না কাছে,
তব বাঁশীখানি বাজিতে থাকুক দূরে,
স্বপ্ন পুড়িতে দিও না দেহের আঁচে,
বিফল চুমায় চাপিয়া মেরো না সুরে।
বাদলা-পোকারা থামুক সার্শি-কাচে,
প্রদীপ-শিখায় মরিতে দিও না পুড়ে।

* * *

রৌদ্রদহনে দগ্ধ ধরণী, আরাম পঙ্ক-সলিলে—
বল কর্দ্দম, তিমিরবরণী, তুমি কি পথিকে ছলিলে?
সে তো করে নাই পঙ্কের ভয়, জ্বালাই চেয়েছে ভুলিতে,
সে জ্বালা করেছ তুমি নিরাময় তব জলকণাগুলিতে।
অশুচি হয়তো ছিল, তৃষিতের কি হবে হিসাবে ভালমন্দের
সে শুধু জানিত জ্বালা গাত্রের যাবে তোমারেই দলিলে।

নিদাঘ-দিবস কেটে গেছে, বেলা সন্ধ্যায় আসে নামিয়া;
তৃপ্ত, করিয়া কর্দ্দম-খেলা ঘরে ফিরে গেছে ঘামিয়া।
তাপিত-স্পর্শ তুমি কর্দ্দম, তারো পরে কর কামনা,
বিলাসী জনের ফুরায় যে দম, তুমি কোন দিন থাম না।

ভাগ্য তোমার তুমি থাক কাদা, যেতে চায় যেবা তারে দাও বাধা,
দেখেছি তোমার সকরুণ সাধা, থাকিতে পারি নি থামিয়া।

ঘরেতে ফিরিল বিজয়ী পরিয়া পঙ্কতিলক ললাটে,
তুমি বহিতেছ স্মৃতিটি ধরিয়া করকলঙ্ক-মলাটে।
কাদা ও তৃষিতে জানি তারপর দেখাশুনা নাই কভুও,
তিমির-নিশার স্মৃতিসহচর—দিনে মনে ভাসে তবুও ?
হায় সখি, হায়, ক্রূর সংসার, বহে মাঝখানে স্রোত ক্ষুরধার,
তুমি চিরদিন থাক ঐ-পার, আমি বিপরীত তলাটে।

পাপপুণ্যের হিসাবনিকাশ ফুরাল দিনের আলোকে,
কণ্টকজ্বালা আর ফুলবাস ঢাকে যে মুদিত পালকে।
মনে পড়িতেছে কাঁটার মুখেতে একটি শোণিত-বিন্দু,
কবে হয়েছিল ক্ষুদ্র বুকেতে উদ্বেল মহাসিন্ধু।
আজ গোষ্পদে সাগরের ছায়া পাই সে দেখিতে বল এ কি মায়া,
বুঝিতে পারি না আত্মা বা কায়া নিন্দিত আর ভাল কে !

দারুণ নিদাঘে তোমরা একদা জল যোগায়েছ পথিকে,
সেই কথা আজ মনে জাগে সদা জানি না অসতী সতী কে !
আমি কি পেয়েছি আমি শুধু জানি, পারি না বিচার করিতে,
দিয়েছিনু দাম, সাথে মনখানি বাঁধা ছিল কিনা কড়িতে।
দেওয়া-নেওয়া দাবি তোমরা কর নি, দিয়েছ যোগায়ে পারের তরণী,
আজ মনে হয় মধুর ধরণী শুধু তোমাদের গতিকে।

আজ অবেলায় এস এস সখি, চাঁদ উঁকি দেয় আকাশে,
পূর্ণিমা-চাঁদ—দেখিবে চমকি অমাবস্যায় ঢাকা সে।
চিরচলমান এ জগৎ মাঝে কিছুই নহেক নিত্য,
এ কি কম লাভ, ফাল্গুন-সাঁঝে খুশি হয়েছিল চিত্ত।

চকিতে ফুটিয়া রজনীগন্ধা সুরাভ করেছে একটি সন্ধ্যা,
বিফল বিচার—সুফলা বন্ধ্যা, রক্তরঙিন ফ্যাকাশে।

মনে পড়িতেছে ক্ষণবিশ্রাম আলোকোজ্জ্বল কক্ষ,
শুধু মনে নাই কাহার কি নাম, কার কি যে ছিল লক্ষ্য!
ঢেউয়ের চূড়ায় বুদ্বুদশোভা ক্ষণে জাগে ভাঙে চকিতে—
মহাসমুদ্রে ভাসা আর ডোবা, জিতে নিয়ে পুন ঠকিতে
আসে-যায় নাই কিছুই সেদিন; আজ যে হয়েছি হিসাব-প্রবীণ,
দিবসের আশা সন্ধ্যায় ক্ষীণ, দুরু দুরু করে বক্ষ।

মাটির গর্ভে যে জীবন মোর, যে জীবন মোর আঁধারে,
বাঁধিয়াছ দিয়ে ফুলমালা-ডোর, দাঁড়ায়েছ তার বাঁ-ধারে।
পঙ্কের বুকে পঙ্কজ হয়ে ফুটেছ অমল সলিলে,
সে কাহিনী সখি, কে বেড়াবে ক'য়ে, কি লিখিবে পাকা দলিলে?
খিড়কির পথে কাছে এসে শোন, স্মৃতি-মন্থনে বাধা নাই কোনো,
তোমাদের সাথে হবে না কখনো নূতন জীবন ফাঁদা রে।

* * *

লিখতে হবে তোমার কথা শেষ পাতাতে;
বুকে যখন জাগল ব্যথা নিশীথ-রাতে—
দুয়ের মাঝে নীরবতা হাতটি হাতে।

মুখে আজো হয় নি বলা, "ভালবাসি";
দুজনে পথ হয় নি চলা পাশাপাশি।
গোপন—প্রেমের ছলাকলা কান্নাহাসি।

অলস দ্বিধা ভাঙব কি না বুঝতে নারি,
ছুঁলেই হয়তো হবে বীণা ছিন্নতারই;
সুর যে হবে মিলন-বিনা মিথ্যাচারই।

মনে তোমার ভাঙন ধরে একলা শুয়ে ?
কান্না আসে বালিশ 'পরে মুখটি থুয়ে—
তারার আশিস্ তখন ঝরে আঁধার ছুঁয়ে ?

যাও নি দূরে, তুমি ছিলে কাছাকাছি,
আস নি হায় মোর নিখিলে প্রসাদ যাচি।
চলি নি পথ দুজন মিলে মরি বাঁচি।

মরা গাঙে সহসা বান আসবে কবে,
ফল্গুধারায় লাগবে যে টান উজান ববে ?
মিলবে দুটি ভীরু পরান মহোৎসবে !

পথ চলা শেষ হয় নি আমার, দাও নি ধরা,
সন্ধ্যা নামে, ক্রমেই আঁধার বসুন্ধরা ;
ব'সে আছি খুলিয়া দ্বার, কর ত্বরা।

এখনো ঠাঁই আছে বুকে, দীর্ঘ রাতি—
সব হাহাকার যাক না চুকে ; জীবন-সাথী
হই দুজনে সুখে-দুখে—নিবুক বাতি।

* * *

রাখো রাখো তুমি নারায়ণ,
ছাড়হ কপট নিদ্রা, মেলহ নয়ন।
নিয়ে নারায়ণী সেনা জানো মোর চলিবে না,
সূত্র বিনা মালিকা বয়ন
নাহি হয় তুমি জানো, সেনাদল বৃথা আনো,
রাখো রাখো তুমি নারায়ণ।

বেঁধেছি ক্ষণিক খেলাঘর,
তুমি জানো ভিত্তি তার বালুকা-উপর।

বার বার ঘর বাঁধি, আসে ঝড় আসে আঁধি,
পুনরায় ধুধু করে চর।
মাটির পরশ খুঁজি, যত বাধা তত বুঝি
বেঁধেছি ক্ষণিক খেলাঘর।

জীবনের স্বপ্ন যায় টুটে,
জল গ'লে গ'লে যায় বদ্ধ করপুটে।
লইয়া আকণ্ঠ তৃষা মন নাহি পায় দিশা,
লক্ষ্যহীন যায় ছুটে ছুটে;
ক'রো না ছলনা আর তৃষিতেরে বার বার,
জীবনের স্বপ্ন যায় টুটে।

সবে মানিয়াছে পরাজয়—
কামনা মরিয়া যায় প্রেম জেগে রয়।
শুধু কি শুনিব গান, আমি খুঁজিতেছি প্রাণ
মৃত্যুমাঝে চির-জ্যোতির্ম্ময়।
নিশীথের অন্ধকার রৌদ্রালোকে মানে হার,
সবে মানিয়াছে পরাজয়।

সব স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে,
শোভিছে সিন্দুরদীপ্তি ললাট-আকাশে।
তুলসীর বেদীতলে সন্ধ্যাদীপখানি জ্বলে,
শঙ্খরব বাতাসেতে ভাসে।

ছায়াছবি, দলে দলে ভেঙে যায় স্রোতোজলে,
সব স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে।

প্রণতি ঘনায় মনোমাঝে,
সেনাদল একে একে ফিরে যায় লাজে।
ডাক তুমি বিদ্রোহীরে, তোমারে থাকুক ঘিরে,
ফিরে যাক সংসার-সমাজে;
ভুলে ভুলে পেয়ে পথ পুরে তার মনোরথ,
প্রণতি ঘনায় মনোমাঝে।

দেবতা, বিলম্ব নহে আর,
চাহ চোখ মেলে, লহ নিজ অধিকার।
শান্ত হ'ল রণাঙ্গন, ক্লান্ত তব সেনাগণ,
এবারে আপনি লহ ভার।
নিশীথিনী শ্রান্তিহরা নামিতেছে, কর ত্বরা,
দেবতা, বিলম্ব নহে আর।

সব দুঃখ কর নিবারণ,
ছাড়হ অনন্ত-শয্যা, জাগো নারায়ণ,
মনে হয় আর্ত্তো কারা চেয়ে আছে সর্ব্বহারা;
নব পুষ্প করিয়া চয়ন,
হয়তো গাঁথিছে মালা, সে হবে ভুজঙ্গ-জ্বালা,
সে দুঃখ করহ নিবারণ।

ছোটলোক

উন্নতমস্তক রাঘব সরকার দ্বিপ্রহরের নিদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে খদ্দর, মাথায় ছাতা নাই। পায়ে জুতা অবশ্য আছে, কিন্তু তাহা এমন কণ্টকসঙ্কুল যে, বিক্ষত পদদ্বয়কে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মর্য্যাদা দিলে খুব বেশি অন্যায় হয় না। উন্নতমস্তক রাঘব সরকারের কিছু ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি দ্রুতপদেই চলিয়াছেন। সুনির্দ্দিষ্ট-নীতি-অনুসরণকারী, অনমনীয়-চরিত্র রাঘব সরকার চিরকালই উন্নতমস্তক। তিনি কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না। স্বকীয় মস্তক সর্ব্বদা উন্নত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া এক রিকশাওয়ালা তাঁহার পিছু লইল।

রিকশা চাই বাবু—রিকশা—

রাঘব একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন। অস্থিচর্ম্মসার লোকটা তাঁহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। যাহারা নিতান্ত অমানুষ, তাহারাই মানুষের কাঁধে চড়িয়া যায়—ইহাই রাঘবের ধারণা। তিনি জীবনে কখনও পালকি অথবা রিকশা চড়েন নাই, চড়া অন্যায় মনে করেন। খদ্দরী আস্তিন দিয়া কপালের ঘামটা মুছিয়া বলিলেন, না, চাই না।

দ্রুতপদে হাঁটিতে লাগিলেন।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া রিকশাওয়ালাটাও পিছু পিছু আসিতে লাগিল। সহসা রাঘব সরকারের মনে হইল, বেচারার ইহাই হয়তো অন্নসংস্থানের একমাত্র উপায়। রাঘব কৃতবিদ্য ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কে ধনিকবাদ, দরিদ্র-নারায়ণ, বল্‌শেভিজ্‌ম্‌, ডিভিশন অব লেবার, পল্লীর দুর্দ্দশা, ফ্যাক্টরি, জমিদারি অনেক কিছুই নিমেষের মধ্যে খেলিয়া

গেল। তিনি আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। আহা, সত্যই লোকটা জীর্ণশীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট। হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল।

ঘণ্টা বাজাইয়া রিকশাওয়ালা আবার বলিল, চলুন না বাবু, পৌঁছে দিই—কোথায় যাবেন?

ওই শিবতলা পর্য্যন্ত যেতে ক পয়সা নিবি?

ছ পয়সা।

আচ্ছা, আয়।

রাঘব সরকার চলিতে লাগিলেন।

আসুন বাবু, চড়ুন।

তুই আয় না।

রাঘব সরকার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন।

রিকশাওয়ালাও পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে কেবল নিম্নলিখিতরূপ বাক্য-বিনিময় হইতেছে।

আসুন বাবু, চড়ুন।

আয় না।

শিবতলায় পৌঁছিয়া রাঘব সরকার পকেট হইতে ছয়টি পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন, এই নে।

আপনি চড়লেন কই?

আমি রিকশা চড়ি না।

কেন?

রিকশা চড়া পাপ।

ও। তা আগে বললেই পারতেন—

লোকটার চোখে মুখে একটা নীরস অবজ্ঞা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। সে ঘাম মুছিয়া আবার চলিতে শুরু করিয়া দিল।

পয়সাটা নিয়ে যা।

আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

"বনফুল"

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

২

৬। **ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার***। ইং মে ১৮১৭ (১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৩৯ শক)। পৃ. ৩+৬৪।

এই পুস্তকের ভূমিকাটি (পৃ. ১-৩) রামমোহনের কোন গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হয় নাই। আমরা উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

। ভূমিকা।

ওঁতৎসৎ। মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগতদিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকলশাস্ত্র প্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সর্ব্ব সাধারণ প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম। কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ জন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ়২ সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থহইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়। দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকা সাতষষ্টিপৃষ্ঠ তাহাতে অভিপ্রায় করি যে বেদান্তের আট নয় সূত্রের

* ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রকাশিত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র উত্তরে এই বিচারপুস্তক লিখিত। "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৪র্থ পুস্তক-রূপে 'বেদান্ত চন্দ্রিকা" প্রকাশিত হইয়াছে।

অধিক নাই আর বেদের দুই তিন প্রমাণ লিখিয়া থাকিবেন অধিকন্তু এই সকল সূত্র কোন অধ্যায়ের কোন পাদের হয় আর ঐ শ্রুতি কোন উপনিষদের অথবা কোন ভাষ্যে ধৃত হয় তাহা লিখেন না এবং বেদান্তচন্দ্রিকার মঙ্গলাচরণীয় প্রভৃতি শ্লোকসকল কোন গ্রন্থের হয় তাহা প্রায় লিখেন না অতএব নিবেদন দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃত্যাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য্য লিখিবেন তাহার বিশেষরূপে নিদর্শন যেন লিখেন। তৃতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথমে লিখেন যে এগ্রন্থ কাহার ভাষা বিবরণের উত্তর দিবার জন্যে লেখা যাইতেছে এমৎ নহে অথচ প্রথমঅবধি শেষ পর্য্যন্ত হে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কেবল আমাদিগ্যেই শ্লেষ করিয়াছেন এবং স্থানে২ যাহা আমরা কদাপি কোনো গ্রন্থে লিখি নাই এবং স্বীকার করি নাই তাহা আমাদের মত হয় এমৎ জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় প্রার্থনা এই যে শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠ এবং পংক্তির নির্দ্দেশ পূর্ব্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্ব্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য্য কৃপা পূর্ব্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব ইতি।

৭। **কঠোপনিষৎ**। ইং আগষ্ট ১৮১৭।

৮। **মাণ্ডুক্যোপনিষৎ**। ইং অক্টোবর ১৮১৭। পৃ. ২৩+১৯।

৯। **গোস্বামীর সহিত বিচার**। ইং জুন ১৮১৮। পৃ. ৫০।

ইহা "ভগবদ্গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর"।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০) সহিত যে পুস্তক-তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার বাংলা-বিভাগে রামমোহনের একখানি পুস্তিকার এইরূপ উল্লেখ পাইতেছি :—

Reply to a MS. of Ram-gopala Sormono.

ইহা 'গোস্বামীর সহিত বিচার' হওয়া অসম্ভব নহে।

১০। **সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ**। ইং নবেম্বর ১৮১৮। পৃ. ২২।

এই পুস্তিকার শেষে কোন প্রকাশকাল দেওয়া নাই। ইহা যে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, ২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> "সহমরণ।—কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থুল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

১১। **গায়ত্রীর অর্থ**। ইং ১৮১৮ (শকাব্দা ১৭৪০)।

১২। **মুণ্ডকোপনিষৎ**। ইং মার্চ ১৮১৯।

এই পুস্তকের শেষে প্রকাশকাল দেওয়া নাই। সকলেই ইহার প্রকাশকাল "১৮১৭" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা যে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়, ২৭ মার্চ ১৮১৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> "নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত রামমোহন রায় অথর্ব্ব বেদের মণ্ডুকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জ্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন।"

পাদরি লং তাঁহার মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন,—"Mundak Upanishad, by R. Ray, 1819."

রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'র ৮০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মণ্ডুকোপনিষৎ "মাণ্ডুক্যোপনিষদের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভূমিকাতে এমন উল্লেখ আছে।" কিন্তু মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় এরূপ কোন উল্লেখ নাই।

রাজনারায়ণ বসু ও বেদান্তবাগীশ 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'তে যে মূল পুস্তকের সাহায্যে মুণ্ডকোপনিষৎ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার একটি স্থল খণ্ডিত। গ্রন্থাবলীর ৫৮৭ পৃষ্ঠার শেষে এই অংশ বসিবে :—

> ব্রহ্ম তৈঁহই সত্য ইহা পূর্ব্বকালে অঙ্গিরাঋষি আপন শিষ্য শৌনককে কহিয়াছেন আর ব্রতোপাসনার অনুষ্ঠান যাহারা না করিয়া থাকেন

তাঁহারা এ উপনিষদের পাঠ করিবেন না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি নমস্কার পুনরায় তাঁহাদের প্রতি নমস্কার দুইবার কথনের তাৎপর্য্য এই যে মুণ্ডকোপনিষদের সমাপ্তি হইল॥

ইতি মণ্ডুকোপনিষৎ সমাপ্তা॥

১৩। **সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ** *। ইং নবেম্বর ১৮১৯। পৃ. ৩৩।

Second Conference / between / An Advocate and an Opponent / Of the practice of / Burning Widows Alive. / সহমরণ বিষয়ে / প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ. / Calcutta, / Printed at the Mission Press. / 1819. /

১৪। **কবিতাকারের সহিত বিচার**। ইং ১৮২০। পৃ. ২৩+৪৯।

"ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখমাত্র না করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানাপ্রকার কদুক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন...তাহা মধ্যে২ দেবতা বিষয়ের শ্লোক এই দুইয়ে একত্র করিয়া ঐ পুস্তককে প্রত্যুত্তর শব্দে বিখ্যাত করিয়াছেন... ।"

১৫। **সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার**। ইং ১৮২০। পৃ ১৬।

ইহা দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায়, এবং বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় মুদ্রিত। শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে।

ইহার ইংরেজী অনুবাদও *Apology for the Pursuit of Final Beatitude, independent of Brahmunical Observances* নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

* কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' (আগষ্ট ১৮১৯, পৃ. ২৮) ইংরেজী অনুবাদ-সহ প্রকাশ করেন। ইহারই উত্তরে রামমোহন উপরিলিখিত পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছিলেন।

এই সময় সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত সুবা শাস্ত্রীর সহিত রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচার হয়। বাংলা ও সংস্কৃতে রচিত রামমোহনের এই বিচার-পুস্তকখানির উল্লেখ কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (১৮১৯-২০) পরিশিষ্টে মুদ্রিত পুস্তকাবলীর তালিকায় আছে। এই তালিকার বাংলা এবং সংস্কৃত বিভাগে প্রকাশ :—

Reply to the Observations
of Sobha-sastree...Rammohun Roy...Baptist Mission Press.

সুবা শাস্ত্রী ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী উভয়েই সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

১৬। **ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ**। ইং ১৮২১।

এই সাময়িক পুস্তকের প্রথম তিন সংখ্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ (*The Brahmunical Magazine. The Missionary and the Brahmun*) থাকিত। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ৪র্থ সংখ্যা *The Brahmunical Magazine* দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা কেবল ইংরেজীতে মুদ্রিত।

'ব্রাহ্মণ সেবধি' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকের ২২-২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৭। **চারি প্রশ্নের উত্তর**। ইং মে ১৮২২। পৃ. ২৬।

২৩ চৈত্র ১২২৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী চারিটি প্রশ্ন করেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩২৬-২৮ দ্রষ্টব্য)। এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তর আলোচ্য পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।

১৮। **পাদরি ও শিষ্য সংবাদ**। ইং ১৮২৩।

ইহার ইংরেজী অংশ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল; বাংলা অংশও ঐরূপ সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

১৯। **গুরুপাদুকা**। ইং ১৮২৩। পৃ. ৬।

পাদরি লঙের মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকের তালিকায় প্রকাশ :—

Guru Paduka, by R. Ray, pp. 6, 1823, reply to the Chandrika's defence of idolatry.

এই পুস্তিকার ভূমিকাটি এইরূপ :—

১৭ই আষাঢ় ১০ সংখ্যার সমাচারচন্দ্রিকা হস্থলিত শ্রীমদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির প্রিয় পোষ্যস্য কস্যচিৎ ক্ষুদ্র শিষ্যস্য ইতি স্বাক্ষরিত জ্ঞানাঞ্জন শলাকা নামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছিল যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে সে দুর্ব্বাক্যের উত্তর দিবার প্রয়োজনাভাব কিন্তু গত চন্দ্রিকায় তদুত্তর প্রার্থনায় শ্রীগৌরাঙ্গ দাস এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন সুতরাং তাহার এবং তৎসংসর্গিদের কৃতার্থের নিমিত্ত গুরুপাদুকা নামিকা এই পত্রিকা প্রদান করিতেছি ইহাতে যদি জ্ঞান না জন্মে তবে চেষ্টান্তর করিতে হইবেক।—'ছোট গল্প', ১য় বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, পৃ. ১১৭৯।

২০। **পথ্যপ্রদান*** ইং ১৮২৩। পৃ. ২৬১।

পথ্য প্রদান / সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্ট কর্ত্তৃক / কলিকাতা / সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দা ১৭৪৫ / MEDICINE / for the sick / offered / By / One who laments / his inability to perform / all righteousness. / Calcutta, / Printed at the Sungscrit Press. / 1823. /

২১। **প্রার্থনাপত্র**। ইং ১৮২৩। পৃ. ৪।

---

* এই পুস্তকখানি উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দ্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-রচিত 'পাষণ্ডপীড়নে'র উত্তরে লিখিত। "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৮ম গ্রন্থরূপে 'পাষণ্ডপীড়ন' রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে প্রকাশিত হয়। লঙের মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকের তালিকাতে ইহার প্রকাশকাল— ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ দেওয়া আছে।

২২। **ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ**। ইং ১৮২৬ (শকাব্দা ১৭৪৮)।

২৩। **কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার**। ইং ১৮২৬ (শকাব্দা ১৭৪৮)।

২৪। **বজ্রসূচী** (১ম নির্ণয়)। ইং ১৮২৭ (শকাব্দা ১৭৪৯)।

২৫। **গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং**। ইং ১৮২৭*।

২৬। **ব্রহ্মোপাসনা**। ইং ১৮২৮।†

২৭। **ব্রহ্মসঙ্গীত**। ইং ১৮২৮।†

২৮। **অনুষ্ঠান**। ইং ১৮২৯। পৃ. ৬+৪।

অনুষ্ঠান। / শকাব্দাঃ / ১৭৫১ /

২৯। **সহমরণ বিষয়**। ইং ১৮২৯ (শকাব্দাঃ ১৭৫১)। ১১।

৩০। **সহমরণ-নিবারণে লর্ড বেণ্টিঙ্ককে মানপত্র**। জানুয়ারি ১৮৩০।

এই মানপত্রখানি রামমোহনের রচনা হওয়া বিচিত্র নহে। ইহার ইংরেজী অনুবাদটিকে তাঁহারই রচনা বলিয়া ধরা হয়।

---

* যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীতে (i. xx) রামমোহনের রচনাবলীর যে তালিকা আছে, তাহাতে এই তারিখ পাওয়া যায়। আলোচ্য পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

† Jogendra Chunder Ghosh : The Eng. Works of Raja Ram Mohun Roy, i. xx.

মানপত্রখানির ইংরেজী ও বাংলা উভয় অংশই ১৮ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখের *Government Gazette* পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ২৩এ জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' উহা উদ্ধৃত করেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ২য় সং., পৃ. ২৯০-৯২ দ্রষ্টব্য)।

৩১। **গৌড়ীয় ব্যাকরণ**। ইং ১৮৩৩। পৃ. ৯৭।

Grammar / of / the Bengali Language. / গৌড়ীয় ব্যাকরণ / তদ্ভার্য্য বিরচিত / শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়দ্বারা পাণ্ডু লিপি / ও / কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিদ্বারা / এবং / তম্মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। / ১৮৩৩। / Calcutta : / Printed at the School-Book Society's Press ; and sold at its / Depository, Circular Road. / 1833.

*

ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তিকা দুইখান রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু এগুলির প্রকাশকাল জানা যায় নাই :—

ক্ষুদ্রপত্রী (বিতরণার্থ মুদ্রিত)

আত্মানাত্মবিবেক (বঙ্গানুবাদসহ)

এই তালিকায় রামমোহন কর্ত্তৃক "প্রকাশিত" অথচ প্রণীত নহে, এমন কতকগুলি পুস্তকের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। যথা,—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা' (পৃ. ৩৭৭), * এবং ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক প্রভৃতি

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৮০৩-৪ দ্রষ্টব্য। রাজনারায়ণ বসুও রামমোহন-গ্রন্থাবলীর ৮১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত সূত্রের সমগ্র সংস্কৃত শাঙ্কর ভাষ্য পৃথক্ মুদ্রিত করিয়াছিলেন,...বেদান্ত সূত্র ভাষ্য খানি চতুষ্পত্রাকারের (quarto size) ৩৭৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।"

কয়েকখানি উপনিষদের মূল ও ভাষ্য। 'কুলার্ণব' সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। 'কুলার্ণব' রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু উহা বোধ হয় রামমোহনের গুরুস্থানীয় হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কলিকাতা অবস্থানকালে—সম্ভবতঃ ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে—প্রকাশ করিয়াছিলেন।*

রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি। ইং ১৮৮০। পৃ. ৮১৪।

ইহা রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পুনঃপ্রকাশিত। ইহাই রামমোহনের বাংলা গ্রন্থাবলীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংস্করণ।

ইহার পূর্ব্বে, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের বাংলা গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।† তাহার পর তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক রামমোহনের ইংরেজী-বাংলা অধিকাংশ গ্রন্থেরই সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাশীতে হরিহরানন্দের মৃত্যু হইলে, পরবর্ত্তী ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সমাচার দর্পণ' যাহা লেখেন তাহার এক স্থলে আছে :—"প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়।"

† "It affords us great pleasure to be able to announce that Baboo Annodapersaud Bonerjee, a distinguished Patron of native education has published at his own expence the whole of the Bengallee writings of the late RAJA RAMMOHUN ROY, for the purpose of disseminating generally the enlightened views of that Indian philosopher in respect to theology and the Hindoo Shasters."—*The Calcutta Courier* for January 6, 1840.

সরোজিনী

১১

পরদিন সকালে বৈঠকখানার দাওয়ায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। শেষরাত্রি হইতে প্রবল বৃষ্টি নামিয়াছিল; অবিশ্রান্ত কয়েক ঘণ্টা বর্ষণের পর এখন ঝিরঝির করিয়া পড়িতেছিল। আকাশে কিন্তু এখনও মেঘ থমথম করিতেছিল, কাজেই আশা করিতেছিলাম, যদি নয়টা-দশটার সময়ে আবার বর্ষণ শুরু হয় এবং ঘণ্টাখানেক ধরিয়া চলে তো আজ রেনি-ডের জন্য স্কুল বন্ধ করিয়া দিব। হঠাৎ দেখিলাম, ছাতা-মাথায় হারাণ হনহন করিয়া আসিতেছে। হারাণ তো এত সকালে কোন দিন উঠে না! হঠাৎ ব্যাপার কি! বাড়িতে কনে-বউয়ের কোন অসুখ-বিসুখ নয় তো! কাছে আসিতেই উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিলাম, কি হে, এত সকালেই?

হারাণ ছাতাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া সিঁড়িতে পা ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল, মনুদার কাছে গিছলাম, কাউকে কিছু বলতে মানা করলাম।

রাজি হ'ল মনুদা? আর রাজি হ'লেও—

হারাণ কহিল, না, কাউকে ও আর বলবে না। আমি যে ওদের দলে, তা আমি ওকে বিশ্বেস করিয়ে এসেছি।

কহিলাম, কি ক'রে?

এদের দলের দু-চারটা গোপন কথা ফাঁস ক'রে দিয়ে। সরোজিনীর শাশুড়ীকে যে ওরা বার ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তাও ব'লে দিয়ে এসেছি।

আমার নামে মিথ্যে ক'রে কিছু লাগাও নি তো?

পাগল! তা আবার লাগাতে পারি! কিন্তু যাক ওসব কথা, একটু চা খাওয়াও দেখি।—বলিয়া ঘরে আসিয়া চেয়ারে বসিল। আমি বাড়ির ভিতরে গিয়া চায়ের জন্য বলিয়া ফিরিতেই হারাণ কহিল, কাল সারারাত চোখে পাতায় করি নি।

চেয়ারে বসিয়া কহিলাম, কেন হে?

বিরক্তিতে সারামুখ কুঞ্চিত করিয়া হারাণ কহিল, কনে-বউয়ের ঘ্যানঘ্যানানি। রাত্রেতে বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হ'লই, তার ওপর কিছু খেতেও পারলাম না। তা কনে-বউ এমনই যা করুক, বোঝালে বোঝে, আর বুঝিয়েও এনেছিলাম খানিক।

কি ক'রে?

বললাম, গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে মজলিস ছিল, রাত হয়ে গেল ব'লে না খাইয়ে ছাড়লেন না।

তারপর?

তারপর, আমাদের সেই ফেউটি আছেন তো—পদ্ম পোড়ামুখী! সেই ধরিয়ে দিলে সব—

ও জানলে কি ক'রে?

জানবে না কেন? গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে কাল গিয়েছিল যে। আমি আর তুমি যে প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ি গিয়েছিলাম, তা ও দেখে এসেছিল।

তা হ'লে বউ সব জানতে পেরেছে বল।

অত্যন্ত করুণ মুখে উপরে ও নীচে ঘাড় নাড়িয়া হারাণ কহিল, হ্যাঁ, সে এক রকম জানাই—তবে আমি বলেছি, দারোগার ওখানে খেয়ে এসেছি, তুমিও সঙ্গে ছিলে। বউ বিশ্বেস করে নি বোধ হয়।

কি বললে বউ?

যৎপরোনাস্তি গালাগালি করলে—হাড়ী, ডোম, ম্লেচ্ছ, মায় কুকুর পর্য্যন্ত। তারপর বিছানায় শুতে দিলে না; মেঝেতে মাদুর পেতে শুলাম তো বিছানায় ব'সে ফোঁস-ফোঁস ক'রে কাঁদতে লাগল; ভুলোবার জন্যে বিছানায় উঠতে গেলাম তো তড়াক ক'রে নেমে বাইরে বেরিয়ে গেল; বাইরে গেলাম তো ভেতরে ঢুকে দুড়াম ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর সারারাত্রি ধ'রে দরজা-ঠেলাঠেলি। বিশ্বেস তো নেই! যা রাগ! হয়তো গলায় দড়ি দেবে। কিছুতেই খুললে না। শেষ-রাত্রে বৃষ্টি নামল; তার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়; বৃষ্টির ছাটে ভিজে সপসপে হয়ে সারারাত্রি দরজা-গোড়ায় ব'সে কাটালাম।

পদ্ম কি করলে?

রাগে দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিল, ওদের মা-বেটাকে আমি ঘর থেকে বার করব। রাতদিন বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া কচকচি, চালে কাক বসতে দেয় না। ওই তো বউয়ের মেজাজ খারাপ ক'রে দেয়। না হ'লে বউ খারাপ লোক নয়।

শিকল ঝনঝন করিয়া উঠিল। বুঝিলাম, সিগ্‌ন্যাল পড়িল, পত্নী চা-হস্তে দ্বারান্তরালে সমুপস্থিত, ত্বরিতপদে কাছে গিয়া দুই হাতে দুই পেয়ালা ধূমায়মান চা লইয়া আসিতেই হারাণ আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া কহিল, দাও। পেয়ালাটা লইয়াই গরম চায়ে এক চুমুক দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, গরম। তারপর সতর্কভাবে দুই-চারিবার চুমুক দিয়া কহিল, ভারী আরাম হ'ল ভাই। বউদিদির হাতের চা চমৎকার! যেমন রঙ, তেমনই স্বাদ! আমার বাড়ির চা যেন আলকাতরা, খেতে গেলে কান্না পায়।

কহিলাম, পদ্মর ছেলে তো এখন চাকরি করছে।

ঘাড় নাড়িয়া হারাণ কহিল, করছে তো। সরকারী ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারি করে। পনরো টাকা ক'রে মাইনে পায়। তবে আজ পর্যান্ত একটি পয়সাও ঠেকায় নি, মা-ই সব জমাচ্ছেন। ডাইনীটার কুচুটে বুদ্ধি তো কম নয়। তাই তো কনে-বউ বলে, অনেকদিন তো করলাম আমরা; এর পর ছেলে মানুষ হয়েছে, স'রে পড়লেই হয়, ঘরও তো দিচ্ছি, আমাদের বামুন-ডোবার পাশে প'ড়ো বাড়িটা, একটু সারিয়ে-সুরিয়ে নিলেই চলবে; তা ডাইনী কিছুতে নড়তে চাইছে না। বলতে গেলেই ঝগড়া।

ভায়া আছ নাকি?—বলিয়া মণীন্দ্র হাজির হইল। হাতের সপসপে ভিজা ছাতাটা সুদ্ধ ঘরে ঢুকিতেই কহিলাম, ছাতিটা বাইরে রেখে এস মনুদা। মণীন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, দেখ মাস্টার, কার সঙ্গে কেমন ক'রে কথা বলতে হয় শিখে রেখো, যাকে বলে—

বাধা দিয়া ধমকের সুরে কহিলাম, শিখব এখন, তুমি ছাতাটা রেখে এস তো।

মণীন্দ্র এক মুহূর্ত্তে নরম হইয়া কহিল, রাখছি, রাখছি, রাগ কিসের? —বলিয়া ছাতাটা বাহিরে রাখিয়া, ঘরে আসিয়া কহিল, চা খাচ্ছ নাকি?

আমার জন্যে এক কাপ ব'লে দাও দেখি, হারাণকে লক্ষ্য করিয়া মুরুব্বিয়ানার সহিত কহিল, দেখ হারু, সমঝে চলাফেরা ক'রো। যার-তার সঙ্গে মিশো না। কতবড় একটা ঘরের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক, সব সময়ে খেয়াল রেখো।

হারাণ চুপ করিয়া রহিল। মণীন্দ্র গম্ভীরভাবে কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া পা দুইটি দোলাইতে লাগিল।

এক পেয়ালা চা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া মণীন্দ্রর সামনে নামাইয়া দিয়া কহিলাম, কি হ'ল ? মণীন্দ্র চায়ে চুমুক দিয়া কহিল, কিছু না, হারাণকে সাবধান ক'রে দিচ্ছিলাম, গাঙুলী, রাধানাথ, ঐসব ছোট-লোকগুলোর সঙ্গে যেন না মেশে। ওতে আমাদের মাথা হেঁট হবে।

কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, তোমাদের মাথা হেঁট হবে কেন ? মণীন্দ্র ভ্রূ দুইটা বার দুই তোলা-নামা করিয়া কহিল, বাঃ রে! জান না নাকি ? ও যে আমাদের ভগ্নীপতি। আমি জানতাম না, সরোজ জানত বরাবরই।

হারাণের দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিলাম, তবে আর কি হে! তোমার তো পোয়া বারো। মণীন্দ্র খ্যাঁক করিয়া উঠিল, মানে ?

এমন একটি শালী—মানে বড়লোক শালী পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নাকি ?

মণীন্দ্র সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, ওতে আর ওর কি সুবিধে হবে ? আমি ভাই, আমারই ব'লে কিছু হচ্ছে না। মুখে রক্ত উঠিয়ে মাসে পনরো টাকা। ফুর্তি-ভিটের—। বলিয়াই মণীন্দ্র চুপ করিয়া গেল।

হারাণ কহিল, ফুর্তি-ভিটের কি ?

কিছু নয়, কিছু নয়। দেখ হেরো, না না, দেখ ভাই হারু, সকালের কথাটা সত্যি তো ? তা হ'লে বুড়ীটাকে একটু সাবধানে রাখতে হবে। তা ছাড়া থানায় একটা ডাইরি করিয়ে দিয়ে আসি, কি বল ?

বাইরে সজোরে বৃষ্টি নামিল। মণীন্দ্র কহিল, বর্ষাটা নেমে গেল বোধ হয়। বাস্-চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। তা হ'লে জেলায় যাবার কি হবে বল দেখি ?

কহিলাম, জেলায় গিয়ে কি হবে?

মণীন্দ্র বিস্ময়ের সুরে কহিল, আরে, মনে নেই? অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত কহিল, মাস্টারি ছেড়ে দাও মাস্টার। তোমার স্মরণশক্তি একেবারে গোল্লায় গেছে। ছেলেগুলোকে ভুল শিখিয়ে মাথা খেও না আর। তারপর দুই চক্ষের দৃষ্টি বাঁকা করিয়া, চোখের তারা দুইটা চোখের ডান পাশে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, মনে নেই? সেই যে, লা—ব—কে—হা—

বুঝিলাম—লাইব্রেরির বই কেনা ও হাকিমের সঙ্গে দেখা করা। বলিলাম, বুঝেছি, পরে ভেবে বলব এখন।

ভাবাভাবি আর করতে হবে না, যত শিগগির হয় ততই ভাল। তুমি আর আমি, বুঝলে?

দরজায় গোষ্ঠ ডোমের ডাক শোনা গেল, মাস্টারবাবু রইছেন গো?

সাড়া দিয়া কহিলাম, কে, গোষ্ঠ? কি খবর?

খবর কিছু লয়, কর্ত্তাবাবু বললেক উস্কুলের চাবিটা দিতে। হুজুর সাহেব এসেছেন। আর আপনকাকেও যেতে বললেক। হঠাৎ হারাণকে দেখিতে পাইয়া বলিল, ও ঘোষাল মশয়! আপনার কাছে যাচ্ছিলাম যে। আপুনিও চল।

হারাণ অসহ্য বেদনায় নাক-মুখ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, আবার পেটটা মোচড়াতে শুরু করল মাস্টার। আমি উঠি।

গোষ্ঠকে কহিল, বাবা গোষ্ঠ! ভারী পেটের অসুখ, গাঙুলী মশায়কে ব'লো, সারারাত ভেদবমি হয়েছে; অনেক কষ্টে ক পা হেঁটে মাস্টারের কাছে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেতে এসেছিলাম। ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল, চলি হে মাস্টার! তুমিও ব'লে দিও। হারাণ ছাতা লইয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে বাহির হইয়া গেল।

মণীন্দ্র কহিল, আমিও উঠি তা হ'লে। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ তো? আর দেরি নয়। দু আনা চার আনা দামের বিশ-ত্রিশ টাকার বই কিনলেই এক গাদা বই হবে, তাই দিয়ে এক রকম ক'রে একটা আলমারি ভর্ত্তি ক'রে, হাকিমকে এনে হাজির করা চাই, তা হ'লেই সব ঢিট হয়ে যাবে।

গোষ্ঠ মুখ বাড়াইয়া কহিল, কে কথা কইছেন গো? চক্রবর্ত্তী মশয় নাকি? আপনকাকেও যে একবার ডাকছিলেন গাঙুলী মশয়, বললেক—

মণীন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, তোর গাঙুলী বুড়োকে বলগে যা, মনু চক্রবর্ত্তী কারও তাঁবেদারের নফর নয় যে, তু করলেই ছুটে যাবে, তার দরকার থাকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করুক।— বলিয়া ছাতাটি লইয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

গোষ্ঠর হাতে চাবি পাঠাইয়া দিয়া আমিও স্কুলের দিকে চলিলাম।

স্কুলে পৌঁছিতেই দেখিলাম, গাঙুলী মশায়, রাধানাথ, আরও পাড়ার দুই-চারিজন লোক স্কুলের উঠানে জড়ো হইয়াছে। গ্রামের চৌকিদাররা সরকারী নীল জামা ও পাগড়ী পরিয়া, হন্তদন্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই গাঙুলী মশায় শশব্যস্তভাবে কহিলেন, হুজুর আফিস-ঘরে রয়েছেন, আজ আর স্কুল থাক, বাদলার জন্মে বন্ধের নোটিস দিয়ে দাও।

পাড়াগাঁয়ে দারোগা ও সার্কল-অফিসার বাস্তু-দেবতারই সামিল। নিত্য তাঁহাদের সেবা যোগাইতে হয় এবং সকাল সন্ধ্যা ভক্তি নিবেদন করিতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি. ও. প্রভৃতি উপরওয়ালা হাকিমরা দুর্গা-কালীর মত বৎসরে দুই-একবার আসেন এবং যখন আসেন, তখন সারাগ্রামে হৈ-চৈয়ের অন্ত থাকে না।

আফিস-ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, সার্কল-অফিসার একটি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া আছেন, সবুট পা দুইটি টেবিলের উপর রক্ষিত; আরামে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সিগারেট টানিতেছেন। আমার জুতার শব্দে একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া আমাকে দেখিয়া লইয়া আবার চোখ বুজিলেন। একজন শিক্ষককে সাধারণ ভদ্র-লোকের প্রাপ্য সৌজন্যটুকু দেখানোও তাঁহার হাকিমী মর্য্যাদাজ্ঞানে বোধ করি বাধিল। বসিতে না বলিলেও বসিলাম, চেয়ারে নয়, কারণ চেয়ারটিতে হাকিম বাহাদুর তাঁহার টুপিটি রাখিয়াছেন, কাজেই একটি টুল সংগ্রহ করিয়া সম্মানসূচক দূরে বসিলাম।

এই হাকিমটি কৈবর্ত্ত-সন্তান, নাম অদ্বৈতচরণ ঘোষ। বয়স

প্রায় ত্রিশ; এম. এ. পাস; ভাল ছেলে ছিলেন নিশ্চয়ই, না হইলে প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় পাস করিয়া চাকুরি পাইতেন না। চেহারাও হাকিমোচিত দশাসই। ইনি যে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের একজন প্রতিনিধি ও গ্রাম্য জনমণ্ডলীর একান্ত ভক্তির পাত্র, তাহা নিজেও কখনও ভুলেন না, কাহাকেও কখনও ভুলিতে দেন না। ইনি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও উপরওয়ালাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন জানি না, কিন্তু আমাদের কাছে নিজের চতুর্দ্দিকে সদাসর্ব্বদা এমনই একটি দেবতাসুলভ মহিমাময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন যে, আমরা গ্রামবাসীরা যুক্তহস্তে ইহার সামনে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ইহার দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকি ও ইহার মুখে মনিবসুলভ কথাবার্ত্তা, হাসি ও কাসি দেখিতে ও শুনিতে পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাই।

হঠাৎ হাকিম বাহাদুর আমি আগে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, আপনাদের গ্রামের ব্যাপার কি? চোখ খুলিয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া পাশে তাকাইতেই আমাকে দেখিতে পাইলেন, এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, ওঃ, বসেছেন দেখছি, তা বেশ করেছেন। এখন গাঁয়ে কি সব ব্যাপার চলছে বলুন দেখি?

কহিলাম, বিশেষ কিছু না। মানে—

হুজুর বাধা দিয়া কহিলেন, সে কি মশায়? এত সব কথা শুনলাম, আর আপনি সব উড়িয়ে দিচ্ছেন?

জবাব দিলাম, আমি সব ব্যাপার ভাল জানি না। গাঙ্গুলী মশায় জানেন।

তবে যে রাধানাথবাবু বললেন, আপনি ভেতরে ভেতরে ও দলে রয়েছেন।

গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিলাম, আমি কোন দলেই নেই, অথবা দুই দলেই আছি। শিক্ষক হয়ে দলাদলিতে যোগ দেওয়া আমাদের চলে না।

হুঁ-শব্দে হুজুর গর্জ্জন করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া, দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া, মুখে নানা প্রকার ভাব ফুটাইয়া, হুজুর হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া নূতন আর একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতে

লাগিলেন। আমিও একখণ্ড কাগজ সংগ্রহ করিয়া রেনি-ডের নোটিস লিখিয়া, বাহিরের নোটিস-বোর্ডে আঁটিয়া দিতে গেলাম। গাঙুলী মশায় আমাকে দেখিয়াই ছুটিয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন নাকি?

কহিলাম, দলাদলির কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

আগ্রহান্বিত স্বরে গাঙুলী মশায় কহিলেন, কি বললে?

এই সময়ে রাধানাথও আসিয়া হাজির হইল। কহিলাম, বললাম, রাধানাথ দাদা সব জানে, ওই তো দলাদলি সৃষ্টি করেছে কিনা।

রাধানাথ চটিয়া উঠিয়া কহিল, তার মানে?

কহিলাম, মানে বুঝতে পারছ না নাকি? বাংলা ভুলে গেছ?

রাধানাথ চোখ পাকাইয়া তর্জ্জনী নাড়িয়া কহিল, দেখ মাস্টার, মিথ্যে চুকলি ক'রো না বলছি।

কহিলাম, তুমি আমার নামে কর নি? তুমি বল নি, ভেতরে ভেতরে আমি ঐ দলে আছি?

রাধানাথ কহিল, আছ তো, বলব না?

তুমি দলাদলি সৃষ্টি করেছ তো, বলব না?

গাঙুলী মশায় দুই হাত দুইজনের কাঁধে দিয়া কহিলেন, আরে, থাক থাক, ঘরে ঘরে ঝগড়া করতে হবে না। হুজুর শুনতে পেলে কি ভাববেন বল দেখি? মাস্টার, হুজুরের কাছে ব'সগে যাও। আর রাধানাথ ভাই, মাছধরার কতদূর কি হ'ল একবার দেখগে যাও। বেশি দরকার নেই, একটা সের পাঁচেক রুই কি মিরগেল হ'লেই হবে। ওবেলায় তো আবার পাঁঠার হাঙ্গামা আছে। আর দেখ, ফেরবার সময়ে অনুকূল মামাকে (প্রবোধ গাঙুলীর মামা) ডেকে নিয়ে আসবে।

রাধানাথ চলিয়া গেল। গাঙুলী মশায় কহিলেন, হুজুরকে সব বলেছি। দারোগার ওপর তো এমনিই চটা, আরও চ'টে গেছেন আজ। হাকিম হোক, হিন্দুর ছেলে তো। হিন্দুর বিধবার সঙ্গে মোছলমানের নটখটি শুনলে চটবারই কথা। যাও, কাছে ব'সে আরও একটু উসকে দাওগে যাও। হুজুরকে দিয়েই আজ রাত্রে কার্য্যোদ্ধার করতে হবে।

ভিতরে গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে গাঙুলী মশায় ভিতরে

ঢুকিয়াই একেবারে আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, হুজুর ঘামছেন, আর মাস্টার ব'সে ব'সে দেখছ? পাখা! পাখা! ঐ যে পাখা।—বলিয়া পিছনে বেঞ্চির উপর পাখাটার দিকে ছুটিলেন এবং পাখাটা তুলিয়া লইয়া হুজুরের পিছনে দাঁড়াইয়া সজোরে পাখা চালাইতে লাগিলেন।

হুজুর একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, থাক না, দরকার নেই।

কিন্তু গাঙ্গুলী মশায় প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া পাখা করিতেই লাগিলেন। হুজুর চেয়ারের নীচে পা দুইটা চালাইয়া দিয়া, চেয়ারে ঠেস দিয়া, মুদ্রিত চক্ষে প্রশ্ন করিলেন, সে মেয়েটির বয়স কত?

গাঙ্গুলী মশায় জবাব দিলেন, আজ্ঞে, ভরা যৌবন, তার ওপরে—সুন্দরী।

হুজুর চোখ খুলিয়া কহিলেন, আমি গাঁয়ে প্রায় আসা-যাওয়া করছি জেনেও দারোগার কাছে গেল কেন?

আজ্ঞে, স্বভাব। তা ছাড়া মনু চক্রবর্ত্তীর কারসাজি, বোনকে মোছলমানের হাতে তুলে দিয়ে সব মেরে দেবার চেষ্টা।

হুজুর হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, চাবকাতে পারেন না? ডেকে পাঠান তাকে, আমি ঠিক ক'রে দিয়ে যাচ্ছি। নচ্ছার! হারামজাদা!

গাঙ্গুলী মশায় নিবেদন করিলেন, ডেকে পাঠিয়েছিলাম তাকে হুজুরের নাম ক'রে, তো বলেছে, আমার গরজ পড়ে নি, যার ইচ্ছে এসে দেখা করুক আমার সঙ্গে।

হুজুর রক্তচক্ষু হইয়া কহিলেন, তাই নাকি?

গাঙ্গুলী মশায় পাখা-সুদ্ধ দুই হাত যুক্ত করিয়া কহিলেন, হুজুর, ভারী বেড়েছে কিনা! বোনের পয়সায় নবাব ব'নে গেছে, লঘুগুরু জ্ঞান-গম্যি কিছু আর বাকি নেই।

হুজুর রোষে ফুলিয়া উঠিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আমিই যাব। আমার সামনে কি রকম মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে দেখব।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, আপনার সামনে দাঁড়াবার সাধ্য কি? দেখলেই পায়ের নীচে প'ড়ে পা চাটবে দেখবেন। তাই তো বলছিলাম সবাইকে, মামলা-মকদ্দমা, আইন-আদালত কিছুর দরকার নেই।

আমাদের হুজুর আসুন। উনি যদি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে একবার ব'লে দেন তো ঐ মনু চক্রবর্ত্তী আর তার বোন বুড়ীকে হাতে তুলে দিতে পথ পাবে না।

বাধা দিয়া হুজুর কহিলেন, বুড়ীকে নিয়ে কি করবেন আপনারা?

গাঙুলী মশায় জবাব দিলেন, হুজুর, বুড়ীর কি কম দুর্দ্দশা হচ্ছে! চোখে দেখতে পায় না, কানে শুনতে পায় না, একেবারে অথর্ব্ব। তা বউটা তাকে একবারও চোখ চেয়ে দেখে না, নিজের সাজগোজ, আমোদ-আহ্লাদ নিয়েই মেতে থাকে। তা ছাড়া যে বাড়িতে দিনরাত ঐ কুকুরে কীর্ত্তি, সেখানে হিন্দু বিধবার থাকা চলেও না।

হুজুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তা বটে। কিন্তু দারোগার আনাগোনাতে গাঁয়ের ছোকরারা আপত্তি করে না?

জিহ্বা ও তালু সহযোগে ক্ষোভসূচক শব্দ করিয়া গাঙুলী মশায় কহিলেন, ও কথা আর বলবেন না। গাঁয়ের ছোকরাগুলোকে সব ভেড়া বানিয়েছে। রাতদিন মাটি কামড়ে প'ড়ে আছে সব ওর বাড়িতে।

ওদের সঙ্গেও তা হ'লে—। বলিয়া হুজুর চক্ষের ইঙ্গিতে বক্তব্য জ্ঞাপন করিলেন।

গাঙুলী মশায় ঘাড় নাড়িয়া সহাস্যে কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হ'লে তো রেগুলার প্রষ্টিটিউট দেখছি।

গাঙুলী মশায় বুঝিতে পারিলেন না, কহিলেন, কি বললেন?

মানে, রীতিমত—বেশ্যা—

গাঙুলী মশায় সোৎসাহে কহিলেন, তারও বেহদ্দ। বলব কি হুজুর, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা ঠিক করেছি, বুড়ীকে বার ক'রে নিয়ে আসি। ওঁর ভাইও এই বিপদ শুনে এসে হাজির হয়েছেন। তাঁকে দিয়ে একটা খোরপোষের মামলা করিয়ে দিই। ওদিকে শুনছি প্রবোধ গাঙুলীর একজন ভাগনে আছে। তাকে সব জানিয়ে চিঠি লেখা হয়েছে। সে এসে পড়লে মেয়েটা যদি দারোগার সঙ্গে ভিড়েও যায় তো সম্পত্তিটা সব বেহাত হবে না।

হুজুর চিন্তিতমুখে কহিলেন, সম্পত্তি যদি মেয়েটির নামে থাকে, তা হ'লে?

গাঙ্গুলী মশায় মুদ্রিত চক্ষে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, আজ্ঞে, সব সম্পত্তি নেই। প্রবোধ গাঙ্গুলী যে সম্পত্তি স্বয়ং করেছিল, তা সব স্ত্রীর নামে। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি সব তার নিজের নামেই ছিল। সেও বিস্তর সম্পত্তি হুজুর।

হুজুর কহিলেন, সে ভদ্রলোককে খবর দেন নি?

আজ্ঞে দিয়েছি, এই এলেন ব'লে।

বলিতে বলিতেই ভদ্রলোক অর্থাৎ প্রবোধ গাঙ্গুলীর মাতুল, ঝাকড়দা স্কুলের ফিফ্‌থ মাস্টার অফিস-ঘরে প্রবেশ করিল। আজও পরিধানে থান-ধুতি, কোঁচাটা দু ভাঁজ করিয়া পেটের উপর গোঁজা, গায়ে কেটের কোট। ইহার মধ্যেই স্নানাহ্নিক সারিয়া তিলক-ফোঁটা কাটিয়াছে। রাধানাথ পরম আপ্যায়নের সহিত তাহাকে বেঞ্চির উপর বসাইয়া হুজুরের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিল। মাতুল হুজুরকে নমস্কার করিতেই, হুজুর মস্তকে মৃদু ঝাঁকানি দিয়া প্রতি-নমস্কারের ভঙ্গি করিলেন।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, আজ তা হ'লে চলুন, হুজুরকে নিয়ে আমরা যাই ওখানে। আপনার ভাগ্নে-বউকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে দিদিকে নিয়ে আসবেন।

মাতুল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি তো বলেছি, ও বাড়িতে পা দোব না। আপনারা হাতে এনে দিন, তারপর যা করতে হয় করব। রাধানাথের দিকে তাকাইয়া কহিল, কি বল রাধানাথ বাবাজী?

রাধানাথ সায় দিয়া কহিল, আজ্ঞে, তা বইকি। মামলা-মকদ্দমার সমস্ত ধকল আমরা পোয়াব, আনাআনির হাঙ্গামায় আমরা নেই।

গাঙ্গুলী মশায় রাধানাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন, তুমিও যাবে না নাকি? হুজুরের উদ্দেশে কহিলেন, শুনছেন হুজুর, আমাদেরই যেন গরজ!

হুজুর কহিলেন, আপনারা সব না গেলে আমি যাব না। আপনারা নিজেরা বোঝাতে পারছেন না, তাই আমাকে ধরেছেন। আপনাদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে, আমি যেতে রাজি হয়েছি, এর পর যদি আপনারা পেছপা হন, তা হ'লে আমি যাব কেন? আপনারা যা

পারেন নিজেরাই করবেন। তা ছাড়া, আমার এসব হাঙ্গামায় থাকা উচিত নয়, তবে নেহাত একটা কুৎসিত ব্যাপার হচ্ছে, সেটা বন্ধ করবার জন্যেই রাজি হয়েছিলুম, না হ'লে আমার কি?

গাঙ্গুলী মশায় রাধানাথের দিকে তাকাইয়া চোখের ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। রাধানাথ অবশেষে কহিল, তা হ'লে হুজুর, আমরা সকলেই যাব। ইনি বুড়োমানুষ, ইনি না হয় না গেলেন। আপনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিটমাট ক'রে দেবেন, তার চেয়ে সুবিধে আর কি আছে! আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, তুমিও যেও হে মাস্টার। কাজের বেলায় পালিও না যেন, আর হারাণ—

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, ওর পেটের অসুখ হয়েছে, গোষ্ঠ বলছিল। আমাকে কহিলেন, ভায়া, একবার খবর নিও দেখি। যদি ভাল থাকে, খাওয়া-দাওয়া না করুক, আমাদের সঙ্গে যেন যায়।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বৃষ্টি ছাড়িয়া গেল। পূর্ব্বাকাশে কৃষ্ণাভ ধূসর মেঘ ছড়াইয়া রহিল বটে, কিন্তু পশ্চিমাকাশ একেবারে নির্ম্মেঘ হইয়া গিয়া, অস্তোন্মুখ সূর্য্য ঝলমল করিয়া উঠিল। কাজেই গাঙ্গুলী মশায়ের আদেশমত হারাণের খবর লইবার জন্য তাহার বাড়ির দরজায় আসিয়া হাঁক দিলাম।

হারাণ সাড়া দিয়া কহিল, এস হে, নির্ভয়ে এস, বাড়িতে কেউ নেই। উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। প্রায় বিঘাখানেক জায়গা চারিদিকে উঁচু মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা, জায়গাটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা; উত্তর দিক ঘেঁষিয়া খানতিনেক উঁচু-দাওয়াওয়ালা-ঘর, দেওয়াল মাটির, ঘরের মেঝে, বারান্দার মেঝে ও সিঁড়ি ইট-সিমেন্ট দিয়া বাঁধানো। ডান দিকে রান্নাঘর, তাহারও দাওয়া বেশ উঁচু, উঠানের মাঝখানে চার-পাঁচটা বড় বড় ধানের মরাই। উঠানের দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব দিক ঘেঁষিয়া গোটা দুই প্রকাণ্ড খড়ের 'পালুই,' তাহার পাশেই গোয়াল। পশ্চিম দিকে কতকটা জায়গা বাঁশের কঞ্চি দিয়া ঘিরিয়া তরি-তরকারির বাগান। দেখিলেই মনে হয়, হারাণরা বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। হারাণ আমাকে ডাকিয়া কহিল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে? এস।—বলিয়া একটা মাদুর পাতিয়া

দিয়া নিজে মাটিতে বসিতে যাইতেই কহিলাম, ও কি হচ্ছে? মাটিতে কেন?

হারাণ কহিল, গিন্নীর হুকুম নেই, ম্লেচ্ছের বাড়িতে খেয়ে ম্লেচ্ছ হয়ে গেছি কিনা, তাই কোন জিনিস ছুঁতে দিচ্ছে না আমাকে।

টানিয়া মাদুরে বসাইয়া কহিলাম, ব'স তো এখন। গিন্নী কই?

হারাণ কহিল, ঘাটে গেছে।

তোমার ওপর বাড়ি আগলাবার ভার কেন? পদ্ম কোথায় গেল?

হারাণ সঙ্কোচে কহিল, রাগ ক'রে ঘর থেকে সকালে বেরিয়েছে, সারাদিন ঢোকে নি।

সবিস্ময়ে কহিলাম, সে কি?

হারাণ কহিল, সকালে ধুম ঝগড়া, এ মারে তো ও মারে। দুজনের কেউ তো কম যায় না!

কহিলাম, ঝগড়ার হেতু?

হেতু তেমন কিছু না, সকালে বউ আমাকে মরাইতলায় খেতে দিয়েছিল, তো পদ্ম তাই দেখে বললে, বউ, দাদা কি মুনিষ না মান্দের যে, মরাইতলায় খেতে দিয়েছ? বউ প্রথমে জবাব দিলে না। তবে পদ্ম তো চুপ ক'রে থাকবার মেয়ে নয় কিনা, আবার বললে, তোমার ভাইরা এলে যা ইচ্ছে ক'রো, আমার ভাইয়ের এমন হেনস্তা করলে সহ্যি করব না বলছি। এমনই দু-চার কথা। তারপরেই লেগে গেল চুলোচুলি, মারামারি, টেনে ছাড়ানো যায় না, আর ছাড়ানোও বিপদ। এই দেখ না, কামড়ে দিয়েছে বউ।—বলিয়া ডান বাহুতে দুই পাটি দাঁতের কামড়ের দাগ দেখাইল।

কহিলাম, ভাগনে বাড়িতে ছিল না?

কে, পকা? (অর্থাৎ প্রকাশ, হারাণের ভাগিনেয়) বাড়িতে ছিল না। কি কাজে এসে পড়ল তাই, না হ'লে একা সামলাতে পারতাম না।

হঠাৎ ভিজা কাপড়ের সপসপ শব্দ হইতেই হারাণ কহিল, বউ আসছে ভাই।—বলিয়া মাদুর ছাড়িয়া মেঝেতে বসিল। হারাণের বউ উঠানে পা দিয়াই আমাকে দেখিয়া ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া দিল। সে

পুকুরে গা ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া ফিরিয়াছে, কাঁধে লাল ডুরে গামছা। দ্রুতপদে রান্নাঘরে ঢুকিয়া বউ শিকলের ঝনঝন শব্দ করিতেই হারাণ কহিল, একবার উঠে চল ভাই, বউ কাপড় ছাড়বে। উঠিয়া উভয়েই উঠানের একপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলাম। হারাণের বউ শয়নকক্ষে ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িয়া, আধময়লা লালপাড় শাড়ি ও শেমিজ পরিয়া আবার রান্নাঘরে চলিয়া গেল। আমি ফিরিয়া আসিয়া মাদুরে বসিলাম ও হারাণ রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সবিনয়ে আর্জ্জি পেশ করিল, মাস্টারকে এক কাপ চা—

প্রশ্ন হইল, আর তোমাকে?

হরিাণ কহিল, আমার থাক, মাটির ভাঁড়ে খা সোঁদা গন্ধ, চা খাওয়া যায় না।

হারাণের জন্য মাটির ভাঁড়ের ব্যবস্থা হইয়াছে সম্ভবত। জবাব আসিল, যাকে তাকে কাপ-প্লেট দিতে পারব না, নতুন কিনে দিতে পার, দিচ্ছি।

হারাণ বিষণ্ণ-বদনে ফিরিয়া আসিতেই, কনেবউকে শুনাইয়া কহিলাম, ওহে! তুমি তো একা খাও নি, আমিও তো খেয়েছিলাম। জাত গেলে আমারও গেছে। আমাকেও ভাঁড়ে ক'রেই দিতে বল, কোন জবাব আসিল না।

কিছুক্ষণ পরে চা আসিল, আমার যথারীতি পেয়ালায় ও হারাণের জন্য মাটির ভাঁড়ে। কহিলাম, কতদিন শাস্তি চলবে?

অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে চাপা গলায় কনেবউ কহিল, যতদিন না প্রাচ্চিত্তির করে।

কহিলাম, কিন্তু এ লঘুপাপে গুরুদণ্ড হয়ে যাচ্ছে না? তা ছাড়া সব বাড়িতেই যদি এ রকম শুরু হয়ে যায়, তা হ'লে—

কনেবউ জবাব দিল, সে আমি কি জানি? আমার বাড়িতে অনাচার করলেই প্রাচ্চিত্তির করতে হবে, তাতে কারও না ভাল লাগে তো বাপের বাড়ি রেখে এলেই পারে।

হারাণ চোখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, চেপে যাও ভাই। যা আছে

অদৃষ্টে হবে। কনেবউ চলিয়া গেলে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ও বেলায় কি হ'ল ?

কহিলাম, আজ সন্ধ্যেবেলায় সব দল বেঁধে যাবে, স্বয়ং হুজুর দলের নেতা। আমারও যাবার হুকুম হয়েছে, আর তোমারও, অবশ্য পেটের অসুখ ভাল হয়ে থাকলে।

হারাণ কহিল, আমি আর সরজমিনে যাব না ভাই, এমনিই তো চ'টে আছে, তার ওপর আবার গেছি শুনলে আর আস্ত রাখবে না। ফিসফিস করিয়া কহিল, কি ফ্যাসাদ করেছি মাইরি আবার বিয়ে ক'রে, রান্নাঘরের দরজার আড়াল হইতে শাড়ির লালপাড় দেখা যাইতেই কহিলাম, চুপ, বউ শুনছে।

হারাণ মুখ ফ্যাকাশে করিয়া কহিল, তাই নাকি! সব সময়ে আড়ি পাতা অভ্যেস। মনে মনে কহিলাম, আমারটিরও; শুধু আমারটির কেন, বোধ করি মেয়েমানুষ-মাত্রেরই, স্বামীর সম্বন্ধে তাহাদের সন্দেহের সীমা নাই।

অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত মুখ-চোখ কুঁচকাইয়া হারাণ কহিল, এমন একটা শালী আছে জানলে মাইরি কোনও দিন বিয়ের নাম করতাম না।

সন্ধ্যাবেলায় স্কুলে আসিয়া দেখিলাম, সকলে জড়ো হইয়াছে। হুজুর স্কুলের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া, ও তাঁহাকে ঘিরিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ দল—গাঙুলী মশায়, রাধানাথ, দোলগোবিন্দ, পাড়ার আরও কয়েকজন লোক। গোষ্ঠ ডোম হুজুরের পিছনে দাঁড়াইয়া পাখা চালাইতেছে। হুজুর কহিলেন, আপনাদের মাতুল তা হ'লে সত্য সত্যই যাবেন না ?

রাধানাথ আগাইয়া আসিয়া কহিল, হুজুর, না। তা ছাড়া সময়ও নেই। সন্ধ্যে থেকে তো জপে বসেছেন, রাত্রি নটা পর্য্যন্ত চলবে। এ রকম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দেখা যায় না। একেবারে নিরামিষভোজী, মাছ পেঁয়াজ কিছু খান না, খান শুধু পাঁঠা, তাও মা কালীর পেসাদী হওয়া চাই। আজকের পাঁঠাটা, হুজুর, তাই মা কালীর সামনে বলি দিতে হ'ল। তা ছাড়া ওঁর জন্যে এসপেশাল ক'রে, পেঁয়াজ না দিয়ে সাত্ত্বিক মতে রান্না হচ্ছে।

হুজুর মুচকি হাসিয়া কহিলেন, তাই নাকি! ওর জন্তে গঙ্গাজল দিয়ে মাংস সেদ্ধ করছেন নাকি?

রাধানাথ রসিকতা না বুঝিয়া কহিল, না হুজুর। গঙ্গাজল এত কোথায় পাওয়া যাবে? তবে খেতে বসেন যখন, ইষ্ট-দেবতাকে নিবেদন করবেন, তখন গঙ্গাজলের ছিটে দেবেন ঠিক।

অন্ধকার একটু গাঢ় হইতেই সকলে বাহির হইল। সর্ব্বপ্রথমে লণ্ঠন হাতে গোষ্ঠ—তাহার পিছনে হুজুর, তারপরে পর-পর গাঙুলী মশায়, রাধানাথ, দোলগোবিন্দ ইত্যাদি, সর্ব্বশেষে আমি, তারপরে গ্রামের জনকয়েক ডানপিটে ছেলে; তাহাদের পিছনে নারী-বাহিনী অর্থাৎ ত্রিশ হইতে ষাট বৎসর বয়সের গ্রামের যতগুলি বিধবা, তাহাদের নেত্রী সৌদামিনী, সহনেত্রী পদ্ম, সকলের পিছনে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া হারাণ। পাশে পাশে যাইতে লাগিল, রংলাল, বৈকুণ্ঠ, হারু প্রভৃতি চৌকিদারেরা, প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া লণ্ঠন।

এই বিরাট বাহিনীর মস্তকদেশ প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ি সামনে পৌঁছিতেই, হুজুরের আদেশে গোষ্ঠ গেটের মধ্যে ঢুকিয়া দরজার কাছে যাইয়া হাঁকিতে লাগিল, চক্রবর্ত্তী মশায় রইছেন গো?

ভিতর হইতে সাড়া আসিল, কে?

আমি গোষ্ঠ, একবার বাইরে আসুন কিপ্পা ক'রে।

অচিরে মণীন্দ্র আসিয়া হাজির হইল; গোষ্ঠ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে কহিল, হুজুর আইছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্তে, দাঁড়িয়ে রইছেন বাইরে।

মণীন্দ্র আগ্রহান্বিত স্বরে কহিল, তাই নাকি!—বলিয়া ত্বরিতপদে একেবারে গেটের বাহিরে আসিয়া, হুজুরের সামনে প্রায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া নমস্কার করিয়া কহিল, আমাদের কত ভাগ্য! চলুন, বসবেন চলুন!—বলিয়া মুখের ইঙ্গিতে বৈঠকখানার বারান্দায় খান-দুই বেঞ্চিকে নির্দ্দেশ করিল।

হুজুর বুক চিতাইয়া কড়া গলায় কহিলেন, বসতে আসি নি, আপনাদের সঙ্গে একটু কথা বলবার আছে।

মণীন্দ্র হাতজোড় করিয়া কহিল, হুজুর, বলুন।

হুজুর ফটকের একটা থামের গোড়ায় বুট দিয়া ঠুকিতে ঠুকিতে কহিলেন, আপনারা প্রবোধ গাঙুলীর মাকে আটকে রেখেছেন কেন?

মণীন্দ্র পূর্ব্ববৎ পোজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, হুজুর, সে কি কথা! আটকে রাখবে আবার কে? রাখবার দরকারই বা কি? তাঁর নিজের বাড়িতে তিনি আছেন।

হুজুর বজ্র-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, তাঁর এখানে থাকার ইচ্ছে নেই, আপনারা জোর ক'রে তাঁকে আটকে রেখেছেন।

মণীন্দ্র কহিল, হুজুর, আপনি দয়া ক'রে ভেতরে গিয়ে বসবেন চলুন। প্রবোধের মাঠাকরুণ এখনও জেগে আছেন। আপনি নিজে তাঁকে সব জিজ্ঞাসা করুন। যদি তিনি বলেন, এখানে কষ্ট হচ্ছে, আর তিনি আপনাদের সঙ্গে যেতে চান তো এখনই তাঁকে আপনাদের সঙ্গেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি না যেতে চান, তাও নিজের কানে শুনে গাঁয়ের লোকদের বিদ্যে-সিদ্যে বুঝে নেবেন।—বলিয়া মণীন্দ্র গোষ্ঠকে কহিল, তিনুকে বলগে, বারান্দায় একটা শতরঞ্চি পেতে দিতে।—বলিয়া আবার যুক্তহস্ত হইয়া কহিল, হুজুর, আসুন তা হ'লে।

হুজুর গাঙুলী মশায় ও রাধানাথের দিকে তাকাইতেই তাহারা কহিল, তাই চলুন হুজুর। নিজের চোখে-কানে সব দেখে-শুনে যাবেন।

হুজুরের পিছু পিছু সকলে ভিড় করিয়া ঢুকিলাম।

ছেলেগুলাকে দেখিয়া রাধানাথ কহিল, হারামজাদা ছেলেগুলো সব জায়গাতেই আছে! সকলে উঠানে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের সকলকে দেখিয়া ফুন্টি রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, হাতে একটি লণ্ঠন, চোখে বিস্ময় ও আশঙ্কা। এদিকে লম্বা একটানা বারান্দায় তিনু ও গোষ্ঠ ধরাধরি করিয়া একটা বড় শতরঞ্চি পাতিতে লাগিল।

মণীন্দ্র ফুন্টিকে ডাক দিয়া কহিল, ঐ লণ্ঠনটা নিয়ে আয়। তোর পিসীমা কোথায়?

ফুন্টি আসিতে আসিতে জবাব দিল, আহ্নিক করছেন।

সমবেত জনতার মধ্যে একটা চাপা হাসির তরঙ্গ গড়াইয়া গেল।

কে কহিল, আসন নয়, আসনাই করছেন। কে কহিল, চপ-কাটলেট সাঁটছেন। কে প্রশ্ন করিল, চপ-কাটলেটও খায় নাকি ?

উত্তর হইল, খুব, খুব। দারোগাবাবুর খানসামা দিন একটা ক'রে মুরগীর ঠ্যাং বাড়িতে দিয়ে যায়।

মণীন্দ্র প্রবোধ গাঙুলীর মাকে হাতে ধরিয়া আনিয়া শতরঞ্জিতে বসাইয়া দিয়া যুক্তহস্তে হুজুরকে কহিল, হুজুর, এসে বসুন, যা জিজ্ঞেস করবার করুন।

হুজুর কহিলেন, আমরা বসব না, এমনই এখান থেকেই জিজ্ঞাসা করছি।—বলিয়া গাঙুলী মশায়কে কথা বলিতে আদেশ দিলেন।

গাঙুলী মশায় কতকটা আগাইয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, খুড়ী, কেমন আছ ?

বৃদ্ধা কম্পিত স্বরে টানিয়া টানিয়া কহিল, কে তুমি ?

আমি পরাণ।

বৃদ্ধা পুলকিতা হইয়া কহিলেন, ও! পরাণ! আয় বাবা, ব'স। আসিস না কেন আজকাল ?

গাঙুলী মশায় প্রশ্নের জবাব না দিয়া কহিলেন, ভাই এসেছে যে তোমার।

বৃদ্ধা আগ্রহের সহিত কহিল, কে, অনুকূল ? কই ?

আসে নি এখানে; রাধানাথের বাড়িতে উঠেছে।

বৃদ্ধা বিস্ময় ও ক্ষোভের সহিত কহিল, সে কি! আমি এখনও বেঁচে আছি। আর অনুকূল কোথায় রাধানাথের বাড়িতে উঠেছে! কই, অনুকূলকে ডেকে দে দেখি, এত বয়েসেও বুদ্ধি-শুদ্ধি হয় নি ওর।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, এ বাড়িতে পা দেবেন না বলেছেন।

বৃদ্ধা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, প্রবোধ আমার নেই ব'লে বুঝি আসতে চাইছে না ? অশ্রুজড়িত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, কি করবি বল ? ভগবানের মার, মাথা পেতে নিতেই হবে। না হ'লে এমন ছেলে হারিয়ে মাকে বেঁচে থাকতে হয় ? তবু তো হতভাগী আমি বেঁচে রয়েছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি; মরণ হচ্ছে কই বল ? বলিতে বলিতে ভাবলেশ-হীন দৃষ্টিহারা চক্ষু দুইটি হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আঁচলে

মুছিয়া কহিল, অনুকূলকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে পাঠিয়ে দিগে। আর বাঁচব না বেশিদিন, শেষদেখা দেখে যাক।

গাঙ্গুলী মশায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন।

হুজুর কহিলেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওসব কি শুনছেন? যা বলতে এসেছেন, ব'লে দিন না।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, ওজন্যে নয় খুড়ী। তোমার বাড়িতে ম্লেচ্ছ-কীর্ত্তি হচ্ছে কিনা, তাই আসবে না বলেছে।

সবিস্ময়ে বৃদ্ধা কহিলেন, আমার বাড়িতে ম্লেচ্ছকীর্ত্তি! স্বয়ং জনার্দ্দন এসে বললে যে, বিশ্বাস করব না পরাণ। আমার বউমা থাকতে সে হবার উপায় নেই। দেখেছ তো আমার বউমাকে, যৌবনে যোগিনী সেজেছে, একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করে; কত বলি, বউমা, একটু জল খাও, শোনে না।

আবার হাসির তরঙ্গ উঠিল।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, তুমি জান না খুড়ী, দেখতে তো কিছু পাও না। তোমার বউ যা-তা করতে আরম্ভ করেছে। মোছলমান দারোগার বাড়িতে আনাগোনা করে, তাকে এনে বাড়িতে বসিয়ে খাওয়ায়, আরও যা যা করে, তা আর মুখে বলা যায় না।

সহসা পাশের ঘর হইতে সরোজিনী বাহির হইয়া দৃঢ়চরণে ঋজু-ভঙ্গিতে সকলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পরনে গরদের থান, গায়ে শুধু শেমিজ, মাথায় এলোচুল হইতে অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে, মুখে বিস্ময় ও বিরক্তি; মণীন্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিল, কি ব্যাপার?

মণীন্দ্র কহিল, গাঁয়ের সব মাতব্বররা এসেছেন তোমার কাছে, আর এসেছেন আমাদের হুজুর।

কপাল কুঁচকাইয়া সরোজিনী কহিল, কে?

মণীন্দ্র কহিল, আমাদের এ তল্লাটের ছোট হাকিম।

সরোজিনী তাচ্ছিল্যের সহিত হুজুরের দিকে একবার কটাক্ষক্ষেপ করিয়া কহিল, কি জন্যে এসেছে সব?

হুজুর গরম হইয়া কহিলেন, আপনি যে হিন্দুঘরের বিধবা হয়ে

সমাজের বুকে ব'সে যা ইচ্ছে তাই করছেন, তারই কৈফিয়ৎ নিতে এসেছি আমরা।

সরোজিনী মণীন্দ্রর দিকে চাহিয়াই ভারী গলায় কহিল, ব'লে দাও, কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই আমরা।

অপমানে মুখ কালো করিয়া হজুর গাঙ্গুলী মশায়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, তবে আর কি, ফিরে চলুন। ভাল কথায়—

বলিতে না বলিতে রাধানাথ আগাইয়া গিয়া কহিল, নিশ্চয় বাধ্য। সমাজে বাস ক'রে যা-তা করতে পার না তুমি।

সরোজিনী রাধানাথের দিকে তাকাইয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, কি করেছি আমি?

রাধানাথ কহিল, দারোগার সঙ্গে থানায় গিয়ে দেখা করেছ।

সরোজিনী দুই চোখ ডাগর করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, দারোগার কাছে গিছলাম আমি একা? রাধানাথ ঠাকুরপো! মিথ্যে কথা ব'লো না, এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উঠছে।

রাধানাথ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, উঠছেই তো। কিসের মিথ্যে!

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, রাধানাথ, তুমি থাম, আমি বলছি। তারপর আগাইয়া গিয়া কহিলেন, দারোগাকে ঘরে বসিয়ে তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া স্ফূর্ত্তি-আমোদ কর নি তুমি?

রাগে সরোজিনীর মুখ আগুনের মত লাল টকটকে হইয়া উঠিল; কিন্তু কিছু জবাব দিল না।

রাধানাথ কহিল, গাঁয়ের জোয়ান ছেলেগুলোকে বাড়িতে জড়ো ক'রে তাদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছ না তুমি?

সরোজিনী জলন্ত চোখে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, তোমরা মিথ্যেবাদী।

রাধানাথ ভড়কাইয়া গিয়া কহিল, মিথ্যেবাদী বইকি? নিজে যা-তা ক'রে—

পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, বেশ্যার আবার তেজ!

হঠাৎ সরোজিনী চীৎকার করিয়া উঠিল, কি, আমি বেশ্যা? আমার বাড়িতে এসে আমাকে অপমান? আমার স্বামী নেই ব'লে কি এমনই নেমে গেছি যে, পথের কুকুর এসে আমাকে লাথি মারবে? তীক্ষ্ণকণ্ঠে

শাশুড়ীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মা, শুনছেন কি বলছে? আমি বেশ্যা! হঠাৎ ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া, 'ও মা গো' বলিয়া, ভাল ভাল যাত্রা-থিয়েটারে নায়িকাদের যেমন ভাবে পতন ও মূর্চ্ছা হয়, ঠিক তেমনই কায়দায়, অতি সুনিপুণভাবে সরোজিনী শতরঞ্চির উপর ধড়াস করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল।

মণীন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল, ওরে, আমাদের কি হ'ল রে! সবাই মিলে বোনকে আমার মেরে দিলে রে! সঙ্গে সঙ্গে ফুচি মিহি গলায় তান ধরিল, পিসীমার কি হ'ল গো!

শাশুড়ী স্খলিতকণ্ঠে 'অ বউমা, কি হ'ল গো' বলিতে বলিতে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সরোজিনীর দিকে যাইতে শুরু করিলেন। বেগতিক দেখিয়া হুজুর দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেই কহিলাম, চ'লে যাচ্ছেন যে?

হুজুর ত্রস্তকণ্ঠে কহিলেন, আরে মশায়, এমন সীন করবে জানলে কে আসত! সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! একটা চৌকিদারকে ডেকে দিন দেখি!—বলিয়া ডাকার অপেক্ষা না করিয়াই দরজার দিকে ছুটিলেন। চৌকিদাররা ব্যাপার দেখিয়া আগেই সরিয়া পড়িয়াছিল। শুধু গোষ্ঠ পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল এবং এখন সুযোগ বুঝিয়া পলাইতে-ছিল; তাহাকে ডাকিয়া হুজুরের চার্জ বুঝাইয়া দিলাম। রাধানাথ, পাঙুলী মশায়, দোলগোবিন্দ 'হুজুর চ'লে গেলেন যে, হুজুর চ'লে গেলেন যে' বলিতে বলিতে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই তিমুদ দল তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। রাধানাথ তাহাদের একজনকে একটা চড় কষাইবার চেষ্টা করিতেই সেই ছেলেটি রাধানাথের হাতের পাঞ্জা ধরিয়া এমনই মুচড়াইয়া দিল যে, রাধানাথ 'উহু, ছাড়, ছাড়' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দোলগোবিন্দ উত্তেজনায় বুকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া কাসিতে শুরু করিল। বিধবারা ও ছেলেগুলো সরোজিনীর মূর্চ্ছিত দেহের কাছে ভিড় করিল। হঠাৎ 'কি হ'ল গো' বলিয়া মিণ্টা এবং 'কি হ'ল হে, অ্যা' বলিয়া তাহার বাপ বীরু আচাযিয় ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল। মিণ্টা সটান সরোজিনীর কাছে চলিয়া গেল, বীরু আচাযিয় ব্যূহ-মধ্যস্থ রথীদের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

উপরে এতগুলি ব্যাপার বর্ণনা করিতে এত সময় লাগিল বটে, কিন্তু ঘটিতে তাহাদের দু-তিন মিনিটের বেশি সময় লাগিল না। আমি সমস্ত ব্যাপারটা একবার দেখিয়া লইয়া সরোজিনীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। সরোজিনী নিস্পন্দ, অচেতন ভাবে পড়িয়া আছে; পায়ের কাছে বসিয়া ফুন্টি হাউহাউ করিয়া কাঁদিতেছে; মাথার কাছে উবু হইয়া বসিয়া মণীন্দ্র মুখের মধ্যে আঙুল চালাইয়া দাঁত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, তিনু মাথায় জল ঢালিতেছে ও তিনুর পাশে দাঁড়াইয়া মিন্টা পাখা করিতেছে। হঠাৎ হিন্দুস্থানী মোটা গলায় 'কি হুয়েছে' বলিয়া বোধ হয় লছমন সিং প্রবেশ করিল। তারপর দারোগাবাবুর গলা শুনিলাম, ঘর চড়াও ক'রে মারধর করতে এসেছেন সব! বুড়ো বয়সে ৪৪৮ ধারায় কেসে পড়লেন শেষে! ওখানে কি ব্যাপার?

মণীন্দ্র দাঁত ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে হেঁড়ে গলায় কাঁদিয়া উঠিল, দারোগাবাবু, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

কি হয়েছে? খুন-জখম কিছু হয়েছে নাকি, অ্যাঁ?—বলিতে বলিতে দারোগাবাবু ছুটিয়া আসিলেন। সকলে পাশ কাটিয়া রাস্তা করিয়া দিল। দারোগাবাবু কাছে আসিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিলেন, ম'রে গেছেন?

মেয়েদের মধ্যে কে বলিল, মরে নি বাছা, উতলা হ'য়ো না, মুচ্ছো গেছে।

দারোগাবাবু আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, ও মূর্চ্ছা! ভাঙে নি? একবার ডাক্তারবাবুকে কেউ ডেকে আনুক। কড়া গলায় ভিড়ের উদ্দেশে কহিলেন, এখানে কেউ ভিড় ক'রো না। ধমক দিয়া কহিলেন, যাও। কেউ এখানে থাকতে পাবে না।—বলিয়া দুই পা আগাইয়া যাইতেই ছেলেগুলা ছুটিয়া পলাইল ও বিধবারা গজগজ করিতে করিতে সরিয়া দাঁড়াইল। দারোগাবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কে ডাক্তারবাবুকে ডাকিতে গেল?

ফুন্টি নাকিসুরে কাঁদিতে কাঁদিতে মিন্টা ও তিনকড়ির দিকে তাকাইয়া ... ; তিনুর উদ্দেশে ভীরুকণ্ঠে কহিল, আপনি যান না তিনু দাদা। ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনুনগে, মিন্টা দিদি জল দিচ্ছে।

দারোগাবাবু কহিলেন, ওর মাথাটা মাটিতে পড়াচ্ছে, কেউ কোলে তুলে নিলেই পারেন।

হঠাৎ পাশে গুঁতা খাইয়া দেখিলাম, হারাণ ঠেলাঠেলি করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া কহিল, যাব?

সকলকে শুনাইয়া কহিলাম, যাও না হারাণ, কোলে নিয়ে ব'স; তোমার তো ছোট শালী—নিজের বোনের মত।

মণীন্দ্র না বসিতে বসিতেই, হারাণ ঝপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া সরোজিনীর মাথাটা কোলে তুলিয়া লইল এবং লইতেই সরোজিনী সম্বিৎ লাভ করিয়া, দুই কনুয়ের উপর ভর দিয়া মাথা তুলিয়া, হারাণের মুখের দিকে দুই বিহ্বল-চোখ মেলিয়া কহিল, কে, জামাইবাবু? তারপর হারাণের কোলে মাথা গুঁজিয়া দুই বাহু দিয়া হারাণের কোমর জড়াইয়া ধরিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কোথায় ছিলেন? সাহেব নিয়ে সব মারতে এসেছিল আমাকে।—বলিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল, গোবর-গণেশের মত ব'সে থেকো না হারু, দাঁতটা ছাড়াও।

দারোগাবাবু কহিলেন, তিনকড়িবাবু এত দেরি করছেন! আচ্ছা, আমি ওদিকটা একবার দেখি, যা-তা আরম্ভ করেছে সব। একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

পলাতক

তাহারা আসিতেছিল।

রেঙ্গুন হইতে প্রোম, প্রোম হইতে পোড়াং, তারপর সেখান হইতে একশো কুড়ি মাইল অতি দুর্গম পাহাড়ের পথ পার হইয়া চট্টগ্রামের অভিমুখে।

১৯৪২ সালের ২৩এ জানুয়ারি। ব্রহ্মদেশে তখন বসন্ত আসিয়াছে। পাহাড়ে পাহাড়ে ফুল ফুটিতেছে অজস্র। সোনার মন্দির সোয়েডাগন প্যাগোডার ধ্যানী বুদ্ধের সামনে ধূপদানিতে সুগন্ধি ধূপ পুড়িতেছে। পথ বাহিয়া ফুলের মত সুন্দরী মেয়েদের শোভাযাত্রা।

প্রতিবার তো এমন করিয়াই বসন্ত আসে। কিন্তু এবার সে আসিল রূপ বদলাইয়া। আকাশের নির্মেঘ নীলিমা বিমানধ্বংসী কামানের ধোঁয়ায় কালো হইয়া গেল। বাতাসে বনফুলের মদিরতা নয়—মাস্টার্ড-গ্যাসের তীব্র ঝাঁজ কি ভাসিয়া বেড়াইতেছে! আগুনে-বোমা হইতে উঠিতেছে পোড়া রবারের মতো একটা বিকট দুর্গন্ধ। একটা পলাতক ভয়ার্ত্ত জন্তুর মতই যেন বসন্ত আসিয়া স্লিট-ট্রেঞ্চে আশ্রয় লইয়াছে।

বন্দরের পাশেই আরমান স্ট্রীট। তেইশে জানুয়ারির সুপ্রভাতে জাপানী বিমান আসিয়া বোমার বিস্ফোরণে নববসন্তকে অভিনন্দিত করিয়া গেল। এবং তারপর—

তাহারা পলাইতেছিল।

প্রোমে বসিয়াছে সরকারী ক্যাম্প। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ী পথে যাহাতে মানুষের অস্বাভাবিক ভিড় না জমিয়া যায়, সেইটা নিয়ন্ত্রিত করিবার

জন্যই। কিন্তু বন্যার জলকে বালির বাঁধ দিয়া ঠেকাইবার চেষ্টার মতই দাঁড়াইয়াছে ব্যাপারটা। এক-একদল করিয়া বাহির হইবার ছাড়পত্র পায় তো অবশিষ্ট সহস্র সহস্র কণ্ঠে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধ্বনিত হইয়া উঠে।

অবশ্য বিক্ষুব্ধ হইবার কথাই।

ক্যাম্পে যাহারা আটক পড়িয়াছে, কলেরা শুরু হইয়াছে তাহাদের মধ্যে। কথা নাই, বার্ত্তা নাই—বারকয়েক ভেদবমি করিয়াই এক-একজন চোখ উল্টাইয়া পড়িতেছে, আর সরকারী লোক আসিয়া তাহাদের কোন্ দিকে যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা ভগবানই জানেন। অন্তত যাহারা যাইতেছে, তাহারা আর ফিরিতেছে না।

তবু যেমন করিয়া হোক, ফেরী স্টীমারে ইরাবতী পাড়ি দিয়া তাহারা আসিয়া পোড়াঙে পৌঁছিয়াছে, এবং তারপরেই আরাকানের পথ ধরিয়া বহু দুঃখের যাত্রা শুরু হইয়াছে তাহাদের।

পথ—পথ—পথ। এ যেন আর কখনও ফুরাইবে না। আরাকানের দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়া, উটের পিঠের মত বন্ধুর ও অসমতল চড়াই-উতরাই ডিঙাইয়া তাহারা চলিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া এক-একবার ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিগুলি মাথার উপর দিয়া বুলাইয়া লইতেছে—কোন্ সময় বা সূর্য্যোদয়ের দেশ হইতে "মিৎসুবিশি" বিমান আসিয়া গোটা-কয়েক বোমা বর্ষণ করিয়া যায়।

পথ, কিন্তু পথ বলিতে কি ইহাই? সম্মুখে পিছনে যতদূরে তাকানো যায়, অপরিচ্ছন্ন জঙ্গল আর উদ্ধত মাথা তুলিয়া পাহাড়ের শ্রেণী; সংকীর্ণ পথের গা ঘেঁষিয়া অতলস্পর্শ গভীর খাদ হাঁ-হাঁ করিতেছে, শ্যাওলায় পা পিছলাইয়া একবার পড়িলেই নিশ্চিতভাবে পাতালে টানিয়া

লইয়া যাইবে—এতটুকু আৰ্ত্তনাদও বাহিরের আলো-বাতাসে ভাসিয়া আসিবে না হয়তো।

কষ্ট হয় বুড়া আব্বাসেরই সব-চাইতে বেশি।

দিগন্তকে আবৃত করিয়া পাহাড়ের পর পাহাড় যেন প্রতিরোধের তৰ্জ্জনী তুলিয়া আছে। সেদিকে চাহিলে এতটুকু আশা করিবার থাকে না। একশো কুড়ি মাইল ডিঙাইয়া টাঙ্গাপে পৌঁছিতে হইবে; কিন্তু আজ পরম দুঃসময়ে এই পথটা যেন অনন্ত পৰ্য্যন্তই প্রসারিত হইয়া গিয়াছে।

আব্বাসের কণ্ঠস্বর অনেকটা যেন আৰ্ত্তনাদের মতই শোনায়।

একে বয়স হইয়াছে, তাহার উপর একখানা পাকে টানিয়া টানিয়া হাঁটিতে হয়। কোন্ একটা কারখানার দান। ছোটবেলায় কবে মুখের একটা দিক পুড়িয়া গিয়াছিল, খানিকটা কালো মাংস সেখানে যেন শিক-কাবাবের মত জমিয়া আছে। সে মুখে যখন যন্ত্রণার চিহ্ন দেখা দেয়, তখন সেটাকে রীতিমত পৈশাচিক বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলে, আল্লা!

আল্লা! তীক্ষ্ণ রূঢ়কণ্ঠে কালু মিঞা কথাটার প্রতিধ্বনি করে। দলের মধ্যে তাহার একটু বিশেষত্ব আছে। জোয়ান বয়স, হয়তো সেইজন্যই নিজের ভাবনাটাকে তেমন করিয়া আমল দেয় না সে। কিন্তু পঙ্গু ওই সহযাত্রীর দল—বিশেষ করিয়া আসন্নপ্রসবা ওই মাদ্রাজী মেয়েটির দিকে চাহিলে সে যেন মাথা ঠিক রাখিতে পারে না।

চলিতে চলিতে আব্বাস বিড়বিড় করে, এখন মরলেই বেঁচে যেতাম।

কিন্তু মরিতে যে আদৌ চায় না—এ তো চোখের সামনেই দেখা

যায়। খোঁড়া পাটা লইয়া বার বার পিছাইয়া পড়ে, তবু প্রাণপণে দলের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে চেষ্টা করে। খানিকদূর আসিয়া ধপ করিয়া একটা ঢিবির উপর বসিয়া পড়ে, তারপর জিব বাহির করিয়া শুরু করে হাঁপাইতে।

সঙ্গীরা খুশি হয় তা নয়। এই অক্ষম বুড়াটাকে পথের মধ্যে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিলেই অনেকে স্বস্তি বোধ করে যেন।

মজিদের বিরক্তিটা আর কোনক্রমেই গোপন থাকে না।

কালু মিঞা কিন্তু রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠে। ডক-কুলিদের কি একটা ইউনিয়নে সে ছোটখাটো পাণ্ডাই ছিল বলিতে হইবে। হয়তো সেই কারণেই মানুষের জীবন সম্বন্ধে ধারণাটা তাহার কিছু পরিমাণে বদলাইয়া গিয়াছে।

রূঢ় চট্টগ্রামী ভাষায় ধমক দিয়া বলে, মানুষ না তোমরা সব? খালি নিজের প্রাণটা বাঁচাবার জন্যেই ব্যস্ত?

তিরস্কারটা কঠিন। কিন্তু এ সত্যটা কে না জানে যে, নিজের প্রাণটা বাঁচাইয়া রাখার চাইতে বড় কাজ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই! নিঃস্বার্থতা শব্দটা শুনিতে চমৎকার, কিন্তু জীবন লইয়াই যেখানে প্রশ্ন, সেখানে ওটা চিরকাল নীতি-পাঠের রাজত্বেই বিরাজ করে মাত্র।

মজিদ বলে, সে তো ঠিক। কিন্তু এমন ক'রে হাঁটলে কাউকেই বাঁচতে হবে না। তা ছাড়া—। হাত বাড়াইয়া সে নির্দ্দেশ করে মাদ্রাজী মেয়েটির দিকে।—ওর অবস্থা তো দেখছ?

না দেখিবার মত নয়। মাতৃত্বের আশীর্ব্বাদ যে কত বড় অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে সময়বিশেষে, কাঞ্চীই তাহার প্রমাণ। ইচ্ছা করিয়া কিনা কে জানে—মাদ্রাজী কুলীর দল তাহাকে পিছে ফেলিয়া গিয়াছে। সেই হইতেই সে সঙ্গ ধরিয়াছে ইহাদের।

এক মুহূর্ত ভাবিয়াই কালু মিঞা কর্তব্যটা স্থির করিয়া ফেলে। চট করিয়া সে সামনে ঝুঁকিয়া পড়ে, তারপর পরক্ষণেই আব্বাসকে তুলিয়া লয় সোজা কাঁধের উপর। নিবিড় জঙ্গলের ছায়ায় আরাকান রোডের আঁকাবাঁকা সরীসৃপগতিকে অনুসরণ করিয়া সে আগাইয়া চলে, এক মুহূর্তে সে একটা আসুরিক শক্তি লাভ করিয়াছে যেন। সঙ্গীরা একবার এ ওর মুখের দিকে তাকায় মাত্র।

আরাকান রোড।

ইতিহাসের জরাজীর্ণ পাতায় সন্ধান করিলে আজও খুঁজিয়া পাওয়া যায় ইহার বিবর্ণ স্বাক্ষর। জরাগ্রস্ত সম্রাট শাজাহানের পঙ্গুশিথিল মুষ্টি হইতে 'দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা'র রাজদণ্ড যখন স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, সেদিনকার সেই ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত কাহিনী। রাজমহলের বিলাস-দুর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া বিশখালির নদীর ধারে, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে সুজাবাদের কেল্লায় শ্বাপদের মত লুকাইয়া থাকিয়া, অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় বাংলার নবাব শা-সুজা এই পথ ধরিয়াই আরাকানে পলাইয়া গিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতকের হাতে নিজেকে সমর্পণ করিয়া সপরিবারে তিনি আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার অশ্রুচিহ্ন আজও বিস্মৃতির পারে মিলাইয়া যায় নাই।

আজ আবার সেই পথ দিয়াই ইহারা পলাইতেছে। হয়তো এমনই করিয়াই ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে নিজেকে। অথবা ইহাই হয়তো মহাকালের পরিহাস।

রেঙ্গুনে যখন ছিল, স্বাতন্ত্র্যের সীমা ছিল না। সাম্প্রদায়িকতার বিষ হিংসার নীল ফেনা বাহিয়া ইহাদের মধ্যে যে ফুঁসিয়া না উঠিয়াছিল

তাও নয়। কিন্তু দুঃখের এই পরম মুহূর্তে হিন্দুস্থানের দিবাস্বপ্ন আর পাকিস্তানের আকাশ-কুসুম খানিকটা অলীক ধোঁয়ার মতই মিলাইয়া গিয়াছে শূন্য দিগন্তে। সমস্ত সংস্কারকে ছাড়াইয়া কোথা হইতে নিত্য-কালের অখণ্ড মানুষটি আসিয়া আজ ইহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে।

সন্ধ্যা নামিতেছে। পাহাড়ের মাথায় মাথায় রক্তের মত প্রগাঢ় সূর্য্যের আলো। এলোমেলো জঙ্গল যেন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল লইয়া দিকে দিকে উঁকি মারিতেছে কালো কালো বিকটমূর্তি রাক্ষসের মত। যেন সন্ধ্যার অন্ধকার আরও একটু ঘন হইয়া আসিলে একেবারে ইহাদের ঘাড়ের উপরেই ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

সামনে অচেনা দীর্ঘ পথ। বাঁকের পর বাঁক রচিয়া চলিয়াছে তো চলিয়াছেই। কবে যে শেষ হইবে, কে জানে! কখনও কখনও এমনও সংশয় জাগে যে, ইহা কোন দিন আর ফুরাইবে না—মহাপ্রলয়ের দিনটি পর্য্যন্ত অশ্রান্তভাবে চলিয়া সোজা নামিয়া যাইবে মহাপ্রস্থানের পাতাল-গর্ভে।

কিন্তু থামিতে হইল। পথের শেষ না থাক, মানুষের ক্লান্তি আছে। উপত্যকার এক পাশে একটা শালবনের মধ্যে ইহারা ডেরা বাঁধিল রাত্রির মত। সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, তাই দিয়াই পোডাং হইতে চাল, ডাল, চিঁড়া কিনিয়া আনিতে হইয়াছে। এক টাকা করিয়া পড়িয়াছে চালের সের, তাহাও ফুরাইয়া আসিল প্রায়। দলসুদ্ধ সকলে যদি একবেলা করিয়া খায়, তাহা হইলে টাজাপ পর্য্যন্ত কোন রকমে কুলাইতে পারে হয়তো।

শুকনা ডালপাতা সংগ্রহ করিয়া ছোট একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালাইয়া লইতে হইল। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের অভাব নাই কোনখানে। জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে আশামুগ্ধ হইয়া ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে তাহারা। কান পাতিয়া থাকিলে ঝরা পাতার উপর হয়তো শোনা যায় তাহাদের লুব্ধ পদধ্বনি।

আজ প্রায় পঞ্চাশ মাইল ধরিয়া তাহাদের বিনা জলেই কাটিতেছে এক রকম। এই পথের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এই যে, এতটা সুদীর্ঘ পথ ধরিয়া কোনখানে একবিন্দু তৃষ্ণার জল পাইবার জো নাই। পাষাণ প্রকৃতি নির্ম্মম কঠিনতায় যেন মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এই রূঢ়তার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া অর্দ্ধ-উলঙ্গ যে নাগাজাতি বাস করে, তাহাদের কাছ হইতেও এতটুকু সহানুভূতি মেলে না। এক ঘটি জল চাহিলে তীর-ধনুক বাগাইয়া নাগারা তাড়া করিয়া আসে।

দিন-দুই আগে পাহাড়ের মধ্যে হঠাৎ একটা কর্দ্দমাক্ত ঝরনার সন্ধান মিলিয়াছিল। টাঙ্গাপ হইতে আসিবার সময় যে গোটা-তিনেক মাটির ভাঁড়ে জল সঞ্চয় করিয়া আনা হইয়াছিল, সেগুলি আবার নূতন করিয়া ভরিয়া লওয়া হইয়াছে। পালা করিয়া সকলে এই জলের ভার বহন করে। অপচয় করিবার উপায় নাই, ক্ষুধা পাইলে চিঁড়া আর কাঁচা চালই চিবাইতে হয়, রান্না করা চলে না।

মজিদ জলের কলসীগুলির দিকে তাকাইল।—এও ফুরিয়ে এসেছে।

কালু জবাব দিল, তা তো দেখছিই।

কিন্তু এর পরে কি হবে? যা জল ছিল, তাতে আমাদের তো টাঙ্গাপ পর্য্যন্ত কুলিয়ে যেত, কিন্তু—

দ্বিতীয় 'কিন্তু'টার মানে অত্যন্ত সহজ। এতদিন তো তাহারা চলিয়া যাইত নিশ্চয়ই। কিন্তু বুড়া আব্বাস আর কাঞ্চীর উপসর্গ তো কালু মিঞাই জুটাইয়া লইয়াছে।

আগে তো ফুরোক, তারপর সে ভাবনা ভাবা যাবে।

হুঁ। মজিদ চুপ করিয়া রহিল। দুইটা পরস্পরবিপরীতমুখী মন

লইয়া কখনই তর্ক চলিতে পারে না। অথচ যেমন করিয়া হউক, ইহার একটা প্রতিবিধান করিতে হইবে।

আব্বাস এক পাশে পড়িয়া গোঙাইতেছে—লোকটার খোঁড়া পায়ে কি একটা ঘটিয়াছে যেন। কাঞ্চী একটু দূরে একটা গাছে ঠেসান দিয়া পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া আছে নীরবে। তরুণী, কিন্তু মান্দ্রাজী মেয়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য আর কুলিজীবন তাহার চেহারায় এতটুকু শ্রীছন্দ রাখিয়া দেয় নাই। বাঙালী কিংবা আর কোনও জাতের মেয়ে হইলে এ পথ বাহিয়া এ ভাবে আসিতে পারিত কি না সন্দেহ।

তাহার ভাঙা ভাঙা হিন্দী চট্টগ্রামী মুসলমানেরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, সেও যে তাহাদের কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারে এমন নয়। তবু বাধ্য হইয়া ইহাদের সঙ্গ তাহাকে লইতে হইয়াছে, কোন্ ঘাটে গিয়া যে ভিড়িবে, তাহাও অনুমান করার জো নাই।

সামনে শুকনা ডালপাতার আগুন জ্বলিতেছে দপদপ করিয়া, আর তাহার লাল আলোটা থাকিয়া থাকিয়া নাচিতেছে গর্ভকাতর কাঞ্চীর পীড়িত মুখের উপর। পেটে একটু একটু ব্যথা উঠিতেছে যেন। দাঁতে দাঁত চাপিয়া কাঞ্চী পাথরের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

পাহাড়ের গায়ে কালো রাত্রি ঘন হইয়া নামিতেছে। আকাশে চাঁদের একটা বাঁকা রেখা শালবনের ওপারে অস্তে নামিয়া গেল। আব্বাস গোঙাইতেছে।

কিছু চাল আর চিঁড়া একত্রে গো-গ্রাসে গিলিয়া লইয়াছে সকলে। সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পরে যে যেখানে পারিয়াছে, লম্বা হইয়া অঘোরে নিদ্রায় মগ্ন। রহমনের নাক ঘড়ঘড় করিয়া ডাকিতেছে, যেন বাড়িতে নরম গদির উপরে শুইয়া গভীর আরামে ঘুমাইতেছে সে। তাহার নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তি দেখিলে ঈর্ষা হয়।

কালু মিঞা স্তব্ধ চোখে আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারার অজস্রতায় কোনখানে এতটুকু ফাঁক নাই। উপরের এত আলোর দিকে চাহিয়া নীচের অন্ধকারপুঞ্জকে একান্তই অর্থহীন বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

কিন্তু তারার সঙ্কেত তো চিরদিন স্পর্শের বাহিরেই রহিয়া যায়। অন্ধকারটাই বুঝি একমাত্র সত্য। নিষ্প্রদীপ নগরীর মৃত্যুমগ্ন আতঙ্ককে চিরিয়া ফাড়িয়া বোমারু বিমানের আবির্ভাব ঘটে। শিসের মত তীক্ষ্ণ-শব্দ করিয়া বোমা নামিয়া আসে—আগুন, এক্সপ্লোশন, গ্যাস। বাজ-পাখির মত ছোঁ মারিয়া এক ঝাঁকে মেশিনগানের গুলিবৃষ্টি করিয়া যায়। সামাদ মিঞার কথা মনে পড়িতেছে। গ্যাসে পুড়িয়া লোকটার সর্ব্বাঙ্গে টেনিস বলের মত বড় বড় ফোসকা পড়িয়াছিল এক-একটা।

যুদ্ধ! আপনা হইতেই কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল যেন। এ বর্ব্বরতার শেষ হইবে কবে, কে জানে! পৃথিবীর প্রথম দিনটি হইতে যে ইতিহাসের ধারা বহিয়া আসিতেছে, তাহার স্রোতটাকে উল্টা মুখে ঘুরাইয়া দিতে না পারিলে আর ইহার অবসান হইবে না।

মজিদ জাগিয়া এখনও। প্রশ্ন করিল, ঘুমোও নি কালু ভাই?

না।

ফস করিয়া মজিদের দীর্ঘশ্বাস পড়িল একটা। তাই তো, ঘুম আর কেমন ক'রে আসবে! যে সর্ব্বনাশের দিন—সর্ব্বনাশ!

অন্ধকারের মধ্যে কালু মিঞার মুখ দেখা গেল না। আমাদের সর্ব্বনাশ আর কি হবে? সর্ব্বনাশ তাদেরই—এতকাল ধ'রে যারা মানুষের রক্ত শুষে খেয়েছে।

মজিদ বুঝিতে পারিল না। বলিল, কি বলছ?

কিছু না।

আবার মজিদের দীর্ঘশ্বাস পড়িল, তোমার বিয়ে হয়েছে কালু ভাই?

না, সময় পাই নি।

তা বুঝতে পেরেছি।—মজিদের কণ্ঠস্বর গভীর হইয়া আসিল, সেই-জন্যেই নিজের প্রাণটার কোনও দাম নেই তোমার কাছে। কিন্তু আমার ছেলে আছে, মেয়ে আছে, আমি মরলে তারা না খেয়ে মরবে।

কোথায় আছে তারা?

চুনতি। চুনতি জান? হার্ব্বাঙের কাছে। চৌধুরীদের প্রজা আমরা। যেন ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে সে, তোমার বাড়ি কোথায়?

জানি না।

বিস্ময়ে মজিদ স্তব্ধ হইয়া গেল, জান না?

কেমন ক'রে জানব? ছোটবেলায় বাপ-মা ম'রে গেছে, কারখানার আওতায় বেড়ে উঠেছি। দেশ-গাঁয়ের খবর কেউ কখনও দেয় নি।

ওঃ, তাই। মজিদ চুপ করিয়া গেল। এতক্ষণে স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে ব্যাপারটা, এইজন্যই লোকটা এমন নিরঙ্কুশ। নাঃ, ইহার সংস্রবটা ছাড়িতেই হইল।

দূর হইতে বোধ হয় গাড়িই আসিতেছে একটা। পাহাড়ের অসমতল পথে খড়খড় খটখট করিয়া উঠিতেছে একটা রূঢ় কর্কশ শব্দ। ধোঁয়ায় জড়িত মিটমিটে ল্যাম্পটার তির্য্যক রশ্মি শ্যাওলা-পড়া পাথরের উপরে চিকচিক করিতেছে। নিশ্চয়ই কোনও বড়লোক। যথেষ্ট টাকা না থাকিলে গাড়ি ভাড়া করিয়া এ পথ দিয়া যাওয়ার সামর্থ্য নাই কাহারও।

সহসা মজিদ যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে।

দিব্যি গড়গড়িয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছে ব্যাটারা!—কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা প্রকাশ পাইল তাহার, আর রাস্তার ধারে আমরা না খেয়ে মরছি।

পাহাড়ী পথে দুলকি চালে টলিতে টলিতে গাড়িটা দেখা দিল। মগ-গাড়োয়ান আয়েশ করিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছে। বিড়ির জোনাকি-স্ফুলিঙ্গে তাহার মুখ দেখা যায় না, কিন্তু কঠিন অবয়বটার যেন আভাস পাওয়া যায়।

কালু হাসিল, আর বেশিক্ষণ গড়গড়িয়ে যেতে হবে না। আরও একটু এগিয়ে ওই গাড়োয়ানই হয়তো মেরে-ধ'রে সব কেড়ে নেবে।

মজিদ চাপা গলায় বলিল, তাই নেওয়া উচিত।

রাত্রি বাড়িতেছে। জঙ্গলের ওপারে বহুদূরে কোথায় বাঘ ডাকিতেছে—পাহাড়ের গায়ে গায়ে গমগম করিতেছে তাহার প্রতিধ্বনি। ও না হয় দূরেই ডাকিতেছে, কিন্তু আশপাশের অরণ্যের মধ্যে আর কেহই যে ওত পাতিয়া বসিয়া নাই, এমন আশ্বাস কে দিবে? আরাকান হিল্‌সের রহস্যাবৃত কত গুহার অন্ধকারে বসিয়া যে মৃত্যু তাহার অস্ত্র শানাইতেছে, পরিপূর্ণ দিনের আলোকেও তো তাহা নিশ্চয় করিয়া জানিবার জো নাই।

কালু উঠিয়া আসিয়া আগুনের কুণ্ডটায় কতকগুলি ডালপালা চাপাইয়া দিল।

বাতাসে একটা জান্তব গন্ধ। অদূরেই কোথায় যেন মাংস পচিতেছে। যাত্রীর ভিড় ক্রমশ বাড়িতেছে, বাড়িতেছেই। ইহার আগে যে দলটা এ পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদেরই কাহারও মড়া গলিতেছে সম্ভবত। সরকার হইতে কি একটা 'রিলিফে'র বন্দোবস্ত হওয়ার কথা, কিন্তু এখনও তো তাহার কিছুই হয় নাই। পথে আসিতে আসিতে

দশ-পনরোটা শবদেহ তাহাদের চোখে পড়িয়াছে। অনশন ও পিপাসার সঙ্গে সঙ্গে হাত মিলাইয়া চলিতেছে কলেরা।

মানুষ, আকাশ-বাতাস, এই পাহাড়, বনের জীবজন্তু, রোগ, পীড়া—ইহারা সবাই একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াছে যেন। একের পর এক থাবা গাড়িয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, হত্যা করা ছাড়া কাহারও যেন আর কোন সংকল্প নাই। এখানে ওখানে তীব্রস্বরে ঝিঁঝি ডাকিতেছে। মনে হইতেছে, কাহারা যেন সম্মুখে পশ্চাতে ছন্দোবদ্ধ একটানা স্বরে মারণ-মন্ত্র জপ করিয়া চলিয়াছে।

চুনতি। পাহাড়ের কোলে ছায়াছবির মত এক খণ্ড গ্রাম। দূর হইতে রৌদ্রের আলোয় চৌধুরীদের সাদা বাড়িটা দেখা যায়, কাঁচের সাশিগুলি হীরার মত ঝকমক করে। স্ত্রী পুত্র কন্যা, ভালবাসায় গড়া ছোট একটি সংসার। মজিদের চোখ ভরিয়া ঘুম জড়াইতে লাগিল।

বোমা! বোমা পড়ছে! পালাও, বোমা!

একটা আর্ত্ত চীৎকারে চারিদিকের পাহাড়গুলি চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। এতক্ষণ নিশ্চিন্ত আরামেই বোধ হয় ঘুমাইয়া ছিল, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে রহমন দাঁড়াইয়াছে সটান খাড়া হইয়া। আগুনের অস্পষ্ট আলোতেও দেখা যায়, তাহার ভীত চোখ দুইটা যেন কোটরের মধ্য হইতে বাহিরে ছুটিয়া পড়িতেছে; মাথার চুলগুলি সজারুর কাঁটার মত তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া উঠিয়াছে, অমানুষিক উত্তেজনায় সর্ব্বাঙ্গ বাঁশ-পাতার মতো কাঁপিতেছে থরথর করিয়া।

মজিদ তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া সজোরে নাড়া দিতে লাগিল, রহমন, রহমন!

রহমন শুনিতেই পাইল না।—ওই, ওই আসছে! বোমা, আগুন! আল্লা, মালিক!

পরক্ষণেই মৃগীরোগীর মত সোজা সে মাটিতে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেল। কশ বাহিয়া তখন তাহার গ্যাঁজলা গ্যাঁজলা ফেনা নামিতেছে। চাপা দাঁতের মধ্য দিয়া অস্ফুটভাবে কাকী গোঙাইতেছে। বাতাসে উগ্রতর হইয়া উঠিতেছে পচা মাংসের বীভৎস গন্ধটা।

কতকগুলি মানুষের গুঞ্জনে আব্বাসের তন্দ্রা টুটিয়া গেল।

পায়ের যন্ত্রণায় ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে নাই, পেটে অসহ্য ক্ষুধার আগুন। সন্ধ্যার সময়ে ভাগে যে যৎসামান্য খাদ্য জুটিয়াছিল, দুঃসহ পথশ্রমে বহুক্ষণ আগেই তাহা হজম হইয়া গিয়াছে। ঠিক তন্দ্রাও নয়, অনেকটা আফিংখোরের মতই ঝিমাইতেছিল সে।

চেতনাটা ভাল করিয়া সজাগ হইতেই সে দেখিল, একটু দূরেই শেষরাত্রির জ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বল পাহাড়ের পথ বাহিয়া কাহারা সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। পরক্ষণেই মনে হইল, বাগানটা যেন একেবারে ফাঁকা।

তবে কি মজিদের দল তাহাকে পিছে ফেলিয়াই চলিয়া গেল?

ভয়ে এবং উৎকণ্ঠায় শুকাইয়া উঠিল একেবারে বুক পর্য্যন্ত। ক্ষীণ একটা আর্তনাদ বাহির হইল কি হইল না। সে অক্ষম; সে বৃদ্ধ। এইভাবে উহারা তাহাকে একা ফেলিয়া গেলে পথের মধ্যেই পড়িয়া মরিবে যে। বাঘে খাওয়াও নেহাত আশ্চর্য্য নয়।

আব্বাসের সমস্ত চিন্তায় যেন প্রলয় শুরু হইয়া গেল। খোঁড়া পা-খানাকে টানিয়া টানিয়া ওই দলটার অভিমুখেই ছুটিয়া চলিল সে। মজিদের দলই বটে।

যা হোক, তবু সে ইহাদের ধরিয়া ফেলিয়াছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে রুদ্ধস্বরে বলিল, বাঃ, আমাকে ফেলে যাচ্ছ যে?

অস্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় মজিদের সমস্ত মুখ ভরিয়া হিংসা ফুটিয়া উঠিল। দুই হাতের মুষ্টি মুহূর্ত্তের মধ্যে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থায় কি করিতে হইবে, বহুপূর্ব্ব হইতেই সেটা তাহার নির্দ্ধারিত আছে।

এক মুহূর্ত্ত সে দ্বিধা করিল কি করিল না, পরক্ষণেই বাঘের মত থাবা দিয়া আব্বাসের ঘাড়টা ধরিয়া পাঁচ-সাত হাত দূরে ঠেলিয়া দিল তাহাকে।

আব্বাস চীৎকার করিবার একটা চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা হইতে তাহার স্বর বাহির হইল না। শ্যাওলা-পড়া পিছল পাহাড়ী পথের পাশে যেখানে তিন হাজার ফুট গভীর খাদ যুগ-যুগান্তের ক্ষুধায় আকাশের দিকে হাঁ করিয়া আছে, সেইই আদর করিয়া টানিয়া লইল বুড়া আব্বাসকে। অতল-অন্ধকারের গভীরতা ঠেলিয়া শব্দের ক্ষীণতম একটা তরঙ্গও বাহিরের ঈথারে এতটুকু দোলা জাগাইতে পারিল না।

প্রকাণ্ড একটা উতরাই বাহিয়া মজিদের দল নিঃশব্দে তিরোহিত হইয়া গেল।

নিশ্চিন্তে ঘুমাইবার জো নাই। ভোর হইতে না হইতেই আবার যাত্রা শুরু করিতে হইবে। দৈনন্দিন সংস্কার আবছায়া অন্ধকার থাকিতে না থাকিতেই তুলিয়া দিল কালু মিঞাকে।

তুলিয়া দিল বটে, কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া চোখকে যেন বিশ্বাস হইল না। আগুনটা কখন নিবিয়া গিয়াছে, শুধু বাতাসে খানিকটা ছাই উড়িয়া বেড়াইতেছে। শালবনের মধ্যে সে ছাড়া আর কেহই নাই, এমন কি বুড়া আব্বাস পর্য্যন্ত নয়। এত তাড়াতাড়ি তাহারা পলাইয়াছে যে, যাওয়ার সময় আব্বাস তাহার লাঠিগাছা অবধি সঙ্গে লইতে পারে নাই। সে কি এতটাই বেশি খাইত?

তৎক্ষণাৎ মনে হইল, মানুষকে বিশ্বাস করিবার মূল্য কতটুকু। কাহার ভাল করিবার স্পর্দ্ধা সে রাখে? এই চরম দুঃসময়েও জল আর শুকনা চালের হিসাব ছাড়া বৃহত্তর পৃথিবীর কোনও রূপই যাহারা দেখিতে পাইল না, সকলের সঙ্গে কেমন করিয়া এক হইয়া তাহারা দাবি-দাওয়া বুঝিয়া লইবে? জন্ম আর জীবনের অর্থটাকে যাহারা সংকীর্ণ স্বার্থ ছাড়া আর কোনও আলোতেই ব্যাখ্যা করিতে পারে না, চাকার নীচে তাহারা আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়াই গুঁড়া হইয়া চলিকে যে।

কিন্তু—

একটা অদ্ভুত শব্দে কালু মিঞার চটকা ভাঙিয়া গেল। না, সে তো একা নয়। ওই তো একটা গাছের তলায় কাঞ্চী উবু হইয়া পড়িয়া, আর, আর, তাহার পায়ের কাছে ওটা কি নড়িতেছে!

নক্ষত্রবেগে কালু আগাইয়া গেল সেদিকে।

কাঞ্চীর সর্ব্বাঙ্গে রক্ত; মাটিতেও রক্ত ও সদ্যোমাতৃত্বের কতকগুলি আনুষঙ্গিক চাপ বাঁধিয়া আছে। আর শুষ্ক অস্ফুট গলায় ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিতেছে রক্ত-ক্লেদে মাখা সদ্যোজাত একটি শিশু।

কালু ডাকিল, কাঞ্চী!

কাঞ্চী সাড়া দিল না, নড়িল না পর্য্যন্ত। হয়তো অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। গায়ে একবার হাত ছোঁয়াইয়াই সে পিছাইয়া আসিল। কাঞ্চীর সর্ব্বাঙ্গ শক্ত আর শীতল হইয়া আসিতেছে। বেশিক্ষণ আগে হয়তো মরে নাই। পথ-শ্রান্তির গভীর তন্দ্রায় সে আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, টের পায় নাই। পাইলে হয়তো এমনটা ঘটিত না।

বাষ্পে চোখ ঝাপসা হইয়া আসে, তবু ইহারই মধ্যে সে দেখিল,

অদূরে একটা ঝোপের আড়াল হইতে ডোরা-কাটা একটা প্রকাণ্ড হায়েনা নাক বাহির করিয়া বাতাস শুঁকিতেছে। শিশুর কান্না আর রক্তের গন্ধই তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে নিশ্চয়।

পরক্ষণেই নত হইয়া কালু মিঞা অপরিচ্ছন্ন শিশুটিকে দুই হাতে ধরিয়া অতি সাবধানে তুলিয়া আনিল। তারপর গায়ের কাপড় দিয়া বেশ করিয়া তাহাকে জড়াইয়া লইয়া পাহাড়ের পথে অত্যন্ত দ্রুতবেগে আগাইয়া চলিল সে। সময় নাই, সময় নাই। যদি সামনে কোথাও হঠাৎ একখানা গ্রাম জুটিয়া যায়, একটু দুধ যদি মেলে, তাহা হইলে ইহাকে বাঁচানো হয়তো অসম্ভব নয়। একটি শিশুর জীবন, কে জানে, সমস্ত কৌলীন্যবর্জ্জিত ভবিষ্যৎ পৃথিবীর একজন যুগপ্রবর্ত্তক কি না!

দূরে পাহাড়ের মাথায় রক্তের রং ধরিল। সূর্য্য উঠিতেছে। সামনে আরাকান রোড সরীসৃপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া কোন্ অলক্ষ্য দিগন্তে বহিয়া গিয়াছে, কে জানে!

এই পথ দিয়াই বাংলার নবাব শা-সুজা পালাইয়াছিলেন, আজ আবার পালাইতেছে ইহারাও। কিন্তু ইতিহাস কি কেবলই পুনরাবৃত্তি করিবে নিজেকে? নূতন করিয়া তাহার রচনা হইবে না কোনও দিন? এই পলাতকের স্রোত কি সেদিন দিগ্বিজয়ী সেনার রূপ ধরিয়া মুক্ত তরবারির ফলকে মিথ্যাবাদী ইতিহাসের ধারাটাকে বিপরীত মুখেই ফিরাইয়া লইয়া যাইবে না?

সম্মুখে সূর্য্য উঠিল।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পাকিস্থানী স্কিম

পাকিস্থানী স্কিম যে ভাল
বুঝতে নারি আভাসে,
শুধু জানি, কতক মানুষ
চায় যেতে সেই আবাসে।
কিন্তু ভেবে হই যে সারা,
দেবদারু নিম কদম-চারা
কে রবে ভাই পাকিস্থানেই,
এমন নসিব কার হবে,
জুঁই চামেলি পদ্ম গোলাপ
কে যাবে আর কে রবে?
উড়িয়ে দিয়ে সব কোকিল—
পাকিস্থানেই পাঠিয়ে দিলে
উঠবে নেচে হয়তো দিল,
ছোট্ট কথা কিন্তু মোর—
'বাদুড়' 'বায়স' কোথায় রবে,
কোথায় বা 'বক' 'শামুক-খোর'?
টিয়া তোতা বুলবুলি,
শ্যামা দোয়েল চুলবুলি,
কোন্ ঠাঁয়ে নীড় বাঁধবে গিয়ে,
কোন্ পাখিরা বাদ যাবে,
'চড়াই' এতই বড়াই করে
কোন্‌খানে সে ঠাঁই পাবে?

এসব কথা নাই ধরি,
চাঁদকে ফুটা ক'রে কি হায়,
সুধা তাহার ভাগ করি—
পাঠিয়ে দেবে 'পাক'সেপুর,
তারার আলোয় চেরাগ জ্বালি
ভাগাভাগি করবে নূর ?
'ষণ্ড' 'পাঁঠা' 'গাড়োল'দের—
কোন্‌খানেতে হবে যে ঠাঁই
বুঝতে নারি, 'গ্রহের ফের'।
বুদ্ধিও যে মাথায় নাই,
বুঝতে নারি, এমনতর
পাকিস্থানী স্কিম যে তাই।

"কুমারভট্ট"

দেহবাদ

যুগে যুগে মানুষের স্মৃতি বহিয়া আনিছে কোন্ বাণী,
থামে সুর থামিলেই গীতি—প্রাণ রয়, ক্ষয় দেহখানি।
তত্ত্ব কথা সবি আছে জানা তবু দেহে আঁকড়িয়া ধরি।
দিব্যদৃষ্টি পায় যদি কানা, সহসা কি ছাড়ে তার নড়ি ?

সন্দেহ

এ বিশ্বের খেলাঘরে হ'ল বহু ভাঙাগড়া খেলা,
এবার ভাঙন দেখে মনে হয়, খেলা বুঝি শেষ ;
লণ্ডভণ্ড হাঁড়িকুড়ি পুতুল ভাঙিয়া হ'ল ঢেলা,
বিয়ে ক'রে শ্বশ্রূগৃহে এবার কি যাবে পরমেশ ?

টকিতে খুকী

প্রথম পর্ব্ব

টকি হাউস। শো শুরু হইয়া গিয়াছে। জনৈক মহিলা তাঁহার আট-নয় বছরের একটি কন্যাসহ প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া অনেক ফিসফিসানি ও হাঁটু অতিক্রম-পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিলেন। বালিকাটির হাতে লজেঞ্চুসের একটি ছোট ঠোঙা।

পর্দ্দায় চিরকুমার নায়কের বসিবার ঘর দেখা যাইতেছে। ঘরটি ষ্টুডিওর উদ্ভাবন। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধবর্গ-মাইল; মেঝেটি পাথরের। কয়েকটি ফোয়ারা ও "পাম"গাছের একটি ছোটখাট জঙ্গল কক্ষটিতে বিদ্যমান।

চিত্রের লম্পট নায়ক তাহার ভৃত্যকে বলিতেছে, "শোন, আজ রাতে মিস হোড় ছাড়া আর কেউ এলে ব'লে দিবি যে, আমি বাড়ি নেই।" ভৃত্য প্রস্থান করিলে সম্মুখস্থ টেবিল হইতে মদের গ্লাস তুলিয়া তাহার তলদেশে নায়ক মিস হোড়ের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইল এবং গান আরম্ভ করিল, "পেয়ালা, মোর পেয়ালা।"

অষ্ট বছরের খুকীটি প্রশ্ন করিল, ও কি খাচ্ছে মা ?

মা উত্তর দিলেন, শরবৎ।

প্রশ্ন। শরবৎ বুঝি কালো হয় ?

উত্তর। লাল শরবৎ ফোটোতে কালো দেখায় খুকু।

[একটু পরে]

প্র। আচ্ছা মা, মিস হোড় ছাড়া ও আর কারও সঙ্গে দেখা করবে না ?

উ। না।

প্র। কেন মা ?

উ। সে তুমি বুঝবে না।

[খানিকক্ষণ পরে]

প্র। মেয়েটার বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে? চোখ দিয়ে কত জল পড়ছে মা, দেখ।

উ। আঃ, চুপ।

প্র। বাবুটির হাতের নখে ও চুমো খাচ্ছে কেন মা?

উ। (রূঢ়ভাবে) ও রকম কড়মড় ক'রে যদি তুমি লেবেনচুষ চিবোও তো তোমাকে বার ক'রে দেবে।

নায়ক (নায়িকার প্রতি) "বাস্তবিক তোমাকে দেখলে, তোমার মুখ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় গীতা। বিশ্বাস করছ না আমার কথা?"

প্র। ওর চোখ কি জ্বালা করছে মা?

উ। স্—স্—স্।

প্র। চোখে কিছু পড়েছে বুঝি?

উ। চুপ কর। বলছে যে, মেয়েটিকে দেখে ও খুব খুশি হয়েছে।

প্র। কেন? ও, বুঝেছি, মেয়েটা বুঝি ওর চোখ থেকে ময়লা বার ক'রে দেবে।

উ। বললাম তো, ওর চোখে কিছু পড়ে নি।

প্র। তবে চোখ জুড়োবে বলছে কেন?

উ। ওটা হচ্ছে কথা বলবার কায়দা।

প্র। কায়দা কি মা?

উ। মানে—মানে হচ্ছে যে, সত্যিই যদি ওর চোখে কিছু হয়, তা হ'লে ঐ মেয়েটি তা ভাল ক'রে দিতে পারবে।

প্র। ও নার্স নাকি মা?

উ। না না, ওকে দেখলেই ওর চোখ সেরে যেত।

প্র। কিন্তু মা, মেয়েটা যে অত ঝকঝকে সব গয়না পরেছে, তা দেখে বাবুটির চোখ আরও জ্বালা করত না?

উ। উঃ, তুমি ভয়ানক অসভ্য মেয়ে!

প্র। মা, ধর যদি ওর চোখে—

উ। (রাগতভাবে) দেখ, আবার যদি তুমি ঐ রকম ফোঁস-ফোঁস ক'রে সামনের বুড়ো বাবুটির ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেল তো উনি পেছন ফিরে তোমাকে এখুনি এক চড় কষিয়ে দেবেন, আর তা হ'লে আমি খুব খুশি হই।

নায়িকা—"ও, তুমি মনে করেছ যে, তুমি ইচ্ছে করলেই অর্থ দিয়ে আমাকে সামান্য একটা—একটা ইয়ের মত কিনে নিতে পার?" (ক্রন্দন)

প্র। একটা "কিয়ের" মত মা?

উ। সে তুমি বুঝবে না।

প্র। লেবেনচুষের মত বুঝি?

উ। (বিরক্ত হইয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ।

প্র। ঐ মেয়েটা লেবেনচুষের মত কেন মা?

উ। (ছবি দেখিতে দেখিতে তন্ময় চিত্তে) লেবেনচুষের মত নয়।

প্র। এই যে বললে?

উ। না, বলি নি। আমি বলছিলাম—। আঃ, শোন না কি বলছে!

প্র। ইয়ের মত বললে কেন মা? ওর পার্ট ভুলে যায় নি তো? আমাদের ইস্কুলে প্রাইজের দিন একটা মেয়ে তার পার্ট ভুলে—

উ। হাঁসাস নি বাপু (হাসিয়া ফেলিলেন)। মেয়েটা একটা বিচ্ছিরি কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারছে না।

প্র। কি কথা মা?

উ। কি জানি! আমি জানি না।

প্র। তা হ'লে কি ক'রে বুঝলে যে কথাটা বিচ্ছিরি?

উ। মানে—আমি—

প্র। (সেই একঘেয়েভাবে) কি ক'রে বুঝলে মা যে, কথাটা—

উ। (দাঁতে দাঁত চাপিয়া) ফের যদি আমার কোলে তুমি থুতুসুদ্ধ লেবেনচুষ ফেলো তো কান ছিঁড়ে দোব।

নায়িকা (আবেগভরে) "তুমি আমাকে চরম দুর্গতির হাত থেকে বাঁচিয়েছ বিজয়দা। সে অবস্থার চেয়ে মৃত্যুও ভাল।"

প্র। ও কি বলছে মা?

উ। স্—স্—স্।

প্র। কার চেয়ে মৃত্যু ভাল মা?

উ। (সরোষে) তুমি চুপ করবে কি না?

প্র। ওঃ, বাবুটি ওকে মারত বুঝি মা? আচ্ছা মা, ঐ বাবুটি যদি তোমার কাছে আসত, তা হ'লে তুমি কি ওর নখে—

উ। চুপ, নচ্ছার মেয়ে।

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক পিছন ফিরিয়া দেখিলেন।

[কিছুক্ষণ পরে]

প্র। আচ্ছা মা, মরার চেয়েও খারাপ জিনিসের থেকে বাবুটি ওকে বাঁচিয়েছেন, তবু ও অত গোমড়া মুখ ক'রে ব'সে আছে কেন?

উ। ও মোটেই মুখ গোমড়া ক'রে নেই। ও এখন একটা ব্যথা চাপবার চেষ্টা করছে।

প্র। ওর কোথায় ব্যথা করছে মা?

উ। আঃ, চুপ কর খুকী।

প্র। আচ্ছা, ওর যদি এখন কোথাও একটা ব্যথা হয়, সেটা কি ম'রে যাওয়ার—

সশব্দে মুখ হইতে লজেঞ্চুস পড়িয়া গেল

উ। আবার মেঝেতে লেবেনচুষ ফেলেছ! ফের যদি ফেলো তো তক্ষুনি তোমাকে নিয়ে বাড়ি চ'লে যাব।

নায়ক—(একটি পককেশা বৃদ্ধার কাঁধে মাথা রাখিয়া) "মাগো আমার, এ সব-ই তো তোমার জন্তে, মা।"

প্র। বাবুটি ঐ বুড়ীকে 'মাগো আমার' ব'লে ডাকছে কেন মা?

উ। (আবিষ্টভাবে)—ও যে ওর মাকে বড় ভালবাসে, মণি।

প্র। আমি যদি তোমাকে 'মাগো আমার' ব'লে ডাকি, তা হ'লে তোমার ভাল লাগবে, মা?

উ। (তত আবিষ্টভাবে নয়), তুমি আমাকে শুধু 'মা' ব'লেই ডেকো।

প্র। তা হ'লে 'মাগো আমার' ব'লে ডাকতে দেবে না তো?

উ। না।

প্র। কেন মা?

উ। আমরা তো আর সিনেমার লোক নই।

প্র। আচ্ছা মা, ধর, যদি বাবা একদিন রামধারীকে বলেন যে তিনি কেবল বীণা-মাসী ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা করবেন না—

উ। কি?

প্র। ধর, বাবা যদি ওরকম বলেন; আর তুমি যদি বল যে, বাবা তোমার সঙ্গে একটা ইয়ের মত—

উ। কিসের মত?

প্র। সেই যে মা, সেই বিচ্ছিরি কথাটা—তুমি জান, কিন্তু আমাকে বললে না। আচ্ছা, তখন আমাকে 'মাগো আমার' ব'লে ডাকতে দেবে তো?

উ। যেমনই অসভ্য, তেমনই হাড়জ্বালানি আর পাকা মেয়ে হয়েছিস।

প্র। আর আমি ওরকম কথা বলব না, মাগো আমার।

উ। চুপ করলি, লক্ষ্মীছাড়ি?

প্র। হ্যাঁ, মাগো আ—। না না, শুধু মা। এইবার, এইবার!

উ। কি হ'ল রে?

প্র। ছবি শেষ হয়েছে। এবার "মিকি মাউস" দেখানো হবে; "মিকি মাউস", "মিকি মাউস"।

উ। বাব্বা, বাঁচা গেল।

মাতা খুকীর হাতের ঠোঙা হইতে একটা লজেঞ্চুস লইয়া মুখে পুরিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

পূর্ব্ব-বর্ণিত দৃশ্য। এবার খুকীটির হস্তে লজেঞ্চুসের ঠোঙার বদলে একটি বোতল। শার্লি টেম্পল ও রিন-টিন-টিন দেখিতে পাইবে আশায় আসিয়াছিল; কিন্তু মিস কায়াকে পর্দায় দেখিয়া তাহার মেজাজ অন্তরূপ হইয়া গিয়াছে এবং সে একবর্ণও বুঝিতে পারিতেছে না।

প্র। 'মা, মেয়েটা ওরকম মুখ করছে কেন?

উ। স্-স্-স্।

প্র। দেখ না মা।

উ। আঃ, বোতলের লেবেনচুষগুলো অমন ঝনঝন ক'রে বাজিও না, ঠিক ক'রে ধ'রে থাক।

প্র। ঐ দেখ মা, আবার এসেছে। ওরকম কেন করছে মা?

উ। ও একজন বন্ধুর জন্তে ব'সে আছে।

প্র। বন্ধুর জন্তে ব'সে থাকলেই ওরকম মুখ করতে হয় নাকি মা? কুশনগুলোতে সেণ্ট ছিটোচ্ছে কেন?

উ। তার আমি কি জানি?

প্র। নিজের গায়েও তো দিচ্ছে! ওর গায়ে বোটকা গন্ধ হয়েছে নাকি মা?

উ। আঃ, জালিও না।

প্র। তা হ'লে সারা গায়ে সেণ্ট ঢালছে কেন মা?

উ। সেই বন্ধুটি আসবে ব'লে।

প্র। সেণ্ট লাগালেই বুঝি বন্ধুটি ওকে খুব ভাল বলবে মা?

উ। হ্যা হ্যা।

প্র। কি ক'রে জানলে?

উ। জানি না যা।

প্র। কি ক'রে জানলে মা যে, ওর গায়ে গন্ধ—

উ। আঃ, চুপ ক'রে ছবি দেখ।

ইতিমধ্যে নায়ক আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই নায়িকা ছুটিয়া তাহার কাছে গেল এবং বলিতে লাগিল, "এসেছ নগেন, এসেছ।···জানি তুমি আসবেই···তুমি কত-ও-ও-ও বড়, আর আমি কত-ও-ও-ও ছোট— কত্ত-ও-ও-ও অসহায়, এইজন্তেই তো এত ভাল লাগে তোমাকে নগেন। (দীর্ঘাকৃতি নায়কের ভুঁড়ির উপর বেঁটে নায়িকা মাথা রাখিল।)

প্র। আচ্ছা মা, বাবুটি অত-ও-ও বড় ব'লেই বুঝি মেয়েটার অত ভাল লাগে বাবুটিকে ?

উ। বাবুটি ওকে নিরাপদে রাখতে চায়, তাই।

প্র। কেন, ওকে কেউ মারবে নাকি ?

উ। না, ওকে অনেকের কাছ থেকে দূরে রাখতে চায়।

প্র। কেউ ওকে মারবে বুঝি ?

উ। না না, ও সকলের কাছে খুব খারাপ ব্যবহার পেয়েছে, সেইজন্তে ওকে দূরে রাখবে।

প্র। তা হ'লে অত হীরের গয়না ও কোত্থেকে পেলে মা ?

উ। আহা, টাকা-পয়সার কথা নয়।

প্র। তা হ'লে কিসের কথা বলছ ?

উ। বলছি যে, ওর দুঃখ কেউ বুঝল না।

প্র। সেইজন্তেই বুঝি ও অত রোগা আর ছোট ?

উ। হ্যাঁ বাপু, হ্যাঁ।

প্র। যদি ও অতই দুর্ব্বল, তবে কি ক'রে ঐ বাবুটির কাঁধ ধ'রে দোল খাচ্ছে ?

উ। চুপ কর খুকী।

প্র। বাবুটি যদি ওর চেয়ে জোয়ান হয়, তা হ'লে ওকে থামাচ্ছে না কেন ?

উ। ওরা দুজনে দুজনকে খুব ভালবাসে কিনা, তাই।

প্র। তাই ওরকম ঝুলছে?

উ। আবার বোতল নাড়াচ্ছ? চুপ ক'রে ব'স।

প্র। বাবুটির এরকম ভাল লাগছে?

উ। আমি জানি না।

প্র। তুমিও বাবার কাঁধ ধ'রে ওরকম দোল খাও নাকি মা?

উ। মোটেই না।

প্র। তা হ'লে বাবাকে বুঝি তুমি ভালবাস না?

উ। দুটো মোটেই এক কথা নয়।

প্র। আচ্ছা, তুমি যদি একদিন বাবার কাঁধ ধ'রে—

উ। চুপ।

প্র। আর ধর, যদি—

উ। ছি ছি, কি ইল্লুতে, মাগো! মুখ থেকে লেবেনচুষগুলো আবার বার করছিস কেন?

প্র। সেই কালো ডোরাগুলো মিলিয়ে গেছে কি না দেখছি মা।

উ। তোমাকে নিয়ে কি যে মুশকিল আমার! শিগগির লেবেনচুষ মুখে পোর বলছি।

রুপালী পর্দ্দায় বহু অভিব্যক্তিতে আদিরস ঘনীভূত হইয়া আসে। নায়কের চক্ষু ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠে; নায়িকার চক্ষু মুদিয়া আসে। নায়ক নায়িকার কানে কানে কি যেন বলে। এই চিত্রের দর্শকদের মধ্যেও যাঁহারা রুচিবাগীশ ছিলেন, যেন তাঁহাদেরই মনস্তুষ্টির জন্য নায়িকা গোপন কথাটি শুনিয়া চমকিয়া উঠে এবং কৃত্রিম আর্ত্তস্বরে বলিতে থাকে, "তা হয় না নগেন, তা হয় না।"

প্র। (স্বপ্রভাবে) কি হয় না মা?

উ। স্-স্-স্।

প্র। বল না, কি হয় না?

উ। চুপ ক'রে শোন বলছি।

প্র। আমি তো শুনছি মা, ও খালি 'তা হয় না' বলছে।

উ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলছে। এখন চুপ কর তো।

প্র। কি হয় না মা?

উ। (হতাশভাবে) ও বেশিদূর এগোতে দিতে চায় না।

প্র। কতদূর যেতে দিতে চায় মা?

উ। মানে, বেশি ভালবাসা ও পছন্দ করে না।

প্র। তা হ'লে কেন বাবুটির কাঁধ ধ'রে ঝুলছিল?

উ। আমি জানি না তো কি ক'রে বলব?

প্র। কতটা ভালবাসা ও পছন্দ করে মা?

উ। আঃ, চুপ ক'রে শোন।

নায়িকা—"আমরা কি শুধু বন্ধু হয়ে থাকতে পারি না নগেন?"

প্র। ওদের মধ্যে কি বন্ধুত্ব নেই মা?

উ। ওঃ, একটু চুপ কর তো।

প্র। আমি কিন্তু বাড়ি গিয়ে মণ্টুদার কাঁধ ধ'রে ঝুলব।

উ। খবরদার, ওসব অসভ্যতা শিখো না খুকী; তুমি কক্ষনো ওসব করতে পাবে না, তা ব'লে রাখছি।

প্র। এ মেয়েটা তা হ'লে অসভ্য হয়েছে মা?

উ। না, ও একজনকে ভালবাসে কিনা, তাই অমন করছে।

প্র। ভালবাসলে বুঝি অসভ্যতা করা হয় না মা?

উ। না, তখন সব অন্য রকম হয়।

প্র। তা হ'লে ও কেবল 'তা হয় না, তা হয় না' বলছে কেন?

উ। (অন্যমনস্কভাবে) ও আর একজনের বউ কিনা, তাই।

প্র। ওর বরকে ও 'তা হয় না, তা হয় না' বলে নাকি ?

উ। উঃ, খুকী, তুমি অসহ্য হয়ে উঠেছ।

প্র। ঐ দেখ মা, আবার ঐ কথা বলছে। কি হয় না মা, বল না ?

উ। একটু চুপ ক'রে কি শুনতে পার না মা ?

প্র। (নাকী কান্নার সুরে) শুনছিই তো ; কিন্তু কি হয় না, তা বলছ না কেন ?

উ। নাঃ, আর দেখতে দিলি না তুই ছবিটা। চল, বাড়ি চল। জ্বালাতন ক'রে খেলে !

মাতাপুত্রীর পিছন হইতে শ্লেষাত্মক স্বর—"কি জন্যে যে এতটুকু মেয়েকে নিয়ে এই সব ছবি দেখতে আসা, তা বুঝি না। ধন্য আজকালকার শিক্ষা !"

প্র। বললে না মা, কি হয় না ?

উ। অসহ্য ! চল, চল লক্ষ্মীছাড়ি।

মাতা নির্দ্দয়ভাবে খুকীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। দূর হইতে শিশুটির প্রশ্ন শুনা যাইতে লাগিল—"কি হয় না, বল না মা ?"

এদিকে পর্দ্দায় নায়িকা' বলিয়া চলিয়াছে—"তা হয় না নগেন, তা হয় না।"

কিন্তু নায়িকার স্বরের দৃঢ়তা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শিথিল হইয়া আসিয়াছে বুঝা যায়। পার্শ্বের একটি দর্শক মন্তব্য করিল যে, শিশুসহ চলিয়া গিয়া মাতা বুদ্ধির পরিচয়ই দিয়াছেন।

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায়

Beverley Nichols প্রণীত ও Jonathan Cape কর্ত্তৃক প্রকাশিত *For Adults only* পুস্তক হইতে গ্রন্থকারের ও প্রকাশকের সৌজন্যে অনূদিত।

তন্ত্রের দর্শনবাদ

যে দর্শনবাদের উপর এসিয়ার ভূয়িষ্ঠ ঐতিহাসিক কীর্ত্তি আশ্রিত, যা সমগ্র প্রাচ্য চিন্তার সহিত ওতপ্রোত, এমন কি যার প্রভাব ইউরোপীয় ও ইসলাম জগতেও প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করেছে, তার কোনরূপ সুষ্ঠু চর্চ্চা না হওয়া বিস্ময়জনক। বস্তুত এই দর্শনবাদ পরিত্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসিয়ায় একটি অভিনব অন্ধকার যুগ আরম্ভ হয়—যার প্রভাব এখনও চলছে। জাপানী ভাবুক ওকাকুরা এ অবস্থাকে বলেছে, "night of Asia"। এই নৈশযুগে ভারতের চিন্তাধারাকে নিজের ভিত্তি হারিয়ে পরের আশ্রয় নিতে হয়েছে—তাতে ক'রে আর কোনও গভীর বা নূতন দর্শনবাদের সৃষ্টি হতে পারে নি।

তান্ত্রিকযুগ বলতে সনাতন প্রাচ্য দিগ্‌দর্শনের নির্দ্দেশের কথাও উল্লেখ করতে হয়। ইউরোপে নূতন চিন্তাকে অগ্রসর হতে হ'লে পূর্ব্বের চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে অগ্রসর হতে হয়। ভারতের পথ ঠিক বিপরীত; এখানকার সকল চিন্তাধারাই বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করে, বেদের ভিতরই নিজেদের উৎস খোঁজে। বেদের ভিতর যার আদিতম সন্ধান নেই, তাতে শ্রদ্ধা করবার কিছু নেই, এই হ'ল মূল কথা। ফলে অন্যান্য মতবাদের মত তন্ত্রের মতবাদকেও আর্য্য চিন্তার প্রাঙ্গণে পাওয়া যায় বলা হয়েছে। ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্তে তন্ত্রের আদি প্রেরণা আছে বলা হয়ে থাকে (মণ্ডল ১০ সূক্ত ১২৫)। অথচ তাম্রপ্রদীপে আছে, কলিযুগে তান্ত্রিকধর্ম্মই প্রবল হবে—বৈদিক নয়। কুল্লূকভট্ট তন্ত্রের উচ্চতর মর্য্যাদাদান ক'রে বলেছেন, শ্রুতি দ্বিবিধ—বৈদিক ও তান্ত্রিক।

তান্ত্রিক শ্রুতিই যে কলিযুগে জাগ্রত ও কার্য্যকরী, এ কথাও তন্ত্রকারেরা বার বার বলেছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে :—

কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যমসংশয়ম্।

কলিতে জগতের সর্ব্বত্রই তান্ত্রিক শক্তিবাদই যে চলবে, তান্ত্রিক আচার্য্যগণের এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর সত্যতা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

এ সমস্ত ভেবে মনে হয় এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ তন্ত্রকে অভূতপূর্ব্ব শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছেন। তাঁরা বার বার তন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলেছেন :—

নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয় বিষহীনোরগা ইব
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব।

সত্যাদি যুগে শ্রৌত মতাদি চলে এসেছে, কলিযুগে সেসব বিষহীন অবসন্ন সর্পের মতই থাকবে—তন্ত্রশাস্ত্রের এই মতের পশ্চাতে ছিল একটা দূরদৃষ্টি। আজ ইউরোপের ভাবের রাজ্য পরীক্ষা ক'রে দেখা যায়, পূর্ণভাবে ও-দেশ শাক্ত হয়েছে বা শক্তিধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। যীশুখ্রীষ্টের এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল সম্প্রসারণের নীতি সেখানে বর্জ্জিত হয়েছে। সমাজ, রাষ্ট্র, সর্ব্বত্রই ইউরোপে আজ যা প্রচলিত, তা তান্ত্রিক-ধর্ম্মেরই অনুরূপ বলতে হয়। তান্ত্রিকধর্ম্ম শক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন যুগের মন্ত্রযান ও বজ্রযান প্রভৃতির প্রভাবও যে ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম্মে গেছে, এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। Sir Charles Eliot তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে (Hinduism and Buddhism) বলেছেন, খ্রীষ্টীয় আচার-অর্চ্চনায় অনেক কিছুই তান্ত্রিক ব্যবহারের অনুরূপই মনে হয়, কাজেই তন্ত্রকে ঘৃণা করা নিরর্থক। তন্ত্রকে ঘৃণা করার বাতিক ইউরোপে খুবই প্রবল। ইউরোপের একখানি অতি-আধুনিক গ্রন্থ

গেটির (Getty) "গণেশে" ফরাসী পণ্ডিত ফুসে (Foucher) বলছেন—"It is a kind of leprosy"। অবশ্য ইদানীং বিপরীত মতও চলতে শুরু করেছে। অধ্যাপক Giuseppe Tucci সম্প্রতি বলছেন, "we know many misleading ideas are current in the west as regards the Tantras"। ভদ্রভাষার বন্ধন অতিক্রম ক'রে তন্ত্রের উপর গালাগালি দেওয়া হয়েছে। তার প্রচুর কারণও আছে।

একটা বিরাট তত্ত্ব যখন সমগ্র সভ্যতাকে রূপান্তরিত করে, অধিকারী-ভেদে চিন্তার নানা অলিগলিতে এর বিকারের প্রভাবও হতে বাধ্য। বস্তুতন্ত্রতা (Realism) যখন ফ্যাশন হয়—তখন শুধু উচ্চচিন্তার ভিতর নয়, অতি নীচ, ঘৃণিত ও ইতর পয়ঃপ্রণালীর খবর Zolaর মত ঔপন্যাসিক জগৎকে দান করতে ইতস্তত করেন নি। এ যুগের প্রাকৃতবাদের (Naturism) যখন বিস্তার হয়, তখন নগ্নদেহে অসংখ্য লোক এক-একটি জায়গায় Colony করেছে—sunbath উপলক্ষ্য ক'রে শালীনতা দূর করেছে, এমন কি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ উপলক্ষ্যে এই স্বভাববাদী psycho-analytic যুগ যেসব বই ছাপিয়েছে—তন্ত্রের গ্লানিযুক্ত চরম চর্চ্চার কোথাও সেসব পাওয়া যাবে না।

বস্তুত কোন বিরাট শহর প্রদক্ষিণ করতে হ'লে, সে শহরের ড্রেন ও গলিত পূতিগন্ধপূর্ণ আবর্জ্জনার স্তূপকেই পরমার্থ মনে করা ভুল। হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর বা কাঞ্চনজঙ্ঘা—নিম্নতর অবনত ভূভাগের অন্ধকার ও বিভীষিকাকে অস্বীকার করে না। সব কিছুকেই সমগ্রতার দিক দিয়ে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, খণ্ডতার দিক দিয়ে নয়। কাজেই তন্ত্রবাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য কি তাই বিচারের ব্যাপার—শুধু সাময়িক আবেষ্টন বা সমসাময়িক আচার-অর্চ্চনা, রীতিনীতির বা ব্যবহারের accedents-এর ভিতর সেই তত্ত্বকে খুঁজতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

বলা প্রয়োজন, আধুনিক যুগে ভারতীয় ভাববাদ ইউরোপে বিস্তৃত হয়েছে Schopenhauer-এর চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে। আমি Schopenhauer-এর "will"-বাদকে ভারতীয় 'সোঽহং' বাদের রূপান্তর বলতে চাই। দার্শনিক নিজেই উপনিষদের নিকট থেকে প্রাপ্ত নিজের ঋণ স্বীকার করেছেন। এই ঋণ ইউরোপের চিন্তাধারায় কি ভাবে গৃহীত হয়েছে, দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত সে বিষয়ের কোন বিচারই হয় নি।

ইউরোপ উপনিষদের, "শান্তং শিবং অদ্বৈতং"-এর আত্মসমর্পণের অন্বয়ী দিক গ্রহণ না ক'রে—অন্বয়ী-মূলক ব্যতিরেকী বিধিতে অহংতত্ত্ব ধ্যান করেছে। ফলে এখানকার প্রলয়ঙ্কর শক্তিবাদ ইউরোপের জাগ্রত ধী ও উগ্র জীবনযাত্রা গ্রহণ করেছে। এই মতবাদ উদ্দাম হয়ে নীট্‌সে-র অতিমানববাদের শক্তির চর্চ্চাকেই বরণীয় মনে করেছে। ইউরোপের দার্শনিক চিন্তার ধারা অনুসরণ ক'রে পাশ্চাত্য জনগণ কি ক'রে রক্তাক্ত শাক্তবাদ গ্রহণ করে, সে সম্বন্ধে কোন লেখক (M. A. Mugge) বলেছেন, "They scorned Kant's dream of an ultimate rule of reason and of permanent peace. They quoted Goethe. They referred to Schopenhauer's will expressing itself as a struggle."

মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দিক থেকে বিচার করলে আধুনিক ইউরোপকে তান্ত্রিক না ব'লে উপায় নেই। বস্তুত ইউরোপ আদ্যাশক্তিরই উপাসক—মেষশাবকরূপধারী খ্রীষ্টের প্রচারিত শান্তির নয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, তান্ত্রিক গ্রন্থাদি কলিযুগের যে অবস্থার কথা কল্পনা করেছে, সে অবস্থার ভিতর দিয়েই এ যুগ আজ যাচ্ছে।

ভারতবর্ষ শঙ্করের মায়াবাদ, বৌদ্ধের সন্ন্যাস ও কৌপীনবাদের পিছনে ছুটেছিল উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে। এখনও তার ধারা চলেছে। এ আলেয়া থেকে মুক্তি কখন হবে বলা যায় না। তবে বলিষ্ঠভাবে তন্ত্রের মুখ্য দর্শনবাদ অধ্যয়ন যে ভারতের উন্নয়নের পক্ষে একটা পরম ভেষজ, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। এ কথা লক্ষ্য করা প্রয়োজন, এশিয়ার শ্রেষ্ঠ যুগগুলি তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত। চীন, জাপান, ভারত এক সময় তন্ত্রের প্রভাবে জগতের বাস্তবতা স্বীকার ক'রে শক্তি ও রসবৃত্তায় অপরাজেয় হয়।

কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা বা শারীরিক যন্ত্রণাদির সাহায্যে কিছু অধিগত করার চেষ্টা ভুল—এ হচ্ছে তন্ত্রের আর একটি মুখ্য তথ্য। রুদ্রযামলের সপ্তদশ অধ্যায়ে বশিষ্ঠের সাধনার উপাখ্যান আছে। ছয় হাজার বছর সাধনা ক'রে তিনি ব্যর্থ হন এবং ব্রহ্মার নিকট নূতন মন্ত্র প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা আবার সাধনা করতে উপদেশ দান করেন। সমুদ্রতীরে গিয়ে আবার হাজার বছর তপস্যা ক'রেও বশিষ্ঠ ব্যর্থ হন এবং তিনি মহাবিদ্যাকে শাপদান করেন। মহাবিদ্যা আবির্ভূতা হয়ে বলেন, তুমি আমাকে পূজা করতে জান না, আমার ধ্যানে কৃচ্ছ্র কৃত্য বা যন্ত্রণা নেই, আমার সাধনা ও মন্ত্র পবিত্র এবং বেদেরও অগোচর।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গলিত বা স্খলিত ক'রে সাধনার ভিতর অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্র সাধন তন্ত্রের অনুমোদিত নয়। রবীন্দ্রনাথের

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

এবং— "ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।"

এসব তান্ত্রিক অনুভূতিপ্রসূত ভক্তি। বহু শত বৎসর পূর্ব্ব থেকে ভারতেই এর বাণী উত্থিত হয়েছে; কুলার্ণব তন্ত্রে আছে—

"ভোগো যোগায়তে সম্যক্ দুষ্কৃতং সুকৃতায়তে
মোক্ষায়তে চ সংসারঃ কুলধর্ম্মে কুলেশ্বরী।"

শুধু তা নয়, আধুনিক সভ্যতায় চরম রসপাত্র হাতে ক'রে তন্ত্রবিদ্ দুনিয়ায় তুরীয় আনন্দ পান করেছেন। অপর দিকে এ যুগের সার্ব্বভৌমিক সাম্যের ধ্যানেও তন্ত্র একাল থেকেও অধিক অগ্রসর হয়েছিল। তন্ত্রের পথ ছিল সর্ব্বজনীন। সকল বর্ণ ও স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে তান্ত্রিক সাধনামার্গ ব্যবহৃত হয়। তন্ত্রে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা অসীম—বহু পরিমাণে তা পাশ্চাত্য দেশের নারীর প্রতি আনুকূল্যের সহিত তুলনীয়। সর্ব্বোল্লাসে আছে—

"স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ো প্রাণাঃ"।

গৌতমীয় তন্ত্রে আছে—

"সর্ব্ববর্ণাধিকারাশ্চ নারীণাং যোগ এব চ।"

কাজেই এ যুগের চরম লক্ষ্য যা, তা তন্ত্রের আদি যুগেই স্বীকৃত হয়েছিল, সেজন্য আন্দোলন বা আলোচনার প্রয়োজন হয় নি। এমনই ভাবে দেখা যাবে, তন্ত্র একটি সার্ব্বভৌমিক পাদপীঠে জগতের মননকে আহ্বান করেছিল।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ওঠো, জাগো, নাচো—

তব আহ্বান এসেছে এবার ভারতীয় নটরাজ,
ঠ্যাং তুলে এক পোজ
আছ কতকাল নাহি জানি মোরা, সেই একমত সাজ
দেশী তাণ্ডবী ভোজে।
এবার এসেছে গ্র্যাণ্ড তাণ্ডব, কাণ্ড বিশ্বব্যাপী,
ওঠো, জাগো, নাচো শিব,
কাঁধে-ম'রে-যাওয়া সতীরে তোমার এবার করহ "ষ্ক্যাপি"
থেকো না কো নির্জ্জীব।

সংবাদ-সাহিত্য

একবার একটি বিশ্ববিখ্যাত ব্যাডমিণ্টন টুর্নামেণ্টের ফাইনাল খেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। খেলাটা কোথায় হইয়াছিল ঠিক স্মরণ নাই, কিন্তু হইয়াছিল। সমগ্র পৃথিবীর দুই চ্যাম্পিয়ন পক্ষ দুই দিকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন —জোড়ায় জোড়ায়। ইঁহারা বলেন, আমাদের দেখ, উঁহারাও তাই বলেন। সমরাঙ্গণ দর্শকে দর্শকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। খেলা আরম্ভ হইল; খেলোয়াড়দের হাত-পা চালাইবার কি অপরূপ ভঙ্গি, কি বিচিত্র মার! পালকশীর্ষ বলটি মারের চোটে জালের এপারে-ওপারে ছুটাছুটি করিয়া এমনই কসরৎ শুরু করিয়া দিল যে, আমরা তাজ্জব বনিয়া গেলাম। খেলোয়াড়দের এমনই হাত-সাফাই যে, বল মাটিতে পড়িবার পথ পায় না। দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মত খেলা দেখিতে লাগিল। আমরাও সবিস্ময়ে বলের গতিপথ লক্ষ্য করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া গেলাম। যখন জ্ঞান হইল, তখন হঠাৎ অনুভব করিলাম যে, বলের দিকে আর আমাদের লক্ষ্য নাই; আমরা বিহ্বলভাবে শুধু দর্শকদের ঘন ঘন মস্তক-সঞ্চালন দেখিতেছি। সে এক অপরূপ দৃশ্য! বলের গতির সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র দর্শকের মাথা একসঙ্গে একবার বামে এবং একবার ডাহিনে ঈষৎ আবর্ত্তিত হইতেছে, অনেকে মাথা স্থির রাখিয়া শুধু ডান-বাম কটাক্ষের দ্বারা ঠিক একজাতীয় চোখ-ঠারা ডলি-পুতুলের মত ভঙ্গি করিতেছে। সকলের সমবেত মাথা-নাড়া এবং চোখ-ঠারার ফলে এমন একটা বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতেছে যে, বল-চলাচলের মজা তাহার তুলনায় কিছুই নয়। আমাদের সাংখ্যদর্শনে ঠিক এই জাতীয় ব্যাপারেরই পুরুষ-প্রকৃতিমার্কা কি একটা নাম আছে; প্রকৃতির খেলা দেখিতে দেখিতে পুরুষ নিজেই দর্শনীয় হইয়া বিশ্বনিয়ন্তার বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, এরূপ ব্যাপার সচেতন পুরুষমাত্রই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন।

ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল রণাঙ্গণে এই জাতীয় টুর্নামেণ্ট কিছুদিন হইতে চলিতেছে; কয়েক রাউণ্ড খেলা ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে; কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা, ভারত-সরকার এবং ইংলণ্ডীয় সরকারের পক্ষে যথাক্রমে মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, জনাব জিন্না, বীর সাভারকর, মহামান্য বড়লাট বাহাদুর, সার্ ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স প্রভৃতি মিলিয়া প্র্যাকটিস ম্যাচের সিঙ্গল্স এবং ডবল্স খেলা এক দফা শেষ হইয়াছে; মহাচীন হইতে মাদাম চিয়াংকাইশেক-শাসিত মার্শাল চিয়াংকাইশেক এবং আমেরিকা হইতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধিকে ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ঠিক কাহাদের পক্ষে আসিয়াছিলেন, এখনও বুঝা যাইতেছে না। টাই নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বেই দল বদল করিবার চেষ্টাও দেখা যাইতেছে, কংগ্রেসের রাজা-গোপালাচার্য্য লীগদলের জনাব জিন্নার পার্টনার হইবার প্রবল চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এই সকল বহুবিধ গোলযোগের মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, ফাইনাল খেলা হইবে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস ও ভারত-সরকারের মধ্যে এবং কংগ্রেস পক্ষে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলাল যে থাকিবেন, তাহাও একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে। ভারত-সরকারের পক্ষে কে বা কাহারা থাকিবেন, তাহা জানা সম্ভব নয়; খেলা শেষ হইবার পরও সম্ভবত আমরা তাহা জানিতে পারিব না।

* * *

প্র্যাকটিস ম্যাচ শুরু হইয়াছে। কথা হইতেছিল দর্শকদের লইয়া। মহাত্মা গান্ধী এবং ভারত-সরকারের মধ্যে যে খেলা ইতিমধ্যেই চলিতেছে, তাহা দেখিতে দেখিতেই আমরা দর্শকেরা দর্শনীয় হইয়া উঠিয়াছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা (?) রক্ষার জন্য ভারত-সরকার দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইতেছেন, মহাত্মা গান্ধী একটি অহিংস মার মারিয়া বলটিকে সজোরে জালের ওপারে পাঠাইয়া বলিতেছেন, স্বাধীনতা রক্ষা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, কিন্তু যুদ্ধে তিনি বিশ্বাস করেন না। ভারতবর্ষের দরিদ্র দর্শকদের মুগ্ধ করিবার জন্য ভারত-সরকার বলে একটি ছোট মার দিয়া বলিলেন, যুদ্ধের দরুন ভারতবাসীর খাদ্যের

অপ্রতুলতা হইয়াছে, সুতরাং আমরা "খাদ্য উৎপাদন বাড়াও"-আন্দোলন করিতেছি। মহাত্মা গান্ধী অমনই পাণ্টা মার দিয়া ফোকলা হাসি হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের ও ইয়ার্কি রাখ। খাদ্যের অভাব কোথায়? শহরে তোমরা যে পরিমাণ খাদ্যের অপচয় করিতেছ, তাহা বাঁচানো হইলে সমগ্র দেশের খাদ্যসমস্যার মীমাংসা হইবে; আমি "অপচয় বন্ধ কর"-ক্যাম্পেন চালাইব। এই মারামারির মধ্যে আমরা একবার এদিকে একবার ওদিকে মস্তক সঞ্চালন করিয়া সচেতন পুরুষদের দর্শনীয় হইয়া উঠিতেছি। শুনিতেছি, আসল খেলা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে; তখন মহাত্মা গান্ধী কি বলিবেন এবং ভারত-সরকারই বা কি বলিবেন, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু আমাদের মাথা যে ঘন ঘন নড়িবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

* * *

এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা আসলে ব্যাডমিণ্টন খেলা মাত্র; খেলা বিশ্বব্যাপী হইলেও ব্যাডমিণ্টন টেনিস নয়। ব্যাডমিণ্টনকে টেনিস করিতে হইলে হাতের কব্জি আরও শক্ত করিতে হইবে, বলের মাথায় মোহন পালকগুচ্ছ ঘুচাইতে হইবে। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন আমরা দর্শকহিসাবে যতই মাথা-চালাচালি করি না কেন, পুরুষপর্য্যায়ে উন্নীত হইব না। যাহারা আজীবন টেনিস খেলিয়াছে এবং ভাল টেনিস খেলিয়াছে, তাহারা মজা ও প্রয়োজনের খাতিরে মাঝে মাঝে ব্যাডমিণ্টন টুর্নামেণ্টে নাম লিখাইতে পারে, দর্শকদের মনোরঞ্জনও করিতে পারে, কিন্তু ব্যাডমিণ্টন খেলাই যাহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য, বিশ্বব্যাপী টেনিস খেলার দর্শকহিসাবে তাহাদের মাথা ঘন ঘন নড়িবে বটে, কিন্তু তাহারা সমঝদার দর্শক বলিয়া খাতির পাইবে না।

—

"স্বাধীনতা" ও "দেশপ্রেম" শব্দ দুইটির প্রকৃত তাৎপর্য্য খুঁজিতেছিলাম। 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া বৃটানিকা' হইতে 'চলন্তিকা' অবধি সন্ধান করিয়াও হদিশ পাইলাম না। ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডি—জন ষ্টুয়ার্ট মিল হইতে কার্ল মার্ক্স পর্য্যন্ত ঘাঁটিলাম, কোনও মীমাংসাই হইল না। [illegible]

শরণাপন্ন হইলাম। শুনিয়াছিলাম, তিনি ইদানীং একটি পলিটিক্যাল অভিধান সঙ্কলনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। গোপালদা বাড়িতে ছিলেন না। গোপাল-বউদি ঘোমটার আড়াল হইতে ফিসফিস করিয়া যে সংবাদ দিলেন, তাহা শুনিয়া বিস্ময়বোধ করিলাম। গোপালদা এ. আর. পি. দলে যোগ দিয়াছেন এবং চাকুরি বজায় রাখিবার জন্য আপিসে দৈনন্দিন হাজিরা দিতে গিয়াছেন। হায় কপাল, গোপালদাও শেষ পর্য্যন্ত—

গোপালদার অভিধানের পাণ্ডুলিপির কথা জানা ছিল। সেটা টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। প্রথমেই "স্বাধীনতা" খুঁজিলাম। গোপালদার সবই বিচিত্র; তিনি এই শব্দের ইংরেজী বাংলা সংস্কৃত কোনই প্রতিশব্দ দেন নাই; অর্থস্থানে একটা হেঁয়ালি ঢুকিয়া রাখিয়াছেন। হেঁয়ালিটি এই—"ক যদি খ কর্ত্তৃক কৌশলে বিজিত ও শাসিত হয় এবং পরে গ আসিয়া যদি গায়ের জোরে ক-কে অধিকার করিতে চায়, তখন খ-এর অধিকার বজায় রাখিবার জন্য ক যদি গ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাহা হইলে ক নিজের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ এই অবস্থায় ক যাহার জন্য যুদ্ধ করিবে, তাহার নাম ক-এর স্বাধীনতা।"

*   *   *

পড়িয়া কেমন অসোয়াস্তি বোধ হইতে লাগিল। ঠিক বুঝিতে না পারিলেও এক একবার কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল—ইহা রাজদ্রোহ। কিন্তু গোপালদার এ. আর. পি. যোগদান সংবাদে সে সন্দেহ মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া "দেশপ্রেম" খুঁজিলাম। সেখানেও সেই একই কাণ্ড—হেঁয়ালি। "ক খ-এর শাসনে থাকিয়া যদি গ-এর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে জীবনদান করে, তাহা হইলে সে তাহা দেশপ্রেমবশতই করিবে। অর্থাৎ খ-এর অধীন থাকিয়া ক যে প্রবৃত্তির বশে খ-এর অধিকার বাঁচাইতে গ-কে প্রতিরোধ করিবে, সেই প্রবৃত্তির নাম দেশপ্রেম।"

কেমন গোলমাল ঠেকিল। "ভূমিকা" উল্টাইয়া দেখিলাম, গোপালদা

লিখিয়াছেন, "এই অভিধান-সঙ্কলিত অর্থ শুধু ভারতবর্ষের পক্ষেই খাটিবে, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশের পক্ষে খাটিবে না। ভারতবর্ষের সহিত চীনের যোগ দীর্ঘকালের, চীনের পক্ষেও ইহা অংশত প্রযোজ্য।"

* * *

বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, হঠাৎ বিমান-আক্রমণ-প্রতিরোধী ধড়াচূড়া পরিয়া গোপালদা হাজির হইলেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গোপালদার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি প্রথম ধাক্কায় কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া পরে সামলাইয়া লইয়া সেই লজ্জা চাপা দিবার জন্ত হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আরে ভায়া, বেকার ব'সে ব'সে কোমরে বাত ধ'রে যাচ্ছিল; আমাদের ক্যাপ্‌টেন ঘোষকে ধ'রে এ একটা অকুপেশনও হ'ল, আবার এদিকে ঘরে টু-পাইস কিঞ্চিৎ আসবেও। গোপালদা বুঝিলেন, এত অল্পে প্রিন্সিপ্‌ল পরিবর্ত্তনের ওজুহাতটা আমার পছন্দ হইল না। তাই কানের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন, তা ছাড়া ভায়া, পাড়ার হরেরাম চাটুজ্জে বেটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিলাম না; এইবারে টের পাবেন বাছাধন!

বুঝিলাম। কিন্তু ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় ছিল না; 'দেশপ্রেম' ও 'স্বাধীনতা'র ব্যাপারে বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম। গোপালদাকে আমার কথাটা নিবেদন করিতেই তিনি বলিলেন, ও অভিধানটা বাতিল ক'রে দিয়েছি ভাই। কর্ত্তাদের হুকুমে খাঁটি বাংলার একটা অভিধান সঙ্কলন করছি। বলিলাম, তার তো অভাব নেই, বরং এই পলিটিক্যাল অভিধানেরই—

গোপালদা বাধা দিয়া বলিলেন, সে হবে এখন ভাই, এখন এই বাংলা অভিধানটিই জরুরি। আমাদের কাজের পক্ষে তোমাদের অভিধানগুলি বাতিল। আমাদের বানান আলাদা, শব্দবিন্যাস আলাদা—সবই আলাদা। এই দেখ।—বলিয়া সেদিনকার 'যুগান্তর' ও 'আনন্দবাজার' খুলিয়া একটি সরকারী বিজ্ঞাপনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বিজ্ঞাপনটি হুবহু এই—

শত্রুর মিষ্টিকথায় ভুলবেন না। তারা যে বক্তৃতায় নিজেদের দুর্জ্জয়ী প্রমান করার জন্য আপনাদের কাছে চেষ্টা করছে, সে বিষয় লক্ষ্য রাখ্‌বেন। তারা রেডিও তে ব'লে বেড়াচ্ছে - তারা ভাড়তের বন্ধু - কারণ তারা ভারতে আসিলে আপনাদেরই হাতে নিহত হ'তে চায় না। মিথ্যা বক্তৃতাদ্বারা তারা আমাদের মধ্যে সন্ত্রাশ শৃষ্টি করতে চায়, আমাদের দিশেহারা করতে চায়, আমাদের দুর্ব্বল করতে চায়। ইহাই হ'ছে এযুদ্ধের নব-নীতি। ভারত আক্রমনের সময় তাহারা ভারতীয়দের দ্বারা নিহত হ'তে চায় না। আমাদের গৃহেই তারা বাস করতে চায়। কিন্তু এটিধ্রুবসত্য জান্‌বেন যে আক্রমনকারী জাপানীরা সমস্তই বিনষ্ট হ'বে আমাদের সৈন্যদের বিক্রম আমাদের কামান, আর পিছন থেকে আপনাদের যথাপাধ্য সাহায্য, তাদের মৃত্যু-মুখে নিক্ষেপ করবে। এই ৩৮ কোটি মানবের মহাদেশ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তো কেহই তাহাকে জয় করতে পারে না।

জাপানেব মিথ্য প্রচাবে চীন 'ভোলেনি। যে চীন এক-কালে বহুভাগে বিছিন্ন ছিল, সেই চীন আর ৫ বৎসর ধরিয়া কি বীর বিক্রমেই না জাপানেব সঙ্গে যুদ্ধে করছে-পরাজয়েব ছায়া ও সেখানে নাই। রাশিয়াও নাজীদের দ্বারা প্রতারীত হয় নি, এই নাজিই রশিয়ার সহিত বন্ধুত্বের সান্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ থাকা সত্বেও রশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছিল। রাশিয়া ও চীন আমাদের যেন চোখ খুলে দিক্। জাপানের প্রচারে যেন আমরা কান না দিই।

পড়িয়া এমনই বেকুব বনিয়া গেলাম যে, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বাড়ি ফিরিয়া আসার পথ কষ্টে পাইলাম।

জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' ৫৯৯ পৃষ্ঠায় যে কবিতা দুইটি পাশাপাশি প্রকাশিত হইয়াছে, হিসাব করিয়া দেখিলাম, তাহাতে সাম্প্রদায়িক পার্সেন্টেজ আশ্চর্য্য রকমে

বজায় আছে। সম্পাদক-বিভাগ সুবিবেচক তাহাতে সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কন শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য পাইয়াছেন ১৮ লাইন স্থান এবং কবিখাড়ু বন্দেআলী মিয়া পাইয়াছেন ২২ লাইন। ১৮ : ২২ = ৪৫ : ৫৫। দুইটিই বর্ষার কবিতা এবং দুইটিতেই সরস-কঠিন কথা আছে। ফিফ্‌টিফাইভ পার্সেণ্ট লিখিয়াছেন—

"কামরাঙা পাতা লাগে অবনত কামনার অনুরাগে"

এবং ফরটিফাইভ পার্সেণ্ট লিখিয়াছেন—

'বর্ষাতি মন ভেঙে পড়ে ঘন অশ্রুবাদল মাঝে"

"কামরাঙা পাতা" ও "বর্ষাতি মন" আসলে একই বস্তুর দুই সত্তা।

জ্যৈষ্ঠের 'প্রভাতী' পত্রিকায় শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার "আমাদের সাহিত্য" সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"বৃথা অহঙ্কারে মত্ত থাকিয়া আমরা আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের অনেক বিঘ্ন ঘটাইতেছি। আমাদের আশে পাশে সর্ব্বদা যাহা ঘটিতেছে, চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া তাহাও আমরা দেখিয়াও দেখি না। 'কল্যাণ' মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত একখানি হিন্দী মাসিক পত্র। ইহাতে সদ্যস্নাতা ও অভিসারিকাদের চিত্র প্রকাশিত হয় না। ফিল্ম ষ্টার বা সিনেমা উপগ্রহদের ছবিও পাতায় পাতায় বাহির হয় না। শুধু ইহাই নহে; ইহাতে বাহিরের কোন বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় না; তবুও ইহার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ষাট হাজার। বাংলার সাময়িকগুলি গল্প উপন্যাস ও যৌনবিজ্ঞানের ছড়াছড়ি করিয়াও, এবং দেশী ও বিদেশী শ্লীল অশ্লীল সর্ব্বপ্রকারের বিজ্ঞাপন ছাপিয়াও আজ পর্য্যন্ত এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে নাই।"

* *

ইহার কারণও লেখক একটা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"হিন্দী সাহিত্য যে আজ এরূপ বহুদূরপ্রসারী হইয়াছে, এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করিবার উপক্রম করিয়াছে, ইহার মূল কোথায়, তাহাও

আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার। মিথিলা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড হিন্দী সাহিত্যকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের সর্ব্বস্থানের কথ্যভাষা অবশ্য একরূপ নহে। একথা সকলেই বিশেষ করিয়া জানেন যে মিথিলার কথ্যভাষা মৈথিলী, এবং রাজস্থানের কথ্যভাষা রাজস্থানী; কিন্তু তৎসত্ত্বেও মিথিলা ও রাজস্থানবাসী হিন্দীকে তাহাদের সাহিত্যিক ভাষারূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। আর ইহা এই জন্য সম্ভব হইয়াছে যে হিন্দী সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারিতার স্থান একেবারেই নাই; ইহার রূপ সর্ব্বত্রই একই প্রকার; এবং কথ্যভাষাকে ইহাতে মোটেই আমল দেওয়া হয় নাই।"

হিন্দীর প্রসাব এবং বাংলার অপ্রসারের ইহাই একমাত্র কারণ না হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে একটা বড় কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। নানা প্রাদেশিক ভাষার আশ্রয়ে আমরা যখন লেখ্য ভাষাকে জোরালো করিবার স্বপ্ন দেখিতেছি, তখন অক্ষমতার দরুন নানা অনাচার ঢুকিয়া বাংলা লেখ্য ভাষা এমন একটা রূপ লইয়াছে, যাহা বাংলা নয় এবং যাহা বুঝিতে সর্ব্বপ্রদেশীয় সাধারণ বাঙালীর কষ্ট হয়। আমরা এই ভাবে নানা বৈদেশিক প্রক্রিয়ায় সাহিত্যকে যখন শক্তি ও বৈদগ্ধ্য মণ্ডিত করিতেছি বলিয়া ভাবিতেছি, সাহিত্যের পাঠক-সম্প্রদায় তখন হ্রাস পাইতে পাইতে নিতান্ত এক একটা দল বা coterie-তে পরিণত হইতেছে। এক দলের লেখা অন্য দলে পড়ে না—এখন বাংলা সাহিত্যের এই অবস্থা; এবং ইহা দুরবস্থা সন্দেহ নাই। 'বঙ্গদর্শনে'র বহুলপ্রচারের ফলে বাংলা দেশে একদিন যে লেখ্য ভাষা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার পাঠক ছিল সারা বাংলা দেশ জুড়িয়া; ঢাকা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, বীরভূম কোনও অঞ্চলের লোকেরই সে ভাষা বুঝিতে কষ্ট হইত না; এমন কি অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত অন্তঃপুরিকারা পর্য্যন্ত এই ভাষা শুনিলে বা বানান করিয়া পড়িলে বুঝিতে পারিত। 'সবুজপত্রে'র যুগে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর প্রবল চেষ্টায় সেই ভাষায় একটা নকল চলতি ভাষার কোটিং দেওয়া হইল বটে, কিন্তু আসলে যাহা দাঁড়াইল তাহা

ইংরেজী-না-জানা পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। ফলে এই সকল শক্তিমানদের কৃপায় যে নূতন সাহিত্য বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তাহার পাঠক সংখ্যায় কমিয়া গেল। যে কোনও সাময়িক-পত্রিকার ইতিহাস লক্ষ্য করিলেই এ কথার প্রমাণ মিলিবে। আধুনিকেরা এবং অতি-আধুনিকেরা অনাচারের মাত্রা বাড়াইয়া 'সবুজপত্রে'র ধারারই অনুবর্ত্তন করিলেন; এবং তাঁহারা তথাকথিত পণ্ডিতসমাজের বাহবা পাইয়া এখনই আত্মবিস্মৃত হইলেন যে, লক্ষ্য করিলেন না, বাংলা দেশের জনগণ তাঁহাদের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া গেলেন এবং তাঁহাদের অন্ন পাঁচকড়ি দে ও দীনেন্দ্রকুমার রায় অতি সহজেই কাড়িয়া লইলেন। দেশের লোকের সহিত মাখামাখির ভান করিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করা হইয়াছে বলিয়াই তাহারাও চরম প্রতিশোধ লইতেছে। ইহা লইয়া আক্ষেপ করা বৃথা। অবিলম্বে প্রতিকার করা প্রয়োজন।

* * *

মজুমদার মহাশয়ের আর একটি কথাও বিবেচনার যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

"মিথিলার ভাষার সহিত বঙ্গদেশের ভাষার সম্পর্ক অতি নিকট; উভয়ের লিপিকে ত প্রায় এক বলিলেও চলে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মিথিলাবাসী কেন বাংলার পরিবর্ত্তে হিন্দীকে আপনাদের সাহিত্যিক ভাষারূপে স্বীকার করিয়াছে, ইহা কি আমরা নির্ণয় করিতে পারিয়াছি? উড়িষ্যা ও আসামের সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলা যায়। এই দুইটি স্থানেও বাংলারই সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রচলিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একদিকে আমাদের সঙ্কীর্ণতা অন্য দিকে আমাদের দারুণ অবহেলা, এই উভয় কারণে আসাম ও উড়িষ্যাকেও আমরা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছি।"

আসাম উড়িষ্যা তো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রদেশ, এই ভাবে বেশিদিন চলিলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিজ বাংলা দেশকেও হারাইবে। পুস্তক-প্রকাশক ও পত্রিকা-প্রকাশকেরা ইতিমধ্যেই আতঙ্কিত হইয়াছেন; চিন্তাশীল

সাহিত্যিকেরা সকলে সমবেত হইয়া বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত না হইলে বাংলা সাহিত্যের আরও দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

—

আশ্চর্য্যের বিষয়, বাংলা দেশের আধুনিক কবিরা উপরোক্ত সর্ব্ববিধ সমস্যার মধ্যে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ আছেন। তাঁহাদের প. পি. চু. স. (পরস্পর পিঠ-চুলকানি সমিতি) যথারীতি চলিতেছে—বিষ্ণু শিবকে, শিব ব্রহ্মাকে তারিফ করিয়া চলিয়াছেন; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কার্য্য সুষ্ঠুভাবেই নির্ব্বাহ হইতেছে। ইঁহাদের বহুবিধ "উন্মেষ" আমরা দেখিতেছি, শুধু জ্ঞানের উন্মেষ ছাড়া। এক "উন্মেষ" দেখুন—

"হনলুলু সাগরের জল,
ম্যানিলা—হাওয়াই,
টাহিটির দ্বীপ,
কাছে এসে দূরে চলে যায়—
দূরতর দেশে।
কি এক অশেষ কাজ করেছিল তিমি,
সিন্ধুর রাত্রির জল এসে
মৃদু মিথিরি জলে মিশে গিয়ে তাকে
বোর্নিও সাগরের শেষে—
যেখানে বোর্নিও নেই—ম্লান আলাস্কাকে
ডাকে।
যতদূর যেতে হয়
ততদূর অবাচী অন্ধকারে গিয়ে
তিমির শিকারী এক নাবিককে আমি
ফেলেছি হারিয়ে;
তিমির পিপাসী এক রমণীকে আমি
হারায়ে ফেলেছি;…

নিপট আঁধার ;
ভালো বুঝে পুনরায়
সাগরের সৎ অন্ধকারে নিক্রমণ।...
বেবুনের রাত্রি নয় তার হৃদয়ের
রাত্রির বেবুন ॥”

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে “সাহিত্যিক”-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন—

“অন্য লোকের মত লেখকদের চিত্তও আজ বিক্ষিপ্ত। নিজের সৃষ্টির মূল্য বোধে ক্ষণে ক্ষণে মনে সংশয় জাগে। প্রপাগাণ্ডাকে মনে হয় সাহিত্য,— জীবনের সঙ্গে যার যোগ। কিন্তু এ চিত্ত-বিক্ষেপ সংযত করতে হবে, মনের সংশয় উঠতে হবে কাটিয়ে। সাহিত্য সৃষ্টির নামে প্রপাগাণ্ডা রচনা ক'রে কাজের লোক সাজার প্রলোভনকে দমন করতে হবে। যে জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ তা কেবল আজকের দিনের জীবন নয়, চিরন্তন মানুষের চিরপুরাতন ও চিরনূতন জীবন। আজকের দিনের সাহিত্য আজকের দিনের জীবনই গড়বে, কিন্তু কেবল সেই জীবনের প্রয়োজন-সিদ্ধির তাগিদে নয়। আজকের জীবনের পারিপার্শ্বিকে সেই সনাতন মানুষকে গড়বে চিরকালের মানুষ যার মধ্যে চিরপরিচিতকেই দেখবে।

“আমাদের দেশের উপর প্রলয়ের টর্ণেডো আজ উদ্যত। এর অবসানে আমরা ভেঙেচুরে কেমন গড়ন নেবো কে জানে। তবে নিদারুণ দুঃখের মধ্য দিয়েই আমাদের চলতে হবে। বিপদের প্রতিকার চেষ্টায় মনে যে উৎসাহের বল আসে আমরা তা থেকেও বঞ্চিত। কারণ প্রতিকারের চেষ্টা আমাদের হাতে নেই। এ দুর্দিনে আমরা হয়তো কিছুই রক্ষা করতে পারব না, কিন্তু মনুষ্যত্বের গৌরবকে যেন রক্ষা করি। সাহিত্যিকদের কণ্ঠরোধ ও কণ্ঠনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলবে। কোনও ভয় বা লোভে আমরা যেন মিথ্যাকে সত্য, কুৎসিতকে

সুন্দর না বলি। না-বলার পাপ যদি আমাদের স্বীকার করতেই হয়, মিথ্যা-বলার পাপ আমরা কিছুতেই স্বীকার করব না।"

* * *

দুঃখের বিষয়, মিথ্যাকে সত্যবলার পাপে আজ বাংলা দেশের সাহিত্য, বিশেষ করিয়া সাময়িক সাহিত্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রবীণ সমালোচক কারণে অথবা অকারণে অর্ব্বাচীন কবিদের এমন সকল কাব্যের ও কবিতার জয়গান করিতেছেন, সত্য কাব্য-জিজ্ঞাসার নিক্তিতে মাপা হইলে যাহা কাব্যের পংক্তিতেই বসিতে পারে না; এমন সকল গল্প-কবিতা প্রতিদিন মাসিকে সাপ্তাহিকে এবং দৈনিকের রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে, যাহা নিছক প্রপাগাণ্ডা এবং সন্দেহ হইতে পারে লেখক এবং প্রকাশক এগুলি লিখিয়া ও প্রকাশ করিয়া পকেট ভারী করিতেছে। আষাঢ়-সংখ্যাগুলিতেই দেখিতেছি এই মারাত্মক ব্যাধি (প্রসিদ্ধ আট-হাজারী দশ-হাজারী মাসিকগুলিতে পর্য্যন্ত) ছড়াইয়া পড়িয়াছে; ষাট-হাজারীরা পর্য্যন্ত জানিয়া অথবা না জানিয়া এই বিষম প্রপাগাণ্ডায় সহায়তা করিতেছেন। সাহিত্যকে প্রচারের দ্বারা কলুষিত করিবার জন্য বাংলা দেশের প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকের কাছে উপরোধ-অনুরোধ আসিতেছে; এই উপরোধের তেলোর নীচে অন্য বস্তুও দেখা যাইতেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন অসতর্ক ও অসহায় সাহিত্যিকের পতন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় অতুলবাবু যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা সত্যই সময়োচিত হইয়াছে।

এই আষাঢ় মাসটা দেখিতেছি অধ্যাপক দার্শনিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের "কচে বারো" মাস; আমাদের মহামান্য সম্রাটের জন্মদিন আষাঢ়ে পড়িলে আমরা এবারে দুই নম্বর সার্ সারেণ্ডারনটকে পাইতাম। আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে তাঁহার প্রবন্ধ-কবিতাই শুধু বাহির হয় নাই; "বিবিধ প্রসঙ্গে" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত গোপাল ঠাকুর শালুক চিনিয়াছেন। "ভারতবর্ষ' পূর্ব্বাপরই কিঞ্চিৎ ব্যাকওয়ার্ড! তাঁহারা অধ্যাপক মহাশয়ের "নারী"-স্তুতিটির অধিক আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তবে অধ্যাপক মহাশয়ের "নারী" একাই একশো! যাঁহারা ডক্টর

দাসগুপ্তের হাতসাফাই দেখিতে চান, তাঁহারা "নারী" পড়িবেন; "নারী"-স্তুতির মধ্যেই কি ভাবে নিজের টাই-বাঁধার ইতিহাস দেওয়া যাইতে পারে, কৌশলী ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া পুলকিত হইবেন।

* * *

অধ্যাপক মহাশয়ের দার্শনিক যুক্তি সর্ব্বত্র মানিয়া লইলেও দুই-এক স্থলে আমাদের প্রতিবাদ করিবার আছে। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন—

"পুরুষের মধ্যে যে বুদ্ধি, যে বিচার শক্তি, যে চরিত্রবল আছে নারীর মধ্যেও তাই আছে।...স্বামীর চিতায় সহাস্যে অগ্নি-প্রবেশ করেছেন, এমন দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত অনেক মেয়ে দেখিয়েছেন।"

এটি কিন্তু নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। চালাক পুরুষের ধাপ্পায় ভুলিয়া এই আত্মনাশ সে-যুগে যতই প্রশংসা পাইয়া থাকুক, এ-যুগে তাহা নিন্দনীয় বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু তবুও কি নারী এই সর্ব্বনাশা শিক্ষা ভুলিয়াছে? ভোলে নাই। এ-যুগেও দেখিতে পাই, লম্পটদের পাল্লায় পড়িয়া শুধু বিধবা সতীরাই নয়, কুমারী সতীরাও তিলে তিলে অগ্নিপ্রবেশ করিতেছেন। হায় নারী, তুমি আজিও কি নিম্নোদ্ধৃত সুরম্য স্তুতিবাদেই মুগ্ধ থাকিবে—

"নারীর মধ্যে যে আত্মভোলা প্রেম আছে, যে সহজ স্বার্থত্যাগ আছে, যে কোমলতা আছে, যে সেবা এবং শুশ্রূষা-পরায়ণতা আছে তা পুরুষের মধ্যে অতি বিরল।"

না, এই সকল স্তুতিবাদ ভুলিয়া সত্যকার ধূর্ত্ত লম্পট পুরুষের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সত্য নারীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে?

এই নারী-স্তুতির প্যাঁচ বুড়া বয়সে নরেনদাও কষিয়াছেন! আষাঢ়ের 'ভারতবর্ষে' তাঁহার কবিতা "সারা পৃথিবীর মানুষের দেশ—" দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, দীনচণ্ডীদাসী "শুন হে মানুষ ভাই"-জাতীয় নূতন কিছু তথ্য পাইলাম। তথ্য কুড়াইতে গিয়া দেখিলাম, শিলা গলিয়া কাদা হইয়া গিয়াছে—

"যাদের ইসারা ইঙ্গিত বুঝি, আঁখির চটুল ভাষা
অন্তর মাঝে অনুভব করি অকথিত ভালবাসা

বুঝি যাহাদের প্রেম অনুরাগ
ঘৃণা উপেক্ষা আদর সোহাগ
যাদের সঙ্গ সাহচর্য্যের আনন্দ আমি পাই
সেই পৃথিবীর মানুষের দেশ আমার স্বদেশ ভাই !"

এই তত্ত্বকথাই তো খুনে রমজান মিঞা ফাঁসির কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া মৌলভীকে শুনাইয়াছিল, তাহাকে মৃত্যুর পর নরকে যাইতে হইবে শুনিয়া সে প্রশ্ন করিয়াছিল, গহরজান বিবি কোথায় যাইবে ? মৌলভী সাহেব তোবা উচ্চারণ করিয়া দোজখের কথাই বলিয়াছিলেন। রমজান তখন একটা গভীর দুশ্চিন্তা কাটাইয়া উঠিয়া সোল্লাসে বলিয়াছিল, "সেই পৃথিবীর মানুষের দেশ আমার স্বদেশ ভাই !" নবেনদার কাছ হইতে আমরা 'বেটার' কিছু এক্সপেক্ট করিয়াছিলাম।

—

কিন্তু কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে) আমাদের সে দুঃখও ঘুচাইয়াছেন বজ্রকণ্ঠে "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি তুলিয়া। ইসলাম এবং বৈদিক ধর্ম্ম, হদিস এবং পুরাণকে তিনি ময়দাঠাসা করিয়া এমনই লেচি বানাইয়া দিয়াছেন যে, লুচিভ'জা হইলে কাহারও সাধ্য হইবে না খাঁটি গহুম ও খাঁটি সোপষ্টোনকে তফাত করে; ভেজিটেবল ঘিয়ে দুইই সমান ফুলকো হইয়া উঠিবে। শুনুন—

"আল্লা হো আকবর !
আমারে তোমার গাণ্ডীব কর হে মহাধনুর্দ্ধর !
পঙ্গুরে তুমি পাহাড়ে চড়াও, বোবারে দাও হে বাণী,
তুমি যদি কৃপা না কর দেবতা, হালে পায় নাকো পাণি।"

কবি নজরুল একবার চেষ্টা করিয়া হালে পাণি পান নাই, দেখা যাক এই মন্বন্তরের কবি বিজয়লাল অঘটন ঘটাইতে পারেন কি না !

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪২

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১০

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের stress-গুলিকে আমি স্বরবৃদ্ধি বলিব, যদিও সাধারণ অর্থে আমি 'ঝোঁক' শব্দটিই ব্যবহার করিতেছি। আমাদের উচ্চারণে সর্ব্বদা আদ্য-অক্ষরে যে ঝোঁক পড়ে, তাহা এমন নয় যে, তাহার দ্বারা ছন্দস্পন্দের কাজ চলিতে পারে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পর্ব্বভূমক ছন্দে এই ঝোঁকের উপরেই একটু জোর দিয়া তাহাকে rhythmical accent করিয়া লওয়া হইয়াছে; কিন্তু, আমি যাহাকে স্বর-বিস্ফোরণ বলিয়াছি ('বাংলা ছন্দ'-বিষয়ক প্রবন্ধে)—এ ঝোঁক সেই ছড়ার ছন্দের ঝোঁকগুলির মত প্রবল নয়; সেরূপ ধাক্কা দিয়া পড়িলে, ছন্দ সাধুভাষার ধ্বনি-ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া যেন ব্যঙ্গ করিতে থাকিবে। এই ঝোঁকগুলি মধুসূদনের ছন্দের কেবল এইটুকু উপকার করিয়াছে যে, সেই ঈষৎ-স্পৃষ্ট বর্ণগুলি চরণের ধ্বনি-প্রবাহকে একেবারে সমতল হইতে দেয় নাই। এগুলিকে স্ফুটতর করিবার জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে তিনি শব্দগুলিতে যে স্বরবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে ভাষা ও শব্দের উপরে তাঁহার কবিজনোচিত অধিকার ও আধিপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়; ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির উপরেই নির্ভর করিয়া, আর কেহ এমন ছন্দসৃষ্টির কৌশল করেন নাই। এই ঝোঁকগুলির মর্ম্ম—তাহাদের বৃদ্ধির তারতম্য, সংখ্যা, ও সজ্জা-কৌশল—তিনি মিল্টনের

ছন্দ হইতেই উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়াছিলেন। মধুসূদনের ছন্দে আমরা এই ঝোঁকগুলির যে নিয়ম লক্ষ্য করিব, মিল্টনের ছন্দেও ঠিক সেইরূপ ; সে সম্বন্ধে একজন ছন্দোবিদ্ যাহা বলিয়াছেন, এ প্রসঙ্গের ভূমিকাস্বরূপ এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।—

> "Nor should it be forgotten that the 'sense' of words, their meaning weight, their rhetorical value in certain phrases, constantly affects the theoretical number of stresses belonging to a given line ; in blank verse, for instance, the theoretical five stresses are often but three or four in actual practice, lighter stresses taking their place in order to avoid a pounding monotony."

আমি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর চরণের যে পরিচয় এক্ষণে দিব, তাহার মূলতত্ত্ব এই কথাগুলির মধ্যেই নিহিত আছে। এইবার আমি, এই ঝোঁকগুলির পরিচয় গোড়া হইতেই দিব।—

(১) মাত্র পদচ্ছেদ—ও তজ্জনিত ঝোঁক ; চরণমধ্যে তাহাদের ন্যূনতম ও অধিকতম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।—

জন্মভূমি রক্ষাহেতু । কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় । শত ধিক্ তারে !

* * *

নতুবা এসেছি মিছে । সাগরে বাঁধিয়া
এ কনক-লঙ্কাপুরে, । কহিনু তোমারে।

* * *

দানব মানব দেব । কার সাধ্য হেন,
ত্রাণিবে সৌমিত্রি তোরে । রাবণ রুষিলে ?

[৮+৬ ভাগের চৌদ্দ অক্ষরে ন্যূনতম পদচ্ছেদের সংখ্যা—চার ; অধিকতম সংখ্যা, ছয়। এইরূপ পদচ্ছেদ যে পর্ব্ব বা foot নয়, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শব্দের আয়তন ও স্বাভাবিক উচ্চারণরীতির ফলে যেখানে যে কয়টি ঝোঁক পড়িতে

পায়ে—কেবল তাহারই একটা হিসাব। প্রবল ঝোঁক বা 'beat'-এর সাহায্যে, আমাদের ভাষায় 'bar' বা অমিতাক্ষর 'foot' যে হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রাচীন পুঁথির লিপিদোষ, অথবা কবিদেরই অক্ষমতা, কিংবা ছন্দে সুর-সংযোগের ফলে, যে সকল অনিয়ম প্রাচীন বাংলা ছন্দে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা প্রকৃত-পক্ষে ছন্দপদ্ধতির লক্ষণ নয়।]

(২) ঝোঁকগুলি প্রধান ও অপ্রধান-ভেদে ছন্দকে কিরূপ স্পন্দিত করিতেছে, তাহাই দ্রষ্টব্য।—

হে রাঘবকুল—চূড়া! তব কুলবধূ
রাখে বাঁধি—পৌলস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন?—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু—

* * *

তোমর, ভোমর, শূল, মুষল মুদ্গর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে!

* * *

নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি—মহাবল রহিলা ভূতলে!

নীরব—রবাব, বীণা, মুরজ মুরলী

[প্রধান ঝোঁকের সংখ্যা সাধারণত দুই বা তিনটি, তৎসহ একাধিক অপ্রধান ঝোঁক—ছন্দস্পন্দের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু চরণের মধ্যে, শব্দের উপরে পৃথক ঝোঁকের সংখ্যা বাড়াইতে পারিলে ছন্দের ধ্বনিগৌরব বৃদ্ধি হয় এবং ছন্দের বৈচিত্র্য ঘটে।]

(৩) ঝোঁকগুলি প্রায় সমান, বিশেষ বড় ঝোঁক নাই—চরণ-মধ্যে সমাস-বদ্ধ দীর্ঘ পদের জন্যই এরূপ ঘটে; অথবা, কেবল পদচ্ছেদের

ঝোঁকগুলির দ্বারাই ছন্দ স্পন্দিত হইয়া থাকে,—ইহাতে ছন্দে লিরিক সুরের সঞ্চার হয়, যথা—

পিকবর—রব নব—পল্লব মাঝারে

* * *

কুসুমবন-জনিত পরিমল-সখা
সমীর, জুড়ায় কাণ শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব জনরব-সহ—

* * *

—যথা জলতলে

কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতে ছিলা—

(৪) বাংলা উচ্চারণরীতির সাহায্যে চরণমধ্যে কয়েকটি ঝোঁক আমদানি করা সম্ভব হইলেও, তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব কত অসমান, তাহাও লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ, পদচ্ছেদের আয়তন দুই হইতে পাঁচ অক্ষর তো হয়ই; তাহার উপর, যদি সমাসের উপদ্রব থাকে, তবে ছয় অক্ষর পর্য্যন্ত হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে, অন্তত চরণের সেই অংশে, বর্ণবৃত্তের বর্ণধ্বনিই ছন্দের লয়কে দ্রুততর করিয়া, সুরের বৈচিত্র্যবিধান করে, যথা—

নয়ন-রঞ্জন—কাঞ্চী / কৃশ—কটিদেশে

* * *

বননিবাসিনী—দাসী / নমে—রাজপদে

দৈত্যকুলদল—ইন্দ্রে / দমিনু সংগ্রামে

* * *

মুছ—অশ্রুবারিধারা / দাশরথি রথি

[এরূপ স্থলে, syllable ও accent দুইয়ে মিলিয়া ছন্দ-সঙ্গীত বৃদ্ধি করিতেছে।]

(৫) বড় ঝোঁকগুলির অবস্থানগুণে চরণমধ্যে ছন্দতরঙ্গের উত্থান-পতন নানা রকমের হইয়া থাকে। মিল্‌টনের ছন্দে এই তরঙ্গ ক্রম-উর্দ্ধমুখী হইবার যে সুযোগ আছে—বাংলায় তাহা নাই; কারণ আমাদের ছন্দের বর্ণগুলি বড় ঠাসা, এবং পর্ব্বের আভাসমাত্র নাই বলিয়া, ঝোঁকগুলি কোথাও তেমন ধারাক্রমিক হইতে পায় না। এজন্য, মিল্‌টনের চরণের মত—"O Prínce, O chiéf of mány-thróned pówers"—ছন্দতরঙ্গের এই ক্রমিক উচ্চতা (rising rhythm) আমাদের ছন্দে সম্ভব নয়। তথাপি তরঙ্গের নানাবিধ উঠা-নামা মধুসূদনের ছন্দেও দেখা যায়। কোথাও মধ্যস্থলে উঠিয়া শেষের দিকে নামিয়া গিয়াছে; কোথাও শেষ পর্য্যন্ত উচ্চতা রক্ষা করিয়াছে; কোথাও বা দুই পদভাগেরই আদিতে সমান উচ্চ হওয়ায়, ছন্দটি আর এক ভাবে দুলিয়াছে।—

অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি

* *

লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে

* * *

সোনার প্রতিমা যথা বিমল সলিলে

* * *

গ́রজিল গ́জ, শ́ঋ নাদিল ভৈরবে।

* * *

ম́জালে রা́ক্ষসকুলে ম́জিলে আ́পনি!

এ পর্য্যন্ত, আমি ছোট ও বড় 'ঝোঁক' এবং তদ্দ্বারা ছন্দস্পন্দ-(rhythm)-সৃষ্টির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। এইবার সামান্ত ঝোঁকগুলিকে জোরালো করিবার উপায় এবং সেগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিবার যে কৃতিত্ব, সে সম্বন্ধে সবিস্তারে কিছু বলিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাংলা বাক্যের উচ্চারণে প্রত্যেক পৃথক শব্দের বা বাক্যাংশের আদ্য-অক্ষরে যে একটু ঝোঁক পড়ে, মধুসূদন তাহা দ্বারাই তাঁহার চরণগুলির rhythm-এর গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু এই ঝোঁকগুলি একটু বৃদ্ধি করিতে না পারিলে ছন্দ রীতিমত তরঙ্গিত হইতে পারে না,—যদিও গীতিসুরের ছন্দে তাহার দ্বারাই কাজ চলিতে পারে। অতএব, মিল্টন যেমন ইংরেজী শব্দের মৌলিক (Etymological) accent-কেই সাধারণভাবে কাজে লাগাইয়া, তাঁহার অমিত্রাক্ষরের ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন,—তেমনই, মধুসূদনও প্রায় সেই কৌশলে ভাষার সেই সামান্ত ঝোঁকগুলিকে বাংলা অমিত্রাক্ষরের উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি প্রধানত, বাক্যরীতি- এবং শব্দের ভাব-অর্থ-ঘটিত গুরুত্ব ('meaning weight', 'rhetorical value') এই দুইয়ের উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন। কিন্তু, কাব্যের ভাষা গদ্যের ভাষা নয় বলিয়া, যে সকল শব্দালঙ্কার সেই ভাষাকে সমৃদ্ধ করে, তাহাও এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছে। আমি এই উপায়গুলির একটি তালিকা দিলাম।

(১) বাক্যরীতির (Syntactical বা Logical) কারণে শব্দ-বিশেষে স্বরবৃদ্ধি; অর্থাৎ, বাক্যের মধ্যে যে শব্দগুলি প্রধান—তাহারই উপরে স্বাভাবিক ঝোঁক পড়িয়াছে,—

যা কহিলে—সত্য,—ওহে অমাত্য-প্রধান—
সারণ!—জানি হে আমি—এ ভবমণ্ডল
মায়াময়,—বৃথা এর—দুঃখ-সুখ যত!
* * *
নিশায়—পাইলে রক্ষা, মারিব—প্রভাতে।
* * *
এ—বৃথা গঞ্জনা,—প্রিয়ে,—কেন দেহ—মোরে?
গ্রহদোষে—দোষী-জনে—কে নিন্দে—সুন্দরী?

[এই বাক্যরীতিঘটিত উপায়টিই স্বরবৃদ্ধির প্রধান উপায়—এবং সর্ব্বত্র তাহাই দেখা যাইবে। কিন্তু মধুসূদন ইহার মর্ম্ম যেমন বুঝিয়াছিলেন—যে ভাবে Logical accent ও Rhythmical accent-কে তাঁহার ছন্দে এক করিয়া লইয়াছিলেন—তেমনটি তাঁহার পরবর্ত্তী কবিদের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই; তাহার কারণ, তাঁহারা 'অমিত্রাক্ষর'-ছন্দের কেবল ওই নামটাই বুঝিয়াছিলেন—এ ছন্দের জ্ঞানই তাঁহাদের ছিল না।]

(২) উপরে প্রদর্শিত ওই জাতীয় ঝোঁক ছাড়াও আর একপ্রকার ঝোঁক—যাহাকে বক্তার নিজের ভাব-অনুরূপ কণ্ঠস্বরের জোর (Rhetorical বা Emphatic) বলা হইয়া থাকে, তাহাও এই ছন্দে বড় কাজে লাগিয়াছে। এই ধরনের ঝোঁকই সবচেয়ে বড় ঝোঁক—

নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী

বধিল সম্মুখরণে? ফুলদল দিয়া

কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে!

* * * *

এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে!

শতপুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি!

* * *

হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!

রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে

আনিলে এ কথা তাত, কহ তা' দাসেরে!

স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;

পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি

ধূলায়!

[উপরে আমি কেবল Rhetorical accent-গুলিই চিহ্নিত করিয়াছি—অন্যবিধ ঝোঁকও যথাস্থানে আছে।]

এইবার, কাব্যকলাকৌশল বা শব্দালঙ্কার-ঘটিত ঝোঁকের নমুনা দিব। ইহাকেও দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়—

(ক) অনুপ্রাস। [অনুপ্রাসের দ্বারা কাব্যভাষার সৌন্দর্য্য এবং ছন্দের যে মাধুরী বৃদ্ধি হয়, সে কথা যথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছি। কিন্তু মিলটনের ছন্দের মত মধুসূদনের ছন্দকেও এই অনুপ্রাস কতখানি ধারণ করিয়া আছে, তাহাও লক্ষণীয়,—যেখানে শব্দহিসাবে অতি সামান্য ঝোঁক মাত্র পড়ে, সেখানে এই অনুপ্রাস সেই শব্দকে বাজাইয়া ঝোঁকের কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি সাধন করে। 'মেঘনাদে'র ভাষায় প্রায় আগাগোড়া

অনুপ্রাসের এমন ছড়াছড়ি যে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, মধুসূদন প্রায় প্রত্যেক চরণকে অল্পবিস্তর অনুপ্রাস-শিঞ্জনে শিঞ্জিত করিয়াছেন—সর্ব্বত্র কেবল ঝোঁকবৃদ্ধির জন্যই নয়। আমি এখানে তাহার কয়েকটি মাত্র, ছন্দস্পন্দের কৌশল-হিসাবে, উদ্ধৃত করিতেছি। এখানেও অন্যবিধ ঝোঁক চিহ্নিত করিব না; যেখানে অনুপ্রাস ছাড়া ঝোঁকের অন্য কারণ আছে, সেখানেও ঝোঁক-চিহ্ন দিলাম না।]

সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে।

* * *

ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র রণে।

কি সাধ্য আমার সাধিব, রোধি আমি গতি?

* * *

রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে,

* * *

মানস সকাশে শোভে কৈলাস-শিখরী

আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন।

* *

দ্বিরদরদনির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া

কাঁদে অনুসূয়া সই বিলাপি বিষাদে।

* * *

এ বর বরণ মম—

উপরে আমি কেবল অনুপ্রাস দ্বারা ঝোঁকবৃদ্ধির উদাহরণ দিলাম; ইহাতে কেবল ঝোঁকের সংখ্যাবৃদ্ধিই হয় না—যেখানে ঝোঁক স্বভাবতই অল্প, সেখানেও তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

(খ) যমক, একই শব্দের পুনঃপ্রয়োগ, চরণের মধ্যে শব্দের মিল-জনিত অনুপ্রাস,—প্রভৃতির দ্বারা ছন্দকে স্পন্দিত করিবার উপায়। এইগুলিতে কোথাও আমি ঝোঁক-চিহ্ন দিলাম না; চিহ্ন না দেখিয়া,

কেবল, একটু মনোযোগ সহকারে আবৃত্তি করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে —কোথায় ঝোঁকটি কি কারণে স্পষ্টতর হইয়াছে।—

হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী
* * *
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে।
* * *
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা গদাধর যথা।
* * *
রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
* * *
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর ভালে।
* * *
খুল্লতাত বিভীষণ বিভীষণ রণে।
* * *
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে।

১১

এতক্ষণ আমি, মধুসূদনের ছন্দে, আগু-অক্ষরে স্বরবৃদ্ধির দ্বারা ছন্দ স্পন্দিত করিবার নানা উপায় বিশেষ করিয়া দেখাইলাম। এইবার এই স্বরবৃদ্ধির একটি অন্য উপায়, ও তাহার বিশিষ্ট গুণের উল্লেখ করিব। 'মাত্রা' বা 'quantity' বলিতে যে ধরনের স্বরবৃদ্ধি বুঝায়—মধুসূদনের ছন্দে তাহারও অবকাশ রহিয়াছে, দেখা যায়। যদিও দীর্ঘস্বরের গুরুত্ব বাংলা ভাষার স্বভাবসিদ্ধ নয়—বাংলা ছন্দেরও প্রকৃতিগত নয়, তথাপি, ওই-জাতীয় স্বরধ্বনিও ইহার ছন্দস্পন্দকে সমৃদ্ধ

করিয়াছে। কোনরূপ হিসাবের মধ্যে ইহাকে পাওয়া না গেলেও, এবং এ ছন্দের Rhythm মুখ্যত ওই ঝোঁকগুলির দ্বারাই সম্পন্ন হইলেও, পাঠক পড়িবার সময়ে কানকে একটু সজাগ রাখিলেই বুঝিতে পারিবেন—কোন্ কোন্ স্থানে অক্ষরের দীর্ঘস্বর সত্যই একটু দীর্ঘত্ব কামনা করে; তাহাতে ছন্দস্পন্দের যেমন বৈচিত্র্য ঘটে, তেমনই তাহার সঙ্গীত-গুণও বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে, ছন্দের সঙ্গীতটি সম্পূর্ণ আদায় করিবার মত ছন্দরসপিপাসাও পাঠকের থাকা চাই। মাত্রাজাতীয় স্বরবৃদ্ধি হয় দুই কারণে; প্রথম, যুক্তবর্ণের অবস্থান: দ্বিতীয়, দীর্ঘস্বরযুক্ত বর্ণ। আমি এ পর্য্যন্ত স্বরবৃদ্ধির প্রসঙ্গে যুক্তবর্ণের উল্লেখ করি নাই; তাহার কারণ, এই যুক্তাক্ষরের জন্য পূর্ব্ব-অক্ষরে যে ঝোঁক পড়ে তাহা একটু ভিন্ন রকমের—উহা কতকটা সংস্কৃত গুরুবর্ণের মত। 'সম্মুখ সমরে'—এখানে 'সম্মুখে'র 'সম্', 'কশ্চিৎ কান্তা'র 'কশ্', অথবা 'পশ্যতি'র 'প'এর মত গুরু অক্ষর। যদিও এই গুরুত্ব ঠিক দীর্ঘস্বরযুক্ত অক্ষরের সমতুল্য নয়, তথাপি এই স্বরবৃদ্ধি ঠিক stress-এর মতও নয়; উচ্চারণে একটু দীর্ঘতার আভাস আছে। প্রসঙ্গক্রমে, এইখানে, একটা অপণ্ডিতসুলভ কথা বলিব; প্রাচীন বা আধুনিক সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রীরা এ পর্য্যন্ত তাহা বলিয়াছেন কি না জানি না। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে, যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণও যেমন গুরু, দীর্ঘস্বরমাত্রাও তেমনই গুরু—দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা গণনার মধ্যে আসে না। 'কশ্চিৎ কান্তা'র আদ্য-অক্ষর ওই 'ক', এবং মধ্যের ওই 'কা' এই দুইয়ের স্বরবৃদ্ধি নিশ্চয় একরূপ নহে। অতএব, এমন কথা বলিলে ভুল হইবে না যে, সংস্কৃত ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গের যে বৈচিত্র্য এমন শ্রুতিসুখকর হয় তাহার মূলে আছে, এই বিভিন্ন মাত্রাধ্বনির সমাবেশ—চরণমধ্যে ওই দুই-জাতীয় অক্ষরের গণনা একই হিসাবে করিলে চরণগুলির ধ্বনিবৈচিত্র্য অস্বীকার করা হয়।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। মধুসূদনের ছন্দেও স্বরবৃদ্ধির যে মাত্রাগুণ আছে, তাহার একটি ওই-জাতীয়, অর্থাৎ যুক্তাক্ষরঘটিত। বাংলা সাধুভাষার পর্ব্বভূমক ছন্দে যে Rhythmical accent অধুনা আমরা পাইয়াছি, তাহা কথ্য বাংলার ছড়ার ছন্দের মত ধাক্কাযুক্ত নয়; ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির বশে তাহা ঈষৎস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, যুক্তাক্ষর সহযোগে এই ঝোঁক স্ফুটতর হয়। মধুসূদনের ছন্দে এইজন্য ইহার মূল্য সমধিক হইয়াছে। তথাপি ইহাকে আমি খাঁটি stress বা আঘাত-মূলক স্বরবৃদ্ধি না বলিয়া একরূপ মাত্রাগন্ধী 'গুরু'-ঝোঁক হিসাবে ইহার প্রাথমিক আলোচনা করিব। প্রথমে আমি ইহারই কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি; লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইহা সর্ব্বত্র আদ্য-অক্ষরের ঝোঁক নয়।—

দুরন্ত কৃতান্ত দূত সম পরাক্রমে

*   *   *

মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী

*   *   *

হে কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব! মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী?

*   *   *

অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাচিছে হুঙ্কারে

[ইহার সহিত, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি দুইটিতে যুক্তাক্ষর-পূর্ব্ব বর্ণের ঝোঁক তুলনীয়:—

তোমরা বিপ্র হয়ে ভৃত্যকার্য্য করে' বাড়ি ফিরে'
শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে—

মধুসূদন যে ধরনের ঝোঁক তাঁহার ছন্দে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা স্বরধ্বনি-প্রধান ভাষারই উপযোগী। এ বিষয়ে তাঁহার কান এত সজাগ ছিল যে, তিনি কোথাও প্রাচীন কবিদের মত কোন কারণে, 'হৈল' 'কৈল'—প্রভৃতিরও শরণাপন্ন হন নাই।]

যুক্তবর্ণঘটিত স্বরবৃদ্ধির—এবং তদ্দ্বারা ছন্দস্পন্দ-সৃষ্টির উপায় সম্বন্ধে ইহার অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এইবার দীর্ঘস্বরঘটিত মাত্রাবৃদ্ধি ও সেই কারণে ছন্দের গৌরববৃদ্ধির নমুনা দিব—

(১) যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণে দীর্ঘস্বর থাকায় তাহার মাত্রাবৃদ্ধি।

রত্নাকর রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী।

* * *

নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে।

* * *

যাদঃপতি-রোধ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।

(২) দীর্ঘস্বরের জন্যই অক্ষরের মাত্রাবৃদ্ধি।

ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,

আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি
তোমার।

* * *

দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে

* * *

সুবর্ণদীপ-মালিনী রাজেন্দ্রাণী যথা

রত্নহারা।

* * *

এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ডটঙ্কারে।

* * *

ওই ভীম বামকরে

কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্তধামে

!!

* *

উড়িছে কৌশিক ধ্বজ...

সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে...

[মধুসূদন বোধ হয় এইজন্যই, ঐ-কার ও ঔ-কারের ব্যবহারে কার্পণ্য করেন নাই।]

উপরে দীর্ঘস্বরজনিত স্বরবৃদ্ধির যে উদাহরণগুলি দিলাম, তাহাদের ঠিক ওই গুণ ওই স্থলে আছে কি না—পাঠকের নিজের ছন্দরসবোধ ও আবৃত্তি-কৌশল তাহার মীমাংসা করিবে। আমি কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মধুসূদনের নিজের যে এই দিকে দৃষ্টি ছিল, তাহা, তাঁহার ছন্দ ভাল করিয়া পাঠ করিলে অনুমান করা যায়। তাহা ছাড়া, তাঁহার নিজেরই কথায় একটু প্রমাণ হয় যে, তিনি স্থানবিশেষে বাংলা অক্ষরের দীর্ঘমাত্রা মানিতেন, যথা (একখানি পত্রে)—

> Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long....In that description of evening you have these lines—
>
> আইলা তারাকুন্তলা, শশীসহ হাসি
> শর্ব্বরী;
>
> —How, if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারুতারা, you improve the music of the line, because the double syllable ন্ত mars the strength of লা। Read—
>
> আইলা সুচারুতারা, শশীসহ হাসি
> শর্ব্বরী—"

—ইহা হইতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, মধুসূদনের কানে, স্থানবিশেষে এবং শব্দবিশেষে, দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতার প্রয়োজন-বোধ ছিল। ইহার পরে, মধুসূদনের ছন্দ সম্বন্ধে বোধ হয় এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে—

> "As we listened it was easy to believe that 'stress' and 'quantity' and 'syllable' all playing together like a chime of bells, are concordant and not quarrelsome elements in the harmony of Modern Bengali Verse."

১২

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-চরণে বাংলা ছন্দের একটা প্রাথমিক অভাব দূর করিয়া কি উপায়ে বৃহত্তর ও জটিলতর ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যতদূর সাধ্য সবিস্তারে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে এই ছন্দের অপর প্রধান উপাদান—ইহার নূতন যতি-বিন্যাস, বা যতিস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে কিছু বলিব। মধুসূদন যেমন এই ঝোঁকগুলি দ্বারাই Rhythm সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইলেন, তেমনই, ছন্দের ছাঁদ (৮+৬), এবং ছন্দের তরঙ্গটি রক্ষা করিয়া, যে কোন ছেদকে বাক্য বা বাক্যাংশের ছোট-বড় বিরাম-স্থল করিয়া লইতে, তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি ও দেখাইয়াছি, পয়ারের দুই পদভাগের শেষে যে দুইটি যতি আছে, তাহা এখানেও লুপ্ত হয় না; কেবল, চরণান্তিক যতিটি এক্ষণে আর সর্ব্বত্র pause বা বিরাম-যতি হইতে পারিতেছে না; কিন্তু উভয় যতিই সর্ব্বত্র ছন্দ-যতির যাহা কাজ সেই কাজ করিতেছে, অর্থাৎ, চরণের পদভাগ ঠিক রাখিয়া তাহার গতিকে পূর্ব্ববৎ ছন্দিত করিতেছে। আমি অতঃপর এই দুই প্রকার যতির দুই পৃথক নাম দিব—ছন্দভাগের যতিকে (Caesura, Harmonic pause) 'ছন্দ-যতি', এবং বাক্যাংশ বা বাক্যশেষের যতিকে 'বিরাম-যতি' বলিব। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে এই দুই প্রকার যতির পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইবে।—

বহিছে পরিখারূপে / বৈতরণী নদী /
বজ্রনাদে ;+ রহি রহি / উথলিছে বেগে /
তরঙ্গ,+উথলে যথা / তপ্তপাত্রে পয়ঃ /
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ,+/ ত্রস্ত অগ্নিতেজে ! //
নাহি শোভে দিনমণি / সে আকাশ দেশে ;+/
কিম্বা চন্দ্র,+কিম্বা তারা ;+ / ঘন ঘনাবলী, /
উগরি পাবকরাশি, / ভ্রমে শূন্যপথে /

বাতগর্ভ,+গর্জ্জি উঠে, / প্রলয়ে যেমতি /
পিনাকী,+পিনাকে ইষু / বসাইয়া রোষে। //

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা—কারণ, (১) এই পংক্তিগুলিতে ছন্দ-যতি ও বিরাম-যতি সর্ব্বত্র নির্ব্বিরোধে অবস্থান করিতেছে; (২) বিরাম-যতির স্থান একরূপ নহে—৮ অক্ষরের মত, ৩ ও ৪ অক্ষরেও বিরাম ঘটিয়াছে (এ বিষয়ে আরও বৈচিত্র্য দেখা যাইবে); (৩) বিরাম-কালের স্বল্প-দীর্ঘ ভেদ রহিয়াছে। পংক্তিগুলির মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ আছে দুইটি; তৎসত্ত্বেও, সব পংক্তিগুলি মিলিয়া একটি পূর্ণ ছন্দ-মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে অমিত্রাক্ষরের 'Verse Paragraph' বা 'ছন্দ-ব্যূহ' বলে। এ সম্বন্ধে পরে বলিব। এক্ষণে উপরের verse paragraph-টির মধ্যে দুই প্রকার যতি-স্থান লক্ষ্য করিতে বলি; এবং আরও লক্ষ্য করিতে বলি—ওই বিরাম-যতিগুলি সত্ত্বেও সর্ব্বত্র সেই (৮+৬)-এর ছন্দ-যতি বজায় রহিয়াছে। ছন্দ-যতির চিহ্ন (/) এইরূপ, বিরাম-যতির চিহ্ন (+) এইরূপ, এবং পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন (//) এইরূপ দিয়াছি।

মধুসূদনের ছন্দে, কোন কোন স্থানে বিরাম-যতি ও ছন্দ-যতির এইরূপ নির্ব্বিরোধ অবস্থান দেখা যায় না, কিন্তু তাহাতে ছন্দ-হানিও হয় নাই। তথাপি, এই ছন্দের স্বাভাবিক (normal) গতি যে ওই নিয়মকেই মানিয়া চলে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, মধুসূদনের ছন্দ মহা-কাব্যের ছন্দ, এজন্য এ ছন্দে সর্ব্ববিধ বৈচিত্র্যবিধান যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই মধুসূদন নিজেও সর্ব্বত্র ছন্দের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহাও নিশ্চিত। আমি এইবার কয়েকটি এমন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, যাহাতে দেখা যাইবে, এই যতি-স্বাচ্ছন্দ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।—

(১) পশিল কাননে দাস;+/ আইল গর্জ্জিয়া /
সিংহ;+বিমুখিনু তাহে, / ভৈরব হুঙ্কারে /

বহিল তুমুল ঝড় ;+ কালাগ্নি সদৃশ /
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ;+/ পুরিল চৌদিকে /
বনরাজি ;+কতক্ষণে / নিবিলা আপনি
বায়ুসখা,+বায়ুদেব / গেলা চলি দূরে ।//

(২) দীপিছে ললাটে /
* শশিকলা,+মহোরগ-ললাটে যেমতি /
মণি !+জটাজুট শিরে+/ তাহার মাঝারে /
জাহ্নবীর ফেনলেখা+/ শারদ নিশাতে /
কৌমুদীর রজোরেখা / মেঘমুখে যেন !//

(৩) গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া / কোষাকোষী+ভরা /
হে জাহ্নবী, তব জলে+/ কলুষনাশিনী /
তুমি !+পাশে ঘণ্টা ; / উপহার নানা /
হেমপাত্রে ;+ রুদ্ধদ্বার ;+/ বসেছে একাকী /
রথীন্দ্র,+নিমগ্ন তপে / চন্দ্রচূড় যেন /
যোগীন্দ্র,+ কৈলাসগিরি, / তব উচ্চচূড়ে ।//

উপরে আর সব পংক্তির যতি-স্থান ঠিক আছে, কেবল (*) চিহ্নিত পংক্তিটির যতি-বিন্যাসে যেন নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। এখানে আট-ছয়ের মধ্যবর্ত্তী ছন্দ-যতিটি লোপ পাইয়াছে। এইরূপ আরও একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি—

ভেবে দেখ মনে, শূর,+/ কালসর্প-তেজে /
* তবাগ্রজ,+ / বিষদন্ত তার / মহাবলী /
ইন্দ্রজিৎ।

ইহার প্রথমটিতে যতিভঙ্গ-দোষ হইয়াছে ;—'মহোরগ-ললাটে', এই শব্দ দুইটির যতি রক্ষা করিতে গেলে অন্বয় রক্ষা হয় না ; অতএব এখানে ছন্দেরই দোষ ঘটিয়াছে। এইরূপ যতিভঙ্গ-দোষ মেঘনাদের ছন্দে অনেক স্থলে আছে ; বিশেষত এক ধরনের যতি-ভঙ্গকে কবি যেন, ভাবের বাক্য-স্রোতে ভাসিয়া, গ্রাহ্য করা আবশ্যক মনে করেন নাই ;

অলঙ্ঘ্য-সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে !
* * *
নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন !

এইরূপ আরও আছে। ইহার কোন কৈফিয়ৎ নাই। কিন্তু উপরে (*) চিহ্নিত দ্বিতীয় পংক্তিটির কথা স্বতন্ত্র। এখানে ছন্দ-যতির স্থান রীতিমত ঘটিয়াছে—যেন, আট অক্ষরের প্রথম পদভাগকে দুই ভাগ করিয়া (৪+৪), তাহার ফাঁকে দ্বিতীয় পদভাগটিকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে; ফলে, চরণের মধ্যে দুইটি ছন্দ-যতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রথমটিতে ছন্দ-যতি ও বিরাম-যতি—দুই যতিই আছে; দ্বিতীয়টিতে কেবল ছন্দ-যতিই আছে। এইরূপ যতিবিপর্য্যয় 'মেঘনাদে'র ছন্দে খুব বেশি না থাকিলেও, ইহাকে ছন্দ-দোষ বলা যাইবে কি না সে বিষয়ে আমি নিসংশয় নহি। মধুসূদন, তাঁহার ছন্দে সর্ব্ববিধ বিরাম-যতির ব্যবস্থা করিয়াও, কোথাও ছন্দ-যতিকে স্থানচ্যুত করেন নাই; এমন কি, ছন্দের এই অবারিত গতিমুখে, তিনি (৮+৬)-এর পরিবর্ত্তে (৬+৮)-এর ছন্দভাগও পছন্দ করেন নাই; কারণ, উহাতে এ ছন্দের প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্য, আমার মনে হয়, যেহেতু এখানেও কানে ছন্দ ঠিক আছে, অতএব এমন একটা কিছু এখানে ঘটিয়াছে, যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত (৮+৬)-এর যতি কোন না কোন প্রকারে বজায় আছে, কান ওই (৮+৬)-এর ছাঁদকে হারাইয়া ফেলে না। আমি ইহাতেও সেই (৮+৬)-এর ভাগ দেখিতেছি; কেবল, আটের ভাগটি খণ্ডিত (split) হইয়া ছয়ের ভাগকে মাঝে বসাইয়াছে। আরও একটি যতি-ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক—

যোগাতেন আনি
নিত্য ফলমূল / বীর সৌমিত্রি / +মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু ;

এখানেও, দ্বিতীয় পংক্তিটিতে বিরাম-যতি পড়িয়াছে 'সৌমিত্রি'র পরে ; তাহাতে মাঝের ছন্দ-যতিটি যেন লোপ পাইয়াছে ; এবং, ওই মাঝের পদটিতে ছয় অক্ষরও নাই। তথাপি, এখানে ছন্দ-যতি লোপ পাইতেছে অন্য কারণে। বিরাম-যতিটি ১১ অক্ষরের পরে থাকা সত্ত্বেও ছন্দ ক্ষুণ্ণ হয় না, তাহার প্রমাণ—

অদূরে শোভিল বনে°/—দেউল, +উজলি
সুদেশ।

এখানে যথাস্থানে স্বাভাবিক ঝোঁক পড়ার ফলে, আট অক্ষরের ছন্দ-যতিটি অক্ষুণ্ণ আছে। 'দেউল' শব্দটির উপরে Logical accent একটু প্রবল হওয়ায়, উহার আগে ও পরে, যে সামান্য যতির প্রয়োজন তাহাতেই, সুকৌশলে ছন্দ-যতি ও বিরাম-যতির বিরোধ মিটিয়াছে। এখানে ছন্দ-যতিটি বিরাম-যতির সহযোগিতা করিতেছে। আবার 'উজলি'র উপরেও বাক্যরীতিঘটিত একটু বিশেষ ঝোঁক পড়ে, এজন্য তাহার একটু পৃথক উচ্চারণের ব্যবস্থা ঠিকই হইয়াছে। প্রথম নমুনাটিতে এইরূপ যথাস্থানে আবশ্যকমত ঝোঁক পড়ে না বলিয়াই, ওই ছন্দ-যতিটিকে কষ্টে উদ্ধার করিতে হয়। এখানে 'বীর' ও 'সৌমিত্রি' দুইয়েরই ঝোঁক সমান, এবং শব্দ দুইটি অন্বয়-বদ্ধ, যথা—

নিত্য ফলমূল বীর—সৌমিত্রি, মৃগয়া—

এই মাঝের ছন্দ-যতিটি রক্ষা করা দুরূহ। পড়িবার সময়ে

'সৌমিত্রি'র উপরে একটু বেশি ঝোঁক দিলে, যতিস্থান বজায় থাকিবে, এবং ছন্দটিও নির্দ্দোষ হইবে।

এই বিরাম-যতির সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। মধুসূদন তাঁহার ছন্দে, শব্দের মধ্যে বা শেষে হসন্ত-বর্ণ-ধ্বনি সম্বন্ধে বেশ একটু সজাগ ও সতর্ক ছিলেন—ছন্দের স্বর-বৈচিত্র্য, ও যথাস্থানে গীতিকলধ্বনির প্রয়োজনে, তিনি হসন্তের ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু যতিস্থানের অক্ষরগুলিকে যতদূর সম্ভব স্বরান্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। 'মেঘনাদে'র যে কোন একটা অংশ পড়িলে দেখা যাইবে—মধুসূদনের ছন্দের যতিস্থানে স্বরান্ত অক্ষরই সংখ্যায় অধিক। উপরের উদ্ধৃত পত্রাংশেও, অন্তত ওই অষ্টম অক্ষরের যতিস্থানে তাঁহার এ বিষয়ে সতর্কতার প্রমাণ রহিয়াছে। ইংরেজী ছন্দেও masculine ও feminine pause নামে যতির যে একটা প্রকারভেদ করা হয়, বাংলায় সেইরূপ এই স্বরান্ত যতিগুলিকে masculine pause বা 'ধীর যতি', এবং ওই হসন্ত-শেষ যতিগুলিকে feminine বা 'ললিত যতি' নাম দেওয়া যাইতে পারে। আমি এখানে মধুসূদনের ছন্দে এই দ্বিবিধ যতির কিছু নমুনা দিব :—

দণ্ডক ভাণ্ডার যার / ভাবি দেখ মনে
কিসের অভাব তার ? / যোগাতেন আনি
নিত্য ফলমূল বীর / সৌমিত্রী ; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু ; / কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, / রাঘবেন্দ্র বলী—
দয়ার সাগর নাথ, / বিদিত জগতে ;

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে দেখা যাইবে অধিকাংশ হসন্ত-ব- পদশেষে (যতির স্থানে) না থাকিয়া পদমধ্যে রহিয়াছে। তথাপি এখানে কয়েকটি feminine pause বার বার আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার

সহিত অপর যে কোন স্থানের কয়েক পংক্তির তুলনা করিলে দেখা যাইবে, মধুসূদন সাধারণত 'ললিত যতি' অপেক্ষা 'ধীর যতি'রই অধিকতর পক্ষপাতী ; আমার মনে হয়, এইজন্যই তিনি বাংলা কর্ম্ম-কারকে এ-বিভক্তি, এবং বাংলা শব্দের শেষে সংস্কৃতের মত বিসর্গ ব্যবহার করিয়াছেন।—

বননিবাসিনী দাসী / নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র ! যদিও তুমি / ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু / পারে কি অভাগী ?
হায়, আশামদে মত্ত / আমি পাগলিনী !
হেরি যদি ধূলারাশি, / হে নাথ, আকাশে ;
পবন-স্বনন যদি, / শুনি দূর বনে ;
অমনি চমকি ভাবি, /—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, / পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজিরাজি, / শূরথ, সারথি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ ! / আশার ছলনে
প্রিয়ংবদা, অনসূয়া, / ডাকি সখীদ্বয়ে ;

যতিস্থানের অক্ষরগুলি চিহ্নিত করিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে, উপরের পংক্তিগুলিতে একটিও 'ললিত যতি' (feminine pause) নাই।

১৩

এইবার মধুসূদনের ছন্দের যাহা প্রথম ও শেষ, অর্থাৎ প্রধানতম লক্ষণ, তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া এই ছন্দ-পরিচয় শেষ করিব। মধুসূদনের এই মিল্‌টন-অনুগামী ("তব অনুগামী দাস") অমিত্রাক্ষর-ছন্দের

প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহার Verse-Paragraph বা ‘পদ্যপংক্তি-ব্যূহ’। বাংলা নামটা একটু শ্রুতিকটু হইল, কিন্তু ঠিক অর্থটি বজায় রাখিতে হইলে নামটিকে আরও ছোট করা দুরূহ। আমি সংক্ষেপে ‘পংক্তিব্যূহ’ বলিব। এই পংক্তিব্যূহ-রচনাতেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর প্রকৃত ছন্দ-গৌরব লাভ করিয়াছে। কেবল ছন্দ-যতিকে গৌণ করিয়া বিরাম-যতিকে মুখ্য করিয়া তোলাই ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়—এ কথা আমাদের ছন্দশাস্ত্রীরা একবারও ভাবিতে পারেন নাই। বাংলা ছন্দের পরিচয় দিতে গিয়া, তাঁহারা, সমুদ্রকেও পুষ্করিণীর, এবং হিমালয়কেও উইটিবির সমশ্রেণী বলিয়া প্রমাণ করিতেই ব্যস্ত; যাহারা গোঠে-মাঠেই বিচরণ করে, তাহারা পাঁচনবাড়ি অপেক্ষা বড় মাপকাঠি কোথায় পাইবে? এই Verse-Paragraph-এর জন্যই মধুসূদনের ছন্দ মিল্‌টনের ছন্দের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে—এবং ইহারই গুণে, ওই এক ছন্দে একখানি বৃহৎ কাব্য বিচিত্র সঙ্গীতস্রোতে প্রবাহিত হইয়া, ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুরের আবর্ত্তন রক্ষা করিতে পারিয়াছে; নতুবা, কেবল চরণমধ্যে যতি-স্বাচ্ছন্দ্যের গুণেই ওই এক ছন্দে মহাকাব্য রচনা করা যাইত না। এই Verse-Paragraph-এর আয়তন ছোট বা বড় হইতে পারে; কিন্তু, ইহা তিনটি বা চারিটি পংক্তির ব্যাপার নয়। স্বল্প ও দীর্ঘ বিরাম-যুক্ত বহু বাক্য ও বাক্যাংশের সমাহার—বা, সঙ্গীত-সঙ্গতির সহায়ে, একটি ভাব, একটি চিত্র, বা একটি ব্যাখ্যান যে পূর্ণ ছন্দ-রূপ লাভ করে—তাহাই অমিত্রাক্ষরের পংক্তিব্যূহ। এ যেন ছন্দের এক-একটি সৌরমণ্ডল—প্রত্যেক গ্রহের নিজস্ব গতি যেমন আছে, তেমনই, সকলে একটি এক-কেন্দ্রিক বৃহত্তর গতিচক্রের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমি মূল প্রবন্ধের একটি প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই কিছু আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু এখানেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিবার উপায়

নাই—কারণ, এ বিষয়ে কোন মাপ-যন্ত্রের আস্ফালন চলিবে না ; এখানে কেবল কাব্যের সুরে নিজের কান মিলাইতে হয়, এই 'পংক্তিব্যূহ'গুলি বার বার পড়িতে হয়। এ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিক কিছু বলিবার নাই। তাঁহার মতে—

> "These combinations or paragraphs are informed by a perfect internal concent and rhythm—held together by a chain of harmony. With a writer less sensitive to sound this free method of versifying would result in mere chaos. But Milton's ear is so delicate that he steers unfaltering through these long involved passages, distributing the pauses and rests, and alliterative balance with a cunning which knits the paragraph into a coherent regulated whole."

—এ সম্বন্ধে ইহার বেশি কেহ বলিতে বা বুঝাইতে পারেন না। মিল্‌টনের একটি Verse-Paragraph, ও তাহার পরেই মধুসূদনের একটি, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; পাঠকের যদি একটু ছন্দরস-বোধ থাকে (এবং সেই অনুপাতে ছন্দের ব্যাকরণবিদ্যা কম হয়), তাহা হইলে তিনি, যে বস্তুটি এত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা কানের দ্বারাই বুঝিয়া লইতে পারিবেন।—

> Now came still Evening on, and Twilight gray
> Had in her sober livery all things clad ;
> Silence accompanied ; for beast and bird,
> They to their grassy couch, these to their nests,
> Were slunk, and all but the wakeful nightingale ;
> She all night long her amorous descant sung :
> Silence was pleased. Now glowed the firmament
> With living sapphires ; Hesperus, that led
> The starry host, rode brightest, till the Moon,
> Rising in clouded majesty, at length
> Apparent queen, unveiled her peerless light,
> And o'er the dark her silver mantle threw ;

এবং—

হাসি দেখা দিল উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে
দুঃখতমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে; উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা শততারাতেজে!
ফুটিল কুন্তলে ফুল নব-তারাবলী!

এই সঙ্গে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' হইতে একটি পংক্তিব্যূহ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে দেখা যাইবে, বিভিন্ন আয়তনের ছোট-বড় পদ, এবং নানাবিধ ঝোঁকের 'rhythm'—held together by a chain of harmony'—কি সুন্দর ও সুসম্পূর্ণ ছন্দমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে!—

যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তব চন্দ্রমুখ—অতুল জগতে!
যে দিন প্রথম তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে।
এ পোড়া বদন মুহু হেরিনু দর্পণে;
বিনাইনু যত্নে বেণী; তুলি ফুলরাজি,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে!
চির পরিধান মম বাকল; ঘৃণিনু
তাহায়। চাহিনু কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকুল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে।
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে!
হায়রে, অবোধ আমি! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে?

কিন্তু বুঝি এবে, বিধু! পাইলে মধুরে
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী!—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি!

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে ইহার অধিক বলিবার অবকাশ উপস্থিত নাই—বোধ হয়, প্রয়োজনও নাই; অনেক সূক্ষ্ম বিচার যে বাদ পড়িল তাহাও স্মরণ আছে। কিন্তু আজ বাংলা কবিতা ও বাংলা ছন্দের যে দিন আসিয়াছে, তাহাতে সহস্র বিচারে কিছু হইবে বলিয়া আশা করি না। কেবল, যাঁহারা আধুনিক বাংলা ছন্দের পরিচয় লইবেন, তাঁহারা যাহাতে এই একটি কথা বুঝিতে পারেন যে, মধুসূদনের ছন্দ শুধুই একটা নূতন ছন্দ-সৃষ্টি নয়, উহা একাই বাংলা-ছন্দের একটা সম্পূর্ণ পৃথক রাজ্য; আর যাবতীয় বাংলা ছন্দ গীতিচ্ছন্দ, কেবল ভগবানের আশীর্ব্বাদে, আমরা ওই একটি অপর ছন্দ লাভ করিয়াছি—যাহার দ্বারা কাব্যচ্ছন্দকেই, সাগর-কল্লোল হইতে তটিনীর কলধ্বনি পর্য্যন্ত, সকল সুরে ঝঙ্কৃত করা যায়; বিশেষ করিয়া, জীবন ও জগতের যাবতীয় প্রত্যক্ষ রূপরসের অনুভূতিকে মানবকণ্ঠেরই বিচিত্র স্বরব্যঞ্জনায়, ভাষার ছন্দে প্রকাশ করা যায়। মধুসূদনের ছন্দে সাধু বা সংস্কৃত শব্দের ঝঙ্কার থাকিলেও, তাহা খাঁটি বাংলা বাক্‌পদ্ধতি ও উচ্চারণরীতির ছন্দ; ইহার চরণও পয়ারের চরণ; অতএব, Blank-verse-কে যেমন ইংরেজী 'National verse' বলা হইয়া থাকে—এই অমিত্রাক্ষরকেও তেমনই আধুনিক বাংলার সেইরূপ বিশিষ্ট ছন্দ বলা যাইতে পারে। ভাষার সেই রূপ, ও সেই ধ্বনির চর্চ্চা এখন আর নাই বলিলেই হয়; তাই, কেবল, এই ছন্দের নির্ম্মাণ-কৌশল বুঝিতে পারিলেই ইহার বিচিত্র ও সূক্ষ্ম শ্রুতিমাধুর্য্যের ধারণা করা যাইবে না; এইরূপ লিখিত আলাপ-আলোচনার দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। ভাষা ও

ছন্দের সে সংস্কার পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে হইলে রীতিমত পাঠ-চক্রের ব্যবস্থা করিতে হয়।

সর্ব্বশেষে আমি এই বলিয়া বিদায় লইব যে, মধুসূদন যেমন এই ছন্দ-সৃষ্টির জন্য কোনরূপ ছন্দ-বিজ্ঞান বা ছন্দ-সূত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই—সে বিষয়ে তাঁহার কানই একমাত্র গুরুর কাজ করিয়াছিল, আমিও তেমনই, মধুসূদনের সেই কানের সুরটিকে আমার কানে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি, এবং তাহারই সাহায্যে এই ছন্দ-পরিচয় লিখিয়াছি; কেবল, আমার সেই কানের সাক্ষ্যকে যাচাই করিবার জন্যই ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ সাক্ষ্যও সংগ্রহ করিয়াছি। ছন্দের ব্রহ্মসূত্র নির্ম্মাণ করিবার স্পর্দ্ধা বা দুঃসাহস আমার নাই। ইতিপূর্ব্বে, বাংলা ছন্দের পরিচয়, যে প্রয়োজনে আমারই জ্ঞান ও বুদ্ধিমত লিখিয়াছি, এবারকার প্রয়োজন তদপেক্ষাও গুরুতর। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ—তাঁহার কাব্যের মতই, গত ৪০ বৎসর বাংলা কবিতার বহির্ভূত হইয়া আছে—সে ছন্দ এখন আর কেহ পড়ে না, পড়িতে পারেও না। তাহাও বরং ভাল ছিল; ইহার উপরে, আধুনিক ছন্দ-পণ্ডিতগণের অত্যধিক পাণ্ডিত্যের দাপটে অমিত্রাক্ষরের পিতৃনাম পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এ ছন্দের ধর্ম্ম ও মর্ম্মের সন্ধান এ পর্য্যন্ত কেহ করিল না, তাহার উপর বাংলা সাহিত্যের ছাত্রগণকে ইহার একটি দুষ্ট নাম (অমিতাক্ষর) শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে! আমি আমার সাধ্যমত, বাংলার এই অদ্বিতীয় ছন্দের যে পরিচয় দিলাম, আশা করি, তদ্দারা, আর কিছু না হউক—বাঙালী কাব্যরসিক বিদ্বজ্জন, ইহার অপূর্ব্ব ধ্বনি-কৌশল ও ইহার মহিমা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিবেন।

সমাপ্ত

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সরোজিনী

ইতিমধ্যে ছেলে ও বিধবারা আবার হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছিল, দারোগাবাবু আমাকে কহিলেন, আমি আসছি, একটু দেখবেন, এরা কেউ যেন না পালায়। থানা থেকে জনকয়েক কনস্টেবল আনতে পাঠাচ্ছি, সব ধ'রে নিয়ে যাবে। দারোগাবাবুর কথা মন্ত্রবৎ কাজ করিল, দেখিতে দেখিতে ছেলেগুলা কে কোথায় পলাইয়া গেল, তাহা টের পাওয়া গেল না। বিধবাদের মধ্যে যাহাদের বয়স কিছু কাঁচা তাহারাও সরিয়া পড়িল, শুধু সৌদামিনী, পদ্ম এবং আরও জনকয়েক নেতৃস্থানীয়া বিধবা, নারীসুলভ লজ্জা ও সঙ্কোচ যাহারা হজম করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারাই অটল হইয়া রহিল। অধিকন্তু একজন মন্তব্য করিল, ছোঁড়ার বাড় দেখ, হিন্দুর মেয়েকে হাজতে দেবে বলে! কে একজন বলিল, ও পদ্ম! লক্ষ্মী-নারাণ মূর্ত্তি দেখে নয়ন সার্থক কর লো, কনেবউকেও ডেকে নিয়ে এসে দেখা। কনেবউয়ের নাম শুনিতেই হারাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল বোধ হয়, হয়তো ভাবিল, স্পর্শসুখে আর কাজ নাই; কনেবউ আসিয়া হাজির হইলে যে গুরুতর স্পর্শসুখের ব্যবস্থা হইবে, তাহার ধকল এ বয়সে শরীরে সহ্য হইবে না। কিন্তু বেচারার উপায় নাই, সরোজিনী এমন সজোরে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে যে, সে বাহুবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা তাহার একার সাধ্য নহে।

দারোগাবাবু বন্দীদের কাছে আগাইয়া গিয়া হুকুম দিলেন, লছমন সিং, নিয়ে চল সব থানায়।—বলিয়া দুই পা আগাইয়া যাইতেই দোলগোবিন্দ মেঝেতে সটান চিত হইয়া শুইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। দারোগাবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কি হ'ল?

দোলগোবিন্দ বুকে হাত দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, হাঁপানির রুগী হুজুর, রোগটা চাড়া দিয়ে উঠেছে, টানা-হেঁচড়া করলে ম'রে যাব হুজুর।

দারোগাবাবু কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধমকের স্বরে কহিলেন, রোগ তো এসব হাঙ্গামায় আসেন কেন ?

দোলগোবিন্দ উঠিয়া বসিয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, হুজুর, আসতে চাই নি আমি, সবাই মিলে—বলিয়া কথা শেষ না করিয়া, টানিয়া টানিয়া কাসিতে শুরু করিল।

দারোগাবাবু কহিলেন, শুধু রাধানাথবাবু, আর গাঙুলী মশায়কে নিয়ে চল, বাকি সব ছেড়ে দাও, ওঁরা এলেই হবে। রাধানাথ কহিল, হুজুর, আমাদের কি দোষ ? মেয়েটার সব ঢং। কিছু হয় নি ওর। দারোগাবাবু গম্ভীরমুখে কহিলেন, সেসব জানবার আমার দরকার নেই, পরের বাড়ি চড়াও করতে আপনারা এসেছেন কেন ? মণীন্দ্রবাবু আগেই ডাইরি করিয়ে এসেছেন আপনাদের নামে। গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ দুইজনেই চোখ কপালে তুলিয়া একসঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, হুজুর, তাই নাকি ! দারোগাবাবুর পিছনে পিছনে রাধানাথ ও গাঙুলী মশায় চলিল, তাহাদের পিছনে চলিল লছমন সিং এবং লছমনের পিছনে পিছনে বাকি সব পুরুষেরা একে একে চলিয়া গেল। মেয়েদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, পদ্ম নাই, সেও বোধ হয় বাড়ি চলিয়া গিয়াছে।

তিনু আসিয়া হাজির হইল। কহিল, ডাক্তারবাবু বললেন, আমার যাবার দরকার নেই, এই ওষুধটা শুঁকিয়ে দিলেই ভাল হয়ে যাবেন—বলিয়া অ্যামোনিয়ার একটি শিশি দেখাইল। কহিলাম, একটু একটু ক'রে শুঁকিয়ে দাও—একেবারে বেশি ক'রে দিও না, ভারী কড়া গন্ধ কিনা। তিনু, মিণ্টু ও হারাণ মাঝখানে বসিয়া শুঁকাইতে লাগিল, তাহাই কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া ফুণ্টি কহিল, তিনু দাদা, আপনি পা দুটো ধরুন, আমি যাচ্ছি শুঁকিয়ে দিতে।

মেয়েদের মধ্যে কে বলিল, ফুণ্টি যে তিনুকে খুব হুকুম করছিস লো। ফুণ্টি খনখন করিয়া কহিল, বেশ করছি, তোমাদের কি ? শকুনির মত জুটেছ কেন সব বল দেখি ? একসঙ্গে যতগুলি বিধবা অধরোষ্ঠ সহযোগে 'ফিচ' শব্দ করিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিল। মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল, তোমরা এখানে এসে জুটেছ কেন বল দেখি ? মজা দেখতে এসেছ নাকি ?

সৌদামিনী কহিল, দেখ মনু, ফুন্টি এককোঁটা মেয়ে হয়ে অপমান করলে, তাও সহ্য করেছি। বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নি ওর, কাকে কি বলতে হয় জানে না। কিন্তু তুই বুড়ো মিনসে হয়ে এই কথা! বিপদে-আপদে লোক আসবে না তো কখন আসবে?

মণীন্দ্র উত্তর দিল, গাঁয়ের কারও সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। আমাদের বিপদে-আপদে কারও এসে কাজ নেই। তোমরা যাও যাও।—বলিয়া হাত বাড়াইয়া দরজা দেখাইয়া দিল। ঠিক এই সময়ে হনহন করিয়া আসিল পদ্ম, আর তার পিছনে পিছনে কনেবউ, মাথা হইতে অবগুণ্ঠন প্রায় খসিয়া গিয়াছে, চোখ দুইটা ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত জ্বলিতেছে। দুইজনে একেবারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পদ্ম কহিল, এই দেখ কি কাণ্ড! হারাণ একবার কনেবউয়ের দিকে তাকাইয়াই পাংশুমুখে নতমস্তক হইয়া বসিয়া রহিল। ঠিক এই সময়ে সরোজিনীর জ্ঞান হইল, মাথা তুলিয়া কহিল, কি? কে? তারপর মুখ ফিরাইয়া পদ্ম ও কনেবউয়ের দিকে তাকাইয়া ভয়ার্ত স্বরে কহিল, কে তোমরা? পেত্নী? জামাইবাবু, ধরুন আমাকে, পেত্নীরা আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছে।—বলিয়া আবার হারাণের কোলে মুখ গুঁজিয়া সজোরে তাহার কোমর আঁকড়াইয়া ধরিল।

কনেবউ গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, কি! আমি পেত্নী? এই কথা ব'সে ব'সে শুনছ তুমি? উঠে এস। চীৎকার করিয়া কহিল, উঠে এস বলছি।

হারাণ থতমত খাইয়া কহিল, ছাড়ছে না যে!

ধমকাইয়া কনেবউ কহিল, ছাড়ছে না যে! কেন কোলে নিতে গিছলে? পরের মেয়েমানুষ ভারী মিষ্টি, না?

হারাণ কহিল, পর আবার কি? নিজের শালী—

দাঁতমুখ খিঁচাইয়া কনেবউ কহিল, শালী! শালীর নিকুচি করেছে! উঠে এস। ঠাকুরঝি, দাও তো একটা ঝাঁটা—

ফুন্টি হাঁকিয়া কহিল, আমাদের জিনিসে কেউ হাত দিও না বলছি।

কনেবউ কহিল, ঝাঁটা দেবে না? বেশ।—বলিয়া হারাণের হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া কহিল, ঠাকুরঝি, তুমিও ধর তো—

আমি বাধা দিয়া কহিলাম, কনেবউ, ভারী বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?

কনেবউ ত্বরিত-হস্তে মাথায় ঘোমটা টানিল। যাহাই করুক, কনেবউয়ের লজ্জা-শরম নাই—এ কথা পরম শত্রুতেও বলিতে পারে না।

হারাণকে কহিলাম, মাথাটা আর কারও কোলে দাও।

তিনকড়ি উঠিবার উপক্রম করিতেই, ফুন্টি কহিল, আমি নিচ্ছি। ফুন্টি সরিয়া বসিল। তখন সবাই মিলিয়া টানাটানি করিয়া সরোজিনীর বাহুবন্ধন একটু আলগা করিতেই হারাণ নিজেকে ছাড়াইয়া লইল। তারপর হেডমাস্টারের পিছু পিছু অপরাধী ছাত্র যেমনভাবে আপিস-ঘরের দিকে যায়, ঠিক তেমনইভাবে কনেবউয়ের পিছনে পিছনে চলিল। পদ্মকে কহিলাম, তুমিও যাও।

পদ্ম কহিল, দাঁড়াও, জ্ঞান হোক। একবার শুনিয়ে যাব না! পেত্নীই হই আর যা-ই হই, ছিনালি করা আমাদের অভ্যেস নেই।

মণীন্দ্র কহিল, খুব হয়েছে, আর শোনাবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। তুই বেরো দেখি।

পদ্ম মুখ নাড়িয়া জবাব দিল, তোর যে ভারী বাড় হয়েছে রে মনু! বড়লোক বোন চিরদিন গাঁয়ে থাকবে না। মাথা ন্যাড়া ক'রে, ঘোল ঢেলে, কুলোর বাতাস দিয়ে গাঁয়ের লোক একদিন গাঁ থেকে তাড়াবেই। তখন কি ক'রে গাঁয়ে থাকিস দেখব।

মণীন্দ্র কহিল, শুনছ মাস্টার? নেহাত মেয়েমানুষ ব'লে সহ্য করতে হচ্ছে। না হ'লে—মনু চক্রবর্ত্তী এসব সয়?—বলিয়া আমার দিকে কটমট করিয়া তাকাইল।

আমি, পদ্ম ও আরও অন্যান্য বিধবাদের উদ্দেশে কহিলাম, আপনারা যান, আর ভয় নেই। ওষুধ যখন শোঁকানো হচ্ছে, তখন এখনই ভাল হয়ে উঠবে।

সৌদামিনী কহিল, ভাল হয়ে উঠলেই ভাল ভাই, আমাদের আর কি? চোখে দেখা তো। তাও যদি সহ্যি না হয় তো আমরা চ'লেই যাচ্ছি।—বলিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সাঙ্গোপাঙ্গদের লইয়া স্থান-ত্যাগ করিল।

ফুল্টি ছিপিটা বন্ধ করিয়াই শুধু শিশিটা শুঁকাইতেছিল। লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, ও রকম ক'রে নয়; ছিপিটা খুলে ভাল ক'রে শোঁকা। একবার শোঁকাতেই সরোজিনী চেতনালাভ করিয়া 'আঃ' শব্দ করিয়া উঠিল এবং শিশিটা হাত দিয়া সরাইয়া কহিল, থাক, আর দিতে হবে না।—বলিয়া শান্ত ও স্বাভাবিক ভাবে শুইয়া রহিল।

মণীন্দ্রকে কহিলাম, যদি ঘুমিয়ে পড়ে, আর ঘুম ভাঙিও না। তবে আবার যদি মূর্চ্ছো হয় তো ওষুধটা শুঁকিয়ে দিও।

সরোজিনীর শাশুড়ী এতক্ষণ একটানা সুরে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছিলেন।—ওমা, আমার কি হ'ল গো! কাকে নিয়ে এ সংসারে থাকব গো! ইত্যাদি।

এতক্ষণে কান্না থামাইয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, হ্যাঁ বাবা, ভাল হবে?

আমি বলিলাম, ভাল হবে কি, হয়ে গেছে। আপনি আর ব'সে থাকবেন না, শোন গে। তারপর চলিয়া আসিলাম।

১২

পরদিন রবিবার। বেলা আটটার সময়ে হুজুর ও তাঁহার অনুচরবৃন্দের খবর লইবার জন্য গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে হাজির হইলাম। বৈঠকখানায় ছিলেন না। বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখিলাম, দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া গাঙুলী মশায় চা খাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া গম্ভীরমুখেই কহিলেন, এস, ব'স। পাশে বসিয়া কহিলাম, আজ এত বেলা? গাঙুলী মশায় জবাব না দিয়া চা পান করিতে লাগিলেন। চুপ করিয়া মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। বিনিদ্র-রজনীর ক্লান্তি ও অপরিতৃপ্তি মুখে-চোখে পরিস্ফুট, চোখ দুটি ফুলিয়া উঠিয়াছে, মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ, ঠোঁটের কোণ দুইটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কহিলাম, কাল কি হ'ল?

সে অনেক ব্যাপার।—বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন। দিদিমা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া হাজির হইলেন এবং কলিকাটি হুঁকার মাথায় দিয়া ও হুঁকাটি দাদামশায়ের হাতে ধরাইয়া দিয়া আমাকে উদ্দেশ

করিয়া কহিলেন, আমি বলেছিলাম না নাতি, যে ল্যাটা গাঁয়ে এসে জুটেছে, সকলকে নিকেশ না ক'রে যাবে না? গাঙুলী মশায় তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন, সত্যি।—বলিয়া মাঝারি-গোছের নিশ্বাস ফেলিলেন। দিদিমা উৎসাহিতা হইয়া কহিলেন, গরিবের কথা বাসী হ'লেই মিষ্টি লাগে কিনা! তখন পইপই ক'রে বলেছিলাম, এসব হাঙ্গামে থেকো না, কথা না শুনে কি ফ্যাসাদে পড়লে দেখ! আগ্রহের সহিত কহিলাম, কি ফ্যাসাদ?

দিদিমা কহিলেন, পেঁয়াজ, পয়জার—দুই হয়ে গেছে কাল। অপমান, তার ওপর জরিমানা।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তাই নাকি?

গাঙুলী মশায় একাগ্রচিত্তে তামাক টানিতে লাগিলেন। গাঙুলী-গিন্নী উঁচু পর্দ্দায় কহিলেন, তবে আর বলছি কি! সব শোন ব'সে ব'সে। আমি আবার ডাল চড়িয়ে এসেছি।—বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, তর্জ্জনী নাড়িয়া কহিলেন, এই আমি ব'লে দিচ্ছি, ও ছুঁড়ীকে জব্দ করা তোমাদের সাধ্যি নয়। উলটে ওই যদি সবাইকে জব্দ ক'রে না ছাড়ে তো কি বলেছি।—বলিয়া রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে ছুটিলেন।

অনেকক্ষণ ক্রমাগত ধূমপান করিয়া কতকটা চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া, গাঙুলী মশায় কহিলেন, ওঃ, কাল ভারী বিপদ গেছে! বেটা দারোগা গুলিখেকো বাঘের মত হয়ে উঠল! যেমন লম্ফঝম্প, তেমনই দাঁত-মুখের খিঁচুনি! কখনও বলে, হাজতে পুরব; কখনও বলে, কোমরে দড়ি বেঁধে জেলা পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যাব। অনেক বোঝালাম, মিনতি করলাম।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কিছুতেই না।

দুজনে তখন লম্বালম্বি পায়ের নীচে গড়িয়ে পড়লাম। ম্লেচ্ছটার তাতেও মন গলল না। শেষে টাকা দিয়ে ছাড়ান পেলাম।

কত টাকা?

মুখ ভারী করিয়া, বিষণ্ণ গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, অনেক। পাঁচশো টাকা। সঙ্গে সঙ্গে দিতে হ'ল।

অত রাত্রে এত টাকা পেলেন কোথায় ?

ঐ গাঁজাওয়ালার কাছে। অত রাত্রে উঠিয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিলাম দুজনে—টাকায় মাসে দু পয়সা সুদ।—বলিয়া প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

কখন ফিরলেন ?

ফিরলাম রাত তিনটেয়। হুজুরের কাছে গেলাম, হুজুর তখনও জেগে। ঘুম কি হয়! হাকিম হয়ে এতবড় অপমান! তাও আবার একটা একফোঁটা মেয়ের কাছে!

হুজুরকে সব বললেন ?

বললাম বইকি।

ঘুষের কথা বললেন ?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হুঁা।

কহিলাম, ওটার জন্যে কোন ব্যবস্থা করা যাবে না? ঘুষ যে নিয়েছে, তা তো হ্যাণ্ডনোট থেকেই প্রমাণ হবে।

করুণ মুখে গাঙুলী মশায় কহিলেন, হায় হায়! তার কি উপায় রেখেছে বেটা! এক মাস আগের তারিখ দিয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়েছে।

সাক্ষী ?

সাক্ষী—দোকানের কর্ম্মচারীরা আর বীরু আচায্যি।

সবিস্ময়ে কহিলাম, বীরু আচায্যি গিছল নাকি ?

গাঙুলী উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, যাবে না! মাতঙ্গ পাঁকে পড়েছে, ব্যাং নয়ন ভ'রে দেখবে না! মনু চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দল বেঁধেছে। প্রবোধ গাঙুলীর কাছে ঘরবাড়ি বাঁধা আছে, জান না? ভাবছে, মনুকে তেল দিয়ে সব ছাড়িয়ে নেবে।

কহিলাম, রাধানাথের ভগ্নীপতি যে!

হ'লই বা। জমি নিয়ে দুজনে ঝগড়া চলছে না! এখন খুব দারোগার কাছে যাওয়া-আসা করছে। রূপসী মেয়েটার ওপর যখন থাবল পড়বে, তখন বুঝবে মজাটা।

হুজুর কি পরামর্শ দিলেন ?

বললেন, এস. ডি. ও.-কে সব বিবরণ জানিয়ে দরখাস্ত করুন, দারোগা যে ও-দলে রয়েছে, তাও খুলে লিখবেন। তা হ'লে এন্‌কোয়্যারির ভার আমার হাতেই পড়বে। তারপর এমন রিপোর্ট দোব যে, মাথায় ক'রে বুড়ীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

কহিলাম, আজ আর কোথাও বেরোবেন না। সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে ঘুমুনগে।

খিন্ন কণ্ঠে গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, আর ঘুম! ঘুম কি আমার আসবে ভাই! এতগুলো টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় গেল। শোধ যে কি ক'রে করব, তাই ভাবতে গেলে মাথায় আগুন জ্ব'লে উঠছে। ঘুম! ঘুম আর আমার হবে না।

উঠিলাম। উঠানে পা দিতেই দিদিমা পাছু ডাকিলেন, ওহে! এদিকে একবার শুনে যাও দেখি।

কাছে যাইতেই কহিলেন, লুকিয়ে লুকিয়ে পালাচ্ছ যে বড়! নাত-বউয়ের টানে, না ঐ ডাইনীটার টানে?

কহিলাম, মানে?

তুমিও তো খুব যাওয়া-আসা করছ শুনছি। খুব সাবধান কিন্তু। বাগে পায় তো চুষে নেবে। কাউকে বাদ দেবে না ও, ব'লে দিচ্ছি। হারাণের কি হাল হয়েছে, জান না? পদ্ম ব'লে গেল এখনই।

উৎসুক কণ্ঠে কহিলাম, কি?

আজ মাথা মুড়িয়ে প্রাশ্চিত্তির করাচ্ছে ওর বউ, তারপর নাকি রাত্রেই ওকে নিয়ে পালাবে।

কোথায়?

বাপের বাড়ি। শুধু কি ওই, পাড়ার যতগুলো বউ আছে, সকলেরই টনক নড়েছে। সব পালাবে নিজের নিজের স্বামী নিয়ে। পুরুষদের মড়ক লেগে গেছে গাঁয়ে ভাই। নাতবউকে একটু সাবধান হতে ব'লে দিয়ে আসব ভাবছি।

দোহাই দিদিমা! আমার বাড়িতে আর আতঙ্ক ছড়িয়ে আসবেন না। নাতবউ আপনার বেশ দিল ঠাণ্ডা ক'রে আছে।

দিদিমা মুচকি হাসিয়া কহিলেন, তার জন্যেই তো ভয় হয় হে।

যদি কোন বিপদ-আপদ হয়ে যায় তো জানতেই পারবে না। কপাল চাপড়ে মরবে শেষে।

আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। আপনার নাতবউকে বইতে বইতে ঘাড়ে কড়া প'ড়ে গেছে, যেমন দাঁতই হোক, এখানে বসবে না।

বিকালে হারাণের খবর লইতে চলিলাম। দরজায় শিকল তোলা। হারাণের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে, হারাণকে কনেবউ একা ছাড়িয়া দিয়া কোথাও যাইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে কি সঙ্গে লইয়াই গা ধুইতে গিয়াছে? তাও সম্ভব বলিয়া মনে হইল না। তবে কি বাড়িতে আটকাইয়া রাখিয়া গিয়াছে? হারাণের নাম ধরিয়া ডাক দিলাম।

হারাণ সাগ্রহে সাড়া দিল, এস হে, শেকল, না তালা?

জবাব দিলাম, শেকল।

হারাণ মিনতির স্বরে কহিল, তবে খুলে ভেতরে এস ভাই।

বাড়ির ভিতরে গিয়া হারাণের মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম, গলা হইতে সমস্ত মুণ্ডটায় কেশের লেশমাত্র নাই—মাথাটা একটা প্রকাণ্ড বেলের মত একেবারে চাঁছা-পোঁছা, গোঁফ-দাড়ি যৎসামান্য যাহা ছিল, মায় ভ্রূ দুইটা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল। হারাণের গা খালি, পরনে একটা নূতন গামছা; গলা হইতে নূতন পৈতা ঝুলিতেছে।

কহিলাম, কি ব্যাপার?

হারাণ কহিল, এস, সব বলছি।

কাছে গিয়া বসিতেই হারাণ কহিল, কাল যে কি ক'রে রাত কেটেছে, তা আমিই জানি। ঝাঁটা হাতে এই মারে তো এই মারে, উল্টে কিছু বলতে গেলেই মূর্চ্ছো। তারপর সকাল হতেই এই ব্যাপার। ঢোক গিলিয়া কহিল, প্রাশ্চিত্তির করতে হ'ল।

কহিলাম, ভ্রূ দুটো কামিয়ে দিয়েছ কেন?

শোকার্ত্ত কণ্ঠে হারাণ কহিল, আমি কি নিজে কামিয়েছি? বউ গোবিন্দ নাপিতকে হুকুম করলে, মাথায় মুখে যেন একগাছি চুল না থাকে। আর বেটা গোবিন্দকে জান তো! হুকুম করতে না করতেই

একেবারে ফস ক'রে (ডান হাত দিয়া ক্ষুর-চালনার ভঙ্গি করিল) একটা ভুরু সাবাড় ক'রে দিলে, তখন আর একটাকে কি ক'রে রাখি বল ?

কহিলাম, কাপড়-চোপড়ও কেড়ে নিয়েছে নাকি ?

হারাণ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সব-ঘরে' চাবি দিয়ে রেখে গেছে ; পাছে দেওয়াল ডিঙিয়ে পালাই। বাইরে শেকল তুলে দিয়েও বিশ্বাস হয় নি।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আজ রাতেই আবার ধানশোল (হারাণের শ্বশুরালয়) টেনে নিয়ে যাবে।

প্রশ্ন করিলাম, পদ্ম কোথায় ?

তার কথা আর ব'লো না মাইরি ! ভাত খেয়ে পুঁথি শুনতে গেছে। ঐ যে সদু বামনীর বাড়িতে দিন ভাত খাবার পর বিধবাগুলোর আড্ডা বসে, একটা রামায়ণ কিংবা মহাভারত সাক্ষী রেখে পরচর্চ্চা করে—

কহিলাম, পদ্মই বুঝি কাল কনেবউকে ডেকে নিয়ে গিছল ?

তা ছাড়া এত কুবুদ্ধি কার ? বদমাইসের জাসু কিনা ! এদিকে এত ঝগড়া, তবু সাত-তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ডেকে নিয়ে গেছে। একবার ভালয় ভালয় ফিরে আসি, ওকে তাড়াব আমি। যেখানে ইচ্ছে যাক, জায়গা-টায়গা কিচ্ছু দোব না। ছেলে তো রোজগার করছে, বাড়ি করুক গিয়ে কোথাও।

কহিলাম, গাঙ্গুলী মশায়েরও কাল খুব বিপদ গেছে।

হারাণ কহিল, সব শুনেছি। আমাদের গেজেটটি তো সকালে এক-পাক ঘুরে এসেছেন কিনা ! কিন্তু খুব ভাল হয়েছে। ওদের একটু শাস্তি হওয়া দরকার।

বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, কেন ?

ওরা ভারী অন্যায় করতে আরম্ভ করেছে। একটা অনাথা অবলা মেয়েমানুষ, অল্প বয়সে স্বামী হারিয়ে গাঁয়ে এসে আশ্রয় নিলে তো সবাই তার যা কিছু সম্বল সব সাবাড় ক'রে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। যখন তা পারলে না, তখন তাকে গাঁ থেকে অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দেবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগে গেল।

কহিলাম, কিন্তু সরোজিনীর দারোগাবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা, গাঁয়ের ছোকরাগুলোকে হাত করা, এগুলো কি?

হারাণ বাধা দিয়া কহিল, বাধ্য হয়ে করেছে। তা ছাড়া যদি অন্যায়ই করেছে, আর তার শাশুড়ীর জন্যে তোদের বুকই ফাটছে তো তাকেই সরিয়ে নিয়ে আয়।

সরতে দেয় কই? হুজুরকে পর্য্যন্ত হিমসিম খাইয়ে দিলে কাল।

কই, সে কথা তো কাল কিছু হ'ল না! হুজুর বুড়ীকে নিজের মুখে জিজ্ঞাসা করলেই পারতেন, তার কষ্ট হচ্ছে কি না, সে যেতে চায় কি না? তা না ক'রে গাঙুলী মশায় আর রাধানাথকে লেলিয়ে দিলেন। আর ওরাও, আসল কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে, সরোজিনী এই করে, সরোজিনী সেই করে, সে বদমাইস, সে বেশ্যা, এই সব অবান্তর ঝগড়া করলে।

সত্য কথা। গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ, বৃদ্ধাকে উদ্ধার করার চেয়ে, সরোজিনীর স্বরূপ-মূর্ত্তি হুজুরকে দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। এবং সেই মূর্ত্তি হুজুর যতটা দেখিয়াছেন, তাহাতেই মোহিত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; আর বোধ হয় সহজে সরোজিনীর ত্রিসীমানায় পা দিবেন না।

হঠাৎ হারাণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কাল কার মুখ দেখে উঠেছিলাম মাইরি!

কহিলাম, পরশু রাতে তো ঘুমোও নি বলছিলে।

হারাণ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তাই। না হ'লে, দেখে দিনটা ভাল যাবে এমন মুখ তো আমাদের ত্রিসীমানায় নাই কিনা।

কহিলাম, কি ভালটা হ'ল?

দুই চোখ ডাগর করিয়া হারাণ কহিল, ভাল নয়? সরোজিনীর মত মেয়ে আধ ঘণ্টা ধ'রে যার কোলে মাথা গুঁজে শুয়ে থাকে, হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধ'রে থাকে, তার ভাল নয়? কাল দারোগাবাবুর চোখ দেখ নি? ওর ইচ্ছে ছিল—ওই ব'সে যায়, নেহাত চক্ষুলজ্জায় পারলে না। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সত্যি, কি রকম রঙের জলুস দেখেছ! এই পাড়াগাঁয়ের রোদ-হাওয়াতেও একটু পোড়

খায় নি। কাল মনে হচ্ছিল, মুখ নয়, যেন একগাঁশ তাজা পদ্মফুল নিয়ে ব'সে আছি। আর হাত দুটো কি নরম! এত জোরে ধরেছিল, তবু একটুও কষ্ট হয় নি। আর আমাদের-গুলির? হাত তো নয়, যেন লোহার বেড়ি!

কহিলাম, ওসব কথা বাদ দাও।

হারাণ কহিল, কেন? হিংসে হচ্ছে বুঝি? তা দাদা সাজতে রাজি হয়েছিলে কেন? বউয়ের সঙ্গে বোন সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়ে জামাইদাদা সাজলেই পারতে।

কথার মোড়টা ঘুরাইবার জন্য কহিলাম, কখন যাচ্ছ তোমরা?

হারাণ কহিল, কাল ভোরে। কত বোঝাচ্ছি, এই চেহারা নিয়ে এক মাস কোথাও বার হতে পারব না, তা শুনছে না। ভারী একগুঁয়ে মেয়েমানুষ।

এই চেহারার জন্যে বাপের বাড়িতে কি কৈফিয়ৎ দেবে বলছে?

তাও ঠিক করে নি নাকি? বলবে, বাড়িতে একটি গাই গলায় দড়ি দিয়ে ম'রে গেছে, তাই প্রাশ্চিত্তির করতে হয়েছে। সুবুদ্ধি না থাক, কুবুদ্ধির অভাব নেই কিনা।

কহিলাম, আচ্ছা, আমি উঠি। একবার সরোজিনীর ওখানে যাব ভাবছি, খবরটা নিতে।

হারাণ করুণস্বরে কহিল, ব'লো ভাই সব বুঝিয়ে আমার কথা, কি অবস্থায় প'ড়ে গাঁ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি; যদি গাঁয়ে থাকতাম তো তাকে বুক দিয়ে আমি আগলে রাখতাম।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া পত্নীকে কহিলাম, সরোজিনীকে একবার দেখতে যাবে না?

পত্নী বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, কি হয়েছে ওর?

কহিলাম, বারে! জান না, কাল হঠাৎ মূর্চ্ছা হয়ে গিছল?

পত্নী আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, ওঃ, তাই। আমি বলি, আর কিছু হয়েছে।

কহিলাম, মূর্চ্ছা যাওয়াটা সোজা নাকি? মনের আর মস্তিষ্কের কতখানি উত্তেজনা হ'লে—

বাধা দিয়া পত্নী ধারালো স্বরে কহিলেন, দেখ, ব'কো না, আমার এসব ঢের দেখা-শোনা আছে। তোমরা পুরুষরাই ওতে ভুলবে, আমরা ভুলব না। আমাদের বড় মামীর মূর্চ্ছা দেখ নি?

দেখি নাই। বড় মামীকেই দেখি নাই তো তাঁহার মূর্চ্ছা দেখিব কি? বড় মামাকে দেখিয়াছি। তিনি জজের সেরেস্তাদার। কেহ কোথাও সরকারী চাকরি করে শুনিলে ইঁহারই নাম পত্নী সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করেন। ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, না।

পত্নী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, সে ভারী মজার মূর্চ্ছা! সারাদিন বেশ ভালমানুষ, খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, হাসছেন-খেলছেন; কিন্তু যেমনই মামা কাছারি থেকে বাড়িতে পা দেওয়া, অমনই মূর্চ্ছা। আর বড় মামা সারাদিনের রোজগার পকেট খালি ক'রে হাতে গুঁজে দেবামাত্রই মূর্চ্ছা ভেঙে উঠে বসা।

কহিলাম, সরোজিনীর মূর্চ্ছা ও রকম মেকী মূর্চ্ছা নয়, খাঁটি।

অধর ও ওষ্ঠ সহযোগে অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি করিয়া পত্নী কহিলেন, খাঁটি! পদ্মর কাছে যদি না সব শুনতাম।

কহিলাম, পদ্ম এসেছিল নাকি?

ঘাড় নাড়িয়া পত্নী কহিলেন, হুঁ, এইমাত্র তো গেল।

কি বললে পদ্ম?

ঢঙী মেয়ের ঢঙের কথা সব ব'লে গেল। মেয়েটা সত্যি খারাপ। পরপুরুষকে জড়িয়ে ধরতে একটু সঙ্কোচ হয় না! আমাদের তো ভাবলে গা-ঘিনঘিন করে।

কহিলাম, জড়িয়ে ধরবার লোক আছে কিনা, তাই বলছ; না থাকলে—

পত্নী ধমক দিয়া কহিলেন, ওসব কথা যেতে দাও। মোট কথা, ওখানে যাবার দরকার নেই তোমার। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, পরের বউরা মূর্চ্ছা গেলে পুরুষদের বুক ফেটে যায়, আর নিজেদের বউরা মুখে রক্ত উঠে মরলেও দেখতে পায় না। হারাণ কোন্ লজ্জায় ওর মাথা কোলে করলে?

কহিলাম, নিজের শালী যে!

স্ত্রী কহিলেন, শালী নয়, ওসব ধাপ্পা। পদ্ম বললে, ও কোন দিন ও কথা শোনে নি।

কহিলাম, পাগল নাকি! সরোজিনীর মিছে কথা ব'লে লাভ কি? হারাণ এমন কিছু স্বনামধন্য ব্যক্তি নয় যে, মেয়েরা সব ওর শালী হবার জন্যে ঝুলোঝুলি করবে।

স্ত্রী দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, আমি বলছি, হারাণকে হাত করবার জন্যে ও মিথ্যে বলেছে। তুমি যে রকম আনাগোনা করছ, তোমাকেও ও বিপদে ফেলবে ব'লে দিচ্ছি। সাংঘাতিক মেয়েমানুষ ও। মুচকি হাসিয়া কটাক্ষ হানিয়া কহিলেন, যদি জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরে তো কনে-বউয়ের মত আমি ছাড়িয়ে আনতে পারব না, ব'লে দিচ্ছি। মজাটা টের পাবে তখন।

১৩

দিন চার অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। বিভাগীয় সহকারী ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামের স্কুলে ইঁহাদের আগমন উপলক্ষ্যে প্রধান-শিক্ষককে যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ বুঝিবেন না। স্কুল-গৃহের সারাবৎসরের পুঞ্জীকৃত আবর্জ্জনা পরিষ্কার করানো, ভাঙা বেঞ্চি, চেয়ার ও টেবিলগুলি মেরামত করানো, স্কুলের খাতাপত্র সারা, ছাত্রদিগকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষকদিগের পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা, প্রত্যেক ক্লাসে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য শিক্ষকদিগকে উপদেশ দেওয়া, ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের আদর-আপ্যায়ন ও আহারের ব্যবস্থা করা, এবং অনিবার্য্য ত্রুটিগুলি যাহাতে ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের শ্যেন-দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে, সেই-জন্য তাঁহার বিদায়গ্রহণ পর্য্যন্ত দুর্গানাম জপ করা ইত্যাদি সকল কার্য্যই প্রধান-শিক্ষকেই করিতে হয়। কাজেই এ কয়দিন গ্রামের কোন খোঁজ-খবর রাখার ফুরসৎ হয় নাই। গাঙুলী মহাশয় স্কুলে

আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর সাহেব চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কখন চলিয়া আসিয়াছিলেন, জানিতে পারি নাই।

সেই দিন স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিবার পর পত্নী কহিলেন, সাহেব চ'লে গেল?

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, গেছে। সাহেব নয়, ফাঁড়া; তা এক রকম কেটে গেছে, বছর খানেকের জন্যে এখন নিশ্চিন্ত।

স্ত্রী কহিলেন, মুখ-হাত ধুয়ে নাও, খাবে না?

কহিলাম, চা-খাবার স্কুলে খেয়ে এসেছি, এখন আর খাব না। একটু চা দেবে তো দাও।

আচ্ছা।—বলিয়া পত্নী রান্নাঘরের দিকে গেলেন; আমিও রাজবেশ ছাড়িয়া রাখল-বেশ ধারণ করিলাম। ইতিমধ্যে পত্নী চা আনিয়া হাজির করিলেন। খাইতে খাইতে কহিলাম, চোখে কানে কদিন দেখতে শুনতে পাই নি। গাঁয়ের কি কি খবর বল দেখি?

পত্নী কহিলেন, ভারী মজার মজার ব্যাপার সব চলছে গাঁয়ে।

উৎসুক কণ্ঠে কহিলাম, কি?

পত্নী কহিলেন, এক নম্বর, পদ্মর মূর্চ্ছা।

মানে?

ভাত খাবার পর সদু দিদিমার বাড়িতে গাঁয়ের বিধবাদের যে একটা আড্ডা বসে, সেখানে পরশুর আগের দিন পদ্ম গোবিন্দকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, ছুঁচোর চাকর চামচিকে—তার মাইনে চোদ্দ সিকে।

কহিলাম, এ কথা বলার অর্থ?

অর্থ বুঝতে পারছ না? গোবিন্দর ভাই তিনু যে ফুণ্টিকে পড়ায় কিনা, তাই।

তারপর?

শুনে গোবিন্দ ফোঁস ক'রে উঠে বললে, শুধু আমার ভাই চামচিকে? আর তোর ছেলে? পদ্ম হাত নেড়ে বললে, সে বলতে হয় না, তেমন ছেলে গর্ভে ধরি নি, আমার ছেলে সরকারী চাকরে। গোবিন্দ মুখ ভেংচিয়ে বললে, সরকারী চাকরে-! তবু যদি না প্রবোধ গাঙ্গুলীর বউয়ের দিনরাত মাথা না টিপত। পদ্ম লাফিয়ে উঠে বললে, খবরদার

বলছি, আমার ছেলের নামে যা-তা বলবি না। জিব কেটে দোব। গোবিন্দও লাফিয়ে উঠে বললে, জিব সবাই কাটে! তোরও থ্যাদা নাক বুঁচিয়ে দোব না! দেখে আয়গে যা, বিশ্বেস না হয় তো। পদ্ম গোবিন্দর হাত ধ'রে টেনে বললে, আয়, দেখাবি চল। যদি দেখাতে পারিস, সবাইকার সামনে মাঝ-উঠোনে ঘ'ষে ঘ'ষে সাত হাত নাকখত দোব; আর যদি দেখাতে না পারিস, তোর মুখে গুনে গুনে সাতবার মুড়ো ঝাঁটা মারব। তারপর দুজনে চলল প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ি; সদর-দরজা খোলা ছিল; ওরা ঢুকে একেবারে উঠল দোতলায়। পা টিপে টিপে গিয়ে দেখে, সরোজিনী বিছানায় শুয়ে আছে। প্রকাশ মাথার কাছে ব'সে সরোজিনীর মাথায় হাত বুলোচ্ছে, আর সরোজিনীর পাশে, প্রকাশের মুখোমুখি ব'সে, পাখা করছে মিণ্টা।

ঔৎসুক্যের সহিত কহিলাম, তারপর?

দেখে, পদ্ম চেঁচিয়ে উঠে বললে, তাই তো লো! আমার ননীর পুতুল রাক্ষুসীদের গহ্বরে ঢুকেছে!—ব'লে ছুটে পালিয়ে এল।

সাত হাত নাকখত দেওয়ার কি হ'ল?

আর নাকখত দেওয়া! এসেই ধড়াস ক'রে প'ড়ে পদ্ম মূর্চ্ছা গেল। তখন গোবিন্দই গিয়ে প্রকাশকে ডেকে নিয়ে এল।

তারপর?

প্রকাশ ওষুধ শোঁকাতেই পদ্ম ভাল হয়ে উঠে ব'সে, কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। প্রকাশ বললে, চল, বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। পদ্ম কেঁদে বললে, না, আমি যাব না, তুই আগে আমার পা ছুঁয়ে বল, ওখানে আর যাবি না। প্রকাশ বললে, আমি তো নিজে যাই নি, ডাক্তারবাবু আমাকে যেতে বলেছেন। পদ্ম বললে, সে মুখপোড়া নিজে না গিয়ে তোকে পাঠিয়েছে কেন?

আমি বাধা দিয়া কহিলাম, আমারও ঐ প্রশ্ন, তার নিজেরই তো যাওয়া উচিত ছিল!

পত্নী হাত নাড়িয়া কহিলেন, সবাই তো আমার মত হাবা-গোবা মেয়ে নয়। ওর গিন্নী নিশ্চয় ছাড়ে নি।

কহিলাম, ও তো তোমার জবাব, প্রকাশের জবাবটা কি হ'ল?

প্রকাশ বললে, তাঁর শরীর খারাপ, কদিন কোথাও বেরোন নি। তা ছাড়া আমি তো বিনা পয়সায় যাচ্ছি না। আমাকে রীতিমত টাকা দিচ্ছে। পদ্ম রেগে বললে, ও টাকার মুখে আমি ঝাঁটা মারি, তুই কিছুতেই ও বাড়িতে পা দিতে পাবি না, দিলে আমি দেশান্তরী হব। প্রকাশ চুপ ক'রে রইল। তখন পদ্মর বন্ধুরা প্রকাশকে বোঝাতে লাগল। প্রকাশ বেঁচে থাকলে অনেক টাকা রোজগার করবে, ও রকম একটা নষ্ট-দুষ্ট মেয়ের কাছে যেয়ে পদ্মর মত মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া প্রকাশের মত সুসন্তানের উচিত নয়। প্রকাশ শেষে বললে, বেশ, যাব না। তুমি বাড়ি চল। তারপর পদ্মকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে প্রকাশ চ'লে এল।

আবার সরোজিনীর বাড়ি?

না, ডাক্তারখানায়। পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রে আর কি যেতে পারে?

কহিলাম, তোমার দু নম্বর খবর বল এবার।

পত্নী হাসিয়া কহিলেন, সেও ভারী মজার। পরশু দুপুরবেলায় হঠাৎ গোবিন্দ এসে হাজির হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি গো ঠাকুরঝি, কি খবর? গোবিন্দ খুঁট থেকে একটি মোড়ক-করা কাগজ খুলে আমার হাতে দিয়ে বললে, দেখ তো, কে লিখেছে? বললাম, কার চিঠি? বললে, তিনুর বোধ হয়, ফুন্টির ভাই দিয়ে গেল। বললাম, তিনু তো দিনরাত ওখানেই থাকে, তা আবার চিঠি পাঠানো কেন? গোবিন্দ বিরক্ত হয়ে বললে, তুমিও ঐ কথা বলছ বউ! দিনরাত ওখানে থাকবে কিসের দুঃখে? গরিব হ'লেও মাথা গোঁজবার জায়গা ওর আছে। বললাম, না ঠাকুরঝি, আমি কিছু ভেবে বলি নি। গোবিন্দ বললে, তুমি হয়তো বল নি, কিন্তু সবাই তো বলছে। দু পয়সা পাবে ব'লে সবাইকার বুক চড়চড় করছে, তাও এখনও এক পয়সা ঘরে ঢোকে নি। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, তাও তো কাল সারাদিন ঘরেই ছিল, ওদের বাড়ি যায় নি।

চিঠিটা প'ড়ে আকাশ থেকে পড়লাম।

প্রশ্ন করিলাম, কেন?

পত্নী কহিলেন, চিঠি নয়—প্রেমপত্র, ফুণ্টি লিখেছে—তিনুকে। পাঠ লিখেছে—প্রাণের মাস্টার মশায়। নীচে লিখেছে—তোমারই জীবনে-মরণে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তিনেটা এর মধ্যেই খুব শিখিয়েছে তো! একেবারে প্রেমপত্র লেখা অবধি! মেয়েদের লেখাপড়ার চরম শিখিয়ে দিয়েছে একেবারে।

পত্নী সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন। চিন্তার ভান করিয়া কহিলাম, কিন্তু ফুণ্টি যে তিনুকেই লিখেছে, তা নাও হতে পারে। হয়তো তিনু ওকে লিখতে দিয়েছিল। ফুণ্টি লিখে, কেমন হয়েছে দেখবার জন্যে তিনুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

পত্নী কহিলেন, তোমার তো ঐ রকমই বুদ্ধি কিনা। তিনু লিখতে-টিখতে দেয় নি। ও পুরো একদিন সরোজিনীর বাড়ি যায় নি; ওকে এতক্ষণ না দেখতে পেয়ে ফুণ্টির বিরহ-আগুন দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছিল, তাই পত্রপাঠ দেখা দিয়ে আগুন নেবাবার জন্যে তিনুকে চিঠি লিখেছিল।

কহিলাম, তাই নাকি! ফুণ্টি একফোঁটা মেয়ে, তার এই কাণ্ড!

একফোঁটা মেয়ে! ষোল বছরের ধাড়ী। বুকের ভেতরটা এখন একেবার বারুদের মত হয়ে আছে যে। পুরুষের ছোঁয়াচ লাগলেই দপ ক'রে জ্ব'লে উঠবে; তুমি পড়াতে গেলেও ও তোমার প্রেমে প'ড়ে যেত।

কথাটা উল্টাইয়া দিয়া কহিলাম, তিনুর মানসিক অবস্থার কোন খবর জান?

পত্নী কহিলেন, বলছি। গোবিন্দকে বোঝালাম, সরোজিনীর চিঠি—তিনু কাল পড়াতে যায়'নি কিনা, তাই যেতে লিখেছে। তিনু বোধ হয় কোন কারণে রাগ করেছে। গোবিন্দ চোখ কপালে তুলে বললে, বিধবা মেয়ের ওপর রাগ আবার কি বউ? ভাল কথা নয়। তিনুকে আর আমি যেতে দোব না। থাক আমার রোজগার।

বললাম, না না, ওসব কিছু নয়। তুমি তিনুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। চিঠিটা আমার কাছে থাক, আমি বুঝিয়ে দোব।

প্রশ্ন করিলাম, তিনু এসেছিল?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হুঁ, সেই দিন বিকেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলে। জিজ্ঞেস করলাম, পড়াতে যাচ্ছ না কেন? তিনু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি জানলেন কি ক'রে? বললাম, সে জেনেছি যেমন ক'রে হোক, না যাবার কারণটা কি শুনি? তিনু একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, ফুণ্টি বারণ করেছে। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তিনু একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, সরোজিনী দেবীর কদিন ধ'রে দিন-রাত ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছিল। তাই তাঁর কাছে থেকে সেবা করতে হয়েছিল। বললাম, সে তো উচিত কাজই করেছিলে, তাতে ফুণ্টি বারণ করলে কেন? একটু ইতস্তত ক'রে তিনু বললে, মানে, আমি একা তো নয়, মিণ্টাও করছিল; একরাত্রি তো দুজনকেই জাগতে হ'ল। ফুণ্টি জাগতে না পেরে ঘুমিয়ে পড়ল, তার পরের দিন সকালেই ফুণ্টি হঠাৎ রেগে উঠে বললে, পিসীমা ভাল না হ'য়ে ওঠা পর্য্যন্ত আমি পড়ব না। আপনি এ কদিন আসবেন না। হেসে বললাম, ফুণ্টি যদি পছন্দ না করে তো মিণ্টার সঙ্গে রাত জাগবার দরকার কি? তিনু বললে, ফুণ্টি পছন্দ করবে না ব'লে আমি আমার কর্ত্তব্য করব না? বললাম, বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, ফুণ্টি রাগ করলে তোমার কিছু যাবে-আসবে না। তিনু চুপ ক'রে রইল। বললাম, এই চিঠি নাও, ফুণ্টি তোমাকে লিখেছে; রাগ ক'রে পুরুষত্ব না দেখিয়ে, তাকে ভোলাওগে যাও, আর তাড়াতাড়ি বিয়ে করগে।

তারপর?

তারপর আর কি? তিনু শুনছি, সেই দিনই ওখানে গিছল, আর বিয়েরও নাকি কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

কি ক'রে জানলে?

গোবিন্দ আজ ব'লে গেল, মনু চক্রবর্ত্তী ওর সঙ্গে দেখা ক'রে বিয়ের কথাবার্ত্তা ক'য়ে গেছে।

গাঙুলী মশায়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বৈঠকখানায় বসিয়া ইহার মধ্যেই লণ্ঠন জ্বালাইয়া ইউনিয়ন বোর্ডের খাতাপত্র সারিতেছিলেন,

আমাকে দেখিয়া কহিলেন, এস ভায়া। তখন তোমাকে বলবার সময় হ'ল না, এস. ডি. ও. সাহেব আসছেন আসছে রবিবার।

কহিলাম, ইউনিয়ন বোর্ড দেখবেন নাকি ?

তা দেখতে চান, দেখাব। খাতাপত্র সব ঠিক ক'রে রাখছি। চোখ মটকাইয়া কহিলেন, কি জন্যে আসছেন, জান ? আমাদের সেই দরখাস্তটার তদন্ত করতে। আমাদের হুজুর নিজে গিয়ে সব বলেছেন তো। ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, ভায়া, নেকড়ে হ'লেও বাঘ তো ! মুখ শোঁকাশুঁকি আছেই।

ওরা দরখাস্ত করে নি ?

গাঙ্‌লী মশায় নাসিকা উঁচাইয়া কহিলেন, করলেই বা। মুরুব্বী তো ওদের দারোগা। দরখাস্ত পাবামাত্র ছিঁড়ে ফেলে দেবে।—বলিয়া কাল্পনিক দরখাস্তটি দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার ভঙ্গি করিলেন। তারপর ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কিচ্ছু হবে না। কবে বুড়ীকে কাঁধে ক'রে পৌঁছে দিয়ে যায় দেখ।

বাড়ি ফিরিবার রাস্তায় মণীন্দ্রর সঙ্গে দেখা হইল। পরিধানে সাদা জিনের গলাবন্ধ কোট, পায়ে মেটে রঙের বাটার তৈয়ারি কামবিসের জুতা, বগলে ছাতা, আমাকে দেখিয়া হাঁক দিয়া কহিল, কোথায় যাওয়া হয়েছিল—অ্যাঁ ? গাঙ্‌লীর আড্ডায় বুঝি ? ওই তোমার মাথা খাবে দেখছি।

জবাব না দিয়া কহিলাম, কোথায় গিছলে ?

আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ভ্রূ দুইটি নাচাইয়া কহিল, বলব কেন ? সবাইকে সব কথা বলতে আছে কি ?—বলিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ মণীন্দ্র বলিয়া উঠিল, সব ব্যাটার গুড়ে বালি দিয়ে এলাম।

চুপ করিয়া থাকিয়া চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে মণীন্দ্র আবার বলিয়া উঠিল, হিন্দুর অনিষ্ট করতে হিন্দুর জোড়া আর নেই ; মুসলমানরা ঢের ভাল।—মণীন্দ্র বোধ হয় দারোগাবাবুর কথা বলিতেছে। কিন্তু কথাটি তো সত্য। সরোজিনী গ্রামে আসার পর হইতেই, গ্রামের ছোকরারা ছাড়া সব হিন্দুধর্মধ্বজীরাই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে ;

শুধু দারোগাবাবু, বিধর্ম্মী হইয়াও, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি বা হৃদয়-বৃত্তি যাহারই তাগিদে হোক, সরোজিনীর স্বপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন।

মণীন্দ্র হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করিল, হ্যাঁ হে মাস্টার, এস. ডি. ও. সাহেবকে যে ওরা দরখাস্ত করেছে সরোজিনীর বিরুদ্ধে, সেটা তো তোমার লেখা, নয়?

থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, কে বললে?

মণীন্দ্র কহিল, কে আবার বলবে? আমি বললাম—

আর্ত্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কাকে বলেছ?

মণীন্দ্র বেপরোয়াভাবে কহিল, কেন? এস. ডি. ও. সাহেবকে, জিজ্ঞাসা করছিলেন কিনা! তা এম. এ. পাস ক'রে এত ভুল লিখেছ কেন? সাহেব চোখ-মুখ কুঁচকে একাকার।

আমি কড়া গলায় কহিলাম, দেখ মনুদা, তুমি অত্যন্ত বোকা। কি ক'রে জানলে তুমি, আমি লিখেছি?

মণীন্দ্র জবাব দিল, গাঁয়ে তোমার ছাড়া ইংরিজীতে দরখাস্ত লেখার বিদ্যে আর কার আছে?

মুখ ভেংচাইয়া কহিলাম, বিদ্যে আর কার আছে! কেন, তোমাদের মামাবাবুটি এসেছে, ও লিখতে পারে না?

মণীন্দ্র আকাশ হইতে পড়িল। চোখ বড় করিয়া, ঘাড় কাত করিয়া কহিল, ঠিক ধরেছ তো! ঐ ব্যাটারই তো লেখা। তাই তো বলি, আমাদের মাস্টারের মত বিদ্বান লোক—ছি ছি! হাকিম কি ভাবলেন বল দেখি? আমাকে মনে করিয়ে দিতে হয়।

মনে করিয়ে দিতে হয়! আমি কি তোমার সঙ্গে গিয়েছিলাম নাকি?

অনুতাপের সুরে মণীন্দ্র কহিল, তাই তো, তুমি সঙ্গে থাকলে ঠিক হ'ত।—বিরক্তির সহিত কহিল, বললাম তখন সরোজকে, মাস্টারকেও ধ'রে নিয়ে যাই। বললে, না না, যাকে-তাকে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই।

যাকে-তাকে কথাটা খচ করিয়া মনের গায়ে বিঁধিল। সরোজিনীর আদর-আপ্যায়ন তাহা হইলে মৌখিক, অন্তরে সে আমাকে পর বলিয়াই জানে।

মণীন্দ্র ক্ষোভের সহিত কহিল, ব্যাটার নামটা ক'রে দিলে কত কাজ এগিয়ে যেত বল দেখি? তোমার নাম করাটা ভাল হয় নি। ভাবলে, মাস্টারের মত লোক ও-দলে আছে! যেমন ক'রেই হোক, এম. এ. পাস করেছে তো। আবার নিজেই প্রবোধ মানিয়া কহিল, যাকগে, ওতে কিছু হবে না। তোমার ইংরিজী প'ড়েই—

ধমক দিয়া কহিলাম, আবার বলছ, আমার ইংরিজী?

মণীন্দ্র থতমত খাইয়া কহিল, আরে না না, তোমার ইংরিজী নয়, কিন্তু সাহেবকে বলেছি তো তোমার ইংরিজী, সেইটাই সে বুঝে ব'সে আছে। কিন্তু থাকগে ব'সে, তুমি তো জান, তোমার লেখা নয়। কিন্তু বাজে কথা যাক, আজ আজিজ সাহেব খুব উপকার করেছে ভাই, আমরা দু ভাই-বোনে চিরদিন তার কাছে কেনা হয়ে থাকব। অন্যমনস্ক-ভাবে চুপ করিয়া রহিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, আজিজ সাহেবকে জান না? ঐ যে হে, চপাইয়ে বাড়ি, মস্ত বড়লোক, জমি-জায়গা পুকুর-বাগান বিস্তর; নিজ জোতেই তো দুশো বিঘে জমি; বিশ জোড়া বলদ, ছাগলের মত নয়, প্রকাণ্ড—এক-একটা যেন হাতি; গাই-বাছুর যে কত, তার ইয়ত্তা নেই। আর খামার যদি দেখ তো হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবে, ধানের মরাইয়ে ঠাসা, পা ফেলবার জায়গা নেই।

আজিজ সাহেবকে জানি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সরকারী-মনোনীত সভ্য। এ তল্লাটের একজন অবস্থাপন্ন জাঁদরেল ব্যক্তি; আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডেরও একজন সভ্য।

মণীন্দ্র বলিতে লাগিল, তা ছাড়া খাঁটি মুসলমান, ইয়া চাপদাড়ি, পাঁচ ওখ্‌ত্‌ নমাজ করে।

বিরক্তির সহিত কহিলাম, জানি হে, জানি আজিজ সাহেবকে, অত ব্যাখ্যান ক'রে বলতে হবে না। কি করেছে বল না!

মণীন্দ্রও মেজাজের সহিত কহিল, অত ধমক কিসের বল দেখি? ছাত্র পেয়েছ নাকি? যাও, বলব না।—বলিয়া আবার চলিতে শুরু করিল। আমি পিছু পিছু চলিতে লাগিলাম। ভুল ইংরেজীটি আমার লেখা বলিয়া এস. ডি. ও. সাহেব জানিয়াছেন ভাবিয়া মনটা বিরক্তিতে

ভরিয়া গিয়াছিল, কথা কহিতে বা শুনিতে ভাল লাগিতেছিল না। মণীন্দ্র হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ভালয় ভালয় শোন তো সব বলছি। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মণীন্দ্র বলিতে লাগিল, দারোগাবাবু কাল আজিজ সাহেবকে ডেকে সরোজিনীর ওপর গ্রামের লোকের অত্যাচারের সব পরিচয় দিলেন। শুনে আজিজ সাহেবের চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গাল বেয়ে পড়তে লাগল।

কহিলাম, দেখতে পেলে কি ক'রে? নাক চোখ বাদ দিয়ে সারা মুখে তো দাড়ির জঙ্গল।

মণীন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিল, জঙ্গল তো কি হবে? কাঁদলে বোঝা যায় না? গোঁফ-দাড়ি ভিজে সপসপ করছিল যে।

তাই বল।

মণীন্দ্র রাগিয়া উঠিয়া কহিল, অত কথা ধরলে কথা বলা যায় না। শোন না, আজিজ সাহেবের চোখ থেকে জল পড়তে লাগল, বললে যে, সে জান দিয়ে সাহায্য করবে। তারপর দারোগা সাহেব তাকে যা যা করতে হবে, ব'লে দিলেন। ঠিক হ'ল, আমাকে নিয়ে জেলায় গিয়ে ও যথাকর্ত্তব্য সব করবে।

কহিলাম, তারপর?

আজ সকালে গিয়েছিলাম। ভাল উকিল দিয়ে মুসাবিদা করিয়ে দরখাস্ত লেখানো হ'ল, আজিজ সাহেবের সঙ্গে এস. ডি. ও. সাহেবের বাড়ি গিয়ে দরখাস্ত দিলাম। আজিজ সাহেব সমস্ত ঘটনা সাহেবকে বুঝিয়ে বলতে তিনি বললেন, ও পক্ষেরও দরখাস্ত পেয়েছি।—ব'লেই কাগজের তাড়া থেকে তোমাদের দরখাস্ত—

বাধা দিয়া কহিলাম, তোমাদের মানে?

মণীন্দ্র কহিল, বেশ বেশ। ঐ ব্যাটাদের দরখাস্ত প'ড়ে শুনিয়ে দিলেন, শেষে বললেন, রবিবার নিজে এসে তদন্ত ক'রে সব ঠিক ক'রে দিয়ে যাবেন।

কহিলাম, এই বারেই তিনুকে নিয়ে গিয়ে লাইব্রেরির বই-টইগুলো কিনে আনলে না কেন? এস. ডি. ও. সাহেবকে দিয়ে এই বারেই লাইব্রেরিটার উদ্বোধন করিয়ে নিলে হ'ত।

মণীন্দ্র ভারী গলায় কহিল, লাইব্রেরি-টাইব্রেরি ওসব হবে না। সরোজ বলেছে, ও এখন থাক। পরে করলেই হবে। এখন অনেক খরচ। তা ছাড়া তিমুরও ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আর চলবে না।

আন্দাজে কতকটা বুঝিলাম; তবু প্রশ্ন করিলাম, কেন?

তিমুর সঙ্গে ফুন্টির বিয়ে দোব ভাবছি, সরোজ সব খরচ দেবে।

কহিলাম, ওদের মত হয়েছে?

মণীন্দ্র তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, মত! হাত ধুয়ে ব'সে আছে। ছেলে তো না বলতে বলতেই রাজি।

আর গোবিন্দ?

ঢোক গিলিয়া মণীন্দ্র কহিল, হ্যাঁ, সেও রাজি। ব্যারিং পোস্টে তো আর চালান হচ্ছে না, রীতিমত পয়সা খরচ করা হবে। বললাম যে, সরোজিনী সব খবচ দেবে বলেছে।

প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ির সামনে আসিতেই মণীন্দ্র কহিল, এস না, একবার সরোজিনীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে। সেদিন এত বিপদ দেখে গিয়েও তো একবার উঁকি পর্য্যন্ত মার নি। ঢের ঢের নেমকহারাম দেখেছি, তোমার মত দেখি নি। আর ওদিকে গাঙ্গুলী বুড়োর বাড়ি রোজ যাওয়া হচ্ছে।

কহিলাম, দেখ মনুদা, মিথ্যে কথা ব'লো না। ইন্‌স্পেক্টর আসার হিড়িকে নাইতে খেতে সময় পাই নি, লৌকিকতা করব কি?

ওঃ, তাই! তা চল না একবার। এতবড় একটা কন্যাদায় ঘাড়ে চেপে বসেছে। ঘাড় থেকে নামাবার একটা ফন্দি-ফিকির বাত্‌লে দাওগে দেখি, তুমি তো এসব বিষয়ে ওস্তাদ লোক।

সরোজিনীর যাকে-তাকে কথাটা এখনও মনের গায়ে খচখচ করিতেছিল। তাই এড়াইবার জন্য কহিলাম, হ্যাঁ, ওস্তাদ বইকি। কতগুলো মেয়ে পার করলাম এই বয়সে!

তা নাই বা করলে। বুদ্ধি-শুদ্ধি তো আছে? অন্য উপকার তো কোন দিন কর নি, করবেও না, এক-আধটা পরামর্শ দিয়ে উপকার করতেও অনিচ্ছে?

যাইতেই হইল। উঠানে পা দিতেই দেখিলাম, মন্থর ও বীরু আচায্যির একপাল ছেলেমেয়ে উঠানে কলরব সহকারে খেলা করিতেছে। রান্নাঘরের দাওয়ায় গোবিন্দ, মিণ্টা ও মনু চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী মুখামুখি বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

মণীন্দ্র হাঁক দিয়া কহিল, ওরে কে আছিস, একটা শতরঞ্চি পেতে দিয়ে যা তো। আমাকে কহিল, দাঁড়াও হে মাস্টার, আসছি।—বলিয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। মণীন্দ্র বিবাহের অছিলায় সপরিবারে এখানে আড্ডা গাড়িয়াছে বুঝিলাম। ফুন্টি আসিয়া একটা ছোট শতরঞ্চি পাতিয়া দিল। আমার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র ফুন্টি লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার গোপন দুষ্কর্ম্মের কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি, ফুন্টি বোধ হয় জানে।

মণীন্দ্র খালি গায়ে আসিয়া কহিল, ব'স হে মাস্টার। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শতরঞ্চিতে বসতে মন সরছে না বুঝি? সাহেব মানুষ তো!

বলিলাম, না না, তা কেন?—বলিয়া জুতা খুলিয়া বসিয়া পড়িলাম।

মণীন্দ্র পরনের কাপড় হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত তুলিয়া দিয়া চৌকস হইয়া বসিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আজ ভারী ছুটোছুটি করতে হয়েছে। যাক, কাজ এক রকম হাসিল করা গেছে তো। আর বাছাধনদের চুলবুল করতে হবে না।

চুপ করিয়া রহিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, আর একদিন আবার গিয়ে বিয়ের জিনিসপত্রগুলো কিনে আনতে হবে।

কহিলাম, তিনুকে নগদ টাকা না দিয়ে কিছু জমি-জায়গা ক'রে দাও না।

মণীন্দ্র বিজ্ঞের মত কহিল, সব হবে। সরোজ যখন রয়েছে, কোন ব্যবস্থার জন্যে কারও মাথা ঘামাতে হবে না।

কিঞ্চিৎ উষ্মার সহিত কহিলাম, কাউকে যখন মাথা ঘামাতে হবে না, তখন আমাকে মিছিমিছি টেনে আনলে কেন?

সরোজিনী আসিয়া হাজির হইল। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া

কহিল, দাদা, পথ ভুলে এসেছেন নাকি? বোন পোড়ামুখী একেবারে মরেছে, না এখনও বেঁচে আছে, দেখবার জন্যে?

হাসি দেখিয়া বিগলিত হইলাম না। নীরস কণ্ঠে কহিলাম, ভারী ব্যস্ত ছিলাম কদিন, ইন্‌স্পেক্টর স্কুল দেখতে এসেছিলেন।

সরোজিনী গম্ভীর মুখে কহিল, ওঃ, তাই! তা কাউকে পাঠিয়েও একবার খবর নিতে পারতেন।

কহিলাম, খবর রোজই পাচ্ছি। যাক, ভাল আছ তো?

সরোজিনী কহিল, কই আর ভাল! সেদিন তো প্রায় সারারাতই মূর্চ্ছা হয়েছিল, তার পরদিনও অনেকবার, আজ দুদিন একটু ভাল আছি, দুবার ক'রে হয়েছে মাত্র।

ডাক্তার এসেছিল কোন দিন?

সরোজ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ডাক্তার তো একদিনও এ বাড়িতে পা দেয় নি। রাধানাথ ঠাকুরপোরা মানা ক'রে দিয়েছে বোধ হয়। তবে প্রকাশ এসেছিল। ভারী ভাল ছেলেটি! ও-মায়ের ছেলে ব'লে মনেই হয় না।

প্রকাশ এখনও আসছে নাকি?

ওর মা নাকি আসতে মানা করেছে। তবু আসে দিন একবার ক'রে, রাত্রে বাড়ি ফেরবার সময়ে।

মণীন্দ্র কহিল, বিনা পয়সায় ভেবো না, রীতিমত ফী দেওয়া হচ্ছে।

সরোজ কহিল, কই আর ফী দেওয়া হচ্ছে! প্রথম দুদিন নিয়েছিল, আজকাল নিচ্ছে না। পকেটে গুঁজে দিলেও ফিরিয়ে দেয়, বলে, আপনার লোকের কাছে ফী নোব কি? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত কহিল, ভারী ভাল ছেলে, আমাকে মাসীমা ব'লে ডাকে।

প্রকাশ-প্রসঙ্গ বন্ধ করিবার জন্য কহিলাম, তিনকড়িকে দেখছি না?

সরোজিনী হাসিয়া কহিল, জানেন না বুঝি, ফুন্টির সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হচ্ছে যে। বিয়ের কথাবার্তার পর থেকে আর লজ্জায় আসে না সব সময়। দুবেলা দুবার খবর নিতে আসে শুধু।

মণীন্দ্র কহিল, মাস্টার বলছে, তিনুকে নগদ টাকা না দিয়ে, জমি দিতে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সরোজিনী কহিল, তোমার যদি তাতেই সুবিধে হয়, তাই কর।

কথাটা উল্টাইয়া দিয়া মণীন্দ্র কহিল, গোবিন্দ এসেছে।

সরোজিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, তাই নাকি! কোথায়?

মণীন্দ্র কহিল, রান্নাঘরে ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কচ্ছে।

আমার দিকে চাহিয়া সরোজিনী কহিল, আমি ওঁর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কইগে, আপনাদের চা-খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, না খেয়ে যাবেন না কিন্তু।—বলিয়া আপত্তির অবসর না দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

নিরঙ্কুশ

পিঙ্গল পাণ্ডুরছায়া রক্তহীন রিক্ত দিনক্ষণ,
ঝ'রে যায় একে একে পীতবর্ণ পাতার মতন।
নিরুপায় বর্ত্তমান; অতীতের শুনি দীর্ঘশ্বাস,
মুছে যায় সব রঙ রাঙা দিন স্বপ্নের আকাশ।
এখানে ফোটে না ফুল; ফলে নাই ফসল সোনার,
বিশীর্ণ বয়স্তদিন, বর্ণহীন ভুবন আমার।
হেরি শুধু শূন্যময় সম্মুখেতে ছায়া রাশি রাশি,
নিরন্তর মৃতস্বপ্ন নিরাশার শুনি প্রেতহাসি।

জীবনে অনেক সাধ—দিগন্ত সে দূরে স'রে যায়;
কামনার মায়াদীপ তবু জ্বলে হলুদ-শিখায়।
আহত আশারা শুধু ফিরে ফিরে স্বপ্নে কথা কয়,
নিষ্পলক অন্ধ আঁখি অন্ধকারে তবু জেগে রয়।
জীবনে অনেক সাধ—দিগন্ত সে দূরে যায় স'রে,
ঘোরে ফেরে স্বর্ণমৃগ তবু এই স্বপ্নের প্রান্তরে।

মৃণালকান্তি দাশ

বাইশে শ্রাবণ

অনেক শ্রাবণ-দিন—বহু ব্যর্থ বাইশে শ্রাবণ
রিক্তহস্তে ফিরে গেছে ; মিশে গেছে তার প্রতিক্ষণ
প্রীতিহীন মৃত্তিকায়—খ্যাতিহীন, গৌরববিহীন,
পাণ্ডুর, মলিন।

বিবর্ণ শ্রাবণ-দিনে সেই শ্রান্ত আনত আকাশ
কুড়ায়েছে রিক্ততার রুক্ষ পরিহাস
বহুদিন। রেখাহীন রঙহীন বুকে
শরৎ হেমন্ত আর বসন্তের বর্ণচ্ছটা
হেসে গেছে নির্ম্মম কৌতুকে।

তারপর একদিন অকস্মাৎ দিন এল তার
একটি মৃত্যুই শুধু দিল তারে মহিমা অপার।
দীর্ঘদিন পৃথিবীতে পরম গৌরবে বাঁচিবারে
একটি সে মৃত্যু এসে দিয়ে গেল তারে
লক্ষ লক্ষ মানুষের সিক্তপক্ষ্ম আঁখির প্রসাদ,
অশ্রুসিক্ত বন্ধনের স্বাদ।

বাইশে শ্রাবণ সেই ঊর্দ্ধে তুলি সে মৃত্যুর মসীলিপ্ত কর
রেখে গেল পৃথিবীতে চিরন্তন অক্ষয় স্বাক্ষর।

আহসান হাবীব

গরু

প্রথম দৃশ্য

দেশ—মানবীয় সভ্যতার অন্যতম আদি-লীলাভূমি মধ্য-এশিয়া—খিরঘিজের দিগন্ত-ব্যাপী দীর্ঘ-তৃণাচ্ছন্ন প্রান্তর। মধ্যস্থলে চালকর-টেঙ্গিজ হ্রদ। হ্রদের তীরবর্ত্তী খানিকটা স্থান অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে ঘন-বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা প্রান্তর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

কাল—প্রাচীন প্রস্তর-যুগের শেষ সহস্রক।

পাত্র—একদল প্রাগৈতিহাসিক মানুষ। একপাল প্রাগৈতিহাসিক কুকুর। এবং একপাল প্রাগৈতিহাসিক গরু।

মানুষে ও কুকুরে বহুপূর্ব্বেই বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। উভয়ে একসঙ্গে শিকার করিয়া থাকে। মানুষই কুকুরের সহিত, কি কুকুরই মানুষের সহিত যাচিয়া বন্ধুত্ব করিয়াছিল তাহা গবেষণার বিষয়। তবে পশু-মনস্তত্ত্ববিদরা কুকুরকেই মানুষ অপেক্ষা অধিকতর মিশুক বলিয়া মনে করেন। অতএব কুকুরই গায়ে পড়িয়া মানুষের বন্ধু হইতে চাহিয়াছিল, ইহাই সম্ভব। এখনও আমরা কাহারও গায়ে-পড়া ভাব দেখিলে কুকুরের সহিত তাহাকে উপমিত করি।

যাহা হউক, একদা একদল মানুষ (নর ও নারী) ও একপাল কুকুর (পুং ও স্ত্রী) একপাল গরুর (পুং ও স্ত্রী) পশ্চাদ্ধাবন করিয়া টেঙ্গিজ-হ্রদের ধারে উপস্থিত হইয়াছিল। গরু, কুকুর এবং মানুষ সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়া যথাক্রমে তৃণভূমিতে, বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে এবং হ্রদতীরবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণীবেষ্টিত স্থানে আশ্রয় লইল। মানুষেরা চর্ম্ম-নির্ম্মিত তাঁবু খাটাইয়া ফেলিল।

পরদিন। সূর্য্য উঠিতেছে। হ্রদের জল গলিত স্বর্ণের মত জ্বলিতে লাগিল। কুকুরেরা ঘেউ ঘেউ শব্দে জাগিয়া উঠিল। সূর্য্যের কিরণ গাছের ফাঁকে ফাঁকে ভূমিতলে প্রতিহত হইতেই মানুষেরা মহান কলরব করিয়া গাত্রোত্থান করিল। রৌদ্রস্নাত তৃণ-প্রান্তরে গরুরাও সমস্বরে হাম্বারব করিয়া উঠিল। ত্রয়ীর সমবেত ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত হইল।

তারপর মানুষ, গরু ও কুকুর তদানীন্তন স্ব-স্ব অভ্যাস অনুযায়ী প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে রত হইলে সহসা প্রাগৈতিহাসিক নারী-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। অমনই এক-প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত অবধি মানুষের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল।

১ম (পুং)। লে-লে-লে-লে-লে-হো-ও-ও-অ-অ-অঃ।

২য় (স্ত্রী)। লি-লি-লি-লি-লি-হে-এ-এ-অ্যা-অ্যা-অ্যাঃ।

বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে দলে দলে নরনারী বাহির হইয়া তৃণ-প্রান্তরের প্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

২য়। অ্যাঃ, দেখেছিস, মেরে ফেলেছে!

১ম। শিং বিঁধিয়ে দিয়েছে শালা গরু।

৩য়। ঐ—ঐ!

৪র্থ। তেড়ে আসছে, বাবা গো!

৩য়। গাছে চড়, গাছে চড়।

তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যে ৪র্থ ব্যক্তি গাছে চড়িল।

২য়। মার—মার।

৩য়। মার—মার।

বিশ-পঁচিশজন মানুষ যূথ-ভ্রষ্ট গরুটাকে বৃত্তাকারে ঘিরিয়া ফেলিল এবং শাণিত পাথরের ছুরি ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল।

১ম। মার শালাকে।

৪র্থ। (গাছের উপর হইতে) মার শালাকে।

৫ম। পালা—পালা সব।

সকলে সচকিত হইয়া তাকাইল, দেখিল, কয়েকটি বন্য গরু ছুটিয়া আসিতেছে।

১ম। ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ।

২য়। ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ।

৪র্থ। (গাছের উপর হইতে) ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ।

অমনই "ঘেউ, ঘেউ ঘেউ" শব্দ করিতে করিতে কুকুরের পাল ছুটিয়া আসিল। মানুষেরা গাছে চড়িয়া গরুদের উপর প্রস্তর-বর্ষণ করিতে লাগিল। কুকুরেরা গরুদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভীষণ সংগ্রাম শুরু হইল। নরহত্যাকারী গরুটি ও অপর দুইটি গরু শীঘ্রই ধরাশায়ী হইল। অন্যান্য গরুরা রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। কুকুরেরা একটি গরুর মৃতদেহ লইয়া ভোজ শুরু করিল। প্রসঙ্গত বলিতে চাই, ইহাই প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাসে যুগান্তকারী 'ব্যাট্‌ল ফর ডমেষ্টিকেশন অব ক্যাট্‌ল' নামে সুবিখ্যাত।

১ম। পালাচ্ছে ব্যাটারা।

২য়। এখন নাব।

৩য়। নেবে পড়, নেবে পড়।

সকলে নামিয়া পড়িল।

৩য়। আগুন ধরা।

১ম। মাটি খোঁড়

কয়েকজন অদূরে মৃত নারীদেহকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন কবর খুঁড়িতে লাগিল। ১ম ব্যক্তি অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মৃতদেহের উপর প্রাক্-সমাধি ইন্দ্রজাল-কৃত্য সম্পন্ন করিল। অপর কয়েকজন শুষ্ক পত্র ও কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আগুন ধরাইল। দুইজন ব্যক্তি একটি গরুর মৃতদেহকে টানিয়া আনিয়া আগুনে ফেলিল। তখন নরনারী সকলে মিলিয়া তদানীন্তন প্রথানুযায়ী উন্মত্তবৎ 'প্রাগশন-নৃত্য' আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সিন্ধুনদতীরবর্ত্তী একটি আর্য্য-জনপদ।
কাল—বৈদিক যুগ।
পাত্র—অগ্নিযাজী, সোমপায়ী, বেদাধ্যায়ী প্রভৃতি।

প্রস্তর-যুগ হইতে বৈদিকযুগের মধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। গরুরা গৃহপালিত জন্তুতে পরিণত হইয়াছে। মানুষ কৃষিকার্য্য শিখিয়া ফেলিয়াছে। ক্ষেত্রে কাজ করে এবং মাংস ও দুগ্ধ দান করে বলিয়া মানুষ এখন গরুকে অমূল্য সম্পদ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুকুরের সহিত মানুষের বন্ধুত্বের অবসান ঘটিয়াছে। কুকুরকে সে এখন স্নেহ করে বটে, কিন্তু সেই স্নেহের সহিত কিছু পরিমাণ দয়া, করুণা ও ঘৃণাও করে। কেন না, এখন সে অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। নিজের শক্তি ও মহত্ত্ব বিষয়ে মানুষ যথেষ্ট সচেতন হইয়া পড়ায় গরুকেও সে ক্রীতদাস বলিয়া মনে করে, এবং তাহার প্রতি ক্রীতদাসের মতই আচরণ করে। মধ্য-এশিয়া হইতে ভারত আগমনের সময় বহুসংখ্যক গরু তস্কর কর্তৃক লুণ্ঠিত হয় এবং প্রবল শীতে মারা পড়ে। তাই খাদ্য হিসাবে গরুর ব্যবহার কমিয়াছে। উৎসবাদি উপলক্ষ্যেই শুধু তাহাকে খাদ্য হিসাবে স্মরণ করা হয়। কিন্তু উৎসব প্রায় প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সিন্ধুতীরবর্ত্তী তপোবন-সদৃশ একটি গৃহ। প্রাঙ্গণের পার্শ্বে গো-দোহনরতা প্রিয়দর্শিনী আর্য্য-দুহিতা। অদূরে দ্রাবিড় পরিচারক গোবৎসকে ধরিয়া রাখিয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সদ্যস্নাত গৃহস্বামী অগ্নিযাজী হবিঃ-সংযোগে যজ্ঞে রত।

অ। ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
সদেবাঁ এহ বক্ষতি ॥

হঠাৎ গরুটি ডাকিতে ও পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিতেই দুধের মৃণ্ময়পাত্র ভাঙিয়া সমস্ত দুধ গড়াইয়া পড়িল।

দুহিতা। বাবা, দেখ দেখ, গরুটা কেমন করছে; দুধটা সব ফেলে দিলে।

অ। অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে।
যশসং বীরবত্তমম্ ॥

দু। যগ্যি এখন রাখ। শিগগির এস।

অ। আসছি মা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। অগ্নয়ে স্বাহা।

শেষ আহুতি দিতে দিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় গরুটি দুহিতাকে পদাঘাত করিয়া শুইয়া পড়িল ও ছটফট করিতে লাগিল।

অ। তাই তো! ওর হ'ল কি?

অগ্নিযাজী ছুটিয়া গেলেন। বাছুরটিকে ছাড়িয়া দিয়া দ্রাবিড় পরিচারকও গরুর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

অ। শিগগির আর্য্য সোমপায়ীকে ডেকে নিয়ে আয় তো।

পরিচারক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই সোমপায়ীকে আসিতে দেখা গেল।

সো। ভো ভো আর্য্য অগ্নিযাজিন্, শীঘ্র একবার চল দেখি। আমার গাভীটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অ। আরে ভায়া, আমারটাও কেমন যেন করছে।

সোমপায়ী আসিয়া গরুর সমীপে দাঁড়াইলেন।

সো। আমারটাও ঠিক এমনই ছটফট করতে করতে কেমন যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। চক্ষু বিস্ফারিত, দন্তপাটি সংবদ্ধ, পদচতুষ্টয় প্রসারিত। মুমূর্ষুর লক্ষণগুলো সব পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

অ। এরও তো' তাই।

সো। ঠিক এমনই।

অ। কি হ'ল বল দেখি?

সো। তাই তো, তুমিই বল তো ভাই।

দু। বাবা, বাবা, ম'রে গেছে।

সো, অ। তাই তো।

সোমপায়ীর পুত্র ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিল।

সো-পু। তাত, গাভীটা অক্কালাভ করেছে।

অ, সো। তাই তো হে, চিন্তায় ফেললে।

অগ্নিযাজী ও সোমপায়ী চিন্তিত মুখে বিজ্ঞের মত মস্তক আন্দোলন করিতে লাগিলেন; এবং যাজীনন্দিনী ও পায়ীনন্দন পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ হানিতে লাগিল

সো। যজ্ঞ কর।

অ। ঠিক।

সো। যাও তো বৎস, সমিধ নিয়ে এস। এই যজ্ঞকুণ্ডেই পঞ্চগব্য দিয়ে যজ্ঞ করা যাক। যাও তো অম্বা, পঞ্চগব্য নিয়ে এস।

যাজী-তনয়া ও পায়ী-তনয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে দ্রব্য লইয়া প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত-সমস্তভাবে আর্য্য বেদাধ্যায়ীর প্রবেশ।

বে। উভয়েই উপস্থিত রয়েছ দেখছি।

অ, সো। ব্যাপার কি?

বে। (উচ্ছ্বাসভরে) আমার নন্দিনীতুল্য গাভীটা ভবলীলা সংবরণ করেছে।

অ। বল কি হে! আমাদেরও যে সেই দশা।

সো। অর্থাৎ, আমাদের গাভীদের।

অ। তাই যজ্ঞ করছি।

সো। গো-মড়ক নিবারণ হবে।

অগ্নিদুহিতা বাজীনন্দিনী প্রিয়দর্শিনী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল

অ। হাসছিস যে?

দু। গরুর হয়েছে অসুখ, যজ্ঞ করলে কি হবে?

সো-পু। গরুকে ওষুধ খাওয়াতে হবে।

সো। (পুত্রের প্রতি) অর্ব্বাচীন, গুরুজনসমক্ষে বাচালতা পরিহার করা কর্ত্তব্য—এও শেখ নি!

বে। আধুনিক শিক্ষা পেয়ে আর্য্য-সংস্কৃতি উৎসন্নে দিতে বসেছে সব।

সো। এসব তোমার ওই বেদ-বিরোধী দেব-নিরোধী আকাটমূর্খ অকাল-কুষ্মাণ্ড কণাদের কীর্ত্তি।

বে। তোমার ছেলে তো ওরই কাছে পড়ে?

সো। তা, হ্যাঁ, মানে—

বে। তোমার নন্দিনীও?

অ। হ্যাঁ।

বে। আমার কাছে অধ্যয়ন করতে ব'লে দিও। আমিও বিনা-দক্ষিণায় পড়াব।

সো। অবশ্য। অবশ্য। তা হ'লে তো অতি উত্তম হয়।

বে। যজ্ঞ নিয়ে কৌতুক!

অ। যাক, ক্রোধ সংবরণ কর। এস, যজ্ঞ আরম্ভ করা যাক।

যজ্ঞকুণ্ডের নিকট গমন করিয়া যজ্ঞ শুরু করিল। নন্দন-নন্দনী পরস্পরের প্রতি সহাস্য সকৌতুক সলজ্জ সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিতে লাগিল।

সো। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।

বে। অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূবসি।

সইদ্দেবেষু গচ্ছতি ॥

সো। অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।
দেবো দেবেভিরাগমৎ ॥

অ। যদঙ্গদাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥

বে, সো, অ। অগ্নয়ে স্বাহা।

দু। বাবা, যতই দুধ-ঘি খাওয়াও, জড়-পরমাণু-সমষ্টি অগ্নিদেব ওসব কিছুই বুঝছেন না।

অ। চুপ কর তো তুই। এর মানে বুঝিস কিছু?

দু। শুনবে? অগ্নিদেবকে ঘুষ দিয়ে তোমরা ভোলাতে চাচ্ছ—হে অগ্নিদেব, তুমি, তোমার উদ্দেশে হবির্দানকারী যজমানের যে মঙ্গলবিধান করিবে, তাহা তোমারই অর্থাৎ তাহা দ্বারা তোমারই সুখসাধন হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, তোমাকে উপাসনা করিয়া যজমান ঐশ্বর্য্যশালী হইলে তাহা দ্বারা উত্তরোত্তর তোমাকে উপাসনা করিতে থাকিবে।

সো। অগ্নিযাজিন্, তোমার দুহিতা বিদুষী বটে।

অ। (প্রসন্ন হাস্যে) তা বটে। যাক, এইবার শেষ আহুতি দেওয়া যাক।

বে, সো, অ। অগ্নয়ে স্বাহা।

পঞ্চগব্যে পাঁচবার আহুতি দিল। এমন সময় কণাদ-প্রমুখ সাত-আটজন নাগরিকের প্রবেশ।

কণা। হাঃ হাঃ হাঃ, তোমরা যজ্ঞ করছ নাকি?

নন্দন-নন্দিনী গুরুদেবকে প্রণাম করিতে তিনি আশীর্বাদ করিলেন।

১ম নাগ। ভালই তো, গো-মড়ক নিবারিত হবে।

বে, সো, অ। অগ্নয়ে স্বাহা।

শেষ আহুতি প্রদান।

অ। কি সংবাদ ?

কণা। গো-মড়ক। তোমাদের গাভীর কুশল তো ?

সো। (মৃত গাভীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে) অবলোকন কর।

সকলে। তাই তো।

কণা। এর প্রতিকারের উপায় চিন্তা করছ ?

বে। এই তো দেখছ, যজ্ঞ করছি।

কণা। তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে বোধ হয়।

১ম না। এ তল্লাটের সব কটা গরুই এখন মারা গেছে।

২য় না। গো-হীন মনুষ্যজাতি কল্পনার অতীত।

৩য় না। দুধের অভাবে শিশুরা মারা পড়বে।

৪র্থ না। মাংসাভাবে যুবকেরা দুর্ব্বল হবে।

৫ম না। গব্যাভাবে যজ্ঞ বন্ধ হবে।

৬ষ্ঠ না। চর্ম্মাভাবে পাত্র ও পাদুকার অভাব হবে।

৭ম না। অতএব আমার মনে হয়, দলবদ্ধ হয়ে আমাদের এস্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কণা। তার চেয়ে অন্য স্থান থেকে গরু কিনে নিয়ে আসাই শ্রেয়।

সো। কিন্তু অত গাভী পাওয়া যাবে কোথায় ?

ক। তা বটে।

অ। যে কটি পাওয়া যায়, তাই নিয়ে আসতে হবে। শিশুদের বাঁচাতে হবে তো।

সো। যজ্ঞও করতে হবে।

বে। মাংস-ভক্ষণে বিরত থাকলেই সংখ্যাল্পতায় বিচলিত হবার কারণ থাকবে না।

২য়, ৩য়, ৫ম। সাধু প্রস্তাব।

৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম। কিন্তু মাংসভক্ষণে বিরত থাকাটা যে কতখানি—

২য়, ৩য়, ৫ম। থাকতেই হবে।

সো, অ, বে। আজ থেকে গোমাংস-ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

কণাদ ব্যতীত সকলে। (সমস্বরে) যে গোমাংস ভক্ষণ করবে, সে নিরয়গামী হবে।

ক। হাঃ হাঃ হাঃ, হোঃ হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ হাঃ।

বে। কেন, তুমি এ প্রস্তাব সমর্থন কর না?

ক। নিরুপায়।

"গোমাংস নিষিদ্ধ" ধ্বনি করিতে করিতে নাগরিকগণ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ফতেপুর সিক্রী।
কাল—মোগল-যুগ।
পাত্র—বিখ্যাত ঐতিহাসিকযুগল বাদাওনী ও নিজামুদ্দীন।

গোমাংস নিষিদ্ধ হইবার পর কালক্রমে গরু গোমাতারূপে পূজা পাইতে লাগিল। হিন্দুযুগের অবসান পর্য্যন্ত খাদ্যহিসাবে নিষিদ্ধ হওয়ায় গরুদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। পক্ষান্তরে গাঙ্গেয়-উপত্যকার আর্দ্র মৌসুমী-জলবায়ুর প্রভাবে গরুরা শীর্ণকায় ও শ্রমকুণ্ঠ হইয়া পড়িল। গোখাদক পাঠান, ইরানী, তুর্কী, তাতার, মোগল ভারতে আগমন ও রাজত্ব আরম্ভ করায় পুনরায় খাদ্য হিসাবে গোমাংসের প্রচলন হয়। যে সমস্ত হিন্দু ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তাহারা পুনরায় গরু খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে সমস্ত হিন্দু ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিল না, তাহারা পুনরায় গরু খাইতে আরম্ভ করিল না। আকবর মুসলমান-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই গোমাংস নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন, যে গোমাংস ভক্ষণ করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে এবং সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইবে।

ফতেপুর সিক্রীর ধনী নাগরিক নিজামুদ্দীনের প্রাসাদের বহিঃ-প্রাঙ্গণ। সম্মুখে সুপ্রশস্ত রাজপথ। প্রাঙ্গণের একাংশে উদ্যান। উদ্যানমধ্যস্থ বেদিকায় অতিথিবর্গ সমাসীন। বাদাওনীর পুত্রের সহিত নিজামুদ্দীনের কন্যার বিবাহের বাক্‌দান-উৎসব উপলক্ষ্যে প্রাসাদটি মুখর ও কর্ম্মচঞ্চল

নিজাম। (জনৈক পরিচারককে) উলুগ এখনও আসে নি?

পরি। আজ্ঞে না হুজুর।

নি। বড়ই মুশকিলে ফেললে দেখছি। মেহমানরা সব এসে গেছে। এখনও হুকুম পাওয়া গেল না।

বাদা। বাদশার হুকুম আনতে পাঠিয়েছ বুঝি ?

নি। হ্যাঁ ভাই। সেই ফজিরে গেছে। এদিকে বেলা বেড়ে চলেছে, না এল হুকুম, না এল বকরা।

বা। তুমিও যেমন। ব্যাটা কাফের—

নি। কে ?

বা। কে আবার, বাদশাহ স্বয়ং।

নি। আস্তে দোস্ত, আস্তে।

বা। আমার ভাই খোলসা বাত। শালা কাফেরগুলোর পাল্লায় প'ড়ে গোশ্‌ত্‌ খাওয়া বন্ধ ক'রে দিলে।

নি। আস্তে দোস্ত, আস্তে।

বা। আরে ব্যাটা, তোর গোশ্‌ত্‌ খেতে ভাল লাগে না, তুই খাস না। তাই ব'লে আর পাঁচজনের খাওয়া বন্ধ করবার তোর কি অধিকার ?

নি। আস্তে দোস্ত। পাঁচজনে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কে কোথায় শুনে ফেলে টুক ক'রে বাদশার কানে গিয়ে লাগাবে।

বা। (আরও উত্তেজিত) লাগাক। খাওয়া বন্ধ করবে, আবার জবানও বন্ধ করবে নাকি! এ কি ইবলিসের রাজত্ব হ'ল নাকি ? বাপ! আল্লাতালার রাজত্বে সব সমান। সকলের সমান স্বাধীনতা। আল্লাহ বকরা সৃষ্টি করেছেন খাবার জন্যে; তুই ব্যাটা খোদার ওপর খোদকারী করবার কে ?

নি। আহা চ'টো না ভাই, চ'টো না।

বা। চটব না ? হাড়ে হাড়ে চটাচ্ছে, চটব না! জৈনরা নিজের বদন খাটিয়ায় বেঁধে খটমল খিলায়, হিন্দুরা গরুকে হারাম মনে করে। তাতে মুসলমানের কি ?

অনেকে। যা বলেছেন।

বা। বলব না! হাজারবার বলব। পৈগম্বর হবার সাধ হয়েছে বামন হয়ে আসমানের চাঁদে হাত!

নি। বাঃ ভাই, বলেছ বেশ। তা আমি কিন্তু হিন্দুদের কোন দোষ দেখি না। তাদের কিতাবে গোশ্‌ত্‌ খেতে মানা।

বা। আমিই কি তাদের দোষ দিচ্ছি নাকি? সব শয়তানির জড় তোমার ওই মুবারক শেখ আর ব্যাটা আবুলফজল। বাপ-ব্যাটা মিলে বাদশাহকে ক'রে তুলেছে দীন-দুনিয়ার মালিক। আল্লাহু আকবরের কি মানে করে ওরা জান?

নি। কি?

বা। আকবরই আল্লাহ! উঃ, কি বেয়াদপি, শালারা আসল শয়তান।

জনৈক পরিচারকের দুইটি বাছুর লইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ।

নি। ওই, ওই, এসে গেছে দেখছি।

পরিচারক আগাইয়া আসিল।

নি। কত দাম নিলে দুটোর?

প। দুশো ফুলুস।

নি। দুশো!

প। জী হুজুর। পহলে তো বেচতেই চায় না। পুছল, কি করবে, জবহ কর যদি, বেচব না। আসলে ব্যাটা দাম বাড়াতে চায়।

বাদা। যাক, নিয়ে যা। দেরি করিস না। জলদি জবহ ক'রে রসুই-ঘরে পাঠিয়ে দে।

পরি। আজ্ঞে, আরজির জবাব না এলে—

বা। দুত্তোর জবাব! আমি দেখে নোব।

নি। না হে, আর একটু দেখাই যাক।

বা। তুমি বড় ডরপোক।

নি। না না, ডরাচ্ছি না, তবে—

বা। তবে কি?

নি। এই, বাদশাহ যদি গোশসা করে—বড় খতরনাক!

বা। কি সাজা দেবে শুনি?

নি। জান না নাকি?

বা। জানি হে, জানি। জান নেবে, মাল ছিনে নেবে—হাঃ হাঃ হাঃ, তুমি বড় ডরপোক দোস্ত।

নি। আচ্ছা, যা।

গোবৎস লইয়া পরিচারকের প্রাঙ্গণে পুনরাবর্ত্তন। অন্য একটি পরিচারক ছুরিকা-হস্তে অগ্রসর হইল। একটিকে জবাই করা হইল। অপরটির গলায় ছুরি বসাইতে যাইবে, এমন সময় রাজপথ হইতে জনৈক অশ্বারোহী রাজপুরুষ তাহা দেখিতে পাইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।

রা। ও কি হচ্ছে?

পরি। (ভীত) হুজুর!

রা। জবাই! কার হুকুমে?

প। জী হুজুর।

রা। জী হুজুর! বাদশার হুকুমৎনামা কোথায়?

গণ্ডগোল শুনিয়া বাদাওনী ও নিজামের প্রবেশ। রাজপুরুষের অশ্ব হইতে অবতরণ। রাজপুরুষ ও বন্ধুদ্বয় পরস্পরকে সেলাম জানাইল।

রা। আল্লাহ আকবর।

নি। জল্লা জলালাহু।

রা। এ কি হচ্ছে বক্সী সাহেব?

নি। আজকে ভোজ কিনা!

রা। সে তো বুঝলাম, হুকুম নিয়েছেন ?

নি। হুকুম আনতে পাঠিয়েছি।

রা। তার আগেই জবই ক'রে ব'সে আছেন দেখছি।

বাদা। তাতে হয়েছে কি ?

রা। আপনাকে বলা হয় নি।

বাদা। না হোক ; বাদশাহ হুকুম না দিলেও আমরা গোশত্ খাব।

নি। আহা-হা, থাম ভাই, থাম।

রা। জানেন, এর কি সাজা ?

বাদা। জানি খুব ভাল ক'রেই। তোমার বাদশাহকে খবর দাও গিয়ে।

রা। বহুৎ আচ্ছা।

রাজপুরুষ অশ্বারোহণে উদ্যত ; নিজামুদ্দীন বাধা দিল।

নি। শুনুন, শুনুন।

রা। বলুন।

নি। গোস্‌সা করবেন না।

রা। বাদশাহের গোলাম হয়ে বাদশাহকে অপমান, এত বড় বে-আদবি!

বাদা। আলবৎ করব। যে অন্যের সম্মান রাখে না, অন্যের ধর্ম্মের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে, অন্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করে, যে তৃণাদপি তৃণ, অণু হতে অণু হয়েও আল্লা আর আল্লার রসুলকে অপমান করে, যে—

রা। খবরদার বাদাওনী! আর একটি কথা বলেছ কি গর্দ্দান নোব।

তরবারি নিষ্কাশণ। নিজাম ঝটিতি তরবারি কাড়িয়া লইল। বাদাওনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

নি। চটবেন না কোতোয়াল সাহেব। আসুন, বসবেন।

বাদা। মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা ক'রে নেবেন।

রা। আমার মেজাজ গোশ্‌ত্‌-খাওয়া মেজাজ নয়।

বাদা। গোশ্‌ত্‌ না খেয়েই আপনার যা মেজাজ, খেলে না জানি—

নি। চুপ ভাই, চুপ। আসুন কোতোয়াল্‌ সাহেব।

জেব হইতে দুইটি স্বর্ণমোহর বাহির করিল।

নি। এই নিন যৎসামান্য উপহার। আজ আমার ঘরে উৎসব। সবাই খুশ-মেজাজ। আপনি যখন মেহেরবানি ক'রে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আপনাকেও খুশি দেখতে চাই।

নিজাম কোতোয়ালের হাতে মুদ্রা দুইটি গুঁজিয়া দিয়া আভূমি সেলাম করিল। রাজপুরুষের মুখে হাসি দেখা দিল। অশ্বারোহণে উদ্যত, এমন সময় উলুগের প্রবেশ।

উলুগ। এই যে হুজুর, বাদশার হুকুমনামা।

নিজাম, বাদাওনী ও রাজপুরুষ একসঙ্গে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। উলুগ বেকুবের মত অপস্রিয়মান রাজপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিল। নিজাম কোতোয়ালের তরবারি দ্বারা তাহার পৃষ্ঠে খোঁচা দিতেই সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। নিজাম ও বাদওনী পুনরায় হাসিয়া উঠিল।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কলেজ স্কোয়ার।

কাল—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ।

পাত্র—রাম-শ্যাম-যদু ওরফে টম-ডিক-হ্যারি।

ডিরোজিও ও তাৎকালীন শিক্ষার প্রভাবে রাম-শ্যাম-যদু টম-ডিক-হ্যারির ধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকার না হইলেও প্রথম দুইটি মকারের অনুশীলন এই সাধনার প্রধান অঙ্গ। মদ্য-মাংসের মধ্যে মোক্ষ-লাভের মার্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিন্দুর হারাম আর মুসলমানের হারাম দুইই এখন ইংরেজের কৃপায় সুলভ।

রা। জয় ডিরোজিওর জয়।

শ্যা। Eat, drink—

য। And be merry !

রাম তিনটি প্লেট তিনজনের সম্মুখে স্থাপন করিল। তারপর পার্শ্বস্থ একটি ডেকচি হইতে চামচ দিয়া তিনটি প্রকাণ্ড মাংসের টুকরা পরিবেশন করিল।

রা। আরম্ভ হোক।

শ্যা। র'স ভাই, শুধু eat-এ ক্ষিধে মেটে, তৃষ্ণা মেটে না।

ট্রাউজারের পকেট হইতে একটি মদের বোতল বাহির করিল। যদু চাদরের আড়াল হইতে ডিক্যাণ্টার বাহির করিয়া মধ্যস্থলে স্থাপন করিল।

য। এইবার তোমার ভৈরবী-চক্র সম্পূর্ণ হ'ল।

রা। তা হ'লে সাধন-ভজন আরম্ভ হোক।

শ্যা। জয় ডিরোজিওর জয়।

রা। জয় গুরুজীকি জয়।

য। জয় এপিকিউরাসের জয়।

রা। আরে, এপিকিউরাস নয়, ব্যাকাস।

য। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে থাকে না ছাই।

শ্যা। ঐ হ'ল, আসল মাল ঠিক থাকলেই হ'ল। ফর্মের ভুলচুকে কিছু যায়-আসে না।

রা। কেন ফর্মটা কি তুচ্ছ ব্যাপার? ডিরোজিও অ্যারিস্টটলের দর্শন বোঝাতে গিয়ে ফর্ম আর ম্যাটারের সমন্বয়-তত্ত্ব কি সুন্দর বোঝালে, মনে নেই বুঝি?

শ্যা। মনে নেই? একশো বার আছে। এই বোতলটা যদি হয় ফর্ম, মদটা হ'ল ম্যাটার অর্থাৎ বস্তু। এখন বল, ফর্ম খেয়ে তৃষ্ণা মিটবে, না ম্যাটারে?

রা। ছি ছি ডিক, তুমি দর্শনের কিছুই বোঝ না।

শ্যা। আর যত বোঝে আমাদের টমটম।

রা। ধিক ডিক!

য। তোমরা ঝগড়াই কর তা হ'লে। আমি আরম্ভ করি।

গো-গ্রাসে গরুর মাংস গিলিতে লাগিল। রামা-শ্যামা ওরফে টম-ডিক যদুর কর্ম্মতৎপরতায় অনুপ্রাণিত হইয়া হ্যারির হস্তাঙ্ক অনুসরণ করিল।

রা। (চিবাইতে চিবাইতে)। দিস ইজ রিয়াল ম্যাটার অর্থাৎ আসল মাল।

শ্যা। ব্র্যাভো! মাংস হচ্ছে ম্যাটার, মদটা হচ্ছে তার ফর্ম।

রা। তুমিও দর্শন-শাস্ত্র বোঝ দেখছি।

শ্যা। দর্শন মানে সত্য-বস্তু-নির্ণয়। আসল বস্তু যখন জিবে ঠেকিয়েছি, তখন সত্য-বস্তু-নির্ণয় না হয়ে পারে! দর্শন ব'লে দর্শন, দর্শনের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষও এখন সহজ সরল সুবোধ্য হয়ে গেছে।

রা। (মুখ হইতে একটি হাড় বাহির করিতে করিতে) নাঃ নাঃ, না হে। এখন ফিলসফিই শুধু। মেটাফিজিক্স এখন দুর্ব্বোধ্য। ফিলসফির কারবার বস্তু নিয়ে, প্রত্যক্ষ নিয়ে, সমীক্ষা নিয়ে, বিজ্ঞান নিয়ে। ডিরোজিও কি বললে মনে নেই?

শ্যা। মনে নেই আবার? একশো বার আছে।

রা। বল দেখি?

শ্যা। Philosophy is ths quintessence of sciences।

রা। তোমার স্মৃতিশক্তিটা বড় জোরালো দেখছি।

য। হবে না? পেটে পদার্থ পড়লে মস্তিষ্কের ধূসর-পদার্থ যে বেড়ে যায়, এটাও মনে করিয়ে দিতে হবে নাকি অপদার্থ?

রা। দেখ যেদো, তুই কি বুঝিস ফিলসফির? পড়িস তো ডাক্তারি।

শ্যা। তা ও ডাক্তারি-বিজ্ঞানের বাইরে কথা বলে নি তো।

রা। তা বটে। তুই বলেছিস ঠিক। ডিরোজিও সেদিন বললে—কি বললে যেন শ্যাম?

শ্যা। বললে, বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করা খুবই দরকার।

রা। হিয়ার ইউ আর। তাতে ক'রে তার পক্ষে দর্শন বোঝা হয় সোজা, আবার বিজ্ঞান-শিক্ষাও হয় সার্থক।

য। কেন না দর্শন হ'ল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান।

রা। (যদুর পিঠ চাপড়াইয়া)। ব্র্যাভো! ঠিক এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। দর্শন হ'ল বিজ্ঞানসমূহের সমন্বয়। দর্শন মেটাফিজিক্স নয়। ডিরোজিও ডেমোক্রিট্সের অত্যন্ত ভক্ত, জান শ্যাম?

শ্যা। কণাদ পড়েছ?

রা। না।

শ্যা। প'ড়ে দেখ, হুবহু ডেমোক্রিট্স।

য। কণাদ গোমাংস খেত, গোমাংস নিষিদ্ধ হবার পরও।

রা। তুই জানলি কোত্থেকে?

য। লজিক্যালি। কণাদের মতবাদ থেকে একমাত্র ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, কণাদ গরু খেত, যজ্ঞ করত না, ঈশ্বর মানত না, অথচ সুনীতি আর মার্জ্জিত রুচির সে ছিল দৃষ্টান্ত-স্থল।

রা। অবাক করলি তুই যেদো! তুই এখন সাহিত্য-দর্শন পড়ছিস, না ডাক্তারি?

য। দর্শনটা একটু আধটু—

রা। একটু আধটু? কি হে শ্যাম! তোমার গাম্ভীর্য্যটা কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে! যদুর প্রশংসায় হিংসে হচ্ছে নাকি?

শ্যা। (উচ্চহাস্যে) মনস্তত্ত্বটা আর কলঙ্কিত ক'রো না। দর্শনের আর সব বিভাগকে তো অপবিত্র করেছ—.

রা। হয়েছে; Condillac পড়েছ?

য। পড়ছি।

রা। তুই ?

য। মানে, শ্যামের কাছে।

রা। আর শ্যাম তোর কাছে পড়ছে শরীরতত্ত্ব। ওঃ, বুঝেছি, ষড়যন্ত্র—ঘোর ষড়যন্ত্র। শ্যাম, ভাল হবে না বলছি। যেদো, তুই একটা মিটমিটে। আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা দুজনে শরীরতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্ব স্টাডি করছ—এ ঘোর অন্যায়। বিশ্বাসঘাতক! বন্ধুদ্রোহী! নাঃ, এ দুঃসহ। হা বিধাত, হা শেক্সপীয়র, তুমি ঠিকই বলেছিলে—কি বলেছিল যেন শ্যাম ?

শ্যা। Most friendship is feigning,

রা। Most loving mere folly ;

য। Then heigh ho ! the holly

রা, শ্যা, য। This life is most jolly !

তিনজনে বোতল চাপিয়া ধরিল। পানপাত্র পূর্ণ করিয়া তিনজনে মদ্যপান শুরু করিল।

রা। এইবার মেটাফিজিক্স।

শ্যা। নো, নো, বি মেরি !

য। উইথ এ কাপ অব শেরি।

রা। জয় গুরু।

শ্যা, য। লং লিভ ব্যাকাস।

পুরাদমে মদ্যপান চলিতে লাগিল। সহসা রাস্তার উপর চোখ পড়িতেই রাম লাফাইয়া উঠিল।

রা। পালা, পালা যেদো, তোর বাবা আসছে।

য। বল কি রামদা! লুকোই কোথায় ?

যদু মুক্তকচ্ছ হইয়া পশ্চিম-মুখে দৌড়াইল।

শ্যা। ভয় কি হে?

রা। না না শ্যাম, তোমার heroics এখন রেখে দাও। বোতলটা পকেটে পুরে নাও জলদি।

শ্যাম বোতল পকেটে পুরিয়া ও ডিক্যাণ্টার হাতে পূর্ব্বদিকে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রাম হাড়গুলি কুড়াইয়া প্লেটগুলি গুছাইতে গুছাইতে বিলম্ব হওয়ায় ভীত হইয়া হাড়গুলি লইয়াই প্রস্থান করিল। এইগুলিই পরে গোঁড়া হিন্দুদের গৃহপ্রাঙ্গণে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। যদুর পিতার প্রবেশ এবং ডেকচি ও প্লেটগুলির সমীপে আগমন।

য-পি। হা বিধাত!

ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়া ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুট।

কাল—বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক।

নিখিল-ভারত-গোখাদক-মহাসভার অধিবেশনে যোগদানের জন্য দলে দলে লোক হলে প্রবেশ করিতেছে। মহামহোপাধ্যায় ত্রিপিটকাচার্য্য শামসুল-উলেমা অমুকেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য D. D., D. Sc., D. Phil. সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পরনে পাজামা ও হাফশার্ট। মঞ্চের উপর বক্তা ও উদ্যোক্তরা আসীন। সভাপতি-বরণ ও অনেকগুলি বাণী পাঠের পর সভার কাজ আরম্ভ হইল।

সভাপতি। ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, এই সভা কি উদ্দেশ্যে আহূত হয়েছে, তা আপনারা জানেন। আমরা যারা গরু খাই না, তারা কেন গরু খাব; আর আমরা যারা গরু খাই, তারা কেন গরু খাওয়া বন্ধ করব না, তৎসম্পর্কে আপনাদের কিঞ্চিৎ আলোক বিতরণ করাই এই সভার উদ্দেশ্য। প্রথম বক্তা ঐতিহাসিক দিক থেকে বিষয়টির বিবেচনা করবেন।

১ম বক্তা। বন্ধুগণ, ইতিহাস বিজ্ঞান। অতএব ঐতিহাসিক বিচার

বৈজ্ঞানিক বিচার। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব হইতে মানুষ গোমাংস ভক্ষণ করিয়া আসিতেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বৈপ্লবিক "ব্যাট্‌ল ফর ডমেষ্টিকেশন অব ক্যাট্‌ল"-এর পর গরুরা গৃহপালিত জন্তুতে পরিণত হয়। হিন্দুযুগে কৃষি ও বাণিজ্য বিস্তারের ফলে গরুর সংখ্যাল্পতার দরুন গোমাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ হয়। মুসলমান যুগে পুনরায় গোমাংসের প্রচলন হইল। তবে যে সমস্ত হিন্দু মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তাহারা পুনরায় গরু খাইতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু যে সমস্ত হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল না, তাহারা পুনরায় গরু খাইতে আরম্ভ করিল না। তাহার পর হইতে গরু হিন্দু-মুসলমানে ভেদ ও বিরোধকে জিয়াইয়া রাখিয়া মনুষ্যজাতির উপর প্রতিশোধ লইতেছে; এবং হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের জীবন্ত প্রতীকরূপে ভারতের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে (হিয়ার হিয়ার)। উনবিংশ শতাব্দীতে গোখাদকদের মহাতীর্থ এই কলেজ-স্কোয়ারে কতিপয় বঙ্গীয়-যুবক ফ্যাশান-হিসাবে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিলে তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ইতিহাস আপনাদের হাতে। (হাততালির মধ্যে উপবেশন)।

সভা। দ্বিতীয় বক্তা ধর্ম্মনীতির দিক থেকে বিষয়টির আলোচনা করবেন।

২য় বক্তা। বেদে লেখা না থাকলেও, হিন্দুরা গরুকে গোমাতারূপে পুজো ক'রে থাকেন। কিন্তু হিন্দুর বহুদেববাদ পৌত্তলিকতা নয়, এরূপ একটি প্রবাদ আছে। বহুদেববাদ আর সর্ব্বেশ্বরবাদ একটা বিস্কুটেরই দুটো দিক (হিয়ার হিয়ার)। তাই গরুকে দেবতাও বলা হয়, আবার 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-ফরমুলা অনুযায়ী গরু ব্রহ্মরূপে

কাল্পিত হয়। তান্ত্রিকমতে গোমাতা শক্তি। বৈষ্ণবমতে গরু কেষ্টর জীব। বিবেকানন্দের 'জীব শিব' নীতি অনুযায়ী গরু শিব। আবার পৌরাণিকমতে শিবের বাহনও বটে। তা হ'লে দাঁড়াল এই, গরু মাতা, দেবতা, শিব, শিবের বাহন, শক্তি, ব্রহ্ম। এতদূর পর্য্যন্ত বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না; হিং-টিং-ছটের মতই সহজ সরল সুবোধ্য।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, বেরাল-কুকুর, ছাগল-ভেড়া, হাতী-ঘোড়া, ভালুক, গণ্ডার, জেব্রা, জিরাফ, হিপো, ক্যাঙ্গারু, এমন কি মানুষের স্বগোত্র শিম্পাঞ্জী, গরিলা, ওরাং-ওটাং এরা দেবতা নয় কেন? বেরাল-কুকুরকে দূর দূর ক'রে তাড়াই কেন? পাঁঠা আর মোষ বলি দেওয়া হয় কেন? পাঁঠা—

জনৈক শ্রোতা। পাঁঠা হ'ল অজ্ঞান, মোষ অসুর (হিয়ার হিয়ার)।

২য় বক্তা। পাঁঠা আর ভেড়া আর মুর্গী আর বুনোশূয়োর খেতে যদি দোষ না থাকে, গরু খেলেও দোষ নেই। (উপবেশন।)

সভাপতি। তৃতীয় বক্তা—

জনৈক শ্রোতা। আমি কিছু বলতে চাই।

জনৈক উদ্যোক্তা। (সভাপতির কানে কানে) ভদ্রলোক. সনাতনী-সভার সেক্রেটারি।

সভা। সনাতনী যুক্তিগুলো আমরা সনাতন কাল থেকে শুনে আসছি ব'লে ভুলে যাই। তাই সনাতনী-সভার সেক্রেটারি মহাশয়কে এই সভায় বক্তৃতার সুযোগ আমরা দোব। তিনি নিশ্চিন্ত হোন। তৃতীয় বক্তা বিষয়টির অর্থনৈতিক বিচার করবেন।

৩য় বক্তা। বন্ধুগণ, যান্ত্রিক-শিল্প ও যান্ত্রিক-বাহনের প্রসারের সঙ্গে ভারবাহী জন্তু হিসাবে গরুদের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ ক'মে আসছে।

তারা এখন দুধও দেয় কম। মানুষও দারিদ্র্যবশত ভাল খেতে পাচ্ছে না। দুধ, ঘি, মাখন, ছানা দুর্ম্মূল্য, খুব কম লোকেরই জোটে, তাও ভেজাল-মেশানো। গোমাংস খুব সস্তা। অতএব গোমাংস খাদ্য হিসাবে পুনরায় ব্যবহার করা উচিত।

সভা। চতুর্থ বক্তা dietetics অর্থাৎ খাদ্যতত্ত্বে গোমাংসের স্থান নির্ণয় করবেন।

৪র্থ বক্তা। খাদ্যতত্ত্বে গোমাংসের স্থান অতি উচ্চে (হিয়ার হিয়ার)। খাদ্যের ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই (হিয়ার হিয়ার)। জৈব-রাসায়নিক উপাদানরূপেই খাদ্যকে বিশ্লেষণ ও খাদ্যের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ কর্ত্তব্য। জান্তব প্রোটিন থেকে আমাদের দেশের লোকেরা বহুলাংশে বঞ্চিত। যে পরিমাণ প্রোটিন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অপরিহার্য্য তা নিরামিষ বা নিরামিষ-প্রধান খাদ্য থেকে লাভ করতে হ'লে যে পরিমাণ খাদ্য খেতে হবে, তাতে অজীর্ণ ও স্বাস্থ্যভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। অথচ নিয়মিতভাবে অল্প-পরিমাণ গোমাংস খেলে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দুইই লাভ হবে। (হাততালির মধ্যে উপবেশন।)

সভা। পঞ্চম বক্তা রাজনৈতিক।

৫ম। আমি রাজনৈতিকও নই, বক্তাও নই।

জনৈক শ্রোতা। এই তো বেশ বলতে পারেন দেখছি।

৫ম বক্তা। জনৈক শ্রোতা আমাকে বক্তা ব'লে সম্মানিত করতে চান—

শ্রোতা। আপনি যে রাজনৈতিক, তাও প্রমাণ হ'ল।

৫ম বক্তা। তিনি আমাকে রাজনৈতিকের সম্মান দিতেও কুণ্ঠিত নন দেখতে পাচ্ছি। তবু আমি কিন্তু গরু সম্বন্ধে রাজনৈতিক আলোচনাই করতে চাই। রাজনীতি বড়ই ভয়ঙ্কর জিনিস।

রাজনীতি কথাটা শুনলেই কারও মাথা ঝিমঝিম করে, কারও বা নাসা কুঞ্চিত হয়; কিন্তু আমাদের রসনা ও বাক্‌যন্ত্র যুগপৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। রাজনীতি মানে—

শ্রো। আপনি রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন, না গরু সম্বন্ধে?

বক্তা। দুটোর সম্বন্ধেই (হিয়ার হিয়ার)।

শ্রো। পৃথকভাবে, না একসঙ্গে?

বক্তা। একসঙ্গে। রাজনীতির ভারতীয় অর্থ হিন্দু ও মুসলমান; পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান; গরু-খাওয়া ও গরু-না-খাওয়া (হিয়ার হিয়ার)। ভারতে গো-খাদকের সংখ্যালঘু; তাই সংখ্যাধিকেরা গোমাংস-ভক্ষণ পাপ ব'লে প্রচার করে (শেম শেম)। কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন, ভারতে না হ'লেও সমস্ত পৃথিবীতে, গো-খাদকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আপনারা আরও জানেন, বর্ত্তমান রাজনীতি আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি। রাজনীতির সংকীর্ণ জাতীয় ভিত্তি ধ'সে পড়েছে। আজ আন্তর্জ্জাতিকতার দিনে সংখ্যাগরিষ্ঠ গোখাদকের জয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব আসুন, নিখিল-ভারত-গোখাদক-মহাসভার সভ্য-পদ অলঙ্কৃত করুন।

আমার বন্ধু ঐতিহাসিক বক্তা বলেছেন, গরুই হিন্দু-মুসলমানের ভেদ ও বিরোধের জীবন্ত প্রতীক। তাকে হত্যা ক'রে তার মাংস খেতে আরম্ভ করুন; দেখবেন, হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অবসান ঘটেছে; ভারতব্যাপী সুদৃঢ় ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (হাততালির মধ্যে উপবেশন।)

সভা। আমি এইবার সনাতনী-সভার সেক্রেটারি মহাশয়কে বক্তৃতা দেবার জন্য সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।

মহান জয়ধ্বনির মধ্যে সেক্রেটারি মহোদয় মঞ্চারোহণ করিয়া মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াইলেন।

সেক্রে। মাননীয় সভাপতি ও ভ্রাতা-ভগিনীগণ, (সুদীর্ঘ হাততালি) —কতকগুলি হিংস্র, অকালকুষ্মাণ্ড, (হিয়ার হিয়ার) দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, বিজাতীয় ভাবধারায়, অনুপ্রাণিত, হিন্দুকুল-কলঙ্ক, বিকৃতমনা, আত্মম্ভরী, পণ্ডিতম্মণ্য, ম্লেচ্ছাচারী, মদ্যপায়ী, মাংসভোজী, বারবনিতা-সেবী, (হিয়ার হিয়ার), আকাটমূর্খ, অবিদ্যা-বিজ্ঞান-সেবক, নাস্তিক, ভাক্তজ্ঞানী, ভারতীয়-বৈশিষ্ট্য-বিরোধী, অধার্ম্মিক, স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্নীতিপরায়ণ, বস্তুবাদী, আর্য্য-সংস্কৃতি-সরোবরের হিপোপটেমাস, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-উপবনের মদহস্তী, সনাতন-আচার-উদ্যানের ছাগপাল, হিন্দু-জাতীয়-সমাজের সারমেয়, জাতীয়-ঐতিহ্য-আঁস্তাকুড়ের শূকরপাল, সনাতন-ধর্ম্ম-ভাগাড়ের গৃধ্রযূথ, ভারত-জননীর গর্ভস্রাব আপনাদিগকে গোমাংস-ভক্ষণে প্ররোচিত করিতেছেন (শেম শেম); আপনারা কি তাহাদিগের বাক্যে প্রলুব্ধ ও বিপ্রলব্ধ হইয়া জাতি কুল শীল, নীতি রুচি, ঐতিহ্য সংস্কার সংস্কৃতি, মান মর্য্যাদা বৈশিষ্ট্য, সত্য ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া দেউলিয়া হইবেন ? (নেভার নেভার)। আপনাদের দৃঢ়-সংকল্পের অভিব্যক্তিতে আশ্বস্ত হইলাম। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

মঞ্চাবতরণ করিয়া নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সভাপতির গাত্রোত্থান।

সভা। বন্ধুগণ, আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে বরণ ক'রে সম্মানিত এবং নিজেদের উপকৃত করেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তারা বিষয়টার সমস্ত দিকেই আলোক-সম্পাত করেছেন। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, গোমাংস না খাওয়াটা একটা সংস্কার মাত্র। প্রত্যেক জিনিসের যেমন একটা ভাল দিক আছে, তেমনই একটা খারাপ দিকও আছে। গোমাংস-ভক্ষণের খারাপ দিকটাও আছে। কিন্তু বন্ধুবর সনাতনবাবু গোমাংস-ভক্ষণের বিপক্ষে যে

সব যুক্তি দিলেন, তাদের সমষ্টি সপক্ষের যুক্তিগুলোর একটির চাইতেও গুরুতর নয়। এমন কি বিরুদ্ধ-যুক্তিগুলো নিজেদের গুরুত্বের জোরে সমর্থক-যুক্তিগুলোকে খণ্ডিত করা দূরে থাকুক, বিরুদ্ধ-যুক্তিদাতার অন্তর্নিহিত সংস্কারগত বিরূপতাকেই সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছে।

আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে বড় বড় সমস্যাগুলো কি? দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা। এগুলো ব্যাপকভাবে দূর করতে হ'লে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদীর তথাকথিত স্বাধীনতা নয়। বিশ্ব-নাগরিকের স্বাধীনতা। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন নিজেদের মানুষ ব'লে ভাবতে শেখা; আর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করতে গিয়ে বিজ্ঞানের শরণ নেওয়া।

আজকের দিনে যাঁরা বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজতত্ত্বের অনুশীলন করেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন, হিন্দুর মুসলমান-বিদ্বেষ মূলত গোমাংস-বিদ্বেষ। আর গোমাংস-বিদ্বেষটাকে কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তাই আমার অনুরোধ, আপনারা সবাই নিয়মিত গোমাংস ভক্ষণ করবেন।

এইবার একটি প্রস্তাব পাঠ ক'রে ভোটে দেওয়া হবে।

প্রস্তাব-পাঠক। "এই সভা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গোমাংস-ভক্ষণ সমর্থন করিতেছে।" প্রস্তাবটি যাঁরা সমর্থন করেন না, তাঁরা হল ছেড়ে বাইরে যান। যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁরা ভিতরেই অবস্থান করুন।

হল খালি হইয়া গেল। শুধু মঞ্চোপরি সভাপতি, বক্তা ও উদ্যোক্তৃগণ রহিয়া গেলেন।

বটুক সান্যাল

অনুচ্চারিত

এস্‌প্ল্যানেডের স্টপে থেমে গেল ডবল-ডেকার—
নব-অনুরাগবতী পাশে ব'সে ছিলে একাসনে ;
সম্মুখ-যুবার চোখে নগ্ন-ক্ষুধা রমণী দেখার,
তোমার জ্বলন্ত ঘৃণা ফুটিয়াছে কটাক্ষ-শাসনে।

বাঁ দিকে গড়ের মাঠ, ডান দিকে চৌরঙ্গির ভিড়—
তার মাঝে তুমি আমি পাশাপাশি ব'সে মৌনমুখ ;
মন কি আকাশে ওড়ে ? অথবা সে গড়ে স্বপ্ননীড়
ফোটে কি হৃদয়-পদ্ম ? কেন তবে কণ্ঠ থাকে মুক

ভিক্ষাপাত্র তুলে ধ'রে ভিক্ষা চায় ভিখারী-বালিকা,
'একটি আধলা দে মা' ;—অঙ্গে তার মূর্ত্ত অনশন,
ধনীর লাঞ্ছনা দিয়ে রচা তার ম্লান দৃষ্টিশিখা,
বঞ্চনার গূঢ় ফণা কণ্ঠে তার করিছে দংশন।

'মায়ের' না হেরি দয়া ফিরাল সে মোর পানে চোখ,
কহিল করুণ কণ্ঠে, 'দে না বাবা !'—দুটি মাত্র কথা ;
কিন্তু এ কি বলিল সে ? মিলনের এ কি নবশ্লোক !
—দুটি সম্বোধন দিয়ে উচ্চারিল ভবিষ্য-বারতা !

অকস্মাৎ কি যে হ'ল, নতমুখে হাতব্যাগ খুলি
পশ্চাতে ফেলিলে ছুঁড়ে ভিক্ষাপাত্রে একটি আধুলি।

জগদীশ ভট্টাচার্য্য

শিল্প ও তাহার ক্রমবিবর্ত্তন

আচার্য্য অক্ষয়কুমারের মুখে একবার ছোট্ট একটা কথা শুনেছিলাম, "শিল্ সমাধৌ"। শিল্প কথাটার মধ্যে যে এত গভীর একটা অর্থ নিহিত আছে, তা পূর্ব্বে ভাবি নি। মানুষের জীবনের সব কাজের মধ্যেই তো শিল্পের ছড়াছড়ি, গ্রামের বাগদীদের হাতের ডালা কুলো তৈরি থেকে তাজমহল নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত সবই তো শিল্প, তাতে আবার 'সমাধি'র প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? তবে এটা বেশ বোঝা যায় যে, তাজমহল তৈরিটাকে সাধনা ও সমাধির পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে, কারণ অমন একটা অতুলনীয় জিনিস নির্ম্মাণ করতে শিল্পীর একাগ্র ধ্যান ও তপস্যা না থাকলে একটা বাড়ি হতে পারে, কিন্তু সেটা 'তাজমহল' হয় না। পরে তিনি আসল ব্যাপারটি এই ভাবে বুঝিয়ে দেন যে, মানুষের সাধনা ও চিন্তার সমাধি থেকেই শিল্প বা আর্টের জন্ম হয়, পরে কার্য্যক্ষেত্রে সেটা দুটো পৃথক ধারায় চ'লে গিয়েছে, একটির নাম 'কলা' আর অন্যটির নাম 'কারু', যাকে আমরা ইংরেজীতে বলি ফাইন আর্ট এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল আর্ট। বাগদীর হাতের ডালা কুলো থেকে ফোর্ডের কারখানার গাড়ি নির্ম্মাণ, বা মাস-প্রোডাক্‌শন হিসাবে তৈরি ফাউণ্টেন পেন পর্য্যন্ত সবই হচ্ছে ওই কারুশিল্পের পর্য্যায়ের জিনিস। যদিও এসব তৈরি করতে মানুষের মাথার বেশ একটু বুদ্ধি বা ইমাজিনেশন থাকা চাই। তারপর সেগুলো গতানুগতিকভাবে কলের মধ্যে থেকে হাজারে হাজারে বেরুতে আরম্ভ করে। তখন সেগুলো কারুশিল্প থেকে জন্মানো মাল অর্থাৎ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট হয়ে দাঁড়ায়।

ফাইন আর্ট বা কলাশিল্প জিনিসটারও ওই চিন্তার সমাধি থেকেই উৎপত্তি, কিন্তু ওর শেষ হচ্ছে ওই সমাধিতেই। এখানেই এ দুইয়ের তফাত। কারুশিল্পের জন্ম হয়েছে মানুষের সমাধি ও সাধনা থেকে, কিন্তু সেটা ঠেকেছে গিয়ে ম্যানুফ্যাক্চারেতে। কাজেই সেটাকে একবার চালু করতে পারলে, তা জলের মত সহজ হয়ে যায় ও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করে। কলাশিল্প জিনিসটা কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যান্ত আদিম ও অকৃত্রিম। এর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন সম্পর্ক নেই।

এর পরই প্রশ্ন ওঠে যে, শিল্পের বা আর্টের যদি এই অর্থ হয়, তবে সবচেয়ে উচ্চস্তরের শিল্প কোন্‌টি। এখানে একটা কথা ব'লে রাখা দরকার, আমি এখানে শিল্পের কি উদ্দেশ্য সে প্রশ্নের দিকে যাচ্ছি না, কারণ Art for Art's sake, না Art for Life's sake, কোন্‌টা যে মূল সত্য সেটা কেউ সমাধান করতে পারে না। কারণ এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। সাধারণত শিল্প বলতে আমরা তিন-চার রকমের বিষয় ধ'রে থাকি। ইংরেজীতে এগুলোকে Three Arts অথবা Four Arts ব'লে একটি সমষ্টি ক'রে বোঝবার চেষ্টা করা হয়। এরা হচ্ছে, ১। কাব্য ও সাহিত্য, ২। চিত্র, ৩। ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য, ৪। সঙ্গীত ও নৃত্য। এর মধ্যে যিনি যেটার জন্যে তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তিনিই তাকে বড় বলবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে মূল প্রশ্নের কোন সমাধান হয় না। আর বাস্তবিকই তো, সকলের মনেই এই তুলনামূলক প্রশ্ন ওঠে যে, তাজমহলকেই বেশি সুন্দর বলব, না কালিদাসের বা রবি ঠাকুরের কাব্যকে, না উদয়শঙ্করের নৃত্যকে? কি বেশি সুন্দর? এভাবে বিষয়টিকে ভাবতে গেলে কিন্তু কোন সুরাহাই হয় না। আমাদের তাই মূল প্রশ্নে প্রবেশ করা

উচিত, অর্থাৎ যে জন্যে এই বিষয়গুলির সাধনা ও ধ্যান, যাকে আমরা বলি "ভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতা", সেই শক্তি এদের কোন্‌টির মধ্যে সবচাইতে বেশি রয়েছে? এ কথা সত্যি যে, তাজমহল দেখলে বা পার্ক স্ট্রীটের মুখে উটরামের অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি দেখলে অথবা উদয়শঙ্করের ইন্দ্রনৃত্য উপভোগ করলে বা কোন রাগবিশেষের মূর্চ্ছনা শ্রবণ করলে আমাদের মনে যে একটা অজানা বা অজ্ঞাত ভাবের উদয় হয়, কালিদাসের মেঘদূত কাব্য পাঠ করলে মনের ভাবটা তার চাইতে আরও অনেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখনই আমরা বুঝতে পারি যে, ভাব প্রকাশ করবার শক্তি সবচাইতে বেশি রয়েছে সাহিত্যে, তারপর চিত্রে, তারপর ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে, সঙ্গীত ও নৃত্যে। কথাটাকে আরও তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওপরের আলোচনা থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভাবপ্রকাশের জন্যে যার যত কম মালমসলা বা উপাদনের দরকার, সেই হচ্ছে তত উচ্চাঙ্গের কলা। এই হিসাবে প্রথমেই চোখে পড়ে, সর্ব্বোচ্চ কলা হয়েছে সাহিত্য, কারণ তাতে ভাবপ্রকাশের মালমসলা বা vehicle হচ্ছে অতি সামান্য জিনিস, কতকগুলো সমষ্টিগত বাক্য, যাকে আমরা বলি ভাষা। এই ভাষাতে যদি তেমন ভাবপ্রকাশের শক্তি থাকে, তবে তা দিয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প পর্য্যন্ত গ'ড়ে তোলা যায়; এই শিল্পের সর্ব্বোচ্চ প্রকাশ হয়েছে আমাদের দেশে উপনিষদে, দর্শনে আর সাহিত্যে, কারণ এই ভাবকে খেলাবার জন্যে আমাদের তখন যে শক্তিমান উপাদান বা মসলা ছিল, সেটা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা। এখনকার আমলে আমাদের যুগেও সেই রকম আর একটা উপাদান আমরা ভাগ্যক্রমে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বহু চেষ্টায় ও সাধনার ফলে পেয়েছি—বাংলা ভাষা—যে মসলায় তৈরি শিল্প এখনও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির পাশে দাঁড়াবার স্পর্দ্ধা রাখে।

সাহিত্যের পরই স্থান হচ্ছে এই হিসাবে চিত্রের। এখানে ভাবপ্রকাশের মালমসলা সাহিত্য থেকে অনেক বেশি সীমাবদ্ধ, কারণ এর জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে কাগজ, ক্যানভাস বা কোন একটা পরিষ্কার দেওয়াল বা plane surface, আর তার ওপর রেখাপাত করার তুলি বা পেনসিল ও কালি বা রং ইত্যাদি। এ থেকেই দেখতে পাওয়া যাবে, চিত্রশিল্পে ছবি আঁকবার আড়ম্বর যত কম হবে, ছবিকে ভাবপ্রকাশে তত কম বাধা দেওয়া হবে। আর যতই রং, shade বা ছায়া, তুলি, পেনসিল, কালির উৎপাত বাড়বে, ছবির ভাব ততই বাধা পাবে। কথাটা হঠাৎ শুনলে কিন্তু আমাদের অস্বাভাবিকই মনে হবে, কারণ সাধারণে বলবে, যেখানে রঙের খেলা নেই, সে আবার কোন্ নিরামিষ চিত্র? আসলে কিন্তু সেটাই তত উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি, কারণ চিত্রটি কোন জায়গায় এই সমস্ত আনুষঙ্গিক রং ইত্যাদির আড়ম্বরে তার ভাবপ্রকাশে অযথা বাধাগ্রস্ত হয় নি। এইজন্যেই আমাদের দেশে চিত্র জিনিসটা লাইনেই র'য়ে গিয়েছিল। রং ছিল বটে, তবে সেটা ছিল গৌণ। Shade বা ছায়া, অথবা দূরত্ব স্থূলত্বের পরিমাপ—যাকে বলে perspective—এসব জিনিস ভারতবর্ষ কখনও মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নি। সেইজন্যে আমাদের দেশে মডেলের সাহায্যে ছবি আঁকা কোন কালে ছিল না। আর সত্যিই তো, বাস্তবকেই যদি নকল করব, তবে তাকে পার হয়ে ভাবের রাজ্যে কল্পলোক সৃষ্টি হবে কেমন ক'রে? আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এই মূল সত্যটি আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থে পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তার প্রথম সন্ধান দেন আচার্য্য অক্ষয়কুমার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরমের এই শ্লোকটিতে—

রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যাঃ বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়োভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ॥

তবেই বোঝা যাচ্ছে, যে শিল্পে আড়ম্বর যত কম, সে শিল্প তত উচ্চস্তরের। সেইজন্যেই ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত ও নৃত্য এগুলির ভাবপ্রকাশের উপাদানগুলি এত কঠোর যে, তা থেকে উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি খুব শক্তিমান ছাড়া সম্ভব হয় না। এক টুকুরো নীরস পাথরে বা ধাতুতে প্রাণ সঞ্চার ক'রে কাব্য সৃষ্টি করা যে কত তপস্যার ফলে হয়, তা যাঁরা এ জিনিসে হাত দিয়েছেন তাঁরাই জানেন। আর সেইজন্যেই সাধারণ সাহিত্যিকদের চেয়ে এঁদের অনেক বেশি পরিশ্রম করতে দেখা যায়। চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য, এমন কি সঙ্গীত ও নৃত্য-শিল্পীদের এজন্যে জমি তৈরি বা spadework করতে হয় অনেক বেশি। তাতে জিনিসগুলো প্রথম ভিত্তিভূমি পায়। তার ওপর ভাবপ্রকাশের শক্তি প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রতিভার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু তার জন্যে চাই সাধনা ও কঠোর তপস্যা। জার্ম্মানদের মধ্যে একটা কথা আছে—Genius is the infinite power of taking pains; আর ওই একই সুরে টমাস এডিসনও ব'লে গেছেন, Genius means 99 p. c. perspiration and 1 p.c. inspiration; তবে সেই শতকরা এক ভাগও তার থাকা চাই, নইলে প্রতিভার জন্ম হয় না। ওই যে আমাদের দেশেই গল্প আছে, সা-রে-গা-মা শিখবে প্রথম দশ বছর। তারপর রাগিণীর কাঠামোগুলি শিখবে দ্বিতীয় দশ বছর, তারপর রাগিণীর খেলা ও 'কর্ত্তব' আরও দশ বছর। এই রকম করতে করতে যখন সঙ্গীতে দিগ্‌গজ হওয়া গেল, তখন দেখি যে, বুড়ো হয়ে গিয়েছি, আর শিখেছি যা, তা শুধু কাঠামোটাই। ওর যে মূল প্রাণটা কোথায়, শেষ পর্য্যন্ত সেটারই কোন হদিস পাওয়া গেল না। সংস্কৃত সাহিত্যে অলঙ্কার ও ব্যাকরণ শিখে কালিদাস হওয়ার আশা, এ রকমও অনেক গল্প আমাদের দেশে আছে। এ যেন অনেকটা Graph paper-এ কাঁটা কম্পাস দিয়ে ছবি আঁকা। সবই হ'ল, কিন্তু ছবি আর দাঁড়াল না।

এই সব ব্যাপার থেকে আজকাল একটা নতুন বিষয় নিয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী জোর আন্দোলন চলেছে—'সিনেমা শিল্প কি না'। বস্তুত, সিনেমা মুখ্যত কারুশিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে, আর অত খরচ ক'রে ব্যবসা হিসাবেই যদি এর ছবি বাজারে না চলে, তবে ও ছাইপাঁশ চারুকলার

সৃষ্টি ক'রে কি হবে? সে যাই হোক, একটা জিনিস সকলেই দেখতে পাবেন যে, সিনেমা-ছবিতে শিল্পসৃষ্টির উপাদানের আর শেষ নেই ;— প্রযোজক, সম্পাদক, আলোছায়া-শিল্পী, সিনেমা-তারকা, রসায়নাগার এবং ছোটখাটো আরও কত কিছু। এ তো গেল নির্ব্বাক ছবির আমলের কথা। সবাকচিত্রে আবার তার ঘাড়ে চেপেছে এসে আবহ-সঙ্গীত, Dialogue, monologue এবং শব্দ-সংক্রান্ত আরও অবান্তর খুঁটিনাটি অনেক কিছু। বলা বাহুল্য, এইজন্যেই সিনেমা-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী, চার্লস্ স্পেন্সার চ্যাপ্‌লিন সবাকচিত্রের এত বিরোধী ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, সবাকচিত্র হচ্ছে for ইতরে জনাঃ, অর্থাৎ এ হচ্ছে তাদের জন্যে, যাদের চিন্তাশক্তি বা Imagination কম। অবশ্য কালধর্ম্মের ঢেউয়ে প'ড়ে তিনি নিজেই শেষে সবাকে যোগ দিয়েছেন, কিন্তু তা হ'লেও দর্শকেরা যদি তাঁর শেষ ছবি-গুলিকে নজর দিয়ে দেখে থাকেন, তবে তাঁরা দেখেছেন যে, যেখানেই তাঁর কথা বলবার প্রয়োজন হয়েছে, সেখানেই তিনি বাজে শব্দ উচ্চারণ বা আবোল-তাবোল gibberish ব'লে শব্দ জিনিসটাকে ব্যঙ্গ ক'রেই গেছেন। সত্যিই তো, অত বেশি কথা বললে চিন্তা ও সাধনা দুইই যে বাধা পায়! এ থেকেই বোঝা যায়, সিনেমাতে রূপ ও রস-সৃষ্টি করতে কত মালমসলার দরকার। আর সবচেয়ে মজা এই যে, এর প্রায় সবগুলোই শিল্পসৃষ্টির কাঁচা মাল বা raw material-এর অন্তর্গত। এদের প'ড়ে-পিটে ঠিকঠাক ক'রে তবে শিল্পসৃষ্টি হবে। ইউনির্ভার্সাল চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠাতা Carl Lammle একবার এক বিশ্ববিখ্যাত মনীষীকে তাঁর স্টুডিও দেখাতে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর সকল unit ও কাঠের বাড়ি-ঘর ও অন্যান্য সাজসজ্জা দেখিয়ে সেখানকার নামকরা পুরুষ ও স্ত্রী সিনেমা-তারকাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে শেষে হঠাৎ তাঁর ক্যামেরার লেন্সের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে মনীষীকে ডেকে বললেন—"Look, that's my artist! All the rest are my raw materials!" বস্তুত সিনেমাশিল্পে এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই।

এবার শিল্প জিনিসটা এই বিংশ শতাব্দীর জগতের পাল্লায় প'ড়ে যে

কোথায় এসে ঠেকেছে, সে বিষয়ে সামান্য কিছু ব'লে এই প্রবন্ধ শেষ করব। বলা বাহুল্য, এটা হ'ল কাজের ও বেগের যুগ। Speed, speed, more speed! গরুর গাড়ি থেকে ঘোড়া, ঘোড়া থেকে মোটর, মোটর থেকে এরোপ্লেন, এখন আবার stratosphere দিয়ে প্লেন চালাবার চেষ্টা চলছে যাতে দশ মিনিটে পৃথিবীটাকে ঘুরে আসা যেতে পারে। যুদ্ধেও সেই blitzkrieg-পদ্ধতি। প্রত্যেক কাজে record break করার সংবাদ। আজ যেটা record, কাল সেটা out of date বা পুরনো। অমুক সিনেমায় একটা ছবি ছ মাস চলেছে, তার পরই খোঁজ পাওয়া গেল, আর একটা শো-হাউসে আর একটা ছবি চলেছে বা চালানো হয়েছে দেড় বছর। এই যখন দুনিয়ার হালচাল, তখন এই আবহাওয়ায় কি আর ধৈর্য্য ধ'রে কলাশিল্প চলতে পারে? কলাশিল্পীরা হয়ে দাঁড়িয়েছেন কারুশিল্পী। Fine Art হয়েছে Commercial Art। আজকাল Fine Art Exhibition থেকে Commercial Art Exhibition-এর কদর বেশি, কেন না তাতে শিল্পীর পয়সা আসবে বেশি। চুলোয় যাক Fine Art, চুলোয় যাক তার মাহাত্ম্য। আজ যে ছবি দেখে লোকে ধন্য ধন্য করবে, কাল তার ছাপানো ছবির কাগজটা দিয়েই লোকে তাদের পুরনো জুতো মুড়ে রাখবে। এটা হচ্ছে Calender-এর ছবির যুগ। এমন কি আজকাল ভাল ভাল ভদ্রলোকের ঘরে গিয়েও বাঁধানো Calender-এর ছবি ছাড়া মূল কোন ছবি চোখে পড়ে না। কারণ ওটার এক বছর পরই নতুন আর একটা ছবি পাওয়া যাবে। এখানেও সেই নূতনত্বের মোহ, সেই mass praduction-এর হিড়িক। Speed, আরও Speed।

এই হ'ল যখন সারা দুনিয়ার চাহিদা, তখন সে চাহিদা মেটানোর পদ্ধতিও তদ্রূপ; তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। আর ভাল মন্দই আবার কি? যে ছবি আজ দেখা গেল বা যে গান আজ শোনা গেল, সেটা তো কালই পুরনো। কাজেই যা দেবে তা দাও নতুন, সেটা একটা অতুলনীয় সুষমামণ্ডিত রূপসৃষ্টিই হোক, না হয় একটা কিম্ভূতকিমাকার Frankenstien বা Kingkong জাতীয় আজগুবি কিছু হোক। তবু তো সেটা নতুন। সেটা তো original। পুরবী রাগিণী তো

out of date। দুর্গা রাগ? হ্যাঁ, সেটা কিছু নতুন বটে। এই নূতনত্বের ঠেলায় ব্যবসাদারেরা নিজেরাই এখন আর্টের পরিবেশন করতে শুরু করেছেন, তাঁদের সবাকছবি ও তার নতুন সুরওয়ালা সঙ্গীত দিয়ে। সেটাতে যে মধ্য-আমেরিকার সুম্ব বা কাফ্রী-নৃত্যের তালের রেশ আছে, তাতে কি এসে যায়? আজ তো সেটা নতুন। কাল না হয় সেটাকে কেউ শুনবেও না। আজকালকার হুজুগই হচ্ছে—ভাঙো আর গড়ো, নতুন কিছু কর। জাহাজ বা মেট্রো প্যাটার্নের বাড়ি কর, কারণ লোকে সেটাকে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় হাঁ ক'রে দেখবে আর গাড়ি-চাপা পড়বে। কিন্তু দশ বছর পর সেটা যে কি কুৎসিত হয়ে দাঁড়াবে তা কেউ ভাবে না, আর ততদিনে তার পাশে হয়তো আর একটা এরোপ্লেন প্যাটার্নের সিনেমা-হল তৈরি হয়েছে।

এই হ'ল যুগধর্ম্ম। প্রথমত মানুষকে বাঁচতে হবে, আর আজকাল বাঁচতে হ'লেই এগিয়ে চলতে হবে। বেগে চলতে গেলেই মানুষের মাঝে মাঝে বিশ্রামের প্রয়োজন। সেই বিশ্রামের জন্যেই আজকালকার এই ধরনের শিল্পের সৃষ্টি। এই শিল্প মানুষের শিক্ষার জন্যে নয়, এ হচ্ছে তার শ্রম অপনোদনের জন্যে; যে শিল্পে মানুষকে শিক্ষা দিতে পারে না, তার চিন্তা-শক্তিকে সাহায্য করতে পারে না, সে শিল্পে মানুষের অপকারই হয় বেশি। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেশে চিন্তাশীলদের মনে প্রায় সবখানেই একটা গভীর নৈরাশ্য—জনসাধারণ ক্রমে ক্রমে নীচুস্তরে নেমে যাচ্ছে। তাদের উচ্চস্তরের বিষয় উপভোগ করার শক্তি নেই। কিন্তু এই অধোগতি ঠেকাবার শক্তিও কারুর নেই; কারণ এটা হচ্ছে যুগধর্ম্ম। বোমার আঘাতে বা Blitzkrieg-এর বন্যায় পৃথিবীর সবই ওলটপালট হতে চলেছে। এর ফলে কি পৃথিবীর এই অস্বাভাবিক বেগের বন্যা রোধ হয়ে স্বাভাবিক হবে? জনসাধারণের উচ্চচিন্তাশক্তি কি আবার ফিরে আসবে? ভবিষ্যতের ইতিহাস এর উত্তর দেবে।

"পিসিয়েল"

রাজশাহী আ্যাঙ্কে ক্লাবের নবম অধিবেশনের সাহিত্য-বাসরে পঠিত।

ছাত্র

কাঠফাটা রোদ, চতুর্দ্দিকে অগ্নি-বর্ষণ করিতেছে। আমার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার সমস্যা দেড় শত অঙ্ক এবং এক শত পৃষ্ঠা হাতের লেখা। গ্রীষ্মাবকাশের হোম-টাস্ক। থার্ড মাস্টারের রুদ্রমূর্ত্তি, রুদ্রতর ভাষণ এবং রুদ্রতম বেত্রাঘাতের কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিবার অবসর নাই। আমি তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র বলিয়া আরও বেশি ভাবনা। সুতরাং নিদারুণ গ্রীষ্মকে উপেক্ষা করিয়া গৌরীশঙ্কর খুলিয়া বসিয়া আছি। হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া থার্ড মাস্টারই প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম, একটু ভয়ও হইল। শুষ্ক মুখ, মাথার রুক্ষ চুলগুলা খাড়া হইয়া আছে, কোটরগত চক্ষু দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত রক্তবর্ণ। ভাবিলাম, কুঁজো হইয়া বসিয়াছি বলিয়া হয়-তো ধমক দিবেন। তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিলাম। কিন্তু সেসব কিছু না করিয়া তিনি অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারিস বাবা।

ঘরের কোণে কুঁজায় জল ছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক গ্লাস আনিয়া দিলাম। ঢক ঢক করিয়া নিমেষে তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

আর এক গ্লাস।

দিলাম।

তাহাও নিমেষে শেষ হইয়া গেল।

আর এক গ্লাস চাই। আঃ, বাঁচালি বাবা, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পাবার উপায় নেই কোথাও—। ঘুম ভাঙিয়া গেল।

স্বপ্ন।

২

বাস্তব কিন্তু আরও নিদারুণ।

পরদিন প্রখর রৌদ্র ও গেঁটে বাতকে উপেক্ষা করিয়া প্রৌঢ় আমি উত্তপ্ত বালির চড়া ভাঙিয়া তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গঙ্গা অভিমুখে চলিয়াছি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্কুলে যে থার্ড মাস্টারের নিকট পড়িয়াছিলাম, যিনি আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছেন—কাল সহসা তাঁহাকে স্বপ্ন দেখিয়া আমি—আপনারা যাহা বলিবেন তাহা আমি জানি, ফ্রয়েড চার্ব্বাক আমিও পড়িয়াছি—নিজের অযৌক্তিক আচরণে নিজেই বিস্মিত হইতেছি, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই—ঘাড়ে ধরিয়া কে যেন আমাকে লইয়া যাইতেছে।

তর্পণ আমাকে করিতেই হইবে।

"বনফুল"

লিমারিক

বেথুনের মিস্ বোস "হার্ডল্স" দৌড়ায়,
কলেজের স্পোর্টসেতে, সভাপতি ইউ. রায়।
এ দিক ও দিক দেখে,
ডান পাটি গেল ঠেকে;
প'ড়ে গিয়ে এইরূপ চিতপাত হ'ল হায় !!

একেরায়

সংবাদ-সাহিত্য

আমাদিগকে ধৈর্য্য ধরিতেই হইবে। ধরিবার মত যাহাদের হাতে আর কিছুই নাই, ধৈর্য্য ধারণ করিয়াই তাহাদিগকে বাঁচিতে হইবে। আমরা দীর্ঘকাল ধৈর্য্য ধরিয়া বাঁচিয়া আছি—আশা করিতেছি, আরও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিব। বীর্য্যের অভাব, শৌর্য্যের অভাব আমরা ধৈর্য্য দিয়া পূরণ করিব।

প্রাচীন কালে নিজেদের অসহায় অবস্থা কল্পনা করিয়া যাঁহারা প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার বলে এই ধৈর্য্য-পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমরা আজিও তাঁহাদিগকে ঋষিজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকি। ঋষিগণ শাস্ত্র রচনা করিয়া এই বিশেষ পন্থার নাম দিয়াছিলেন—যোগ। যোগই আমাদের অবলম্বনীয়। বর্ত্তমান কালের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ অনেক বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীকে এই যোগ শিক্ষা দিয়া নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন। তিনি স্বয়ং লোকচক্ষুর অন্তরালে ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া আছেন, আমরাও ধৈর্য্য ধরিয়া প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে একদিন তাঁহার অকস্মাৎ আবির্ভাব-আশায় উন্মুখ হইয়া আছি। মহাত্মা গান্ধী বিশেষভাবে এই যোগে যোগী; তাঁহার ধৈর্য্যধারণ-পদ্ধতির বিশেষ নাম—অসহ-যোগ। কাহার পক্ষে অসহ, অবশ্য এখন পর্য্যন্ত তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে ভাবে বোধ হইতেছে, এইবার এই অসহ-যোগের চরম পরীক্ষা আসিতেছে। আগামী ৭ আগষ্ট বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন বসিবে, তাহাতে ওয়ার্দ্ধা-প্রস্তাব গৃহীত হইলে, আর কাহারও না হউক, মহাত্মা গান্ধীর ধৈর্য্যের পরিমাপ সম্ভব হইবে।

যোগী-ঋষিদের কথা বেশি জানি না, আমাদিগকে কিন্তু ধৈর্য্য ধরিতেই হইবে।

* * *

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সংস্পর্শে আসিয়া ইংলণ্ডের ইংরেজগণও এই যোগে বিশেষ পটু হইয়া উঠিয়াছেন। অন্য বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বে এবং অন্য সকল গুণ

নিঃশেষে খোয়াইয়াও শুধু এই ধৈর্য্যগুণে বলীয়ান যোগী ইংরেজরা এখনও ভারতবর্ষের মাটিতে সদম্ভে টিকিয়া আছেন এবং ধৈর্য্য অবিচলিত রাখিতে পারিলে হয়তো শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়াই যাইবেন। অপমান, লাঞ্ছনা ও মুহুর্মুহু ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যেই তাঁহাদের সুবিপুল ধৈর্য্যের নির্লজ্জ মহিমা সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময়োদ্রেক করিতেছে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মত ধনযোগী এবং কমরেড ষ্টালিনের মত কর্ম্মযোগী, ইংরেজের এই যোগ-প্রক্রিয়া দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেছেন—আমরা পরপদানত দরিদ্র ভারতবাসী, আমাদের বিস্ময় ও মোহের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

ভারতবর্ষের নিকট ধৈর্য্য-যোগ শিক্ষা করিয়া ইংরেজ তাহা মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশে প্রয়োগ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন, মনে হইতেছে ৭ আগষ্টের পর হইতে গুরু-শিষ্যে এই মাটিতে ধৈর্য্যের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। আগামী "অপসারণ অথবা অবস্থান"-যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা ধৈর্য্যধারণ করিবেন, তাঁহারাই জয়ী হইবেন। ইংরেজের অন্য বহু অস্ত্র আছে, তাঁহারা ধৈর্য্য হারাইয়া সেগুলি প্রয়োগ করিতেও পারেন। আমাদের আর কিছুই নাই, সুতরাং আমাদিগকে ধৈর্য্য ধরিয়াই থাকিতে হইবে।

* * *

আমরা তাহাই থাকিব। পলাশীর যুদ্ধারম্ভ তারিখ হইতে জালিয়ানওয়ালাবাগে যুদ্ধবিরতির তারিখ পর্য্যন্ত আমরা নিরবচ্ছিন্ন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ছিলাম, কিন্তু জ্ঞানত নহে। মধ্যে সিপাহীবিদ্রোহের নামে কিঞ্চিৎ অধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়া পুনরায় ধৈর্য্যের অতলগহ্বরে ডুব দিয়াছিলাম। বাংলা দেশেও কয়েকজন অধীর "ভদ্রলোগ" স্বদেশী আন্দোলনের নামে ১৯০৫-১০ খ্রীষ্টাব্দে পঙ্ক-গহ্বর হইতে বেশ খানিকটা ভুড়ভুড়ি কাটিয়াছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হোলিখেলার পর গুরু আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাস্পর্শে আমাদের জড়-ধৈর্য্য চেতন-ধৈর্য্যে পরিণত হইতে লাগিল। বিরোধ-যোগ অসহ-যোগ হইয়া উঠিল। গত চব্বিশ বৎসরের শিক্ষা ও সাধনায় আমাদের সজ্ঞান-ধৈর্য্যের পাঠও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এবারে আমরা জানিয়া শুনিয়া ধৈর্য্য ধরিব।

*

কারণ, ধৈর্য্য না ধরিলে আর আমাদের উপায় নাই। আমরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ছাপোষা লোক, তাঁহাদের তরফ হইতেই বলিতেছি। হাইড্রলিক প্রেসার-যন্ত্র দেখিয়াছেন? উপর হইতে খানিকটা আয়তন জুড়িয়া একটা প্রচণ্ড চাপ ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামিতেছে এবং নীচে হইতে সমপরিমাণ আয়তন জুড়িয়া অনুরূপ একটা চাপ ধীরে ধীরে ঠেলিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে। মাঝখানে আপনি বসিয়া আছেন, পলাইবার উপায় নাই। আপনি কি করিবেন? ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকুন, দেখিবেন শেষ পর্য্যন্ত চ্যাপ্টা গুঁড়া থেঁতো হইয়া গেলেও কষ্ট পাইবেন না। নিঃশব্দে নিরুপদ্রবে গুঁড়া হইতে পারাই ধৈর্য্য। ইহাই যোগ, অসহ-যোগ। এই যোগ ভালমত সাধন করিতে পারিলে গুঁড়া হইয়াও সুখ পাওয়া যায়। যদি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে সেই সুখ আমাদের ভাগ্যে নাচিতেছে। অতএব ধৈর্য্য ধরিব।

হাইড্রলিক প্রেসারের উপমা কেন দিলাম? আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির মূল্য হুহু করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে; যেগুলি একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া যাইতেছে, সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের নালিশ নাই। কাজের বেলায় দেখিতেছি, এই দুষ্প্রাপ্য অবস্থার সৃষ্টি হওয়াতে আমাদের উপকারই হইতেছে। যে সকল বস্তু না হইলে কিছুতেই চলিবে না ভাবিতাম, সেই সকল বস্তু না হইলেও যে বেশ চলে, এই শিক্ষা পাওয়া আমাদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই শিক্ষা বাইপ্রডাক্ট মাত্র। আসলে দেখিতেছি, আমাদের খরচ প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে, আমাদের আয় প্রতিদিন কমিতেছে। এই দুর্দ্দিনে নানা-জাতীয় ট্যাক্স আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া গবর্মেণ্ট স্বয়ং আমাদের পরিণাম সুগম করিয়া আনিতেছেন। উপরের এবং নীচের চাপে যাঁহারা স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছেন, তাঁহারা ভাগ্যবান। ইহার উপর বোমার ভয়, গোরাতঙ্ক, ইভ্যাকুয়েশনজনিত সর্ব্ববিধ অসুবিধা এবং ব্যয়; স্বামী-স্ত্রীর, সন্তান-পিতার বিচ্ছেদ, সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থার বিপর্য্যয়, ঔষধাদির অভাবে ভোগ ও মৃত্যু, চোর-ডাকাতের অত্যাচার বৃদ্ধি, অনিশ্চয়তাজনিত নিদারুণ অশান্তি

বৃদ্ধি—ভদ্রভাবে থাকিবার কোনও আইনসঙ্গত উপায়ই নাই। ভদ্রভাবে মরিবার জন্ম ধৈর্য্যের আবশ্যক। আমরা সেই ধৈর্য্যের কথাই বলিতেছি। আমাদিগকে ধৈর্য্য ধরিতেই হইবে।

ধৈর্য্য সম্পর্কে আরও কয়েকটি ভাল ভাল প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু সেগুলির উল্লেখ নিরাপদ নয়। সুতরাং ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম।

আগামী বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান। সেদিন সমগ্র জাতির মহাগুরুনিপাত-বৎসর সমাপ্ত হইয়া কালাশৌচ কাটিয়া যাইবে। খবর পাওয়া যাইতেছে, উক্ত দিবসে সমগ্র দেশব্যাপী সভাসমিতি-উৎসব-অনুষ্ঠান হইবে। ভাল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে চিরজাগ্রত রাখিবার জন্ম যে নিখিল-ভারতীয় আয়োজন চলিতেছিল, তাহার কি হইল? মনে হইতেছে, যুদ্ধের ধাক্কায় ইতিমধ্যেই উদ্যোক্তাদের উৎসাহে কিঞ্চিৎ ঢিলা পড়িয়াছে; যুদ্ধের চাপ সরাসরি ভারতবর্ষের বুকে আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই যদি স্মৃতিরক্ষার কাজ শেষ না করা হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেশের কাজ জনকয়েক নীরস গবেষকের হাতে গিয়া পড়িবে না তো? একটা কিছু খাড়া করিয়া যাইতে পারিলে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা অতীতের ধ্বংসস্তূপ ভেদ করিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার মত আশ্রয় সহজেই খুঁজিয়া পাইতেন। নিজেদের আলস্য ও গাফিলতির জন্ম তাঁহাদিগকে বিপন্ন করা কোনক্রমেই সঙ্গত হইতেছে না।

* * *

আর একটি কথা. রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের শেষ কয়েকটা মাস কি ভাবে কতখানি নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আমরা একটু অতিরিক্ত পরিমাণেই পাইতেছি। নিশ্বাসের মাপে মাপে যদিও অনেক ক্ষেত্রেই মিল হইতেছে না, তথাপি এই প্রসঙ্গে আমাদের যাহা জানিবার তাহা জানা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের জীবন তো রোগশয্যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনমাত্র নয়; তাঁহার সুস্থ সবল কর্ম্মব্যস্ত প্রাণচঞ্চল ভাববিহ্বল জীবনের

সুষ্ঠু পরিচয়ই কাব্যের দিক দিয়া অধিকতর মূল্যবান। সে জীবনী রচনা করিবার চেষ্টা তো এখন পর্য্যন্ত দেখিতেছি না। সকলেই "আমি"কে লইয়া ব্যস্ত আছেন। প্রার্থনা করিতেছি, আগামী বাইশে শ্রাবণ "আমি"র পালা শেষ হইয়া "তুমি"কে আসরে আসিবার অবকাশ দেওয়া হউক। বিশ্বভারতী বুদ্ধিবিবেচনাপূর্ব্বক একটু লাগাম কষিলেই এই পরিবর্ত্তন সহজসাধ্য হইবে।

—

রবীন্দ্রনাথের বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিন বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন হইতে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' (মাসিক) বাহির হইবে। রথীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের ভার যাঁহারা গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা সাধু ব্যক্তি এবং সমগ্র জাতির ধন্যবাদের পাত্র তাঁহারা।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এই পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সব ঘর-পোড়া গরুই যে সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পায় না, চৌধুরী মহাশয় তাহাই প্রমাণ করিলেন। 'সবুজপত্র', 'অলকা' ও 'রূপ ও রীতি'র অভিজ্ঞতাও তাঁহাকে কাবু করিতে পারে নাই ; বোধ হইতেছে, তাঁহার সাহস অটুট আছে।

—

ধৈর্য্যের কথা তো খুব ঘটা করিয়া লিখিলাম, কিন্তু আসলে ধৈর্য্যরক্ষা কি সহজ ? একটি "নূতন মনন ও সংস্কৃতিমূলক সাহিত্য পত্রিকা"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ "বেয়নেট ও লেখনী" পড়িতেছিলাম—

"দিনের পর দিন ধরে পৃথিবীময় যে অত্যুগ্র চাপা বিস্ফোরক ফোঁড়া পেকে-পেকে উঠে পৃথিবীর মানুষ-মানুষীদের অন্তরাত্মা শুষ্ক-কঠিন করে ফেলচে, তার অমানুষিক তুশ্চেষ্টা আজ স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে তর-তর করে ছড়িয়ে পড়েচে। ব্যক্তি-সমাজের প্রত্যেকটা কোণে এবং মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে নতুন-নতুন ফাঁটলের রেখা টেনে তার উত্তরোত্তর বাড়তির পথও পরিষ্কার করে দিতে সান্দ্র হয়ে পড়েচে এই বোবা দুর্বোধ পরিস্থিতি।...

"বাস্তবিকই, মানুষের চরিত্রের প্রাতিভাসিক ছায়াভাসের রূপারূপ কতোই-না

বৈচিত্র্যময় আর রহস্যময় হয়ে প্রকাশ পেতে পারে। এই যুদ্ধের জুজুতে আমাদের সকল ইচ্ছে শক্তিকে কতো-যে নতুন এবং ধূসর আলেয়ার প্রলেপের ধোঁকায় ওঠ-বোস করাচ্ছে, তার বিশদ ও শবল পর্যালোচনায় পরম অনুসন্ধিৎসু রসবেত্তার মগজ আর লেখনী সত্যিই তড়িৎশক্তি সম্পন্ন হবে।...

"বাঁচবো কি মারা পড়বো, নিজের-নিজের সৃষ্টির আনন্দের মধ্যে পর্যাপ্ত সময়ক্ষেপ করবার প্রচুর নিরংকুশ অবসর পাবো কি পাবো না, এ-উপলব্ধিতে আজ প্রলয়ংকরী ধাঁধার জ্বালাময় ঘূর্ণি অবিরত ঘুরপাক খাচ্চে: যার তুলুনী আমাদের দৈনিক পদক্ষেপের সীমানা পর্যন্ত সংক্ষেপ এবং কাঁটা বেড়ায় ঘিরে রাখার প্রলোভনে তীক্ষ্ণ প্রলোভিত করচে। আগাগোড়া সমস্ত উরোপটা ঘিরে, তথা উরেশিআয় একটা ভয়ানক করাল আতংকের ছায়া ঘনীভূত হয়ে মৃদুমন্দ আভীক্ষ্ণ্যময় আলাপের তালে দুলচে। একটা নির্বাক স্তব্ধতা, বিশাল প্রশস্ত একটা জমাট যবনিকা যেন পৃথিবীময় ইস্পাতের হুকে টাঙিয়ে একই সংগে একই ক্রূরতায় সমস্ত প্রাণীদের নিরম্বু নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে বীভৎসভাবে হত্যার উৎকট-উল্লাসে নৃত্যপর।"

পড়িয়া মনে হইল, এ "লেখনী"র পাশে "বেয়নেট" নিতান্তই ফুলশর; একমাত্র হাই একস্‌প্লোসিভ বম এই মারাত্মক লেখনীর পাশে বসিতে পারে। পড়িতে পড়িতে আমাদের "নিরম্বু নিঃশ্বাস রুদ্ধ" হইয়া আসে, "বীভৎস হত্যার উৎকট উল্লাসে" মনে হয়, লেখককে "ইস্পাতের হুকে" টাঙাইয়া সমালোচনার বুকে একটা "জমাট যবনিকা" টানিয়া দিই। কিন্তু তাহা হইবার নয় বন্ধুগণ, আইনে বাধে। সেইজন্যই ধৈর্য্যের প্রয়োজন।

—

ধৈর্য্যের সহিত শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পড়িতেছিলাম—

"যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়, যাঁরা মহাপ্রাণ
কবি যাঁরা শিল্পী যাঁরা জ্ঞানী যাঁরা
অরাজক অন্ধকারে একমাত্র আলোর ইশারা,...

তাঁদের বিনাশ এর পৈশাচিক ব্রত।...
ক্ষিপ্ত কুক্কুরের
বিষাক্ত দাঁতের মতো———"

অধৈর্য্যভাবে লাফাইতে লাফাইতে এ. আর. পি.র পোশাকে গোপালদা প্রবেশ করিলেন, মুখে-চোখে নিদারুণ উত্তেজনার ভাব, হাতে সবুজ মলাট 'কবিতা' একখানা। গোপালদা আমার দিকে লক্ষ্য না করিয়াই চেঁচাইয়া যাইতে লাগিলেন, মেরে প্লস্তা উড়িয়ে দেব হারামজাদার, জুতিয়ে লাস করব, চৌরঙ্গীর চৌমাথায় কাপড় খুলে নিয়ে চাবুক মারব, ষ্টিরাপপাম্প দিয়ে ধুয়ে দেব রাস্কেলকে, বালি দিয়ে কবর দেব, কিছু না পারলে কান ম'লেও দেব শেষ পর্য্যন্ত, উল্লুক, বেল্লিক, ইন্‌সিন্‌ডিয়ারি বম কোথাকার!

দেখিলাম, অবস্থা ভাল নয়। জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া চেয়ারে বসাইলাম। বলিলাম, ষাঁড়ের মত চেঁচিয়েই যে চলেছ গোপালদা, কি হ'ল ছাই বলই না।

গোপালদা ক্ষুব্ধ অভিমানাহত কণ্ঠে বলিলেন, যাঃ, বলব আবার কি, ওই নেপাটা, আমার মুখের ওপব বলে কিনা মাইকেল বাংলা জানত না, অভিধান দেখে ভাড়া-করা পণ্ডিতদের সাহায্যে বই লেখাত! এর পরেও ওকে আস্ত রাখব আমি! মারতে মারতে লালবাজার থানায় নিয়ে যাব না!

নেপা, শ্রীমান নৃপেন্দ্র, গোপালদার ভাইপো, বি. এ. পড়ে।

এরূপ উত্তেজনার একটা ব্যাপারেই গোপালদাকে সেবার কিছু দিনের জন্য রাঁচি পাঠাইতে হইয়াছিল। মনে মনে ভয় পাইলাম! শান্ত করিবার জন্য বলিলাম, না গোপালদা, এ ওর মনের কথা নয়। তুমি মাইকেল-পাগল ব'লে তোমাকে খ্যাপাবার জন্যে বলেছে।

রাগে দুঃখে গোপালদার চোখে জল আসিয়াছিল। একটু ধরা গলায় বলিলেন, আরে না ভাই, এই দেখ, নজির ধরিয়ে দিলে আমার হাতে। বুদ্ধদেব বসু নাকি ওই কথা লিখেছে। প'ড়ে দেখলাম, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। বুদ্ধদেব তো আমাদের তেমন ছেলে নয়। ও নিশ্চয় অন্য কথা বলেছে, নেপা হারামজাদা বুঝতে পারে নি। দাও তো ভাই তুমি বুঝিয়ে।

'কবিতা'টি হাতে লইলাম, ১৩৪৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা, ৫২-৫৪ পাতায় বুদ্ধদেববাবুর মধুসূদন-প্রসঙ্গ। নৃপেন খানিকটা জায়গা আণ্ডারলাইন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই নজরে পড়িল—

"এখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই…। সেটা এই যে অতখানি প্রতিভা নিয়েও মধুসূদনের রচনা তাঁর গ্রন্থাবলীতেই আবদ্ধ রইলো কেন—অর্থাৎ, তিনি বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের মতো পরবর্ত্তী লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে কেন পারলেন না। তার কারণ—আমার মনে হয়—বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাঁর অনভিজ্ঞতা। আসলে বাংলা তিনি ভালো জানতেনই না, অভিধান দেখে-দেখে ভাড়া-করা পণ্ডিতের সাহায্যে রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাই তাঁর রচনা-শক্তির একটি আশ্চর্য্য নমুনা হ'য়েই রইলো, বাঙালিজাতির মর্মে প্রবেশ করল না।…বাংলাভাষায় যথেষ্ট দখল ছিলো না ব'লেই মধুসূদনের এই ব্যর্থতা, তাঁর অমিত্রাক্ষর মৌখিক ভাষার ছন্দে স্বতঃ-উৎসারিত হয় নি, তা নির্মিত হয়েছে খুব বেশি যান্ত্রিক উপায়ে। এই কারণেই পরবর্ত্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব এত কম।"

গোপালদা আমার মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া ছিলেন। কি জবাব দিব? ওই পংক্তি কয়টির অন্য কোনও অর্থই যে করা যায় না। শান্তভাবে বলিলাম, বুদ্ধদেববাবু ভুল করেছেন। He is an honourable man, বুঝিয়ে দিলেই নিজের ভুল বুঝতে পারবেন।

গোপালদা খুশি হইলেন, বলিলেন, তাই দাও তো ভাই।

বলিলাম, এবারে হয় না গোপালদা, আসছে বারে দেখব চেষ্টা ক'রে। 'কবিতা'টা থাক আমার কাছে।

গোপালদা আর বসিলেন না, যাইবার মুখে বলিলেন, দেখ, নেপা তোমার কথা শোনে। ওকেও একটু বুঝিয়ে ব'লো, খ্যাপায় না যেন আমাকে আর।

গোপালদা চলিয়া গেলেন। আমি ধৈর্য্যের সহিত বুদ্ধদেববাবুর কবিতা পড়িতে লাগিলাম—

"যে-বীভৎস ইতরতা চলে বঙ্গভূমে,
সমালোচনার ছদ্মবেশে—"

মধুসূদন গৌড়জনের জন্য তাঁহার মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন, বঙ্গজনের জন্য নয়।

অনেক দিন সাময়িক পত্রের সম্পাদনা করিতে করিতে মনে একটা অভিমান জন্মিয়াছিল যে, লায়েক হইয়া গিয়াছি। ও লাইনে আর কিছুই শিখিবার নাই। কিন্তু শ্রাবণের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গ" দৃষ্টে সে অভিমান ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম, এখনও 'প্রবাসী'র চরণতলে বসিয়া দীর্ঘকাল শিক্ষা-নবিসি করিতে পারি। বিনয়-ভাব মনে জাগিতেই মনটা হালকা হইয়া গেল, ভারী আরাম পাইলাম।

মাঝে মাঝে অভ্যাসদোষে পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিতে হয়। আত্মীয়দের মধ্যেও দুই-একজনের লেখার বদ অভ্যাস আছে। কিন্তু এতদিন নিজেদের সম্পাদিত পত্রিকায় কিছুতেই নিজেদের অথবা নিকট-আত্মীয়দের রচিত পুস্তকের প্রশংসা ঢুকাইয়া দিবার মত কায়দা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। এবারকার "বিবিধ প্রসঙ্গে" 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয় সে কায়দা দেখাইয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কায়দাটি এই। নিজের অথবা নিজের পুত্রকন্যার লিখিত কোনও পুস্তকের সম্পাদকীয় প্রশংসা করিতে হইলে সম্পাদক পুস্তকের নামমাত্র উল্লেখ করিবেন, লেখক বা লেখিকার নাম বাদ দিতে হইবে। তাহা হইলেই আত্মপ্রশংসার পাপ তাঁহাকে লাগিবে না। শ্রাবণের "বিবিধ প্রসঙ্গে" "পুণ্যস্মৃতি" শীর্ষক প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

এটি স্থূল বিজ্ঞাপন। কিন্তু ওই কার্য্যই সূক্ষ্মতর উপায়ে করা হইয়াছে "প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুবার্ষিকী দিবস"-প্রসঙ্গে। সূক্ষ্মতম চালের বশে 'পুণ্যস্মৃতি'র সঙ্গে 'নির্ব্বাণে'র নাম করিয়া সম্পাদক মহাশয় কি ভাবে ন্যায়ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার মত। পুস্তকটি 'প্রবাসী'-কার্য্যালয়ে যৎকিঞ্চিৎ

কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে পাওয়া যায়, সে কথাটিও কৌশলে উহ্য রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শেষোক্ত প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

"আমরা আগে আগে যে বলেছি, এইরূপ অনুষ্ঠানের অন্যান্য ব্যয় কমিয়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী ক্রয় ও প্রচারে অধিক পরিমাণে টাকা খরচ করা উচিত, সেই পরামর্শের পুনরাবৃত্তি করছি। রবীন্দ্রনাথের ভাল জীবনচরিতও এই সময় গঠিত হওয়া উচিত—যদিও তিনি লিখে গেছেন, "কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে।" তাঁর যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁর কোন জীবন-চরিতে নাই, তা তাঁর সম্বন্ধে লিখিত বহু প্রবন্ধে এবং "নির্ব্বাণ" ও "পুণ্যস্মৃতি" পুস্তকদ্বয়ে পাওয়া যাবে।" —পৃ. ৩৩৭।

যাক। ইট ইজ লেভার টু লেট টু লার্ন।

'ত্রিকাল' বাহির হইয়াছে। যাঁহাদের তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে, তাঁহারা ইহাতে মজা পাইবেন না; যাঁহাদের এক কাল গিয়া তিনকাল বাকি আছে, 'ত্রিকাল' তাঁহাদেরই জন্য। মানুষের কথা বলিতেছি না, জাতির কথা বলিতেছি।

'ত্রিকাল' সর্ব্বপ্রথমে পুরুষ-নারী ভেদ ঘুচাইয়াছে। হুমায়ুন কবির ও শান্তি কবিরে লিঙ্গভেদ নাই। "উৎসর্গ" দেখুন—

"নীলিমা দেবী

শান্তি কবির

শ্রদ্ধাস্পদেষু"

'ত্রিকাল' হ্রস্ব-দীর্ঘের জ্ঞানও অনাবশ্যক মনে করে। "রবিন্দ্রনাথের দু'খানা অপ্রকাশিত ছবি" দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

'ত্রিকালে'র আদি মধ্য ও অন্ত্য আছে; ইহার আদিতে জহরলাল নেহরু, ইহার মধ্যে আবুল কাসেম ফজলুল হক (আমাদের মাননীয় গো!) এবং অন্ত্যে লিয় ট্রট্স্কি। তবে মধ্যেই মধ্যমণি। তিনিই ত্রিকালজ্ঞ। ম্যাজিক, ব্ল্যাক-আউট, মুখে ভাত, ঝাঁপ—এসব ফাউ।

কবিতাগুলি কিন্তু কাউ নয়, বেসন-মোড়া কাউল কাটলেটের মত, পোট্টাইও বটে, আবার চাটও হয়। যেমন সমর সেনের—

"নীল্‌চে চোখ, তুঙ্গ বুক, উরুর মস্থণ অন্ধকার,
দেহ স্বার্থের স্বর্গে আস্থা নেই,
ও নিরুদ্বেগ উদ্দাম বিলাস
নূতুন মানুষের জন্মে।"

আমরা তিনকাল-যাওয়া এককালের দলে, ত্রিকালের চার চোখ (মলাটের ছবি) দেখিয়া একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছি। আর কিছু নয়।

* * *

একটা চোখ একটু তির্য্যক ভঙ্গিতে পড়িয়াছে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর উপর। চৌধুরী মহাশয় প্রসবোন্মুখ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সম্পাদক হইতে চলিয়াছেন— তাঁহার সম্বন্ধে শওকত ওসমানের আলোচনা সময়োচিত হইলেও সহৃদয় হয় নাই। প্রমথভক্তরা নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করিবেন।

"চল্‌তি গদ্যের তিনি স্রষ্টা, নূতন ঢঙের প্রবর্তক ইত্যাদি মুখরব ঐতিহাসিক জ্ঞান ও গবেষণায় অজ্ঞ একদল চেলা-চমূ গলা ফাটিয়ে জাহির করে। এই ঢক্কা-বাদকদের অনুরোধ, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম' ও প্রমথ চৌধুরীর যে কোন প্রবন্ধ তাঁরা যেন পাশাপাশি রেখে পড়েন।...বীরবলী প্রবন্ধ ও তৎরচয়িতা—দুই-ই হাল্কা। সহৃদয় কল্পপ্রীতি(fancy)-র দীনতায় প্রমথবাবুর কোন প্রবন্ধ জাতে উঠে নি। বৈহাসিকতার জঠরেই তাদের অপমৃত্যু।...এরা চলে কিন্তু কিছু বলে না।...যে পুরোহিত মন্ত্র জানে না, সে ঘণ্টা নাড়ে বেশি—এ তো চিরদিনই সত্য।"

চৌধুরী মহাশয়ের জয়ন্তীতে যে সকল লেখককে খুব উৎসাহিতভাবে যোগ দিতে দেখিয়াছিলাম, তাঁহাদের অনেককেই 'ত্রিকালে' দেখিতেছি। তাই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, ব্যাপারখানা কি?

শ্রাবণের 'ভারতবর্ষ' কবিতা-সম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু টেক্কা মারিয়া গিয়াছেন শ্রীনরেন্দ্র দেব তাঁহার "মন্দ না!" কবিতায়। এত অল্প আয়োজনে যে এতখানি কাণ্ড করা যায়, না দেখিলে বিশ্বাসই করিতে পারিতাম না। যাদুকর নরেনদা, এক 'মন্দ না' লইয়াই ভেল্‌কি খেলিয়া গিয়াছেন। হাজার হোক পুরাতন হাড় তো! একটু শুনুন—

"সবাই বলে সুন্দরী সে—
আমার চোখেও মন্দ না!
রূপের দীপে দীপ্ত না হোক
দেখতে ভালই, মন্দ না!
চশমাখানির ফ্রেমটি ভাল
নূতন ঢঙের মন্দ না!
'আই-ব্রাউ' সে আপনি রচে
তুলির টানে মন্দ না!
পাতলা পেলব অধর পুটে
লালচে আভা মন্দ না।
গাল দু'টিতে দাড়িম-ভাঙা
রংটি লাগে মন্দ না!"

এবং এইরূপ আরও ত্রিশটি "মন্দ না"র পরে

কলম তোমার থামল দাদা,
থামলে লাগে মন্দ না!
কাব্যলেখার প্যাঁচটি এমন
বের করেছ মন্দ না!

কিন্তু "মিত্র সখী সচিব"কেই "মন্দ না" বলিতে বলিতেই আমাদের গিরিজা-দাদা প্যাঁচান্তরে পড়িয়াছিলেন। তাই নরেনদাকে একটু সাবধান করিতেছি।

আচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের "চরমক্ষণে" ও শ্রীআভা দেবীর "আলোকের অভিযান" শ্রাবণের 'ভারতবর্ষে' ১১৪ পৃষ্ঠায় পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে; কবিতা দুইটি পরস্পর-পরিপূরক। ডক্টর আচার্য্যের পদে উন্নীত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়, কবিতাটি অনেকটা ভূতঝাড়া মন্ত্রের মত ঠেকিতেছে। আসলে কবিতাটি শিশু-সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে। একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

"মরণ দ্রাবণ আসছে রাবণ লঙ্কাপুরীর থেকে
সেই ঘোষণা কলোচ্ছ্বাসে যাচ্ছে সাগর হেঁকে।
আজকে শুধু আসছে ভেসে কবন্ধেরি খাদ্য
শিরায় আমার নেচে বেড়ায় দুন্দুভিরই বাদ্য
লাগিয়ে দেব এ ভুবনে মহান ভূমিকম্প
যাই তো যাব জাহান্নামে দেব ভীষণ লম্ফ"

জয় বিষহরি! আচার্য্য মহাশয় এই জীবনে ভাগ্যবলে অনেক ভীষণ ভীষণ লম্ফ দিয়াছেন, আবার কেন?

—

যাঁহাদের বিশ্বাস, আমাদের ছেলেমেয়েরা আসন্ন জনযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং যে বিলাস-ব্যসনের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া দূষিত বাষ্পের প্রকোপে দমবন্ধ হইয়া তাহারা মরিতে বসিয়াছিল, সেই বিলাস-ব্যসনকে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া সুস্থ ও সবল হইবার সাধনা করিতেছে, তাঁহাদের অবগতির জন্য একটি অতি-আধুনিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"পৃথিবীতে নতুন বাতাস বইচে, চারদিকেই নতুনের ডাক আর অভিযানের সাড়া পাওয়া যাচ্চে প্রচুর। শতাব্দীর সেরা শতাব্দী হচ্চে এই বিংশ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দীর সেরা উদ্দেশ্য হচ্চে টয়লেটিং বিদ্যায় পুংখভাবে যত্নবান আর যত্নবতী হওয়া। এটিকেট-দুরস্ত হতে হলে টয়লেটিং ব্যাপারে হওয়া চাই সর্ব্ব-প্রথম সিদ্ধহস্ত। বাইরের জগতের যে দিকেই চোখ ফেরানো যায়, সে-দিকেই নজরে পড়বে সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে টয়লেটিংয়ের অনবদ্য নিদর্শন। কোন্ মহাপুরুষ নাকি তাঁর কোনো প্রখ্যাত পুস্তিকায় এক সময় তাঁর কোনো নায়িকার মুখ থেকে

বার করেছিলেন যে, সর্বপ্রথম গাত্রচর্ম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, কারণ শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মনও প্রফুল্ল থাকবে, এমন কী প্রাণও সতেজ স্ফুরতিবান হবে! কলেজের মেয়েগুলো অশেষ সৌন্দর্য্যবতী না হয়েও লাবণ্যবতী, অর্থাৎ সোণালি রঙ না হলেও সোণার আমেজ আসে টয়লেটিং-এ, আনা চলে স্বচ্ছন্দেই। রোমাঞ্চ না আনুক, অপূর্ব্ব পুলক-শিহরণ আর স্নিগ্ধতা আনে প্রচুর!"

গাত্রচর্ম্ম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার সহজ পদ্ধতি সে-যুগের গুরুমশাইরা জানিতেন, বাপখুড়ারাও প্রয়োজন বোধ করিলে উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থলের গাত্রচর্ম পরিষ্কার করিয়া দিতেন, তাহাতে ছেলেমেয়েরা "স্ফুরতিবান" হইত না বটে, বুদ্ধিমান হইত; পুলক-শিহরণ হইত কি না জানি না, তাহাদের রোমাঞ্চ নিশ্চয়ই হইত। কিন্তু আজকাল টয়লেটিঙের সাহায্যে "সতেজ স্ফুরতিবান" হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক সংবাদপত্রে, পত্রিকায় এবং 'মোহাম্মদী'তে এত বিজ্ঞাপন দেখি কেন?

—

আষাঢ়ের 'পরিচয়ে' পড়িতেছিলাম—

"পরম দুর্দ্দিনে কেন এ দুর্বার সাহস আমার
ভয় নেই আর কোনো এক্সাসের উদ্ধত যৌবনে।
অগ্নিময় ট্রয়, ভোগ্যা আন্দ্রোমাকি, শুধু হেকুবার
হৃদয়েতে ধৈর্য্য কিবা অতি মর্ত স্বপ্ন নিরসনে।"

ধৈর্য্যের কথা বটে, কিন্তু হৃদয়ের ধৈর্য্যের ব্যাপারই নয়, ইহা মগজের ধৈর্য্যের কথা। মনে পড়িয়া গেল বহুদিনবিস্মৃতা সুন্দরী হতভাগিনী কুলেগুাকে, সেই তাহাকে একবার চকিতের মত ইলিসা-হাবুসের পথে দেখিয়াছিলাম, হকতুর উদ্যান-বাটিকায়। আমার পানে ম্লান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কুলেণ্ডা প্রশ্ন করিয়াছিল, তুমি, তুমি, তুমিই কি দামিয়স? কি জবাব দিয়াছিলাম, মনে করিতে পারিলাম না। চোখ দুইটি জলে ঝাপসা হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি পাতা উল্টাইয়া জীবনময় রায়ের "ভিজাস্যাঁতা দেশলাই কাঠি"টির সাহায্যে একটি বিড়ি ধরাইয়া

অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। আর যাহাই করি, 'পরিচয়ে'র বাংলা কবিতা আর পড়িব না।'

—

এ তেত্রিশ কোটির দেশে একমেবাদ্বিতীয়ম্ টিকিবার নয়, টিকিতে পারে না। এক এখানে মাটির গুণে বহু হইতে বাধ্য। 'প্রবাসী'ই কি ছাই লাগাম ধরিয়া এই বহুবাদ সামলাইতে পারিতেছে? ফাঁক পাইলেই ঘেঁটু ওলা শীতলা বানের জলের মত হুড়্ করিয়া আসরে ঢুকিয়া পড়িতেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা লইবার কালে তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ী দেবী তাঁহাকে কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন? শ্রাবণের 'প্রবাসী'র ৩৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখিতেছেন—

"কিমহং তেন কুর্য্যা যে নাহং মৃতা স্যাম্"

আবার ৩৭৯ পৃষ্ঠায় দেখুন, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা লিখিতেছেন,

"যেনাহং নামৃতা স্যাং, কিমহং তেন কুর্য্যাম্?"

একজন সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল, অন্যজন 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক। আমাদেরও বৈদিকমতে প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে—

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম? (বানান ঠিক হইল তো?)

—

এবার আমাদিগকে ধৈর্য্যে পাইয়াছে। "ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা" 'নূতন লেখা'র বৈশাখ সংখ্যা পড়িতে পড়িতে এই অতি-আধুনিক ধৈর্য্যের জলন্ত নিদর্শন পাইয়া পুলকিত হইলাম। বেণু সরকার লিখিতেছেন—

"বনস্পতি আমি সখি, বনানীর তরুশ্রেণী মাঝে
শ্যামচ্ছায়া স্নিগ্ধ সুশীতল! আপেলের তরু তুমি,—
দুটী ফলে আনত-নিবিড়; অথবা বুকের মাঝে
বকুলের মালা,—ডুবায়ে অস্তিত্ব দেখে, মোরে চুমি'
চুষে লও বক্ষের সম্পুটে:
জল আমি সুশীতল
বিশাল দিঘীর, অর্দ্ধস্ফুট পদ্ম তুমি, তার বুকে
দোল অবিরাম, দোলাও অপরে: ভ্রমরার দল,

তোমারে ঘেরিয়া সখি করে গুঞ্জরণ—স্বপ্নলোকে
বাঁধে নীড়, চোখে স্বপ্ন আকাশ-কুসুম! হায় সখি!
তা'রা তো জানে না,—তুমি কারো নও, একান্ত আমার।"

বিশাল দীঘির সুশীতল জলে অর্দ্ধস্ফুট পদ্ম ভাসিতেছে, ভ্রমরার দল তাহাকে ঘিরিয়া গুঞ্জরণ করিতেছে। পদ্মের মালিক দীঘির জলের ভ্রূক্ষেপ নাই, সে ধৈর্য্য ধরিয়া চিত হইয়া পড়িয়া আছে এবং মিটিমিটি করিয়া মধুলোলুপ ভ্রমর-কুলের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিতেছে, বাবাজীরা, যতই মধু খাও তোমরা, শেষ মার এই ওস্তাদের; মৃণাল ধরিয়া বসিয়া আছি, শ্রীমতীকে শেষতক এই শর্ম্মার বুকেই লতাইয়া পড়িতে হইবে। এই উদার মনোভাব বাংলা দেশে ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছে বলিয়া সেকেলে বস্তাপচা খুনজখমগুলা আর বড় দেখিতে হয় না। এ যুগের রোহিণীরা সত্যই ভাগ্যবতী।

বিষ অনেকদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে; সপ্তকোটি কণ্ঠকে ত্রিংশকোটি কণ্ঠের কলকল নিনাদে পরিণত করাইয়া আমরা যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করি না কেন, পশ্চিম-ভারতীয় জনাব জিন্নার পাকিস্থানী বিষ বাংলা দেশের জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগকেও ধীরে ধীরে জীর্ণ করিতেছে। শুধু ঘুনে-ধরা প্রাচীন 'মাসিক মোহাম্মদী'কেই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ মুসলিম ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত 'মুসলিম হল ম্যাগাজিনে'ও এই পাপ প্রবেশ করিয়াছে। সেখানেও দেখিতেছি—

"Pakistan is our deliverance, defence and destiny! We deny that we are one Nation with the Hindoos and the rest. Nothing unites us save arbitrary geographical boundary and temporary shackles of slavery. Nationality based on either of these must in its very nature be unnatural. It cannot, it will not last."

* * *

আবদুল হামিদ শেখ আষাঢ়ের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে "ভারতীয় জাতীয়তা" প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে জন্ম নিয়েছে, তাতে ভারতে একজাতীয়তা গড়ে উঠতে পারে না, একথা আজ অস্বীকার করে লাভ নেই। হিন্দু ও মুসলমান মিঃ গান্ধী ও মিঃ জিন্নার

কথায় উঠে বসে। তার কারণ, এই দুই ব্যক্তিত্বে দু'টি বিপরীত চিন্তাধারা কাজ করছে। মিঃ গান্ধী যেমন মানবীয় পারিপার্শিকতার হিন্দু-দিকটার প্রতিনিধিত্ব করছেন, মিঃ জিন্না তেমনি মুসলিম পারিপার্শ্বিকতার প্রতিনিধিত্ব করছেন। অর্থাৎ হিন্দুরা গান্ধীবাদের আওতায় তাদের জীবন-পথ খুঁজে পেয়েছে, মুসলমানরা ইসলামের শক্তিবাদের আওতায় পথ খুঁজে পেয়েছে, আর সেই পথ দেখিয়ে দিয়েছেন মিঃ জিন্না। এই দুই নেতৃপুরুষের আওতায় হিন্দু ও মুসলমান তাদের পরস্পরের পরিপার্শ্বগত মুক্তিবোধকেই খুঁজে পেয়েছে। কাজেই পরস্পরের কর্ম্ম ও চিন্তাধারায়ও হিন্দুমুসলমান দুই জাতি। তাদেরকে একজাতিত্বের খোঁটায় বেঁধে দিলে আমাদের জাতীয় জীবনের পঙ্গুতাকেই ডেকে আনব। নিজ নিজ প্রতিভানুযায়ী আমাদের উভয় জাতির পৃথিবীর সভ্যতার অংশ গ্রহণ করাই উচিত।...

ইস্‌লামের আদর্শ—"activity of life in all branches—physical & spiritual," আর কংগ্রেসের বা তথাকথিত হিন্দুদের আদর্শ অহিংসাবাদ বা চরকাবাদ—যাহাকে মরীচিকা বা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। কারণ অহিংসা ও মানবতা এক জিনিষ হতে পারে না। অহিংসা দেবতার জন্য হতে পারে, যদিও ইসলামে তাহাও স্বীকার করে না। কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ মাঝে মাঝে হিংসা করে থাকেন; যেমন, তিনি অন্যায় দেখলে সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেন। নিষ্ক্রিয় শক্তি দ্বারা নহে, সক্রিয় শক্তি দ্বারাই। যেমন ভূ-কম্প, প্লাবন ইত্যাদি। কাজেই আদর্শের দিক দিয়ে কংগ্রেস তথা হিন্দুসমাজ ইসলামবিরোধী। 'Common memory' ও 'common ideal' যে কি, তাহা শিবাজী ও আওরঙ্জেবকে পাশাপাশি দাঁড় করালেই বুঝা যাবে। একজন হিন্দু 'ideal'-এর মূর্ত্ত প্রতীক আর একজন মুসলিম 'ideal'-এর দীনসেবক। আওরঙ্জেব মুসলমান সমাজে যে-জন্য

প্রিয়পাত্র ঠিক সেই কারণেই হিন্দুর কাছে ঘৃণার পাত্র ; তেমনি শিবাজীও হিন্দুর প্রিয়পাত্র এবং ঠিক সেই কারণেই মুসলমানের কাছে তস্কর ও প্রতারক। আধুনিক কালেও মিঃ গান্ধী যে-কারণে হিন্দুর কাছে প্রিয়পাত্র, মিঃ জিন্না ঠিক সেই কারণেই মুসলমানের প্রিয়পাত্র। কাজেই আমাদের এমন একটি লোক নেই যাকে হিন্দু মুসলমান সমপরিমাণে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, এবং ঠিক সেই কারণে হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি এবং ভারতের একজাতীয়তার অস্তিত্ব কোনদিক দিয়েই দেখানো যায় না।

উপরের ইংরেজী ও বাংলা উভয় উদ্ধৃতির মধ্যে যে বিন্দুমাত্র যুক্তি বা সত্য নাই, যে কোনও সাধারণধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই তাহা বুঝিতে পারিবেন ; কিন্তু পরম-প্রপাগাণ্ডিষ্ট জিন্না সাহেবের কূট-কৌশলই এই যে, মিথ্যাকে বারংবার জোরের সহিত প্রচার করিতে করিতে সত্যের রূপ দেওয়া ; সেই ভয়াবহ প্রপাগাণ্ডা যে বাংলা দেশে বেশ আটঘাঁট বাঁধিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রমা হাতে হাতে মিলিতেছে। আমরা একটি ধ্রুব সত্য লইয়া এই কদর্য্য মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারি, আমাদের এই প্রপাগাণ্ডা সত্যের ভিত্তির উপর সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। সে সত্য এই যে, ভারতবর্ষ এক দেশ এবং ভারতবর্ষের অধিবাসীবৃন্দ এক মহাজাতি। যাহারা সত্যসত্যই ভারতবর্ষের মঙ্গলকামী, তাহাদিগকে উঠিতে বসিতে শয়নে স্বপনে ঘরে বাহিরে উচ্চকণ্ঠে এই কথাটাই ঘোষণা করিতে হইবে যে, পাকিস্থানী মিথ্যা এই মহৎ সত্যের কাছে কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিবে না।

* * *

একটা ভরসার কথা এই যে, 'ঢাকা মুসলিম হল ম্যাগাজিনে'র (১৯৪১-৪২) বাঙালী মুসলমান লেখকগণ বাংলা সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া পাকিস্থানী মিথ্যা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন ; তাঁহাদের সত্যকার সাহিত্যপ্রীতি ইহার কারণ হইতে পারে। এমন কি যে আবদুল হামিদ শেখের কম্বুকণ্ঠ পাকিস্থান-মহিমা-ঘোষণায় 'মাসিক মোহাম্মদী'তে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনিই ঢাকার মুসলিম ছাত্রদের পত্রিকায় "আমাদের সাহিত্য" প্রসঙ্গে অন্য কথা বলিতেছেন।

'শ্রীহর্ষ' যে ১৩৪২, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের "তর্ক ও তর্কাতীত" প্রবন্ধ পড়িলাম। এ আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম। গাড়ু ও বদনা—দুই ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি একসঙ্গে দীর্ঘকাল পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়া চলিতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে, দিলীপবাবু বাংলা দেশের অনেক ক্ষতি করিয়া এই শিক্ষাটা লাভ করিলেন। অনেক কষ্টে সংগৃহীত বলিয়া দিলীপবাবুর এই অভিজ্ঞতা মূল্যবান। তিনি যখন অজ্ঞান ছিলেন, তখন তাঁহারই প্রশংসাপত্র লইয়া বসু মহাশয় তাঁহার আজন্ম-আকাঙ্ক্ষিত সমাজে নাসিকাগ্রভাগ প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন, আজ সজ্ঞানে দিলীপবাবু বুদ্ধের আসল স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, সমাজের লোকের কাছে তাহাও নিবেদন করিতে হইবে বইকি! দিলীপবাবু বলিতেছেন—

> বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে আমার স্বভাবের মিল প্রায় শূন্য। কিন্তু তবু ওঁর দিকে যে আমি প্রথমদিকে একটু বেশী ঝুঁকে ছিলাম, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই ওঁর 'বন্দীর বন্দনা'র কবিত্ব, কিন্তু প্রধান কারণ ওঁর রচনার প্রাণশক্তি তথা ভঙ্গি-নৈপুণ্য, যাকে চলতি ভাষায় আমরা বলি চটক। তুমি জানো, মানুষের মন বেশী সহজে ভোলে এই সস্তা চটকের নগদবিদায়ে, এমন কি সে চটক বিষকুম্ভ-পয়োমুখ হ'লেও। বুদ্ধদেববাবুর লেখার মধ্যে জ্ঞানবত্তা বা সারবত্তা অকিঞ্চিৎকর হ'লেও তাঁর লেখার এই প্রাণবত্তার জন্যে অনেকেই প্রথমটায় তাঁর লেখার দিকে ঝোঁকে। কিন্তু ঐ "প্রথমটাই"। কারণ চটুকের গাফিলিই হ'ল এই যে, সে দক্ষিণা যা দেবার দিয়ে গেল শুরুতেই, কাজেই শেষরক্ষা করতে পারে না।
>
> বুদ্ধদেববাবু আজকাল যেন একটু বেশী বেসামাল হ'য়ে পড়ছেন। কারণ এমন কি ছন্দ—যেটা 'বন্দীর বন্দনা'র যুগে তিনি জানতেন, মোটামুটি, সে সম্বন্ধেও তাঁর কান তীক্ষ্ণতা হারাচ্ছে—ফলে আজকাল ওঁর কবিতাটবিতা যে "nicely লিখা," এমন কথা ওঁর অতিবড় মিত্রও বলবে না। উদাহরণত ওঁর সদ্যোজাত "প্রণয়গাথা" কবিতাটি দেখো গত আশ্বিনের 'কবিতা'য়। মাত্রাবৃত্তর সঙ্গে স্বরবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত মিলিয়ে সে যে এক কি অপরূপ জগাখিচুড়ি তিনি পরিবেষণ করেছেন—এমন কি মিলেরও ভুল করে স্থানে স্থানে—বিশেষ পূর্ণ পর্বের সঙ্গে অপূর্ণ পর্বের মিল দিয়ে! তবে এ পরিণতি তাঁর হ'য়ে থাকবে গদ্যছন্দের ছোঁয়াচে, "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" বলে না? অবশ্য ওরিজিনাল

হবার উৎকট চেষ্টা এর কারণ হতে পারে। যে মেটিরিয়ালিষ্ট বলতে "আমরা বুঝছি শুধু তাদেরকে, যারা লেখে রাজ্যির যতসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে—(we mean by it that they write of unimportant things ;)—যারা প্রচুর নৈপুণ্য, প্রচুর শ্রম ব্যয় ক'রে শুধু নগণ্য ও'ক্ষণিক রঙচঙকে খাঁটি ও শাশ্বতের চেহারা দিতে (that they spend immense skill and immense industry making the trivial and the transitory appear the true and the enduring)… ।" কিন্তু করলে হবে কি ভাই, মানুষের মূল্যজ্ঞান যাবে কোথায় বলো। তাই—বলছেন শ্রীমতী [ভার্জিনিয়া উল্‌ফ] প্রথমটায় আমরা যতই কেন না মনকে চোখ ঠারি, শেষটায় হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে দীর্ঘশ্বাসের নীড়ে এই সকরুণ প্রশ্ন রণিয়ে উঠেই উঠে : "এসবের মজুরি পোষায় কি ? এরা কিই বা চায় বলতে ? (We drop the finished novel on the crest of a sigh—'Is it worth while ? What is the point of it all ?)" বুদ্ধদেববাবুর অত্যাধুনিক গদ্যছন্দ প্রভৃতির অক্লান্ত অন্তঃসারশূন্য গবেষণা দেখে কার না প্রতিধ্বনি করতে ইচ্ছে হয় এই গভীর প্রশ্নটির ? কার মনে না আক্ষেপ জাগে যে এতখানি পরিশ্রম ও নৈপুণ্য কারু যদি অলীক চটকের মোহে না প'ড়ে আত্মনিয়োগ করত অন্তরাত্মার পরম আনন্দ ও আকুতিতে প্রকাশ করতে চেয়ে। তা না করে চাই শুধু বড়কে ছোট করতে—যেমন ঋষি বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্‌" মন্ত্রবাণীকে বুঝতে না চেয়ে শুধু সস্তা ব্যঙ্গ করা।

দেখিতেছি প্রসঙ্গান্তরে গোপালদাকে ভুল বুঝাইয়াছি, বড়কে ছোট করাই এই বেঁটে ভদ্রলোকের স্বভাব !

'দি টেলিগ্রাফ রিভিউ' পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় দেখিলাম, আলিপুরের গবর্মেণ্ট টেলিগ্রাফ ষ্টোর্স ও ওয়ার্কশপ কলিকাতা হইতে অন্যত্র বরাবরের জন্য স্থানান্তরিত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া সেখানকার কর্মচারীগণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছেন। যুদ্ধের দরুন সাময়িকভাবে সকল ব্যবস্থারই অদলবদল হইতে পারে এবং সব অসুবিধা সত্ত্বেও সকলেই এই সাময়িক পরিবর্ত্তনজনিত অসুবিধা ভোগ করিতে বাধ্য ; ষ্টোরের কর্ম্মচারীরাও সাময়িক ব্যবস্থায় গররাজি ছিলেন না। কিন্তু অভ্যস্ত ও পরিচিত পরিবেশকে অকারণে অথবা কর্ত্তৃপক্ষের নিতান্ত খামখেয়ালিতে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে যদি

তাঁহারা রাজি না থাকেন এবং নিখিল-ভারত টেলিগ্রাফ ইউনিয়নে যদি ইহা লইয়া আন্দোলনও হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেশের লোকই এই আন্দোলন সমর্থন করিবে, আমরাও করিতেছি।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধৈর্য্যহীন হইলে চলিবে না। ধৈর্য্য চাই। যাঁহারা আমাদিগকে দোহন ও নিষ্পেষণ করিবার জন্যই নিজেদের সামাজিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া, যাতায়াতের ব্যয়ভার স্বীকার করিয়া এবং অন্যান্য বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিয়া সাতসমুদ্র তেরোনদী পার হইয়া এই মশা-ম্যালেরিয়ার দেশে আসিয়াছেন তাঁহারা যদি সহানুভূতির সহিত আমাদের এই সকল সমস্যাকে না দেখেন, তাহা হইলে আমাদিগকে ধৈর্য্য ধরিয়া সকল অসুবিধা সহ্য করিতে হইবে বইকি! ধৈর্য্য ধরিতে ধরিতে আমরা যথাকালে এমন একটি সীমায় আসিয়া পৌঁছিব, যেখানে ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের যুক্তিহীন অত্যাচার উপেক্ষা করা সহজ হয়, চোখরাঙানিকে আর ভয় থাকে না। আশা করি, ছোটরা সেই সীমায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বড়রা অবহিত হইবেন।

বাংলা দেশে দেখিতেছি প্রত্যেক প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক একজন বুদ্ধিমান ঘোষ আসিয়া জুটেন; তাঁহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত সামলাইতে চট্টোপাধ্যায়রাই কাহিল হইয়া উঠেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বাল্যসুহৃৎ মদ্যপ গণেশ ঘোষ জুটিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঘোষ, পদবী আর একটু বাড়াইয়া ঘোষালরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; এখন দেখিতেছি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাঁধে শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ আসিয়া চাপিয়াছেন। এই ঘোষ-পুঙ্গব 'বাংলা গদ্যে চার যুগ' নামক যে গব্য-গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আত্মবিস্মৃত হইয়া শ্রাবণের "বিবিধ প্রসঙ্গে" তাহার জয়গান করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয়ের উক্তি আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রাহ্য না হইলেও এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি বিশ্বাসবশত প্রতারিত হইবেন, তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা আগামী বারে বাংলা গদ্যে এই ঘোষযাত্রার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিব।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত সতর বৎসর ধরিয়া 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ', 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'বঙ্গশ্রী', 'দেশ', 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় রামমোহন রায় সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই যে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার *Rajah Rammohan Roy's Mission to England* পুস্তক বাহির হইয়াছিল, তাহার পর তিনি রামমোহন সম্পর্কে আর কোনও পুস্তক বা পুস্তিকা প্রকাশ করেন নাই। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে যে মূল্যবান ও অপরিহার্য্য উপাদান ছিল, তাহা একরূপ বিস্মৃতির

গর্ভেই তলাইয়া যাইতেছিল। এরই মধ্যে তাঁহারই ব্যবহৃত উপাদানগুলি লইয়া দুই-এক-জন ভাগ্যবান ব্যক্তি বৃহদাকার পুস্তক প্রকাশের দ্বারা নূতন আবিষ্কারের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন।

বিশেষ আনন্দের বিষয় ব্রজেন্দ্রবাবু এতদিনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের "সাহিত্যসাধক-চরিতমালা"র অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাঁহার 'রামমোহন রায়' বাহির করিলেন। এই ক্ষুদ্র জীবনীটি আকারে ছোট, কিন্তু ইহাতে রামমোহন-জীবনীর এখন-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত সকল উপাদানই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; ইহার অতিরিক্ত কথা বৃহৎ বৃহৎ জীবনীগুলিতে তো নাইই, ইহাতে এমন অনেক তথ্য আছে, যাহা অন্য কেহ দিতে পারেন নাই। ইহা সম্ভব হইয়াছে—ব্রজেন্দ্রবাবু গদগদ উচ্ছ্বাসের পক্ষপাতী নহেন বলিয়া। ব্রজেন্দ্রবাবু এই পুস্তকের ভূমিকায় রামমোহন-সম্পর্কিত তাঁহার যাবতীয় প্রবন্ধের একটি তালিকা দিয়া অধিকতর অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সহায়তা করিয়াছেন। যাঁহারা রামমোহনের স্বরূপ জানিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিতেই হইবে।

তথাপি, রামমোহনের মত অত বড় একটি মহৎ জীবনের এই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে আমাদের মন ভরে না, শুধু তথাই নয়, বিস্তৃত কাহিনী জানিবার জন্য আমাদের মন ব্যাকুল হয়। ব্রজেন্দ্রবাবু রামমোহন লইয়া যেরূপ একনিষ্ঠ পরিশ্রম করিয়াছেন, বাংলা দেশে সেরূপ আর কেহ করেন নাই। আমরা আশা করি, তিনি রামমোহনের একটি বৃহৎ জীবনী রচনা ও প্রকাশ করিয়া রামমোহন-সম্পর্কে বাঙালীচিত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন।

—

দুঃখের বিষয়, আমাদের পুস্তক-সংগ্রহের সর্ব্বনাশা লোভ আবার আমাদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। একবার এই পাট চুকাইয়া দিয়াছিলাম, লোভে লোভে আবার অনেককে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, কিন্তু এবারে স্থানাভাবে পুস্তক-প্রসঙ্গ লিখিয়াও প্রকাশ করা গেল না। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে অর্থাৎ পূজার পূর্ব্বে ও-পর্ব্ব শেষ বারের মত চুকাইয়া নাকখৎ দিব। ভবিষ্যতে সমালোচনার্থ পুস্তক দিয়া আমাদিগকে কেহ বিপন্ন করিবেন না।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি

১৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৯

এবারের শারদীয়-সম্ভাষণ

১৩৪৯ সালের মনে কি আছে জানি না, তথাপি কোনরূপে আশ্বিনে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। দেশের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, এবং ক্রমশ যে কঠিনতর অবস্থা আসন্ন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে গতানুগতিকভাবে কোন কাজই করিতে পারা বা করিতে ইচ্ছা করা—স্বাভাবিক্ নহে। প্রতিমাসে ইহাই মনে হয়, সাহিত্য-সেবার প্রয়োজন কি এখনও আছে? যদি সে অবকাশ মনে বা প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় কাহারও থাকে, তাহা হইলেও বাহিরে তাহার পরিচয় প্রচার করার কি কোন হেতু আছে? সে কি অপর সকলের উপরে একটা হৃদয়হীন অভদ্র উপদ্রব নয়? দেশে যখন দিন দিন অন্নাভাব ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে, যখন প্রাণের আশঙ্কা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন সাহিত্যের তত্ত্ব বা তথ্য সম্বন্ধে আগ্রহ করিবে কে? আমি না হয় কোনরকমে সর্ব্বভয় ও সর্ব্বভাবনা হইতে কিছুক্ষণের জন্যও নিজেকে মুক্ত রাখিয়া কিঞ্চিৎ সাহিত্য-চিন্তা করিলাম, কিন্তু যখন তাহা হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াই, তখন নিজেকে—নির্ম্মম না হইলেও—নির্ব্বোধ বলিয়া ধিক্কার দিই। তখন আমাদের এক কবির সেই লাইনগুলি মনে পড়ে—

> হাঁকে বৃদ্ধ, 'ডাব, কচি ডাব ?'—
> পাগল ! আজি এ সাঁঝে
> সঙ্কীর্ণ গলির মাঝে
> উদরে উদরে অন্নাভাব ;—
> সেইখানে এই শীতে
> কি বাতিক প্রশমিতে
> কে তোমার খাবে কচি ডাব ?

আমার অবশ্য 'কচি ডাব' নয়—ঝুনা নারিকেল; কিন্তু অবস্থা আমার প্রায় একই। না, হাসির কথা নয়; সাহিত্য-চর্চ্চা এক্ষণে লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তবু একটা কৈফিয়ৎ আছে। নিকট ভবিষ্যৎ যেরূপ অন্ধকার হইয়া উঠিতেছে, দূরতর ভবিষ্যৎও যেরূপ অনিশ্চিত, তাহাতে বর্ত্তমানের যেটুকু সময় হাতের মুঠায় ধরিতে পারা যায়, তাহার শেষ সদ্ব্যবহার করিলে ক্ষতি কি? অনেক কাজ করিবার ছিল, অনেক কথা বলিবার ছিল—হয়তো সহসা তাহার সকল উপায় ছিন্ন হইয়া যাইবে। অতএব ইহারই মধ্যে যতটুকু লিখিয়া রাখা যায়, এই বিষম অবস্থাতেও যেটুকু শান্তির অবসর এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহাতেই যতটুকু সম্ভব দুই-একটি কথা শুনাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। তাই কালবৈশাখীর প্রহর-গণনার সময়ে যেমন, আজ এই আশ্বিনে-ঝড়ের প্রতীক্ষা-কালেও তেমনই, কিছু বলিবার উদ্যম করিতেছি।

*   *   *

কিন্তু কি বলিব? বলিবার অনেক আছে, কিন্তু সময় বড় অল্প. কোন বড় বিষয়ে কিছু লিখিবার ভরসা পাই না; প্রতিমাসেই মনে হয়, এই বুঝি পত্রিকার শেষ সংখ্যা—এক সংখ্যায় আরম্ভ করিয়া পরে আর শেষ করিতে পারিব না। বর্ত্তমান সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র শারদীয়া সংখ্যা। বাংলার যে ঋতু সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর—অতিরিক্ত বর্ষার দেশ বলিয়া আমাদের দেশে শরতের যে অপূর্ব্ব শ্রী বিকশিত হয়—সেই শ্রী ও সৌন্দর্য্যের পূজাই শারদীয়া পূজা—বাঙালী-জাতির জাতীয় উৎসব। অতএব এই সংখ্যায়—এক দিকে বিল্ববৃক্ষমূলে বোধনের যে চণ্ডীপাঠ এবং অপর দিকে পূজামণ্ডপতলে সানাইয়ের যে সুর-মূর্চ্ছনা—তাহারই সূচনা করা উচিত। কিন্তু বাঙালীর সে জীবন আর নাই, বহুদিন

তাহাতে জরা প্রবেশ করিয়াছে। গ্রাম গিয়াছে, নদী মজিয়াছে, দীঘির জল শুকাইয়াছে, খাল-বিল শীর্ণ ও শুষ্কপ্রায়। আমি বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কথা বলিতেছি, যে বঙ্গের ভাগীরথীকূল বারাণসীসমতুল বলিয়া একদিন সারা হিন্দু-বাংলার তীর্থভূমি ছিল। শুধু তীর্থভূমি নয়,—হিন্দু-বাঙালীর আধুনিক সংস্কৃতি,—অর্থাৎ প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কালের ধর্ম্ম, সমাজ, ভাষা ও সাহিত্য, এবং শেষে ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার সারবস্তু—সে সভ্যতার জীবনীয় অংশ—এই ভূমিতেই বাঙালীর মনীষা ও প্রতিভায় কষিত হইয়া সারা বাংলা দেশ ও বাঙালী-জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস যাহাই হউক—এই কালে তাহার হিন্দু-সংস্কৃতি নানা কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে-সমাজে শক্তি, সাহস, হৃদয়-বল ও মনীষার কখনও অসদ্ভাব না ঘটিলেও, খাঁটি হিন্দু-আচার ও হিন্দু-সংস্কার এবং খাঁটি হিন্দু-মনোভাব রক্ষা করা অনেক কারণে দুরূহ হইয়াছে। যে সকল কারণ একদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা আজ অতিমাত্রায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আজ এমনও আশঙ্কা হইতেছে যে, হিন্দু-বাঙালীর জাতি-ধর্ম্ম, মান-ইজ্জত বজায় রাখিতে হইলে তাহাকে বাস্তু-বদল করিতে হইবে—কারণ, বাংলা দেশ এক্ষণে স্পষ্টই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছে; এ ভাগ পূর্ব্বেও ছিল—রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক কারণে তাহা প্রকট হইয়া উঠে নাই। আজ তাহাকে আর ঢাকিয়া রাখা যাইতেছে না; ফলে, হিন্দু-বাঙালীর বড়ই অবস্থাসঙ্কট ঘটিয়াছে। হিন্দুর জমিদারি-স্বত্ব ও মুসলমানের জমি-স্বত্ব এই দুইয়ের বিরোধ যেমন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে—তেমনই, হিন্দুর সামাজিক অবস্থাও অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছে। এ অবস্থায় হিন্দু-বঙ্গ ও মুসলমান-বঙ্গ এই দুই ভাগ রোধ করা যাইতেছে না। এবং সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে

হিন্দুর ভবিষ্যৎচিন্তা নূতন করিয়া করিতে হইবে—গতানুগতিক মনোভাব বা বাস্তু-প্রীতির অতিরিক্ত সেণ্টিমেণ্ট দমন করিয়া এ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, এবং সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে হইবে।

বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যে ভারতের অন্য দেশের তুলনায় অতিশয় বৃহৎ ও জটিল, তাহা অস্বীকার করিলে—নানা নূতন মতবাদের সাহায্যে ইহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে—কোন পক্ষেরই কল্যাণ হইবে না। বাঙালী মুসলমান যখন হিন্দু-বাঙালীর সঙ্গে ঘর করিবে না স্থির করিয়াছে, এবং পূর্ব্বপ্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে সমুদয় বাঙালীর উপরে আধিপত্য দাবি করিতেছে, তখন বর্ত্তমানে কোনরূপ আপোস মীমাংসাও সম্ভবপর নহে।

এসব কথা খোলাখুলি আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে—যদিও সকল সমস্যাই হয়তো মন্বন্তরের মুখে আপনা-আপনি সমাধান হইয়া যাইবে, কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তথাপি বর্ত্তমানের রূপ যতদিন না পরিবর্ত্তন হইতেছে, ততদিন এ সমস্যা গুরুতরই বটে। সংস্কার-কৈঙ্কর্য্য সকল বিষয়েই সমান অহিতকর—এক্ষেত্রেও বহুদিনের বংশগত সংস্কারকে সবলে উৎপাটন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু-বাঙালীকে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার উপায় করিতে হইবে। যে-বিরোধ ভূমিগত, এবং যে-বৈষম্য জন-সংখ্যাজনিত তাহা দূর করিয়া একত্র বসবাস অসম্ভব নয়; কিন্তু কত কালে দেশে সেই শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহা এখনও একরূপ অনিশ্চিত বলিলেই হয়।

আমার এ কথায় অনেকে মনে করিবেন, আমি বাংলা দেশে পাকিস্থানের প্রস্তাব করিতেছি; পাকিস্থান কি বস্তু, তাহা কি করিয়া

সম্ভব হইতে পারে, সে বিষয়ে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই ; যাহা শুনিতে পাই তাহাতে মনে হয়, উহা আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের এক প্রকার 'সব-পেয়েছির দেশ'। তাঁহাদের সেই স্বপ্ন সফল হউক বা না হউক, আমি বাংলা দেশে সকল 'বাঙালী'র জন্যই এক শাসন-ব্যবস্থা কামনা করি। কেবল, ধর্ম্ম, সমাজ ও বাস্তুঘটিত বিবাদ নিবারণের জন্য—উভয় সম্প্রদায়ের যতদূর সম্ভব পৃথক্‌-বাস বাঞ্ছনীয় মনে করি ; তাহাও এইজন্য যে, পূর্ব্ববঙ্গে এই দুই সমাজের বসতি-বৈষম্য বড় বেশি—এ ভূমি মুখ্যত মুসলমানের বাসভূমি হইয়াই আছে। যদি কোনরূপে এই বসতি-বৈষম্য দূর করিতে পারা যায়, তাহা হইলে, একদিন এক শাসন-ব্যবস্থার ফলে, উভয় সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিষয়ে ন্যায্য অধিকার লাভ, এবং তাহা ভোগ করা, দুইই সম্ভব হইতে পারিবে। অন্তত, ধর্ম্ম ও সমাজ লইয়া বিবাদের সম্ভাবনা কমিবে ; এবং এখনই শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যবিধান সুসাধ্য হইয়া উঠিবে।

আমি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালী-সমাজের কথা বলিতেছিলাম—এবং তাহারই প্রসঙ্গে, পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর অবস্থা-সঙ্কটের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গও তো মৃতপ্রায়—ভাগীরথীর দুই কূল বিদেশী বণিকরাজের কল ও কুলীরাজ্যে পরিণত হইয়াছে, ভদ্র বাঙালীর বাস উঠিয়াছে। তাহারও বাহিরে—হিন্দুর সেই পল্লীসমাজ আর জীবিত নাই ; গ্রামের পর গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইয়া, ভগ্ন ইমারতের ইষ্টকস্তূপ ও জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়াছে ; মাঝে মাঝে দুই-একটি গ্রাম হয়তো কোন কারণে এখনও বসতিহীন হয় নাই ; কিন্তু অধিকাংশই জনহীন, এমন কি কৃষকহীন হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, ধর্ম্মিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ মানুষ সেখানে আর বাস করে না—সমাজবন্ধন

একেবার ভাঙিয়া গিয়াছে। সমাজের যাহারা ভিত্তিস্বরূপ সেই কৃষি ও শিল্প-জীবী বৈশ্যসমাজ লোপ পাইয়াছে—সমাজ নাই, সমাজপতিও নাই; যাহারা আছে তাহারা সেই পূর্ব্বসমাজের কঙ্কাল মাত্র—নড়িবার শক্তি নাই বলিয়াই পড়িয়া আছে। পশ্চিমবঙ্গের যে স্থানগুলি মুখ্য ছিল, তাহাদের অবস্থা এই। অর্থাৎ, হিন্দু-বাঙালীর বাস্তু-সমস্যা এখানেও আর এক রূপে ভয়াবহ। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরাই বা আবশ্যক হইলে, পশ্চিমবঙ্গের কোথায় আশ্রয় লইবে? তথাপি, উপায় মানুষের হাতে, চাই বুদ্ধি ও সাহস, চাই সংঘবদ্ধতা ও ঈর্ষাবর্জ্জন—সমগ্র জাতির শুভানুধ্যান। আজ হিন্দু-বাঙালীর মহাপরীক্ষার দিন উপস্থিত—ফাঁকি দিয়া, উচ্চভাবের ভণ্ডামি করিয়া, পৃথকভাবে আত্মস্বার্থ সাধন, অথবা দল কিংবা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া—জেলাগত কিংবা বিভাগীয় মনোভাব (local patriotism) রক্ষা করিয়া আজ আর বাঙালী বাঁচিতে পারিবে না। এ সত্য সকলেই স্বীকার করিবেন—ইহা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু মনে নয়—প্রাণে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং কেবল মুখে নয়, অন্তরের অন্তরে যদি শুচি হইতে পারি, তবেই আমরা বাঙালী ও হিন্দু হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিব; নতুবা প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে আমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব—যাহারা বাঁচিবার কৌশল জানে, তাহারাই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিবে, এবং তাহাদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতিকে গ্রাস করিবে, কেবল উচ্চতর সংস্কৃতির জোরেই কোন জাতি জাতিহিসাবে বাঁচিয়া থাকে না।

* * *

কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, আজ কিছুতেই কোন একটা বিশেষ চিন্তার ধারা ধরিয়া চলিতে পারিতেছি না। সময় অল্প—কথা অনেক; তবু ভাবিতেছিলাম, একটা সাহিত্য-প্রসঙ্গকেই সাময়িক-

রূপে আলোচনার বিষয় করিব। কিন্তু ভিতর হইতে তেমন সাড়া পাইতেছি না। সাময়িক বলিতে বাহিরের যে ব্যাপার বুঝায়, তাহার আলোচনা নিরাপদ নয়, বোধ হয় লাভজনকও নয়। ভিতরের অবস্থা—আসন্ন বিনাশের আশঙ্কা বা মৃত্যুভয়। শাস্ত্রে বলে—মৃত্যু যখন চুলের মুঠি ধরিয়াছে, তখন ধর্ম্ম আচরণ করিবে; অতএব এক্ষণে ধর্ম্মাচরণই সাময়িক। আমরা সাহিত্যজীবী—আমাদের 'আচরণ' প্রায় সবটাই 'চিন্তা'। মৃত্যুভয় নিবারণ হয় যাহাতে, তাহাই চিন্তা করা আমাদের কর্ত্তব্য। কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুযুৎসু সেনার সম্মুখে ভগবান অর্জ্জুনকে যে ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা মুখ্যত আত্মজয়ের, অথবা মৃত্যুজয়ের 'উপদেশ' হইলেও, সেই উপদেশের ফাঁকে ফাঁকে 'তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত' বলিতে তিনি বিরত হন নাই। বড়ই অদ্ভুত কথা! মৃত্যুভয়-নিবারণ অর্থে আমরা বুঝি—মৃত্যুর পর পরলোকে সদ্গতিলাভের উপায় করা; সেইজন্যই তো আমরা এত কষ্ট করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাই; কেন না, বাঁচিয়া না থাকিলে সেইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব কেমন করিয়া? কিন্তু শ্রীভগবান বলিতেছেন, 'যুদ্ধ কর'—তাহার অর্থ, এখনই জীবলীলা শেষ কর। ভয়ানক কথা! অর্জ্জুন অবশ্য ভয় পান নাই, কারণ যুদ্ধ করাই তাঁহার ব্যবসায়; তবু সেই অর্জ্জুনকেও দেহের মমতা ত্যাগ করাইবার জন্য ভগবানকে কি পরিশ্রম না করিতে হইয়াছে! "বাসাংসি জীর্ণানি" হইতে আরম্ভ করিয়া "ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" পর্য্যন্ত প্রায় গলদ্ঘর্ম্ম ব্যাপার! সর্ব্বশেষে অবশ্য যেই জিজ্ঞাসা করিলেন—

> কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
> কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়। ১৮।৭২

অমনই অর্জ্জুনও কেমন চটপট উত্তর দিলেন!—

> নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
> স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব। ১৮।৭৩

আসল কথা, গীতা কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদরূপে মানুষকে যে অভয়বাণী শুনাইয়াছে—তাহা সাধারণ মৃত্যুভয়ের ঔষধ নয়; সে 'মরিবার' ভয় নয়, 'মারিবার' ভয়; অর্জ্জুনের ন্যায় বীর-পুরুষের জীবসংস্কারঘটিত কোন ভয় দূর করিবার জন্য নয়—তাঁহার আত্মিক মোহ—'অজ্ঞান'-সুলভ অনুকম্পা দূর করিবার জন্যই, শ্রীভগবান অর্জ্জুনের নিকটে জগৎ-রহস্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 'জীবন-বাদ' নয়, 'জীবন্মুক্তি'র তত্ত্ব ও তাহা উপলব্ধি করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের সমস্যা অর্জ্জুনের সমস্যা নয়; আমরা জীবনকে তেমন করিয়া অস্বীকার করিতে পারি না; আমরা বাঁচিতেই চাই। আমরা, "অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা"—এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে সুদৃঢ় বৈরাগ্য-শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া, সেই পরমপদের অন্বেষণ করিতেছি না—"যস্মিন্‌গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ"—যেখানে পৌছিলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। আমরা এ যুগের মানুষ, আমরা সম্পূর্ণ পৃথক জ্ঞান ও ভাবমার্গে শিক্ষিত, দীক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছি; এই মর্ত্ত্যলোক, এই সংসারই আমাদের কাম্যস্থান—জীবনযজ্ঞের বেদী; ইহাকে পরম দুঃখের 'আলয়' বুঝিয়া এখান হইতে চিরতরে প্রস্থান করিবার যে কামনা, এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভ করার যে পরমপুরুষার্থ তাহা আমাদিগকে, প্রাচীন বা মধ্যযুগের যোগী-পুরুষদের মত, শ্রদ্ধান্বিত করে না। ইহার কারণ কেবল ইহাই নহে যে—আমরা দেহসংস্কারযুক্ত সহজ-প্রবৃত্তিপরায়ণ জীব, আমরা ইন্দ্রিয়সুখলোলুপ স্বার্থমোহমুগ্ধ অধঃপতিত মানব। অন্য কারণ এই যে, এ যুগের, অর্থাৎ আধুনিক কালের মানব-সাধনা ভিন্নমুখী; এ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-কামনা—অন্যবিধ পুরুষার্থকে আমাদিগের আদর্শ পুরুষগণেরও বরণীয় করিয়াছে। আমরা এই জীবন ও জগৎকে একটা বড় মূল্য দিয়া থাকি। প্রবৃত্তিকে শোধন

করিয়া যে আত্মশুদ্ধির সাধনায় আমরা বিশ্বাস করি, তাহাতে প্রকৃতিকে উচ্ছেদ করিতে চাই না—ত্রৈগুণ্যের অতীত হইবার প্রয়োজন বোধ করি না। আমরা জীবনকেই ভোগ করিতে চাই—মানুষের মত, পুরুষের মত, সুখ ও দুঃখদায়ক মাত্রাস্পর্শ বা ইন্দ্রিয়ার্থ প্রভৃতিকে আমরা আত্মার অস্পৃশ্য করিতে চাই না; অর্থাৎ, আমরা আমাদের ব্যক্তি-সত্তার বিনাশ কামনা করি না। গীতায় এই সকল বিষয়েরই উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা ও সাবধানবাণী আছে; কিন্তু উহা যে-যুগের মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ঔষধ বা উপাদেয় পথ্য ছিল, আমরা সে যুগের মানুষ নহি। গীতায় 'জীবনবাদ' নাই—'মোক্ষবাদ' আছে। এইজন্যই বোধ হয়, গীতাধর্ম্ম যখন ভারতে প্রবল হইয়াছিল, তখন হইতেই, 'কর্ম্মসন্ন্যাস' সাধনার নামে শেষে অতিশয় দুর্ব্বল কাপুরুষোচিত বৈরাগ্য বা অস্বাস্থ্যসুলভ 'নৈষ্কর্ম্ম্য' এই জাতিকে জীবন-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে। গীতার ভাগবত-ধর্ম্ম—উপনিষদে আত্ম-তত্ত্ব ও হীনযানী বৌদ্ধদিগের অনাত্মবাদ—এই দুইয়ের মধ্যে যে রফা করিয়াছিল—প্রকৃতি ও পুরুষের উপরে একটি 'পুরুষোত্তম' স্থাপনা করিয়া বৈরাগ্যসাধনার মধ্যেই যে ভুক্তিপ্রেরণার উপায় করিয়াছিল—যাহাকে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির মহাসমন্বয় বলা হইয়া থাকে, এবং যাহা বোধ হয় আদি ভাগবত-ধর্ম্মরূপে সে যুগে একটা বড় উপকার করিয়াছিল,—যাহার প্রভাবে বৌদ্ধ-মত মহাযান-পন্থায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল,—তাহা শেষ পর্য্যন্ত 'সমন্বয়' রক্ষা করিতে পারে নাই; এক দিকে দারুণ সন্ন্যাস ও অপর দিকে দারুণতর বৈষ্ণবভক্তিরস এই দুই বিপরীত নিষ্ঠা প্রায় সকল ধার্ম্মিক পুরুষকে গ্রাস করিয়াছিল; যাহারা সাধারণ মানুষ—সেই সামাজিক গৃহস্থগণ এই দোটানার মধ্যে যে-জীবন যাপন করিয়াছে, তাহা একরূপ ভীতত্রস্ত, পুরুষকার-কুণ্ঠ জীবন—শাস্ত্র ও সংহিতাশাসিত ইহলোক-পীড়িত ও

পরলোক-প্রবঞ্চিত জীবন। গত সহস্র বৎসরের যে অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট ইতিহাস আমরা যেটুকু পাই, তাহাতে দেখি—আমাদের দেশের মানুষ মানুষ-হিসাবে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে; এক দিকে বিষয়-লালসা ও অপর দিকে পরলোকভীতি, এই দুইয়ের মধ্যে সাম্যরক্ষার প্রয়োজনে তাহারা সত্যভ্রষ্ট হইয়াছে; পাপ ও পুণ্যের দুইটি পৃথক খাতা খুলিয়া—হিসাব পৃথক রাখিয়া—পরম নিশ্চিন্ত মনে, অর্থাৎ, ঘোর তামসিক অবস্থায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। অতএব, গীতাই হউক বা পরবর্ত্তী আর যে-কোন ধর্ম্মমতই হউক—সকলই যে জাতির জীবন-সাধনার পক্ষে নিষ্ফল হইয়াছে, ইহা মানিতেই হইবে; সে দোষ প্রকৃতিপুঞ্জের উপরে চাপাইলে হইবে না; নূতন নূতন আখড়া খুলিয়া নূতন নূতন ভাষ্য-রচনা ও প্রচার করিয়া এই সত্যকে চাপা দেওয়া যাইবে না। যাহা ঘটিয়াছে তাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই ঘটিয়াছে। তাহার মূলে কার্য্য-কারণের কোনরূপ বিচ্যুতি নাই; কাল বা মানুষের ইতিহাসই এস্থলে সর্ব্বাগ্রে গণনীয়,—আখড়ার আখড়াই-বিচার নিতান্তই নিরর্থক।

আজ জগৎব্যাপী মহামন্বন্তরের মুখে দাঁড়াইয়া, এসকল কথার আবৃত্তি বা আলোচনা নিতান্তই নিষ্ফল। আজ মৃত্যুর বিরাট উদ্যত মুষ্টির আঘাত আমাদের রুদ্ধ জীবন-গৃহদ্বারে আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে—সকল মিথ্যা, সকল অসত্য, সকল সুখকর আত্মপ্রবঞ্চনা, ও দুঃখকর প্রাণধারণ-চেষ্টা—আত্মার সফল বা নিষ্ফল ভিক্ষা-চর্য্যা ঘুচিবার দিন আসিয়াছে। মৃত্যুকে রোধ করা যাইবে না; দুই খাতার হিসাব আজ মিলাইয়া 'বুঝ' দিবার লগ্ন আসিয়াছে। সেই লগ্নেও কি আমরা একবার

চোখ মেলিব না—ঘুমন্ত অবস্থাতেই কি এই এত মমতার দেহ ত্যাগ করিব ?

এই স্থানে, ঠিক এই লগ্নে, গীতার উপদেশ বড় কাজে লাগিবে—জীবনযাপন-বিধির যে তত্ত্ব গীতা প্রচার করিয়াছেন, তাহা যেমন সাধারণ মানুষের স্বভাব-অনুকূল নহে, তাহা অসাধারণের উপযোগী বলিয়াই নিষ্ফল হইয়াছে ; তেমনই, গীতায় মৃত্যু-সম্বন্ধীয় উপদেশ যে অসাধারণ স্থান-কাল ও ঘটনা উপলক্ষ্যে শ্রীভগবানের মুখে নিঃসৃত হইয়াছে—তাহা আজ আমাদের পক্ষেও বড় উপযোগী ; কারণ, আজ আমাদের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ অসাধারণ ; আমরা এক মহাকুরুক্ষেত্রে মহাকালের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি। এমন কি, অর্জ্জুনের মত দিব্যদৃষ্টি লাভ না করিয়াই, মহাকালের বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছি। আমরাও দেখিতেছি—

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনি পাল সঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ।
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
(১১-২৬।২৭)

আমরাও আর্ত্তস্বরে বলিতে পারি—

দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো!।

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস!।

—এখানে তো কোন তফাত নাই। অতএব, যদি উপদেশ লইতে হয়, তবে আজ গীতার উপদেশই একমাত্র উপদেশ। সে উপদেশ লইবার যোগ্যতা কি আমাদের আছে? আমরা কি অর্জ্জুনের ন্যায় সুস্থ, আমাদের কি সেই বাহুবল, সেই বীর্য্য আছে? না; কিন্তু, তথাপি আমরা মানুষ, আমাদের এই সুপ্ত মনুষ্যত্বেরই অন্তর্গহনে সেই বস্তু আছে, যাহা আজিকার এই ঘোর অন্ধকার আকাশের বজ্রানলস্পর্শে মুহূর্ত্তের জন্যও জাগিয়া উঠিতে পারে। সেই বস্তু সহজে জাগে না, আমাদের মত জীবনমৃত জাতির পক্ষে সে ঘটনা আরও অসম্ভব। কিন্তু ইহা তো আমাদের শক্তি নয়! জাগিবার শক্তি নয়, জাগাইবার শক্তিই তো আসল! আজ মহাকাল সেই শক্তি প্রয়োগ করিতেছে—তাই তুচ্ছ তৃণও আজ জ্বলিয়া উঠিতেছে। একদিন আমাদের কবি যে গাহিয়াছিলেন—

যে-পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ-যুগান্তের।

আজ তাহা সত্য হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, আজ গীতার উপদেশ আমাদের পক্ষেও অসাধ্য নহে। সেই উপদেশ কি? মৃত্যু যখন আসন্ন, এবং প্রায় নিশ্চিত—তখনও 'মামনুস্মর যুধ্যচ'। এই 'যুধ্যচ' অর্থে ইহাই নয় যে, সকলে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে ছুটিবে। শ্রীভগবানও অর্জ্জুনকে সেই কথাই বলিতেছেন না—কারণ, এই যুদ্ধ করিতে হইবে—'সর্ব্বেষু কালেষু'। অতএব এখানে 'মামনুস্মর' কথাটাই বড়। 'আমাকে অনুস্মরণ কর', ইহাই তো দুরূহ কাজ—ইহাই যুদ্ধ; কারণ তাহা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার ভয়, স্বার্থচিন্তা, মোহ ও প্রমাদকে বশে

রাখিতে হইবে, 'তাহার মত যুদ্ধ আর কি আছে? 'সর্ব্বেষু কালেষু' আমরা তাহা পারি না, এবং পারি নাই বটে, কিন্তু আজ? আজ তাহাই পারিতে হইবে—অন্তকালেও যদি তাহা করিতে পারি, তবে মৃত্যুভয় থাকিবে না। কারণ,—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ (৮-৫।৬)

ইহার বেশি বলিবার, বা আরও ব্যাখ্যা করিবার সময় নাই; বরং প্রত্যেকেই ইহার ব্যাখ্যা, নিজ নিজ অবস্থায়, আপন বুদ্ধিমত করিয়া লইবেন, ভগবদ্বাক্যের ব্যাখ্যা সেইরূপ করাই উচিত।

আজ এই ১৩৪৯ সালের আশ্বিন মাসে "শারদীয়া পূজার" বোধন-বেদীতলে বসিয়া, আমার এই অতি দুর্গত ও মোহাচ্ছন্ন জাতির কল্যাণ-কামনা করিয়া এই কয়টি কথামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই উদ্দেশে নিবেদন করিলাম—যিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বজীবের—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

চিত্রগুপ্ত

চিত্রগুপ্ত ওৎ পেতে ব'সে আছে,
মরিয়াও নাই নিস্তার তার কাছে;
অস্ত-অচলে ডুব দিল রাঙা রবি—
রাতের আঁধারে কেউ লাগে তার পাছে।
অরণ্যে ওঠে সোমপায়ীদের গান,
সোনার স্বদেশে পুড়িয়ে করে শ্মশান্
রবির কাহিনী—আলোকের জীব জানে
মাঝখানে পড়ে শনি হয় সাবধান।

ছিন্নমস্তা

ভৈরবী বেশে দেখিয়াছি তোরে,—আজি যে খড়্গহস্তা !
মহাবিদ্যার সর্ব্বনাশিনী তুই কি ছিন্নমস্তা ?
শিবের বক্ষ সবলে দলিয়া সেজেছিলি তুই কালী,
দেখেছি সে রূপ চিতার আলোকে, কপালিনী কঙ্কালী ;
ধূমে ধূমাবতী ধূসর ধরণী রাঙায়ে রক্তপাতে
আজি তোর দেখা, ছিন্নমস্তা, পাই এ প্রলয়-রাতে !

রুধিরসিন্ধু পার হয়ে যদি এলি ভারতের কূলে,
চেয়ে দেখ তোর ভোলানাথ ভয়ে চরণে পড়েছে ঢুলে !
বলির রক্তে কুলায় না আর, তাই কি ভয়ঙ্করী,
আপন মুণ্ড আপনি কাটিস নিজ হাতে খাঁড়া ধরি ?
কমলা কোথায় লুকালি তরাসে, তারারে কে আজি তারে ?
ভুবনেশ্বরী লুপ্ত সাগরে এ ঘোর অন্ধকারে !

ভুলে-ভরা এই ধরারে ডুবায়ে শোণিতসিন্ধুজলে
নূতন সৃষ্টি চাস কি করিতে ও রাঙা চরণতলে ?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

শ্যামাদাসের মৃত্যু

শ্যামাদাসবাবু রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন—মৃত্যু-রোগশয্যা। সে কথা তিনি জানেন। গভীর-চিন্তাশীল বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক তিনি, এ কথা তাঁহার কাছে অবিদিত ছিল না। লোলচর্মের আবরণীর অভ্যন্তরে কালজীর্ণ মধুশূন্য মধুচক্রের মত অসংখ্য কোটি কোষচক্র-গুলির স্বরূপ তাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ; তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি সেগুলির ক্রম-জীর্ণতা দীর্ঘকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। গভীর প্রশান্ত দৃষ্টিতে খোলা জানালার ভিতর দিয়া তিনি দেখিতেছিলেন, গাঢ় নীল আকাশ—অসীম রহস্যময় শূন্যমণ্ডল।

দুইটি জিনিসকে জানিবার জন্য ছিল তাঁহার অসীম আগ্রহ, অপরিমেয় কৌতূহল; তাঁহার সমস্ত জীবনটাই কাটিয়াছে সেই সাধনায়, কঠোর অক্লান্ত, ক্লৈব্যহীন সাধনা। জীবনরহস্য আর মরণরহস্য জানিবার সাধনায় সমস্ত জীবনটাই তাঁহার কাটিয়া গেল। আরম্ভ করিয়াছিলেন বাইশ বৎসর বয়সে, আজ তাঁহার বয়স সত্তর, কিন্তু—। শ্যামাদাসবাবুর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, জীবনরহস্য জানা হয় নাই, জানিবার আর সময়ও নাই। সেজন্য তাঁহার আক্ষেপ নাই, তাঁহার শিষ্য, শিষ্যের শিষ্য, তাহার শিষ্য, তাহাদের উপরই রহিল তাঁহার অসমাপ্ত সাধনা সমাপ্ত করিবার ভার। তিনি এখন নিজে ধীরে ধীরে এক গভীরতর রহস্যের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইতে চলিয়াছেন, দূরত্ব ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে।

পৃথিবীর স্বাদ গন্ধ ধ্বনি বর্ণ সমস্ত কিছুর উপর ক্রম-ঘনায়মান কুয়াশার মত একটা লুপ্তির রহস্য ঘনাইয়া আসিতেছে—ওই তার পদ-ধ্বনি। দেহের অভ্যন্তরে, কোষচক্রের অভ্যন্তরে জীবনীমধুর দ্রুত

আবর্ত্তন—প্রোটোপ্লাস্‌মকে তিনি জীবনীমধু বলেন—ক্রমশ গতিহীন স্থির হইয়া আসিতেছে,—ধাতুবহ্নি নিবিয়া যাইতেছে সে তিনি জানেন; কিন্তু তাহারও অতিরিক্ত কিছু জানিবার আগ্রহ তাঁহার।

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়িয়া গেল।

মাসখানেকের মধ্যেই সংসারে দুইটি মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছিল। তাঁহার ছোট ভাই দুর্গাদাস এবং তাঁহার নিজের স্ত্রী কৃষ্ণভামিনী মাসখানেক আড়াআড়ি মারা গিয়াছিলেন।

* * *

দুর্গাদাস ছিলেন উকিল, অল্প বয়সেই তিনি হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দুই ভাইকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিত, ইন্দ্র-চন্দ্রের মত দুই ভাই। কথাটা অতিরঞ্জন সন্দেহ নাই, কিন্তু দুই ভাইয়ের কৃতিত্ব সত্যই ছিল গৌরবের বস্তু। শ্যামাদাসবাবু নিজে বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি, মেডিকেল কলেজের বায়োলজির অধ্যাপক। একটা মামলা লইয়া দুর্গাদাস মফস্বলে গিয়াছিলেন, টাইফয়েডে আক্রান্ত হইয়া ফিরিলেন। মারা গেলেন বত্রিশ দিনের দিন, অজ্ঞান অবস্থায় চীৎকার করিতে করিতে তিনি মারা গেলেন। শ্যামাদাসবাবু অবিচলিত ধৈর্য্যে ভাইয়ের বিছানার পাশে বসিয়া ছিলেন, সব শেষ হইলে তিনি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখের হাসি হাসিলেন, বার বার—বার বার তিনি দুর্গাদাসকে বলিতেন, অন্তত জলটা গরম ক'রে খাবে।

দুর্গাদাস তাঁহার কথা উপেক্ষা করিতেন এমন নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল না বলিয়াই সতর্ক হইবার মত ব্যগ্রতা তাঁহার ছিল না; চাকরকে বলিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন। ফলে বৈজ্ঞানিক সত্য আপনাকে সপ্রমাণ করিল অতি নিষ্ঠুরভাবে; মেঘের আড়ালে অদৃশ্য

শত্রুবিমান-নিক্ষিপ্ত বোমার স্প্লিণ্টারের আঘাতে অসতর্ক পথচারীর মতই দুর্গাদাস মারা গেলেন।

কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যু ধ্রুব—এ কথা তিনি কল্পনা না করিলেও, আঘাত অনিবার্য্য এটা তিনি সেই সময়েই জানিয়াছিলেন। দুর্গাদাসের ব্যাধিটা টাইফয়েড—এ কথা অণুবীক্ষণের দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়িতেই শ্যামাদাস-বাবু বাড়ির প্রতিটি জনকে টি-এ-বি ভ্যাক্‌সিন ইন্‌জেক্‌শন লইতে বাধ্য করিলেন। বাধ্য করিতে পারিলেন না কৃষ্ণভামিনীকে। দুর্গাদাসের স্ত্রী পর্য্যন্ত ভাশুরের কথায় অবনত মুখে নীরবে হাতটি বাড়াইয়া দিলেন, কিন্তু কৃষ্ণভামিনী বলিলেন, আর জ্বালিও না বাপু, ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে জ্বর-যন্ত্রণা ভোগ করতে পারব না আমি।

শ্যামাদাসবাবু অনুরোধ করিলেন, অনুনয় করিলেন, অবশেষে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তবে মর।

হাসিয়া কৃষ্ণভামিনী বলিলেন, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তোমার আশীর্ব্বাদ সফল হোক। তোমাদের সকলের বালাই নিয়ে যেন যাই আমি। তা হ'লে আমার মত ভাগ্যিমানী কে?

ও রকম ভাগ্যিমানী হিন্দুর সংসারে ঘরে ঘরে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। হিসেব করতে হ'লে চিত্রগুপ্তের খাতা চাই। ইংরেজ আমলের আগে জন্মমৃত্যু রেজেষ্ট্রির নিয়ম ছিল না। যাক, এখন ইন্‌জেক্‌শন নেবে কি না?

না।

দুর্গাদাসবাবু মারা গেলেন, কৃষ্ণভামিনী বিছানায় শুইতে বাধ্য হইলেন।

শ্যামদাসবাবু বলিলেন, এইবার ওষুধ খাবে তো?

অসুখ করলে ওষুধ না খেলে চলবে কেন?

ইন্‌জেকৃশন?

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কৃষ্ণভামিনী হাসিলেন—সে এক বিচিত্র হাসি। বলিলেন, ডাক্তার কি বলছে? আমি বাঁচব না?

শ্যামাদাস বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ডাক্তারে তা বলতে পারে না।

কৃষ্ণভামিনী বলিলেন, ঠাকুরপো চ'লে গেলেন, আমার বাঁচবার জন্যে ইন্‌জেকৃশন নিতে লজ্জা হয়। কিন্তু মরণ যদি না হয়? তবে মিছি-মিছি রোগের ভোগ বাড়িয়ে তো কোন লাভ নেই। আমার কষ্টের কথা বলছি না, গোটা বাড়িটা কষ্ট পাবে। তোমার কষ্ট হবে। তখন ইন্‌জেকৃশনও দরকার হ'লে নিতে হবে বইকি। নেব।

তবে? তখন নিলেই তো হ'ত।

তুমি ব'কো না বাপু; ইন্‌জেকৃশন নিলেই নাকি অসুখ আমার হ'ত না! কপালের দুর্ভোগ যার যা থাকে, সে যাবে কোথায়?

কপাল? দুর্ভোগ?—হাসিয়া শ্যামদাস সে দিন বলিয়াছিলেন, সে তোমার নয়, আমার। অবশ্য মনে মনে বলিয়াছিলেন, প্রকাশ্যে বলিলে আর রক্ষা থাকিত না। জীর্ণ দেহে রোগশয্যায় শুইয়া দীর্ঘকাল পরেও শ্যামদাস সে কথা মনে করিয়া আজ হাসিলেন।

মুহূর্ত্ত পরে আবার তিনি হাসিলেন, সে হাসি অন্য হাসি।

দুর্ভোগ তাঁহারই বইকি?

জীবনে তাঁহার ও কৃষ্ণভামিনীর মিলনের মধ্যে বিরোধের সংস্থান অদ্ভুত। জীবন-পথে তাঁহাদের যাত্রা ঠিক একটি অন্তহীন সরলরেখার দুইপ্রান্ত অভিমুখে,—ক্লান্তিতে, বিশ্রামে, অবসাদে কখনও পাশাপাশি বসিবার সুযোগ মিলে নাই।

কৃষ্ণভামিনীর যাত্রা ছিল পাপ-পুণ্যের, ধর্ম্ম-অধর্ম্মের, মায়ামোহে

বিচিত্র মর্ত্যলোক পার হইয়া জন্মজন্মান্তরের পথে—পরলোকেরও পরপারে স্বর্গলোক অভিমুখে। তারও পরে আছে নাকি এক পরম আনন্দলোক।

শ্যামাদাসের যাত্রা বিপরীত মুখে। তাঁহার পৃথিবী—অত্যুত্তপ্ত ফুটন্ত ধাতবীয় এক পরিমণ্ডলের উপর বারিধিমণ্ডলবেষ্টিত কঠিন স্তরময়ী এই পৃথিবী; এই পৃথিবীর বুকে জীবজীবনের বিবর্ত্তন-পথে—এক কৌষিক দেহ হইতে বহু কৌষিক দেহে, উপাদান হইতে অবয়বের পথে, অবয়ব হইতে শক্তির পথে, শক্তি হইতে গতির পথে, শ্রীর পথে; চেতনা হইতে বোধের পথে, বোধ হইতে বাসনার পথে, ইচ্ছা হইতে মনের পথে; মন হইতে বুদ্ধির পথে, জ্ঞানের পথে, বিজ্ঞানের পথে তাঁহার যাত্রা।

কৃষ্ণভামিনী যখন পূজার আসনে বসিয়া ধ্যানস্তিমিত চিত্তে মনশ্চক্ষে দেখিতেন আকাশমণ্ডলের বুক চিরিয়া অদৃশ্যপথে নামিয়া আসিতেছে এক অপূর্ব্ব-গঠন জ্যোতির্ম্ময় রথ, সেই রথের মধ্যে জ্যোতির আকর তাঁহার ইষ্টদেবতা, তখন শ্যামদাসবাবু তাঁর লাইব্রেরি ঘরে বসিয়া রাশি রাশি বই লইয়া মনের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতেন সৌরমণ্ডলের শূন্য-লোকের মধ্যে এক বাষ্পলোক। বিভিন্ন বাষ্পের আলোড়ন সংমিশ্রণ সেখানে। পৃথিবীর বুক হইতে ক্রমশ উর্দ্ধে উঠিয়া চলিয়া যাইতেন আর এক মণ্ডলে—স্ট্র্যাটোস্‌ফিয়ারে।

এ কি? অকস্মাৎ সেদিন নজরে পড়িয়াছিল, দুইটা গিনিপিগ বাগানের পথে ছুটিয়া একটা ঝোপের দিকে পলাইতেছে। এ কি? ও দুইটা খাঁচা হইতে বাহির হইল কি করিয়া? বই ফেলিয়া চিন্তা ছাড়িয়া তাঁহার গবেষণাগারে আসিয়া শ্যামাদাস স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন—খাঁচার ভিতর বাটিতে দুধ, ভিজা ছোলা! কে দিল?

যে দিয়াছে, খাঁচা খুলিবার সময় তাহারই অসাবধানতাবশত ও দুইটা পলাইয়াছে। শ্যামাদাস বরাবরই অত্যন্ত কঠোরচিত্ত লোক। কঠিন ক্রোধে তিনি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কয়েকটা গিনিপিগকে অনাহারে রাখিয়া বিভিন্ন অবস্থায় তাহাদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত কোষচক্রগুলির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

গবেষণাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি চাকরটাকে ডাকিয়াছিলেন। শ্যামাদাসবাবুর মূর্ত্তি দেখিয়া সে শুকাইয়া গিয়াছিল, হাতজোড় করিয়া সভয়ে সে নিবেদন করিয়াছিল, সে কিছুই জানে না।

শ্যামাদাস অন্য কোন শাস্তি দেন নাই, তাহাকে তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, এক মাসের মাইনে তোমার বাকি আছে, সেও তুমি পাবে না।

লোকটা অনেক দিনের পুরানো চাকর, সে আবার কাকুতি করিয়া বলিয়াছিল, আমি কিছু জানি না হুজুর; তবে বড় বউমা—

কি?

আজ্ঞে, তিনি একবার চাবি নিয়েছিলেন ঘরের।

বড় বউ চাবি নিয়েছিল?

হ্যাঁ। আমিই নিয়েছিলাম চাবি। কৃষ্ণভামিনীর বয়স তখন সবে পঁচিশ কি ছাব্বিশ; কৃষ্ণভামিনী নির্ভয়ে আসিয়া ক্রুদ্ধ শ্যামাদাসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

জরাগ্রস্ত মৃত্যুসমীপবর্ত্তী শ্যামাদাসের চোখের উপর আজও সে মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। সদ্যস্নাতা কৃষ্ণভামিনীর চুল হইতে নখ পর্য্যন্ত সব মনে পড়িল। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী কৃষ্ণভামিনীর পরনে সেদিন ছিল লালপাড় শাড়ি। আয়ত চোখে নির্ভীক দৃষ্টিতে চাহিয়া আজও যেন তিনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

হ্যাঁ, আমিই নিয়েছিলাম চাবি।

তুমি?

হ্যাঁ। আমিই দুধ দিয়েছি, খাঁচা খুলতে দুটো পালিয়েও গিয়েছে।

তুমি? তুমি দুধ দিয়েছ?

হ্যাঁ, আমি। বার বারই তো বলছি।

শ্যামাদাস ক্রোধের উপর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন।

কৃষ্ণভামিনীকে নিত্য নিয়মিত তিনি বিজ্ঞান পড়াইতেন। বিবাহের পর হইতে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহার জীবনের সত্যকারের অর্থে কৃষ্ণাকে সঙ্গিনী করিয়া তুলিবার জন্য। অসীম আগ্রহ, কৌতূহল এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কৃষ্ণভামিনী তো সবই শুনিতেন। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্য দিয়া চক্ষুর অগোচর সৃষ্টিবৈচিত্র্য-রহস্য দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি দেখিয়া শ্যামাদাসের আনন্দের তৃপ্তির আর অন্ত থাকিত না। সেই কৃষ্ণভামিনী এই কাজ করিয়াছে! এ কথায় তাঁহার বিস্ময়ের আর অবধি থাকিত না।

কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিলেন, এমনই ক'রে অনাহারে তিলে তিলে দগ্ধে তুমি জীবগুলোকে মারবে, শুধু তাই নয়, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা চালাবে, ওদের কাটবে, সে পাপ আমি হতে দেব না—কিছুতেই না।

শ্যামাদাস আর আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই, বলিয়াছিলেন, বাজে ব'কো না কৃষ্ণা, সেন্টিমেণ্টাল ফুলের মত।

সেন্টিমেণ্টাল ফুল? কৃষ্ণভামিনীর আয়ত কালো চোখ দুইটা বিদ্যুৎস্ফুরিত রাত্রির মেঘের মত ঝকমক করিয়া উঠিয়াছিল।

শ্যামদাস এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আজও তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—জীর্ণ দেহ লইয়াও তিনি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

কে ডাকিল, বাবু!

চাকরটা ডাকিতেছিল, রুগ্ন শ্যামদাস বলিলেন, বাইরে যা, বাইরে যা তুই।

সেদিনও তিনি কৃষ্ণার মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া চাকরটাকেই সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছিলেন, যা যা, বাইরে যা তুই।

চাকরটা চলিয়া যাইবামাত্র কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিল,'জান, তোমার ওই পাপে আমার সংসার শূন্য হয়ে রইল। সন্তান থেকে ভগবান আমায় বঞ্চিত করলেন; আমাকে দিলেন না তিনি। পরমুহূর্ত্তেই বিদ্যুদ্দীর্ণ মেঘের বর্ষণের মত অনর্গল ধারায় কৃষ্ণভামিনীর চোখ হইতে জল ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

শ্যামদাস মাথা নীচু করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। এত বড় আঘাত তিনি জীবনে পান নাই। সেদিনের পূর্ব্বেও না, পরেও না। আপন গবেষণাগারে আসিয়া তিনি সেদিন অর্দ্ধেকটা দিন ক্রমাগত মাথা হেঁট করিয়া পায়চারি করিয়াছিলেন। কৃষ্ণভামিনীর অভিযোগের জন্য নয়; কৃষ্ণভামিনী নিজেই জানিতেন, তাঁহার বন্ধ্যাত্ব তাঁহার নিজের দেহাভ্যন্তরের কোন সূক্ষ্ম ত্রুটির জন্য; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল তিনি বার বার বহু প্রশ্ন করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন। শ্যামাদাসের ক্ষোভ দুঃখ তাঁহার দাম্পত্য-জীবনের ব্যর্থতার জন্য। কৃষ্ণভামিনীকে তিনি সহধর্ম্মিণী করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণভামিনী প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেন, সত্যকে অস্বীকার করিলেন। মর্ম্মান্তিক আক্ষেপে তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, সে কথাটি পর্য্যন্ত শ্যামাদাসের মনে পড়িল।

আজও তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মনে হইল, সেদিন বাকি গিনিপিগগুলাকে ছাড়িয়া দিলেই হয়তো ভাল হইত। সেদিনও সে কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল।

রুগ্ন শ্যামাদাসের স্তিমিতদীপ্তি হরিদ্রাভ নিষ্প্রভ চোখ দুইটি ক্ষীণ দীপ্তিতে মুহূর্ত্তের জন্য যেন জ্বলিয়া উঠিল। সেদিন মুখে তাঁহার এক ক্ষুরধার হাসি খেলিয়া গিয়াছিল। কতবার তিনি কৃষ্ণভামিনীকে বুঝাইয়াছিলেন জীবন-মৃত্যুর অবিরাম দ্বন্দ্বের কথা; জীবন-সৃষ্টির দিন হইতেই অহরহ নিরবধি সে দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে,—হয় জীবনের বিলুপ্তিতে তাহার সমাপ্তি হইবে, নয় মৃত্যুকে জয় করিয়া তাহাকে পঙ্গু করিয়া জীবন এ দ্বন্দ্বের মহাকাব্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ টানিবে।

গাঢ় নীল আকাশের দিকে চাহিয়া শ্যামাদাসের মনশ্চক্ষে সেই অনন্ত মহাদ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি ভাসিয়া উঠিল—অণুবীক্ষণের দিব্যদৃষ্টির মধ্য দিয়া দেখা ছবি। দেহের অভ্যন্তরে পেশী স্নায়ু অস্থির মধ্যে আপাদমস্তক কোষে অণুকোষে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী নিরবধি অবিরাম এক সংগ্রাম। জীবনীমধুরসে টলমল কোষচক্রগুলি মৃত্যুর আক্রমণে জীর্ণ হইয়া ধ্বংস হয়, জীবন আবার করে নূতন সৃষ্টি, জন্মলাভ করে নূতন কোষচক্র।

কল্পনা নয়, প্রত্যক্ষ করা সত্য। অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া কৃষ্ণভামিনী এ দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, শ্যামাদাস আপনার অন্তর উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার অনুভূতির রাজ্যে কৃষ্ণভামিনীকে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন, কৃষ্ণভামিনী তবু তাঁহার উপলব্ধ সত্যকে—সাধনার ফলকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, আকস্মিক জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য যেমন দুর্ব্বল জীবন গ্রহণ করিতে পারে না। কৃষ্ণভামিনী সেই দিন হইতেই তাঁহার কাছে মরিয়াছিলেন।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণভামিনী—যেন মৃত্যুরূপিণী হইয়া তাঁহাকে ক্ষয় করিয়া জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণভামিনীকে হার মানিতে হইয়াছে। শ্যামাদাস জীবনের একটা দিনও তাঁহার গবেষণায় ক্লান্ত হন নাই।

না, না। কৃষ্ণভামিনীও তাঁহার কাছে হার মানেন নাই—কোন দিন না। তিনিও যেমন তাঁহার গবেষণায় ক্ষান্ত হন নাই, কৃষ্ণভামিনীও তেমনই কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্য আপনার স্বতন্ত্র ধর্ম্মসাধনায় বিরত হন নাই।

মনে পড়িল—স্বতন্ত্র শয্যার কথা।

কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিলেন, বাড়ি এসে কাপড় যেমন ছাড় তুমি, তেমনই স্নানও করা উচিত।

কেন?

ল্যাবরেটারির ওইসব কাণ্ডের পরে তোমার স্নান করা উচিত নয়? নিজে তুমি অশুচি বোধ কর না?

না।

না নয়, তোমাকে স্নান করতে হবে।

সাবান দিয়ে হাত-পা আমি ধুয়ে থাকি। যতটুকু প্রয়োজন বোধ করি, তার অতিরিক্ত কিছু করব না আমি।

কৃষ্ণভামিনী আর তাঁহাকে কিছু বলেন নাই, কিন্তু সেই দিনই তাঁহার শয্যা রচনা করিয়াছিলেন খাট ছাড়িয়া মেঝের উপর, ঘরের বিপরীত প্রান্তে।

অথচ একটি দিনের জন্য তাঁহার পরিচর্য্যার ব্যবস্থায় এক বিন্দু ত্রুটি কৃষ্ণভামিনী হইতে দেন নাই। মুর্গীর ডিম, মাংস পর্য্যন্ত নিজের হাতে তিনি রান্না করিয়া দিতেন। তাহার পর ছিল কৃষ্ণভামিনীর স্নানের নিয়ম।

শ্যামদাস বিছানায় শুইয়া সদ্যস্নাতা কৃষ্ণভামিনীর দিকে চাহিয়া দেখিতেন; কৃষ্ণভামিনী নিস্পন্দ মূর্ত্তিতে ধ্যান করিতেন।

কৃষ্ণভামিনী তাঁহার কাছে হার মানেন নাই।

অকস্মাৎ রুগ্ন শ্যামাদাসের চোখের দৃষ্টি কেমন হইয়া উঠিল। জীবন-মৃত্যু জ্ঞান-বিজ্ঞান সব তিনি যেন ভুলিয়া গেলেন। মনে পড়িয়া গেল এক দিনের কথা। প্রদীপের মিটমিটে আলোর সম্মুখে কৃষ্ণভামিনী সেদিন এক অপরূপ রূপে অসামান্যা হইয়া উঠিয়াছিলেন। ম্লান আলোর সম্মুখে কৃষ্ণভামিনীকে দেখিয়া শ্যামাদাসের অকস্মাৎ মনে পড়িয়াছিল একটা লাইন—

"Oh she doth teach torches to burn bright !"

শ্যামাদাস বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। শীতের রাত্রি। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ খোলা জানালা দিয়া দেখা যাইতেছিল। বৈজ্ঞানিক শ্যামাদাসের শীত গ্রীষ্ম বারো মাস বিছানার পাশের জানালা খোলা থাকে। পাণ্ডুর চাঁদের মরা জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আবার তিনি চাহিয়াছিলেন কৃষ্ণভামিনীর দিকে। মনের মধ্যে আবার গুঞ্জন করিয়া উঠিয়াছিল—

"Arise, fair sun, and kill the envious moon,
Who is already pale and sick with grief
That thou her maid art far more fair then she."

কৃষ্ণভামিনীর পিঠের উপর এলানো একরাশ ভিজা চুল, ভ্রমরের সারির মত কোঁকড়ানো কালো চুল; মোমে-মাজা সাদা সুতার মত সিঁথি, মসৃণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছোট কপালটির মধ্যখানে সিঁদুরের টিপ, আধ-মুদিত ডাগর দুইটি চোখ;—সেদিনের কৃষ্ণভামিনী অসামান্যা।

শ্যামাদাস বিছানা হইতে নামিয়া আসিয়া কৃষ্ণভামিনীর পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কৃষ্ণভামিনী পদশব্দে বঙ্কিমদৃষ্টিতে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শুধু বলিয়াছিলেন, হুঁ। অর্থাৎ সরিয়া যাও।

না, শ্যামাদাস সেইখানেই বসিয়া পড়িয়াছিলেন। বাঁ হাতটা মাটির

উপর রাখিয়া ডান হাত তিনি প্রসারিত করিয়াই অকস্মাৎ চকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাঁ হাতে কোন কিছুর স্পর্শে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে একটা চকিত সঙ্কুচন-শিহরণ খেলিয়া গিয়াছিল। হাতের, বুকের, উরুদেশের পেশীগুলি অকস্মাৎ মুহূর্ত্তে সঙ্কুচিত হইয়া লাফাইয়া উঠিয়াছিল, মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে খেলিয়া গিয়াছিল, যেন বিদ্যুতের প্রবাহ। আপনাকে সংযত করিয়া শ্যামাদাস হাত তুলিয়া দেখিলেন, তাহার পর চাহিয়া দেখিয়াছিলেন মাটির দিকে। দেখিলেন, হাতের তালুতে আলপিনের মাথার মত এক বিন্দু স্থান সাদা, মাটির উপর ধূপকাঠির মাথার স্তিমিত অগ্নিবিন্দুটিও ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নিবিয়া গেল।

কৃষ্ণভামিনীও ব্যাপারটা দেখিয়াছিলেন, ধ্যানস্তিমিত মুখেই মৃদু হাসি তাঁহার ঠোঁটের উপর খেলিয়া গিয়াছিল।

শ্যামাদাসের মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনিও হাসিয়াছিলেন—ওই সাদা জায়গাটার ভিতরের কোষচক্রটা অগ্নিস্পর্শে মরিয়া গেল, তাহারই অনুভূতি।

আকস্মিক মৃত্যুর মধ্যে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা আছে। সেটা যেমন ক্ষণিক, তেমনই সেটা প্রচণ্ড।

গিলোটিনে অথবা বন্দুকের গুলিতে বা বজ্রাঘাতে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। ধীরে ধীরে তিনি উঠিয়া আসিয়া খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই চিন্তায় তাঁহার সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গিয়াছিল।

এই প্রচণ্ড মূর্ত্তি মৃত্যুর কিন্তু বিকৃত রূপ—অকস্মাৎ তপোভঙ্গে বহ্নি-স্ফুরিতনেত্র শিবের রূপের মত। তাহার স্বরূপ শান্ত, গতি ধীর; তিনি নিজে বেশ অনুভব করিতেছেন। লোলচর্ম্ম হাতখানি তুলিয়া তিনি আপনার চোখের সম্মুখে ধরিলেন। পরমুহূর্ত্তেই হাসিলেন। দৃষ্টি

অস্বচ্ছ, পরিপূর্ণ পরিষ্কার দৃষ্টির সম্মুখে আবরণ পড়িতে শুরু করিয়াছে। হাত দিয়া স্পর্শ করিয়াও কিছু বুঝা যাইবে না। স্পর্শানুভূতিও ক্ষীণ হইয়াছে; লোলচর্ম্মের অন্তরালে পেশীস্নায়ুর পরিবর্ত্তন হইতেছে মৃত্যুর স্পর্শে, পেশীস্নায়ুর মধ্যে কোষ-অণুকোষগুলি বোধ হয় মরণোন্মুখ। ক্রমে ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল অসাড় হইয়া পড়িবে, স্মৃতি বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া আসিবে, সদ্যোজাত শিশুর অস্ফুট অবসাদ-সুখের মত এক আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ বিলুপ্তিতে হইয়া যাইবে সমস্ত কিছুর অবসান।

দুর্গাদাস বড় চীৎকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুটা অনেকটা আকস্মিক; শেষের দিকে মস্তিষ্কের মধ্যে রোগ প্রবেশ করিয়াছিল। ক্ষুদ্র অন্ত্রপ্রদেশের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় নলযন্ত্রটি ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, গিলা-করা মসলিনের মত অতি সূক্ষ্ম কুঞ্চনে কুঞ্চিত শ্লৈষ্মিক ত্বকখানি জীর্ণ করিয়া দুষ্ট ক্ষত উদ্গার করিয়াছিল বিষবাষ্প; সেই বাষ্পাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে সে কি যন্ত্রণা—সে কি দুরন্ত বিকার! কিন্তু বড় মর্ম্মস্পর্শী প্রলাপ বকিয়াছিলেন দুর্গাদাস।

কে বাঁধলে? আমার বাক্স বিছানা কে বাঁধলে? আঃ—ছি-ছি-ছি! আমি যেতে পারব না বলছি। কি বিপদ দেখ দেখি!

কৃষ্ণভামিনীই চমকিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! কি বলছ?

রক্তচক্ষু মেলিয়া দুর্গাদাস তাঁহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চিনিয়া বলিয়াছিলেন, বউদি!

কি বলছ?

কিছু না।

ওই যে বাক্স বিছানা ব'লে কি বলছ?

শ্যামাদাস বিরক্ত হইয়া ধমক দিয়াছিলেন, কেন ওকে বিরক্ত করছ? ডিলিরিয়াম হয়েছে, দেখছ না ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওরা বলছে, আমায় যেতেই হবে। আমি পারব না বলছি। কিছুতেই শুনবে না। আঃ—ছি-ছি-ছি! আমি যাব না। যাব না।

মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্তও অস্ফুট গোঙানির মধ্যেও তিনি বলিয়াছিলেন, না, না, না। আঃ—ছি-ছি-ছি !

রোগ টাইফয়েড শুনিয়া দুর্গাদাস মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়াছিলেন, জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুর আশঙ্কার দ্বন্দ্ব—বিকারের প্রভাবে বিশৃঙ্খল মন এমনই ভাবেই প্রকাশ করিয়াছিল। বাঁচিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল দুর্গাদাসের।

কৃষ্ণভামিনী কি মরিতে চাহিয়াছিলেন? আজও সে প্রশ্নের মীমাংসা শ্যামাদাস করিতে পারেন নাই। মৃত কৃষ্ণভামিনীর মুখ মনে পড়িল—প্রশান্ত হাসিমুখ। কৃষ্ণভামিনীর শবদেহ দেখিয়া সেদিন শ্যামাদাসের বৈজ্ঞানিক তথ্য মনে পড়ে নাই; মনে পড়িয়াছিল রোমিও-জুলিয়েটের কয়েকটা লাইন—

"Death, that hath sucked the honey of thy breath
Hath had no power yet upon thy beauty—
Thou art not conquered"

কৃষ্ণভামিনীর মরণ তাঁহার কাছে আজও বিস্ময়। সংসার সম্পদ সুখ, এ সমস্ত পিছনে ফেলিয়া কেমন করিয়া এমন হাসিমুখে মৃত্যুর সঙ্গে মুখামুখি দাঁড়াইলেন তিনি? তাই তাঁহার আজও মনে হয়, গোপন অন্তরে বোধ করি কৃষ্ণভামিনী মরিতে চাহিতেন। তাঁহাকে হয়তো সে—। কিন্তু সে কথা শ্যামাদাস মনে মনেও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

রাত্রি বারোটায় কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যু হইয়াছিল। সন্ধ্যা হইতেই নাড়ী কাটিতেছিল ; ডাক্তার ইন্‌জেকৃশন দিলেন, শ্যামাদাস নিজে কৃষ্ণভামিনীর হাতখানি হাতে লইয়া বসিয়া ছিলেন। অনুভব করিতেছিলেন, আঙুলের অগ্রভাগগুলি ক্রমশ হিম হইয়া আসিতেছে।

কৃষ্ণভামিনী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, পারলে না? বাঁচাতে পারলে না?

বিবর্ণমুখে শ্যামাদাস বসিয়া ছিলেন, হাস্যমুখী কৃষ্ণার এ করুণ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নাই।

মরতে আমার ইচ্ছে ছিল না, তোমাকে রেখে বৈকুণ্ঠে গিয়েও তো আমার শান্তি নেই। কিন্তু কি করব বল?

এবার শ্যামাদাস আত্মসম্বরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, বেশি কথা ব'লো না। কি বাজে বকছ!

বাজে? হাসিয়া কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিলেন, না, বাজে নয়। আমি বুঝতে পারছি।

কেন? কি হয়েছে তোমার?

কি হবে আর? খুব ভাল লাগছে।

সে তো ভাল। ঘুমোও দেখি একটু।

না। তোমার সঙ্গে কথা ব'লে নিই। তোমার কাজ সেরে যেতে কত দেরি, তা তো জানি না। কতদিন তোমার সঙ্গে কথা বলতে পাব না!

শ্যামাদাস অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

না, তুমি এমন ক'রে থেকো না। তোমার মত জ্ঞানী লোক—ছি! আবার তো দেখা হবে দুজনে। নাও, তোমার পায়ের ধূলো নিয়ে আমার মাথায় দাও। সিঁদুর-কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দাও।

তারপর বলিয়াছিলেন, ছোট বউ কই, ছোট বউ? ডাক, তাকে ডাক।

সদ্যবিধবা দুর্গাদাসের স্ত্রী কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিয়াছিলেন, আমি তো যাচ্ছি ছোট বউ, ঠাকুরপো সেখানে আছেন, বল, আমায় ব'লে দে, তোর কি বলবার আছে ব'লে দে।

মৃত্যুর পঁচিশ মিনিট পূর্ব্বে বোধ হয় বিকার অথবা চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছিল।

অকস্মাৎ কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিলেন, ছোট বউ, ছোট বউ, স'রে দাঁড়া, দরজা থেকে স'রে দাঁড়া। আসতে দে।

বাহিরে কেহ ছিল না। শ্যামাদাস ডাকিয়াছিলেন, কৃষ্ণা! কৃষ্ণভামিনী!

ঠাকুর এসেছেন, ঠাকরুণ এসেছেন, মা এসেছেন, বাবা এসেছেন, ছোট বউকে দরজা থেকে স'রে দাঁড়াতে বল।

কি বলছ তুমি?

হাসিয়া কৃষ্ণভামিনী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, ভুল বকি নি আমি। আমিও আসব তোমাকে নিতে। দেখো তুমি, ঠিক আসব।

* * *

চিত্তবিভ্রম? হাঁ, চিত্তবিভ্রমই। চিত্তবিভ্রম, দৃষ্টিবিভ্রম।

বার বার আপনাকেই কয়দিন ধরিয়া শ্যামদাস ওই প্রশ্ন করিলেন, নিজেই ওই উত্তর দিলেন। চিত্তবিভ্রম ঘটে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ওটা একটা লক্ষণ। মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের দ্বন্দ্বে জীবনের ক্ষয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে বহু কোটি বৎসরের বিবর্ত্তন-পথে জীবনের সাধনার সঞ্চয় একে একে ক্ষয় হইয়া লয় হয়। একে একে চৈতন্য, বুদ্ধি, মন, ইচ্ছা, বোধশক্তি—সর্ব্ব অন্তর্লোক আচ্ছন্ন হইয়া আসে, বাহিরে শ্রীর উপরে পড়ে কালিমা,

শক্তির নিঃশেষে হয় ক্ষয়, পড়িয়া থাকে শুধু দেহ, অবয়ব তাহার মধ্যে পার্থিব উপাদান।

শ্যামাদাসের ঘুম আসিতেছিল।

একটা অতি ক্ষীণ সূক্ষ্ম কিছুর স্পর্শে মৃদু বেদনা অনুভব করিয়া তিনি জাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শীতের শেষরাত্রির কুয়াশাচ্ছন্ন চন্দ্রালোকের মধ্যে তাঁহার যেন ঘুম ভাঙিয়াছে। কিছুক্ষণ পর ভোর হইল। আলো ফুটিয়া উঠিতেছে। অস্পষ্ট শব্দ কানে আসিল। কোথায় দূরে কেহ কথা বলিতেছে।

কেমন আছেন?—দূর হইতে কে প্রশ্ন করিল।

চারিদিক চাহিয়া শ্যামাদাস দেখিলেন, পাশে দাঁড়াইয়া কেহ, ক্রমশ তাহাকে চিনিলেন, সে ডাক্তার। ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইল, ডাক্তারের হাতে ইন্‌জেক্টিং সিরিঞ্জ। ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, ইন্‌জেক্‌শন দেবেন?

ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছি।

বারোটা বাজতে কত দেরি?—বিচিত্র হাসি হাসিয়া শ্যামাদাস প্রশ্ন করিলেন।

ডাক্তার সে কথার উত্তর দিলেন না, বলিলেন, কোন কষ্ট হচ্ছে আপনার?

কষ্ট? না। তবে—

কি বলুন?

কিছু না।—শ্যামদাস চোখ বন্ধ করিলেন।

স্তিমিত আচ্ছন্ন একাগ্রতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন শ্যামাদাসবাবু। একটা অসীম শূন্যতা। শীতের সন্ধ্যা বোধ হয় হইয়া আসিল। অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বলিলেন, সূর্য্যাস্ত হয়ে গেছে? চাঁদ ওঠে নি?

আবার বলিলেন, আকাশে তারা ফুটেছে?

আবার কিছুক্ষণ পর বলিলেন, সে আসে নি? সে? সে?

বলিতে বলিতেই তিনি যেন নীরব হইয়া গেলেন। আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রিতের মত পড়িয়া রহিলেন। ঘণ্টাখানেক পর চোখ মেলিয়া চাহিলেন, এবার যেন তিনি অনেকটা আচ্ছন্নতাবিমুক্ত, চারিদিক চাহিয়া বলিলেন, ডাক্তার?

বলুন।—মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাক্তার উত্তর দিল।

আর দেরি নেই। কিন্তু—

বলুন।

কিন্তু সে কই? সে?

কে?

সে।—শ্যামদাস ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, বহুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া খোলা জানালার উজ্জ্বলতর আলোকাভাস অনুভব করিয়া বাহিরের পথে আকাশ অনুসন্ধান করিলেন, চারিদিকে শীতের রাত্রির কুয়াশা, চাঁদটাও যেন অস্তাচলশায়ী, কুয়াশার স্তর অবলম্বন করিয়া অন্ধকার আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অতি ক্ষীণ হতাশ কণ্ঠে শ্যামাদাস বলিলেন, সে—সে এল না? আসব বলেছিল, এল না?

ডাক্তার বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া রহিলেন, আর কোন প্রশ্ন করিলেন না, উত্তরও দিলেন না।

তা হ'লে—?

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

নাথিং মোর? আর নেই? সে আর নেই?

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মুহূর্তের জন্য চঞ্চল অধীর হইয়া উঠিলেন। শেষবারে একবার শুধু ডাকিলেন, মা!

স্থির দৃষ্টি, নিষ্পলক চোখ দুইটির চোখের পাতা ডাক্তার হাতের চাপ দিয়া নামাইয়া দিলেন। হাত দুইটি তুলিয়া দেখিলেন, দুই হাতের তালুতে দুই বিন্দু জল।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

খাদ্য-বিজ্ঞান

তর্কের চোটে আগুন ছুটিয়াছে, এমন সময় রামজয় খুড়ো ঠুকঠুক করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ললিত মাস্টার বলিল, তোরা এবার থাম বাপু, খুড়ো এসে গেছেন, মীমাংসা ক'রে দেবেন।

একজন তাড়াতাড়ি গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটা চেয়ার আনিয়া দিল। লাঠিটা চেয়ারের পিঠে আটকাইয়া দিয়া বসিতে বসিতে খুড়ো প্রশ্ন করিলেন, কথাটা কি? তামাক আনতে ব'লে দে শিবকালী।

শিবু বলিল, সে বলতে হবে না, তোমায় আসতে দেখেই ব'লে পাঠিয়েছি। কথাটা কিছু নয়, খাবারের সঙ্গে মনের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, মানুষের মেজাজটা তার আহারের অনুযায়ী হয় কি না—মানুষই হোক বা ইতর জীবই হোক, যেমন ধর—

খুড়ো বলিলেন, হয়, আবার হয়ও না, যেমন—

গোবিন্দ বলিল, ও রকম দু-তরফা রায় দিও না খুড়ো, ওইটি তোমার কেমন একটা রোগ।

খুড়ো বলিলেন, হয় না এইজন্যে বলছিলাম, তোরা যেমন লাগিয়েছিস দেখলাম, তাতে মনে হয়, সবাই এক-একটা বুনো মোষ জলখাবার ক'রে এসেছিস, কিন্তু তা তো করিস নি! হয় এইজন্যে বলছিলাম, যত দিন দাঁত ছিল, পাঁঠাটা-আসটা খেতাম, হাঁকডাক ছিল, সবাই তাঁবেতে থাকত। ডিস্পেপ্‌সিয়া ধরেছে, মুগের ডাল বরাদ্দ, তোদের খুড়ীর নাকঝামটার কাছে দাঁড়াতে না পেরে গুটি গুটি স'রে পড়তে হ'ল।

ললিত মাস্টার বলিল, ওদিকে খুড়ী আবার তোমার ভাগেরটাও টানছে কিনা—

ছেলের দল একটু মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

তামাক আসিল। খুড়ো হুঁকাটা একবার টানিয়া দেখিলেন, জল খানিকটা ফেলিয়া দিয়া আবার কলিকাটি সযত্নে বসাইয়া দুইটা টান দিয়া বলিলেন, খাবারের সঙ্গে মেজাজের সম্বন্ধ আছে বইকি, কে বলছিস নেই?

শিবু বলিল, আমি বলছিলাম। বেশ, তা হ'লে দুর্ব্বাসা মুনি কি খেতেন বল?

গোবিন্দ বলিল, ফল খেতেন। তাহার পর হাত নাড়িয়া মুখটা একটু বিকৃত করিয়া বলিল, কিন্তু আজকালকার তোমা হেন শৌখিন বাবুদের মত ফলের আসল জিনিসটুকু বাদ দিয়ে শুধু নরম নরম শাঁসটুকুই খেতেন না। যেটা খেতেন, সেটার মধ্যে ভাইটামিনটুকু ষোল আনা বজায় থাকত। বাজে ব'কো না।

শিবু আর তাহার তরফের দুই-একজন 'রেখে দে তোর ভাইটামিন' বলিয়া উগ্রতরভাবে আরম্ভ করিতে যাইতেছিল। খুড়ো বলিলেন, তোরা থাম, দেবতা-ঋষিদের আর এসব আসরে টেনে এনে কাজ নেই। কি খেলে ওঁদের ওপর কি রকম প্রভাব হ'ত, আমাদের মাথায় ঢুকবে না। রমা তাঁতীকে দেখেছিস তো, সন্ধ্যের সময় ছটাকখানেক ধেনো চড়িয়ে এসে কি কাণ্ডটাই করে চোপর রাত!...দেবতারা অষ্টপ্রহর অমৃত গিলছেন, বেদই বল, রামায়ণই বল, মহাভারতই বল, কোনখানে কাউকে একটা বেফাঁস বলতে দেখেছিস? ওঁদের ছেড়ে দিয়ে যাদের বুঝব তাদের কথা ধরা যাক। আহারের সঙ্গে শরীরের মনের আছে সম্বন্ধ; আজ-কালকার সায়েন্সও বলছে, আগেকার ইতিহাস-কিম্বদন্তীও বলছে। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার কথা জানিস সব?

শিবু গোঁজ হইয়া বসিয়া ছিল, বলিল, না, বাঙালীর ছেলে—কপালকুণ্ডলার কথা জেনে কাজ কি?

খুড়ো বলিলেন, শুমরের কথা নয়, কপালকুণ্ডলার তাবৎ ঘটনা কেউই জানে না। জানত এক বঙ্কিম, আর জানত বঙ্কিম যার কাছে শুনেছিল। বঙ্কিমও নেই, সেও নেই; এখন আর কেউ জানে না।

শিবু মুখটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি জান নাকি?

খুড়ো বলিলেন, আমার জানা আমার ছোটঠাকুদ্দার কাছে। তিনি অবশ্য খোদ সেই লোকের কাছে শুনেছিলেন, যে বঙ্কিমকে বলে। আমি এতদিন আমল দিই নি কথাটায়, ছোটদাদু বললে তো বললে, শুনে গেলাম। তারপর এই সেদিন কোথায় একটা কার চিঠিতেই হোক বা কোন বইয়েই হোক, দেখলাম, বঙ্কিমের যখন মেদিনীপুরে পোস্টিং, সেই সময় একজনের মুখে এক কাপালিকের গল্প সে শোনে, তাই থেকেই কপালকুণ্ডলার জন্ম। তখন মনে হ'ল, তবে তো ছোটদাদু কিছু খেলাপ বলে নি।

গোবিন্দ বলিল, তা বঙ্কিম কপালকুণ্ডলা লিখলে তো ওটুকু বাদ দিলে কেন? তুমি ঠিক একটি আজগুবি কিছু ছাড়বার যোগাড় করছ খুড়ো।

খুড়ো বলিলেন, যা পেয়েছিল, তার মধ্যে থেকে যেটুকু তার উপন্যাসের জন্যে দরকার, সেটুকু নিয়ে বাকিটুকু বাতিল ক'রে দিয়েছিল, রসিক লোক তো। গাছে আমায় পাকা আমটি দিলে, তাই ব'লে আমায় নির্ব্বিচারে আঁশ, আঁটি, খোসা সব পেটে পুরতে হবে?

শিবু গোবিন্দের পানে কটাক্ষ হানিয়া বলিল, ভাইটামিন আছে বলে?

গোবিন্দ মুখটি গোঁজ করিয়া লইল। খুড়ো তামাক টানিতে

লাগিলেন। ললিত মাস্টার বলিল, তা তোমার কপালকুণ্ডলার সেই অলিখিত অধ্যায়টা কি বলই না হয়, তুমি যে আবার দর বাড়াতে আরম্ভ করলে খুড়ো।

খুড়ো বলিলেন, সবই ওরা আজগুবি ব'লে উড়িয়ে দিতে চায় ব'লে খেলো হতে মন চায় না। অধ্যায়-টধ্যায় নয়, ওই যে বললাম, কপাল-কুণ্ডলার আসল ব্যাপারের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই, বঙ্কিমও তাই সে কথা তোলে নি। খাবারের সঙ্গে মনের সম্পর্কের কথাটা উঠল ব'লে আমার মনে প'ড়ে গেল পুরনো কথাটা, এ নিয়মের অত ভাল উদাহরণের কথা আমার আর জানা নেই কিনা। যে সময় কাপালিক-নবকুমারের দেখা হয়, কাপালিকের মনের অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ। তার আশ্রমে ভয়ানক একটা অনাচার ঢুকেছে, কাপালিক টের পেয়েছে এর ফল ভাল নয়, তার এত দিনের সাধনা ঠিক যখন সিদ্ধির মুখে, বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল। তার মনের অবস্থা ঠিক পাগলের মত। কিসে দোষটা কাটিয়ে উঠবে, তাড়াতাড়ি সেই ফিকিরে সে ছুটোছুটি করছে, এমন সময় নবকুমার এসে পড়ল হাতের কাছে। কাপালিক ভাবলে, যাক, বোধ হয় দেবী সদয় হলেন, যা খুঁজছিলাম পাওয়া গেল বোধ হয়। নবকুমারকে প্রশ্ন করলে, কস্তম্ জাত্যা? শাক্ত বৈষ্ণবো বা? অর্থাৎ তুমি জাতিতে শাক্ত না বৈষ্ণব? নবকুমার উত্তর করলে, শাক্তোঽহম্। তখন আদেশ হ'ল, অনুগচ্ছস্ব, অর্থাৎ পেছনে পেছনে এস। না যদি নবকুমার বলে কথাটা, অত কাণ্ড হয় না। গেরো আর কাকে বলে! দেখলে, লোকটা রক্তাম্বর-পরা কাপালিক; ভাবলে, শাক্ত কি আর শাক্তের অনিষ্ট করবে? এই পরিচয়ই দিই। ভেতরে যে এদিকে কি কাণ্ড হয়েছে, কাপালিক যে একটা আঁটো-সাঁটো নধরকান্তি শাক্তই খুঁজে বেড়াচ্ছে, তা তো আর জানত না বেচারী। বললে, শাক্তোঽহম্।...অনুগচ্ছস্ব...বেশ, চল।

শিবু বলিল, কপালকুণ্ডলায় তো এ ধরনের কথাবার্ত্তা নেই খুড়ো।

খুড়ো উত্তর করিলেন, কিন্তু হয়েছিল এই ধরনেরই কথাবার্ত্তা। সবটা শোন, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।...নবকুমার পেছনে পেছনে এসে দেখলে, যা ভেবেছিল তাই বটে, শ্মশানকালীর বেদী, পূজোর চারিদিকে বীরোপচার, আসনের পাশেই কারণপূর্ণ নরকপাল, সবই যা ভেবেছিল। তবে একটা ব্যাপার দেখে সে একেবারে হকচকিয়ে গেল। দেখলে, আসন থেকে অল্প একটু দূরে এক প্রায় বারো-তেরো হাতের বাঘ। কাপালিক বুঝেছিল, ভয় পেয়ে যাবে; বললে, নিঃশঙ্কো অনুসরস্ব। প্রথমটা ভয়ই পেয়েছিল—তুমিও পেতে, আমিও পেতাম, কিন্তু একটু কাছে আসতে ভয় গিয়ে তার জায়গায় ভয়ানক আশ্চর্য্য ভাব এসে পড়ল নবকুমারের মনে; বাঘই—জলজ্যান্ত, তেরো হাতের একটি চুল কম নয়; কিন্তু এ কি, সে চাউনিই বা কোথায়? সে গোঁফ-ফোলানোই বা কোথায়? সে গর্জ্জনই বা কোথায়? কাপালিক আসতে একবার চোখ তুলে চাইলে—সে চাউনি হরিণের চোখকেও হার মানায়; কুঁইকুঁই ক'রে দুবার আওয়াজ করলে—যেন কুকুরবাচ্চা মাই খাবার জন্যে ধাড়ীর পেছন নিয়েছে। তারপর আরও দু পা এগুতে যা দেখলে, তাতে তার যাও একটু বুদ্ধি ছিল লোপ পাবার দাখিল হ'ল। দেখলে, বাঘের মুখটি দুটি থাবার ওপর রাখা, আর একটি থাবায় একটা বেশ মোটা তুলসী-কাঠের মালা জড়ানো।

সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, খুড়ো! ললিত মাস্টার বলিল, আজকালকার কচি ছেলের কাছেও এমন গাঁজাখুরি বের করা চলে না খুড়ো।

খুড়ো বলিলেন, তা হ'লে থাক, করব না বের। একটু কাজও আছে আবার দরকারী।—বলিয়া লাঠিটা লইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেই

শিবু লাঠিটা ধরিয়া ফেলিল। বলিল, চা করতে বলেছি খুড়ো, তোমার নাম করা চা খেয়ে কে পাপের ভাগী হবে বল ?

খুড়ো বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতে লাগিলেন। আগ্রহে সবাই মরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কচি ছেলেরও অধম হইবার ভয়ে কেহ আর সেটা প্রকাশ করিবার সাহস করিতেছে না। অবশেষে গোবিন্দ বলিল, গাঁজাখুরি-টাজাখুরি বুঝি না, আমার আবার আধকপালে রোগ আছে, শেষ কর খুড়ো, যখন ফেঁদেছ ; ওষুধ-গেলা ক'রেও আমায় শুনতে হবে।

শিবু বলিল, না খুড়ো, তুমি বল, আমি মন্ত্রশক্তি বিশ্বাস করি, তা ছাড়া মন্ত্রশক্তি না থাক, উইল-পাওয়ার আছে, হিপ্‌নটিজ্‌ম আছে, মেস্‌মেরিজ্‌ম আছে—

অপর কে একজন বলিল, আর এ তো অ্যাফ্রিকার সোমালিল্যাণ্ডের জঙ্গলের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে ভারতের এক তপোবনের কথা—কাপালিকেরই হোক বা বৈষ্ণবেরই হোক, তাতে যায় আসে না।

শিবু একটু অধৈর্য্যভাবে খুড়োকে আগাইয়া দিল, দেখলে, থাবায় একটা মোটা তুলসী-কাঠের মালা জড়ানো। তারপরে ? গিয়ে নিশ্চয় থাবা ছুঁয়ে একটা প্রণাম করলে ?

চা আসিল। যে আনিয়াছিল, তাহারই হাতে হুঁকাটা দিয়া খুড়া চা-টা শেষ করিলেন, তাহার পর আবার গোঁফজোড়াটা মুছিয়া হুঁকাটি লইয়া বলিলেন, অথচ একটা দিন আগে পৌঁছুলে নবকুমার বাঘের চেহারা দেখত বিলকুল অন্য রকম। গর্জ্জনের চোটে আশ্রমের ত্রিসীমানায় মধ্যে আসে কার সাধ্যি ! অষ্টপ্রহর দৌড়োদৌড়ি, লাফালাফি ; এক্ষুনি এ জানোয়ারটাকে তাড়া ক'রে নিয়ে গেল তো, একটু পরেই একটা

অন্য জানোয়ার মেরে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে হাজির। দিন নেই, রাত্তির নেই, এক ভাব, আশ্রমে কান পাতবার জো নেই।

শিবু বলিল, আমি ভেবেছিলাম ওই রকম একটা কিছু। আফিঙের দলাটলা খাইয়েছিল তো কাপালিক? কিন্তু খুড়ো, আমাদের কথা হচ্ছিল খাবার নিয়ে, খাবার আর নেশার মধ্যে যে বিস্তর তফাত আছে, এটা—

খুড়ো বলিলেন, তোরা বাগড়া দিস নি বাপু পদে পদে, বাঘের অমন নিরীহ অবস্থা দেখেই ব'লে কাপালিকের ঘুম ছুটে গেছে কোন অনাচার-টনাচার হয়েছে ভেবে, সে আবার তার ওপর আফিং খাওয়াতে যাবে! সেসব কিছু নয়, কাপালিক যে বাঘের ধকলটা কেন সহ্য করত, আর বাঘ ও রকম মিইয়ে যেতে কেনই বা নার্ভাস হয়ে উঠল, সেটা জানতে হ'লে তন্ত্রবাদের গোড়ার কথাটা বোঝা দরকার। তোরা বুঝিস না সুঝিস না, তান্ত্রিক দেখলেই মুখ ফেরাস, মনে করিস, সব পঞ্চমকার আঁকড়ে ব'সে আছে। আসলে কিন্তু তা নয়, পঞ্চমকার ত্যাগ করবার জন্যেই ওদের সাধনা। ওদের কথা হচ্ছে—দুর্ব্বলতাকে পায়ে মাড়িয়ে শক্তিকে লাভ করতে হয়, দুর্ব্বলতাকে এড়িয়ে শক্তিকে লাভ করা চলে না। পায়ে মাড়াও, সেগুলো তোমার চরণের দাস হয়ে থাকবে। এড়িয়ে যাও, বাঘের পেছনে ফেউয়ের মত তোমার পিছু নিয়ে তোমায় উস্তম-কুস্তম ক'রে মারবে। মানুষের সবচেয়ে বড় রিপু, যা আদি রিপু, কারণ-বারি ইত্যাদি সব রকম আনুষঙ্গিক জুটিয়ে দেহ-মনকে সব রকমে সেই রিপুর অনুকূল ক'রে নিয়ে ওরা সেই রিপুর সামনাসামনি হয়, তারপর আদ্যাশক্তির পায়ে মনকে সমর্পণ ক'রে ওরা সেই রিপুকে, সঙ্গে সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গ সব রিপুগুলোকেই জয় করে। এই হ'ল তন্ত্রসাধনা, এই হ'ল আদ্যাশক্তির বেদীতে পশুবলি, এ বলি না পেলে তিনি ধরা দেন না। শুঁটকো শুঁটকো ছাগলগুলোকে প্রতিমার সামনে

ঝপাঝপ কোপ মেরে মদের চাট করলেই সে তন্ত্রসাধনা হ'ল, তা নয়। যাক; দুর্ব্বলতার কথা হচ্ছিল,—ছটা রিপুর ওপরেও আবার কতকগুলো দুর্ব্বলতা আছে মানুষের, একটা দুর্ব্বলতা হচ্ছে ভয়, দয়াও আবার একটা দুর্ব্বলতা। এটা ললিত মাস্টার বুঝবে, দয়া ক'রে যদি রোজ পিটতে পিটতে ছেলেগুলোকে বেঞ্চির নীচে গড়াগড়ি না দেওয়ায় তো বড় হয়ে—

ললিত মাস্টার বলিল, বাস্, একটু যদি কুটুস ক'রে কামড় দেবার সুবিধে পেলে তো—

খুড়ো বলিলেন, একটা উদাহরণ দিলে বোঝে ভাল। কি বলছিলাম, হ্যাঁ, ভয়ের কথা। ভয়ের যে এই উৎকট আয়োজন, একটা গোটা বেঙ্গল টাইগার আশ্রমটার মাঝে দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছে, সাধনার একটু ব্যতিক্রম হ'লেই ঘাড়টি মটকাবে, কাপালিকের পক্ষে ছিল এটাও একটা সাধনার অঙ্গ। বাঘের এই দাপটের মধ্যে মনকে ঠিক রেখে সাধনমার্গে সে আর এক ধাপ উঠে যেতে চাইছিল। এমন সময় ওই ব্যাপারটুকু হ'ল, ওতে বাল্মীকি ঋষি খুশি হতেন আর একটি বাঘ আশ্রমধর্ম্মে কন্‌ভার্টেড হ'ল মনে ক'রে; কিন্তু কাপালিক হ'ল না।

যেদিনকার কথা, সেদিন তিথিটা অমাবস্যা, তায় শনিবার, তন্ত্রশাস্ত্র-মতে একটা দুর্লভ যোগ। সন্ধ্যে থেকে আকাশ ঘেরে মেঘ ক'রে এসেছে, উপচার-টুপচার সব ঠিক ক'রে কাপালিক যখন আসনে বসল, অল্প অল্প ক'রে বেশ জোরে বর্ষা নামল। তোমাদের মত নিরীহ ভাল-মানুষদের পক্ষে যেমন পূর্ণিমা-রাত মলয়-হাওয়া, তান্ত্রিকদের পক্ষে সেই রকম অমাবস্যা, শনিবার, আর এই রকম দুর্য্যোগ—পেলে মেতে ওঠে একেবারে। তার ওপর আবার বছরের ওই সময়টা সোঁদরবনের কাপালিকদের একটা মরসুম। যত আনাড়ি সব দেশ-বিদেশ থেকে

সঙ্গমস্নান করতে আসে, একটু যদি দল ছেড়ে ছিটকে পড়ল তো নির্ঘাত ওদের কারুর না কারুর হাতে। কাপালিকের কপালে সেবার দুটো জুটে গেছল, পরে নবকুমার নিয়ে তিনটে। দিন তিনেক আগে একটাকে বলি দিয়েছিল। একটা জীয়নো আছে, চমৎকার যোগ, কাপালিক ঠিক করছে, আজ এটিকে উচ্ছুগ্গু করবে। আর এমন একটা রাত্তে দেবীর পায়ে উচ্ছুগ্গু করবার জিনিসও বটে। এই দীর্ঘ গৌরকান্তি চেহারা, সাত্ত্বিক মানুষ, শরীর থেকে পুণ্যের জ্যোতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে, শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান, আর অত তেজেও চক্ষু দুটি করুণায় ভরা। কাপালিক যখন ছলনা ক'রে নিয়ে এল, একটু চাঞ্চল্য নেই মনে। শুধু জিজ্ঞেস করলে, বামাচারী কৌলোঽসি? কাপালিক উত্তর দিলে, এবমেব।...অস্তু, শাস্ত্র বিচারং যাচ্ঞামি। তার মানে—বেশ, তর্কে আমায় পরাস্ত কর, তারপর তোমার যেমন অভিরুচি ক'রো, আপত্তি নেই। কথাটা সে রোখ দেখিয়ে বললে, তা নয়। সে যুগের ওটা রেওয়াজই ছিল,—বিদ্যের গুমর ছিল মানুষের; শাস্ত্র-বিচারে হারা মানেই মরা, তারপর তুমি যা কর। কাপালিক কোণঠাসা হয়ে চ'টে উঠল, বললে, অসার তর্ক আমার অস্ত্র নয়, আমার যা অস্ত্র তার পরিচয় তুমি যথাসময়েই পাবে, ততক্ষণ ধৈর্য্য ধ'রে থাক। ব'লে পিঠমোড়া ক'রে বাঁধতে যাবে, ব্রাহ্মণ শান্তভাবে হেসে বললে, আমায় বাঁধবার কোনই দরকার নেই। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, তৃণাদপি তুচ্ছ, আমার এই নশ্বর শরীরের দ্বারা তোমার দেবীর যদি সন্তোষ-বিধান হয় তো স্বচ্ছন্দেই এবং সানন্দেই তা অর্পণ করব। বন্ধন নিতান্ত কর, তাতেও রাজি আছি, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই; চল, তোমার পূজার পাশে, তোমার দেবীর বেদীমূলে আমি গিয়ে বসছি। এ যত ঠাণ্ডা করতে চায়, কাপালিক ততই গরম

হয়ে ওঠে—পূজোই বল, যাই বল, আসলে খুনের নেশায় রক্ত মাথায় উঠেছে তো। বললে, ব্রাহ্মণ, তুমি অতি প্রগল্‌ভ, তোমার পরিচয় দাও। ব্রাহ্মণ সেই রকম শান্তভাবেই বললে, কি করবে পরিচয় নিয়ে? মানুষ সৃষ্টির মধ্যে এতই নগণ্য যে, তার ঐহিক মর্য্যাদা আকাশচুম্বী হ'লেও সে তৃণের চেয়েও সুনীচ, আমি অমুক জায়গার মঠধারী, ভগবানের সামান্যর চেয়েও সামান্য যে সেবক. তার আমি দাসানুদাস। ও যত নীচু হচ্ছে, এ ততই যাচ্ছে খেপে, খানিকক্ষণ পরে বললে, ওসব ধাপ্পাবাজি চলবে না। তোমার দিকে আমার মন প'ড়ে থাকবে, আমি দেবীর চরণে মন বসাতে পারব না; অথবা যদি পারিই, দেবীর অনুগ্রহ হয়, তুমি আমার সেই সমাধিস্থ অবস্থার সুযোগ নিয়ে চম্পট দেবে;—অকৌলং নাতি বিশ্বসেৎ—যারা অতান্ত্রিক তাদের বেশি বিশ্বাস করা শাস্ত্রসম্মত নয়। তোমার ভীরু কাতর দৃষ্টিতে শক্তির পূজায় ব্যাঘাত হতে পারে, তাই তোমায় বদ্ধ অবস্থায় এইখানেই ফেলে রাখছি; রজনীর তৃতীয় যামে আজ দেবী বলিদান গ্রহণ করবেন, সেই সময় তোমায় নিয়ে যাব, মনকে তুমি প্রস্তুত ক'রে রাখ। কিঞ্চিৎ আহার্য্য চাও? মঠধারীর একটুও রাগ নেই, একটু দ্বেষ নেই, একটুও হিংসে নেই, বললে, তোমার দাসানুদাসের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে যদি দাও, আপত্তি নেই; আহার্য্যের আস্বাদনের জন্যে বলছি না, তোমায় আধার ক'রে গোবিন্দ যে করুণা বিতরণ করছেন, সেইটুকুর জন্যে বলছি, নিয়ে এস।

বলে—চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। কাপালিক ওসব কথায় কান দেবে কেন? ওর পক্ষে সবই তো ভেঁপোমি। তা ছাড়া পূজোর সময়ও হয়ে আসছিল, আর মেলা বাক্যব্যয় না ক'রে মঠধারীকে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে ফেললে, তারপর একটা বেশ বড় সরা ক'রে এক সরা ফল

কেটে সামনে রেখে বললে, চতুষ্পদের মত শুধু মুখের সাহায্যেই এগুলি ভক্ষণ করবে। আর একটা কথা, এই পুণ্য শক্তি-আশ্রমের প্রহরী এক ব্যাঘ্র। সে একটু কানন-বিহারে গেছে, এল ব'লে। সাবধান, পালাবার চেষ্টা ক'রো না। এস, বরং আরও দু-এক পাক ক'ষে দিই। মঠধারী বললে, অস্থি, মেদ, অন্ত্রের শত পাক দিয়ে শরীর আত্মাকে বেঁধে রাখতে পারে না, রজ্জুর শত পাক দিয়ে আপনি এই নশ্বর শরীরকে কতক্ষণ বেঁধে রাখবেন? কাপালিক রেগে কটমটিয়ে একবার মঠধারীর দিকে চাইলে। জিজ্ঞেস করলে, এ রহস্যের অর্থ? ঠিক এই সময় আশ্রম কাঁপিয়ে বাঘটা লাফিয়ে এসে পড়ল। কাপালিক কড়া চোখ মঠধারীর ওপর ফেলে বললে, সাবধান, আমি চললাম, ওই তোমার প্রহরী সমাগত।...শিবু, কলকেটাতে আর কিছু নেই, আর একবার সেজে দিয়ে যেতে বল।

শিবকালী বলিল, তুমি থেমো না খুড়ো, বাঘটাকে ঠিক জায়গায় এনে ফেলে—এও তোমার একটি রোগ। আমি অলরেডি আর একটা কলকে ভর্ত্তি করতে ইশারা ক'রে দিয়েছি, এল ব'লে।

খুড়ো বলিলেন, গোড়াতেই বলেছি, কাপালিক সে রাত্তিরে খুব তোড়জোড় ক'রে পূজোয় বসল। আসনেও বসল আর ওদিকে বৃষ্টিও নামল। সোঁদরবনের গভীর জঙ্গল, অমাবস্যার রাত, শনিবার, তায় আকাশে ওই রকম দুর্য্যোগ, তার ওপর দেবীর পূজোর সবচেয়ে বড় উপচার নরবলি। সিদ্ধি হাতের মুঠোর মধ্যে। কাপালিক প্রাণ ঢেলে দিলে পূজোর মধ্যে। যোগাযোগের মধ্যে যদি কিছু বাকি ছিল তো সেটা পুরো ক'রে দিলে বাঘটা। সে রাত্রে কি তার লম্ফঝম্ফ! কি গর্জ্জন! দুদিন আগে যে মানুষটাকে বলি দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে গিলে ম্যান-ইটার হয়ে গেছে কিনা, একটা নেশা চ'ড়ে গেছে মানুষের

জন্তে, একেবারে হন্তে হয়ে উঠেছে। তারপর এসে দেখে, আর একটা হাজির। বন তো সে তোলপাড় ক'রে ফেলতে লাগল।

এত সুযোগ, এদিকে কিন্তু এক কাণ্ড হচ্ছে, কাপালিক কোনমতেই পূজোতে মন বসাতে পারছে না। যতই চেষ্টা করছে, কারণের ওপর কারণ চড়িয়ে মনটাকে টেনে রাখতে চেষ্টা করছে, মনটা ততই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। রাত্রি তৃতীয় যাম যখন হয়ে গেছে, বলি দেবার সময়, কাপালিকের তখনও পূজোর গোড়ার অঙ্গগুলিই শেষ হয় নি। এমন বিঘ্ন হ'লে তান্ত্রিকদের যা হয়, সব বিভীষিকাগুলো—শনিবার, অমাবস্যা, দুর্য্যোগ, বাঘের গর্জ্জানি, ওদিকে বলিপ্রার্থী দেবীর সাঙ্গোপাঙ্গ সব ডাকিনী-যোগিনী কারণের নেশায় সব চতুর্গুণ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে তার মনশ্চক্ষুর সামনে। ভয়ে তার মন্ত্রে ভুল হয়ে যাচ্ছে, পদ্ধতিতে গোলমাল হচ্ছে, মাথা ক্রমেই যাচ্ছে গুলিয়ে, আর যতই গুলিয়ে যাচ্ছে, ততই সে সেটাকে এক্তিয়ারে আনবার জন্যে কারণের ওপর কারণ চাপাচ্ছে। এই করতে করতে এক সময় আর নিজেকে সামলাতে পারলে না, চরম নেশার উত্তেজনার পরই ঝিমিয়ে আসনে গড়িয়ে পড়ল।

যখন চোখ খুলল, তখন অনেকটা বেলা হয়েছে। প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলে না, কোথায় আছে, কি বৃত্তান্ত, কিছুই না। তারপর আস্তে আস্তে জ্ঞান হ'ল। পূজোর সরঞ্জাম যেমন তেমনই প'ড়ে আছে, শুধু কারণের পাত্র একেবারে শূন্য। আস্তে আস্তে রাত্তিরের সব কথা মনে ফিরে এল—মঠধারী, তার সঙ্গে তর্ক, পূজোয় বিঘ্ন, বাঘের অতিরিক্ত দৌরাত্ম্য। বাঘের কথা মনে হতেই তার খেয়াল হ'ল, কই, বাঘের শব্দ তো একেবারেই নেই! কাপালিক আসন ছেড়ে উঠে রাত্তিরে যেখানে মঠধারীকে বেঁধে ফেলে রেখেছিল, সেইখানে এল।

…চক্ষু চড়কগাছ—নো মঠধারী। কাকস্য পরিবেদনা! প্রথমটা ভাবলে, বাঘে সাবড়ে দিয়েছে। কিন্তু বাঘ তো তা করবে না। এর আগের বলি তিন দিন ওই বাঘের হেফাজতে ছিল, গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত দেয় নি; সেই থেকেই কাপালিক বুঝেছে, বাঘের মধ্যে রক্ষিকা-ডাকিনী কাজ করছে, সে দেবীর বলি চেনে। কিন্তু বাঘই বা কোথায়? খোঁজ, খোঁজ; শেষে পাওয়া গেল বাঘকে। আশ্রমের এক পাশ দিয়ে একটা কালো জলের সুঁতি ব'য়ে গেছে, তার ধারেই একটা তমালগাছ। সেই গাছের তলায় দুটি থাবার ওপর মুখ রেখে বাঘ চুপ ক'রে প'ড়ে আছে, ডান থাবায় একটি মোটা তুলসী-কাঠের মালা জড়ানো, পরম ভক্তিভরে জিব দিয়ে আস্তে আস্তে সেটা চাটছে। আর সেই যে ফলের সরাটা মঠধারীকে দেওয়া হয়েছিল, সেটা বাঘের বাঁ থাবার নীচে, কয়েকটা টুকরো ফল তখনও প'ড়ে রয়েছে সরায়। পুজো দিলে ফলে সন্দেশে যেমন সিঁদুর লেগে থাকে, সেই রকম সিঁদুরের দাগ ফলে সরায় লেগে রয়েছে।

কাপালিক একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বুঝলে, এ সেই কপটাচারী মঠধারী বাবাজীর কাজ। যখন সে বললে, বন্ধনের দ্বারা তার নশ্বর শরীরকে আবদ্ধ রাখা যাবে না, তখনই কাপালিকের সন্দেহ হয়েছিল—সে যাদুবিদ্যা জানে, তারই বলে সে নিজেকে মুক্ত করেছে, তারপর বাঘটাকে মন্ত্রপূত ফল খাইয়ে নিবীর্য্য ক'রে দিয়ে সটকে পড়েছে। কাপালিক বাঘটার সামনে এসে বললে, উত্তিষ্ঠ। আমাদের পোষা কুকুরে যেমন দু-একটা কথা বোঝে, বাঘটাও কাপালিকের সেই রকম দু-একটা কথা বুঝত, মেনেও চলত। এবারে কিন্তু 'উত্তিষ্ঠ' বলতে আরও নীচু হয়ে কুঁইকুঁই ক'রে পায়ের কাছে মুখ দিয়ে গড়িয়ে, ল্যাজ নেড়ে একশা ক'রে দিলে। কাপালিক ঘেন্নায় পিঠে দুটো লাথি বসিয়ে গেল মঠধারীর খোঁজে, মন্দিরে গিয়ে বলির খাঁড়াটা হাতে ক'রে নিয়ে এল।

তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলে সমস্ত দুপুর—দেবভাষায় যতটা গালাগাল দেওয়া চলে—ভণ্ড, কপটাচারী, কাপুরুষ, যদি কিছুমাত্র মর্য্যাদা জ্ঞান থাকে তো অবিলম্বে সম্মুখীন হবি, তুই সিংহকে কুক্কুরে পরিণত করেছিস, আর এক্ষণে তোকেও আমি কুক্কুরের মতই বধ করব।

কার আসতে ব'য়ে গেছে?

খুড়ো একটু বেদম হবার জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক, চুপ করিয়া হুঁকায় মন দিলেন।

শিবু বলিল, এও প্রায় তোমার সেই আফিং খাওয়ানোর মতনই হ'ল খুড়ো। ফল মন্ত্রপূত ক'রে খাওয়ালে বাঘ ভেড়া হয়ে গেল, এতে স্বাভাবিক খাবারের সঙ্গে স্বাভাবিক মনের সম্বন্ধ—

খুড়ো হুঁকায় একটা সুখটান দিয়া বলিলেন, শেষে একটেরেয় একটা খালের ধারে মঠধারীর সন্ধান পাওয়া গেল। সমস্ত জায়গাটা রক্তে মাখামাখি, আর গোটাকতক টাটকা হাড় এদিক ওদিক ছড়ানো রয়েছে। কাপালিক থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাঘটাকে আবার বাঘ ক'রে ফেলবার বিস্তর চেষ্টা করলে, তুকতাক, পুজো, মানসিক—উঁহুঃ, সে মঠধারী বৈষ্ণবের মাংস খেয়েছে—পঞ্চাশ বছরের একটা পাকা বৈষ্ণব, আর কখনও হিংসের দিকে যেতে পারে সে? আর সে লম্ফঝম্ফ দিতে পারে? আর সে উৎকট হুঙ্কার তার আসে?

অনেক ভেবে চিন্তে কাপালিক বেরুল একটা শাক্ত বলির খোঁজে। নবকুমারকে পেলে, পেয়েই জিজ্ঞাসা করলে, কস্তম্? শাক্ত বৈষ্ণবো বা? …আর একবার চা দিতে বল, গলা শানিয়ে তবে তোদের খুড়ীর দিকে এগুতে হবে।

খানিকক্ষণ চুপচাপের পর ললিত মাস্টার বলিল, খুড়ো, আজ তুমি চরম ক'রে দিলে বাবা, একেবারে মালা জপিয়ে পর্য্যন্ত ছাড়লে—

খুড়ো বিস্মিত হইয়া বলিলেন, বাঃ, তা আবার কখন বললাম? তোমরা যদি ধ'রে নাও—! ঘাড় মটকে খাবার সময় মালাটা কি ক'রে থাবায় জড়িয়ে গিয়ে থাকবে। অনেক সঙ্গতিপন্ন বৈষ্ণবেরা তখন আবার সোনার তার ক'রে মালা গাঁথত, ছিঁড়তে পায় নি। রক্ত লেগেছিল, চাটছিল। নাঃ, তোমাদের কাছে গল্প ক'রে সুখ নেই, নিজেই কালিদাস হব, আবার নিজেই মল্লিনাথ হতে হবে?

এর পর সরার সিঁদুর মাখানো ফলের কথাটা কেহ আর তুলিতে সাহস করিল না।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমরা

মস্ত মস্ত জায়গা যত ভরাট করা সহজ কত
মস্ত মস্ত লোকের মত হাত-পা যদি ছড়িয়ে থাকি;
কুঁড়ে-ঘরে আমরা থাকি সাড়ে তিন হাত জায়গা ঢাকি
যা জোটে সব সেথায় রাখি ভরাট করি জায়গা যত।
সেইটুকুতে দিলে নজর আমরা যদি দেখাই ওজর
লাথির চোটে ভাঙে পাঁজর মস্ত মস্ত লোকের লাথি।
মস্ত মস্ত লোকের লাথি দেশ জুড়ে হয় মাতামাতি
এবং দমে মোদের ছাতি, সে দিকে কেউ দেয় না নজর।
সাড়ে তিন হাত জায়গা নিয়ে অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে
মস্ত মস্ত জায়গা দিয়ে মস্ত মস্ত লোকের হাতে,
মস্ত মস্ত লোকের হাতে রেলে কলে কারখানাতে
জীবন দিয়ে দি শেষটাতে সাড়ে তিন হাত জায়গা নিয়ে।

আধুনিকা

মেয়েটি সত্যই আধুনিকা।
ভাব-ভঙ্গিতে চাল-চলনেই নয় কেবল,
মনে প্রাণেও।
পোশাক-পরিচ্ছদে পছন্দ করে না
বিদেশী নকলের সস্তা চাকচিক্য,
অপরের মনে ঈর্ষা উদ্রেক ক'রে
গয়না-কাপড় ঝকমকিয়ে বেড়ায় না কখনও,
যখন-তখন যেখানে-সেখানে
নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জাহির ক'রে
আসর জমাবার প্রবৃত্তিও নেই।
চাল দিয়ে কথা বলে না,
এমন কি
ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে যে সে
তা বোঝবার উপায় নেই,
ইংরেজী বুকনি মুখ দিয়ে বেরোয় না কখনও।
যেসব জিনিস থাকলে
অহঙ্কারে মটমট করা স্বাভাবিক,
সেসব জিনিস থাকা সত্ত্বেও
তার অহঙ্কার নেই।
বরং তার সঙ্কোচ হয়।
মনে হয়, এগুলো বাধা।
বিদ্যা, বুদ্ধি, রুচি, ঐশ্বর্য্য
চারটে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর যেন
আড়াল ক'রে রেখেছে তাকে,
বঞ্চিত করেছে আর পাঁচজনের সঙ্গ থেকে।
সত্যিই লজ্জা করে তার।

এই লজ্জা জিনিসটা তার মজ্জাগত
বাইরে প্রকাশ নেই।
আপাত দৃষ্টিতে তাকে নির্লজ্জ ব'লেই মনে হয়।
জিব কেটে
ঘাড় হেঁট ক'রে
মুচকি হেসে
লাল্ হয়ে
ঘোমটা টেনে
লজ্জা বস্তুটাকে নয়নলোভন দৃশ্য ক'রে তুলতে
আরও বেশি লজ্জা করে তার।
সুতরাং তার জীবন
নীরব এবং নিঃসঙ্গ।
বেশি কথা বলতে পারে না,
মিলতে পারে না কারো সঙ্গে প্রাণ খুলে।
তার সঙ্গে মেশবার সুযোগই দেয় না সে কাউকে।
দিলেও যে খুব বেশি লোক জুটত,
মনে হয় না তা।
কারণ যে জিনিসটি থাকলে
পুরুষরা মেয়েদের সঙ্গে মেশবার উৎসাহ পায়,
সে জিনিসটির অভাব আছে তার।
রূপসী নয়।
স্বাস্থ্যবতী অবশ্য।
কেরিজ, পায়োরিয়া, চশমা কিছু নেই,
নিখুঁত টিউব,
নীরোগ অ্যাপেন্ডিক্স,
মজবুত কব্জি,
পুষ্ট পেশী,
ফিট হয় না।
টেনিস খেলা

বাইক চড়া
ড্রাইভ করা
সমস্তই পারে অনায়াসে।
কিন্তু রূপ নেই,—
দুধে-আলতা রং
পটল-চেরা চোখ
তিল-ফুল নাসা
মেঘবরণ চুল
শুধু যে নেই তা নয়,
নেই ব'লে দুঃখও নেই ;
যৌবন আছে।
কিন্তু সে যৌবনকে
শাড়ি-কাঁচুলির কৌশলে উদ্রগ্র ক'রে
লোক-লোচনবর্ত্তী করবার প্রবৃত্তি
মোটেই নেই তার।
সুতরাং সে যৌবনও অপ্রকাশিত।
মাথায় চুল 'বব' ক'রে ছাঁটা
ঢিলে পাজামা পরার শখ আছে,
বাইক চড়ার সময় ব্রিচেস পরে,
হঠাৎ দেখলে পুরুষ ব'লেই ভ্রম হয়।
প্রণয়ী জোটে নি সুতরাং—
সাহস নয়, প্রেরণাও পায় নি অনেকে।

প্রণয়ী না জুটলেও
বিবাহার্থী জুটেছিল একাধিক।
কালো, সাদা,
বেঁটে, লম্বা,
সুরূপ, কুরূপ,
ফোঁপরা, শাঁসালো,

বিদ্বান, মূর্খ,
বোকা, বুদ্ধিমান,
নানা রকম।
ভাল চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখলে
প্রার্থী আসে যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে,
ঠিক তেমনি।
একমাত্র কন্যা সে
বিপত্নীক ধনী পিতার।
বিশাল বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী।
কিন্তু গোল বাধল।
এতগুলি ভদ্রসন্তানের
অরূপ-সাধনার অন্তরালে
যে সহজিয়া মনোভাব প্রচ্ছন্ন ছিল,
তা সহজেই প্রকট হয়ে পড়ল।
পিতা দেখলেন,
তাঁর কন্যাটিকে সকলেই চাইছেন
সহধর্ম্মিণী হিসাবে ততটা নয়,
তাঁর লোহার সিন্দুকের চাবি-হিসাবে যতটা।
পুত্রী দেখলেন,
স্বামী হিসেবে লোভনীয় নয় একজনও।
মোটা, রোগা, বোকা, চালিয়াত,
ন্যাকা, হাঁদা, ধূর্ত্ত, ধড়িবাজ,
উদ্ধত, মিনমিনে
নানা জাতীয় আবর্জ্জনা
টাকা-ঘূর্ণির টানে
নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে তার চতুর্দ্দিকে।
ভাল ছেলে জুটল না।
দেশে যে একেবারে ভাল ছেলে নেই তা নয়,
কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—

বিবাহ-ক্ষেত্রে অধিকাংশ ভাল ছেলেরা
কিংবা তাহার অভিভাবকেরা
বেশি মর্য্যাদা দেন
সেই ছুটো জিনিসকেই,
যা স্বকীয় সাধনায় অর্জ্জন করা অসম্ভব,
যা ভাগ্যবলে দৈবাৎ মেলে—
রূপ এবং বংশ-গৌরব।
স্বোপার্জ্জিত বিদ্যা অথবা অর্থ
লোভনীয় নয় মোটেই এঁদের কাছে।
সদ্বংশের সুন্দরী পাত্রী চান এঁরা।

বাবা মারা গেলেন হঠাৎ একদিন।
শোকে-তাপে
আত্মীয়-স্বজনদের অভ্যাগমে
শ্রাদ্ধ-ব্যাপারে
কাটল কিছুদিন।
আত্মীয়-স্বজনেরা চমকে গেলেন
শ্রাদ্ধের নূতনত্ব দেখে।
প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ করা কামরায়
এলেন বেদজ্ঞ পুরোহিত
কাশী থেকে ;
ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে এলেন
দ্বাদশজন ব্রাহ্মণও—
জাত-ব্রাহ্মণ নয়,
গুণ-ব্রাহ্মণ—
অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী।
তার মধ্যে ছিলেন
ছুইজন বৈদ্য এবং একজন কায়স্থও।
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা সহকারে

অভ্যর্থনা করলে সে গুণীদের,
শ্রাদ্ধান্তে দক্ষিণা দিলে
স্বর্ণমুদ্রা, পট্টবস্ত্র, মাল্য-চন্দন এবং গ্রন্থ।
স্থানীয় লোকেরাও বাদ গেলেন না,
আপামরভদ্র সবাই
যোগ দেবার সুযোগ পেলেন একদিন
বিরাট ভূরিভোজনের মহোৎসবে।

বছরখানেক কাটল।
কর্ত্তব্য বোধেই সম্ভবত
আত্মীয়-স্বজনেরা আর একবার এলেন,
চেষ্টা করলেন বিয়ের।
সে সংক্ষেপে বললে,
বিয়ে করব না আমি।
কেন?
রুচি নেই।
রুচিবিকার-সংশোধনে অসমর্থ ব'লে নয়,
লক্ষাধিক টাকার মালিক
বি. এ.-পাস এই মেয়েটা
তাঁদের শাসনসীমা-বর্ত্তিনী হতে
রাজি হ'ল না ব'লে
নিরস্ত হলেন তাঁরা।
আধুনিক শিক্ষাকে গাল পাড়তে পাড়তে
মুক্তকচ্ছ কম্পিতগুম্ফ হিতৈষীর দল
একে একে
অন্তর্দ্ধান করলেন আপন আপন বিবরে।

কাটল আরও বছর দুই।
অন্য কেউ হ'লে

এম. এ. দেবার চেষ্টা করত হয়তো,
নিতান্ত পক্ষে কিংবা
সময় কাটাবার জন্যেও অন্তত
শিক্ষয়িত্রীগিরি যোগাড় ক'রে নিত একটা।
এ কিন্তু করলে না কিছুই।
নোট-বই প'ড়ে
বাঁধা-ধরা নিয়মের পরীক্ষা পাস করাকে
চিরকালই সে
খোঁটায় বাঁধা গরুর
তৃণ-ভোজনের সঙ্গে উপমিত করেছে,
হাস্যকর নিয়মের খাঁচায় বন্দী হয়ে
মাস্টারি করার ছুতোয় তোতাগিরি করাটাও
চিরকাল অপছন্দ তার,
তাই ওসব করলে না কিছুই।
পড়া-শোনা অবশ্য বন্ধ রইল না।
তার 'মিণ্টো' বুক-কেসগুলোতে
ওয়ালনাট-টেবিলে
মেহগিনি-আলমারির তাকে তাকে
জমতে লাগল নানা বই নানা ধরনের।

কিন্তু—
হ্যাঁ,
স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল ক্রমশ
মস্ত বড় একটা 'কিন্তু'।
মন ভরে না কেবল বই প'ড়ে
উপন্যাস যত ভালই হোক,
ক্লান্তিকর শেষ পর্য্যন্ত।
উপন্যাস ছেড়ে ধরল ইতিহাস—
ভারতের, চীনের, জাপানের,

রোমের, গ্রীসের, জার্ম্মানীর, ইংলণ্ডের,
রাশিয়ার।
নাঃ,
মরা মানুষের মরা কাহিনী সব—
কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা
তাও অনিশ্চিত।
কিনলে সহজবোধ্য বিজ্ঞানের বই
কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজি, জুওলজি;
ভাল লাগল না।
কাণ্ট, হেগেল, এমার্সন,
রামায়ণ, মহাভারত, জাতক,
গীতা, উপনিষদ—
তাও বিস্বাদ।
পাঞ্চ, স্ট্র্যাণ্ড, নেচার,
লিটারারি ডিজেস্ট, প্যারেড,
ধর্ম্মতত্ত্ব, কাব্যতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব,
অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি
কিছুই ভাল লাগে না আর,
এমন কি
হার মানলেন
হ্যাভ্‌লক এলিস, বাৎস্যায়ন পর্য্যন্ত।

নানা রকম ক্যাটালগ ওলটাতে ওলটাতে একদিন
উদ্দীপ্ত হ'ল কল্পনা—
ফলে
হাজার কয়েক টাকা বেরিয়ে গেল।
ক্রোমিয়মের ডিনার-সেট,
অদ্ভুতাকৃতি চেয়ার টেবিল,
বাসন নানা রকম দামী চীনেমাটির,

নতুন মডেলের
কার, ক্যামেরা,
রেফ্রিজারেটার, রেডিও,
অভিনব খাঁচায়
অভিনব বর্ণের ক্যানারি এক ঝাঁক,
অভিজাত বংশের
অ্যাল্সেশিয়ান, স্প্যানিয়েল, পুড্ল।
কাটল কিছুদিন।
মনে হ'ল তারপর
কেন এসব? কার জন্য?
মনের ক্ষুধা তো মিটল না!

ছবি আঁকবার চেষ্টা করলে,
কিন্তু সার হ'ল সরঞ্জাম কেনাই।
তুলি, রং, কাগজ পেলেই হয় না শুধু,
প্রতিভা চাই।
ছবি হ'ল না।
ছেলেবেলায় একবার
কণ্ঠ এবং যন্ত্র-যোগে রীতিমত
প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল
সঙ্গীত-বিদ্যা আয়ত্ত করবার,
সফলকাম হয় নি।
সেদিক দিয়েও গেল না সুতরাং।

মনে হ'ল একদিন,
বাগান বানালে কেমন হয়?
ফুল নিয়ে কবিত্ব করার শখ
কোন দিনই তার ছিল না অবশ্য,
ফুল-চাঁদ-মলয়-মেঘ-মূলক কবি-বৃত্তিকে

প্রশ্রয় দেয় নি সে কোন দিনই।
আকাশের চাঁদ দেখে সে যতটা না মুগ্ধ হ'ত,
তার চেয়ে ঢের বেশি মুগ্ধ হ'ত
বৈদ্যুতিক টেবিল-বাতিটা দেখে।
কি উজ্জ্বল আলো তার,
গঠনে কি বর্ণ-বৈচিত্র্য—শোভা!
বেশি আবিষ্ট করত তার মনকে
সিনেমার দৃশ্য
প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়ে,
গহন বনের সৌন্দর্য্যের চেয়ে
বেশি অভিভূত করত
বিরাট ফ্যাক্টরির সৌন্দর্য্য।
সেকেলে কবিদের নকল ক'রে
যন্ত্রকে—
মানব-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে
দানব ব'লে উপহাস করতে
সঙ্কুচিত হ'ত সে।
মনে হ'ত
ওই জাতীয় উক্তির পেছনে লুকিয়ে আছে
পলায়নী মনোবৃত্তি,
অক্ষমতার শূন্য আস্ফালন।
তাই তার বাগানের শখ
মূর্ত্ত হ'ল
নানা রকম সারে, যন্ত্রে,
নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়।
ফুল ফুটল নানা রকম দেশী, বিদেশী,
ফসলও ফলল বহুবিধ
শাক-সবজি তরি-তরকারির,
বামন গাছ

অর্কিড,
সিজ্‌ন-ফ্লাওয়ার হরেক রকমের,
হরেক রকমের পরীক্ষা
গাছেদের বর্ণ-সঙ্করত্ব নিয়ে,
পরাগ-বিনিময়
কলম-তৈরি
বাকি রইল না কিছুই।
তবু কিন্তু মন ভরে না।
মনে হয় ক্ষুধিত আছি,
মনে হয় আসল জিনিস পাওয়া যায় নি,
যাবেও না কখনও বোধ হয়।
ক্ষতি কি হয়েছে তাতে?
মনকে জোর ক'রে বোঝাতে হয়,
সুখেই তো আছ;
জোর ক'রে মানতে হয়,
হ্যাঁ, সুখেই আছি।
কিন্তু ওই ছোট কুঁড়েঘরে
মালীর সদ্যোজাত শিশুটা যখন কেঁদে ওঠে,
তখন ঝন ঝন ঝনাৎ ক'রে
আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে
মনের সমস্ত তারগুলো যেন।
এ কি অত্যাচার!
মাতৃত্ব কামনা করি ব'লে
ধরা দিতেই হবে পুরুষের বাহুপাশে?
ফুলকে তো ধরা দিতে হয় না,
সমীরণের তরঙ্গে তরঙ্গে
পতঙ্গের পাখায় বাহির হয় সৃষ্টির বীজ।
মানুষ এখনও এত বর্ব্বর?

জলের কুঁজোটাকে বিয়ে না করলে
পিপাসার জল পাব না ?

নিঃশব্দে পাখা ঘুরছে।
নিঃশব্দে জ্বলছে সুদৃশ্য-ডোমে-ঢাকা বিদ্যুৎ-বাতিটা,
সামনের থাবা দুটোয় মুখ রেখে
নিঃশব্দে ব'সে আছে স্প্যানিয়েলটা,
সে পদ-চারণা ক'রে চলেছে নিঃশব্দে।
ভাবছে, অশোভন হবে কি
ডাক্তারের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করাটা ?

সব শুনে বললেন ডাক্তার,
বিয়ে করতে আপনার আপত্তি কেন ?
রুচি নেই।
রুচি বদলান।
বদলাবার ইচ্ছে নেই,
নিজের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করতে চাই না
একদিনের জন্যেও ;
কিন্তু ছেলে চাই,
উপায় নেই কোন ?
উপায় আছে বইকি,
টেস্ট টিউব বেবি—
বিজ্ঞানের যুগ এটা
সবই সম্ভব।

সম্ভব হ'লও।
প্রত্যক্ষ-ভাবে পুরুষ-সংস্রবে না এসেও
সন্তান-সম্ভবা হ'ল সে।

গভীর রাত্রে হঠাৎ একদিন
ঘুম ভেঙে গেল তার।
ম্যুরিলোর আঁকা
ইম্‌ম্যাকুলেট কন্‌সেপ্‌শন ছবিখানা
স্বপ্নে যেন দেখতে পেল স্পষ্ট সে।
অনন্ত আকাশের বুকে
দাঁড়িয়ে আছেন কুমারী জননী,
পদ-প্রান্তে সরু একফালি চাঁদ,
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে শিশুরা সব—
দেবশিশুরা
ভিড় ক'রে আছে চারিদিকে
কেউ স্পষ্ট, কেউ অস্পষ্ট।
মনে পড়ল কুন্তীর কথা
জবালার
সীতার
দ্রোণের,
মনে পড়ল ইসাডোরা ডান্‌কান—
টং ক'রে একটা বাজল।
অস্পষ্ট ঘর্ঘরধ্বনি ভেসে এল যেন কোথা থেকে—
বিমান-পোতে কে আসছে এত রাত্রে!

বার্ত্তা চাপা রইল না বেশিদিন।
যথানিয়মে
হিতৈষী আত্মীয়েরা এলেন অনাহূতভাবেই।
যথানিয়মেই
ফুসফুস-গুজগুজও হ'ল,
ধাত্রী-বিদ্যা-পারঙ্গম মহাপুরুষও একজন সম্ভব হলেন
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়।
টলল না কিন্তু সে;

বললে স্থিরকণ্ঠে,
পাপ করি নি কিছু,
নারীজীবনের চরম-সার্থকতা যে মাতৃত্বে
তাই অর্জ্জন করিতে যাচ্ছি
আধুনিক পদ্ধতিতে
অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের পরামর্শ নিয়ে
আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রেখে।
আপনারা আমাকে রেহাই দিন।

টাকা আছে প্রচুর,
রেহাই দিতে হ'ল সুতরাং।

দু মাস কাটল।
ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন একদিন,
চমকে গেলেন :
আর একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা
আগে লক্ষ্য করেন নি তিনি,
পেল্‌ভিস ভয়ানক ছোট
স্বাভাবিক প্রসব অসম্ভব।
অপরিণত শাবকটিকে ধ্বংস না করলে
মায়ের জীবন-সংশয়।
মুখ শুকিয়ে গেল তাঁর।
অন্য কোন উপায় নেই?
আছে—সিজারিয়ান সেকশন।

পেট কেটে ছেলে বার করা যেতে পারে,
কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা।
সে বিপদের সম্মুখীন হবে—
আত্মরক্ষা ও আত্মবিনোদনই আধুনিকতা নয়,
দুর্জ্জয়কে জয় করাবার সাহসই আধুনিকতা।

অবশেষে এল সেই দিন।
ঠিক করাই ছিল সব—
রবার-প্যাড দেওয়া অপারেশন-টেবিল,
আরও দুটো টেবিলে
তোয়ালে, ক্যাথিটার, কাঁচি, লোশন,
টাওয়েল, ফর্‌সেপ্‌স,—সারি সারি ওষুধ।
জল গরম করবার ইলেক্‌ট্রিক স্টোভ,
সদ্যোজাত শিশুর প্রথম স্নানের টব,
ইলেক্‌ট্রিক রেডিয়েটার একটা,
হাই-পাওয়ার বাল্‌ব চারটে,
ত্রুটি ছিল না কিছু।
ফোন করবার সঙ্গে সঙ্গেই
এসে পড়লেন ডাক্তারেরা
একজন সার্জন—দুজন সহকারী।
নার্স দুজন আগেই এসেছিল
প্রাক-অপারেশন ব্যবস্থা করবার জন্যে।
ডাক্তারদের সঙ্গে এল
গোটা চারেক বড় বড় ড্রাম,

কোনটাতে যন্ত্রপাতি
কোনটাতে ব্যাণ্ডেজ, গজ, তুলো
কোনটাতে ডাক্তারদের পোশাক
স্টেরিলাইজ্‌ড আধুনিক পদ্ধতিতে।
স্পাইনাল অ্যানিস্‌থিসিয়া দেওয়া হ'ল।
ডাক্তাররা হাত ধুলেন,
পরলেন তাঁদের অদ্ভুত অটোক্লেভ্‌ড পোশাক—
লম্বা গাউন পা পর্য্যন্ত,
নাক-মুখের আচ্ছাদন,
মাথায় টুপি,
হাতে রবারের দস্তানা।

চুপ ক'রে শুয়ে রইল সে মুখ বুজে,
মুখের একটি পেশীও বিচলিত হ'ল না।

জ্ব'লে উঠল নিঃশব্দে
চারটে হাজার-ক্যাণ্ডেল-পাওয়ারের বাতি।
একটা আর্‌গট ইন্‌জেক্‌শন দেবার পর
শুরু হ'ল অপারেশন।
করকর ক'রে ছুরি বসল পেটের চামড়ায়,
ইউটেরাস দেখা গেল একটু পরেই,
সেটাকে
ভল্‌সেলাস দিয়ে ধরলেন বাগিয়ে সহকারীরা,
ছুরি বসালেন তাতে সার্জন।

ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটল,
সার্জনের গাউনে এক পিচকিরি রং দিলে যেন কেউ।
কট কট কট—
আর্টারি ফরসেপ.স চেপে ধরল ছিন্ন শিরার মুখ
নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে কাজ চলতে লাগল।

বাইরেও তখন ফিনিক ফুটছিল জ্যোৎস্নার।
চন্দ্রমল্লিকার স্তবকে স্তবকে
রজনীগন্ধার গুচ্ছে গুচ্ছে
চামেলী-কুঞ্জে
যূথিকা-বনে
ঝিল্লির অশ্রান্ত একটানা সঙ্গীতে
জ্যোৎস্না-ধবল মেঘমালায়
মূর্ত্ত হয়ে উঠছিল সেই চিরন্তন সত্য—
সৃষ্টি কি সুন্দর!

সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনে
সচকিত হয়ে উঠল চতুর্দ্দিক।
সামাজিক, নৈতিক, শারীরিক
সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে
প্রবেশ করল আধুনিক জগতে
চির-পুরাতন চির-নূতন শিশু।

"বনফুল"

১৬

দিন দুই পরে বিকালবেলায় গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে গিয়া দেখিলাম, তিনি ও রাধানাথ বৈঠকখানায় গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। জুতার শব্দ শুনিতে পাইয়াই রাধানাথ হাঁকিয়া উঠিল, কে? জবাব না দিয়া দরজার সামনে উপস্থিত হইতেই গাঙুলী মশায় তাকাইয়া আমাকে দেখিয়া কহিলেন, ওঃ, তুমি! এস ভায়া। পাশে গিয়া বসিলাম। গাঙুলী মশায় প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, শুনেছ? ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি?

এস. ডি. ও. ব্যাটা আমাদের দরখাস্তটা নাকচ ক'রে দিয়েছে। উল্টে হুকুম দিয়েছে, সরোজিনী দেবীর—মানে ঐ মাগীর ওপর কেউ জোর-জবরদস্তি করে কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে। বিপদ দেখ দেখি! মাগী যে লোক ভাল নয়, জান তো। যদি জানতে পেরে থাকে সরকার থেকে এই হুকুম হয়েছে, তা হ'লে নিজেই কোন বিপদ বাধিয়ে আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবে।

রাধানাথ কহিল, যাকে বলছেন, সেই এখনই ব'লে দেবে গিয়ে। যা দহরম-মহরম, একদিন ওর বাড়ি না গেলে ভাত হজম হয় না।

চুপ করিয়া রহিলাম, প্রতিবাদ করিলেন গাঙুলী মশায়, পাগল নাকি! ও সে রকম লোক নয় হে রাধানাথ।

রাধানাথ রুক্ষকণ্ঠে কহিল, নয় তো দিনরাত আড্ডা দেয় কেন?

ভারী গলায় কহিলাম, তোমার মত দিনরাত আড্ডা দিয়ে বেড়ানো আমার কাজ নয়—

রাধানাথ মুখ ভেংচাইয়া কহিল, আড্ডা দিয়ে বেড়ানো আমারই কাজ নাকি? যাকে এতগুলো দোকান চালাতে হয়, তার যে কত সময়, তা সবাই জানে।

কহিলাম, বলে তো সবাই, বাউরীপাড়ায় সারারাত—

রাধানাথ গর্জন করিয়া উঠিল, দেখ মাস্টার, মুখ সামলে কথা বলবে বলছি।

কহিলাম, কেন ? বাউরীপাড়ায় রাত্রে আড্ডা দাও না ?

তোমাদের মত অধার্ম্মিক লোকেরাই ঐ কথা বলে। রাত দুটো পর্য্যন্ত খোল-করতালের শব্দ, কীর্ত্তনের শব্দ পাও না ? না, কালা হয়েছ ?

শুনতে তো পাই, তবে—

রাধানাথ তাহার মুখটা আমার মুখের সামনে আনিয়া কড়া গলায় কহিল, কি তবে ?

গাঙুলী মশায় কহিলেন, থাক থাক, বাজে কথায় ঝগড়া ক'রো না, মাগীটাকে কি ক'রে জব্দ করা যায়, একটা উপায় ঠিক কর দেখি।

রাধানাথ সরিয়া বসিয়া কহিল, উপায় বাতলালেই বা কি হবে ? ঘরের বিভীষণদের না তাড়ালে কিছু হবে না।

কহিলাম, তার মানে ?

মানে তো বুঝতেই পারছ। হয় ওদের ছাড়, না হয় আমাদের এখানে এসো না।

সাভিমানে গাঙুলী মশায়কে কহিলাম, আপনারও কি তাই মত ? গাঙুলী মশায় চুপ করিয়া রহিলেন। বলিলাম, বেশ, তা হ'লে আমি উঠি, আপনারা পরামর্শ করুন। উঠিবার উপক্রম করিতেই গাঙুলী মশায় হাতে ধরিয়া বসাইয়া কহিলেন, আরে ব'স না ভায়া। রাধানাথের আজ রাগ হয়েছে, ওর কথা ছেড়ে দাও।

কহিলাম, সব কথা ছেড়ে দিলে চলে না। ওর মাত্রাজ্ঞান বড় কম। সেদিন দেখুন না, থানাতে কি কাণ্ডটাই করলে! আপনাদের যে দরখাস্ত নাকচ হয়েছে, বলতে গেলে ওর দোষেই হয়েছে। আপনার মত তো বললেই পারত, পরে দোব, ও রকম ক'রে পালিয়ে যাবার কি দরকার ছিল ?

রাধানাথ তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, আমার অবস্থায় পড়লে সব অধমকেই পালাতে হ'ত। কি রকম পেটের অসুখ! ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করগে না!

গাঙুলী মশায় কহিলেন, এস. ডি. ও. সাহেব কিছু বলছিলেন নাকি ?

গম্ভীরভাবে কহিলাম, হ্যাঁ, ঐ ধরনের কথাই বলছিলেন। আর

সত্যি কথাই তো, সরকারের ওপর দরদ না দেখালে, সরকারই বা দরদ দেখাবেন কেন ?

গাঙ্গুলী মশায় চিন্তিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সত্যি। কথাটা উল্টাইবার জন্য রাধানাথ কহিল, বুড়ীটার কপালে অনেক দুঃখ আছে দেখছি, শুধু ইহকালে নয়, পরকালেও।

কহিলাম, ইহকালের দুঃখ তো তিনি স্বীকার করেন না দেখলাম।

মানে ?

নিজের মুখেই তো বললেন, খুব সুখে আছেন, কোথাও যেতে চান না।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, তাই নাকি ? এত দেখে শুনেও বুড়ীর জ্ঞান হচ্ছে না ?

রাধানাথ কহিল, বুড়ী কি দেখতে শুনতে পায় যে, বুঝবে ? ভাবছে, ভারী সুখে আছি, ওদিকে যে পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে মুসলমানীর হাতে জল খেয়ে।

প্রতিবাদ করিলাম, ও কি কথা! ভদ্রমহিলার নামে যা-তা ব'লো না রাধানাথদা।

রাধানাথ মুখ ভেংচাইয়া কহিল, ওঃ, দরদের সীমা নেই দেখছি যে! দারোগা সাহেবের সঙ্গে নটখটির কথা কে না জানে গাঁয়ে ? দিনরাত— আটটা বাজতে না বাজতে ওর বাড়িতে যাওয়া, রাত এগারোটা পর্য্যন্ত আড্ডা দেওয়া, গাঁয়ে কে না দেখেছে ? দারোগা সাহেবের স্ত্রী পর্য্যন্ত শুনেছে সেই কথা।

কহিলাম, তাই নাকি ?

রাধানাথ কহিল, শুনবে না ? বাউরী মেয়েগুলো ওদের বাড়িতে চাকরানীর কাজ করে, তারা সব শুনে বলেছে গিয়ে।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, দারোগাবাবুকে কিছু বলে নি ?

চোখ ডাগর করিয়া রাধানাথ কহিল, বলে নি. আবার! রাতদিন ঝগড়া কচকচি চলছে বাড়িতে। একটা কিছু কাণ্ড না হয়ে যায়। আমাদের হিন্দু স্ত্রী তো নয় যে, সব মুখ বুজে সহ্য করবে। দৃঢ়কণ্ঠে

কহিলাম, কিন্তু এ কথা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা। ধমকের স্বরে রাধানাথ কহিল, দেখ মাস্টার! বেশি চালাকি ক'রো না, সব জান তুমি।

সব জানি ব'লেই বলছি, সরোজিনী চতুর হতে পারে বটে, কিন্তু তার চরিত্রের কোন দোষ নেই।

গাঙ্গুলী মশায় ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে, তিনি আমার সহিত একমত নহেন। রাধানাথ, গাঙ্গুলী মশায়ের সমর্থনে উৎসাহিত হইয়া কহিল, চরিত্রের দোষ নেই! তাই একজনে শানছে না, আর একজনকে জুটিয়েছে! সকৌতুকে কহিলাম, সে আবার কে?

রাধানাথ নাক উঁচাইয়া কহিল, কেন? আজিজ সাহেব। সেও যে জুটেছে আজকাল। শেষে শুম্ভ-নিশুম্ভর লড়াই বেধে না যায়।

কহিলাম, আজিজ সাহেব একদিনই তো ওর বাড়িতে এসেছিল এস. ডি.ও. সাহেবের সঙ্গে। তাও নিজে আসে নি, এস. ডি.ও. সাহেব ধ'রে নিয়ে এসেছিলেন।

ঘাড় নাড়িয়া মুখ বিকৃত করিয়া রাধানাথ কহিল, আজ্ঞে না, তার পর-দিন তো এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, নেমন্তন্ন!

ঘাড় কাত করিয়া চোখ মুদ্রিতপ্রায় করিয়া রাধানাথ কহিল, আজ্ঞে হঁ্যা, নেমন্তন্ন। তোমাদের শ্রীল শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী শুম্ভ নিশুম্ভ দুজনকেই নেমন্তন্ন খাইয়েছিলেন। ঘাড় সোজা করিয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, তিনকড়ের দলের ছেলেরা বলে, শ্রীমতী সরোজিনী দেবী—

কটমট করিয়া তাকাইয়া কহিল, দেবী থেকে যেদিন বেগম সাহেবা বলবে, সবার চোখ ফুটবে সেদিন।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, কাল নাকি মাগীটা আজিজ সাহেবের বাড়ি পাল্কি ক'রে বেড়াতে গিয়েছিল।

রাধানাথ উপরে ও নীচে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হঁ্যা তো। আজিজ সাহেব পাল্কি পাঠিয়ে দিয়েছিল। শুধু মাগীই যায় নি, মন্টুর মেয়েটাও গিয়েছিল।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, যেটাকে তিনকড়ের ঘাড়ে চাপাচ্ছে?

রাধানাথ কহিল, হঁ্যা, আজিজ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে নাকি ধর্ম্ম-মা,

পাতানো হচ্ছে। হাসিয়া কহিল, ধর্ম্মনাশ হ'লেই যা হবে, তারই গোড়া-পত্তন আর কি। আর ওদিকে যিনি ধর্ম্ম-জামাই হবেন, তিনি যদি ধর্ম্ম-শাশুড়ীকে ধ'রে টানাটানি করেন, তখন বুঝবে মজাটা।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, কে ?

রাধানাথ কহিল, আজিজ সাহেবের ভাইপো, ঐ যে সেদিন সভায় এসেছিল। কি রকম চোয়াড়ে চেহারা দেখলেন ওর ? সব পারে ও। ওর সঙ্গেই আজিজ সাহেবের মেয়ের বিয়ের সব ঠিকঠাক যে।

গাঙুলী মশায় বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, আমরা বেঁচে থাকতেই গাঁয়ের এই অধঃপতন আরম্ভ হ'ল, আমরা ম'রে গেলে কি যে হবে, কে জানে !—বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

রাধানাথ সান্ত্বনার সুরে কহিল, কি করবেন, গাঁয়ের যে একতা নেই। না হ'লে দেখুন না, ওদের জব্দ করবার জন্যে একঘরে করা হ'ল তো গাঁয়ের ছোকরারা ওদের ধারে দাঁড়াল, মাস্টারের মত গণ্যি-মান্যি লোক, ওদের সাহায্য করতে লাগল। গাঁয়ে একতা থাকলে এক-ঘরে হয়েও মনু চক্রবর্ত্তী মেয়ের বিয়ে দিতে পারে, না ঐ মাগীটা চোখের সামনে যা-তা করতে সাহস করে ?

গাঙুলী মশায় চিন্তাকুল মুখে কহিলেন, সত্যি।

রাধানাথ সক্ষোভে বলিতে লাগিল, এই দেখুন না, আপনার কথা-মত তিনের দলের ছোঁড়াগুলোর বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে ওদের বাপ-জ্যেঠাদের বলতে গেলাম, তিনের বিয়েতে ছেলেগুলোকে খেতে মানা ক'রে দাও, না হ'লে সব একঘরে হতে হবে তা সবাই কি বললে জানেন ? বললে, ছেলেরা কোথায় কি করছে, তা সমাজের দেখবার দরকার কি ? বললাম, ছেলেগুলি তো কচি খোকা নয়, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, সামাজিকভাবে মনু চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে খেলে সামাজিক দণ্ড নিতে হবে।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, কি জবাব দিলে সব ?

জবাব দিলে, ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হবে, তখন তোমরাই এক-ঘরে হয়ে যাবে।

গাঙুলী মশায় মুখ কালো করিয়া আর একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

১৭

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় গাঙুলী মশায়ের বাড়ি গেলাম না। যাইতে ইচ্ছা করিল না। রাধানাথ নিশ্চয়ই এতক্ষণে জুটিয়াছে সেখানে, দেখিবামাত্র ঝগড়া শুরু করিবে। কাজেই, যে আধ-পাকা রাস্তাটি পুরা পাকা রাস্তা হইতে বাহির হইয়া আমাদের স্কুলের সামনে দিয়া রাঙামাটি পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। অচিরে গ্রাম ছাড়াইয়া বাহিরে আসিলাম। আসিতেই চোখে পড়িল, দুই পাশে সদ্য-কর্ষিত মাঠের শ্রেণী দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত; এই এক-টানা ধূসরতার মধ্যে মাঝে মাঝে সবুজের ছোপ, চাষারা ধানের চারা তৈয়ারি করিয়াছে; সামনের দিকে দূরে পাশাপাশি ছোট ছোট গ্রামগুলি—চাঁদাই, চপাই, মান্দারবুনি। চপাই গ্রামে আজিজ সাহেবের বাড়ি আমাদের গ্রাম হইতে তিন মাইল।

সন্ধ্যার পরেই ফিরিলাম। হাতল-হীন সোনার কাস্তের মত শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ পশ্চিম আকাশে উঠিয়াছে। তাহারই ম্লান আলোকে আকাশ, প্রান্তর, দূর দিগন্ত-রেখা, গ্রামান্তের সারি সারি বাঁশের ঝাড়, দীঘির পাড়ে তালগাছের শ্রেণী, রহস্যময় রূপ ধারণ করিয়াছে। দেখিয়া বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ মনে হইল, জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কৈশোরে ও যৌবন-প্রারম্ভে কত কর্ম্মহীন মধ্যাহ্নে ও নিদ্রাহীন নিশীথে কল্পনার তুলি দিয়া মনের পটে ভাবী জীবনের যে বিচিত্রবর্ণ ছবি আঁকিয়াছিলাম, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাহার বিন্দুমাত্র মিল হইল না; মানসী প্রিয়ার বদলে মাত্র স্ত্রী, উচ্চ রাজপদের বদলে মাস্টারি, দেশব্যাপী খ্যাতি ও সম্মানের বদলে একটি নেহাত পল্লীগ্রামে চাষাভুষাদের মধ্যে স্বল্প প্রতিপত্তি। তবু এই লইয়াই তো জীবনের অর্দ্ধেকটা কাটাইয়া দিলাম। প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে অসন্তোষের কাঁটা ফুটিত, ভাগ্য ও ভগবানের বিরুদ্ধে মনে বিদ্রোহ জাগিত; আজকাল মন অনেকটা পোষ মানিয়াছে, ডাইনে ও বামে বাড়ির

আঘাত খাইয়া খাইয়া নিরীহ শান্ত বলদের মত বাঁধা রাস্তা ধরিয়া চলিতে শিখিয়াছি। হঠাৎ সামনে কড়া ও চড়া কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, কে? থমকিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিলাম, দুইটা লোক আমার দিকে আসিতেছে। গ্রামের সীমানার মধ্যে ঢুকিয়াছি, কাজেই চোর-ডাকাত যে আক্রমণ করিবে, তাহার ভয় নাই; করিলেও সঙ্গে মূল্যবান কিছুই নাই, তাহা ছাড়া হাঁকাহাকি করিলে লোকজন আসিয়া পড়িবে। কাজেই সাহসের সহিত দাঁড়াইয়া রহিলাম। লোক দুইটা কাছাকাছি আসিতেই দুই চক্ষের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া তাহাদিগকে চিনিতে চেষ্টা করিলাম। সামনের লোকটা কাছে আসিয়াই কহিল, কে? মাস্টারবাবু? চিনিলাম, আজিজ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র সত্তর সাহেব। পরিধানে গাঢ় লাল ও নীল রঙের ঘর-কাটা লুঙ্গি, গায়ে রঙিন গেঞ্জি। আমাকে দর্শন-দান করিল কেন? হাত করিবার বিদ্যাটা এখনই প্রয়োগ করিতে শুরু করিবে নাকি?

জবাব দিলাম, হ্যাঁ।

সত্তর একেবারে গা ঘেঁষিয়া আসিয়া, দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া শিথিল কণ্ঠে কহিল, আপনাকে যে গরু-খোঁজা করছিলাম এতক্ষণ, কোথায় ছিলেন বলুন দেখি?—বলিয়া ঠিক মুখের সামনে মুখটা আনিয়া স্থির করিয়া দিল।

মুখ হইতে মদের তীব্র গন্ধ নাকে ঢুকিয়া পেটের ভিতরটা পাক দিয়া উঠিল। গলা হইতে হাত দুইটা ছাড়াইতে চেষ্টা করিয়া কহিলাম, বেড়াতে গিয়েছিলাম।

ডান হাত তুলিয়া লইয়া বাম হাত দিয়া গলাটা আরও ঘনভাবে সাপটাইয়া ধরিয়া সঙ্গী লোকটাকে সম্বোধন করিয়া টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিল, রে রমজান! আমার কথাই ঠিক তো? তুই বলছিলি কোথায় ফুর্তি করতে গেছে, এই সাঁঝ রেতে। তা আবার পারে? মাস্টারবাবু যে!—বলিয়া ঠোঁট দুইটায় চাড়া দিয়া হাসিবার ভঙ্গি করিল।

কহিলাম, ছেড়ে দিন, রাত হয়ে গেল, বাড়িতে কাজ আছে আমার।

শুনিয়া সত্তর হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন ভারী একটা রসিকতা করিয়া ফেলিয়াছি।

একটু পরেই হাসি থামাইয়া, ঘাড়টি ডাইনে বামে নাড়িয়া, চোখ দুইটাতে চাড়া দিয়া কহিল, আমারও তো কাজ আছে মাস্টারবাবু। না হ'লে এই সন্ধ্যে রেতে কেউ একটা মন্দ মাস্টারের কাছে আসে, অ্যাঁ?—বলিয়া আমার কাঁধের উপর ডান হাতটা আবার চাপাইয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া আবার পূর্ব্ববৎ হাসিবার ভঙ্গি করিল। হাত দুইটা একটু আলগা মনে হইতেই চট করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিলাম, কি কাজ আছে বলুন,, আমার সময় নেই।

সত্তর নিজের হাত দুইটা কোমরের দুই পাশে রাখিয়া বুক চিতাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কি বললে? সময় নেই? আমারও সময় নেই মাস্টারবাবু। কত ফুর্ত্তি মাঠে মারা যাচ্ছে বল দেখি, অ্যাঁ?

কহিলাম, তা হ'লে বাজে কথায় সময় নষ্ট না ক'রে কাজের কথাটা ব'লে ফেলুন।

সত্তর চোখ দুইটা একবার বুজিল, ঠোঁট দুইটায় একবার চাড়া দিল, তারপর কহিল, বলছি, কিন্তু এখানে নয়, আর একটু এগিয়ে চলুন।

লোকটার মতলব কি? কোন খুন-জখম করিবে নাকি? কিন্তু জ্ঞানত কোন অপরাধ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভীতকণ্ঠে কহিলাম, আবার এগিয়ে যাওয়া কেন? এইখানেই বলুন না।

সত্তর শিথিলকণ্ঠে টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিল, প্রাণের কথা কি যেখানে সেখানে বলা যায়, মাস্টারবাবু? একটু গোপনে বলতে হয়। সঙ্গের লোকটাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, এই বে রমজান, একটু আগিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখ না। কদমগাছের তলা হ'লে সবসে ভাল।—বলিয়া বেয়াড়া সুরে গাহিয়া উঠিল, কদম্বতলে বসিয়া বিরলে (বিন্দে) বলিব প্রাণেরই কথা।

কহিলাম, ও আবার কি হচ্ছে?

সত্তর কহিল, বুঝতে পারছ না মাস্টারবাবু? তোমাদের কেষ্ট বিন্দেদূতীকে বলছে, সখী গো! ঐ কদমগাছের তলায় ব'সে আমার প্রাণের কথা বলিগে চল। আমার কাঁধে থাবা মারিয়া কহিল, তুমি

বিন্দেদূতী। নিজের বুকে চাপড় মারিয়া কহিল, আমি কেষ্ট। ডান হাতটা তুলিয়া কহিল, আর তোমার—

বাধা দিয়া কহিলাম, বুঝেছি, কিন্তু আমি কোথাও যাব না, যা বলবার এখানেই বলুন।

সত্তর হাঁক দিল, রমজান! মাস্টার যায় না যে। আয় তো-চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে যাই।

রমজান কাছে আসিয়া আমার দিকে চোখ ঠারিয়া কহিল, চলুন না বাবু, কিছু ভয় নেই আপনার। কি বলবেন শুনেই চ'লে আসবেন।

পদব্রজে যাওয়াই শ্রেয় মনে করিলাম। সত্তর ও রমজান আমার পিছু পিছু আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটা সাঁকোর কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম, রাস্তার দুই পাশ ইট ও সিমেণ্ট দিয়া উঁচু করিয়া বাঁধানো। কহিলাম, এইখানে বসলে হয় না?

সত্তর কহিল, এখানে কদমগাছ কই?

কহিলাম, কদমগাছ নেই এ তল্লাটে।

সত্তর ধমকের সুরে কহিল, কে বললে নেই? রমজান!

রমজান কহিল, ঠিক বলেছেন উনি, এইখানেই বসুন।

তাই বসি, তা হ'লে তুই স'রে যা এখান থেকে। রমজান দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুইজনে পাশাপাশি বসিলাম। সত্তর কহিল, সেদিন সেই যে মেয়েটিকে দেখলাম, ও আপনার বোন, নয়?

কহিলাম, নিজের বোন নয়, এমনই 'দাদা' ব'লে ডাকে।

ও, পাতানো। তা হোক, চোখ মটকাইয়া কহিল, বেশ দেখতে, নয়? যেমন রঙের জৌলুস, তেমনই আঁটসাঁট বাঁধন, বয়সও কাঁচা। চুপ করিয়া রহিলাম। সত্তর ভ্রূ দুইটা কুঁচকাইয়া মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, তা মেয়েটার আজিজ সাহেবের সঙ্গে এত দহরম-মহরম কেন বল দেখি? সাদি করবে নাকি ওকে?

জবাব দিলাম, জানি না।

সত্তর কড়া গলায় কহিল, জান না? কিন্তু এই কথাটা জেনে রাখ, ওসব চলবে না। আমি জল-জীয়ন্ত বেঁচে থাকতে, আমার চোখের সামনে ঐ পঞ্চাশ বছরের বুড়ো যে ঐ বসরাই গোলাপকে

ছিঁড়ে নিয়ে গলায় পরবে, তা হবে না।—বলিতে বলিতে উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়া বুকে একসঙ্গে এক জোড়া কিল মারিয়া কহিল, বরং জান দোব, তবু যাকে প্রাণ চায়, তাকে পরের হাতে তুলে দিতে পারব না।—বলিয়া বাম হাত বুকে রাখিয়া, ডান হাতটা তুলিয়া, আমার দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমিও উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিলাম। করিতেই আমার দুই কাঁধে দুই হাতে চাপ দিয়া আমাকে বসাইয়া কহিল, যাচ্ছ কোথা? আরও কথা আছে আমার।—বলিয়া হাত দুইটা পিছনে ঝুলাইয়া ও যুক্ত করিয়া পায়চারি করিতে শুরু করিয়া দিল। আমি ভয়ে ভয়ে কহিলাম, আর কি বলবার আছে বলুন, রাত হয়ে গেল যে।

থমকিয়া দাঁড়াইয়া সত্তর কহিল, একটা কাজ করতে পার?

কহিলাম, কি?

সত্তর হাতছানি দিয়া ডাকিয়া কহিল, এখানে এস।

বসিয়া রহিলাম। কড়া গলায় ডাকিল, এস। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কহিল,কাছে এস। ভয়ে ভয়ে কাছে গেলাম। যাইতেই আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া সত্তর কহিতে লাগিল, মাস্টার! আমার প্রেয়সীর পাতানো দাদা, প্রাণের মাস্টার! আমার বুকের ভেতরটা জ্ব'লে যাচ্ছে মাস্টার, তাকে না দেখতে পেলে আমি বাঁচব না মাস্টার। —বলিয়া আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কি করিয়া এই মাতালের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব, তাহার উপায় সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। কহিলাম, ছেড়ে দিন উপায় বাতলে দিচ্ছি।

ছাড়িয়া দিয়া সত্তর কহিল, কি উপায় বল মাস্টার। আজই তাকে একটি বার দেখবার উপায় আমাকে বাতলে দাও। তুমি যত টাকা চাও, আমি দোব।

কহিলাম, দেখা তো আজ হবে না।

আঁতকাইয়া উঠিয়া সত্তর কহিল, দেখা হবে না? আর্তকণ্ঠে ডাক দিল, রমজান! রমজান কাছে আসিতেই কহিল, শুনছিস, কি বলছে

মাস্টার? বলছে, দেখা হবে না আজ। তা হ'লে আমি বাঁচব? রমজান ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বাঁচিবে না। সত্তর দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিল, তবে মাস্টার? হিন্দু মুসলমানের প্রাণের দুঃখ বোঝে না ব'লেই আমাদের এত রাগ তোমাদের ওপর, তাই এত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, এত মারামারি, বুঝলে? চুপ করিয়া রহিলাম। সত্তর বলিতে লাগিল, আমি মুসলমান কিনা, তাই আমার ওপর দরদ হচ্ছে না তোমার। সেদিন কোথাকার কে একটা হাকিমকে হিন্দু ব'লেই সরাসরি অন্দরে ঢুকিয়ে দিলে। এই একচোখোমি যতদিন না তোমাদের যাবে, ততদিন হিন্দু-মুসলমানে মিল হবে না।—বলিয়া চোখ বুজিয়া মাথাটা বার দুই নাড়িল, তারপরে চোখ খুলিয়া রাগত স্বরে কহিল, আজিজ সাহেবের বাড়ি পাঠিয়ে দাও, আর আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পারবে না? আমার এই চাঁছা-পোঁছা চেহারার চেয়ে ওর ভালুকের মত চেহারা তোমাদের পছন্দ হ'ল?

কহিলাম, দেখা হ'লে কি করবেন আপনি?

কি করব? খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, হাত ধ'রে আমার প্রাণের ব্যথা তাকে জানিয়ে আসব। (হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) এমনই ক'রে ব'সে, (আমার করতল চুম্বন করিয়া) এমনই ক'রে চুমু খেয়ে বলব, পিয়ারী! আমার প্রাণ, মান, ধন, সম্পত্তি, আমার চামড়ার কারবার পর্য্যন্ত, সব তোমার পায়ে সঁপে দিচ্ছি, তুমি আমার হও।—বলিয়া আমার মুখের দিকে ঢুলু-ঢুলু চোখে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ বুদ্ধি খেলিল, কহিলাম, উঠুন, আমি যা বলি শুনুন। ঐসব যদি ইচ্ছে থাকে তো আমাকে দিয়ে হবে না। মেয়েটি মনু চক্রবর্ত্তীর নিজের বোন, ওর কথা ও খুব শোনে, মরতে বললে মরে, বাঁচতে বললে বাঁচে, ওকে গিয়ে ধরুন। ওই সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সত্তর কহিল, মনু চক্রবর্ত্তী কে? আমি কহিলাম, ঐ যে ভদ্রলোক মেয়েটির পক্ষ থেকে সেদিন যুদ্ধের চাঁদা দিলে, আপ্যায়িত ক'রে সবাইকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল, বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে এল।

ভ্রূ নাচাইয়া সত্তর কহিল, তাই তো, আমার ওর কথা মনে পড়ে

নি। মিথ্যে একটা বাজে লোকের সঙ্গে সময় নষ্ট করলাম। কড়া গলায় কহিল, এতক্ষণ না ব'লে চুপ ক'রে ছিলে কেন? কেন মিথ্যে এতক্ষণ সময় নষ্ট করলে?—বলিয়া রুখিয়া আসিবার উপক্রম করিতেই রাস্তার মাঝখানে সরিয়া দাঁড়াইয়া রমজানের দিকে তাকাইলাম। সে কহিল, বাবুর বোধ হয় মনে পড়ে নি, ওকে ছেড়ে দিয়ে চক্রবর্ত্তীর ওখানেই চলুন। আমাকে কহিল, চক্রবর্ত্তীর বাড়ি আমাদের দেখিয়ে দেবেন চলুন।

সত্তর লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল। আমি ও রমজান পিছু পিছু যাইতে লাগিলাম। সত্তর কতকটা আগাইয়া যাইতেই রমজানকে কহিলাম, রমজান, কাজটা ভাল হচ্ছে কি?

রমজান কহিল, কি করব বাবু? এখন কি কিছু হুঁশ আছে, একদম পাগল। সারাদিন মদ গিলেছে আজ। কোন কথা বললে শুনবে না, উল্টে মারধর করতে আসবে।

কহিলাম, কিন্তু এটা ভদ্রলোকের বাড়ি তো। মামলা-মকদ্দমায় প'ড়ে যাবে শেষে।

রমজান ভীতভাবে কহিল, সত্যি, কি করব বলুন দেখি?

কহিলাম, ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি নিয়ে যাও।

রমজান হাঁক দিল, শুনছেন?

সত্তর থমকিয়া দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কি? পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া কহিল, তাড়াতাড়ি আয় না, পিছিয়ে পড়ছিস কেন?

রমজান কহিল, একবার শুনুন, কি বলছেন ইনি।

সত্তর কহিল, কি বলছে?

রমজান কহিল, বলছেন, চক্রবর্ত্তী আজ বাড়িতে নেই, আজিজ সাহেবের সঙ্গে জেলায় গেছে।

সত্তর রাস্তার উপরেই বসিয়া পড়িল। কাছে যাইতেই কহিল, আজ বুড়ো জেলায় গেছে, নয়?

রমজান ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

আমার দিকে তাকাইয়া সত্তর কহিল, চক্রবর্ত্তী যে ওর সঙ্গে গেছে, তা জানলে কি ক'রে?

কহিলাম, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

লাফাইয়া উঠিয়া তাড়িয়া আসিয়া কহিল, দেখেছ তো বল নি কেন, অ্যাঁ?

রমজান সামলাইয়া লইয়া কহিল, কি করবেন উনি, মনে ছিল না বোধ হয়।

টকটকে লাল চোখের তারা দুইটা চরকির মত ঘুরাইয়া, মুখ ভেংচাইয়া সত্তর ধমকের সুরে কহিল, মনে ছিল না! মনে থাকে না কেন? মাস্টারি কর কি ক'রে?

রমজান কহিল, তবে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? বাড়ি চলুন আজ। কাল চক্রবর্ত্তী ফিরলে ব্যবস্থা করা যাবে। আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, চ'লে যান আপনি।—বলিয়া চোখের ইঙ্গিত করিল। আমি দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিলাম এবং কতকটা রাস্তা আসিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, রমজান সত্তরকে পাকা রাস্তা হইতে নামাইয়া মাঠের দিকে ধরিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

দেহ ও মন দুইয়ের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হইয়া উঠিয়াছে। ডলাই-মলাইয়ের চোটে মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত পাকা ফোড়ার মত টনটন করিতেছে; কাঁধের কাছে জামাটা চোখের জলে ও মুখের লালায় ভিজিয়া গিয়াছে; সারা দেহে মদের তীব্র গন্ধ। বাড়িতে গিয়া গৃহিণীর কাছে কি কৈফিয়ৎ দিব, তাহা ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইতেছি না। তা ছাড়া ঐ পাষণ্ডটার উপরে রাগে ও ঘৃণায় মনের ভিতরটা জ্বালা করিতেছে। কি পাপিষ্ঠ বলুন দেখি! একজন ভদ্রমহিলার প্রতি পাশবিক মনোভাব একজন ভদ্রলোকের কাছে প্রকাশ করিতে তো বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয়ই নাই, তাহার উপর ঐ দুষ্কর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য তাহাকে টানাটানি, অপমান ও ভয়-প্রদর্শন! কি মনে করে ইহারা? হিন্দুর মেয়ের মান-মর্য্যাদা মাটির মূল্যে নামিয়া গিয়াছে নাকি? না, মা-বোন ও স্ত্রীদের সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা করিবার সামর্থ্য বাঙালী হিন্দু হারাইয়া ফেলিয়াছে? সরোজিনীর উপর রাগ হইল। কেন সে নিজেকে এত সুলভ করিতেছে? আজিজ সাহেবের বাড়ি যাইবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল? যাহাদের মন হইতে নারীদেহের প্রতি পশু-সুলভ নির্ব্বিচার লোভ শিক্ষা ও সংস্কৃতির জারক-রসে এখনও

নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই, তাহাদের সামনে দাঁড়াইবার তাহার কি প্রয়োজন? লেখাপড়া শিখিয়া আপ-টু-ডেট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া কি? যদি নিপীড়ন করে, ধর্ষণ করে, আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কি? তাহার পুরুষ আত্মীয় ও বন্ধুরা, মনু চক্রবর্ত্তী, তিনু ও তাহার দলবল তাহার মর্য্যাদাহানির প্রতিশোধ লইতে পারিবে কি? পারিবে না। সকলে দিন কয়েক হৈ-চৈ করিবে, বাহ্বাস্ফোট ও বাগাড়ম্বর করিবে, পুলিস ডাকিবে, সরকারের কাছে দরবার করিবে ও কান্নাকাটি করিবে। কিন্তু একজন অসভ্য, অশিক্ষিত সাঁওতাল পুরুষের মত নারীর প্রতি অপমান ও অত্যাচারের নিজের হাতে প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ছুটিবে না। আমি কি করিলাম? লেখাপড়া শিখিয়া সভ্য হইয়াছি, সুনাম রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া আছি, তাই ঐ পাষণ্ডটাকে সঙ্গে সঙ্গে চড় কষাইয়া দিয়া তাহার অন্যায় চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া ভয়ে ভয়ে পলাইয়া আসিলাম। শুধু আমারই কি এই অবস্থা? শিক্ষিত, সভ্য সমগ্র হিন্দু-সমাজের পুরুষদের এই অবস্থা। প্রতিদিন হিন্দুনারীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়া বা তাহার কাহিনী সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া আমরা ক্রোধে ও ক্ষোভে আগুন হইয়া উঠি। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। পরমুহূর্ত্তেই প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাসে অন্তর্বাষ্প বিমুক্ত করিয়া দিয়া সিগারেট ধরাইতে বসি অথবা কর্ম্মান্তরে বা প্রসঙ্গান্তরে প্রস্থান করি। আমাদের মধ্যে যাহারা 'আমরা তরুণ, আমরা সবুজ' বলিয়া আস্ফালন করে, পায়জামা ও হাত-কাটা হাফ-কোট পরিয়া কম্‌রেড সাজিয়া, 'বিশ্বের যুবক এক হোক, বিশ্বের শ্রমিক এক হোক, বিশ্বের ছাত্র এক হোক' ইত্যাদি বুলি বলিয়া হুঙ্কার ছাড়ে, তাহারাও তাই। ইহারা কুঠিতে ও কারখানায়, কলেজে ও স্কুলে, অকারণে বা স্বল্পকারণে ধর্ম্মঘট করিয়া বা করাইয়া, তারুণ্য-কণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করে, কর্ত্তৃপক্ষদিগকে মারধর করিয়া বা করিবার ভয় দেখাইয়া, মাস্টার ও প্রফেসারদের অপমান করিয়া, কর্ত্তব্য ও নিয়ম-নিষ্ঠ সহকর্ম্মী বা সহতীর্থদের নির্য্যাতন করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করে, কিন্তু মা-বোনদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার কালে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়া নির্ব্বিকার দাঁড়াইয়া থাকে। না হইলে, দিনের পর

দিন ধর্ষিতা নারীর ক্রন্দন বাংলার আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে, আদালত-গৃহ হইতে হাকিমের চক্ষের সম্মুখে, পাষণ্ডের দল পশুর মত হতভাগিনী-দের ছিনাইয়া লইয়া গিয়া মাংসপিণ্ডের মত লোফালুফি ও কাড়াকাড়ি করিতেছে, তাহা শুনিয়া ও দেখিয়া তাহাদের তরুণ রক্ত তিলমাত্র তাতিয়া উঠে না তো। কাজেই যে সমাজের পুরুষরা মেষ হইতেও ভীরু, পাষাণের চেয়েও প্রাণহীন, সেই সমাজের মা-বোনদের সতর্ক হইয়া চলা উচিত। তাহাদের বোঝা উচিত, এদেশে সম্ভ্রম, সতীত্ব ও ধর্ম্ম আমরণ বজায় রাখিতে হইলে পুরুষ-মুখাপেক্ষিতা ছাড়িয়া, হয় তাহারা নিজেরা শক্তিময়ী হইয়া উঠুক, না হয় অন্দরের ভিতরে অন্দর গাঁথিয়া সেখানে লুকাইয়া থাকুক, অথবা বোরখার উপরে বোরখা আঁটিয়া নিজেদের দুর্নিরীক্ষ্য করিয়া তুলুক।

১৮

দিন চার পরে—সকালবেলায় বৈঠকখানার সামনে হাঁক শোনা গেল, মাস্টার, ও মাস্টার, বেরোও না হে!

তাতাতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, মণীন্দ্র। আমাকে দেখিয়া কহিল, ওহে, তোমার সঙ্গে একটা দরকার আছে, শোন দেখি।

কহিলাম, এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ঘরে এসে ব'সে যা বলবার বল। হাতের ছাতাটা লাঠির মত উঁচাইয়া মণীন্দ্র কহিল, মাস্টার কিনা, সময়ের মূল্য তো বোঝ না, অনেক কাজ আমার—

কহিলাম, যত কাজ তোমার, জানা আছে, এস তো।—বলিয়া ঘরের ভিতরে আসিয়া বসিলাম।

মাস্টারি করলে যে বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকে না—লোকে বলে, মিথ্যে নয়। আমার কাজ নেই তো গাঁয়ে কার কাজ আছে, শুনি? এত বড় একটা এস্টেটের ম্যানেজারি, তার ওপর মাথার ওপরে মেয়ের বিয়ে।—বলিতে বলিতে মণীন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া চেয়ারে বসিয়া টেবিলে পা দুইটা তুলিয়া দিয়া কহিল, এক কাপ চা খাওয়াতে পার? খাই নি যে তা নয়। তবে বৌমার হাতের চায়ের মত মিষ্টি চা গাঁয়ে আর কেউ তৈরি করতে পারে না, সরোজিনী পর্য্যন্ত না। বাড়িতে ঢুকিয়া চায়ের জন্য বলিয়া ফিরিয়া

আসিয়া দেখিলাম, মনুদা চেয়ারে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছে। তন্দ্রা না ভাঙিয়া আবার বাড়ির ভিতরে গেলাম এবং চা লইয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন মনুদার রীতিমত নাক ডাকিতে শুরু করিয়াছে। চায়ের পেয়ালাটি টেবিলে নামাইয়া মনুদাকে নাড়া দিতেই সে দুই রক্ত-চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রুক্ষস্বরে কহিল, কি? কহিলাম, চা খাবে না, ঘুমুচ্ছ যে এই সকালবেলায়? মনুদা সোজা হইয়া বসিয়া মাথা নোয়াইয়া চায়ে চুমুক দিয়া কহিল, আঃ! ভারী ভাল লাগছে ভায়া। প্রশ্ন করিলাম, কাল রাত্রে ঘুমোও নি নাকি? মণীন্দ্র জবাব না দিয়া প্লেটে চা ঢালিয়া কয়েক প্লেট খাইয়া কহিল, না।

কেন?

গরুর গাড়িটা চাল-ডাল-নুন-মসলা-তরিতরকারি-হাঁড়ি-বেড়ি-কড়াই-গামলাতে এমনই ঠাসাই হয়েছিল যে, সোজা হয়ে ব'সে থাকাই যায় না তো ঘুমুব কি?

মানে?

আরে, ফুন্টির বিয়ের জন্যে জিনিসপত্র কিনতে গিয়েছিলাম যে, কাল রাত্রে গরুর গাড়িতে ক'রে সব নিয়ে ফিরলাম।

কবে বিয়ে?

আজই রাত্রে। তাই তো নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছি, আর তোমার মত অকর্ম্মার পাল্লায় প'ড়ে আটকে গেছি। আজ রাত্রে তোমার নেমন্তন্ন সরোজের ওখানে। ঐখানেই বিয়েটা হচ্ছে কিনা। তবে একেবারে খাবার জন্যেই যেও না, একটু সকাল-সকাল যেও। আমার অবশ্য লোকের অভাব নেই, দারোগাবাবু আর আজিজ সাহেবের কৃপায় সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তা হ'লেও একটু দাঁড়িয়ে দেখো-শুনো আর কি।

আর কাকে কাকে নেমন্তন্ন করলে?

ভ্রূ নাচাইয়া মণীন্দ্র কহিল, কেন? গাঁয়ের সবাইকে। আমার কর্ত্তব্যে আমি ত্রুটি করব কেন? যার ইচ্ছে হয় যাবে, না হয় না যাবে। খাওয়ার লোকের অভাব নেই। তবে খাবারের যা ফিরিস্তি দিয়েছি, অনেকেই যাবে ব'লে মনে হচ্ছে। ওঃ, তোমাকে দেওয়া হয় নি, না?—

বলিয়া ফতুয়ার পকেট হইতে একটি মোড়ক-করা লাল রঙের চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, তোমার চিঠি।

কহিলাম, ওরে বাবা! বিয়ের চিঠি ছাপিয়েছ দেখছি যে!

দুই চোখ বড় করিয়া মণীন্দ্র কহিল, ছাপাব না? যে সে লোকের মেয়ের বিয়ে নাকি? পাঁচশো চিঠি ছাপিয়েছি। গাঁয়ের সবাইকে এক-একখানা ক'রে দিয়েছি, প'ড়ে দেখ না।

খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। সর্ব্বোপরি লেখা রহিয়াছে, প্রজাপতয়ে নমঃ, তাহার নীচেই একটি প্রসারিতপক্ষ প্রজাপতির ছবি, তারপর সবিনয়ে নিবেদন করা হইয়াছে। গঙ্গাধর চট্টরাজের পুত্র তিনকড়ি চট্টরাজের সহিত মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ফুল্লরা দেবীর শুভ-বিবাহ হইবে। তারপর সবান্ধবে সকলকে বিবাহে যোগদান করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে জানানো হইয়াছে যে, লৌকিকতার পরিবর্ত্তে কন্যা-জামাতার জন্য আশীর্ব্বাদই নিমন্ত্রণকর্ত্তার প্রার্থনীয়।

মণীন্দ্র এতক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, পড়া শেষ হইতেই কহিল, উল্টো পিঠটা পড়। উল্টাইয়া দেখিলাম, ভোজ্য ও পেয়ের লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে। লবণ ও জল হইতে আরম্ভ করিয়া লুচি পোলাও, মাছ মাংস, সন্দেশ রসগোল্লা, মিহিদানা সীতাভোগ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মণীন্দ্র মুচকি হাসিয়া কহিল, কি রকম দেখছ? কেউ না গিয়ে পারবে? ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সব নাক ডুবিয়ে খেয়ে আসবে, দেখো। ভারী গলায় কহিলাম, আমি কিন্তু খেতে পারব না।

মণীন্দ্র পরম বিস্ময়ের সহিত কহিল, সে কি হে? তোমার আবার এসব—। বাধা দিয়া কহিলাম, আমি বিয়েতে যোগ দোব, যা করতে-কর্ম্মাতে বলবে করব, কিন্তু—। বাধা দিয়া মণীন্দ্র কহিল, দেখ মাস্টার, বোকামি ক'রো না। এ তোমার পাড়াগাঁয়ের ভোজ নয়, আর সদী পদী দামী ক্ষেমী যার-তার হাতের রান্নাও নয়। সব জিনিস শহর থেকে আনা হয়েছে, আর হালুইকর রাঁধুনীও এসেছে সেখানে থেকে। যদি না খাও তো পস্তাবে শেষে।

চুপ করিয়া রহিলাম। মণীন্দ্র ঝাঁজের সহিত কহিল, বাড়িতে যে

কি খাও, তা জানা আছে। জীবনে একবার আমার ঘাড় দিয়ে মুখটা একবার বদলে নিতে পারতে, তবে অদৃষ্টে আবার থাকা চাই তো! না হ'লে এমন সুযোগ পেয়েও এমন মতিচ্ছন্ন!

বাধা দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিলাম, যাই খাওয়াও, আমি আজ খেতে পারব না। দলাদলিতে কোন পক্ষে থাকা আমার উচিত নয়। আজ যেমন তোমার বাড়িতে খাচ্ছি না, সেদিন তেমনই গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে খাই নি। অন্যদিন বল তো ডাল-ভাত খেয়ে আসতে পারি।

মণীন্দ্র কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, তাই ক'রো। মোদ্দা আজ কিন্তু যাওয়া চাই, না হ'লে সরোজিনী দুঃখু করবে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বেশ, আজ না খাও, পরশু খেতে তো আপত্তি নেই?

কহিলাম, পরশু আবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার আছে নাকি?

মাথায় ঝাঁকানি দিয়া মণীন্দ্র কহিল, তা আর নেই? বড় বড় লোক সব খাবে পরশু—এস. ডি. ও. সাহেব, দারোগাবাবু, আজিজ সাহেব আর তার হবু জামাই সত্তর সাহেব।

কহিলাম, আজিজ সাহেবদের আবার কেন?

বাঃ রে! আজিজ সাহেবকে নেমন্তন্ন করব না? কি সাহায্য করেছে বল দেখি! ও না থাকলে এস. ডি. ও. সাহেব কি এত খাতির করত? তা ছাড়া বিয়েতেও কম সাহায্য করে নি। জিনিসপত্তর কিনে দিয়েছে, আনবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। যত মাছ লাগবে, সব নিজের পুকুর থেকে ধরিয়ে দিচ্ছে।—বলিয়া কিছুক্ষণ দম লইয়া কহিল, তা ছাড়া নতুন আত্মীয়তাও হয়েছে ওর সঙ্গে যে। বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিলাম, সে আবার কি?

কেন? জান না তুমি? আজিজ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে সরোজ ধর্ম্ম-মেয়ে পাতিয়েছে।

গম্ভীর মুখে কহিলাম, দেখ মনুদা, মুসলমানদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা করা ভাল হচ্ছে কি?

কপাল কুঁচকাইয়া মণীন্দ্র কহিল, মন্দটা কি শুনি? আপাতত ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মাছ পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া লোকজনের সুবিধে।

পরে আরও কত উপকার পাওয়া যাবে ওর কাছ থেকে। ওহে, তোমাদের মত হেঁজি-পেঁজি লোক নয়, হাকিমরা একেবারে ওর মুঠোর মধ্যে।—বলিয়া ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আমার নাকের কাছে ধরিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ওসব তোমাদের মাস্টারী মাথায় আসবে না। সাত চাল ভেবে কাজ করে মনু চক্রবর্ত্তী। তার একটা চালের তাৎপর্য্য বুঝতে তোমাদের মত রামা-শ্যামাদের আধ-কপালে ধ'রে যাবে।

দম লইয়া কহিল, চলি তা হ'লে, অনেক কাজ; তোমার পাল্লায় প'ড়ে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। মোদ্দা যেও কিন্তু। তারপর চোখ মটকাইয়া কহিল, সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে না হয় লুকিয়ে ব'সে এক পাত খেয়ে আসবে এখন, কি বল?—বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

বিকালে স্কুল হইতে ফিরিবার পর পত্নী কহিলেন, আজ পদ্ম এসে কান্নাকাটি করছিল।

কহিলাম, কেন?

পত্নী কহিলেন, কি করবে? ছেলে ঝগড়া করছে দিনরাত।

সবিস্ময়ে কহিলাম, কে, প্রকাশ?

স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ।

কহিলাম, প্রকাশ তো ও রকম ছেলে নয়, ছেলে তো ভাল।

কিন্তু সরোজিনীর পাল্লায় পড়েছে কিনা।

মানে?

সেই যে দুদিন মূর্চ্ছার সময়ে সরোজিনীকে দেখতে গিয়েছিল, তারপর থেকেই কেমন ওর মন বিগড়ে গেছে। মেয়েটা মন্ত্র-তন্ত্র কিছু জানে বোধ হয়, না হ'লে তোমার মত—

বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম, প্রকাশ করছে কি?

দিন দুবেলা সরোজিনীর বাড়ি যাচ্ছে। পদ্ম কত মানা করেছে, দিব্বি দিয়েছে, গালাগালি দিয়েছে, পায়ে মাথা পর্য্যন্ত ঠুকেছে, কিছুতেই শুনছে না। আজ ঐ নিয়ে মা-বেটায় ধুম ঝগড়া হয়ে গেছে।

কহিলাম, গেলেই বা, তাতে পদ্মর অত ঝগড়া করবার কি আছে?

তুমি বলবে বইকি; একই পথের পথিক কিনা! যাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, সে যদি অগ্রাহ্যি করে, তাতে মেয়েমানুষের যে কি হয়, তা তারাই বোঝে। তোমরা বুঝবে না। এই ধর, পদ্ম যখন তিনকড়ির বিয়েতে যেতে মানাই করেছে, তখন প্রকাশের যাবার দরকার কি?

কহিলাম, তা হ'লে তিনকড়ির বিয়েতে যাওয়ার জন্যেই আজকের ঝগড়া?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হুঁ, তাই তো।

কহিলাম, পদ্মর ভারী অন্যায়। বন্ধুর বিয়েতে যোগ না দিয়ে কেউ পারে?

স্ত্রী ধমক দিয়া কহিলেন, বন্ধুর জন্যে নয়, একদিন চাঁদমুখ না দেখে থাকতে পারেন না, তাই।

সবিস্ময়ে কহিলাম, কার? সরোজিনীর?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, না।

অধিকতর বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, তবে কার? ফুন্টির?

পত্নী এবারও ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, না।

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কোনমতে কহিলাম, তবে?

পত্নী মুচকি হাসিয়া কহিলেন, মিণ্টার।

আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলাম, সত্যি?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হ্যাঁ সত্যি, বাউরীপাড়ার সবাই চোখে দেখেছে।

ওরা দেখবে কি ক'রে?

ঐ দিকেই যে রোজ রাত্রে বেড়াতে যায় দুজনে। হাত-ধরাধরি ক'রে সাতঘেটে পুকুরের পাড়ে পাশাপাশি ব'সে থাকে; মিণ্টা নাকি আবার গান গায়।

কহিলাম, দূর, ওসব মিথ্যে গুজব।

পত্নী গম্ভীর হইয়া কহিলেন, মিথ্যে, না সত্যি, পরে টের পাবে। হাত-ধরাধরি ক'রে বেড়িয়ে আর গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সেই তো ওরা নিরস্ত হবে না, একটা কিছু অঘটন ঘটাবেই। তখন জানতে পারবে সবাই। চুপ করিয়া রহিলাম। পত্নী কহিতে লাগিলেন, পদ্ম

সরোজিনীর পেছনে লেগেছিল ব'লেই বোধ হয় ও শোধ নিচ্ছে। কিন্তু কড়ুই-রাঁড়ীর একমাত্র ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যে শোধ নিতে পারে, সে মেয়েমানুষ নয়, রাক্ষুসী।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, পদ্মর কান্না যদি আজ দেখতে তো চোখের জল রাখতে পারতে না। চুপ করিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বসিত করুণার আলোড়ন কিঞ্চিৎ সামলাইয়া কহিলেন, বলছে, গাঁয়ে থাকবে না, একে তো পটে'কি মেয়ে, সবাই যে মুখের সামনে ঠাট্টা-টিটকিরি করবে, তা ও সহ্য করতে পারবে না।

ওর আবার যাবার জায়গা কোথায়? শ্বশুরঘর তো দামোদরের গর্ভে।

পত্নী নাকী সুরে কহিলেন, ওর যে এক ভাশুর আছে, সোনামুখীর কাছে কোন্ এক গাঁয়ে এসে বাস করছে, সেইখানে থাকবে বলছে।

প্রকাশ মত দিয়েছে?

খুব। বলছে, যেখানে ইচ্ছে চ'লে যাও, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তোমার। তাই তো পদ্মর দুঃখ, যে ছেলে আজ পর্য্যন্ত মায়ের আজ্ঞা ছাড়া জল পর্য্যন্ত খায় নি, এক পা কোথাও যেতে হ'লে মাকে জিজ্ঞাসা করত, মার কাছে ছাড়া আজ পর্য্যন্ত কোথাও শোয় নি, সেই ছেলের মুখে ঐ কথা! যাদু না জানলে কেউ অমন্ ক'রে মন বিগড়ে দিতে পারে? তাই তো ভয় হচ্ছে, তুমি যে রকম—

বাধা দিয়া কহিলাম, বীরু আচায্যি জানে?

পত্নী ঠোঁট উল্টাইয়া কহিলেন, কে জানে? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, ওরা তো মেয়ে-বেচা ঘর। প্রথম বার বিয়ে দিয়ে নগদ হাজার টাকা পেয়েছিল। তার ওপর বিধবা মেয়েকে ঘরে আটকে গয়না-গাঁটিগুলোও সব হাতিয়েছে। নগদ দাম পেলে আর একবার বিয়ে দিতে ওর আপত্তি কিসের?

কহিলাম, প্রকাশ হাজার টাকা দেবে? পনরো টাকা মাসে মাইনে পায়—

টাকা দেবে তোমার সরোজিনী। গাঙুলী বুড়োকে জব্দ করবার জন্যে দুশো টাকা যুদ্ধের চাঁদা দিলে, আর পদ্মকে জব্দ করবার জন্যে

টাকা খরচ করবে না? তা ছাড়া নগদ টাকাই বা খরচ করতে হবে কেন? বাড়ি-বন্ধকী দলিলটা যদি ফিরিয়ে দেয় তো বীরু আচায্যি শুধু বিধবা মেয়েটাকে কেন, আইবুড়ো ছোট মেয়েটাকে সুদ্ধু ফাউ ধ'রে দেবে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তুমি এত খবর জানলে কি ক'রে?

মুচকি হাসিয়া পত্নী কহিলেন, সব জানি। বাড়িতে আটক থাকলে কি হবে, বাইরে কোথায় কি হচ্ছে, কে কি করছে, সব খবর আমাদের কানে এসে পৌঁছয়।

কৃত্রিম ভয়ের সহিত কহিলাম, লোকের মনের খবরও টের পাও নাকি?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া সহাস্যে কহিল, হুঁ, সব টের পাই। বিশেষ ক'রে তোমার মনের খবর। যখনই কারও কথা ভাব, তখনই বুঝতে পারি। গম্ভীর হইয়া কহিলেন, তাড়াতাড়ি নাও, আমাকে একবার যেতে হবে।

প্রশ্ন করিলাম, কোথায়?

গোবিন্দ-ঠাকুরঝি এসে অনেক ক'রে ব'লে গেল, বর বেরোবার সময় একবার যেতে। রাত্রে আজ রান্না-টান্না করব না, তোমার তো নেমন্তন্ন আছে।

কহিলাম, থাকলেই বা, আমি গিয়ে বিয়ে দেখেই ফিরে আসব।

বিস্ময়ের সহিত পত্নী কহিলেন, কেন? হরেক রকমের খাবারের আয়োজন করেছে, খেয়ে আসবে না? গাঁয়ের সবাই খাবে।

দৃঢ়কণ্ঠে কহিলাম, না। আমি এত পেটুক নয় যে, যাকে সমাজ থেকে পতিত করা হয়েছে, তার বাড়িতে সামাজিকভাবে খেয়ে আসব।

গৃহিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, সামাজিকভাবে খেতেই বুঝি দোষ, এমনই যখন তখন খেতে দোষ নেই?

কহিলাম, না।

গৃহিণী ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন, কিন্তু সরোজিনী কি ছেড়ে দেবে তোমাকে? এত ভালবাসা।

কহিলাম, ভালবাসা নয়, ভক্তি।

ঘাড় নাড়িয়া পত্নী কহিলেন, ভালবাসা গাঢ় হ'লেই ভক্তি। তা যাই হোক, ও যদি খেতে বলে ?

বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে কহিলাম, তা হ'লেও খাব না, স্পষ্ট ব'লে দোব, খাওয়া চলবে না।

পত্নী হাসিয়া কহিলেন, তা তুমি পারবে না। মুখ ফুটে বলা দূরে থাক, সরোজিনী যদি ইশারায় একবার বলে তো শুধু খাওয়া কেন, এঁটো পাত চাটতে ব'সে যাবে তুমি।

সতেজে কহিলাম, পাগল হয়েছ নাকি ? কি মনে করেছ তুমি ? সরোজিনী পায়ে ধরলেও খাব না আমি।

পত্নী মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেই লাগিলেন। কাঁজেই ভারী গলায় কহিলাম, ওসব বাজে কথা যাক, রাতের খাবার তৈরি ক'রে তবে যেখানে হোক যেও। মুড়ি-টুড়ি গিলতে পারব না আমি।

পত্নী আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, আজ্ঞে হুজুর, খাবার তৈরি করা হয়েছে, তুমি যে ওখানে খাবে না, তা আগেই জানতাম।

কি ক'রে জানলে ?

সকালে মন্টু চক্রবর্ত্তীকে বলছিলে, শুনেছিলাম যে।

সব কথা শুনেছিলে ?

মৃদু হাস্য সহকারে ঘাড় নাড়িয়া পত্নী কহিলেন, হুঁ, সব কথা।

বিকালে গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়িতে হাজির হইলাম। চিন্তিত মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়া ছিলেন। অবস্থাটা অনেকটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষভাগে দুর্য্যোধনের মত দেখাইল। আমাকে দেখিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কাছে যাইতেই কহিলেন, মন্টু চক্রবর্ত্তীর ওখানে নেমন্তন্ন নেই ?

বসিয়া কহিলাম, আছে।

জিজ্ঞাসা করিলেন, যাবে না ?

কহিলাম, যাব একবার দেখতে, খাব না।

হুঁ।—বলিয়া গাঙ্গুলী মশায় প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধানাথকে দেখছি না ?

ক্ষুব্ধকণ্ঠে গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, আসে নি দুদিন, কি মতলব কে জানে? হয়তো ভেতরে ভেতরে—। বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, ওর ভগ্নীপতিটি ও দলের মস্ত চাঁই কিনা। ওই নাকি বিয়ের পুরোহিত।

সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, না, ইচ্ছে থাকলেও চক্ষুলজ্জায় পারবে না। তা ছাড়া মাতুল মশায়টি তো এখনও ওর বাড়িতেই রয়েছে।

কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হইয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন,' সে কথা আর ব'লো না। এখান থেকে নড়তে চাইছে না। চব্য-চোষ্য আহার চলছে দুবেলা, দিন দুসের দুধ, সিকি তোলা আফিং। জমিদারির ভাগ বসাতে গিয়ে রাধানাথ বেশ ফ্যাসাদে পড়েছে।

কহিলাম, রাধানাথ স্পষ্ট ব'লে দিক না—আসল কাজই যখন হ'ল না, এবার স'রে পড়ুন।

তা বলতে পারছে কই? লোভটা একেবারে ছাড়তে পারছে না কিনা। তা ছাড়া বুড়ো অনেক ধাপ্পা মেরেছে, বড় বড় জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ওর ছাত্র, ওর কথায় সব ওঠে বসে, তাই তাড়াতে সাহস করছে না, পাছে কোন ফ্যাসাদে ফেলে দেয়।

কহিলাম, প্রবোধ গাঙ্গুলীর ভাগনেকে আসবার জন্যে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার কি হ'ল?

বিরক্তিতে সারা মুখ কুঁচকাইয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, সে বেটা ম'রে গিয়েছে মাসখানেক আগে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ভায়া! পড়তা যখন খারাপ চলে, তখন পাকা গুটিও কেঁচে যায়।

উঠিয়া দাঁড়াইতেই গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, ওখানেই যাচ্ছ নাকি?

কহিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, খেও-দেও না, কি দরকার গোলমালের মধ্যে গিয়ে? দেখে শুনেই স'রে প'ড়ো, আর পাড়ার কে কে খেলে একটু নজর রেখো।

রাস্তায় ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা হইল। বেশ সাজিয়া-গুজিয়া চলিয়াছেন, পরিধানে ধোপদুরস্ত ধুতি ও পাঞ্জাবি, পায়ে পাম্প-শু। সঙ্গ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় চলেছেন মশায়?

ডাক্তারবাবু কহিলেন, এই যে! মনু চক্রবর্ত্তীর বাড়ি ; ওঁর মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছেন কিনা।

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলাম, বলেন কি ? মনু চক্রবর্ত্তীর নিমন্ত্রণে চলেছেন ? বন্ধুবিচ্ছেদ হবে না তো ?

ডাক্তারবাবু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, তার মানে ? বন্ধু আবার কে ?

কেন রাধানাথ ?

ডাক্তারবাবু সক্ষোভে কহিলেন, দেখুন মাস্টার মশায়, আপনার কাছ থেকে এ কথা শুনব আশা করি নি। আমি বিদেশী, তার ওপর ডাক্তার। আমার এখানে বন্ধুও কেউ নেই, শত্রুও কেউ নেই, আপনারা সকলেই আমার কাছে সমান।

কহিলাম, না না, এমনই ঠাট্টা ক'রে বলছিলাম।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর মুখে বলিতে লাগিলেন, ঠাট্টাই করুন আর যাই করুন, ডাক্তারের পক্ষে এ বড় দুর্নাম। এই দেখুন না, মনুবাবুর বোনের মূর্চ্ছার সময় নিজে যেতে পারলাম না, নিজের তখন হাড়ভাঙা ডেঙ্গুজ্বর, নড়তে-চড়তে পারি নি কদিন, তাতেই বিবেক রাতদিন মনের গায়ে দাঁত বসাচ্ছে।—বলিয়া মুখে এমনই ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন এখনও বিবেক-দংশন চলিতেছে।

মনুর বাড়িতে পৌঁছিতেই, ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া সকলে হৈ-হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল, প্রকাশ সর্ব্বাগ্রে এবং তাহার পিছু পিছু মণীন্দ্র ও নিমন্ত্রিতদের অনেকে। যতই হোক, সরকারী চাকুরে তো। তা ছাড়া আজকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র সরকারের প্রতিনিধি। মনু কহিল, এই যে, এসেছেন সময় ক'রে। ভাবলাম—

ডাক্তারবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, বিলক্ষণ! আসব না ? আপনার মেয়ে আর আমার মেয়ে কি আলাদা ?

মণীন্দ্র গর্ব্বে ও আত্মপ্রসাদে মুখ হাঁড়ি করিয়া সকলের দিকে তাকাইয়া নিজের পদমর্য্যাদা সমঝাইয়া দিতে লাগিল। প্রকাশ রাস্তা দেখাইয়া কহিল, আসুন। তাহার পিছু পিছু ডাক্তারবাবু চলিলেন। আমিও বিনাবাক্যব্যয়ে অনুসরণ করিলাম, কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। একটা কথা বলিয়াও কেহ আপ্যায়িত করিল না। যাহার

মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছি, সরকারী চাকুরের আওতায় পড়িয়া, তাহার কাছেও নগণ্য হইয়া গেলাম। নিজের লোক, আমাকে আপ্যায়ন করিবার আবশ্যক কি?—বলিয়া মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে প্রবোধ না মানিয়া অভিমানী বালকের মত মুখভার করিয়া রহিল।

বৈঠকখানার বারান্দায় একটা চেয়ারের উপরে সকলে ধরাধরি করিয়া ডাক্তারবাবুকে বসাইয়া দিল। প্রকাশ একটা খোলা সিগারেটের টিন হইতে সিগারেট দিল। কে একটা ছেলে একটা থালায় করিয়া পান আনিয়া হাজির করিল। আমিও একটা পান তুলিয়া মুখে পুরিলাম, একটা সিগারেট চাহিয়া লইয়া ধরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকের ব্যাপারটা দেখিতে লাগিলাম। বৈঠকখানার ভিতরে একটা শতরঞ্চির উপরে গালিচা পাতা, তাহার ঠিক মাঝখানে পিঠে তাকিয়া ও দুই পাশে মখমলের বালিশ লইয়া তিনু খাড়া হইয়া বসিয়া আছে, এবং তাহাকে ঘেরিয়া তাহার অনুচরবৃন্দ কেহ বসিয়া আছে, কেহ বা শুইয়া পড়িয়াছে। উঠানের দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইলাম, রাধানাথ ও গাঙ্গুলী ছাড়া পাড়ার আর কেহ আসিতে বাকি নাই, এবং প্রত্যেকে শুধু নিজে আসে নাই, পুত্রকন্যাসমেত আসিয়াছে, নেহাত নিমন্ত্রণ-পত্রে বিশদভাবে লেখা ছিল না বলিয়া, স্ত্রীটিকে লইয়া আসিতে পারে নাই। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাহারা বালক-বালিকা পর্য্যায়ে পড়ে, তাহারা উঠানে ছুটাছুটি, মারামারি ও চেঁচামেচি করিতেছে; এবং যাহারা নেহাত শিশু, তাহারা কেহ পিতৃক্রোড়ে, কেহ বা মাটিতে বসিয়া কান্না শুরু করিয়াছে। মনু চক্রবর্ত্তী উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কতকগুলা লোক গভীর মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে। ভাল করিয়া কান পাতিয়া শুনিতে পাইলাম, মণীন্দ্র দুই হাতের করতল প্রসারিত করিয়া বলিতেছে, মিষ্টি দশ রকম, বোঁদে, রসগোল্লা, পানতুয়া, মতিচুর, মিহিদানা, সীতাভোগ, মণ্ডা, জিলিপি, ক্ষীরমোহন, চমচম।

শ্রোতাদের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল, মিহিদানা কি খাস বর্দ্ধমান থেকে আমদানি? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হইল, হ্যাঁ গো। খাস বর্দ্ধমানের,

লোক পাঠিয়ে আনানো হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা! যার-তার বাড়ির কাজ নয়।

সকলে সমস্বরে সমর্থন করিল, সত্যি।

কে আবার প্রশ্ন করিল, পোলাওয়ে মাংস, না মাছ দেওয়া হয়েছে?

মণীন্দ্র উত্তর দিল, মাংস। ইয়া বড় পাঁঠা কাটা হয়েছে।—বলিয়া দুই হাত দিয়া পাঁঠার দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, আর এত বড় দাড়ি।—বলিয়া নিজের চিবুকের নীচে ডান হাত রাখিয়া দাড়ির দৈর্ঘ্য নির্দ্দেশ করিল।

শ্রোতৃমণ্ডলী একসঙ্গে মুখভার করিয়া ছলছল নেত্রে বলিয়া উঠিল, দেড়েল পাঁঠা! মাংস যে বড় কড়া হয়ে যাবে, দাঁত বসানো যাবে না।

মনু চক্রবর্ত্তী হাত নাড়িয়া অভয় দান করিল, কোন ভয় নেই। শহর থেকে দুখু চাটুজ্জেকে এনেছি। পাঁঠা কেন, হাতী সেদ্ধ ক'রে দেবে।

আবার কে প্রশ্ন করিল, মাছ নেই?

মণীন্দ্র মুখ উপর দিকে তুলিয়া ঠোঁট দুইটা ছুঁচলো করিয়া কহিল, প্রচুর। ডান হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমা প্রসারিত করিয়া কহিল, দু মণ। আজিজ সাহেবের ফকির-বাঁধের বড় বড় মাছ, তারই কালিয়া তৈরি হয়েছে, নাক ডুবিয়ে খাবে সব।

হঠাৎ বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইল দোলগোবিন্দ, কি যেন চিবাইতেছে। মনুকে হাঁকিয়া কহিল, ফার্ষ্ট কেলাস হয়েছে বাবাজী। এমনটি কখনও কেউ খায় নি।

সকলে পিছন ফিরিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া সাগ্রহে কহিল, কি?

দোলগোবিন্দ কহিল, পোলাও, সবাই চাখতে বললে, ওস্তাদী মুখ জানে কিনা, মায় বউমা পর্য্যন্ত।

সকলে একসঙ্গে ঢোক গিলিয়া প্রশ্ন করিল, কেমন হয়েছে?

দোলগোবিন্দ দুই হাতের করতল চিত করিয়া দিয়া কহিল, চমৎকার! তারপর ডান হাত নাড়িয়া কহিল, জীবনে এমনটি কখনও খাও নি? নুন, ঝাল, মিষ্টি যেন নিক্তিতে তৌল ক'রে দিয়েছে, এক

তিল এদিক-ওদিক হয় নি। আর গন্ধ যা বেরিয়েছে, তাতে অগ্নিমান্দ্য রোগীরও পেটে আগুন জ্ব'লে উঠবে।

সকলে ঠোঁট চাটিতে শুরু করিল।

মন্নুর মাথায় হাত দিয়া দোলগোবিন্দ কহিল, বেঁচে থাক বাবা মন্নু। একটা কাজের মত কাজ করলে বটে।—বলিয়া কাসিতে শুরু করিতেই সকলে সন্ত্রস্তভাবে সরিয়া দাঁড়াইল। দোলগোবিন্দ কাসি শেষ করিয়া একদলা কফ মাটিতে ফেলিল।

হাঁকিয়া কহিলাম, দাদা মশায়! এখানে এসে বস্থন।

আমার দিকে চাহিয়া দোলগোবিন্দ কহিল, এই যে, ভায়া এসেছ? বেশ করেছ। কাছে আসিয়া কহিল, রেখো আর পরাণের যত দুষ্টু বুদ্ধি! কি করব গাঁয়ে দলাদলি ক'রে? সবাই আত্মীয়-স্বজন মিলে মিশে এক-সঙ্গে থাকাই তো ভাল। ডাক্তারবাবুর দিকে তাকাইয়া কহিল, কি বলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু সিগারেট টানিতে টানিতে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন।

দোলগোবিন্দ একটা চেয়ারে উবু হইয়া বসিয়া কহিল, যা খাবার আয়োজন করেছে মন্নু, বড় বড় লোকের বাড়িতেও এমনটি হয় না। ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, তা মন্নু সিগারেটেরও ব্যবস্থা করেছে নাকি? বাকি কিছু রাখলে না দেখছি। প্রকাশকে ডাকিয়া কহিল, তোর হাতে ওটা কিসের টিন র‍্যা?

প্রকাশ কাছে আসিয়া কহিল, সিগারেট, নেবেন নাকি একটা?

দে, খেতে কি পারব? এখুনিই কাসিয়ে মারবে।—বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া, মুঠা করিয়া ধরিয়া টানিতেই কাসিতে শুরু করিল।

১৯

একদিন পরে। রবিবার, সকালে বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলাম; হঠাৎ সমস্বরে গোঙানির শব্দ শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলাম, কতকগুলা লোক একটা পাল্কি কাঁধে লইয়া আসিতেছে। কাজেই যাহা গোঙানির শব্দ বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে বেহারাদের চিরাচরিত ঐক্যধ্বনি। শব্দ শুনিয়া পত্নী ও ছেলেমেয়েরা

ছুটিয়া আসিল। পাল্কিটা সামনে আসিতেই দেখিলাম, পাল্কির মধ্যে বরবেশী তিনকড়ি বসিয়া, ও তাহার কোলের কাছেই লাল রঙের বেনারসী-পরা, আবক্ষ-ঘোমটা-টানা ফুল্টি। পত্নী কহিলেন, কি ভাই তিনু, ফিরছ বউ নিয়ে?

তিনু আমাদের দিকে একবার তাকাইয়া লজ্জায় মুখ নত করিল।

পত্নী কহিলেন, বেশ মানিয়েছে দুটিকে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, দেখলে কবে?

কাল সন্ধ্যেবেলায় গিছলাম যে, সরোজিনী ডেকে পাঠিয়েছিল অনেক ক'রে। কাল তোমাকে দেখলাম না ওখানে?

বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলাম, আমি রোজই ওখানে যাই নাকি?

তাই তো শুনি। কালই যাও নি, আগে থেকে জানতে পেরেছিলে বোধ হয়।

সন্ত্রস্তভাবে কহিলাম, তোমার দিব্যি বলছি, না।

পত্নী সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, অত দিব্যি-দিলেশা করছ কেন বল দেখি? ডুবে ডুবে জল-টল খাচ্ছ নাকি?

উল্টা প্যাঁচে আটকাইয়া গিয়া ঘাবড়াইয়া উঠিলাম, কহিলাম, পাগল হয়েছ নাকি? নিজের বোনের মত—

পত্নী পরিহাসের সুর পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, আমারও তাই মনে হ'ল কাল, তোমাকে নিজের দাদার মতই দেখে। কাল কত দুঃখ করছিল, তুমি না খেয়ে, না দেখা ক'রে চ'লে এসেছ ব'লে।

কথাবার্তার আসল ধরনটা ঠিক ধরিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

পত্নী কহিলেন, খেলেই হ'ত। সবাই তো খেয়েছে শুনলাম। তোমার যত বাহাদুরি!

কহিলাম, তা কি হয়? সকলের সামনে প্রতিজ্ঞা ক'রে তা ভাঙব কি ক'রে?

যা ইচ্ছে কর বাপু। কিন্তু আমার তো মেয়েটাকে ভাল ব'লেই

মনে হ'ল। আমাকে দেখে যেন কাল হাতে স্বর্গ পেল, কোথায় বসাবে, কি খাওয়াবে, তা নিয়ে যেন অস্থির হয়ে উঠল।

তুমি খেলে বুঝি ?

বাঃ রে! খাব না কেন ? তুমি যখন তখন খেয়ে আসছ, আমারই দোষ ? তা ছাড়া ও যা অপরাধ করেছে, তার চেয়ে অনেক গুরুতর অপরাধ পাড়ার অনেকে করেছে, বলতে গেলেই কথা বাড়ে, না হ'লে কারও অজানা কিছু নেই।

মনু চক্রবর্ত্তীর গলা শোনা গেল, আছ নাকি হে ?

পত্নী দ্রুতবেগে অন্দরের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

কহিলাম, আছি, এস।

মনু আসিয়া বসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া কহিল, যাক, বাঁচা গেল। কন্যাদায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। এখন, ভিণ্টের একটা ব্যবস্থা হ'লেই, বাস্। তারপর বাকি ছেলেমেয়েগুলোর ব্যবস্থা ভিণ্টের ঘাড়ে।

কহিলাম, মেয়ে-জামাই জোড়ে গেল, দেখলাম যে—

মুখ ও চোখ আনন্দে বিস্ফারিত করিয়া মনুদা কহিল, দেখলে ? বেশ মানিয়েছে, নয় ?

কহিলাম, হুঁ। তা তোমাদের সব বিয়ের গোলমাল মিটে গেল তো ?

মুখ চিন্তাকুল করিয়া মনুদা কহিল, কোথায় আর মিটেছে! আসল গোলমালই তো বাকি। এস. ডি. ও. সাহেব, দারোগাবাবু, এঁদের সব খাওয়াতে হবে।

কবে ?

আজই বিকেলে। পাঁচটার সময়ে সাহেব আসছেন।

কে কে খাবে ?

এস. ডি. ও. সাহেব, দারোগাবাবু, আজিজ সাহেব আর তার ভাইপো, তুমি, আর—

কহিলাম, আমাকে আবার কেন ?

লাফাইয়া উঠিয়া মণীন্দ্র ডান হাঁতের তর্জ্জনী তুলিয়া নাড়িতে

নাড়তে সতেজে কহিল, খবরদার মাস্টার! সেদিন ফাঁকি দিয়েছ। আজ না খেলে তোমার আর মুখদর্শন করব না, বলছি। চুপ করিয়া রহিলাম।

মনুদা টেবিলে দুই হাত চাপড়াইয়া সামনে ঝুঁকিয়া, আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া মিনতির সুরে কহিল, সত্যি যেও, না হ'লে সরোজ রাগ করবে। সেদিন তো তুমি খাও নি শুনে প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল। তোমাকে—

বাধা দিয়া কহিলাম, আচ্ছা যাব, তুমি ব'স। মণীন্দ্র বসিল। কহিলাম, আর কে কে বলছিলে?

চোখ মটকাইয়া মনুদা কহিল, আর তোমার গাঙুলী মশায়, বাধানাথ।

সবিস্ময়ে কহিলাম, সত্যি?

ঘাড় নাড়িয়া মণীন্দ্র কহিল, গিয়ে দেখবে মাস্টার, মুসলমানের পাশে ব'সে তোমাদের বকধার্ম্মিকরা পাঁঠার হাড় চুষছে।

বিকালে পাঁচটার সময়ে সরোজিনীর বাড়িতে হাজির হইলাম। দেখিলাম, হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। মনু, প্রকাশ, তিনুর সাঙ্গোপাঙ্গ, ডান কব্জিতে হরিদ্রাবর্ণের সূতা-বাঁধা তিনু পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতেছে। আমাকে দেখিয়া মনুদা কহিল, ভায়া এসেছ? সাহেব এসে গেছেন থানায়। ইউনিয়ন বোর্ডের খাতাপত্র দেখছেন। কি রকম হয়েছে, দেখ দেখি।—বলিয়া আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বৈঠকখানার ভিতরে লইয়া গেল। দেখিলাম, চেয়ার-টেবিল সরাইয়া দিয়া আসনের বদলে একটা শতরঞ্চি ভাঁজ করিয়া লম্বালম্বি পাতা হইয়াছে; তাহার সামনে প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের জন্য এক-এক সেট করিয়া থালা, বাটি, গেলাস সাজানো রহিয়াছে।

কহিলাম, সাহেব আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে খেতে পারবেন?

মনুদা কহিল, সাহেবই তো বললেন, টেবিল-চেয়ারে খাব না। আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে ডাল-ভাত খাওয়াতে পারেন তো যাব। তারপর আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, কেমন, ঠিক হয় নি?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, ঠিক হইয়াছে।

মন্নুদা কহিল, গাঙুলী বুড়ো আর রেখো তুজনকেই সাহেব টেনে নিয়ে আসবেন। ওদের বদমায়েসি সব বলেছি কিনা।

কহিলাম, রাধানাথকে পাবেন কোথায় ?

কেন, থানায়। সেদিন পালিয়েছিল টাকা দেবার ভয়ে। শুনেছে, হাকিম চ'টে গেছেন তার ওপরে। আজ নিজে সেধে টাকা দিতে ছুটেছে। বাবা ! জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে চালাকি চলে ? তা ভায়া, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করবার সময় নয় এখন। একবার থানায় যাই, তুমি বরং বাড়ির ভেতরে কতদূর কি হ'ল একবার দেখ গিয়ে।

বাড়ির ভিতরে ঢুকিতেই সরোজিনীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, তুই ছেড়ে দে মিণ্টা, পারবি না, কেন প্রকাশের সময় নষ্ট করছিস্ ?

আর একটি নারীকণ্ঠ, নিশ্চয়ই মিণ্টার, আবদারের সুরে কহিল, হ্যাঁ, ভারী তো ! দেখে যান না। ওঁর চেয়ে ভাল হয়েছে।

একটি পুরুষ-কণ্ঠ মোটা স্বরে কহিল, হ্যাঁ, সত্যি, মন্দ হয় নি। এই প্রথম চেষ্টা তো। দিন কয়েক অভ্যাস করলেই হাত ওতরাবে।

ভিতরে যাইয়া দেখিলাম, রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া সরোজিনী, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মুখে হাসি, আমাকে দেখিয়াই গম্ভীর হইয়া মুখ ফিরাইল। বুঝিলাম, অভিমান হইয়াছে। অভিমানের পশ্চাতে সুনিশ্চিত স্নেহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম, অথচ প্রভাতের রৌদ্রঝলমল আকাশের মত হাস্যোজ্জ্বল মুখটি যে এক মুহূর্তে অভিমানের মেঘে ম্লান হইয়া গেল, তাহার জন্য মনে অনুশোচনাও হইল। কাজেই মুখে আবার হাসি ফুটাইবার জন্য কহিলাম, তোমার আয়োজন সব শেষ হ'ল ?

মুখ ফিরাইয়া কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত সরোজিনী কহিল, ওমা ! আপনি ! আমি বলি কে আবার—! আপনি যে আমার বাড়িতে পা দেবেন, তা আশা করি নি।

কহিলাম, সেদিন শরীরটা খারাপ ছিল, সকালেই মন্নুদাকে তো—

বাধা দিয়া ডাগর চোখ তুইটি আরও ডাগর করিয়া সরোজিনী কহিল, আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে গেলে শরীরটা আপনার আরও খারাপ হয়ে যেত ? কণ্ঠে অশ্রুর আভাস লাগিল।

ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, তা নয়, তুমি ব্যস্ত ছিলে, ভাবলাম, মিছিমিছি এ সময়ে—

মাথায় ঝাঁকানি দিয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠে সরোজিনী কহিল, হয়েছে! বোনের ওপর ভাইয়ের দরদ! বোনই কেবল ভাইয়ের জন্যে মরে।

কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, মনুদা আমাকে সঙ্গে লইয়া শহরে যাইবার কথা বলায় সরোজিনী নাকি একদিন বলিয়াছিল, যাকে-তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার দরকার নেই। মনটা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই বুঝাইলাম, ঝুটা-আসল বিচার না করিয়া, যাহা জুটিতেছে, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাক। কোন হরিণ-নয়নার নয়ন হইতে তোমার জন্য খাঁটি অশ্রু ঝরিবে, এমন ভাগ্য করিয়া দুনিয়াতে আসিয়াছ নাকি?

মুখ বাড়াইয়া কহিলাম, প্রকাশ, কি করছিস রে?

জবাব দিল সরোজিনী, রান্না করছে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তাই নাকি! প্রকাশকে উদ্দেশ করিয়া কহিলাম, এসব বিদ্যে শিখেছিস নাকি?

প্রকাশ কহিল, হ্যাঁ, কলকাতায় শিখেছিলাম। যে ডাক্তারবাবুর কাছে থাকতাম, তিনি সব রকম মাংস রান্না খুব ভাল জানতেন।

সরোজিনী প্রশংসার সুরে কহিল, সত্যি, ভারী চমৎকার তৈরি করছে, দাদা চেখে দেখে খুব প্রশংসা করলে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, মিণ্টা কি করছে তবে?

সরোজিনী কহিল, মেয়েমানুষ যা করে, পুরুষের কাজে বিঘ্ন করছে।

মিণ্টা কহিল, তা বইকি! দেখুন না কেমন করেছি, প্রকাশদাদার চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে।

কাছে গিয়া দেখিলাম, তোলা উনুনের সামনে উবু হইয়া বসিয়া, মিণ্টা মাংসের কাট্‌লেট ভাজিতেছে, প্রকাশ পাশে দাঁড়াইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। মিণ্টাকে অনেকদিন পরে ভাল করিয়া দেখিলাম, রং ধবধবে ফর্সা নয়, কিন্তু শ্যামবর্ণ বলিতেও মন চাহে না, মুখের ও চোখের

গঠন চমৎকার, সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া যৌবনের প্রাচুর্য্য; আগুনের আঁচে মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে; সামনের রুক্ষ চুলগুলি স্বেদসিক্ত।

পদ্ম যাওয়ার পর হইতে প্রকাশ তাহা হইলে সরোজিনীর বাড়িতেই আড্ডা গাড়িয়াছে। মিণ্টা তো শুনিয়াছি সারাদিন এইখানেই কাটায় এবং বিবাহ উপলক্ষ্যে বোধ হয় রাত্রিটাও এইখানেই কাটাইতেছে। কাজেই অবিরত ও অব্যাহত সাহচর্য্যের ফলে তাহাদের মধ্যে প্রণয়-সূত্রটি দিন দিন মোটা ও মজবুত হইয়া উঠিতেছে। সরোজিনীর যে এ ব্যাপারে সম্মতি ও সাহায্য দুই ই আছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। কিন্তু কাজটি সরোজিনী ভাল করিতেছে না। শহরে লোকারণ্যের মধ্যে যাহাই হউক, পল্লীসমাজে এই অসামাজিক প্রেম কোনমতে আশ্রয় পাইবে না। বিরোধ চারিদিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে; কুৎসা কালি ছিটাইতে থাকিবে; কলহ ও কোলাহলের অন্ত থাকিবে না। এবং শত-করা নব্বইজন বাঙালী যুবকের মত প্রকাশ যদি শেষ মুহূর্ত্তে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে, তাহা হইলে মিণ্টাকে প্রাণ কিংবা মান দিয়া এই প্রেমের দাম চুকাইতে হইবে।

মোটরের শব্দ শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিলাম। অবিলম্বে মোটর আসিয়া পৌছিল। এস. ডি. ও. সাহেব, মণীন্দ্র, আজিজ সাহেব ও তদীয় গুণধর ভ্রাতুষ্পুত্রটি একে একে গাড়ি হইতে নামিল। ভ্রাতুষ্পুত্রের পোশাক-পরিচ্ছদ পূর্ব্ববৎ, মুখে পূর্ব্ববৎ দুরন্ত ও দুর্ব্বিনীত ভাব; আমাকে দেখিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। সকলকে আদর-আপ্যায়ন করিয়া বারান্দায় চেয়ারে বসানো হইল। কিছুক্ষণ পরে দারোগাবাবু, রাধানাথ ও গাঙুলী মশায় হাঁটিয়া আসিলেন। গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ দুইজনেরই মুখ শুষ্ক ও চিন্তাকুল।

মণীন্দ্র যুক্তহস্তে নিবেদন করিল, সব প্রস্তুত, দয়া ক'রে হাত-মুখ ধুয়ে বসলেই হয়।

সকলে সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শুধু গাঙুলী মশায় গালে এবং রাধানাথ পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বসিয়া রহিল। দারোগা-বাবু তাহাদের দিকে তাকাইয়া সোৎসুক কণ্ঠে কহিলেন, কি হ'ল আপনাদের?

গাঙ্গুলী মশায় যন্ত্রণা-কুঞ্চিত মুখে কহিলেন, দাঁতের বেদনা—সেই যে একবার হয়েছিল।

রাধানাথ মুখে যথাসাধ্য যন্ত্রণার ভাব ফুটাইয়া কহিল, পেটটা মোচড় দিচ্ছে, কাল থেকে পেটের অসুখ, প্রায়ই হয় কিনা এমনই—আজ বার্লি খেয়ে আছি।

এস. ডি. ও. সাহেব তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, কি হ'ল এঁদের?

দারোগাবাবু মুচকি হাসিয়া কহিলেন, অসুখ হয়েছে বলছেন, এক-জনের দাঁতের, আর একজনের পেটের—খাবেন না।

মণীন্দ্র কহিল, ওসব ভান, হুজুর।

গাঙ্গুলী মশায় ও রাধানাথ সমস্বরে কহিল, ভান নয় হুজুর, সত্যি; বাড়িতে জিজ্ঞেস ক'রে পাঠান।

এস. ডি. ও. সাহেব গম্ভীর মুখে কহিলেন, বেশ, রেহাই দিচ্ছি; কিন্তু আরও একশো টাকা ক'রে যুদ্ধে চাঁদা দিতে হবে আপনাদের। দিতে পারেন তো বাড়ি গিয়ে এনে দিন।

দাঁত ও পেটের যন্ত্রণা ভুলিয়া দুইজনে হাতজোড় করিয়া বলিয়া উঠিল, না হুজুর, যা দিয়েছি, তার বেশি এক পয়সা দিতে পারব না।

এস. ডি. ও. সাহেব গম্ভীর মুখে কহিলেন, তা হ'লে খেতে হবে। —বলিয়া একেবারে চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করিয়া বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকিলেন, তাঁহার পিছু পিছু ঢুকিল আজিজ সাহেব ও তস্য ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সর্ব্বশেষে ঢুকিলেন গাঙ্গুলী মশায় ও রাধানাথ, ফাঁসির আসামীর মত মুখ করিয়া। দারোগাবাবু তখনও মুখ-হাত ধুইতে লাগিলেন।

আজিজ সাহেব ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এক পাশে বসিল, তাহাদের পাশেই বসিলেন, এস. ডি. ও. সাহেব, একখানা আসন বাদ দিয়া গাঙ্গুলী মশায় ও রাধানাথ পর পর বসিল। মন্টুদা আমাকে ডাকিয়া কহিল, মাস্টার, তুমিও ব'সে যাও না এই সঙ্গে। লবণ ও লেবুর থালাটা তুলিয়া লইয়া কহিলাম, পরে খাব এখন।

মন্টুদা গর্জ্জিয়া উঠিল, পরে আবার কেন? এখন কি হ'ল?

ত্রস্তভাবে কহিলাম, পাগল নাকি! একসঙ্গে সবাই বসলে চলে? —বলিয়া চোখের ইঙ্গিত করিলাম।

মণীন্দ্র শান্ত হইয়া কহিল, আচ্ছা, একসঙ্গে খাব দুজনে।

ইতিমধ্যে দারোগাবাবু মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া এস. ডি. ও. সাহেব ও গাঙুলী মশায়ের মাঝখানের আসনটিতে বসিয়া আচারনিষ্ঠ ও আচারভ্রষ্ট দুই শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিলেন। প্রকাশ, তিনু ও তাহার দলবল খাদ্যদ্রব্য বহন ও পরিবেশন করিতে লাগিল। মণীন্দ্র যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি মুরুব্বিয়ানা করিতে লাগিলাম, এবং রাধানাথ ক্ষণে ক্ষণে আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কাসিতে কাসিতে দোলগোবিন্দ আসিয়া হাজির হইল। আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, কি ব্যাপার আজ? মোটর দেখলাম—

কাছে গিয়া চাপা গলায় কহিলাম, এস. ডি. ও. এসেছেন, খাচ্ছেন ওখানে।

দোলগোবিন্দ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, তাই নাকি! হুজুর খেতে এসেছেন? মস্ত আচ্ছা কাণ্ড করলে যা হোক। আর কে কে?

কহিলাম, গিয়ে দেখুন না।

দোলগোবিন্দ উঠিয়া গিয়া গলবস্ত্র হইয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়া যুক্তহস্তে ভক্তি-গদ্‌গদ স্বরে কহিল, হুজুর, নমস্কার।

এস. ডি. ও. সাহেব খাইতে খাইতেই প্রতি-নমস্কার করিলেন।

তারপর গাঙুলী মশায় ও রাধানাথের দিকে তাকাইয়া দোলগোবিন্দ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া কহিল, বাবাজীরাও ব'সে গেছ দেখছি।

তিনু কাছে গিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, ওখানে দেখুন গিয়ে। বলিয়া জানালার দিকে মুখের ইশারা করিল।

দোলগোবিন্দ জানালার কাছে আসিয়া দেখিয়া কহিল, অ্যাঁ, ভাই সাহেবরা পর্য্যন্ত! দাঁড়াও, একবার আসি ভাই।—বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

তারপর পাড়ার প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা একে একে আসিয়া হাজির হইতে

লাগিল। প্রত্যেকে এস. ডি. ও, সাহেবকে নমস্কার জানাইয়া, একবার ভোজনরত গাঙুলী মশায় ও রাধানাথকে এবং জানালার কাছে গিয়া আজিজ সাহেব ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। রাধানাথ ও গাঙুলী মশায়কে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তাঁহারা যেন কণ্টকাসনে বসিয়া তপ্ত অঙ্গার চিবাইতেছেন।

আহারাদি শেষ হইলে এস. ডি. ও. সাহেব মণীন্দ্রকে কহিলেন, যাঁর এত খেলাম, তাঁকে একবার ধন্যবাদ না জানিয়ে বিদায় নিলে নেমক-হারামি হবে। মনুবাবু, একবার খবর দিন মিসেস গাঙুলীকে।

মণীন্দ্র কহিল, আজ্ঞে, এখুনি ডেকে আনছি।

অচিরে দরজার সামনে শ্রীমতী গাঙুলীর আবির্ভাব ঘটিল, ইতিমধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া বিধি-সঙ্গত সাজসজ্জা করিয়াছে, মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন। এস. ডি. ও. সাহেবের আজ আর হাফ প্যাণ্টের হাঙ্গামা ছিল না। ভদ্র বাঙালীর বেশ—ধুতি, পাঞ্জাবি, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের লপেটা। নমস্কার করিয়া কহিলেন, খুব খাইয়েছেন, ধন্যবাদ।

সরোজিনী লজ্জিত হাস্যে মুখখানি অপরূপ করিয়া তুলিল। সত্তর সাহেবের দুই চোখে ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল। আজিজ সাহেব হাসিল, কিন্তু দাড়ির সুনিবিড় মেঘ ভেদ করিয়া সে হাসি বাহিরে ফুটিল না। দারোগাবাবু ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া হাত কচলাইতে লাগিলেন। রাধানাথ ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে আকাশের দিকে এবং গাঙুলী মশায় চিন্তাব্যাকুল মুখে ভূপৃষ্ঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

এস. ডি. ও. সাহেব কহিলেন, আপনার কথা আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পত্নী শ্রীমতী মিত্রকে বলেছি। তিনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। তা ছাড়া আরও অনেকে চান। চলুন না একদিন ওখানে।

সরোজিনী বাম পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে নতমস্তকে কহিল, যাব একদিন, কাজও একটু আছে। গেলে আপনাদের শ্রীমতীদের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা ক'রে আসব।—বলিয়া একবার মুখ তুলিয়া পরমুহূর্ত্তেই নামাইল।

এস. ডি. ও. সাহেব বিদায় লইলে একে একে সকলে বিদায়

লইলেন, গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ সর্ব্বাগ্রে, তারপর দারোগাবাবু, তারপর আজিজ সাহেব ও সত্তর সাহেব। আমি ও মণীন্দ্র বাড়ির ভিতরে ঢুকিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে সত্তর সাহেব আবার ফিরিয়া আসিল।

মণীন্দ্র আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিছু ফেলে গেছেন নাকি?

ঘাড় নাড়িয়া সত্তর কহিল, না, একটু দরকার আছে এখানে।—বলিয়া আমার দিকে তাকাইতেই, আমি মুখ ফিরাইয়া লইয়া অন্যমনস্কতার ভান করিলাম।

মণীন্দ্র ব্যস্ত হইয়া কহিল, কি দরকার, বলুন?

সত্তর কহিল, আপনার বোনকে একবার ডেকে দিন দেখি।

মণীন্দ্র ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, কেন? তার সঙ্গে আপনার—মানে, সে তো—

সত্তর ধমকের সুরে কহিল, জরুরী দরকার আছে। শিগগির ডেকে দিন। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

মণীন্দ্র ভয়ে ভয়ে কহিল, কি দরকার শুনতে পারি না?

সত্তর কহিল, খুব পারেন, একটা উপহার দিতে চাই।

মণীন্দ্র একবার আমার দিকে তাকাইল, তারপর তাহার দিকে তাকাইয়া আমতা আমতা করিয়া কহিল, উপহার! তাকে?

সত্তর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, যে মেয়েটির বিয়ে হ'ল তাকে।

বিস্ময় ও আনন্দে চোখ ও মুখ বিস্ফারিত করিয়া মণীন্দ্র কহিল, ওঃ, ফুন্টিকে। তাই বলুন।

দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিয়া কহিল, তা দিয়ে যান আমাকে, আমারই তো মেয়ে।

এবার সত্তর সাহেব ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, আপনার মেয়ে নাকি? তবে যে—

মনু কহিল, এ বাড়িতে বিয়ে হ'ল, এই তো? আমার বোনই আমার মেয়ের বিয়ে দিলে কিনা।

সত্তর কহিল, ওঃ, তাই। আমি ভেবেছিলাম—

ভেবেছিলেন, আমার বোনের মেয়ে। ঠিকই ভেবেছিলেন। আমার মেয়েকে আমার বোন মায়ের মতই ভালবাসে। তা আপনার যা দেবার আছে দিয়ে ফেলুন, দেরি ক'রে লাভ কি? ওদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

সত্তর সাহেব পকেটে হাত ঢুকাইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

মণীন্দ্র কহিল, আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ভাবছেন, মেরে দোব, মেয়েকে দোব না। বেশ। ওই তো মাস্টার রয়েছে, ও তো সাক্ষী থাকছে। তা ছাড়া, বাপ হয়ে মেয়ের জিনিস কেউ মেরে দিতে পারে মশায়?

এই সময়ে তিনু বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে ডাক দিয়া মণীন্দ্র কহিল, এস তো বাবা তিনু, একবার এখানে। তিনু কাছে যাইতেই মণীন্দ্র কহিল, একে দিন।

সত্তর ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, ওকে দোব না।

মণীন্দ্র দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, ওকেও দেবেন না? ও যে আমার জামাই, ওই দেখুন, ডান হাতে হলদে সুতো বাঁধা রয়েছে।

সত্তর সাহেব অগত্যা পকেট হইতে একটি নীল রঙের ছোট বাক্স বাহির করিয়া তিনুর হাতে দিয়া কহিলেন, আংটি, দেবেন আপনার বউকে, আমার নাম ক'রে।—বলিয়া পিছন ফিরিয়া গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মণীন্দ্র বাক্সটা তিনুর হাত হইতে লইয়া, খুলিয়া আংটিটি বাহির করিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া কহিল, সোনার, ভাল জিনিস, ফুল্টির আঙুলে বড় হবে ব'লে মনে হচ্ছে, তা তুমিই প'রো বাবাজী।

আগামীবারে সমাপ্য

শ্রীঅমলা দেবী

মৃত্যুভয়

কাল রাতে মৃত্যু দেখিলাম,
মৃত্যু নহে—মৃত্যুর স্বপন।
নিস্তব্ধ নির্জ্জন ঘর একা সঙ্গীহীন,
রাত্রি প্রায় শেষ,
স্রস্ত কেশ বিস্রস্ত বসন,
নিদ্রাশ্লেষ-পীড়ন-মর্দ্দিত
নিক্ষিপ্ত করিয়া ভূমে উপাধান দুটি,
মুষ্টিতল-পিষ্ট করি শয্যা-আস্তরণ,
চমকি জাগিয়া উঠিলাম,
জাগিলাম বিহ্বল-পরাণ,
আড়ষ্ট শীতল স্পর্শে ভয়ে স্পন্দহীন,
দ্রুতবেগস্পন্দিত-হৃদয়,—
নিশি-ভোরে মৃত্যু দেখিলাম।

জাগ্রত জীবনে কেহ জানিয়াছ বাসনার শেষ?
মধুমুগ্ধ স্বৈরগতি ভ্রমরের মত
ভ্রমিয়াছ কামনার ফুলে?
বিক্ষুব্ধ হৃদয়তলে যত ক্ষুধা আছে
আশা শঙ্কা ভয় দ্বেষ ঈর্ষা ব্যভিচার
অনুযোগ অভিযোগ মোহ ও বিকার,
সহসা পলকপাতে কভু
রূপান্তর লভেছে কি বর্ণান্তর-যোগে?
—উত্তরিতে জীবনের তীরে
ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত দূর অলকাপুরীতে,
যার পরে নাহি আর বাসনার রেশ!

পূরেছে কি সর্ব্ব মনস্কাম,
দেখেছ তাহারে ?
বিরহিণী যক্ষপ্রিয়া নহে—
পাণ্ডুক্ষাম-বদন-মলিন,
শীর্ণতনু রুক্ষকেশ ক্বচিৎ-জীবিত,
ফুল দিয়ে দিন গুণে যে কাটায় কাল।
ঈষৎ-রক্তিমা-মেশা মধুবর্ণ-দ্যুতি
স্ফুরিত অধরদলে মূচ্ছিতেছে মধুময়ী নেশা,
জীবনের সাম্রাজ্ঞী যেথায়—
পান করিতেছে হেসে বাসনা-আসব,
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে তনু মধুর বিবশ,
সেথা কি গিয়াছ কেহ—দেখিয়াছ অপূর্ব্ব বিলাস ?
অতি সূক্ষ্ম চন্দ্র-রশ্মিরেখা
চন্দ্রলোকে তরণী-বিহার,
অণুপরমাণু হতে পরম মহৎ
ইচ্ছামত নিবাস যাহার,
চঞ্চল অগ্নির শিখা মন্দ-মধু-বায়ে
শতলক্ষ পতঙ্গের প্রাণ-সঞ্জীবিত
দীপ্তিময়ী,—দেখেছ কি তারে ?—
আমি তারে দেখিয়াছি কাল রাতে স্বপনের মাঝে।

কাল রাতে দেখিনু স্বপন—
বহু-নদী-দেশ-মালা অতিক্রম করি
পঁহুছিনু ক্লান্ত-গতি শৈলপাদমূলে
ভারগ্রস্ত পশুর সমান,
ন্যুব্জ দেহ সাধ্য নাই ঋজু করিবার,
প্রাণে শুধু অন্ধ ইচ্ছা পথ চলিবার।
বালুকীর্ণ শৈলপিঠ 'পরে
প্রোথিত চরণযুগ,—প্রাণপণে তবু

উত্তরিনু শৈলশিরে।
নিম্নে বসুন্ধরা,
উর্দ্ধাকাশে জলিতেছে অগণ্য তারকা
নিবাতনিষ্কম্প স্থির প্রদীপপ্রচয়
আজ্ঞাবাহী স্থিত যেন সেবকের দল,
আর কেহ নাই,—
জনহীন বিশ্বভূমি—জাগ্রত আমিই,
আমি ভোক্তা ভোগ্য আর সব,
বলিলাম মনে মনে যা চেয়েছিলেম
সকলি পেয়েছি আজ;
উর্দ্ধে নীচে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে
উত্তরে দক্ষিণে সবি অধীন আমার।
আমি ছাড়া আর কিছু নাই।
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী এই আশ্চর্য্য প্রকৃতি
মোর করতলগত বদরিকা প্রায়,—
তৃপ্তি-সুখ-আনন্দ-উল্লাসে
হাসিলাম উন্মত্ত বিহ্বল।

সহসা মিলাল ছবি দূরে,—
চমকিত চেয়ে দেখিলাম,
সমস্ত ভুবন যেন তরলিত হয়ে
গলিয়া পড়িছে ক্ষীণ অঙ্গুলির ফাঁকে।
জোরে—আরো—আরো জোরে মুষ্টিতল চাপি
রাখিতে চাহিনু তারে,
সমগ্র দেহে ও মনে যত বীর্য্য ছিল
সবি এনে করতলে করিনু অর্পণ,
তবু মানিল না বাধা।
দৃষদ্-কঠিন দৃঢ় মুষ্টিতল হতে
ছায়াময় শরীরীর মত

নিঃশেষে ঝরিয়া গেল সমস্ত ভুবন—
সর্ব্ব-সুখ সর্ব্ব-আশা আনন্দ ভরসা—
নিষ্পলক চেয়ে দেখিলাম,—
দেখিলাম স্থাণুর মতন।

কাঁদিবারে চাহিলাম যেন,
শুষ্ক চক্ষু কণ্ঠ তালু ব্যাকৃত বদন,
আচ্ছন্ন মানস মুখে ভাষা কিছু নাই,
জ্বর-গ্রস্ত বিকারীর প্রায়
অর্থশূন্য দৃষ্টি মেলি চেয়ে দেখিলাম,
চারিপাশ হতে মোর শতলক্ষ রাঙা প্রজাপতি
উঠিতেছে মিলিতেছে মহাশূন্যে অতল আঁধারে,
সম্মুখে খেলিছে শুধু বহুবর্ণ বিচিত্রিত পাখা
সন্ধ্যার মেঘের মত, ক্ষণেকের তরে
সাধ্য নাই স্পর্শ করি তারে।
তবু যেন সর্ব্ব সত্তা বাসনা-আকারে
ফিরিতে চাহিছে পিছু তার।
স্বপ্ন-গ্রস্ত দুরাশা-বিকার,
শুধু শূন্যে লক্ষ্যহীন হস্ত-আস্ফালনে
ধরিতে চাহিছে মিথ্যা অলীক কায়ারে।

চকিতে আপন সত্তা ফিরিয়া পেলাম।
বলিলাম মৃদুমন্দ স্বরে,
ভুবন হারায়ে গেল যাক সে হারায়ে,
তবু আমি আছি,
আমি আছি আর আছে এই অনুভূতি,
আর কিসে প্রয়োজন মোর?
সর্ব্ব-দিক-দেশ-কাল-অবিচ্ছিন্ন আমি,

আপনাতে আপনি মহান।
জয়ধ্বনি করিলাম তৃপ্তি সান্ত্বনার।

জয়ধ্বনি নহে,
শ্রবণ বিদারি কাঁদে আর্ত্ত-কণ্ঠস্বর,
চারিদিকে নিচ্ছিদ্র আঁধার
সহসা জমাট বেঁধে এল,
কঠিন শীতল স্পর্শ লাগিল এ দেহে,
হিমশ্বাসে নাসারন্ধ্র হ'ল অন্ধপ্রায়,
কণ্টকিত আড়ষ্ট শরীর,
কি শঙ্কায় অধীর হৃদয়!
কি শঙ্কা সে বলিতে পারি না,—
যেন কোন আদিম বর্ব্বর
বন্যজন্তু অন্ধকার জিহ্বার লেহনে
গ্রাসিতে চাহিল ভীত মোরে।
আঁধারের অতল গহ্বরে
ডুবিয়া গেলাম আমি।
—যত ডুবি তত তল
প্রাণপণে উঠিবার যত চেষ্টা করি
তবু যেন উঠিতে পারি না,
মুষ্টি-ধৃত বালুসম খ'সে খ'সে যায়
যাহা কিছু ধরিবারে যাই;
—সে অন্ধকারের
তল নাই মাথা নাই সীমা নাই কোন,
গুরুপরিমাণ তবু তরল মসৃণ,
নেমে যেতে বাধা লাগে তবু বাধা নাই;—
আরো—আরো—আরো ডুবি যত—
কোথা তল—কোথা তল—কোথা তল খুঁজি,
উপরে ওঠার আর আর নাই কোন বাসনা হৃদয়ে,

—তবু তল কোথা!
দীপ্তিহীন চক্ষু মোর স্পর্শহীন ত্বক,
অবরুদ্ধ নাসারন্ধ্র শুষ্ক কণ্ঠ তালু,
বধির শ্রবণযুগ; স্খলিত উপল—
শুধু নীচে নেমে যাই নীচে নামি শুধু।
—বুঝিলাম মনে মনে এই মৃত্যু মোর,
এই মৃত্যু! যাহা এতকাল শুধু শুনিয়াছিলাম।
মুহূর্ত্তের মাঝে
মৃত্যুভয় জাগিল মানসে।
শঙ্কাহত উন্মাদ অন্তর
বলিবারে চাহিলাম অধীর আগ্রহে—
মৃত্যু নাহি চাই,—
মৃত্যু নহে মৃত্যু নহে—অনন্ত জীবন।
অনন্ত জীবন চাই অনন্ত কালের,
বাসনামণ্ডিত রাঙা সোনার জীবন।
ঘনীভূত অবরুদ্ধ অন্ধকার-পাশ
নির্ম্মম নখর-অগ্রে বিদীর্ণ করিয়া
হিমপ্রায় দেহ হতে টেনে খুলে দিতে
প্রয়াস করিনু কত,—নিষ্ফল প্রয়াস!
—ঘুম ভেঙে গেল।—
চৌদিকে দেখিনু চেয়ে বিহ্বল-পরাণ,
—নির্জ্জন নিস্তব্ধ ঘর একা সঙ্গীহীন,
রাত্রি প্রায় শেষ,
অদূরে শয্যার পাশে জ্বলিতেছে মাটির প্রদীপ
নিঃশেষ সলিতা ধূম-উদ্গার-বহুল,
ম্লান ছায়া কাঁপিতেছে দেয়ালের গায়ে,
ছায়া ছায়া ঘোর ঘোর বসনের স্তূপ,
স্বেদসিক্ত শয্যা-আস্তরণ।
স্পন্দহীন শয়ান শরীর,

অবসন্ন মন ভয়-ভাবনা-নিশ্চল,—
বুঝিতে পারি না নিজে মৃত কি জীবিত !
সেই গৃহ সেই শয্যা সেই দীপাধার,
পুরাতন পরিবেশ সেই নিত্যকার,
তবু যেন কোনখানে ছিদ্র রচিয়াছে
বহির্দ্দেশে সন্ধানী দৃষ্টির ;—
চিরাভ্যস্ত পরিচয় তারি মধ্য দিয়া
গলিয়া মিশিয়া গেছে অনন্ত নিশীথে
চিরকাল তরে,—শুধু আমি জেগে আছি
নিদ্রাহীন তৃষ্ণাহীন ক্ষুধাহীন আমি,
নিরালম্ব আলম্বন পিপাসা-কাতর,
ছায়াময় অমূর্ত্ত শরীর,
পৃথিবীর স্পর্শগন্ধশব্দরূপরস
কিছুই আমার তরে নহে।
এই গৃহ এই শয্যাধার
এও মোর অধিকারচ্যুত।
ভয়ঙ্কর ভয়হীন ছায়ামূর্ত্তি শুধু
বাতাসে করিয়া ভর মিশিবে আকাশে,
এই স্বল্প-পরিসর বদ্ধ-বায়ু ত্যেজি
অনন্ত—অনন্ত শূন্যে নিস্তব্ধ নিশীথে,
দূর দূর—বহুদূর—কে জানে কোথায় !
উন্মুক্ত জানালা দিয়া ম্লান নভঃস্থলে
দেখিনু একটি তারা দপদপ জ্বলে,
রাত্রি-শেষ-স্নিগ্ধ বায়ু বাতায়ন-পথে
প্রবেশ লভিল ঘরে,
বুলাল শীতল স্পর্শ অবসন্ন দেহে।
—তরাসে চমকি চাহিলাম—
এই স্পর্শ এই তবে মোর দেহ বুঝি !
স্পর্শ-শক্তি-বান দেহ জীবিত নিশ্চয়,

তবে আমি বাঁচিয়া রয়েছি !
আলোড়িত অন্তঃস্থলে জাগিল উল্লাস,
জীবনের উৎকট উল্লাস।
বিচিত্রা মধুরা ধরা আজো তবে নিতান্ত আপন
কণ্ঠলগ্ন-প্রিয়জন-স্পর্শ-রসাপ্লুত
আনন্দ-আবেগে দ্রুত স্খলিত-বচন
সুপ্তরবিকর কাল ভুঞ্জিব প্রভাতে।
বিচিত্র কুসুমপুঞ্জ ফুটিলে কাননে
বৃন্তদল ক্লিষ্ট করি করিব চয়ন,
যারে ইচ্ছা হয় দেবো তারে।
সুখ-দুঃখ-কণ্টকিত জানি এ জীবন
তবুও সীমা কি তার আছে মাধুর্য্যের ?
সেই মাধুর্য্যের
পসরা বহিব নিজ হাতে ;
আকণ্ঠ করিব পান অপর্য্যাপ্ত সুখে,
বিলাব সকল জনে তাহা,
বিলাব সকল জনে আমি প্রাণবান।
এই মৃত্যু মৃত্যু নহে মোর,
ভাবিলাম মনে,
এই মৃত্যু মৃত্যু নহে মোর,
জানি নিশীথের মাত্র ভঙ্গুর স্বপন।
আনন্দ-বাষ্পের বেগে নেত্র ছলছল
বারে বারে বলিলাম কম্পিত-হৃদয়,
এ শুধুই স্বপ্ন, স্বপ্ন মৃত্যু নহে—মৃত্যু নহে মোর,
এ শুধুই মৃত্যুর স্বপন।

সত্য কি এ স্বপ্ন শুধু আর কিছু নহে ?
বিকল শয্যার পাশে খোলা বাতায়ন—
প্রদীপ নিভিয়া গেল হঠাৎ বাতাসে,

—দূরে দেখিলাম,—
স্থির তরুশিরে আঁকা পঞ্চমীর চাঁদ
পাণ্ডুর পঞ্চমী-চাঁদ বিমর্ষ আকাশে
ক্রমে ক্রমে নিভে আসে।
ঘন অন্ধকার—
সেই ঘন অন্ধকার পটভূমিকায়—
ক্রমশ উঠিল ফুটে দৃশ্য খরতর।
স্পষ্ট দেখিলাম
মৃত্যুভয়ত্রস্ত জীব সারি সারি ছুটিয়াছে বেগে,
কোথায় জানে না কেহ।
আদি নাই অন্ত নাই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশূন্য ব্যোম
ব্যাপিয়াছে শুধু মৃত্যুভয়;
লক্ষশত প্রাণ
নিভিতেছে জ্বলিতেছে নক্ষত্রের মত,
মৃত্যু হানিতেছে ওষ্ঠে শীতল চুম্বন।

আহা এত প্রীতি-প্রেম-স্নেহ-ভালবাসা
কোথা রেখে যাবে তারা?
জীবনের মাঝে
যাহারা উঠেছে ফুটে সরল শোভায়
ছোটখাটো সুখ দুখ হাসি অশ্রু সাথে
কোথায় মিলাবে তারা?
বুক-চেরা যতনের ধন
সম্ভোগ-আনন্দ-তৃষা-ব্যথিত জীবন
এ কি শুধু ক্ষণিক বিলাস!
তারপর আর কিছু নাই,—
আছে শুধু মহাব্যোম-ব্যাপী মৃত্যুভয়
কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর।

কে না জানে জীবনের অনন্ত পিপাসা!
কে না জানে জীবনের নিত্য পরিণাম!
ভয়ত্রস্ত যেতে যেতে তাই
কিছু রেখে দিয়ে যাই অমৃতের আশে,
গ'ড়ে তুলি সংসার সমাজ।
দেহের পুনরাবৃত্তি জন্মদ্বার দিয়ে
আনে শুধু জীবনের অখণ্ড স্পন্দন।

তবু হায় নিস্তার কোথায়?
পশ্চাতে ফিরায়ে মুখ যতদূর চাই
নাই—নাই—কোনো কিছু নাই,
শত রাজ্য ভাঙে গড়ে হৃদয় হারায়,
শত ফুল ফোটে ঝরে নির্মম ধরায়,
সহস্র চূর্ণিত আশা দিকচক্রবালে
মরীচিকাময়ী শুধু হানে বিভীষিকা
নিরন্তর ত্রস্ত আঁখিযুগে।
সেই বিভীষিকা
যত মোরা ছুটে চলি তত পিছু আসে।
যত মোরা এড়াইতে চাহি—
তত ঘোর ছায়া ফেলে শূন্য ব্যোমতলে।
তারপর দেখি—
চলিবার পথ আর নাহি,
চারিদিকে ঘেরিয়াছে অন্ধ-অন্ধকার,
পশ্চাৎ হইতে টানে কৃষ্ণ অষ্টাপদ
বিষাক্ত বাহুর ঘেরে করিয়া বেষ্টন।
সে ভীম কবল হতে মুক্তি লভিবারে
যত ছুটে চলি আগে—তত ভয়ঙ্কর
প্রসারিত করে দীর্ঘ কর,
কঠিন বেষ্টন তার তেমনি ভয়াল

তবু শেষ নাই,—
অন্তহীন আকাশেরো শেষ নাই কোথা!
—সহসা সম্মুখে নামে নিশ্চল-বিস্তার
—জীবনের মরণের মাঝে—
মৃত্যুভয়-যবনিকা নিস্তরঙ্গ স্থির,
পটভূমিকায়
শুধু ভাসে ছায়া-ছবি ভাসে ও মিলায়,
অনন্ত শর্ব্বরী-কোলে তারকার মত,
এই কৃষ্ণ যবনিকা রহস্যমণ্ডিত
এই মৃত্যুভয়।

এই মৃত্যুভয় তারে জানাই প্রণাম!
বলিলাম স্থিরকণ্ঠে এই মৃত্যুভয়
যতকাল আছে আমি আছি,
হোক দেহ হোক তাহা মন
হোক তাহা ভিন্ন আরো কিছু।
এই মৃত্যু ভয়—তাই দেহের দেউলে
প্রাণপণ করি আরাধন
দেবতা-দর্শন লাগি,
যেথায় সে নিয়ত আসীন
দেহ হতে দেহ সৃজি দীপ হতে দীপে
চিরকাল মধুর আরতি,
আমার সন্তানমাঝে চির-আয়ুষ্মান
চিরকাল-ব্যাপী সেথা মোর জাগরণ।
এই মৃত্যুভয়—তাই মানসের ছায়ানীল তটে
মোর ছবিখানি
রেখে যেতে চাই শুধু গীতে ও গাথায়,
বর্ণের বিন্যাসে আর সুরের বিলাসে।
সবাকার সুখে দুখে মোর অনুভূতি

চিরকাল দোলা দেয় আনন্দে ব্যথায়
চিরকাল রই আমি বেঁচে।
এই মৃত্যুভয়—তাই খুঁজি সত্তা তার,
জ্যোতিষ্মান চির-রূপময়,
জড়দেহ গতিশীল মন হতে বিশিষ্ট যেজন,
খুঁজি তারে তমসার পারে
তার মৃত্যুহীনতায় জাগে মোর বাঁচিবার সাধ।
এই মৃত্যুভয়—তারে জানাই প্রণাম,—
যার লাগি বীজ-ধ্বংসে অঙ্কুরের জাগে সম্ভাবনা
কায় হতে কায়ান্তরে রঙিন বাসনা,—
মহাকাল নির্ম্মম কঠিন
যতকাল আছে আমি আছি ;—
যতকাল মৃত্যুভয় ততকাল আমিও অমর।

•

কাল রাতে দেখিনু স্বপন—।
—নিস্তব্ধ নির্জ্জন ঘর একা সঙ্গীহীন,
রাত্রি প্রায় শেষ,
পূর্ব্বাকাশে মিশিতেছে আলো আঁধারের
যুগল বাহুর ঘন মুগ্ধ আলিঙ্গন,—
তারি পানে নিষ্পলক চাহি
বলিলাম নিস্তরঙ্গ মন,
—এও শুধু স্বপ্ন স্বপ্ন—সত্য কিছু নহে
—নিশিভোরে মৃত্যু দেখিলাম।

উমা দেবী

পিশাচ

রাসমণি

রাসমণি কবে এবং কোথায় জন্মাইয়াছিল, কেহ জানে না। দীর্ঘকাল প্রবাসে বাস করার পর হঠাৎ একদিন রাসমণির পিতা গ্রামে ফিরিয়া আসিল। ভগ্ন কোঠাবাড়িটাকে রাজমিস্ত্রীর দল বাসোপযোগী করিবার জন্য পরম উৎসাহে কাজে লাগিয়া গিয়াছে। সাময়িক বসবাসের জন্য রামু গোয়ালা তাহার আটচালা ছাড়িয়া দিয়াছে। এত বৎসরের একত্রিত খাজনা নবীন স্যাকরা (রাসমণির পিতা) নাকি এক দিনে সব টাকা দিয়া জমিদার ছোটকর্ত্তার সহিত বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছে। অল্পদিনের ভিতরেই পরিত্যক্ত কোঠাবাড়িটি চকচকে ঝকঝকে হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে নবীন প্রচার করিয়া দিয়াছে, সঙ্গের মেয়েটি তাহার কন্যা। কন্যার মাতা বিদেশে মারা গিয়াছেন।

কোঠাবাড়ির নূতন ছাঁদ দেখিয়া সকলেই বুঝিল, নবীন বেশ পয়সা করিয়াছে। কারণ শুধু সে বাকি খাজনা চুকাইয়া দেয় নাই, এক লপ্তে চার শত বিঘা আবাদী জমি ইজারা লইয়াছে, আট জোড়া বলদ কিনিয়াছে, কামার-বাড়িতে নূতন হালের ফরমাশ দেওয়া হইয়াছে, বাস্তুভিটার পিছনদিককার ছোট পুকুরটাও আরও বড় করিয়া কাটানো হইতেছে।

বৎসর না পার হইতেই নবীন স্যাকরা গ্রামে একটি গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিল। সামান্য ঘনিষ্ঠতার পরই গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিরা চিনিয়া ফেলিল, রাসমণি কে। মুখটি তাহার হুবহু ক্ষান্তর মত হইয়াছে, রং পাইয়াছে বাপের মত, একেবারে পালিশ-করা আবলুস কাঠ। ক্ষান্তই যে রাসমণির মা, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিল না।

ক্ষান্ত, বাঁড়ুজ্জেদের সেই সোমত্ত বিধবা মেয়েটা, যাহার চরিত্রের জ্বালায় পাড়ার লোকদের কোথাও মুখ দেখাইবার উপায় ছিল না। ওই ধিঙ্গী মেয়েটাই তো নবীন স্যাকরার সহিত পলাইয়াছিল। উহাদের দেখা-শুনা বন্ধ করিবার জন্য চণ্ডীমণ্ডপে কত রকম আলোচনা ও আয়োজন



হইয়াছিল, কেহই উহাদের সাক্ষাৎ ঠেকাইতে পারে নাই। তাহার পর কেলেঙ্কারি আর যখন লুকাইবার কিছু থাকিল না, তখন বাঁড়ুজ্জে মহাশয় চীৎকার করিয়া ক্ষান্তর নাম ধরিয়া বলিয়াছিলেন, তুই যদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে না যাস তো আমার মাথা খাস। তুই আর এক দিন যদি এখানে থাকিস, আমি গলায় দড়ি দোব। যতই ঢাকিবার চেষ্টা করুক, ক্ষান্তর দৈহিক গঠনের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা আর লুক্যানো যায় না। মায়ের প্রায় বৃদ্ধ বয়সে সন্তানসম্ভাবনা হইয়াছে, তিনি একই কারণে কন্যার জন্য মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন। মোটা লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া থান-পরিহিতা পূর্ণযুবতী কন্যাকে বলিলেন, তুই এ কি কাণ্ড করলি, আমার মুখ দেখাবার কিছু রাখলি না! কন্যা কোন প্রতিবাদ করে নাই, কেবল মাতা ও নিজের দেহের তুলনা করিয়াছিল। এই ঘটনার পরের দিন ক্ষান্ত ও নবীনকে গ্রামে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

নবীন গ্রামে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই বাঁড়ুজ্জে মহাশয় গত হইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী ভিন্নগ্রামে ভ্রাতার একান্নবর্ত্তী পরিবারে রাঁধুনীর কাজও করেন, ভ্রাতুষ্পুত্রদের দেখাশুনাও করিয়া থাকেন। সে অনেকদিন হইয়া গেল। ক্ষান্ত, নবীন ও বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের কথা এখন বড় একটা কেউ বলে না। কেলেঙ্কারি পুরাতন হইলে তাহার ঝাঁজ কাটিয়া যায়। ঝাঁজ না থাকিলে কেচ্ছার আলোচনায় তেমন আরাম পাওয়া যায় না, সেই কারণেই উহাদের কথা সকলে ভুলিয়াছে।

রাসমণি-সহ নবীন ফিরিয়া আসিতে দুই-চারিজন দিন কতক কানা-ঘুষা করিয়াছিল। কিন্তু বাড়ি, জমি ইত্যাদি দেখিয়া বুদ্ধিমানরা এ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল। রাসমণি তখন কিশোরী—যৌবন সবে হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু সে তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে সব কিছুর ভিতরই কেমন একটা নূতনের সাড়া পাইতেছিল মাত্র—কিন্তু নূতনকে সম্পূর্ণ অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই।

পিতামাতার একমাত্র সন্তান, গোড়া হইতেই একটু বেশি রকম আদর পাইয়াছিল, অর্থাৎ সে নিজের ইচ্ছামত চলিত। গাছে উঠিয়া পেয়ারা খাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সমবয়স্ক ছেলেদের সহিত সে বালকের

মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইচ্ছামত বাড়িয়া উঠার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকিলেও দুঃসাহসিকতা ছিল। নিজের উচ্ছ্বাস সে দমন করিতে পারিত না। এই বয়সে অপর মেয়েরা অপরাহ্ণে নিয়মিতভাবে প্রসাধনের নিমিত্ত গুরুজন-স্থানীয়াদের নিকট দেহ সমর্পণ করিয়া থাকে। চুলের গোছা লইয়া যখন পিসীমা, খুড়ীমা অথবা জননী পিছন হইতে প্রাণপণ শক্তিতে টান মারেন, তখন যন্ত্রণা উৎকট হইয়া উঠিলেও সহ্য করাটাই প্রসাধন-সাফল্যের অপরিহার্য্য ধর্ম্ম। কোন মেয়েই এই সময়টিতে অবাধ্য হইতে সাহস পায় না, সৌন্দর্য্যের টীকা সুনিশ্চিত করিবার জন্য। রাসমণির চুল বাঁধিয়া দিবার জন্য কেহ ছিল না। তাহার যে-দিন ইচ্ছা হইত চুল বাঁধিত, যেদিন ইচ্ছা হইত না ধূলায় ভরা এলো চুলে ঘুড়িয়া বেড়াইত। কোন বকাটে ছেলে রাসমণির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া একদিন 'পাগলী' বলিয়া হাসিয়াছিল, রাসমণি বাম হস্তে অর্দ্ধভুক্ত কামড়-দেওয়া পেয়ারাটা লইয়া দক্ষিণ হস্তটা ব্যবহার করিয়াছিল একটি ভাল রকমের চড় কষাইবার জন্য।

চড় খাইয়া ছেলেটি ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার পর সে রাসমণির ত্রিসীমানায় আসে নাই। রাসমণি এই ভাবে একটা উগ্রগন্ধযুক্ত বনফুলের মত বাড়িয়া উঠিতেছিল।

অল্প সময়ের ভিতর বনফুলের তীব্র গন্ধ অনেকের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। ফুলটি কণ্টকপূর্ণ, কেহ নিকটে আসিতে সাহস পাইল না। কিন্তু গন্ধটা যে চড়া, তাহা রসিকমাত্রেই মনে মনে স্বীকার না করিয়া পারিল না।

উপযুক্ত সময়ে নব-প্রস্ফুটিত বনফুলের বার্ত্তা বায়ুতে বহন করিয়া আনিল নলিন স্বর্ণকারের নিকট। নলিন স্বর্ণকার জাতব্যবসায়ী; সোনা-রূপার গহনার দোকান আছে, এবং পুরাতন গহনার ব্যবসায়ের সহিত তেজারতির কারবারও চলে। ঋণীর দল আসল দিতে আসিলে বলে, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মশাই, এ তো ঘরের কথা, অসুখ আছে, বিসুখ আছে, আপনাদের টাকার প্রয়োজন কত, আমি কি আপনাদের পর? সামান্য যা সুদ হয়েছে, সেইটুকু দিলেই চলবে। ঋণ-গ্রস্তরা সবই বুঝিত, তথাপি একসঙ্গে অতগুলি টাকা ঘর হইতে বাহির

করিয়া দেওয়া সোজা কথা নয়। নলিনের উপদেশ মানিয়া লইত; সুদের ক্রমবৃদ্ধিতে নলিন হৃষ্ট হইয়া উঠিত।

নলিন লোকটা মোটের উপর মন্দ নয়। ব্যবসায়ী বুদ্ধি একটু বেশি রকম কড়া না হইলে সকলেই প্রাণ খুলিয়া বলিত, লোকটা চরিত্রের দিক দিয়া আদর্শ পুরুষ। কিন্তু গ্রামের গণ্যমান্য অনেকেই নলিন সরকারের নিকট ঋণগ্রস্ত, সুতরাং প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। নলিন সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলেই ধারের কথা আগে মনে আসে।

অর্থ সম্বন্ধে যতটুকু দুর্ব্বলতা থাক, নলিন যে চরিত্রের দিক দিয়া আদর্শ মানুষ—এ কথা সকলেই অকপটে স্বীকার করে। এত ভাল চরিত্র যে, বাড়িতে একটি সোমত্ত বয়সের ঝি পর্য্যন্ত রাখে না। এমন একটি মহাপুরুষের নিকট হইতে যখন রাসমণির সহিত বিবাহের প্রস্তাব আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাসমণির পিতা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস পাইল না। নলিন ইতিমধ্যে দুই দুই বার পাণিগ্রহণের অবশ্য-কর্ত্তব্য সারিয়া ফেলিয়াছে। রাসমণির সহিত বিবাহের প্রস্তাব তৃতীয় বারের পালা। নলিনের পূর্ব্ববিবাহের ইতিহাস আছে, তাহা উপাদেয় না হইলেও এই গল্পের সহিত জড়িত।

প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে নলিনের পিতা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে যাহারা বিবাহ করিত, তাহাদের মতামতের কোন প্রয়োজন হইত না; অভিভাবকরা বিবাহ দিয়া দিতেন। নলিনের বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বিবাহের কিছুদিন পরেই গৃহস্থালির সমস্ত ভার নলিন ও বউমার উপর চাপাইয়া নলিনের পিতা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। লোকে বলিল, বউটা সুলক্ষণা নয়, ঘরে না আসিতেই শ্বশুরকে খাইল। ইহা প্রথম পক্ষের বধূ শুনিয়াছিল। অভিযোগ করিবার কিছু নাই; কারণ সে জানিত, সনাতনপন্থীর বিচারে বাড়ির প্রাচীন অকর্ম্মণ্য ছাগলটি মরিলেও দোষ পড়িত বউয়ের উপর।

বিবাহের পর ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। উভয়ে উভয়কে জানিবার সুযোগ ইতিমধ্যে যতটুকু পাইয়াছিল, তাহাই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। গৃহস্থের বউ হইলেও তাহারও

একটা সহ্যের সীমা আছে। এই সীমা একদিন অতিক্রম করিল। প্রথম পক্ষ বলিয়া ফেলিল, এ সংসারে বাঁচার চেয়ে মরণ ভাল। আমি গেলেই সকলের হাড় জুড়বে। যাচিত ঘটনাটি ঘটিতে বেশি দিন সময় লাগিল না। নলিনের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া প্রথম পক্ষ গলায় দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। কতটা যন্ত্রণা পাইয়া সে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিল, তাহা সাধারণের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া গেল। সকলে বলিল, অলুক্ষণে বউ গেছে, বাঁচা গেছে। পুরুষমানুষের বিয়ের ভাবনা!

আদালতে যথাসময়ে মামলা উঠিল, দারোগা হইতে সকলেই বলিলেন, নলিনের মত সৎচরিত্রের মানুষ দেখা যায় না। নলিন নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি পাইল। হাকিম রায় দিলেন—আত্মহত্যায় মৃত্যু; কারণ অজ্ঞাত।

এই ঘটনার পর মাত্র তিনটি মাস নলিন ধৈর্য্যকে ঠেকা দিয়া রাখিয়াছিল। ঘটকদের ঘন ঘন গতায়াত চলিতেছিল। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া একদিন কন্যাদায়গ্রস্ত একটি প্রপীড়িত পিতাকে নলিন উদ্ধার করিয়া ফেলিল। বিবাহ এবার নিজের পছন্দমত হইয়াছিল। সবল সুস্থ বউ ঘরে আসিল। গৃহস্থালির কাজ ভালই চলিতেছিল; কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পায় নাই। নলিন আলদা ঘরে শুইত। এই অকারণ ব্যবধানের প্রশ্ন মেজবউয়ের অন্তরকে কণ্টকের মত বিঁধিতেছিল, কিন্তু কখনও সে অভিযোগ করে নাই। বুক ফাটিয়া গিয়াছে, কারণটি জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া লজ্জার কশাঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া স্বামীর সামনে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। নিজেকেই প্রশ্ন করিয়াছে, কেন এমনটি ঘটিল? কেন তাহার নিজের স্বামীর নিকট যাইবার অধিকার নাই? যে মানুষ দিনের বেলা ভাষার আদরে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তোলে, সেই মানুষই রাত্রির অধিকতর সুযোগ পাইয়া এই অস্বাভাবিক দূরত্ব সৃষ্টি করে কেন? স্বামীর আচরণ স্ত্রীর নিকট রহস্যময় হইয়া উঠিতেছিল। ক্রমে তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিল। মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ অতি নিকট, ধীরে ধীরে মেজবউ হিষ্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল।

নলিনের ভাগ্যে ঘটনাচক্র সাংঘাতিকভাবে ঘুরিতেছিল। নলিন একদিন দোকান হইতে ফিরিয়া দেখিল, মেজবউ আঁস্তাকুড়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। অনেকক্ষণ বোধ হয় হাত-পা ছুঁড়িয়াছিল। খানিকটা জায়গা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মেজবউ পাতকুয়ায় মাছ ধুইতে আসিয়াছিল, একটি বড় কই কাঁটা সহ হাতের মুঠার ভিতর নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে। কাঁটাগুলি তখনও হাতের নরম তালুতে বিদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বাহির হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে। নলিন পোদ-পিসীকে ডাকিয়া আনিল—পুরুষ কাহাকেও তো ডাকা চলে না, অঙ্গবস্ত্র স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। উভয়ে মাথায় বুকে জল দিতে আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। পোদ-পিসীকে সামনে দেখিয়া মেজবউ মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। সমস্ত দেহ ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। পোদ-পিসী জিজ্ঞাসা করিল, জল খাবে? মেজবউ মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। নলিন জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছিল বউ?

মেজবউ পোদ-পিসীর কানের নিকট মুখ লইয়া বলিল, আমি এইখানে বড়দিকে দেখেছিলাম, আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিলেন, সাদা কাপড় প'রে ওইখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, ওই যে ওইখানটায়।—এতটা বলিয়া আলো-আঁধারিতে গোয়াল-ঘরটার দিক তর্জ্জনীর দ্বারা দেখাইয়া দিল। নলিন ও পোদ-পিসী উভয়েই সেদিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, কিছুই নাই, কেবল ঝুমু গোয়ালার ছেঁড়া কাপড়টা লম্বা-লম্বি ঝুলিতেছে। কাপড়টি একটি বাঁশের উপর হইতে যে ভাবে নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে অন্ধকারে হঠাৎ দেখিলে ঘোমটা-দেওয়া নারী-মূর্ত্তির মতই লাগে বটে। কাপড়টা তুলিয়া আনিয়া নলিন মেজবউকে দেখাইল। কাপড় দেখিয়া মেজবউ একটু হাসিল, পোদ-পিসীর কাঁধে ভর দিয়া ঘরে আসিয়া বসিল। পিসী কাপড় দেখিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই। কানের কাছে মুখ আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেপিলে হবে নাকি রে? মেজবউ মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। পিসী বিশ্বাস করিল না, গালে ছোট্ট একটি ঠোনা মারিয়া বলিল, মা হবি, তাতে লজ্জা কিসের বউ? উত্তরে মেজবউ প্রতিবাদ করিবার জন্য আরও জোরে

মাথা নাড়িয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। পিসী নিজের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া বলিল, ছি, এ অবস্থায় সন্ধ্যেবেলা আঁস্তাকুড়ে একলা যেতে আছে বাছা, তার ওপর আবার সঙ্গে মাছ নিয়ে গেছিস! আর ওখানে একলা যাস নি। আড়ালে নলিনকে ডাকিয়া বলিল, বারদোষ লেগেছে, তার ওপর অপঘাত কিনা—দেখো, যেন বড়বউ ভর না ক'রে বসে। সন্তান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পিসী চলিয়া গেল।

নলিন রোয়াকটায় বসিয়া ছিল, মেজবউ তাহার নিকটে আসিয়া কম্পিত গলায় বলিল, আমাকে কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। এখানে সমস্ত দিন একলা থাকি, বড্ড ভয় করে। বড়দিকে এর আগেও দু-একবার দেখেছি, ঠিক তুমি যে রকম চেহারা বলেছিলে, সেই রকম। তখন কিন্তু আমাকে ডাকেন নি। আজ ওখানে মাছ ধুতে গিয়েই দেখলাম, গোয়াল-ঘরের দরজার সামনে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন এবং আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। তারপর আমার মনে হ'ল, তিনি বলছেন, দে না, গলায় দড়ি দে, আমার কাছে চ'লে আয়, তোর সব দুঃখু ঘুচে যাবে। আরও হয়তো কিছু বলিবার ছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না, নিতান্ত অসহায়ার মত নলিনের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল, আমাকে বাবার ওখানে পাঠিয়ে দেবে? নলিন একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে দুপুরবেলায় দাওয়ায় মেজবউ আপন মনে বসিয়া ছিল, হঠাৎ তাহার গলায় দড়ি দিবার কাতর আহ্বান মনে পড়িল। পরক্ষণেই অনুভব করিল, বড়বউ অদৃশ্যভাবে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং ফিসফিস করিয়া বলিতেছেন, আর কতকাল ভুগবি, সোমত্ত বয়েস নিয়ে আর কতদিন ভুগবি, গলায় দড়ি দে, তোর সব দুঃখু কেটে যাবে, আয় আয়, আমার কাছে চ'লে আয়।

মেজবউ উঠিল, দৃষ্টি তাহার সম্মোহিতের মত। যে ঘরে বড়বউ আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। শূন্য দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি দেওয়াল দেখিল; আর দেখিল যেখান হইতে বড়বউ ঝুলিয়াছিল সেখানটা। অনুমানে মেজবউ অতীতের সব ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিতেছিল। ওই তো সেই দড়ি, এখনও তাহার খানিকটা অংশ

বাঁশের সহিত আটকাইয়া আছে। কে বলিবে, উহা দড়ি নয়, উহা ঝুল, আবর্জ্জনা পরিষ্কারের অভাবে নিজের অস্তিত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে। মেজবউ দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া কি কামনা করিল, তাহার পর জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। পরের দিন নলিন নিজে অনাহূতভাবে মেজবউকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি উপস্থিত হইল। একটি গ্রামের পরেই নলিনের শ্বশুরালয়। নলিন না বলিলেও মেজবউয়ের পিতামাতা সব খবরই রাখিতেন। অসুস্থতার কারণ যখন অহেতুক জানিতে পারিলেন, তখন উভয়েই কন্যার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—সোমত্ত মেয়ে, কিছু যদি ঘটিয়া যায়!

কিছুদিন সহজভাবে কাটিয়া যাওয়ায় পিতামাতা উভয়েই নিশ্চিন্ত হইয়া আসিতেছিলেন, রোগটা তাহা হইলে হয়তো সারিয়া যাইবে। অনেকদিন পর বাপের বাড়িতে আসিতে পাইয়া মেজবউ বেশ সুস্থ বোধ করিতেছিল। এই কারণে তাহাকে আগলানোর সাবধানতাও শ্লথ হইয়া আসিতেছিল। ভবিতব্যের উপর কাহারও হাত নাই। মাতা সেদিন কিছু আগে ঘাটে বাসন লইয়া গিয়াছিলেন, পিতাও তখন কর্ম্মস্থলে। এমনই সময় দেখা গেল, মেজবউয়ের বাপের বাড়িতে আগুন লাগিয়া গিয়াছে, হেঁসেলঘরের ছাউনি দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ক্ষণিকের ভিতর অগ্নি দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া ছুটিয়াছে গৃহস্থের আশ্রয়কে গ্রাস করিতে। গৃহদাহের বার্ত্তা অগ্নি নিজেই বহন করিয়া চলিল দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে। পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিল বালতি ঘটি, যে যাহা সামনে পাইল, তাহাই লইয়া।

মেজবউয়ের মাতা পুকুরঘাট হইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, আমার কি হ'ল গো, মেয়েটা যে ঘরের ভেতর রয়েছে! চীৎকার শুনিয়া দুই একটি সাহসী ছেলে হেঁসেলঘরে ঢুকিয়া পড়িল—মেজ-বউ একেবারে উনানের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে, সব কাপড়ে তখনও আগুন লাগে নাই, কিন্তু পেটটা একেবারে ঝলসিয়া গিয়াছে। যখন মেজবউকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনা হইল, তখন তাহার দেহ প্রাণহীন অসাড়। সকলের চেষ্টায় আগুন নিবিয়া গেল। খবরটি

যথাসময়ে নলিনের নিকট আসিয়া পৌঁছাইল। নলিন কাঁদিল না, স্তব্ধ হইয়া সংবাদটি গ্রহণ করিল। লোক সংগ্রহ করিয়া গরুর গাড়িতে গমন করিল। চিতার সর্ব্বগ্রাসী অগ্নি মেজবউয়ের বাকি অংশটুকুও উপযুক্ত সময় পুড়াইয়া দিল।

শ্মশানযাত্রীর দল ফিরিয়া আসিয়া নলিনকে পরামর্শ দিল, ঘরটা ভাঙিয়া ফেল, তাহার পর ত্রিরাত্রি ওখানে আগুন জ্বালাইয়া রাখিলে দোষ কাটিয়া যাইবে। একটা লোহার পেরেক দরকার, সেইটাই ডাইনীর কুনজর হইতে রক্ষা করিবে। নলিন এবার নিজেই একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিল, কি জানি, গত দুইজনেই যদি তাহাকে তাহাদের পথ অনুসরণ করিতে বলে! শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে একজনকে তাহার সহিত বাকি রাত্রিটা থাকিতে বলিল। একজনের পরিবর্ত্তে সকলেই থাকিয়া গেল, কারণ পান এবং অনুপান উভয়েরই বন্দোবস্ত প্রচুর পরিমাণে ছিল। সমস্ত রাত্রিটা নলিন বাদে সকলে মিলিয়া হুল্লোড় করিয়া মেজবউয়ের জন্য শোক প্রকাশ করিল।

দুই বৎসর হইতে চলিল, মেজবউ মরিয়াছে। রাসমণির বাড়ন্ত গঠনের কথা হাওয়ায় উড়িতেছিল—যথাসময়ে তাহা নলিনের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। ভোজনপ্রিয় হিতৈষীর দল উৎসাহিত হইয়া নলিনকে প্রায় উত্তেজিত করিয়া তুলিল, আরে বাপু, কালো হ'ল তো কি হ'ল? অমন আগলা-শ্রী মেয়ে দেখেছ কোথাও? চেহারাটাই লক্ষ্মীমন্ত। হিতোপদেশের বোঝা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। অবশেষে নলিন ঠিক করিয়া ফেলিল, রাসমণিকে সে বিবাহ করিবে।

নলিনের মত একটি আদর্শ পুরুষ পরোপকারার্থ বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন জানিতে পারিয়া রাসমণির পিতা শুভকার্য্যে কালবিলম্ব করিলেন না। বিবাহে স্ত্রী-আচার হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি অবশ্য-পালনীয় অনুষ্ঠান ছিল, সবেতেই জামাই এবং শ্বশুর প্রাণ ভরিয়া খরচ করিল। বরপক্ষ উদর পূর্ণ করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গেল, বার বার তিনবার, এবার টিকে যাবে।

রাসমণি ফুলশয্যায় সমবয়স্কাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছিল, খেলিয়াছিল; ফুল ছুঁড়িয়া নিজের বরকেই মারিয়াছিল। ইহা লইয়া

বরপক্ষের দুই-একজন প্রাচীনা নিজেদের মধ্যে অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। রাসমণির কানে খবরটি আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল, কিন্তু ভব্যতার সব আইন তাহার জানা ছিল না ;, ভাবিল, উহা হয়তো এক রকমের রসিকতা। কয়েকটি বলিষ্ঠা মেয়ে রাসমণিকে শূন্যে উত্তোলন করিয়া নলিনের ক্রোড়ে বসাইয়া দিল। রাসমণি কিছুমাত্র বাধা দিল না। রাসমণিকে তাহার সমবয়স্কারা চিনিত, কানে কানে কি বলিল। রাসমণি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, কি, আমি পারি না? এই দেখ।

"এই দেখ" বলিয়া যাহা সে করিল, তাহা পাশ্চাত্য সমাজে অধুনা চলন হইলেও দেশী কোন নববধূ স্বামীর সহিত প্রথম সাক্ষাতে সকলের সামনে তাহা করিতে পারিত না। রাসমণি বরের গাল টিপিয়া একটি গোটা চুম্বন করিয়া ফেলিল। চুম্বনের পরেই একজন সখীকে ডাকিয়া কানে কানে বলিল, ভাই, ওর মুখে বিচ্ছিরি গন্ধ। নলিন বহুদিন হইতে পাইওরিয়ায় ভুগিতেছিল। দাঁতের বেদনা অনুভব করিলেও গন্ধের খবর সে নিজেই জানিত না। কিশোরীর অর্থহীন চুম্বন প্রৌঢ় নলিনকে প্রেম-মদিরায় নিমজ্জিত করিয়া দিল। নলিনও হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। রাসমণিকে হৃদয়ের বাহির ও অন্তর স্পর্শ করাইয়া গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিল। সার্কাসের ক্লাউন যেন নূতন খেলা আমদানি করিয়াছে। সকলেই বুড়া বরের কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া লুটাপুটি। সকলের হাসির সহিত নলিনও যোগ দিল, যেন তারের যন্ত্রগুলি একসুরে বাঁধা হইয়া গিয়াছে, একের ঝঙ্কারে অপরে বাজিতেছে।

রাত্রির গভীরতার সহিত ক্রমে আমোদের ঝঙ্কারও কমিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে দুইটি প্রাণী থাকিয়া গেল দুইজনের সহিত চিরপরিচিত হইবার জন্য।

নলিন উঠিয়া আলোটা কম-জোর করিয়া দিল। অভিজ্ঞতা তাহাকে অনেক কিছু শিখাইয়াছিল। বিবাহের পর প্রথম রাত্রি অসুবিধা ওত পাতিয়া থাকে। দরজার উপর কান পাতিয়া অনেকক্ষণ শুনিল, কেহ আড়ি পাতিতেছে কি না। নলিন নিশ্চিন্ত হইল, কেহ

নাই। ফিরিয়া আসিয়া রাসমণিকে বুকের কাছে টানিয়া লইল। মুখে, গালে, কপালে চুম্বনে ভরাইয়া দিল। রাসমণির অদ্ভুত বোধ হইলেও ভাল লাগিতেছিল; কেবল মুখটা অতি নিকটে আসিলেই গন্ধটা পছন্দ করিতেছিল না। নলিনের আদর পূর্ণ রূপ গ্রহণ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে, এমন সময় রাসমণি বলিয়া ফেলিল, তোমার মুখে অত কিচ্ছিরি গন্ধ কেন? বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই প্রশ্নটি অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক ও কাল এবং পাত্র হিসাবে অশোভনীয়। নলিনের সমস্ত প্রেমোত্তম এক মুহূর্ত্তে চুরমার হইয়া গেল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে দেহ ও মন উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহার মুখে এ কি বাণী! তাহার প্রেমোচ্ছ্বাসের বিনিময়ে এ কি প্রতিদান! নলিন কোন উত্তর দিতে পারিল না। ছোটদের সহিত হুড়ামুড়ি করিতে গিয়া প্রায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উঠিয়া নিজেই এক গ্লাস জল ঢালিয়া খাইল; তাহার পর বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

রাসমণির চোখে তখনও ঘুম আসে নাই। একলা ঘরে সে বসিয়া আছে, অপরিচিত পুরুষের পাশে। ঝিমানো আলোতে যে আবেষ্টনী সৃষ্টি করিয়াছিল, রাসমণির কাছে তাহা নূতন অভিজ্ঞতা। নূতনের ভিতর কেমন একটা মাদকতা ছিল, রাসমণি তাহার বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিতেছিল। তাহারও উচ্ছ্বাস আসিতে লাগিল, কিন্তু উপযুক্ত প্রকাশ তাহার জানা ছিল না। গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন নলিনের গোঁফটা একটু টানিয়া দেখিল। মুখের কাছে আসিয়া কি করিতে যাইতেছিল, দুর্গন্ধের কথা মনে পড়িতেই নিজেকে সংযত করিয়া লইল। রাত্রি আরও গভীর হইয়া আসিতেছিল, প্রেমোন্মত্তার নিকট নিস্তব্ধতা প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছে, রাসমণি আবার নলিনের চিবুকে হাত বুলাইল। নলিনের তখন নাক ডাকিতেছে।

নলিনকে তাহার ভাল লাগিল, মনে মনে ভাবিল, এ আমার বর, আমার নিজের বর। অন্তরে উপলব্ধি করিল, এ দাবিতে কেহ ভাগ বসাইতে আসিবে না। উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আর একবার নলিনের গালে হাত দিয়া তাহারই পাশে, অতি নিকটে শুইয়া পড়িল।

বিবাহের পর দীর্ঘ আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, রাসমণি এখন পূর্ণ যুবতী। কিন্তু সন্তানের মা হইবার সৌভাগ্য এখনও সে পায় নাই। পোদ-পিসী, রামুর মা ইত্যাদি পাঁচু-ঠাকুরের মাদুলি হইতে আরম্ভ করিয়া পীরবাবার দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাসমণি কোনটাই ব্যবহার করে নাই। সে জানিত, ঔষধ ব্যবহারে কোন লাভ নাই।

যতই যৌবন রাসমণিকে চারধার হইতে ঘিরিতে আরম্ভ করিল, ততই নলিন বধূকে খুশি করিবার জন্য নিত্য নূতন পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে থাকিল। ভাষাও নিত্য নবরসে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সংক্ষেপে রাসমণির জন্য আদরের ভাষা লইয়া নলিন সর্ব্বদাই, প্রস্তুত বলিব না, তটস্থ হইয়া থাকিত। নলিন যতই উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রাণের কথাকে নানা রূপ দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে, ততই সে অনুভব করিতে থাকে, তাহার মনোভাব প্রকাশ হইতেছে না, কোথায় কিসের অভাব থাকিয়া যাইতেছে, যে অভাব পূর্ণ করিবার শক্তি তাহার নাই।

এই ভাবে রাসমণি ও নলিনের দিন কাটিয়া যাইতেছিল। রাসমণি এখন মনকে আবরু দিয়া বেড়ায়। সাবধানতার দৃঢ় দেওয়াল আবরুকে অভেদ্য করিয়া রাখিয়াছে। নলিন জানিতেও পারে না, তাহার প্রেম-নিবেদনের উৎকোচ রাসমণি আড়ালের পিছন হইতে কি ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিতেছে।

রাসমণি খোলা বাতাসের জন্য হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। পাড়া ঘোরা তাহার অভ্যাস নাই। দীর্ঘকাল সে স্বামীগৃহে আটক পড়িয়াছে, অথচ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ এতই অস্বাভাবিক যে, গৃহ এখন পিঞ্জরের মতই অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। নেহাৎ সংসারধর্ম্মের ফাঁকা কর্ত্তব্যগুলাই এখন তাহার নিকট জীবনযাপনের অবলম্বন। সন্তরণপটুতায় রাসমণি এককালে গ্রামের মধ্যে নাম করিয়াছিল। বহুদিন সাঁতার কাটে নাই; ভাবিল, সাঁতারের অছিলায় অন্তত কিছুক্ষণ যদি গৃহের বাহিরে থাকিতে পারে, হয়তো কিছু শান্তি পাইবে।

নলিনকে বাবুদের পুকুরে স্নানের আবেদন জানাইল। নলিন আপত্তির কোন কারণই খুঁজিয়া পাইল না, বরং আনন্দিত হইয়া রাসমণিকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল।

রাসমণির একঘেয়ে জীবনযাত্রায় নূতন সুরের সাড়া পাওয়া গেল বাবুদের পুকুরঘাটে, তুচ্ছ কয়েকটি সূত্র অবলম্বন করিয়া।

বেলা পড়িয়া আসিলে রাসমণি একলাই এখানে স্নান করিতে আসিত। নানাভাবে সাঁতার কাটিয়া পুকুরটাকে তোলপাড় করিয়া ফেলিত। কখনও চিত, কখনও বুক, কখনও এড়োভাবে সাঁতার কাটিয়া অদ্ভুত কৌশলে এপার হইতে ওপারে চলিয়া যাইত এবং এতটুকু বিশ্রাম না করিয়া ফিরিয়া আসিত। কখনও পুকুরের মধ্যস্থলে হস্তপদ চালনা বন্ধ করিয়া কাষ্ঠখণ্ডের মত অচল অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। সন্তরণ-পারদর্শিতায় রাসমণি নিজেই খুশি হইয়া উঠিত। বয়সের কথা ভুলিয়া যাইত, ভুলিয়া যাইত—সে একজনের পত্নী এবং স্থানটি শ্বশুরবাড়ির পার্শ্বে, এখানে ছেলেমানুষি করিলে লোকে নিন্দা করিবে।

রাসমণি জানিত না, তাহার সন্তরণপটুতার তারিফ করিবার জন্য আর একজন দর্শকও সেখানে উপস্থিত থাকিত, এবং অন্তরাল হইতে শুধু তাহার সাঁতারের তারিফ করিত না, অঙ্গসঞ্চালনে দেহের লীলায়িত রেখাগুলিও সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিত। দর্শক রসিক ও ঘোরতর বাস্তববাদী। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু ভোগ করা যায়, তাহা সে প্রাণ ভরিয়া পাইতে ভালবাসিত। নীতিবদ্ধ সংস্কার কখনও এই ভোগ-লিপ্সায় বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। সত্ত্বগুণ আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত মাটির রজ ও তমোগুণকে চাপিয়া মারে নাই। তাহার আত্মতুষ্টির মহামন্ত্র ও সাধনাই ছিল যাচিত বস্তুটি পাওয়া এবং ইচ্ছামত ভোগ করা। দর্শক আমাদের প্রিন্‌স মহেন্দ্র। জলকেলির প্রদর্শনী দেখিয়া মহেন্দ্র মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পেশাই সুন্দরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া এবং সব বাধা অতিক্রম করিয়া তাহাকে পাওয়া। মহেন্দ্র রাসমণিকে পাইবার জন্য তাহার জাল পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

কিছুদিন বাদে দর্শক অদৃশ্য স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিল। সর্ব্বশরীর সিক্ত করিয়া রাসমণি যখন সিঁড়ির চাতালে স্বচ্ছ বস্ত্র সংযত করিত, সেই সময় শুনিত আমগাছটার নিকট হইতে ছোট্ট একটি কাসি। শব্দ অনুসরণ করিলেই রাসমণি দেখিতে পাইত, মহেন্দ্র গাছের গোড়ায় ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

মুখে কূট হাসি—সে হাসির অর্থ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিলে পাশবিক কিংবা প্রাণস্পর্শীও মনে হইতে পারে,—অর্থগ্রাহীর সাময়িক মনের অবস্থার উপরই তাহা নির্ভর করে।

হাসির কেন্দ্র ছাড়াইয়া চোখের দিকে তাকাইলে মনে হয়, মহেন্দ্রের দৃষ্টি একান্তভাবে নিবদ্ধ রাসমণির গঠনের উপর। চাহনির তীব্র লালসাপূর্ণ মারণোন্মুখ সঙ্কেত অস্বস্তিকর হইলেও ঠিক অবাঞ্ছনীয় বলা চলে না। কাসির শব্দ রাসমণির মনে যে প্রকারেরই প্রতিধ্বনি তুলুক না কেন, বাহ্যিক প্রকাশে কোনরূপ অসমর্থন ছিল না।

কাসির সঙ্কেত যখন একটি নির্দিষ্ট দিকে ঝুঁকিতেছিল, সেই সময় রাসমণি সংস্কারের খোঁচা খাইয়া কিছুদিনের জন্য পুকুরঘাটে স্নান করা বন্ধ করিয়া দিল। এই ঘটনার পর রাসমণি নিজের শক্তিকে শ্রদ্ধা করিবার অবসর পাইয়াছিল। কিন্তু মনের গুপ্ত কোণ যে জালের প্যাঁচে জড়াইয়া গিয়াছিল, তাহা বেশিদিন রাসমণির নিকট অজ্ঞাত থাকিল না।

বিবাহের পর দীর্ঘ আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কই, এই ধরনের চাঞ্চল্য কখনও তো সে অনুভব করে নাই! পুকুরঘাটে যাইবার জন্য সে অস্থির হইয়া উঠিতেছে কেন? পুরুষের মুখশ্রী কঠোর, তথাপি উহা পুরুষোচিত এবং সুন্দর। মহেন্দ্রের দীর্ঘ ও সুঠাম গঠন রাসমণির সত্যই ভাল লাগিয়াছিল। এই ভাল-লাগাকে অস্বীকার করিবার জন্য সে স্বামীগৃহে নিজেকে আবার বন্দিনী করিয়া ফেলিল, মনের চতুষ্পার্শ্বে নীতির বেড়া দিয়া নিজেকে আগলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যে আবেষ্টনীতে সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকেই পুনরায় বরণীয় করিয়া লইতে চাহিল।

ক্রমশ

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

নো তে দিবসাঃ গতা

সে দিন বহিয়া গেল হে বন্ধু,
সে দিন মোদের গত,
সেই চঞ্চল মুখর নয়ন
আজিকে মৌন নত।
ভরা উৎসাহে উৎসুক বুক,
সব পথে পথে চেনা হাসিমুখ,
কোরকে কোরকে অরুণের আলো,
ফুলে ফুলে মধুব্রত।

২

পিয়াল রেণুতে গোটা বসন্ত,
মদিরা পিকের ডাকে,
আসি বর্ষার হর্ষ-জোয়ার
লাগে কদম্বশাখে।
কণ্টক হতে সাড়া দিত কেয়া,
দীর্ঘ 'ময়ুরপঙ্খীর' খেয়া,
জীবন-নদীর মরকত-তটে
আঁট দিত প্রতি বাঁকে।

সব বিহগের কণ্ঠে কাকলী
রৌদ্র উঠান-ভরা,
নভ ঘন নীল, সমীরণে মধু
মধুর বসুন্ধরা।
আজ ঝিঙাফুল ফুটিয়াছে হায়,
ঢাকে অঙ্গন পাণ্ডু ছায়ায়,
বায়স তাদের সান্ধ্য-কুলায়
উড়িয়া যেতেছে ত্বরা।

৪

কোথা পুচ্ছের গৌরব তার
কলাপী ভুলেছে কেকা,
ঘন বর্ষার সমারোহ হেরে
পিঞ্জরে বসি একা।
যূথী-পরিমল মালতীর বাস,
আনে সে সুদূর দিনের আভাস,
কাঁদায় তাহারে রামধনুকের
সপ্ত রঙের রেখা।

৫

সেই ক্ষীর সর নবনীর দিন
আর ফিরিবার নয়,
তমালের ডালে তোলা হিন্দোলা
সেও সেই কথা কয়।
গোষ্ঠে যাবার বনপথ, মরি,
কাঁটা ও গুল্মে দিয়াছে আবরি
কালো কালিন্দী কানুর বাঁশীর
ভুলে গেছে পরিচয়।

৬

সে দিন বহিয়া গিয়াছে বন্ধু,
সে দিন মোদের গত,
হের সুমুখের শ্যাম তালীবন
তেমনি সমুন্নত।
স্নিগ্ধ উজল প্রিয় দিনগুলি,
পারে নাই ধরা রাখিতে আগুলি,
পোষা শুক সারী অকূলেতে পাড়ি
দিল এবারের মত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

প্রসঙ্গ কথা

'ব্রাহ্ম' বনাম 'হিন্দু'

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়াছেন বহুদিন; তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। ধর্ম্মের প্রখর পিপাসা যাঁহাদের আছে, যাঁহারা আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করিয়া আত্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে ব্যাকুল হন, তাঁহারা অনাত্মময় পৌত্তলিক সমাজ ত্যাগ করিয়া অতিশয় পবিত্র পর-ব্রহ্মের উপাসনা করিবার জন্যই সর্ব্বপ্রকার অপবিত্রতা পরিহার করেন। ব্রাহ্মগণ সর্ব্বত্র 'একে'র প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নপর হইয়া থাকেন। রামানন্দবাবুও খাঁটি ব্রাহ্ম, এজন্য 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রে সকলই শোধন করিয়া লন। কিন্তু সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানগবেষণায় এই পরমপবিত্র ঐকতত্ত্ব একটু দ্বৈত-দোষাশ্রিত হইয়াছে; এতদিন তিনি ঐতিহাসিক গবেষণায় রামমোহনকেই বাঙালীর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরিত্রাতারূপে ঘোষণা করিতেছিলেন, সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথও 'নিরাকার' হইয়া যাওয়ায়, রামমোহনের সহিত রবীন্দ্রনাথও যুক্ত হইয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে রামানন্দবাবুর এই দ্বৈত-বিলাস সুলক্ষণ নয়। সংসারে তাঁহার নিজের যে বহুত্ব ঘটিয়াছে, তাহাতে অবশ্য তিনি 'একোঽহংবহুস্যাম্'—এই শ্রুতিবাক্যের চাক্ষুষ প্রমাণ হইয়া আছেন;—এমন 'বহু'র মধ্যে 'একে'র আত্মবিস্তার সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সে যেন সত্যই—'ন ত্বহং তেষু, তে ময়ি'। শ্রুতি যে কেন বলিয়াছেন—'পিতা নোঽসি', তাহার এমন 'শারীরক ভাষ্য' ক্বচিৎ মিলিবে।

*

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। রামানন্দবাবু পৈতা ফেলিয়া এবং জাতিভেদ প্রভৃতি হিন্দুয়ানি ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছেন। হউন, তাহাতে হিন্দুর কোন দুঃখ নাই, কোন আপত্তি নাই, কোন হা-হুতাশ নাই। হিন্দুর গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে—কত জায়গায় চর পড়িতেছে, কত জায়গায় ভাঙন ধরিতেছে, তবুও "সেই চির কলতান উদার গঙ্গা

বহিছে আঁধারে আলোকে।” হিন্দুর কোন ভয় নাই, কিন্তু রামানন্দ-বাবুর ভয় আছে, পাছে ওই ক্ষুদে ‘চর’খানি আবার কখন ভাঙিয়া ভাসিয়া যায়। তিনি সাভারকরের হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়াছিলেন—জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম সকলেই ‘হিন্দু’, এই আশ্বাসে। এখন সহসা সে বিশ্বাসে ঘুণ ধরিয়াছে। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কেবল ‘হিন্দু’ ও ‘মুসলমান’, এই দুই ভাগের কথাই উল্লেখ হইয়া থাকে—যেন তাহাদের মধ্যে মিল হইলেই সব সমস্যার অন্ত হইবে! রামানন্দবাবু বলিতেছেন, কথাটা ভাল নয়! ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান প্রভৃতি কি ভাসিয়া আসিয়াছে? “আইন-সভা আদিতে আসন, মন্ত্রিমণ্ডলে আসন এবং চাকরির বাঁটোয়ারা বা শিক্ষায়” তাহারা কি সম্প্রদায়ভেদে গণনীয় হইবে না?’ এখানে রামানন্দবাবু শুধু ‘হিন্দুসভা’র ‘হিন্দু’সংজ্ঞার বিরুদ্ধে নয়, খ্রীষ্টানদিগেরও পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; অর্থাৎ, হিন্দুসভার সংজ্ঞা অনুসারে ‘হিন্দু’ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে তিনি আর রাজি নহেন; তিনি ‘হিন্দু’ নহেন—‘ব্রাহ্ম’, এবং অপর অ-হিন্দুদের সহিত এক স্বার্থ-সূত্রে বদ্ধ থাকিতে চান। এই পৃথক থাকার দাবি কেন করেন, তাহাও খোলাখুলি বলিয়াছেন, যথা—“কিন্তু সংজ্ঞা (হিন্দুসভার হিন্দুর) অনুসারে যাই হোক, কার্যতঃ এবং হিন্দু ব’লে স্বীকৃত হয় না ব’লে আমরা তাদের আলাদা উল্লেখ করছি।” (‘প্রবাসী’, শ্রাবণ, “বিবিধ প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য)। রামানন্দবাবুর এই দাবির মধ্যে কোন হীন ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি নাই—অতিশয় মহদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই দাবির কথা তুলিয়াছেন। তিনি ভারতের রাষ্ট্রিক প্রভৃতি যাবতীয় কল্যাণকে পূর্ণতর করিবার জন্যই, খুব “বড় এবং সর্ব্বব্যাপক একতা”র জন্যই এই পার্থক্য বজায় রাখিতে চান; তাই ব্রাহ্ম রামানন্দবাবু ‘হিন্দু’ হইতে রাজি নহেন। দেশের কল্যাণ—মহাজাতির কল্যাণ যে তাহা না হইলে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে! দেখ, যদি পৃথকভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দিকে লক্ষ্য রাখা না হইত, তাহা হইলে ভারতের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামও কি এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত? যদি তোমরা কেবল হিন্দুর দিকে তাকাইয়া থাকিতে, তাহা হইলে ব্রাহ্ম আনন্দমোহন বসু এবং ব্রাহ্ম সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ অথবা পারসী দাদাভাই নৌরজী ও পারসী

ফিরোজশাহ মেহতা কি কংগ্রেসের সভাপতি হইতে পারিতেন? যদি না হইতেন, তবে কি সর্ব্বনাশ না হইত! তবেই দেখ, যদি এইরূপ কোনও যোগ্য ব্যক্তি ভারতের উপকার করিতে চায়, এবং তুমি যখন তাহাকে ব্রাহ্ম বা পারসী বলিয়া ডাকিলে না, সে-ও ব্রাহ্ম ও পারসী হিসাবেই সেই কাজ করিবে, অন্যথা যদি না করে, তখন ভারতের কত বড় ক্ষতি হইতে পারে! কারণ, সকল ব্যক্তিরই স্বস্ব সম্প্রদায়-চেতনা থাকা উচিত; যে ব্রাহ্ম সে আগে ব্রাহ্ম, পরে ভারতীয়; এইরূপ সকলেই যদি না হইল, তবে কেবল হিন্দু বা ভারতীয় মহাজাতি হওয়ার অর্থ কি?—একতা সর্ব্বব্যাপক হইল কোন্ অর্থে?

*

কিন্তু রামানন্দবাবু এই ঐক্যতানবাদন করিতে করিতে শেষে প্রায় বুঁদ হইয়া গিয়াছেন—ভয়ানক ব্রাহ্ম হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার ভাবটা এই। ব্রাহ্ম কিসে কম! ব্রাহ্মকে ব্রাহ্মহিসাবে পৃথক গৌরব তোমরা দিবে না? যদি না দাও, যদি ব্রাহ্মসমাজের পৃথক মহিমা স্বীকার না কর, তবে কি হইতে পারে ভাবিয়া দেখিও। বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত কর; যদি কেবল হিন্দুই সে সাহিত্যের সেবা করিবার অধিকারী হইত, তবে খ্রীষ্টান মধুসূদন দত্তকে পাইতে? তাহাতেও না হয় তত বড় ক্ষতি হইত না, কিন্তু আরও কত বড় সর্ব্বনাশ হইত!—"রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ব্রাহ্ম সাহিত্যিকদের সেবা থেকে (বাংলা সাহিত্য) বঞ্চিত হ'ত।" আমি বলিয়াছি, রামানন্দবাবু বুঁদ হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু আসলে বোধ হয় তাঁহার জ্ঞান আরও 'টনটনে' হইয়া উঠিয়াছে, অজ্ঞানেও যেমন আবেশ হয়, পরম জ্ঞানেও তেমনই আবেশ হইয়া থাকে, কেন না—"Extremes meet" কারণ, কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই তৎক্ষণাৎ নিজেই বলিতেছেন, "কিন্তু সুখের বিষয় এ রকম নিয়ম কোনকালে ছিল না এবং এ রকম নিয়ম চালাবার ক্ষমতাও কারো ছিল না, থাকতে পারে না, ও নাই।—থাকিলে এবং থাকা সম্ভব হইলে, রামানন্দবাবু খুবই সুখী হইতেন; কিন্তু যখন তাহা নাই, তখন কি আর করিবেন? অগত্যা একটি অতিশয় অর্থহীন, বুদ্ধিহীন এবং সত্যহীন উক্তি করিয়াছেন, যথা—

"কেবল বা প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমানের কথা ভাবায় দেশ নানা দিকে অহিন্দু ও অমুসলমান যোগ্য লোকের সেবায় বঞ্চিত হচ্ছে।" এ কথার আর কোন টীকাভাষ্য করিবার প্রয়োজন নাই—ইহার অন্তরালে কোন্ মনোবৃত্তির ক্রিয়া রহিয়াছে, তাহা বুদ্ধিমান পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন; ইহাকে নিশ্চয় কেহ ভীমরতি বলিবেন না।

* * *

কিন্তু এ প্রসঙ্গের অবতারণা সে জন্য নয়—রামানন্দবাবুর ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং কথা সবই যে কিরূপ একনিষ্ঠ, তাহা 'প্রবাসী' ও 'Modern Review' মারফতে কাহারও জানিতে বাকি নাই। আমরা ভাবিতেছি ওই রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের কথা। তাই প্রসঙ্গের প্রথমেই রামানন্দ-বাবুর 'অদ্বৈত'-নাশের আশঙ্কায় কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছিলাম। ব্যাপারটা কিন্তু দাঁড়াইতেছে অন্যরূপ। এতদিন রামমোহনকে প্রাণপণে জাপটাইয়া ধরিয়া ('রাজা'র প্রায় শ্বাসরোধ করিয়া) তিনি পর-ব্রহ্মের মান-ইজ্জত রক্ষা করিতেছিলেন; এক্ষণে রবীন্দ্রনাথেরও ব্রাহ্মত্বকে ধ্বজার মত তুলিয়া ধরিয়া এইরূপ আস্ফালন করা কি রবীন্দ্রনাথের আত্মার পক্ষে প্রীতিকর হইবে? আমরা ভুল করিয়াছিলাম,—পরব্রহ্ম, দুই ভাগ কেন তিন ভাগও হইতে পারেন—'পিতা', 'পুত্র' এবং 'পবিত্র ভূত'; ওই তিনের একটি (কোন্‌টি তাহা বলা দুরূহ) রামানন্দবাবুর মধ্যেই অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব নয়; ভক্ত সাধকের প্রয়োজনে পরব্রহ্মের এইরূপ 'ত্রিভঙ্গ' হওয়া বোধ হয় অন্যায় বা অসঙ্গত নয়। তাই, দুই কেন—, আমরা তিন-কেও মানিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু 'তেত্রিশ কোটি'র উপাসক বলিয়া আমরা গণনায় যেমন দক্ষ, তেমনই গনিবার জন্য সাকার বস্তু চাই। যদি কেহ চোখ বুজিয়া বলে, ওই দেখ, কিন্তু খোলাচোখে তাহা দেখিতে না পাই, তাহা হইলে, আমাদের জবান তেমন দুরস্ত বা সভ্য হয় না বলিয়া, সে ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলিয়া থাকি। রামানন্দবাবু রামমোহনকে 'ব্রাহ্ম' বলেন কোন্ সংজ্ঞা অনুসারে? রামমোহন কোন্ অর্থে রামানন্দবাবুর সম্প্রদায় বা সমাজ-ভুক্ত? রামমোহনের জীবদ্দশায় তাঁহাকে তো কেহ সমাজত্যাগী ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া জানিত না, ধর্ম্মবিষয়ক মতামত বা কোন কোন কার্য্যের

জন্য তাঁহাকে যতই আক্রমণ করুক। রামমোহন কি পৈতা ত্যাগ করিয়াছিলেন? তিনি কি তাঁহার পরিবারে সকল হিন্দুসংস্কার উঠাইয়া দিয়াছিলেন? তিনি কি বিধবাবিবাহ চালাইবার বা জাতিভেদ তুলিয়া দিবার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন? নিজের পরিবারেও কি তিনি সেরূপ কোন ব্যবস্থা পাকা করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ পাচক ও গঙ্গাজল প্রভৃতির শুচিতা কি তিনি অমান্য করিয়াছিলেন? তিনি যে ধর্ম্মান্দোলন চালাইয়াছিলেন, তাহা হিন্দুসমাজের ভিতরে দাঁড়াইয়া, না বাহিরে দাঁড়াইয়া? এই প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটির উত্তর আমরা রামানন্দ-বাবুর নিকটে দাবি করি। তিনি বহুদিন ধরিয়া রামমোহন সম্বন্ধে বহু সত্য-মিথ্যার সমর্থন ও প্রচারে সহায়তা করিতেছেন, আমরা তাঁহার নিকটে এই কয়টি প্রশ্নের সোজা জবাব—'হাঁ' কিংবা 'না'—পাইতে চাই; যদি ইহার প্রত্যেকটি 'না' প্রমাণ করিতে অসমর্থ হন, তবে তিনি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইবেন, দোষ আমাদের নয়।

* * *

এখন রবীন্দ্রনাথের কথা। রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন ব্রাহ্ম হইয়াই, অর্থাৎ—যেমন সকলেই জন্মায়—একটা না একটা সমাজে; কিন্তু সকলের মতই তিনি কি সেই গণ্ডির বন্ধন গলায় পরিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন? তিনি কি রামানন্দবাবুর মত ব্রাহ্মই থাকিয়া গিয়াছিলেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ঘরে জন্মিয়াছিলেন,—তিনি কি পাঁচন-বাড়ি হাতে করিয়াই কুরুক্ষেত্রে পার্থ-সারথির কাজ করিয়াছিলেন? তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্যক্তি-জীবনে না হয় ব্রাহ্মই ছিলেন; কিন্তু যে রবীন্দ্রনাথকে গান্ধীজি "গুরুদেব" বলিয়া ডাকিতেন, সে রবীন্দ্রনাথ কি রামমোহনশিষ্য রবীন্দ্রনাথ? গান্ধীজি তো রামমোহনকে ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-গুরুদের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন না—তাহার জন্য, একবার রামানন্দবাবু কি করিয়াছিলেন, তাহা তো আমরা আজও ভুলি নাই। রবীন্দ্রনাথ যদি হিন্দু না হইয়া কেবল ব্রাহ্মই হন, তাহা হইলে তিনি যে ভারতের কেহই হন না! কারণ একমাত্র হিন্দু হইলেই তাঁহার গণ্ডিদোষ কাটে, নতুবা তিনি যে বড় ছোট হইয়া যান। ধর্ম্মের সহস্র পন্থা, সহস্র আখড়া ওই এক হিন্দু নামে ডুবিয়া এক হইয়া আছে। স্বর্গীয়

ব্রাহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সেইজন্ত নিজেকে 'হিন্দু' বলিয়া ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই—'ঈশাপন্থী হিন্দু' বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন। এই হিন্দুত্ব-বোধই তো এ যুগের সকল শ্রেষ্ঠ ভারত-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কারণ। ছি, ছি! রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হিন্দু না হইয়া হইবে ব্রাহ্ম! আমি সেই রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি, যে রবীন্দ্রনাথ ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে বরণীয় ও পূজ্য হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকেও রামানন্দবাবুর মাপে মাপিতে হইবে? হা কপাল! রামানন্দবাবুর উক্তিটির ভাবার্থ এই যে, রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের মূলে ব্রাহ্মত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, ,কবিত্ব ও কাব্যপ্রেরণা সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত রসিক সুজনের সঙ্গে তর্ক করিব না, লোকে হাসিবে; কেবল কয়েকটি কথা বলিব। রবীন্দ্রনাথ বাল্যে কোন্ প্রতিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন? তাঁহার পরিবারের কি সকলেই ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন? রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্য-সংস্কার ঘটিয়াছিল যাঁহার সাহায্যে, সেই বাংলা ও সংস্কৃত:সাহিত্য কি হিন্দু সাহিত্য না ব্রাহ্ম সাহিত্য ছিল? তিনি কেবল রামমোহনের বেদান্ত-গ্রন্থ পড়িয়া বাংলা শিখিয়াছিলেন? তাঁহার আদি সাহিত্যগুরু বিহারীলাল ও বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ জাতির লোক ছিলেন? তিনি যে 'গীতাঞ্জলি'র জন্য নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যে সুরটির সন্ধান পাইয়া ইউরোপ মুগ্ধ হইয়াছে, সে সুর প্রাচীন হিন্দু সাধনার বাউল-বৈষ্ণবের সুর কি না? যদি তাহা না হয়, তবে কোন্ পরব্রহ্ম সেই সুরের জন্মদাতা? রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অংশগুলি হিন্দু জীবনের ও হিন্দু ঐতিহ্যের উপকরণপুষ্ট কি না? কালিদাসের কবিতা ও বৈষ্ণব পদাবলী তাঁহার কবিপ্রতিভার উদ্বোধনে সাহায্য করিয়াছে কি না? হিন্দুর রামায়ণ ও মহাভারত—তাঁহার ঋষিত্ব না হউক, কবিত্বের একটা বড় আদর্শ ছিল কি না? না, এসব কিছুই সত্য নহে—রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন বলিয়াই বাংলা সাহিত্যের এমন সেবা করিতে পারিয়াছিলেন—বাঙালীও হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে তাঁহার কাব্য পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতেছে এবং দলে দলে ব্রাহ্ম হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। অতএব রামানন্দবাবুর জয়জয়কার!

সাহিত্য-সাধনার প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রেরণা কিরূপ ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন ছিল, তাহার একটি অতিশয় সুলভ প্রমাণ—'কড়ি ও কোমলে'র "কাঙালিনী" কবিতাটি। মধ্যযুগে তিনি কিরূপ ব্রাহ্ম ছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বদেশী-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের যোগদান। তাহার পূর্ব্বেই তিনি ব্রাহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রায় শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন; তিনি হিন্দু-জাতীয়তার চারণ-কবিরূপে অজস্র গান রচনা করিয়াছিলেন; তিনি তখন বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ও কীর্ত্তিপূত 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতই সেই জাতীয়তা-ধর্ম্মের প্রবন্ধকার; তখন তিনি 'নৌকাডুবি' উপন্যাস লিখিতেছেন; এবং কন্যার বাল্যবিবাহেরও পক্ষপাতী। একটি প্রমাণ স্বয়ং রামানন্দবাবু গত আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'র ৬৫৬-৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছেন। সেখানে ত্রিপুরার মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরকে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে—দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি এই দুই সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিলেই—ভারতবর্ষ পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিতে পারিবে। আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বৈশাখের (১৩০৯) বঙ্গদর্শনে আমার "নববর্ষ" প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিয়ো। তাহা ব্রাহ্মণের মনের কথা।

হিন্দু না হইলে যে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, আশা করি এই মোটা যুক্তিটা রামানন্দবাবুও বুঝিবেন।

এই রবীন্দ্রনাথেরই পদতলে সমগ্র হিন্দু বাঙালী সমাজ লুটাইয়া পড়িয়াছিল। শেষ-জীবনে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মেরই মহিমা কীর্ত্তন করিবার কালে রামানন্দবাবুর মত ব্রাহ্মগণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিছু উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

রামমোহন রায় তাঁহার চারিদিকের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চেই উঠিয়াছেন সমস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন। একথা কোনো মতেই বলিতে পারিব না যে তিনি হিন্দু নহেন,—কেন না, অন্যান্য অনেক হিন্দু তাঁহার চেয়ে অনেক নীচে ছিল এবং নীচে থাকিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে। কেন বলিতে পারিব না? কেন না, একথা সত্য নহে। কেন না তিনি যে নিশ্চিতই হিন্দু ছিলেন—অতএব

তাঁহার মহত্ত্ব হইতে কখনই হিন্দুসমাজ বঞ্চিত হইতে পারিবে না—হিন্দুসমাজের বহুশত লক্ষ লোক যদি এক হইয়া স্বয়ং এজন্য বিধাতার কাছে দরখাস্ত করে তথাপি পারিবে না।

আমি জানি, এ কথায় ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া বলিবেন,—না, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের সামগ্রী বলিতে পারিব না, তাহা বিশ্বের সামগ্রী। বিশ্বের সামগ্রী নয় তো কি? কিন্তু বিশ্বের সামগ্রী তো কাল্পনিক আকাশ-কুসুমের মতো শূন্যে ফুটিয়া থাকে না—তাহা ত দেশ কালকে আশ্রয় করে, তাহার ত বিশেষ নামরূপ আছে। * * পৃথিবীতে সকল জাতিরই ইতিহাস আপনার বিশেষত্বের ভিতর দিয়া বিশ্বের ইতিহাসকেই প্রকাশ করিতেছে। নহিলে তাহা নিছক পাগলামি হইয়া উঠিত,—নহিলে একজাতির সিদ্ধি আর একজাতির কোনোপ্রকার ব্যবহারেই লাগিতে পারিত না। * *

হিন্দুর ইতিহাসেও সে চেষ্টার বিরাম নাই। বিশ্বসত্যের প্রকাশ-শক্তি হিন্দুর ইতিহাসেও ব্যর্থ হয় নাই; সমস্ত বাধা বিরোধও এই শক্তিরই লীলা। সেই হিন্দু-ইতিহাসের অন্তরে যে বিশ্বচিত্ত আপন সৃজনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন ব্রাহ্মসমাজ কি বর্ত্তমান-যুগে তাহারই সৃষ্টিবিকাশ নহে? ইহা কি রামমোহন রায় বা আর দুই একজন মানুষ আপন খেয়ালমত আপন ঘরে বসিয়া গড়িয়াছেন? * * মানুষের ইতিহাসকে আমি ত এমন খামখেয়ালীর সৃষ্টিরূপে সৃষ্টিছাড়া করিয়া দেখিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজকে তাই আমি হিন্দুসমাজের ইতিহাসেরই একটি স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া দেখি। আমরা কয়জনে দল বাঁধিয়া ঘিরিয়া লইয়া ইহাকে আমাদের বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের বিশেষ একটা গৌরবের জিনিষ বলিয়া চারিদিক্‌ হইতে তাহাকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া তুলিব এবং মুখে বলিব এইরূপেই আমরা তাহার প্রতি পরম ঔদার্য্য আরোপ করিতেছি একথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিব না।—"আত্মপরিচয়"—'পরিচয়', পৃ. ৫৩-৫৬।

বঙ্গজাতক-কথা

তখন আমরা মালদহে ছিলাম। বয়স অল্প, সবে দীনু পণ্ডিতের পাঠশালা ছাড়িয়া জিলা-স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি। একদিন দেখিলাম, শহরে হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড! স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট-ইঞ্জিনীয়ারের হাতে হাতকড়ি পড়িয়াছে। ভদ্রলোক নাকি, ইঞ্জিনীয়ারিং তো দূরের কথা সামান্য ওভারসিয়ারিও পাস করেন নাই, অথচ দীর্ঘ উনিশ বৎসর কাল নির্ব্বিবাদে জাল নামে জাল উপাধির জোরে ডিষ্ট্রিক্ট-ইঞ্জিনীয়ারের গুরুদায়িত্ব পালন করিয়া আসিয়াছেন। এতদিনে ধরা পড়িয়া জেলে যাইতেছেন। আমাদের শিশুমনে আমরা তখন তাঁহার অপরাধের গুরুত্বটা বুঝিতে পারি নাই; বরঞ্চ ইহাই ভাবিয়াছিলাম, না হয়

ভদ্রলোক পাসই না করিয়াছেন, কিন্তু উনিশ বৎসর কাজটা কৃতিত্বের সহিত চালাইয়া আসাও তো কম কথা নয়। এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া গুরুজনদের ধমক খাইয়াছিলাম স্মরণ আছে।

পরে হেতমপুর কলেজের এক প্রিন্সিপ্যাল সম্পর্কেও অনুরূপ ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম; ভদ্রলোক শুধু নাম আর উপাধিটাই না হয় জাল করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যক্ষতার কৃতিত্ব তো জাল করা যায় না! শুনিয়াছিলাম, জালিয়াৎ ব্যক্তি কৃতী অধ্যক্ষ ছিলেন। আসলে এগুলি আমাদের সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থারই দোষ। যাঁহারা সত্যকার গুণী ব্যক্তি, তাঁহারা অনেক সময় সামান্য কারণে উপাধির গৌরব হইতে বঞ্চিত হন, তাহাতেই এই সকল বিস্ময়কর গোলযোগ ঘটে।

কিন্তু একজিকিউটিব ব্যাপারের এই সকল যুক্তি সাহিত্য-ব্যাপারে খাটে না; কারণ, সাহিত্য অন্তরের সম্পদ। একজনের চিন্তাধারা অন্যে মারিয়া দিলে সাহিত্যক্ষেত্রে জুয়াচুরির চরম হয় এবং সে অপরাধের শাস্তি শূল। শূল দেওয়ার প্রথা বর্ত্তমান সভ্যজগতে উঠিয়া গিয়াছে। তবে ভগবান ন্যায়পরায়ণ; শূল-বেদনা বর্ত্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বুদ্ধদেববাবুরও কৃতিত্ব আছে স্বীকার করিতে হইবে। তিনি দীর্ঘ পনরো বৎসর ধরিয়া যে সাহিত্যিক জালিয়াতি চালাইয়া সাহিত্যখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, ধরা-না-পড়ার মধ্যেই তাহার কৃতিত্ব! অথচ আসল ও নকল সকলেরই হাতের কাছেই ছিল। এবারে আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। Aldous Huxley তাঁহার *Crome Yellow* পুস্তকখানা প্রথম ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেববাবুর 'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ' ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ওই নবেম্বর মাসেই বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাহায্য ব্যতিরেকে কোনও উপন্যাস, প্রবন্ধ বা গল্প-পুস্তকের নাম দেওয়ার মত মৌলিকতাও যাঁহার নাই, তাঁহার সম্বন্ধে লোকের পূর্ব্ব হইতেই অবহিত হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, এখন ব্যাপারটা দেখুন।

গল্প

Crome Yellow—Denis কবি, ভালমানুষ। নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে ট্রেনে করিয়া আসিল। পাঠরতা Priscilla-র সহিত তাহার দেখা

হইল। তারপর চায়ের আয়োজন। বাড়ির মেয়ে Anne-কে Denis ভালবাসে, কিন্তু Anne তাহাকে বন্ধুর পর্য্যায়ে ফেলিয়াছে এবং treats him as a child। Denis ক্ষুব্ধ। অন্য অতিথি Gombauld quite smart এবং efficient। Denis তাহাকে ঈর্ষা করে। Denis কবিতা লেখে এবং waste-paper-basket-এ ফেলিয়া দেয়। Ivor আসে। রাত্রে উদ্যান-ভ্রমণ, প্রেম। Denis-কে রচনা-কার্য্য সম্বন্ধে Mr. Barbecue-Smith-এর উপদেশ। Denis-এর হতাশ প্রণয়। Mary approached him but nothing doing। Ivor kissed Mary and made love to her। Denis utterly dejected,—sent home by Mary। Stroy ends।

'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ'—সুমিত্রা ট্রেনে করিয়া নীলিমাদের বাড়ি আসিল। পাঠরতা শীলার সহিত তাহার দেখা হইল। চায়ের আয়োজন। পুরন্দর কবি, ভাল মানুষ। নীলিমাকে ভালবাসে। নীলিমা তাহাকে শিশুর মত মনে করে। বীরেন Gombauld ও Ivor-কে পাঞ্চ করিয়া প্রস্তুত—পুরন্দর তাহাকে ঈর্ষা করে। পুরন্দর কবিতা লিখিয়া বাতাসে উড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। রাত্রে সকলের উদ্যান-ভ্রমণ। প্রেম। পুরন্দরকে রচনাকার্য্য সম্বন্ধে ধীরানন্দের উপদেশ। পুরন্দরের হতাশ প্রণয়। সুমিত্রার 'overtures' বিফল। বীরেন kissed সুমিত্রা এবং made love to her। পুরন্দর ব্যাকুল। শীলা তাহাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিল। গল্পের শেষ।

চরিত্র

Gombauld + Ivor	বীরেন
a good looking black-haired young corsair of thirty, with flashing teeth and luminous large dark eyes. Denis looked at him enviously—envied Gombauld his looks, his vitality, his easy confidence of manner...... Came leaping, laughed as he saw them. He was the hero of more amorous successes than he can remember...irresistible.	চেহারা ছিল সুন্দর—কালো চুল আর চোখ, সুসম্বদ্ধ দাঁতের সারি...কালো চোখের ঝলসানি।...পুরন্দর ওকে ঈর্ষা করে ওকে অনুকরণ করে। বীরেন লাফিয়ে গাড়ী থেকে নামে, যার সঙ্গে দেখা হয় আগে হাসে...এক একটি নূতন মেয়ে ওর গৌরবের মালায় এক একটি নূতন মুক্তো...মেয়ে ভুলোনো কৌশল তার আছে।

Crome Yellow	'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ'
Suddenly she [Mary] was caught by an extended arm and brought to an abrupt halt "Well" said Ivor as he tightened his embrace—she made an effort to release herself···He laughed··· he kissed her.	হঠাৎ তার [সুমিত্রার] দেখা হয়ে গেল বীরেনের সঙ্গে। কোনো কথা না বলে বীরেন তার একটা হাত ধরে ফেললো, তারপর দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখ নিজের মুখের কাছে টেনে আনলো। ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে করতে···। বীরেনের কালো চোখে হাসির আভাস জ্বলে উঠলো। [তারপর চুম্বন]
* * *	* * *
He [Denis] felt tremendously large and protective....She leaned against him....He was the master... A wave of courage swelled through him...."I'll carry you," Denis offered...on the cinema it always looked an easy piece of heroism.... Good heavens, what a weight !... he had to deposit his burden suddenly. Anne's faint amused, malicious smile...	আমি [পুরন্দর] ওকে [নীলিমাকে] বুঝিয়ে ছাড়ব···তার অব্যর্থ পৌরুষই সে এবারে প্রয়োগ করবে। দস্তুর মতো হী-ম্যান হবে সে,···সিনমায় তো এ-রকম জিনিষ প্রায়ই দেখা যায়···ঐরকম পাঁজা-কোলা করে' তুলে' নিতে পারলেই তো হয়—।···নীলিমা মোটেও ছোটখাটো নয়, মাথায় তো প্রায় তার সমান···নীলিমার কি খেয়াল হয়েছিলো, পুরন্দরের কাঁধের ওপর খানিকক্ষণ মাথা রেখেছিলো··· নীলিমার ঠোঁটের কোণে সেই ক্ষীণ হাসি।
* * *	* * *
Mary to Denis—"What have you been writing lately ?"	'নতুন আর কোনো বই লিখছো নাকি ?'
Mr. Scogan, "You have been writing prose ?"	পুরন্দর। 'হ্যাঁ...'
Denis. "Yes."	
Mr. S. "Not a novel ?"	নটরাজ। 'উপন্যাস ?...'
Denis. "Yes."	পুরন্দর। 'বইটা—'

Mr. S. "I'll describe the plot for you. Little Percy, the hero, ...lives among the artists....Writes a novel of dazzling brilliance; he dabbles delicately in Amour... Denis blushed scarlet.

*   *   *

Crome Yellow—Chapter VI

Mr. Barbecue-Smith—writer,... rather fat and complacent.... He could not control his interior satisfaction....Fat white hands and fingers. While talking he jabbed at Denis with his fingers...

"The secret of writing," he said is inspiration...That his my secret, ...I give it you freely...It came quite suddenly...I was hypnotized. I lost cosciousness....I pop off. Two or three hours later I wake up again, and find that inspiration has done its work. Thousands of words, comforting, up lifting words lie before me.

[Inspiration-এ রচিত কয়েকটি লেখা পড়িলেন এবং শেষে বলিলেন]

"That last one, is particularly subtle and beautiful, don't you think?"

নটরাজ। 'তোমার একখানা উপন্যাস আমি পড়েছি...একদল প্রেমিক-প্রেমিকার কথা লিখেছো;...সবাই—সাহিত্যিক না হ'লেও সাহিত্য-ঘেঁষা,...পাতার পর পাতা এরা শুধু কথাই কইলো...আমার অবিশ্যি মনে হয়েছে—কেন এই তর্কাতর্কি? ভালোবাসার উপায় তো একই।

পুরন্দর অনুভব করলো, তার কান গরম হয়ে উঠছে।

*   *   *

'রডোডেন্ড্রন-গুচ্ছ' ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—

ধীরাজপ্রসন্ন মহলানবীশ—লেখক; স্থূলকায়—আত্মপ্রীত, মোটা লোমশ একটা আঙুল...কথা বলিতে বলিতে তিনি পুরন্দরের কাঁধে টোকা দিলেন..."শোনো, ইন্সপিরেশনই হচ্ছে সমস্ত কবিতার উৎস।... তোমাকে আমার সিক্রেট বলে দিচ্ছি। সিক্রেট আর কিছুই নয়—ইন্সপিরেশন। হঠাৎ এক-এক সময় ইন্সপিরেশন আসে... আমি যেন অসীম শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, আমার চার দিককার বস্তু-জগৎ লোপ পেয়ে গেছে।...তখন কাগজ-কলম হাতে নিয়ে টেবিলে বসি—বসেই অজ্ঞান হয়ে যাই। তারপর কী হয় আমি আর জানি নে। মূর্চ্ছা যখন ভাঙে, দেখি, কাগজের ওপর সম্পূর্ণ একটি কবিতা লেখা হয়ে গেছে।"

[ধীরাজপ্রসন্ন "ইন্সপিরেশনে" রচিত একটা কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিলেন]

"আমার কলম থেকেও ও-রকম কোনো কবিতা এর আগে বেরোয় নি।... এরকম মিল আর কেউ দিয়েছে?"

*   *   *

এই রকম মিল আর কেহই অবশ্য দিতে পারে নাই এবং এমন আদর্শবাদী "ইন্সপিরেশনে"র খেলাও ইতিপূর্ব্বে বাংলা দেশে আর দেখা যায় নাই। কিন্তু আসলে ইহা বদ্ বা অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতক-যুগের কথা। এই জন্মের মূল বুদ্ধদেব তপস্যাশেষে শান্তিনিকেতন-বাস্তুতে আবির্ভূত হইবেন-হইবেন করিতেছেন। এতদিন পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে মারের খেলা আছে; মার Huxley, মার Arlen, মার Lawrence, মার Rossetti, মার Browning—কত মারের নাম করিব? কেহ মনে না করেন, মারের নাম করিয়া আমরা মারামারিতে প্ররোচিত করিতেছি। সেরূপ প্রবৃত্তি আমাদের নাই। এযুগে ইংরেজকে ভাঙিয়া ও ভাঙাইয়া যে কেহই কিছু করিতে পারিয়াছেন ও পারিতেছেন, তিনিই যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক, সুতরাং আমাদের নমস্য। বুদ্ধদেববাবুকেও আমরা নমস্কার জানাইতেছি।

পুঃ। আমাদের গতবারের বুদ্ধপ্রশস্তি পাঠে কাচিৎ মহিলা সাহিত্যিক বসু মহাশয়ের বিদেশী নামের বাংলা রূপান্তর বিষয়ে কিঞ্চিৎ দোষ ধরিয়াছেন, আমরা তাঁহার প্রেরিত সংশোধনীটি নিম্নে যথাযথ মুদ্রিত করিলাম।—

বুদ্ধদেব বসুকৃত উচ্চারণ	ঠিক উচ্চারণ
মরিস্ ডেকেব্রা—	মোরিস্ ডেকোব্রা—(Maurice Dekobra)
বদ্লেয়ার—	বোদেলেয়ার—(Baudelaire)
টিশিয়ান—	টিশ্যেন—(Titian)
মিকায়েলেঞ্জেলো	মাইকেলেঞ্জিলো—(Michelangelo)
ফ্রা লিপ্পো লিপ্পি—*	ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পি (আসল নাম) অথবা ফ্রা লিপ্পো লিপ্পি (Browning-এর অনুসরণে—)
মোনা লিসা—	মোনা লিজা—(Mona Lisa)
দা ভিঞ্চি—	দা ভেঞ্চি—(da Venci)

* Browning called him 'Fra Lippo Lippi' in one of his poems, 'Lippo' being the popular contraction of 'Fillippo.' But Huxley calls 'Fillippo', which is right of course, Browning's poem being a satire.
—লেখিকা।

বুদ্ধদেব বসুকৃত উচ্চারণ	ঠিক উচ্চারণ
কনষ্টেবল—	কান্‌ষ্টেবল্‌—(Constable)
রাফায়েল—	রাফাইল—(Raphael)
শারলট্‌ ব্রন্টি—	শারলৎ ব্রঁণ্টে (Charlotte Bronte)

বুদ্ধদেববাবু কোনো স্থানে পাশাপাশি চারজন চিত্রকরের নাম তালিকার মত ব্যবহার করেছেন। দুঃখের বিষয় চারটিই ভুল উচ্চারণে লেখা হয়েছে। যথা—

করেজ্জো—	করেড্‌জো—(Correggio)
রুবেন্স—	রুবীন্স্‌—(Rubens)
রেম্ব্রাণ্ড—	রেম্‌ব্রাণ্ট (Rembrandt)
ভেলাক্‌—	ভেলাথ্‌কেথ (Velazquez)*

গল্পঘটিত জীবনী

ভারতীয় সভ্যতা যে অতীব উচ্চাঙ্গের, তিনটি বস্তুর দ্বারা আধুনিক সভ্যজগতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে—এক, কড়া পাকের সন্দেশ; দুই, স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ; এবং তিন, গল্পঘটিত ইতিহাস অথবা জীবনী। অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন সভ্যতাগুলি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যতই উন্নতি করুক, আজিও সভ্যতার এই তিনটি গৌরীশংকর-চূড়ায় আরোহণ করিতে পারে নাই। হয়, ভারতবর্ষ হইতে এগুলি ইউরোপ-আমেরিকায় চালান হইতেছে, অথবা ভারতবর্ষের অনুকরণে ইউরোপ বা আমেরিকায় প্রস্তুত হইতেছে। অনেকে আজিও অবগত নহেন যে, মানিকতলার কড়া পাকের সন্দেশ বিলাতে অবিকৃত অবস্থায় চালান দিবার জন্যই আধুনিক রিফ্রিজারেটার-যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশবাসীরা দুগ্ধকে ভাঙাইয়া বহু চিত্তচমৎকারী পদার্থ উৎপাদন করিলেও দুধ-সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় যে ছানা, আজিও তাহার বিশদ ও সঙ্গত ব্যবহার করিতে শেখে নাই; ফলে কেকাদি বহুবিধ পেষ্ট্রি সত্ত্বেও পাশ্চাত্য

---

* এই সবগুলি নামই Lawrence অথবা Huxley-র বইয়ে উল্লেখ করা আছে। বুদ্ধদেববাবুর নিজের হয়তো কখনো বইয়ে লেখা ভিন্ন এদের উল্লেখ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে নি। তাই উচ্চারণ এত ভুল। বাঙালীর পক্ষে বিদেশী উচ্চারণ সঠিক না জানা কিছুমাত্র লজ্জার নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রমাগত বাঙালীদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন এবং 'সিরারিয়াস' ও 'ট্রেইন্‌' ইত্যাদি লেখেন, তাঁর পক্ষে এটি গর্হিত অপরাধ।—লেখিকা

রসনা তেমন তৃপ্তিলাভ করিতেছে না এবং তত্রত্য দুর্ভাগ্য অধিবাসীদের সারা দুনিয়ায় দাপাদাপি করিয়া ফিরিতে হইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই যে কেন শ্বেতাঙ্গদের প্রিয়, প্রশ্নিত হইলে সঠিক জবাব তাঁহারাও হয়তো দিতে পারিবেন না ; কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশ এবং বাংলা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কলিকাতা এবং কলিকাতার মধ্যে হেদুয়ার ধারটাই (ডাফের আমল হইতে) যে তাহাদের কেন সমধিক পছন্দ, ইহার সম্যক বিচার করিলে আমরা ওই কড়া পাকের সন্দেশে গিয়া উপস্থিত হইব। দুই নম্বর, স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজের কথা আর কি বলিব ? এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতবর্ষ হইতে জার্মানির মার্ক কোম্পানি উহা প্রস্তুত করিতে শিখিয়া গিয়াছিল বলিয়াই বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে জার্মানির বুক আজও দমিয়া যায় নাই। অনেকেই হয়তো জানেন না, স্বয়ং হিট্‌লার হিক্কেশাক অনুপানে প্রত্যহ দুআনি পরিমাণ মকরধ্বজ সেবন করিয়া এই অবস্থাতেও মাথা ঠিক রাখিতেছেন। যাক, আমাদের আজিকার প্রসঙ্গ ভারতীয় সভ্যতার তৃতীয় তুঙ্গ-গৌরবটিকে লইয়া—গল্পঘটিত ইতিহাস লইয়া। আর দুইটির মত এটিও একান্ত ভারতীয় এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই আরব-পারস্যের পথে এই মহামূল্য বস্তুটি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 'পুরাণ-প্রবেশ'কার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র-শেখর বসু মহাশয় সাক্ষ্য দিবেন ভারতবর্ষীয় পুরাণ-উপপুরাণগুলি কি জাতীয় খাঁটি ইতিহাস। আজ প্রাচীনকালের মহিমা লইয়া উল্লাস প্রকাশ করিবার আমাদের সময় নাই, তবে এ কথা আমরা সকলেই জানি ভারতবর্ষের যে ইতিহাস এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পুরাপুরিই গল্পঘটিত। মকরধ্বজে যেমন স্বর্ণ নিজে সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিয়া ক্যাটালিটিক এজেন্টের কাজ করে, এই সকল ইতিহাসেও তেমনই গল্পগুলি নিছক গল্প থাকিয়াও ক্যাটালিটিক এজেন্টের কাজ করে, দানাদার রসসিন্দুরের মত ইতিহাস স্বতই প্রকাশ পায়। এ এক বিচিত্র ভারতীয় কাণ্ড। তবে ইতিহাসের কথা এখন থাক।

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ হইতে বাংলা দেশে গল্পঘটিত জীবনী একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে। নানা অলৌকিক ও লৌকিক

গল্পরূপ ক্যাটালিটিক এজেণ্ট যোগে এক-একজন মহাপুরুষের জীবনী যা খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে, প্লুটার্ক ও হিরোডোটাস তাহা দেখিলে বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িতেন, এবং জীবনী ও ইতিহাস রচনার পক্ষে historical precision বস্তুটি যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের রচিত জীবনী ও ইতিহাসগুলি পুনর্লিখনে ব্যস্ত হইতেন। একদিনে মধ্যাহ্ন-আহারের পূর্ব্বে একজন বালকের সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ, পিতার ধর্ম্মমতে লজ্জিত হইয়া তেরো বৎসরের বালকের পদব্রজে তিব্বত যাত্রা, মাতৃ-ভক্তিপরায়ণ সন্তানের বর্ষায় দুকূল প্লাবিত দামোদর সন্তরণ, গঙ্গা পার হইতে গিয়া মকরবাহিনী গঙ্গাকে দর্শন ইত্যাদি গল্পব্যঞ্জন যোগে এক-একজন মহাপুরুষ কেমন করিয়া সাধারণের সহজপাচ্য হইয়া উঠিলেন, ইহার কায়দা ও কানুন মাত্র আমরাই জানি। এই গল্পঘটিত জীবনীর গৌরীশঙ্কর-চূড়া ছিল এতদিন ভাইপো শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত খুড়ো বঙ্কিমের জীবনী—অবশ্য হাতেম তাই, গিরিশচন্দ্র, কথামৃত প্রভৃতি ধর্ম্মজীবনগুলি বাদ দিতেছি। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম খণ্ড' প্রকাশিত হওয়াতে শচীশচন্দ্রের গৌরীশঙ্কর-চূড়া আড়ালে পড়িয়াছে, হেমেন্দ্রনাথের এভারেস্ট (জোড়া) শৃঙ্গই এখন জ্বলজ্বল করিতেছে—গল্পঘটিত জীবনীর এটি যেন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য!

বঙ্কিম-জীবনীর সবে আদি পর্ব্ব শুরু হইয়াছে, কিন্তু হইলে কি হয়, এই আদি পর্ব্বেই লেখকের অনাদি মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে; একমাত্র "উদ্দীপক" শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মহিমার নিকটই যদি বা তাহা হার মানে! ক্যাটালিটিক এজেণ্টের সহিত এই উদ্দীপন-শক্তি যুক্ত হইয়া যে কি কাণ্ড ঘটাইয়াছে, বিস্ফোরণ না হইলে কেহ তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন না। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই মজিয়াছি।

কিন্তু আমাদের একটু আপত্তির কারণ ঘটিয়াছে। মাতাল যখন মাতলামি করিতে থাকে, তখন গায়ে বা গুষ্টিতে হাত না পড়া পর্য্যন্ত বেশ লাগে, কিন্তু প্রলাপের মধ্যে হঠাৎ সে যদি পাতঞ্জলীয় যোগদর্শন আওড়াইতে থাকে, তখন মাথায় প্রবল একটা ঝাঁকানি লাগে বইকি!

ঠাকুরমার ঝুলির গল্প শুনিতে শুনিতে হঠাৎ যদি মাঝখানে শুনি—"তখন ১৮৫৬ সাল, ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহের রক্তগঙ্গা বহিতে আরম্ভ হইয়াছে", তখন প্রথমটা একটু থতমত খাইলেও সামলাইয়া লইয়া বলিতে হয়, বাপু হে, বেশ তো গল্প বলিতেছিলে, আবার সাল কেন? আর সালই যদি বল, ওটা ১৮৫৭ সাল, ৫৬ নয়। হেমেন্দ্রবাবুর গল্প-ঘটিত জীবনীতেও ওইরূপ আঘাত মাঝে মাঝে খাইতে হইয়াছে এবং বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে, বেশ তো হইতেছিল স্যার *, আবার ইতিহাস কেন? তাহা যখন করিবার উপায় নাই, তথ্যগুলি তিনি যাহাতে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করিয়া লইতে পারেন, সেইজন্য অনেক ঐতিহাসিক অসঙ্গতির মধ্যে সামান্য দুই-চারিটি প্রদর্শন করিতেছি। তবে এ কথাও তাঁহাকে সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে জানাইয়া দিতেছি যে, এই গল্পঘটিত অসঙ্গতিগুলি দোষ নয়, গুণ; এইরূপ অসঙ্গতির সংখ্যা যত বেশি থাকে, জীবনী ততই সরস ও সুখপাঠ্য হয়। তাঁহারটিও হইয়াছে। তিনি যে "ভূমিকা"য় লিখিয়াছেন—

> আজ যে এতদিন পরে এই ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে সেই বিরাট পুরুষের জীবনী বাহির হইল, তাহাও সেই মহান্ "অদৃশ্য শক্তির" সহায়তাই হইয়াছে। ভগবান কাহাকে দিয়া কি কাজ সম্পন্ন করান একমাত্র তিনিই জানেন, তাঁহারই কৃপায় পঙ্গুও পর্ব্বত লঙ্ঘন করে। ছিলাম উকীল, হইলাম চাকুরীজীবী।...কিরূপে জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সে কাহিনীও বিস্ময়কর।

যাঁহারা তাঁহার জীবনী পড়িবেন, তাঁহাদের কিছুই বিস্ময়কর বোধ হইবে না; ভগবানের যে রসবোধ আছে, ইহাকে তাঁহারা তাহারই একটি সদৃষ্টান্ত স্বরূপ বিবেচনা করিবেন। এরূপ জীবনীলেখক শুধু ভগবানের দয়াতেই হওয়া যায়, অন্য কোনও কোয়ালিফিকেশন প্রয়োজন হয় না। যাহা হউক—

পৃ. ১৫৭। উনিশ বৎসর বয়সে গুপ্তকবি সাপ্তাহিক 'প্রভাকর' পত্রিকা বাহির করেন (১৮৩০)।

---

* স্যার সুবিধা পাইলেই একটা ডি-লিট ডিগ্রীও নাকি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে সেটা বঁড়শে-বেহালা ইউনিভার্সিটির না গোবরডাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়ের, পাশে ব্র্যাকেটে তাহার উল্লেখ থাকে না।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আর একটু সদয় হইলে এই "পঙ্গু" এবং "উকীল" লেখক জানিতে পারিতেন যে, 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়।

পৃ. ১৫৭। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামক আর একখানি পত্রের সৃষ্টি করেন। ইহা ব্রাহ্মরা যে হিন্দুদের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিতেন তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ প্রথমে বাহির হয়।

দেখিতেছি, ডি-লিট ডক্টর সাহেব কাশীনাথের 'পাষণ্ডপীড়ন' পুস্তকের সহিত 'পাষণ্ডপীড়ন' পত্রিকাটিকে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। কাশীনাথের গ্রন্থ রামমোহন রায়ের গ্রন্থের প্রতিবাদ বটে, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের পত্রিকা কদাপি ব্রাহ্মদের প্রতিবাদস্বরূপ প্রকাশিত হয় নাই।

পৃ. ১৭৫। প্রাপ্ত বয়সে রাজার উপরে রাজা, বিরহিণীর দশদশা ও আরও কয়েকটি কবিতা ছাড়া অতঃপরে [১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে] বঙ্কিম আর কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি।

"রাজার উপর রাজা" 'প্রচারে' এবং "বিরহিণীর দশদশা" বঙ্কিমের মৃত্যুর পর 'পঞ্চপুষ্পে' প্রকাশিত হয়, কিন্তু ১২৭৯ হইতে ১২৮৫ সালের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' ও 'ভ্রমরে' যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, জীবনচরিত-লেখক মহাশয় সেগুলি এই হিসাব হইতে বাদ দিলেন কেন?

পৃ. ১৭৭। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হেলহেড সাহেব N. B. Halhed নামক জনৈক সিভিলিয়ান বাঙ্গলা ভাষায় একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন। চার্লস উইলকিন্স নামক জনৈক ইংরাজ কাঠে একপ্রস্থ বাঙ্গলা অক্ষর ক্ষোদিত করেন। ইহাতেই তাঁহার বন্ধু হেলহেডের ব্যাকরণ মুদিত হয়।

"মুদিত হয়"ই ঠিক, লজ্জায় মুদিত হয়! পোড়া কপাল আর কি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই গবেষকপ্রবর আজ পর্যন্ত হ্যালহেডের ব্যাকরণটি যে ইংরেজীতে লিখিত, সে খবরও রাখেন না! এদিকে তো গিরি লঙ্ঘন করিবার বাসনা আছে! অথচ এই সহজলভ্য বইটি চোখে দেখিবার কষ্টও স্বীকার করেন নাই! ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে মাসের পর মাস কি ছাই কাজ করিয়াছেন তবে! সেখানে এ বই আছে, এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে আছে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-লাইব্রেরিতে আছে এবং কলিকাতার অন্যত্র বহু স্থানে আছে। অন্য সব বিষয়ে

দাশগুপ্ত মহাশয় যেরূপ পরস্মৈপদী এক্ষেত্রেও সেরূপ না হইলে দেখিতে পাইতেন, ইহা ইংরেজীতে লেখা বাংলা ব্যাকরণ এবং ইহাতে ব্যবহৃত বাংলা হরপগুলি যে ছেনি দ্বারা ধাতু কাটিয়া প্রস্তুত, তাহাও এই বইয়েরই ভূমিকায় লেখা আছে। বাংলা বই ছাপায় কাঠের কারবার মোটেই কখনও হয় নাই।

পৃ. ১৭৮। ১৮০১ সালে ফর্ষ্টর (H. P. Forster) সাহেব **সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা ভাষায় অভিধান প্রস্তুত করেন।**

ফরস্টারের বাংলা-ইংরেজী অভিধান ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা সর্ব্বপ্রথম অভিধান নয়।

পৃ. ১৭৮। **শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস যোগ্যতার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাঙ্গলা অভিধান ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।**

সজনীকান্ত দাস কখনও পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুজন এরূপ স্বীকার করিতেছেন না। তিনি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান বিষয়ে একটি প্রবন্ধে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এ. আপজন কর্ত্তৃক ক্যালকাটা ক্রনিকল প্রেস হইতে প্রকাশিত অভিধানকেই ওই সম্মান দেন। ডি-লিট ডক্টর মহোদয়ের যাবতীয় গবেষণা যদি এইজাতীয় হয়, তাহা হইলে তিনি জীবনে ওকালতি না করিয়া ভালই করিয়াছেন। গবেষণা এবং ইন্‌সিওরেন্স জগৎই এতখানি বরদাস্ত করিতে পারে, আদালত পারে না। তা ছাড়া একই পৃষ্ঠার উপরে নীচে দুইখানি স্বতন্ত্র বইকে সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষার অভিধানরূপে বর্ণনা করিতে হইলে এককালে কতখানি আবগারী দ্রব্য উদরস্থ করিতে হয়, হেমেন্দ্রবাবু সে বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিলে ভাল হয়।

আমাদের স্থান অকুলান, কম্বলের লোম কত বাছিব? ১৭৮ হইতে

১৮৫ মাত্র এই আট পৃষ্ঠার মধ্যে শতাধিক ইতিহাসের ভুল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদিগকে "জজ পণ্ডিত" বলিত না; "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্" নয়, 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্'; ইহা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হয় নাই, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দেই রচিত ও শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়াছিল; 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র তারিখ ১৮১৩ নয়, ১৮৩৩; "রামমোহন রায়ের যুগ (?) ১৭৭৫-১৮৩২" নয়, ১৭৭৪ [২ ?]-১৮৩৩; 'সস্‌পেন [Saucepan ?] ম্যাগাজিন' নয়, 'গস্‌পেল ম্যাগাজিন'; "ব্রাহ্মনিক ম্যাগাজিন" নয়, 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন'; 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রকাশকাল ১৮৪৬ নয়, ১৮৪৭; অক্ষয় দত্তের বইয়ের নাম "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়" নয়, 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার'; ইহার দুই ভাগ ১৮৫১-২ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, ১৮৫৩ অব্দে নয়; 'বাসুদেব চরিত' ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয় নাই, কখনই বাহির হয় নাই, ইহাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম রচনা, পাণ্ডুলিপি আকারেই ছিল, ইহার অংশবিশেষ পরে তাঁহার জীবনীতে উদ্ধৃত হইয়াছিল; রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ প্রকাশিকা" নয়, 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'; 'মাসিক পত্রিকা' ১৮৫৭।৫৮ সালে প্রকাশিত হয় নাই, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; গুপ্তকবি ১৮৫৮ সালে পরলোকগমন করেন নাই, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়;—"গত চারি বৎসরে আমাকে প্রায় ১২।১৪ বৎসরের পরিশ্রম করিতে হইয়াছে"র ইহাই যদি নমুনা হয়, তাহা হইলে দাশগুপ্ত মহাশয় সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত না করিয়া গায়ে ফুঁ দিয়া এই বইখানি রচনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পঘটিত জীবনী কত অধিক সুখপাঠ্য হইত! আমরা হেমেন্দ্রবাবুদের কাছে সুখপাঠ্য জীবনীই চাই, ইতিহাস চাই না। আশা করি, পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি রচনা করিবার সময় তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এই কথাগুলি স্মরণ রাখিবেন।

অভয়ঙ্কর

বাঁশী ফেলে দাও, বিষাণ বাজাও বীর,
গগনে গগনে উতল হ'ল সমীর
সিন্ধু উঠেছে দুলিয়া
ঝড়ের দাপটে তরঙ্গ উঠে ফুলিয়া
নাচে প্রলয়ঙ্কর
মেঘের মাথায় রক্ত-কেতন তুলিয়া
আসে অভয়ঙ্কর।

বাঁশী ফেলে দাও, বিষাণ বাজাও বীর,
বক্ষে বক্ষে অধীর হ'ল রুধির
দেউল গিয়াছে ভাঙিয়া
প'ড়ে আছে শুধু ভক্ত-শোণিতে রাঙিয়া
ধূলা-শিলা-কঙ্কর
ভ্রূকুটি-ভয়াল নয়নবহ্নি হানিয়া
এল অভয়ঙ্কর।

বাঁশী ফেলে দাও, বিষাণ বাজাও বীর,
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু ডাকে গভীর,
মরণানন্দে মাতিয়া
গণনাথ নাচে তা-থৈ তাথিয়া তাথিয়া,

মত্ত দিগম্বর
শঙ্কাহরণ চরণ ধূলায় পাতিয়া
এল অভয়ঙ্কর।

বাঁশী ফেলে দাও, বিষাণ বাজাও বীর,
খসিয়া পড়ুক ভয়-বিশীর্ণ চীর
ভয় নাই—বল হাঁকিয়া,
এসেছে করাল, সবারে ফিরিছে ডাকিয়া
ভৈরব শঙ্কর
জীবন-দেবতা শ্মশান-বিভূতি মাখিয়া,
জয় অভয়ঙ্কর।

"চন্দ্রহাস"

আমি

ষ্টেশন হয়ে প'ড়ে আছি, তোমরা হচ্ছ প্যাসেঞ্জার,
কেউ বা দিচ্ছ লম্বা পাড়ি মেলে কিংবা এক্সপ্রেসে;
লোকাল ট্রেনে কেউ কেউ বা আসছ যাচ্ছ বারংবার—
দেখা দিয়ে ক্বচিৎ কেউ বা যাও চ'লে কোন্ দূর দেশে।
মুখ হয়তো চিনি নেকো পায়ের শব্দ পাই সবার,
চলন দেখে বলতে পারি আসছ কে কোন্ উদ্দেশে,
জুতোয় কারো বাঁধা যে নাল, কারো জুতোয় ক্ষয় রবার-
ভালবেসে কেউ বা আস, কেউ বা আস ভয় বেসে।
কত দিকের কত যাত্রী আসে এবং যায় চ'লে,
কত গোপন কানাকানি এই আমাকেই শুনতে হয়,
বন্ধু ভাবে কোন্ মুসাফির মনই আমার দেয় ব'লে—
জানি তবু প'ড়েই থাকি করি নে আর শত্রুভয়।
আমি ষ্টেশন, নাই অধিকার দলাদলি কোন্দলে,
সবাই এস, সবাই ব'সো, যেও যখন হয় সময়।

সংবাদ-সাহিত্য

যাঁহাদের মৃত্যুতে বিভিন্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত বিবেচনা করে অথবা আত্মীয়-বিয়োগের দুঃখ অনুভব করে, তাঁহারাই মনুষ্য-সমাজে অসাধারণ। এই অসাধারণত্বে রবীন্দ্রনাথ আধুনিককালের বাংলা দেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে আপামরসাধারণ সমগ্র বাঙালী-জাতি বেদনাবোধ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সহিত অসাধারণত্বের ব্যবধান অধিক হইলেও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ঠিক পরবর্ত্তী স্থান দুইটি অধিকার করিয়া ছিলেন। এক হিসাবে হীরেন্দ্রনাথের স্থান প্রফুল্লচন্দ্রেরও উর্দ্ধে ছিল। তিনি স্বদেশপরায়ণ কর্ম্মবহুল জীবন যাপন করিয়াও রসিক-সমাজের একজন ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবন, কর্ম্মজীবন ও সাহিত্যজীবন তাঁহাকে বহু বিভিন্ন সমাজের প্রিয় ও আত্মীয় করিয়াছিল এবং কোনও ক্ষেত্রেই তিনি নিম্নশ্রেণীর সাধক ছিলেন না, এমন কি, বাংলা দেশের রাষ্ট্রজীবনেও একদিন তিনি প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। এই যুগের স্মৃতি জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ ও যাদবপুর-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগের মধ্য দিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। বাংলা দেশে থিওজফিক্যাল সোসাইটির তিনি প্রধান ছিলেন এবং এই ধর্ম্মজীবনের প্রভাব তাঁহার সাহিত্যজীবনকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিল; তাঁহার 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রেমধর্ম্ম' পর্য্যন্ত বহু গ্রন্থই ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কর্ম্মজীবনে তিনি কলিকাতার ব্যবহারজীবী ও অ্যাটর্নী সম্প্রদায়ের দীর্ঘকাল নেতৃত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এই সকল সম্প্রদায়ের অসংখ্য লোক নেতা-বিয়োগের দুঃখ বোধ করিয়াছেন।

আমাদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক তাঁহার সাহিত্যজীবন লইয়া; সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার তুল্য পণ্ডিত ব্যক্তি ইদানীং আর কেহ ছিলেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে তিনি পারঙ্গম ছিলেন; ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বেদ ও উপনিষদাদিতে

এতখানি জ্ঞান কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু তিনি রসিক ছিলেন। শেষজীবনে বঙ্কিম-সাহিত্য লইয়া তিনি যে পরিমাণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যৌবনে নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তিনি নবীনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার মেঘদূতের কাব্যানুবাদ তাঁহার কবি-মনের পরিচয় দেয়।

তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কীর্ত্তি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ; এই প্রতিষ্ঠানের জন্মকাল হইতে তাঁহার মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত ইহার একরূপ অভিভাবকরূপেই তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া বাংলা দেশে ও বৃহত্তর বঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রচারে ও বিস্তারে তিনি কি পরিমাণ পরিশ্রম ও চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইতিহাস এখনও লিখিত হইতে বাকি আছে। হীরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-নিষ্ঠা এবং বাংলা সাহিত্য বিষয়ে অকৃত্রিম উৎসাহ শেষ দিন পর্য্যন্ত বজায় ছিল। তাঁহার বিয়োগে বাংলা সাহিত্য অপরিসীম ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

রবীন্দ্রনাথ গিয়াছেন, হীরেন্দ্রনাথ গেলেন, বাকি রহিলেন বাংলার প্রফুল্লচন্দ্র; এই চন্দ্র অস্তমিত হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীর সহিত বাংলা দেশের প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন হইবে। সেই দুর্দ্দিন বিলম্বে আসুক।

—

দুইটি সরকারী প্রচার-পত্র হাতে আসিয়াছে—"Three Voices Speak of Britain" এবং "Slavery"। এগুলিতে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় Winston Churchill, পার্লিয়ামেণ্টে ব্রিটিশ লেবার পার্টির লীডার মাননীয় Clement R. Atlee, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক J. B. Priestley এবং আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ Dorothy Thompson প্রভৃতির বাণী উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে, যান্ত্রিক শক্তি পৃথিবীতে আপাতত প্রভুত্ব বিস্তার করিলেও আত্মিক শক্তির নিকট তাহা একদিন পরাভূত হইবেই। এই সকল মহাবাণী সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে সত্য, ইহা জানিয়া আমরা সেগুলি নিম্নে সঙ্কলন করিয়া

দিলাম। এগুলিকে একটা দেশকালবিবৰ্জ্জিত রূপ দিবার জন্য স্থানে স্থানে বর্জ্জন করিতে হইয়াছে। আশা করি, এই সকল মহাবাণী শ্রবণ করিয়া আমাদের দেশের লোকেরাও এই দুর্দ্দিনে আত্মিক বলে বলীয়ান হইবে।

"The lesson to be derived from present experiences is never to give in. Never, never, never. Not in any event, great or small, large or paltry, never, never yield, except to conviction and good sense."—Churchill

"Never yield to force, never yield to the growing, and apparently overwhelming, might of the enemy These are great days—the greatest days our history has seen. We must thank God for allowing each of us, according to our stations, to play a part in making these days so memorable in the history of our race." —Churchill

"...Such an old empire that she had known power for centuries, great power...Her position had deteriorated steadily and, with the leading characteristic of decadence, her leaders and probably the people themselves did not know it ...Her Government... bargained for petty ends....People were losing pride in work, and an indolent, not creative, leisure seemed a universal desideratum. Youth was not looking for honour, glory, keenness, fame or even what all healthy youth seeks—experience and adventure. No, they were looking for safe berths and old-age pensions....

...was like a beautiful museum and summer resort with slums on the outskirts in which people with the greatest tradition... were living on and using up with terrible rapidity the inherited capital of their ancestors....

But out of the wounds of...despair, there rose over-night in the twinkling of an eye another...of the people themselves, with all they remembered of greatness, all they saw of present reality.... A great wave of life passed through and people knew what to do, and did it....They organized...Not Government, they themselves...

...Do not think people have not screamed and wept as they saw their husbands buried in the rubble or their children die, but people would not let them have hysterics. A rough "Shut up!

Don't start this—we are all in the same boat" was enough.... They are happy. Yes, that is true, for what makes happiness? It is to know that you are not alone. It is to realize to the fullest the grandeur of your inheritance. It is to know that if you die, you die for a purpose."—Dorothy Thompson

"...a gigantic brigand state, whose staple industry was aggression....The people they controlled were almost ideal people for this particular purpose. They were, for the most part, naturally obedient and docile, only too anxious to receive orders. ...Moreover, their national traditions were militarist, so that the idea of spending their time and energy creating instruments of destruction wasn't repugnant to them, but instantly aroused their pride and loyalty....

We were, it appeared, a decadent lot, well past our prime, no longer capable of making the terrible effort necessary to challenge successfully....

And we have challenged it, and we are beginning to beat it."—J. B. Priestley

"Wherever the totalitarian regime is introduced, the first victim is liberty · liberty of speech, liberty of conscience and liberty of free association....In the new world and new social order which will emerge when this tyranny is overpast, we must attain a new unity of spirit and purpose."—C. R. Atlee

—

আশ্বিনের 'প্রবাসী'র প্রথম তিন পৃষ্ঠায় যেরূপ রবীন্দ্র-কাতরতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, অতঃপর তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বাজার-হিসাবগুলি লইয়াই টানাটানি করিবেন। তিনি প্রত্যহ কি দিয়া খাইতেন, বাঙালী পাঠকের পক্ষে তাহাও সংবাদ তো! আমরা ভাবিতেছি, পূর্ব্বাহ্নেই বনমালী ও মহাদেবের শরণাগত হইব। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' বাহির হওয়াতে এই দুর্দ্দশা হয় নাই তো?

—

'বিশ্বভারতী পত্রিকা' বলিতে মনে পড়িল। দেখিতেছি, আমরা প্রায় ঋষিত্বে উপনীত হইয়াছি। গত সংখ্যায় শান্তিনিকেতনে বৌদ্ধপ্রভাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত

করিয়াছিলাম—আশ্বিনের পত্রিকাতেই দেখিতেছি আচার্য্য বুদ্ধদেবের বাণী—"স্বাজাতিকতা, দেশপ্রেম, বিশ্বমানবিকতা" এবং সে কি বিশ্ববিমোহন বাণী! এই বাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, আমরা যে বাঙালীজাতি, শুদ্ধ এই বোধ হইতে লজ্জায় ঘামিয়া উঠিব। বর্ত্তমান ভারতের দেশাত্মবোধের মূর্ত্তবাণী বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রকে এমনভাবে জুতাইতে স্বদেশী যুগের গোবা-পল্টনেও পারে নাই। বুদ্ধদেব বসু লিখিতেছেন—

"'আমার মার মতো মা আর নেই, তিনিই বিশ্বের চরমতম মা'—একথা যদি কেউ মুখে বলে কিংবা এই মর্ম্মে কাব্যরচনা করে, সভ্যসমাজের চোখে সে-ব্যক্তি হবে অতীব হাস্যকর, কিন্তু নিজের দেশ সম্বন্ধে অনুরূপ ভাববিলাসিতা লোকে যে শুধু ক্ষমা করে তা নয়, তার মোহে অন্ধ হয়ে হত্যার পথে ধ্বংসের পথে দলে দলে ধাবিত হয় এ তো আজ চোখের উপরেই দেখা যাচ্ছে।...দেশমাতৃকাকে যখন রক্তপায়িকা নরমুণ্ডলুব্ধা 'দেবী' রূপে কল্পনা করা হয় তখনও তার প্রতিবাদে খুব বেশি কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। নৈতিক বিচারের কথা ছেড়েই দিলুম—কিন্তু নিছক মূঢ়তা সংঘবদ্ধ মানুষ যে কতখানি সহ্য করতে পারে—শুধু তা-ই নয়, সেই মূঢ়তার দাসত্ব ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ ঘনায়—তা ভাবলে আজকের দিনেও অবাক না-হ'য়ে উপায় থাকে না।"

"রবীন্দ্রনাথের বাণী মিথ্যা হবার নয়" এই শান্তিমন্ত্র পাঠ করিয়া বসু মহাশয় প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছেন; কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথকেই সেদিন-প্রকাশিত 'চিঠিপত্র দ্বিতীয় খণ্ডে' পুত্র রথীন্দ্রনাথের নিকট বলিতে শুনিতেছি—

"বাংলাদেশের চিত্ত সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে প্রসারিত হোক্, বাংলাদেশের বাণী সর্ব্বজাতি সর্ব্বমানবের বাণী হোক্। আমাদের বন্দেমাতরং মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়—এ হচ্চে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।"

ইহা কি স্বাজাতিকতা নয়? হায় রবীন্দ্রনাথ, আজ বিশ্বমানবিকতায় তুমি বুদ্ধদেব বসুর নিকট হার মানিলে!

—

আশ্বিনের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" শ্রাবণের 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী লিখিত "ভূমিকা" হইতে নিম্নলিখিত অংশটি আলোচিত হইয়াছে—

"বীরবল বহুকাল পূর্বে লিখেছিলেন যে, আমাদের বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ।...রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের চর্চা যথেষ্ট স্থান লাভ করেছে।"

এই আলোচনার পরে নববিধান সমাজের কোনও প্রবীণ কবি 'নববিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করিলে ষোলকলা পূর্ণ হইত। আদি, সাধারণ ও নববিধানের মিলিবার এমন সুযোগ আর মিলিবে না। ভারতচন্দ্রের জয় হউক!

আশ্বিনের 'ভারতবর্ষ' খুলিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল "শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ"। লেখকের নামটা দেখিয়া একটু চমকাইতে হইল বইকি!—সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখিলাম, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলাম না—হালদার মহাশয় কখনও জেলে গিয়াছিলেন কি না। জেলে না বসিয়া কোনও ব্যক্তি গীতা-ভাগবত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎও আলোচনা করিয়াছেন, এমন সংবাদ আমাদের জানা নাই। তা ছাড়া সুধাংশুবাবু বাংলা দেশের আই-সি-এস দৈত্যকুলে এই প্রথম প্রহ্লাদরূপে দেখা দিলেন। আর কোনও আই-সি-এস তো গীতা-ভাগবত পর্য্যন্ত পৌঁছান নাই; অরবিন্দ ঘোষ পৌঁছিয়াছেন বটে, কিন্তু ওদিকে তিনি আবার আই-সি-এসের শেষ ধাপ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন নাই। মোটের উপর তাজ্জব বনিতে হইল।

কবি সামসুদ্দীন হায়দার লিখিয়াছেন—

"এই নখের খরমুখে
তোমার বিভোল মুক শাড়ী
—যতো সখের যবনিকা—
গেলো দীঘল টানে ছিঁড়ে ছরকুটে।...
তোমার শামুক নিরুপায়
কেন খুবলে দিলাম আমি!

আমাদের গত ভাদ্র সংখ্যা বাংলা গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক গত ২রা সেপ্টেম্বরের 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত হওয়াতে অনেককে আমরা কাগজ দিতে পারি নাই। গ্রাহকেরাও অনেকে কাগজ পান নাই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। মফস্বলেও বহু ষ্টল হইতে পুলিস ভাদ্র সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' লইয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবিধান করিতে আমরা অসমর্থ।

ধারা নামুক চোখে হেন—
আমি ডুব্‌লে-যে গো বাঁচি নতুন ক'রে!
আমার নগ্ন অজগর
কোন্ বিজন হরিণীরে
যাচে মগ্ন হ'য়ে আজো
আলো সৃজন কর—বাঁচাও আঁখির তটে!"

কবি হায়দারের এই শামুক-খোবলানো কাব্যের ব্যাখ্যা সমালোচক টিপু-সুলতানই করিতে পারিবেন; অজগর-দৃষ্টে আমরা ভয় পাইয়া গিয়াছি!

"যৌবনবতীর কাহিনী" শুনিবেন? রিজিয়ার কাহিনী? "শুন শুন তাতারনন্দিনী" রিজিয়া নয়, যৌবনবতী, লাবণ্যবতী, "আর সে-সংগে অশেষ মূল্যে মূল্যবতী" রিজিয়া। শুনুন। একদিন—

"রিজিয়া নিজের ঘরে বসে-বসে পা দোলাচ্ছে আপন মনেই। কোনো একটা বিষয় ভাবতে-ভাবতে সে অকারণেই কোলের ওপর বাঁ-হাত দিয়ে সাড়ির আলগা অংশ রগড়াচ্ছিলো। ধীরে-ধীরে কখন যে হাঁটু পর্যন্ত লাল সায়ার সাথে-সাথে সাড়িখানা উঠে এসেচে, তা সে মোটেই লক্ষ্য করে নি। চোখ পড়তেই সে অত্যন্ত চমকে উঠলো, তাড়াতাড়ি নামাতে যেয়ে পায়ের দিকে চোখ পড়তেই আবার চমকে পড়লো, এবং পরক্ষণেই দরজার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালো। কাঁপা পায়ে দ্রুত হাতে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে রিজিয়া দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলো মুখ চোখ বুক-পীঠ ভরে। একটা অনাস্বাদিত সামগ্রীর আবিষ্কারের নেশায় রিজিয়া তখন কামাতুরা। অসহ্য শিহরণ-ধারা তাকে পুড়িয়ে অঙার করে ফেলতে চাচ্ছিলো। নেশাতুরার মতো দুর্বল পায়ে স্তিমিত ইন্দ্রিয় নিয়ে বিছনেয় গিয়ে পা তুলে সে বসলো। পরিশেষে আবার পায়ে থেকে সাড়ি তুলে সে তার পা দুটো পরীক্ষা করতে লাগলো। দু-হাতে স্থানে-স্থানে টিপে-টিপে দেখতে লাগলো।"

পাঠক নিশ্চয় নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া একটা কিছু কেলেঙ্কারির প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমরাও করিয়াছিলাম। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি জানেন? কি দেখিয়া রিজিয়া কামাতুরা—অসহ্য শিহরণ-ধারায় দগ্ধ হইয়া অঙার? শুনুন—

"মিহি সোনালি রোমে সমস্ত পা-টা একটা অপূর্ব রূপ-শ্রী ধারণ করেচে, মাংসালো পায়ে রং ধরেচে কাচা হোলুদের!"

বুঝুন, আধুনিক সাহিত্যের perversity কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে! রোমেই যদি এই, বার্লিনে না জানি কি হইবে? হয়তো রিজিয়া আর বাঁচিবে না।

রিজিয়া নাম হইতেই বুঝিতেছেন, ইহা পাকিস্তানী সাহিত্য। জিন্না সাহেব

যদি ইহাদের লইয়া পাকিস্থানের মধ্যেও একটা আলাদা পাকিস্থান গড়িয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার মাতৃভূমি হিন্দুস্থানের উপকারই করিবেন।

—

মন্মথনাথ রায়ের "রুদ্ররাজ" ('ভারতবর্ষ', আশ্বিন ১৩৪৯) বেশ গুরুগুরু নিনাদেই আরম্ভ হইয়াছিল; "ব্যভিচার, মহামারী, বিদূষক, দাবানল, স্কন্ধকাটা, ছিন্নমস্তা" ইত্যাদির মধ্য দিয়া অন্তমিল ডবল ওয়েলার ঘোড়ার মত বেশ কদমে কদমেই চলিতেছিল, হঠাৎ শেষ দুই পংক্তিতে কবি যে কেন নেতাইয়া পড়িলেন বুঝা গেল না। বাঙালী বলিয়াই কি? অন্তমিলও সম্ভবত সম্পাদকীয় দৌরাত্ম্যে ওই দুই পংক্তিতে কেৎরাইয়া গিয়াছে—

"এ নহে নূতন এই সনাতন বিশ্বের ইতিহাস—
জীবন-মরণ যুগল-মিলন একই ঘরে সহকারে।"

সম্পাদকীয় বিভাগে "সহবাসে" কাহার আপত্তি হইল বুঝিতে পারিতেছি না।

—

কাহারই বা দোষ দিব? 'প্রবাসী'ও এবার "পুস্তক-পরিচয়" বিভাগে (আশ্বিন, পৃ. ৬৩১) "যৌন-অনুরাগিণী" হইয়া উঠিয়া যুগধর্ম্ম পালন করিয়াছেন!

—

"প্রিন্সিপাল মুকুল দে" আশ্বিনের 'ভারতবর্ষে' শ্রীঅরবিন্দকে এই সার্টিফিকেট দিয়াছেন—

"এত লোকের ছবি আমি এঁকেছি, কিন্তু আমার জীবনে আমি এমন ভাল সীটিং দিতে কাকেও দেখিনি। পুরো এক ঘণ্টা আমি এঁকেছিলুম, তার মধ্যে একবার একটুও নড়েন নি, বা আমি একবারও তাঁর চোখের পলক পড়তে দেখিনি।"

এতদিনে শ্রীঅরবিন্দের যোগে বিশ্বাস হইতেছে। কিন্তু ইহার চাইতেও অলৌকিক কাণ্ডের কথা লিখিয়াছেন নূর উদ্দীন মাহমুদ। তিনি লিখিয়াছেন—

"সুপ্ত হলো শূন্য মনে ঘরের মহিষী,
বদ্ধ বায়ু উর্দ্ধে ওঠে, নৃত্যময়ী তিসি।"

"নৃত্যময়ী তিসি" সত্যই অভাবনীয়।

কয়েকটি চিঠিপত্র পাইয়াছি। তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ঢাকা হইতে ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আপনি সাহিত্যিক সংবাদের ভাণ্ডারী। দুই একটা খবর আশা করি দিতে পারিবেন। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' নামক একখানা "রহোন্যাস" দৈবাৎ হাতে পাইয়া পড়িয়া ফেলিলাম। লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি কি সেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁহার প্রথম রচনা "দিবারাত্রির কাব্য" 'বঙ্গশ্রী'তে আপনি সাদরে প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং আমরা পাঠক সাধারণ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া মনে করিয়াছিলাম,—শরৎ চাটুজ্জের পরে এইবার একটি বৃহৎ প্রতিভার উদয়ের অরুণরাগ লক্ষিত হইল? ইনি কি সেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁহার "পুতুল নাচের ইতিকথা' 'দিবারাত্রির কাব্য' দ্বারা জনিত প্রত্যাশাকে ম্লান করে নাই, বর্দ্ধিততর করিয়াছিল? শরৎ চট্টোপাধ্যায় যেমন নকল একজন দাঁড়াইয়া ছিলেন 'দিবারাত্রির কাব্য' বা 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র সম্ভাবনা-সমৃদ্ধ ঔপন্যাসিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনিও তেমনি একজন নকল নহেন তো? যদি তিনের গ্রন্থকার একই হন, তবে আপনার নিকট কিঞ্চিৎ সংবাদপ্রার্থী। তিনি কি বাতশ্লেষ্মাবিকারযুক্ত সান্নিপাতিক জ্বরে ভুগিয়া উঠিয়া মস্তিষ্ক সুস্থ না হইতেই পেটের দায়ে এই পুস্তকখানি লিখিয়া প্রকাশকের কিঞ্চিৎ অর্থাপহরণ করিয়াছেন?"

এই অভিযোগের উত্তর দিবার একমাত্র অধিকারী মাণিকবাবু স্বয়ং, আমরা শুধু এইমাত্র বলিতে পারি যে, 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'র লেখক একই ব্যক্তি।

* * *

'বাঙলায় দেশী-বিদেশী—বঙ্গ-সংস্কৃতির লেন-দেন' নামক একটি পুস্তিকা সম্প্রতি আমাদের হাতে আসিয়াছে—গ্রন্থকার স্বয়ং অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। পুস্তিকাটি পড়িয়া বিনয়বাবু সম্বন্ধে মনে মনে শঙ্কিত হইতেছিলাম, এমন সময় ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের আর একখানি পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

"এই সব রাবিশ ছাপিয়া বাহির করার অর্থ কি? বিনয়বাবুর কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? এই প্রমাণপ্রয়োগহীন অসম্ভব মতবাদ ও উচ্ছ্বাস তিনি নেশার ঝোঁকে উচ্চারণ করিবেন, আর ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ খুঁজিয়া বাহির করিবেন, এই দুরাশা কেন? তিনি মনে করিতেছেন, তিনি আমাদের ঋষিগণের মত মন্ত্রদ্রষ্টা; আসলে ইহা অর্দ্ধশিক্ষিত, প্রমাণ-অনুসন্ধান-বিমুখ অলস আত্মাভিমানীর দারুণ মোহপ্রসূত মূল্যমাত্রহীন স্বকপোলকল্পিত উদ্ভট আবোলতাবোল মাত্র। বিনয়বাবু কেন এমন করিয়া লোক হাসাইতেছেন এবং বাঙ্গালী গবেষকগণকে জগতের সামনে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিতেছেন?"

উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া পুস্তিকাখানি পুনরায় পড়িলাম। ভট্টশালী মহাশয় মিছা রাগ করেন নাই।

* * *

কলিকাতা ল্যান্সডাউন রোড হইতে শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবী লিখিয়াছেন—

"পাঠিকা হিসাবে আপনাদের সংবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে আমার একটা suggestion আছে।

আপনাদের সমালোচনা চমৎকার হয়। যেগুলো আমাদের পড়া, হয়তো নিজেরা যে মতে বলাবলি করছি, হঠাৎ ছাপার অক্ষরে আপনাদের কাগজে সেই মতটি দেখে মন খুসী হয়ে ওঠে। আর একটা উপকার হয় যেগুলো পড়ি নি তার নমুনা দেখে, আর সেগুলো পড়ে অর্থ ও সময় নষ্ট করতে হয় না। সাবধান হওয়া যায় আগে থেকে। কিন্তু এতগুলো কাগজ বই ঘেঁটে আপনারা প্রশংসা করবার মত যদি কিছু পান তবে সেটুকুর উল্লেখ বড় বেশি করেন না তো। আমার suggestion এই যে, ভাল কিছুর উল্লেখ পেলে পাঠকপাঠিকার সুযোগ হয় সেগুলো সংগ্রহ ক'রে পড়বার।"

এই ইঙ্গিত অনুযায়ী কাজ করিতে আমরা চেষ্টা করিব।

* * *

কলিকাতা রসা রোড হইতে শ্রীযুক্ত জিতেন সেন লিখিয়াছেন—

"আপনারা বর্ত্তমান সাহিত্যে জাল-জুয়াচুরি আবিষ্কার করিতেছেন বলিয়া আপনাদের নিকট একটি বিষয় জানানো প্রয়োজন মনে করিলাম। বিষয়টি

আরও শোচনীয়, কারণ এটা ঘটেছে শিশু-সাহিত্যে। দেব-সাহিত্য-কুটীর কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'রঙীন-আকাশ' (২য় সং, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯) নামে গল্প-সঞ্চয়নে শ্রীনিখিলেশ সেনের মৌলিক গল্পরূপে প্রকাশিত "জমিদার বাড়ির দলিল" সুবিখ্যাত মার্কিন লেখক Edgar Allen Poe লিখিত "Purloined Letter" গল্পটির বিকৃত নকল। চরিত্র ও স্থানের নাম বদলাইয়া তিনি বেশ বাহাদুরি দেখাইয়াছেন।"

* * *

মাকাইবাড়ি টি এষ্টেট, কার্সিয়াং হইতে শ্রীযুক্ত পি. ব্যানার্জ্জি লিখিয়াছেন—

"'শনিবারের চিঠি'র ভাদ্র সংখ্যায় আপনাদের "সংবাদ-সাহিত্য" বিভাগে শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন কর মহাশয় সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। কারণ ওসকল গল্প লিখিবার সমস্ত ব্যবস্থা কর মহাশয় মনে মনে (অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব্বজন্মেও) স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত "Great minds think alike" এই নিয়মে তাঁহার লেখা ছাপা হইবার পূর্ব্বেই অন্যে সেইগুলি নিজেদের নামে প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছে। এই দেখুন না কেন, এই শ্রাবণের 'বসুমতী'তে তাঁহার লেখা "ভুলের প্রায়শ্চিত্ত" গল্পটি মঁপাশা কর মহাশয়ের জন্মের বহু পূর্ব্বেই বেমালুম চুরি করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা কর মহাশয়ের উপর অকারণ উত্তেজিত হইয়া মুশকিলে পড়িবেন না।"

অনুরোধ শিরোধার্য্য।

* * *

বরাহনগর, কাশীনাথ দত্ত রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'অদৃশ্য সঙ্কেত' হইতে দুইটি রত্ন উদ্ধার করিয়া পাঠাইয়াছেন। ওই পুস্তকের ৮৬ পৃষ্ঠায় নন্দগোপালবাবু লিখিয়াছেন—

"পূর্ব্ব দিকটা তখন সূর্য্যোদয়ের অবিশ্রান্ত ঘর্ষণে চাপ চাপ রক্তবমি করছে।"

নন্দগোপালবাবু সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক নন। তাই এই অপূর্ব্ব রিয়ালিষ্টিক বর্ণনায় একটু বিজ্ঞানের ভুল আছে। ঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই বমি হয় না, কিছু

কাল পরে হয়। কিন্তু পত্রপ্রেরক এটিকে অসঙ্গতির পর্য্যায়ে ফেলিয়া অন্যায় করিয়াছেন।

পৃ. ১০২। "আর ভালবাসারই মূল্য কি? ওটা একটা মানুষের ছেঁকে আনা জিনিস বই তো নয়...আসলে দেহটাই সব; নির্লজ্জ দৈহিকতাটা মানুষের সৌন্দর্য্যবোধকে আঘাত করে, তাই মানুষ ওর ওপর একটা প্রেমের প্রলেপ লাগিয়েছে মাত্র...কিন্তু যত পবিত্র, শুভ্র সুন্দর করেই ওটাকে দেখাতে চান না কেন, ও আঁসটে গন্ধ কি চাপা পড়ে কোন দিন?"

নন্দগোপালবাবুর দুর্ভাগ্য, তিনি বোধ হয় বাল্যকালে মায়ের ভালবাসা পান নাই।

—

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার সঙ্কলিত এবং সম্প্রতি প্রকাশিত 'কাব্য-মঞ্জুষা'* গ্রন্থখানি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। সাধারণত ইহা স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সঙ্কলিত হইলেও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ঠিক এই ধরনের সঙ্কলন ইতিপূর্ব্বে আর একটিও বাহির হয় নাই। একজন প্রথম শ্রেণীর কবির মন এই সঙ্কলনের পশ্চাতে কাজ করিয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থে আমরা বাংলা কাব্য-সাহিত্যধারার ক্রমবিকাশের একটা স্পষ্ট পরিচয় পাই।

এই পুস্তকের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ইহার "উন্মোচনী" অংশ। ইহাতে কবিতার কথা, বাংলা কবিতার ছন্দ ও কবিতা-পাঠ বিষয়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে, বাংলা দেশে আজ পর্য্যন্ত সে ভাবে আলোচনা কেহ করেন নাই। প্রত্যেকটি কবিতার টীকা ও কবির পরিচয় অংশেও বহু নূতনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। প্যাল্‌গ্রেভ সাহেব যে পরিশ্রম স্বীকার ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের বিখ্যাত কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ও অনুরূপ শ্রম ও সাহিত্যবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই বাংলা 'কাব্য-মঞ্জুষা'টি খাড়া করিয়াছেন। বাংলা দেশের ভাবী-

* কাব্য-মঞ্জুষা—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, ঢাকা লাইব্রেরি, ঢাকা। মূল্য দেড় টাকা।

কালের বালক-বালিকাদের কাছে শুধু এই কাজের জন্যই তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। "মুখবন্ধে" তিনি বলিয়াছেন—

"আমি কেবল ছাত্রগণের পরীক্ষার উপযোগী কবিতাই সংকলন করি নাই; আমার উদ্দেশ্য—তাহারা, কবিতা কি বস্তু, তাহাও যেন বুঝিবার সুযোগ পায়। এজন্য আমি, এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে, যতদূর সম্ভব, নানা প্রকারের কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি। আরও একটি কথা এই যে, আমি কবিতা-নির্ব্বাচন করিয়াছি—কবি-নির্ব্বাচন করি নাই; কোন্ কবিকে বাদ দেওয়া হইল, সে ভাবনা না করিয়া, কয়টি উপযুক্ত কবিতার স্থান করা যাইতে পারে, সেই চিন্তাই করিয়াছি।...আমার সব চেয়ে ভাবনার বিষয় হইয়াছে—কবিতার সমুচিত পঠন-পাঠন। আমি জানি, কেবল ভাল কবিতা চয়ন করিলেই হইবে না, সেগুলিকে ভাল করিয়া পড়াইতে হইবে। এই শিক্ষা—যে কারণেই হোক—শিক্ষার্থীদের যে প্রায়ই হয় না, সে বিষয়ে আমার সাক্ষ্য আশা করি কেহ অগ্রাহ্য করিবেন না।...আমি এই পুস্তকে যতদূর সম্ভব শিক্ষকের কাজ করিয়াছি। বরং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সেই পাঠন-রীতিকেই মুখ্য করিয়া আমি এই পুস্তক রচনা করিয়াছি—ইহা কেবল একখানি সংকলন-গ্রন্থই নয়।"

এই কাব্যসংগ্রহখানি হাতে পাইয়া আমরা এই দুঃখই বোধ করিলাম যে, আমাদের বাল্যে ও কৈশোরে এই জাতীয় পুস্তক আমরা পাই নাই।

—

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দের *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal** সম্প্রতি-প্রকাশিত আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ অধ্যাপক মহাশয়ের দীর্ঘকালের সাধনার ফল। আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক অন্ধভক্তিপ্রসূত; ঠিক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বৈষ্ণব-ভক্তিধর্ম্মের (বাংলার) আলোচনা বিশেষ হয় নাই; ডক্টর দের গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন যে, তিনি এই আলোচনা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের

* General Printers and Publishers Ltd, Calcutta, Price Rs 10/-

দৃষ্টিতে করিয়া যথেষ্ট সৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন ; অনেক মিথ্যা ও মোহ ইহাতে ভঙ্গ করা হইয়াছে।

গ্রন্থের সাতটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়, তৃতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী, চতুর্থ অধ্যায়ে রসশাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ বিবৃতি ও আলোচনা ; ষষ্ঠ অধ্যায়ে বৈষ্ণব আচার ও বৈষ্ণবের ক্রিয়াকলাপাদি এবং শেষ অধ্যায়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল সাহিত্য-গ্রন্থ আছে তাহাব আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়েই সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিচারের দ্বারা তথ্য ও তত্ত্বকে তৌল করিয়া অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাব নিজস্ব বিশিষ্ট মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগীরা নানা কারণে এই গ্রন্থকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহা হইলেও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কিছুমাত্র কমিবে না।

—

১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের *Nalanda Year Book** আমাদের হস্তগত হইয়াছে—এটি Special War Edition। এই জাতীয় যতগুলি ইয়ার-বুক আমাদের চোখে পড়িয়াছে, এটি নিঃসংশয়ে তাহাদেব মধ্যে সুলিখিত ও নির্ভুল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারাপদ দাশগুপ্ত এই বাৎসরিক বহিটিকে সকলের অবশ্য-ব্যবহার্য্য করিবাব জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। গ্রন্থের ছাপাই বাঁধাই ও আয়তন বিবেচনা করিলে ইহার তিন টাকা মূল্য সস্তাই হইয়াছে বলিতে হইবে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাতে যে কয়টি অধ্যায় যোজিত হইয়াছে, তথ্যের দিক দিয়া সেগুলি প্রায় সম্পূর্ণ। সকলকেই আমরা এই গ্রন্থেব এক-একখণ্ড সংগ্রহ করিতে বলি।

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" যে উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হইয়া

* Nalanda Press, Calcutta, Price Rs 3/-

উঠিতেছে, তাহার প্রমাণ অত্যল্পকালের মধ্যে ইহার ১নং 'কালীপ্রসন্ন সিংহ', ৩নং 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কাব', ৪নং 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়', ৫নং 'রামনারায়ণ তর্করত্ন', ১০নং 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ও ১৬নং 'রামমোহন রায়ে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। ৬নং 'রামবাম বসু'রও দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। ইতিমধ্যে ১৭নং 'গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—রাধামোহন সেন—ব্রজমোহন মজুমদার—নীলরত্ন হালদার' বাজারে বাহির হইয়াছে। এই বিষয়ে বাঙালী পাঠকেরা যে উৎসাহ দেখাইতেছেন, তাহাতে আশা হয় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার গৌরবময় ইতিহাস সঠিক জানিবাব জন্য বাঙালীর আগ্রহ বাড়িতেছে। ইহা আশার কথা।

—

এই সংখ্যাতে আমাদের চতুর্দ্দশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইল। যাঁহারা এতকাল সুখে দুঃখে 'শনিবারের চিঠি'র সহিত বার্ষিক চাব টাকার বন্ধনে বাঁধা আছেন, আশা কবি, এই দুর্দ্দিনে তাঁহারা সে বন্ধন ছিন্ন করিবেন না। তবে সব ছিঁড়িয়া গেলে সে স্বতন্ত্র কথা।

পুস্তক-পরিচয়

চিঠিপত্র, ১ম ও ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, কলিকাতা। প্রতি খণ্ড মূল্য ১৲।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে অসংখ্য প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় চিঠি লিখিয়াছেন। বস্তুত, লিপি-শিল্পী হিসাবে পৃথিবীর যাবতীয় মৃত ও জীবিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে তিনিই প্রধান। সামান্য চিঠিকে এত অপূর্ব্ব সাহিত্য-রূপ আর কেহ দিতে পারেন নাই। কবিতা পড়িয়া আমরা কবি রবীন্দ্রনাথের একটা পরিচয় পাইতে পারি, কিন্তু "কাব্য প'ড়ে যেমন ভাব কবি তেমন" নন—এরূপ একটা সন্দেহ তিনি নিজেই আমাদের মনের মধ্যে জাগাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমরা তাঁহাকে অন্যত্র আবিষ্কার করিবার জন্য প্রাণপণ করি। কিন্তু তিনি নিজে এমন দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে তাঁহার দেহ ও মন-গত পরিচয়কে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন যে, মাথা ঠুকিয়া রক্তারক্তি হইয়া গেলেও তাঁহার আসল স্বরূপ আমাদের নাগালের মধ্যে আসে না। এই বিষম দুর্ভেদ্যতার মধ্যে এই 'চিঠিপত্র'গুলি অনেকখানি আশ্বাস বহন করিয়া লইয়া আসে। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ও বহুধাবিস্তৃত জীবনীর উপকরণ হিসাবে এই বই দুইখানি অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রচলিত জীবনীগুলিতে আমরা তাঁহার দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না, স্বরচিত 'জীবন-স্মৃতি'তেও তিনি কোন পরিচয়ই দেন নাই। 'চিঠিপত্রে'র প্রথম খণ্ডে তাঁহার সহধর্ম্মিণী মৃণালিনী দেবীকে যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন এবং কবি-কর্ত্তৃক এতদিন সযত্নে যেগুলি রক্ষিত হইয়াছিল, তাহাই স্থান পাইয়াছে। অর্থাৎ এই চিঠি কয়খানিই তাঁহার দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে একমাত্র উপকরণ। দ্বিতীয় খণ্ডে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখিত অনেকগুলি চিঠি আছে। পুত্রের নিকট লেখা পিতার এই চিঠিগুলির মধ্য দিয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথের এমন একটি ঘনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির কোথাও মিলিবে না। বিশ্বভারতী খণ্ডে খণ্ডে সজ্জিত করিয়া রবীন্দ্রনাথের অগণিত পত্র-প্রকাশ যেদিন সম্পূর্ণ করিবেন, সেদিন সেগুলি যে শুধু তাঁহার জীবনী-রচনার প্রধান উপকরণ হইয়া উঠিবে তাহা নয়, এই 'চিঠিপত্র'গুলিই হইবে তাঁহার সবচেয়ে বড় জীবনী।

স্বপন-পসারি (২য় সং)—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। পরাগ পাব্লিশার্স, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০।

কাব্য-সাহিত্যে মোহিতলালের 'স্বপন-পসারি'র পুনঃপ্রকাশ বিশেষ আনন্দের সংবাদ। 'স্বপন-পসারি'র কবি বাংলা দেশে একটি নূতন 'স্কুল' সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আধুনিক কবি-সম্প্রদায়ের উপর রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী যে দুই-একজন সার্থকব্রত কবির প্রভাব অবশ্য-স্বীকার্য্য, মোহিতলাল তাঁহাদের অন্যতম। বাংলা কবিতায় তিনি যে আর্বী-ফার্সী

শব্দের বহুলপ্রয়োগের প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় পরবর্তী কবিদের কাব্যে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া মোহিতলালের পূর্ব্বে বাংলার হিন্দু-মুসলমান কোন কবিই ভারতের মুসলমান যুগকে কাব্যে এতটা প্রাধান্য দিতে অগ্রসর হন নাই। ভাবের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রধান প্রেমকাব্যে মোহিতলাল দেহাত্মবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। 'স্বপন-পসারি' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল একুশ বৎসর পূর্ব্বে। তারপর 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল' ও 'হেমন্ত-গোধূলি'তে কবি অনেক পথ অতিক্রম করিয়াছেন। যৌবন-বৈশাখের উজ্জ্বল দীপ্তি 'হেমন্ত-গোধূলি'তে স্নিগ্ধতা অর্জ্জন করিয়াছে। 'স্বপন-পসারি'র ছন্দের চটুলতা ও ভাষার উচ্ছলতা 'বিস্মরণী'তেই সংযত-গাম্ভীর্য্যে উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর 'স্মরগরল' ও 'হেমন্ত-গোধূলি'তে দেহাত্মবাদের কবি কাব্য-দেহের প্রসাধন-কলায় সংযম ও শুচিতার চরমে পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু কাব্যবিচারে 'স্বপন-পসারি' মোহিতলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্র-কাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা—শ্রীসরসীলাল সরকার। প্রাপ্তিস্থান: বিশ্বভারতী, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার এক একটি বৈশিষ্ট্য এক এক ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। কেহ কবির ভাষা, কেহ ভাব, কেহ ছন্দ, কেহ বা তাঁহার কাব্যের অপর কোন লক্ষণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সরসীবাবুর নিকট রবীন্দ্র-কবিতার একটি বিশেষ ধারা ধরা পড়িয়াছে। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে কবির বহু লেখায় প্রথমে তাল, পরে গান ও তাহার পর গতির ইঙ্গিত ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকেই গ্রন্থকার ত্রয়ী পরিকল্পনা বলিয়াছেন।

ছোট ছোট ঢেউ ওঠে আর পড়ে,
রবির কিরণ ঝিকিমিকি করে,
আকাশেতে পাখি, চলে যায় ডাকি
বায়ু বহে যায় ধীরে।

এই কবিতায় ঢেউয়ের ওঠা পড়ায় তাল, পাখীর ডাকে গান ও বায়ু বহিয়া যাওয়ার প্রসঙ্গে গতির আভাস পাওয়া যাইতেছে। বহু কবিতা উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার নিজ পর্য্যবেক্ষণের যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছেন।

অনেক খ্যাতনামা গ্রন্থকারের লেখায় রবীন্দ্র-কাব্যের ত্রয়ী পরিকল্পনার অনুরূপ আবর্ত্তনশীল বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী দেখা যায় কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার গূঢ়ার্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। সরসীবাবু এ বিষয়ে অগ্রগামী। তিনি মনোবিদ্যার সাহায্যে রবীন্দ্র-কাব্যের এই বৈশিষ্ট্যের মূল উৎস নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে কবির 'অবচেতন' মন হইতেই ত্রয়ী পরিকল্পনার উৎপত্তি। "পর পর তাল, গান ও গতির

পরিকল্পনা কবির কবিতায় প্রতীক স্বরূপ স্বতঃস্ফুরিত হইয়াছে," কবির জ্ঞাতসারে তাহাদের আবির্ভাব হয় নাই। "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ উপনিষদের এই মহান বাণী তাল, গান ও গতির ভিতর latent content রূপে রহিয়াছে"। সরসীবাবুর মতে কোন কোন ক্ষেত্রে তাল, গান ও গতি সরলভাবে প্রকাশ না পাইয়া ছদ্মবেশে দেখা দিয়াছে, যেমন, তাল 'সমীরহিল্লোলে রজনীগন্ধার গন্ধ' রূপে, গান 'ফুলফোটায়' রূপে, ইত্যাদি। "ত্রয়ী কল্পনার রূপ অনেক স্থলে এরূপভাবে পরিবর্তিত হইয়া যায় যে সহজে তাহাদিগকে ত্রয়ী পরিকল্পনা বলিয়া ধরিতে পারা যায় না।" আবার যখন কবি এমন কোন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যাহা তাঁহার নিজ আদর্শের বিপরীত তখন ত্রয়ী পরিকল্পনার ক্রম উল্টাভাবে দেখা দিয়াছে, অর্থাৎ আগে গতি, পরে গান ও শেষে তালের ইঙ্গিত আসিয়াছে।

সরসীবাবু যদিও তাঁহার বক্তব্য প্রতিপাদনের জন্য মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের বা সাইকো-অ্যানালিসিসের অনেক পরিভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তথাপি তাঁহার গবেষণাকে মনঃসমীক্ষা বলিলে ভুল করা হইবে। তিনি সংজ্ঞান মনোবিদ্যার গণ্ডি অতিক্রম করেন নাই। এবং ত্রয়ী পরিকল্পনার উৎস নিরূপণের জন্য মনঃসমীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে সাধারণ মনোবিদ্যার আশ্রয়েই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সরসীবাবু মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলি ব্যবহার না করিলে ভাল করিতেন। প্রথমতঃ এই শব্দগুলি তাহাদের নির্দিষ্ট রূঢ় অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই তাহাতে নানা প্রকার ভ্রমসম্ভাবনা আসিয়াছে। 'Latent content', 'symbol,' 'super-ego' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ গ্রন্থকার যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা সমীক্ষণ শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। দ্বিতীয়তঃ এই সকল পারিভাষিক শব্দের অযথা প্রয়োগে পাঠকের মনে ধারণা জন্মিতে পারে বুঝি বা গ্রন্থকারের গবেষণা মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রমূলক। দেখিলাম পুস্তকের একজন বিশিষ্ট সমালোচকও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

সরসীবাবু কবির নির্জ্ঞান মনের সন্ধান লন নাই ; তিনি সংজ্ঞানের, অর্থাৎ যে মন সম্বন্ধে আমরা অবহিত তাহারই, নিম্নস্তর অর্থাৎ আসংজ্ঞান পর্যন্ত যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মনোবিদ্‌গণের মতে মনের আরও গভীর স্তরে অর্থাৎ নির্জ্ঞান মনে প্রবেশ করিতে না পারিলে আলোচ্য লক্ষণের মূল উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নহে। গ্রন্থকার এ প্রয়াস করেন নাই বলিয়া তাঁহার আবিষ্কারের গৌরব হানি হইয়াছে। তিনি ত্রয়ী পরিকল্পনার সহিত উপনিষদের বাক্যের যে সংযোগ স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন অনেক পাঠকের নিকট তাহা বিফল মনে হইবে।

সরসীবাবু কবির গহন মনের এক নূতন তথ্য আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। বহু উৎকৃষ্ট কবিতা উদ্ধৃত হওয়ায় এই পুস্তক সাধারণের আনন্দদায়ক হইয়াছে।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

জাবির এবনে হাইয়ান—এম. আকবর আলি। প্রকাশক—মুহম্মদ আবদুল জব্বার, ২৯এ, এন্তোনিবাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৲

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিকদের জীবনী বেশি বাহির হয় নাই ; বাঙালীরা বিজ্ঞান-আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন অল্পদিন। মুসলমান বৈজ্ঞানিকদের কোন জীবনী মাতৃভাষায় আমরা এতাবৎকাল দেখি নাই। এম. আকবর আলি বিখ্যাত মুসলিম বৈজ্ঞানিক জাবির এবনে হাইয়ানের জীবনী প্রকাশ করিয়া সে অভাব পূরণ করিলেন। রসায়নের যে সকল বিচিত্র উদ্ভাবনের গৌরব আমরা এতকাল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের উপর আরোপ করিয়াছি, এই জীবনী পাঠে দেখা যাইতেছে যে, সে সব গৌরব আসলে জাবিরের প্রাপ্য।

কোর্‌আ'ণ মুকুল—বেগম নূরমহল। প্রকাশক—এম. এ. খালেক, কোহিনুর লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম। মূল্য ॥৵০।

কোরানের আটত্রিশটি সুরার অনুবাদ। "ঠিক বাচনিক অনুবাদ নয়, বরং অনেকটা ভাবের অনুবাদ"—এ কথা লেখিকাই স্বীকার করিয়াছেন। অনুবাদের মধ্যেও লেখিকার অন্তরের যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়।

মনে ছিল আশা—উপন্যাস, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে যে সকল উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে, 'মনে ছিল আশা' তাহাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। গজেন্দ্রবাবুর গল্পগুলি পড়িয়া আমরা একদা যে আশা পোষণ করিয়াছিলাম, 'মনে ছিল আশা'তে সেই আশাই আমাদের পুষ্টতর হইল। গজেন্দ্রবাবুর হাতে আমরা নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের আরও অনেক কাহিনী শুনিবার আশা রাখি।

অমলের জীবন বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের সাধারণ জীবন ; এই জীবনে অভাব আছে, দুশ্চিন্তা আছে, একেবারে ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া যাইবার ভয়ও আছে, কিন্তু ইহা যে উপন্যাসের নায়কের জীবন হইতে পারে, গজেন্দ্রবাবু আমাদিগকে তাহা ভাল করিয়াই দেখাইয়াছেন। উপন্যাসের সূত্রপাত হইতে সদ্যবিবাহিতা পত্নী পারুলকে ফেলিয়া অমলের পলায়ন পর্য্যন্ত ঘটনা অতি সামান্যই ; কিন্তু সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়াই এই অতি দরিদ্র নায়কের আশাভঙ্গের কাহিনী লেখকের সহৃদয়তাগুণে একটি অসামান্য মহিমা অর্জ্জন করিয়াছে। এই উপন্যাস যাঁহারা পাঠ করিবেন, অমলের জীবন তাঁহাদের অবসরকালের সঙ্গী হইবে।

অনুবর্ত্তন—উপন্যাস, শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্রালয়, কলিকাতা। মূল্য ২৸০।

বাংলা দেশের প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক যে কয়জন আছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম, তাঁহার 'পথের পাঁচালী' একদিন উপন্যাস-জগতে যে চমকের সৃষ্টি

করিয়াছিল, তাঁহার 'দৃষ্টিপ্রদীপ' ও 'আরণ্যক' প্রভৃতি পুস্তকে তাহাই স্থায়ী রূপ লইয়া তাঁহাকে নিঃসংশয়ে বাংলা দেশে সাহিত্যিক শিল্পী-সমাজে একটি নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইয়া দিয়াছে। মধ্যে আমরা তাঁহার রচনার গতানুগতিকতায় আশঙ্কান্বিত হইয়াছিলাম। কিন্তু 'অনুবর্ত্তন' উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা আবার স্রষ্টা বিভূতিভূষণকে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। উপন্যাসখানি তাঁহার নিজের স্কুলমাষ্টারের জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা রচিত। একটি স্কুলের শিক্ষক-সম্প্রদায় সমবেতভাবে ইহার নায়ক। তাঁহাদের অবিচিত্র একঘেয়ে জীবন লইয়া যে এমন অপূর্ব্ব একটি শিল্প সৃষ্টি হইতে পারে, ইহা জানিতে পারিলে অনেক দুঃখের মধ্যেও এই সকল স্কুলমাষ্টারে একটা নূতন গৌরব বোধ করিবেন। হেডমাষ্টার ক্লার্কওয়েল, নারায়ণবাবু, ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু ইঁহারা সকলেই আমাদের অত্যন্ত পরিচিত এবং অতি সাধারণ লোক। কিন্তু এই নারায়ণবাবুর মৃত্যু-দৃশ্যে আমরা যখন তাঁহাকে তারাজোল গ্রামের মাঠের স্বপ্ন দেখিতে দেখি, তখন মনে হয়, সত্যকার কবির মনে মহাকাব্য কোনও বিষয়ের অপেক্ষা রাখে না; তাঁহারা কিছু না হইতেই সব-কিছু গড়িয়া তুলিতে পারেন। 'অনুবর্ত্তন' নিঃসংশয়ে বিভূতিভূষণের একটি সার্থক সৃষ্টি।

ধাত্রী দেবতা—উপন্যাস, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস। মূল্য ৩৲।

কালিন্দী—উপন্যাস, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কাত্যায়নী বুকস্টল, মূল্য ৩৲।

শ্রীমধুসূদন—নাটক, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। ডি. এম. লাইব্রেরি, মূল্য ২৲।

জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—প্রবন্ধ, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ, ২৲

উপরের চারিখানি পুস্তকই অত্যল্পকালের মধ্যে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া বাংলা দেশে সৎসাহিত্যের মর্য্যাদা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাই প্রমাণ করিতেছে। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবেই ভাগ্যবান।

উপচয়নী—১ম খণ্ড, উপন্যাস-সংগ্রহ। দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং, ৫৲ টাকা।

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং বাংলা সাহিত্য ব্যাপারে অনেক নূতনত্ব সম্পাদন করিয়াছেন, 'উপচয়নী' তাহার অন্যতম। বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের পাঁচ পাঁচটি সুবৃহৎ উপন্যাসের একত্র সন্নিবেশ অভাবনীয় বটে। বর্ত্তমান খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হেরফের', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈরাগ-যোগ', প্রেমাঙ্কুর

আতর্থীর 'প্রবাসী' এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অমলা' স্থান পাইয়াছে। উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটিই বহু-আলোচিত এবং বাংলার সাহিত্যরসিক-সমাজে এগুলি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। 'উপচয়নী'র ছাপাই ও বাঁধাই চমৎকার।

বাংলার পুরনারী—দীনেশচন্দ্র সেন। দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং, মূল্য ৫৲।

বাংলা সাহিত্যে স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই শেষ দান। সেই দিক দিয়া এই পুস্তকটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা' ও 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র যে সকল বিচিত্র কাহিনী ছন্দোবদ্ধভাবে পাওয়া যায়, এই পুস্তকে সেন মহাশয় সেইগুলিই গল্পচ্ছলে বর্ণনা করিয়া ইহাদের ঐতিহাসিকতা, সমসাময়িক পরিবেশ ইত্যাদি বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এই সকল প্রসিদ্ধ কাহিনীতে যে সকল পুরনারীর কথা আছে, 'বাংলার পুরনারী' তাঁহাদেরই ইতিহাস। মূল গীতিকার অংশবিশেষ এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনার চিত্রসন্নিবেশে পুস্তকটির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ—এক হইতে উনিশ, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং, প্রত্যেকটির মূল্য ।৵৹।

মন যখন অবসাদগ্রস্ত, অন্য কোনও কাজ ভাল লাগিতেছে না, তখন এই রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের বইগুলি যে বিশেষ তৃপ্তি দেয়, তাহার সাক্ষ্য আমরা দিতে পারি। এগুলির সবচাইতে বড় গুণ, এগুলি উত্তেজক হইয়াও নির্দ্দোষ; বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের হাতে দৈবাৎ পড়িয়া গেলেও ক্ষতি নাই।

রঙ্গমঞ্চ—নাটিকা-সংগ্রহ, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং, মূল্য ৸৹।

হাসির নাটক-নাটিকা আমাদের দেশে খুব বেশি লিখিত হয় না, অথচ নাটক ও রঙ্গমঞ্চের কাজ প্রধানত লোকের মনোরঞ্জন করা। এই মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অমরবাবু বৈদেশিক নাট্য-সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে মুদ্রিত নাটিকা তিনটি রচনা করিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে এগুলি সফল হইবে কি না জানি না—আমরা পড়িয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি।

রবীন্দ্রকথা—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। জয়শ্রী পুস্তকালয়, মূল্য ৫৲।

রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির বহু জীবনী ইতিমধ্যে লিখিত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছু লিখিতে বাকি আছে। নানা জনে নানা দিক দিয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন। খগেন্দ্রবাবু একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা সঙ্কলন করিতেছেন। 'রবীন্দ্রকথা'র পরিশিষ্ট অংশ এখনও প্রকাশিত হইতে বাকি আছে। খগেন্দ্রবাবু মূলত সামাজিক দিক হইতেই রবীন্দ্রজীবনী লিখিতেছেন। এই কাজ

ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। খগেন্দ্রবাবু এই বিষয়ে সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি। তিনি প্রবীণ, কলিকাতার সমাজের বিশেষ করিয়া পীরালি সমাজের সকল ইতিহাসই তিনি জানেন। তা ছাড়া বিবাহ-সম্পর্কে ঠাকুর পরিবারের পাথুরেঘাটা শাখার সহিত যুক্ত থাকাতে তাঁহার জীবনীতে আমরা এমন অনেক পুরাতন খবর পাইতেছি, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। এই 'রবীন্দ্রকথা' সম্পূর্ণ হইলে ইহা রবীন্দ্রজীবনীর একদিকের অসম্পূর্ণতা দূর করিবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আলোচ্য গ্রন্থটি অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত—ইহার মধ্যে জন্ম ও আবেষ্টনী, রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল, শিক্ষা ও প্রতিভার বিকাশ, গার্হস্থ্যজীবন, জমীদার রবীন্দ্রনাথ ও আচার ও ধর্ম্মে রবীন্দ্রনাথ এই পাঁচটি অধ্যায় পড়িয়া আমরা অনেক নূতন তথ্য ও ইঙ্গিতের সন্ধান পাইয়াছি। এই পুস্তকখানির বহুলপ্রচার আমরা কামনা করি।

পাকিস্থানের বিচার—রেজাউল করীম। বুক কোং লিঃ, মূল্য ১৲।

পাকিস্থানী পাপ ভারতবর্ষ হইতে দূর করিবার জন্য যে কয়জন নিষ্ঠাবান মুসলমান প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছেন, রেজাউল করীম সাহেব তাঁহাদের অগ্রণী। এই পাপের সূত্রপাত হইতে তিনি উচ্চকণ্ঠে বহু বক্তৃতায় প্রবন্ধে ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছেন। তাঁহার এই বিরোধিতা নিছক কণ্ঠকুর্দ্দনই নয়, তাঁহার প্রত্যেকটি উক্তি দৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—আলোচ্য পুস্তকখানিতে তাঁহার সেই পাণ্ডিত্য ও বিচার-বুদ্ধির যথেষ্ট প্রমাণ মিলিবে। যাঁহারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারাও সকল সময়ে সকল অন্যায় ও পাপকে রোধ করিতে পারেন না, কিন্তু মানুষকে সাবধান করিতে পারেন। করীম সাহেব এই গ্রন্থে তাহাই করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"সাধারণ মুসলমানের নিকট পাকিস্থান নামের একটা মোহ আছে। তাহারা কোন কিছু বিবেচনা না করিয়া কেবল হুজুগে পড়িয়া ইহাকে গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ দেখাইতেছে। কিন্তু এই ভাবে হুজুগে মাতিয়া কোন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা চলে না। পাকিস্থান পরিকল্পনা কোন স্থির মস্তিষ্ক হইতে বাহির হয় নাই। যে ভেদনীতি আজ কয়েক যুগ হইতে নীরবে কাজ করিয়া যাইতেছে, ইহা তাহারই চরমতম পরিণতি।" এই পুস্তকখানি আমরা হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল বাঙালীকে মনোযোগ দিয়া পড়িতে অনুরোধ করি।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা—শ্রীহরিদাস চৌধুরী। আর্য্য পাবলিশিং হাউস, মূল্য ১৲।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সমগ্র বাঙালী জাতির একটা অহেতুক শ্রদ্ধা আছে, আসলে তাঁহার সাধনা সম্বন্ধে সাধারণ এবং অসাধারণ অধিকাংশ বাঙালীই বিশেষ কিছু জানে না। ইহার একটি বড় কারণ এই যে, অরবিন্দ এতকাল তাঁহার সাধনা সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, সেগুলি দুরূহ ইংরেজীতে রচিত। এই সাধনার শেষ কথা যে *Life Divine* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অদীক্ষিত জনের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। এতকাল অরবিন্দের পুস্তকগুলির যে অনুবাদও আমরা পাইয়া আসিতেছিলাম, সেগুলিও সরসতা-বর্জ্জিত

বলিয়া আমরা গ্রহণ করি নাই। শ্রীযুক্ত হরিদাস চৌধুরী মহাশয়ই এই প্রথম শ্রীঅরবিন্দের সাধনা সম্বন্ধে সহজবোধ্য সরস ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করিলেন। হরিদাস-বাবু নিজে পণ্ডিত ব্যক্তি এবং শ্রীঅরবিন্দের দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সেইজন্ত তাঁহার পুস্তকে কোথায়ও অস্পষ্টতার বা দুর্ব্বোধ্যতার গ্রন্থি নাই।

মডার্ণ কবিতা—কবিতা গ্রন্থ, শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। বাতায়ন পাবলিশিং হাউস। মূল্য ১৷৷০।

কবি স্বয়ং ভূমিকায় বলিয়াছেন, এই কাব্যের কবিতাগুলি বাংলা দেশের আধুনিক আধুনিকাদের বর্ত্তমান জীবনের "বস্তুগত ও ভাবগত ফটোগ্রাফ বা প্রতিচ্ছবি মাত্র।" ফোটোগ্রাফার ইচ্ছামত যে কোনও angle হইতে ফোটোগ্রাফ তুলিতে পারেন, সাবিত্রী-বাবুও একটি বিশেষ angle হইতে 'মডার্ণ'দের দেখিয়াছেন। তাঁহার ফোটোগ্রাফ নিখুঁত হইয়াছে, কিন্তু তিনি ছবি আঁকিতে পারেন নাই। তাঁহার কবিতা মডার্ণ কবিতা নয়, মডার্ণদের বিষয়ে একজন সাবধানী প্রবীণের কাব্য-বিবৃতি।

বিষয় যাহাই হউক, আমরা সাবিত্রীবাবুর ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং বাচনভঙ্গি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার কলমে যে জং ধরিয়া যায় নাই, যৌবনের চটুলতা ও সরসতা যে তিনি বজায় রাখিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার প্রতি আমাদের হিংসারই উদ্রেক হইয়াছে। কবিতাগুলি প্রবীন নবীন সকলেরই চিত্তবিনোদন করিবে।

অন্তঃশীলা—কাব্য, শ্রীরসময় দাস। পল্লীবাণী কার্য্যালয়, হবিগঞ্জ, সিলেট। মূল্য ১।০।

কবি রসময় দাসকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি—তাঁহার অন্তরের কাব্যলোক বাস্তব রূঢ়তার আঘাতে এখনও ভাঙিয়া যায় নাই। তিনি জাত-কবি এবং 'অন্তঃশীলা' একটি সত্যকার কাব্য। পড়া শেষ হইলেও 'অন্তঃশীলা'র রেশ মনের মধ্যে থাকিয়া যায়।

ভানুমতীর মাঠ—কাব্য, শ্রীঅশোকবিজয় রাহা। কবিতা ভবন, মূল্য ।০।

'এক পয়সায় একটি' সিরিজে এই সর্ব্বপ্রথম সত্যকার কবিতা প্রকাশিত হইল, ইতিপূর্ব্বে যাহা হইয়াছে, তাহা জামাই-ঠকানো হেঁয়ালি মাত্র। অশোকবাবু মফস্বলে থাকেন বলিয়া ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না—কোথায় নাক ঢুকাইতেছেন। তবে কাব্যের ভানুমতীর খেলায় তিনি সিদ্ধহস্ত, তাঁহাকে কেহ চুপড়ি-চাপা দিতে পারিবে না।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯

খ্রীষ্টীয় আদর্শ

মিত্ররাষ্ট্রসংঘ কোন্ মহাপ্রেরণায় এই যুদ্ধে লড়ছেন তার বিবরণ মাঝে মাঝে ব্রিটিশ নেতাদের মুখ থেকে বেরিয়েছে। তাঁরা অনেক-বার বলেছেন—আমাদের উদ্দেশ্য Christian ideal-এর প্রতিষ্ঠা। বহু অখ্রীষ্টান রাষ্ট্র ব্রিটেনের পক্ষে আছে, যেমন চীন ভারত মিসর আরব। রাশিয়ার কর্তারাও খ্রীষ্টধর্ম মানেন না। এই খ্রীষ্টীয় আদর্শের প্রতিবাদ সম্প্রতি বিলাতের মুসলমানদের তরফ থেকে হয়েছে। কিন্তু তার ঢের আগে ব্রিটিশ যুক্তিবাদী আর নাস্তিক সম্প্রদায় তাঁদের আপত্তি প্রবলভাবে জানিয়েছেন। খ্রীষ্টীয় আদর্শ বললে যদি খ্রীষ্টের উপদেশ বোঝায়, তবে তাতে এমন কি নূতন বিষয় আছে যা তাঁর আগে কেউ বলে নি? ইহুদী বৌদ্ধ হিন্দু বা মুসলমান ধর্মে কি নীতিবাক্য নেই? বিলাতে আমেরিকায় রাশিয়ায় যাঁরা খ্রীষ্টধর্ম মানেন না তাঁদের কি উচ্চ আদর্শ নেই? খ্রীষ্টীয় আদর্শ কথাটিতে ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া হয়েছে। এখন ব্রিটিশ নেতারা আমতা আমতা ক'রে বলছেন—আমাদের কোনও কুমতলব নেই, তোমাদেরও উচ্চ আদর্শ আছে বই কি, সেটা খ্রীষ্টীয় আদর্শের চেয়ে খাটো তা তো বলি নি, তবে কিনা খ্রীষ্টীয় আদর্শ বললে তার মধ্যে সকল সম্প্রদায়েরই উচ্চতম ধর্মনীতি এসে পড়ে। প্রতিবাদীরা এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু খ্রীষ্টীয় আদর্শের অন্য একটা মানে থাকতে পারে।

গৌতমবুদ্ধ বৌদ্ধ ছিলেন না, যিশুখ্রীষ্টও খ্রীষ্টান ছিলেন না। ধর্মের

যাঁরা প্রবর্তক তাঁদের তিরোধানের পরে ধীরে ধীরে বহুকাল ধ'রে ধর্ম-সম্প্রদায় গ'ড়ে ওঠে এবং পরিবর্তনও ক্রমান্বয়ে হ'তে থাকে। অবশেষে মঠধারী, প্রচারক, পুরোহিত এবং লোকাচার দ্বারাই ধর্ম শাসিত হয়, এবং যাঁরা আদিপ্রবর্তক তাঁরা সাক্ষিগোপাল মাত্র হ'য়ে পড়েন। বিলাতেও তাই হয়েছে। খ্রীষ্টীয় আদর্শ মানে খ্রীষ্টকথিত মার্গ নয়, আধুনিক প্রোটেস্টাণ্ট ধনী সমাজের আদর্শ। সে আদর্শ কি? গত দু শ বৎসরের মধ্যে বিলাতে যে সমৃদ্ধি হয়েছে তার কারণ প্রোটেস্টাণ্ট সমাজের উদ্যম। এই সমৃদ্ধির কারণ অবশ্য প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম নয়, যেমন এদেশের পারসী জাতি জরথুস্ত্রীয় ধর্মের জন্যই ধনী হন নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যাঁরা বিস্তার করেছেন এবং নিজের দেশে বড় বড় কারখানার পত্তন ক'রে দেশবিদেশে মাল চালান দিয়ে ধনশালী হয়েছেন, দৈবক্রমে তাঁরা প্রোটেস্টাণ্ট—বিশেষ ক'রে ইংলাণ্ডের আংলিকান এবং স্কটলাণ্ডের প্রেস্‌বিটেরিয়ান সমাজ। ধনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক শক্তি আসে, সেজন্য এই দুই সমাজই বিলাতে প্রবল। এঁরা চার্চের পোষক, চার্চও এঁদের আজ্ঞাবহ। গীতায় আছে—'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ, পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ'—যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে তৃপ্ত কর, ঐ দেবগণও তোমাদের তৃপ্ত করুন; পরস্পরকে তৃপ্ত ক'রে পরম শ্রেয় লাভ কর। বিলাতের দেবতা বিলাতবাসীকে ঐশ্বর্যদানে তৃপ্ত করেছেন, বিলাতের লোকেরাও তাঁদের যাজকসংঘকে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যে তৃপ্ত ক'রে থাকেন। কিন্তু শুধু তৃপ্ত করেন না, পরোক্ষভাবে হুকুমও চালান। পার্লিমেণ্ট যেমন ধনীর করতলস্থ, চার্চও সেইরকম। পাদ্রীরা যথাসম্ভব ধনীর ইঙ্গিতে চলেন, অবাধ্য রাজাকে সরাবার বিধান দেন, কমিউনিস্টদের শয়তানগ্রস্ত ব'লে প্রচার করেন, অসহিষ্ণু দরিদ্রকে স্বর্গরাজ্যের আশ্বাস দিয়ে শান্ত রাখবার

চেষ্টা করেন, অধীন দুর্বল জাতিদের চিরস্থায়ী হেপাজত সমর্থন করেন। আমাদের দেশেও ধনী আর পুরোহিতের মধ্যে একটু ঐরকম সম্বন্ধ আছে। কিন্তু ধর্মের ভেদ এখানে বেশী, রাজসাহায্যও নেই, তাই 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ' ব্যাপারটা দেশব্যাপী হয় নি।

যে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে এতটা শ্রীবৃদ্ধি জড়িত তার নামেই যে যুদ্ধোত্তর আদর্শ ঘোষিত হবে তা বিচিত্র নয়। কিন্তু নূতন ক'রে আদর্শখ্যাপনের কারণ এ নয় যে পূর্বের আদর্শ ধর্মবিরুদ্ধ ছিল। কথাটা বিদেশীকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয় নি, ব্রিটিশজাতিরই আত্মপ্রসাদ রক্ষার জন্য বলা হয়েছে, যাতে এই বিপৎকালে কারও মনে গ্লানি বা বৈরাগ্য না আসে। এই আদর্শের আন্তরিক অর্থ—যে উত্তম ব্যবস্থা সেদিন পর্যন্ত ইওরোপ এশিয়া আফ্রিকায় চ'লে এসেছে তাই কিঞ্চিৎ শোধনের পর পাকা করা। আদর্শটা ধূমাচ্ছন্ন, স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করা যায় না, সেজন্য একটা পবিত্র বিশেষণ আবশ্যক। আমাদেরও অনেক ক্ষুদ্র আদর্শ আছে, এক কথায়—আমরা রামরাজ্য চাই। বিলাসী ধনী তাতে বোঝেন—তাঁর ন্যস্ত সম্পত্তি নিরাপদে থাকবে, দারজিলিং সিমলা বিলাত সুগম হবে, হীরে জহরত সিল্ক সাটিন পেট্রল 'সার্'-উপাধি সুলভ হবে, গৃহিণী পুত্র কন্যারা দুখানা মোটরেই সন্তুষ্ট থাকবেন। অতিনিরীহ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বোঝেন—তাঁর রোজগার বজায় থাকবে, ট্যাক্স বাড়বে না, দোকানদার সস্তায় জিনিসপত্র দেবে, চাকর কম মাইনেয় কাজ করবে, ছেলেমেয়েরা আইনলঙ্ঘন বা বিয়ের আগে প্রেম করবে না। খ্রীষ্টীয় আদর্শ বা আমাদের অতি ক্ষুদ্র আদর্শ যতই প্রচ্ছন্ন হ'ক, তার মানে—যা আছে বা যা ভূতপূর্ব তাই কায়েম করা বা আরও সুবিধাজনক করা। কিন্তু আমাদের একটা বড় আদর্শও আছে—স্বাধীনতা, যা অভূতপূর্ব, যার খসড়াও তৈরী হয় নি, শুধু নামটিই সম্বল। সুতরাং কিছু উহ্য না

রেখেই আমরা সে আদর্শ ঘোষণা করতে পারি, ভাবী স্বরাজ্যকে রামরাজ্য বা ধর্ম্মরাজ্য বলবার দরকার নেই।

খ্রীষ্টীয় আদর্শ যাদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের মধ্যে রাশিয়া আছে। সেদিন পর্যন্ত রাশিয়া অর্ধশত্রু ছিল, এখন পরমমিত্র। কিন্তু রাজনীতিক মৈত্রী আর বারবনিতার প্রেম একজাতীয়। যখন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার সময় আসবে তখন সাম্যবাদী মিত্র কি বলবে? হয়তো বলবে—ব্রিটেন তার সাম্রাজ্য নিয়ে যা খুশি করুক, আমরা নিজের দেশ আগে সামলাই। হয়তো ব্রিটেন সেই ভরসাতেই নিজের আদর্শ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছে।

২৩।১০।৪২ রাজশেখর বসু

তত্ত্বকথা

অতি বিচিত্র মানুষের মন, বিচিত্র তার লীলা—
হাতে ধরে চাঁদ, কভু বা সলিলে সহজে ভাসায় শিলা।
বিশ্বের যত নশ্বর রাশি
জানে কালস্রোতে কোথা যাবে ভাসি—
প্রেম ভালবাসা তারো আছে শেষ মনে মনে ভাল জানে;
সঞ্চয় তবু করিছে যতনে
দুর্দিনে অসার বিফল রতনে,
জপিছে মৃত্যু তবু আপনারে অমর বলিয়া মানে।

নিশ্চিত জানে কিছুই রবে না এ জগতে চিরকাল,
নশ্বর লাগি বাধে না হতেও বার বার নাজেহাল।
সর্ব্বনাশের দুয়ারে বসিয়া
খুঁটে বাঁধে কড়ি বিষম কষিয়া
অস্থির ভিত, তাহারি উপরে গড়িতেছে ইমারৎ—
নাকের চেয়েও হইতেছে বড় টানা আর ফাঁদি নথ।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনার প্রতি আমিই সর্ব্বপ্রথম 'শনিবারের চিঠি'তে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম —তখন তাঁহার 'পথের পাঁচালী' 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছিল। এই প্রথম উপন্যাসখানির দ্বারাই তিনি যেন—leapt into fame—এক লম্ফে যশের শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন; আজও তাঁহার সেই যশ অক্ষুন্ন আছে। তাহার কারণ, তাঁহার দৃষ্টি যেমন, তাঁহার স্টাইলও তেমনই মৌলিক। এই মৌলিকতার কারণ দুইটি; প্রথমত, আমাদের রসপিপাসাকে তিনি একটা ভিন্ন মুখে ফিরাইয়াছেন, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীগণের (রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের) মত জীবনের অন্তঃস্রোত বা বহিঃস্রোতে অবগাহন করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিতে চাহেন নাই—তীরে বসিয়া তটশোভা নিরীক্ষণ করিয়াছেন,—জীবনের দুর্গম গহনে প্রবেশ না করিয়া, আপনার মানস-যন্ত্রে তাহার প্রসারিত পট-দৃশ্যের ছবি তুলিয়াছেন। জীবন তাঁহার নিকটে একটা স্থির শান্ত গতিহীন ও প্রায় সুসজ্জিত মনোহর চিত্রশালা। তাঁহার চোখ দুইটির পিছনে একটি যে ভাবরসগ্রাহী মন আছে, তাহার রসায়নাগারে বাহিরের যত কিছু—মানুষ, পশু, পক্ষী, মাঠ, বন, নদী ও আকাশ—কেবল একটি রসরূপে পরিণত হয়; প্রাণ যেন বলে,—এই তো! ইহার অধিক কি চাই? তুচ্ছতম বন্যলতায় ও তৃণ-পুষ্পে, কুটীরবাসী মানুষের অতি ক্ষুদ্র-জঠরের ক্ষুদ্র-ক্ষুধার খুদ-কুঁড়াতেও কি অমৃত রহিয়াছে! চাই

কেবল সেই স্বল্পে-তুষ্ট, তুচ্ছ-লুব্ধ, যাহা-পাই-তাহাতেই-ধন্য, রসভিখারী মন, তাহা হইলেই জীবনের ধূলা-মাটিও পরম পদার্থ হইয়া উঠিবে। বিভূতিভূষণের ব্যক্তি-মনোভাব এমনই বটে, কিন্তু কবিশিল্পীহিসাবে তাঁহার মৌলিকতার দ্বিতীয় লক্ষণ—তিনি এই কাঙাল-সুলভ পিপাসাকে সাহিত্যে একটি অভিনব স্টাইলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। এই স্টাইল জীবনের দ্বন্দ্ব-গভীর, রহস্য-ঘোর, বিরাট-বিপুল অথবা সূক্ষ্ম-জটিল শক্তি-মহিমার স্টাইল নয়; তথাপি তাহা good art বা নিছক রসসৃষ্টির স্টাইল বটে। এই রসেরই সিদ্ধ-সাধক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁহারও কাব্যসাধনার মূলমন্ত্র ছিল—সহজ ও সর্ব্বব্যাপ্ত যাহা ('joy in widest commonalty spread') তাহারই রসরূপ সৃষ্টি করা; এই রস-সম্ভোগের কথাই তিনি তাঁহার 'চিত্রা'-কাব্যের "সুখ"-নামক কবিতাটিতে বড় চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন, যথা—

মনে হইতেছে,
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু-আননের
হাসির মতন, পরিব্যাপ্ত বিকশিত,
উন্মুখ অধরে ধরি' চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে, বাক্যহীন
শৈশব-বিশ্বাসে, চিররাত্রি চিরদিন।

* * *

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে যাহাকে অতিশয় সরল ও সহজরূপে উপভোগ করিয়াছেন—জীবনের আলেখ্য-রচনায়—গল্পে উপন্যাসে—তাহাকে এমন বাউল-শিশুর বেশ ধারণ করান নাই। বিভূতিভূষণ কিন্তু সেই বাউলের একতারাটি মাত্র সম্বল করিয়া উপন্যাসেও সেই সুর বাজাইয়াছেন। তাঁহার কল্পনা লিরিক-কবির মতই আত্মকেন্দ্রিক; তাই তাহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ—তিনি কেবল তাঁহার নিজেরই ভাবানুভূতির লিপিকার। ঔপন্যাসিককে জীবনের রূপকার হইতে হইবে, এরূপ

একান্ত লিরিক-কল্পনা উপন্যাসের উপযোগী নয়। তিনি জীবনের আর্টিস্ট মাত্র—জীবনের কবি নহেন। তাঁহার যাহা কিছু সৃষ্টিনৈপুণ্য তাহা ওই স্টাইলেই সীমাবদ্ধ; ওই স্টাইলের বলে তিনি তাঁহার সেই প্রথম উপন্যাসের পরে বহু গল্প-উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জীবনের রহস্যপুরীর কোন নূতন দ্বার-উন্মোচন নাই; সেই একই সুরের আলাপ আছে। এইরূপ রচনা বিভূতিবাবুর পক্ষে এতই সহজ, এবং তাঁহার ওই স্টাইল এমনই হৃদয়গ্রাহী যে, তিনি অনায়াসে সাহিত্য-বিপণির পণ্যভার বৃদ্ধি করিতেছেন, সামান্য ডায়েরি-জাতীয় রচনাও উপন্যাসরূপে বাঙালী পাঠকের উপাদেয় হইয়া উঠে।

তথাপি, বিভূতিভূষণ একজন বিশিষ্ট সাহিত্যশিল্পী, তাঁহার মৌলিকতার দাবিও স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তিনি জীবন-কাব্যের কবি নহেন, ইহাও মনে রাখিতে হইবে। জগতের সকল শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, নাটক ও উপন্যাস মানুষের যে কাহিনী গাহিয়াছে, তাহাতে লিরিক সুরের অবকাশ যথেষ্ট থাকিলেও, তাহার রস—মানুষের জীবনাবেগের প্রাবল্য, তাহার সুখ-দুঃখের গভীরতম অনুভূতি, এবং দ্বন্দ্ব-সংশয়ের আবর্ত্তফেনিল তরঙ্গকে—এক কথায়, জীবনের সমগ্র রূপকে—আশ্রয় করিয়াছে। প্রত্যেক যুগের সাহিত্যে জীবনের যুগোচিত অনুভূতি ও তজ্জনিত ধ্যান-ধারণা যেমনই প্রতিফলিত হউক, যাহা কেবলই আর্ট নয়—কাব্যও বটে, অর্থাৎ, যাহা মানুষেরই গভীরতম পরিচয়-কাহিনী—তাহাতে আমরা কেবল সুর পাই না, কথাও পাই; সে কেবল সুন্দরের কথাই নয়, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্বঘটিত এক অপূর্ব্ব রহস্য-রসের কথা। অতএব বিভূতি-ভূষণের রচনাগুলি আকারে ভঙ্গিতে উপন্যাস হইলেও—আমি মাত্রাভেদ-সত্ত্বেও যাহাকে খাঁটি সৃষ্টিশক্তি বা কবিশক্তি বলিয়াছি—তাহার দিক দিয়া, তিনি বড় ঔপন্যাসিক নহেন, একজন শক্তিমান সাহিত্যশিল্পী

মাত্র। একরূপ মনোবৈজ্ঞানিক কৌতূহলের সহিত রসকল্পনা যুক্ত হইলে, মানুষকে ও প্রকৃতিকে একটি স্থির-চিত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া যে ধরনের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সম্ভব, তিনি সাহিত্যে সেই সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা। এই হিসাবে তাঁহার মৌলিকতাও যেমন সত্য, তেমনই, তাঁহার প্রতিভা যে রবীন্দ্র-যুগের রস-সাধনারই একটি স্বাভাবিক পরিণাম—তাহাও সত্য।

কিন্তু শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বা 'বনফুলে'র প্রতিভা খাঁটি ঔপন্যাসিকের প্রতিভা, আমি উপন্যাস বলিতে 'ছোট' কিংবা 'বড়' গল্পও বুঝিতেছি ; এই দুই লেখকের রচনাই বর্ত্তমানে বাংলা উপন্যাসের ধারাকে বেগবান করিয়াছে। দুইজনেই জীবনের রূপকার, দুইজনেই জীবনের কলশব্দ-মুখর তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল স্রোতকে কলাবিদ্ কবিশিল্পীর মত কাহিনীর আকারে ধরিবার নিরন্তর সাধনায় আপন আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গি বা রসপ্রেরণা সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেই হয়, উভয়ের কবি-প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা বৈষম্য আছে যে, আমার সন্দেহ হয়, একজন আর একজনের রচনা বোধ হয় পূর্ণ উপভোগ করিতেও অক্ষম। একই কালে এই দুই বিরুদ্ধধর্ম্মী লেখকের অভ্যুদয়ে সাহিত্যের রসপ্রমাতার বড় সুবিধা হইয়াছে। 'বনফুল' জীবনের যে-রূপটি তাঁহার অজস্র রচনার অজস্র রূপ-ভঙ্গিমায় ধরিয়া দিতে পারিয়া উত্তরোত্তর নিজের দৃষ্টি সম্বন্ধে আরও নিঃসংশয় হইতেছেন, সে-রূপ এক হিসাবে আদিম ও অবিকৃত—চির-পুরাতন ও নিত্য-নূতন ; তথাপি, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বাদের সুস্পষ্ট প্রেরণা আছে ; তাঁহার এই paganism নিছক সৌন্দর্য্য-লালসার অতিশয় সুস্থ দেহ-প্রবৃত্তিই নয়, তাহাতে আধুনিক যুগের বিশিষ্ট মনোভাব যুক্ত হইয়াছে। এই কারণে এক অর্থে, তাঁহাকেই আমাদের সাহিত্যের খাঁটি আধুনিক শিল্পী বলা যাইতে পারে।

'বনফুলে'র মনে কোন সংশয় বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মোহ নাই—তিনি অতিশয় সাহসী ও সংস্কারমুক্ত, জীবন-পান্থশালায় যথাপ্রাপ্ত রসের সমঝদার অতিথি। পান্থশালার অধিকারীকে তিনি কোন বহুমূল্য বাদশাহী পানীয়ের ফরমায়েস যেমন করেন না, তেমনই অতিশয় অল্প-মূল্যের ধূম্রজাত নেশাও তিনি বরদাস্ত করিতে পারেন না; যাহা স্বাস্থ্যকর ও জীবনীয় তাহাই তাঁহার পুরামাত্রায় চাই—এতটুকু ভেজাল থাকিলে তিনি একটি পয়সাও দিবেন না। এই মনোভাব তাঁহার রসকল্পনার মূলে বিদ্যমান; তিনি মানুষকে তাহার সুস্থ প্রাণশক্তির লীলায় সহজেই চিনিয়া লইতে পারেন, এবং সে বিষয়ে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সাক্ষ্য মান্য করিয়া থাকেন। মানুষ পশুও নয়, দেবতাও নয়, এমন কি মাঝামাঝি কিছুও নয়; সে কেবলমাত্র মানুষ; তাহাতে গৌরব বা অগৌরবের কথা নাই, আছে শক্তি ও স্বাস্থ্য-অনুভূতির আনন্দ মাত্র। সকল সাহিত্যিক প্রতিভাই সহজাত,—অনুকূল বা প্রতিকূল শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে সেই প্রতিভার বিকাশ হয়। 'বনফুলে'র শিক্ষা ও কর্ম্মজীবন তাঁহার সেই সহজাত শিল্পী-মনোভাবকে বিশেষরূপে পুষ্ট করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি যে-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহার এই মনোবৃত্তিকে পুষ্ট করিবার পক্ষে তেমন আর কিছুই নাই। তিনি জীবনের বৈজ্ঞানিক দেহতত্ত্বকে—বায়োলজি ও ফিজিওলজিকে—তাঁহার সাহিত্যিক জীবনবাদের অন্তর্গত করিয়া লইতে পারিয়াছেন; যাহা সর্ব্ব-সেণ্টিমেণ্ট-বর্জ্জিত তাহাই তাঁহার রস-পিপাসু মনকে একটি বিশিষ্ট ভাবমার্গে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 'বনফুলে'র রসসন্ধানী মনের সঙ্গে দুইটি সর্ব্বদর্শী চক্ষু এবং একখানি ক্ষুরধার ল্যান্সেট সর্ব্বদা কাজ করিতেছে। অন্ধকার তো নহেই—মন্দান্ধকারেও তিনি কাহারও পরিচয় করিবেন না, সেখানেও অতিতীব্র

বর্ত্তিকালোক তাঁহার প্রয়োজন। মানুষের জীবন তাঁহার নিকটে অতিশয় সুস্পষ্ট ও সুগোচর বস্তু, সে যে কত সুগোচর, অসংখ্য জীবন্ত চিত্রে তিনি তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। সে সকল চিত্রে তিনি মানুষের প্রত্যক্ষ দেহ-মনের যে পরিচয়—ভাষা ও ভঙ্গির আশ্চর্য্য অবলীলা এবং চকিত-প্রখর আলোকপাত সহকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাহাতে যেমন বিস্মিত হইতে হয়, তেমনই মানুষের সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা নূতন সংস্কার জাগে, বিশ্বাস হয় যে, মানুষের চরিত্র দোষে-গুণে যেমনই হউক—মনুষ্য-জীবন মোটের উপরে হেয় বা লজ্জা পাইবার মত কিছু নয়। যদি কোন কারণে ইহার স্বাস্থ্যহানি না হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির রাজ্যে সুমহৎ শক্তিকেন্দ্ররূপে সে-জীবনের একটি বিশেষ মর্য্যাদা আছে। সেই শক্তি ও স্বাস্থ্যই ইহার সব-কিছু সৌন্দর্য্য।

'বনফুল' এই আশ্বাস ও বিশ্বাসের কবি, তিনিও এক ধরণের প্রকৃতিবাদী—Naturalist। তাঁহার আর্ট মানুষেরই স্নায়ু-শিরা-শোণিত বিজ্ঞানের আর্ট। তিনি কেবল রূপের পূজারী নহেন, সেই রূপের চিরচঞ্চল প্রবাহে তিনি প্রাণশক্তির লীলা দেখিয়াছেন। এই শক্তি প্রাকৃতিক শক্তি, তাহার মূলে কোন আধ্যাত্মিকতা নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'বনফুলে'র কাব্য-প্রকৃতিতে একপ্রকার paganism আছে—সে এই শক্তিপূজারই paganism; শক্তিরই যে সৌন্দর্য্য, তিনি সেই সৌন্দর্য্যের উপাসক। প্রকৃতির এই মূর্ত্তি তিনি একবার পূর্ণরূপে অপরোক্ষ করিয়াছেন তাঁহার 'রাত্রি'-নামক উপন্যাস-কাব্যে—আমাদের দেশের শক্তিসাধকদিগের সেই উপাস্য দেবতাই যেন সেখানে শোণিত-মাংসে শরীরী হইয়া দেখা দিয়াছে। লেখক তাহার যে রূপ-কল্পনা করিয়াছেন, তাহা শ্রেষ্ঠ কবিশক্তির পরিচায়ক; সে-রূপ রাত্রির মত, তথাপি তাহা কালিদাসের 'স্ফুটচন্দ্রতারকা বিভাবরী' নয়। রাত্রি হইলেও

তাহার রূপ মধ্যাহ্ন-দিবার মত ভাস্বর, কালো মখমলের খাপের মধ্য হইতে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল ছুরিকার মত তাহা ঝলসিয়া উঠে। এই মৃত্যুরূপিণী নারী মহাশক্তিরূপিণীও বটে; 'অপবিত্র পবিত্রো বা'—কোন সংস্কার তাহার নাই; প্রেম, ধর্ম্ম বা নীতির কোন বন্ধন তাহার চিত্তকে অধিকার করিয়া কলুষিত করিতে পারে না। তাহার চতুষ্পার্শ্বে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যাহারা ঘুরিতেছে, তাহারাই মোহগ্রস্ত, তাহারাই কৃপার পাত্র। 'বনফুল' এই একখানি উপন্যাসে তাঁহার অন্তর-গহনের কাব্য-প্রেরণাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিয়াছেন।

জীবনের রূপ-কল্পনার এই এক দিক—আর এক দিক আছে; কোন্ দিক বড় তাহা আমি বলিব না, আর্ট-হিসাবে উভয়েই উভয়ের দিক দিয়া উপাদেয়। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের সেই আর এক রূপের রূপকার। 'বনফুলে'র জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ বাস্তবের জগৎ, তারাশঙ্করেরও তাহাই; তথাপি 'বনফুলে'র জগৎ দিবালোকের জগৎ, কিন্তু তারাশঙ্করের জগতে আলোকের পশ্চাতে নিশীথের রহস্যান্ধকার ব্যাপ্ত হইয়া আছে। 'বনফুল' জীবনের যেটুকু সুস্পষ্ট প্রকাশ তাহার অধিক দেখিতে রাজি নহেন; তারাশঙ্কর সেই প্রকাশের মধ্যেই যে অপ্রকাশের ইঙ্গিত আছে, তাহারই ধ্যানে জীবনকে আর এক মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। 'বনফুল' দ্বিধাসংশয়হীন, দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক; তারাশঙ্কর অজ্ঞেয়-রসিক, মিষ্টিক, তান্ত্রিক। 'বনফুল' অন্ধকারকে আলোর দ্বারা অপসারিত করিবার, মৃত্যুকে জীবনের হস্তে নিজ্জিত দেখিবার পক্ষপাতী, তারাশঙ্কর জীবনকে আর এক রূপে উপভোগ করেন—তিনি,

"Night, the shadow of light,
And life the shadow of death."

—এই দুইয়ের রহস্য মিলাইয়া দেখিতে চান; তাই তাঁহার কল্পনায়

প্রকৃতির নিয়মই মানুষের নিয়তি নয়। সেই নিয়তিই প্রকৃতির নিয়ম-শাসনকে অসীম অর্থ-গৌরব ও পরম রমণীয়তা দান করিয়াছে। তাই প্রকৃতির তাড়নায় মানুষের জীবনে যত বহ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হয়, তাহার সেই বহুবর্ণের আতস-শোভা তিনি যেমন অপলক নেত্রে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, তেমনই, তাহার পশ্চাতে যে অন্ধকারের পটভূমি রহিয়াছে, তাহাকে সেই শোভার একটা বড় কারণ বলিয়া বিশ্বাস করেন; সেই অন্ধকারে জীবনের যে অংশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাকেই তিনি বৃহত্তর বলিয়া জানেন, এবং তাহারই সঙ্কেতে তিনি যে রূপ-সৃষ্টি করেন, তাহাতে সকল জ্ঞান-বিচার স্তম্ভিত হইয়া যায় বলিয়াই একটি মধুর উৎকণ্ঠায় আমাদের রস-চেতনা অনুরণিত হইতে থাকে। তথাপি ইহা নিছক কাব্যরস নয়, আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকের সেই 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' ইহা নয়। ইহাও জীবনের বাস্তবরূপোদ্ভূত রস, এ রস উপভোগকালে জীবন-চেতনা লুপ্ত হয় না, বরং জীবনেরই একটা বিশিষ্ট রূপের বিশিষ্ট ভঙ্গি সর্ব্বক্ষণ সেই রস-চেতনায় বিদ্যমান থাকে, তাহার সেই রূপই অপরূপ হইয়া উঠে। তারাশঙ্কর বাংলাসাহিত্যে জীবনের এই যে রস-রূপ তুলিয়া ধরিয়াছেন, বাস্তব-জীবনেরই সর্ব্ববিধ বৈচিত্র্য ও বিরূপতা—সর্ব্বস্তরের জীবন, এমন কি, মনুষ্যপ্রকৃতির কুৎসিত ও বীভৎস প্রকাশকেও—তিনি যে রসরূপে পরিণত করেন, তাহার মূলে আছে সেই রসচেতনা। জীবনের এই যে রূপ-স্রোত ইহাও একটা মহারূপকের নাট্যাভিনয়। রঙ্গভূমিতে মানুষের চরিত্র ও নিয়তির এই রহস্যরসবোধ যাঁহার কল্পনার উদ্দীপন-কারণ—তিনি বিশ্লেষণ করেন না, আবিষ্কার করেন; ব্যাখ্যা করেন না, সৃষ্টি করেন; প্রমাণ করেন না, প্রদর্শন করেন। তারাশঙ্করের সকল উৎকৃষ্ট রচনায় এই ইঙ্গিতমূলক প্রদর্শন আছে, রূপের সেই রূপক-রস-সঙ্কেত আছে; কোন

যুক্তিতন্ত্র, কোন থিয়রি বা মতবাদ—কোন কিছুর ঘোষণা তাহাতে নাই। কল্পনার এই objectivity—বিশেষ করিয়া তাঁহার ছোট-গল্পগুলিতে, জীবনের যে রূপ-চিত্রাবলী উদ্ঘাটিত করিয়াছে, তাহার বৈচিত্র্য সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মত। তাঁহার দৃষ্টি সেই এক রসকেই বহুর মধ্যে বিচিত্ররূপে আবিষ্কার করিয়া, কুৎসিত-সুন্দর, ভীষণ-মধুর, নিষ্ঠুর-কোমল প্রভৃতি সকল বস্তুকেই সমান উপভোগ করে; প্রত্যেককে তাহারই ভাবে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া সেই অপক্ষপাত রসসম্ভোগ তাঁহার গল্পগুলিতে সম্ভব হইয়াছে। আমি তাঁহার আর্টের যে objectivity-র কথা বলিয়াছি, তাহার একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, তাঁহার গল্পের প্রাতবেশ ও ঘটনা-সংস্থানের সঙ্গে চরিত্রগুলি এমন অচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়া থাকে যে, সবগুলি একত্রে একমুখে গল্পটিকে রসের পরিণাম-মুহূর্ত্তে পৌঁছাইয়া দেয়। ইহার আর একটা লক্ষণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—তাঁহার রস-সৃষ্টিতে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ-ভঙ্গি নাই; গল্পের সকল উপাদানই নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মত কাজ করে; চরিত্রগুলিও কোথাও আপনাদিগের অন্তর-দ্বার আপনারা এতটুকু উন্মোচন করে না—সে বিষয়ে তাহাদের যেন কোন সজ্ঞানতাই নাই; তাহারা খাঁটি জীবনধর্ম্মী মানুষের মত ব্যবহার করে—কথায় ও কাজে তাহাদের গূঢ়তম প্রবৃত্তির ইঙ্গিত-মাত্র প্রকাশ পায়; অর্থাৎ, লেখক নিজকে সম্পূর্ণ আড়ালে রাখিয়াছেন—তাই ঘটনা বা চরিত্রের কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নাই। জীবন্ বলিতে যে একটি পরমাশ্চর্য্য ব্যাপারকে আমরা কেবল ধ্যানেই উপলব্ধি করি, তাহাই এ সকলের মধ্যে যেন চকিতে চমকিয়া উঠে—বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধুদর্শন হয়, ক্ষুদ্র নখের দর্পণে দেশ-কালের বিস্তৃতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহাকেই আমি রূপের রূপক-মহিমা বলিয়াছি—অতি ক্ষুদ্র মানব-মানবীর ক্ষুদ্র কাহিনীতে

সর্ব্বমানবের নিয়তি প্রতিবিম্বিত হয়; অতি ক্ষুদ্র জীবনের তুচ্ছ প্রেম-সঙ্কটে বিরাট ট্র্যাজেডির ছায়া পড়ে; যেন জীবনের সম্মুখভাগে, তাহাকে আড়াল করিয়া যে বিশাল যবনিকা ঝুলিতেছে—যাহাকে আমরা পরিদৃশ্যমান বাস্তব-দৃশ্যপট বলি—তাহার যে-কোন স্থানের ক্ষুদ্রতম ছিদ্রপথেও চক্ষু সংলগ্ন করিলে, সেই এক অসীম রহস্য-সাগরকেই উদ্বেলিত হইতে দেখিব। তারাশঙ্করের যে-কোন উৎকৃষ্ট গল্প ইহার নিদর্শন—এখানে বিশেষ করিয়া তাঁহার 'ঘাসের ফুল' নামক গল্পটি আমার মনে পড়িতেছে।

তারাশঙ্করের কবিশক্তির পরিচয়-প্রসঙ্গে আমি জীবন-রস-রসিকতার যে আর এক ভঙ্গি, ও তাহার আর্ট সম্বন্ধে, যাহা বলিয়াছি—তাঁহার রচনাগুলির অনেকাংশে তাহা প্রযোজ্য হইলেও, আমি এমন কথা বলি না যে, তাঁহার ছোটগল্পগুলিতেই সেই আর্টের চরম পরিণতি ঘটিয়াছে। এই দৃষ্টি তাঁহার আছে—তাঁহার ছোটগল্পগুলিতে তাহা প্রায়ই সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু ছোটগল্পের স্বল্প-পরিসরে তিনি যে রসদৃষ্টিসুলভ অসাধারণ ভাব-সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার উপন্যাসেও সাধারণত সেই শক্তির নিদর্শন থাকিলেও—সমগ্রভাবে সেই সংযম এখনও তাহাতে দেখা দেয় নাই। তাহার কারণ, উপন্যাস রচনাকালে তিনি জীবনের যে সুপ্রশস্ত পটভূমিকার শরণাপন্ন হন, তাহাতে তাঁহার কল্পনা ভিন্নমুখী হইয়া পড়ে—বন্যার জলবিস্তারে নদীর তটরেখা স্থানে স্থানে লুপ্ত হইয়া যায়; তিনি চিরন্তনকে গৌণ করিয়া যুগ-মহিমাকেই মুখ্য করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। যুগ-সমস্যা বা যুগ-প্রবৃত্তি জীবনের নিত্য-রূপের—অর্থাৎ রস-রূপের—অন্তরায় নয়; বরং তাহারই তট-বন্ধনে যাহা কালাতীত, তাহাই নব নব রসরূপ পরিগ্রহ করে।

কবিশিল্পীর পক্ষে, বিশেষত, জীবনের দক্ষতম রূপকার—ঔপন্যাসিকের পক্ষে, সেই উপাদানগুলির প্রয়োজন অল্প নহে; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার রসদৃষ্টি আরও মুক্ত ও স্বচ্ছ থাকা আবশ্যক—বন্যার ভাব-প্লাবনে শিল্পীও যেন স্বস্থানচ্যুত না হন, তাঁহার নির্লিপ্ত রসচেতনায় আত্ম-ভাবের (personal sentiment) ছায়ামাত্র না পড়ে। উপন্যাসের সুবৃহৎ আকারে জীবনের জটিল ও বহুবিচিত্র রূপকে সেই এক রূপক-রসে অভিষিক্ত করার যে আর্ট, তাহাই কবিশক্তির পরাকাষ্ঠা—তারাশঙ্কর সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বাংলাসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান বাংলা গল্প ও উপন্যাস লেখকগণের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি লিপিবদ্ধ করিলাম তাহাতে একজন লেখকের উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি; হয়তো এমন আরও দুই-একটি ভুল হইয়াছে,—একজন ইতিমধ্যেই আমাকে রবীন্দ্র মৈত্রের নাম স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, সেও একটা ভুল বটে; কিন্তু সে ভুলের জন্য আমি দুঃখিত নই, কারণ রবীন্দ্র মৈত্র সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত অলোচনা পৃথক প্রবন্ধে করিয়াছি। এখানে আমি শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্তের কথা বলিতেছি—ইঁহার কল্পনা-ভঙ্গি ও রচনার মৌলিকতা আমাকে প্রথম হইতেই আকৃষ্ট করিয়াছিল; অতএব এরূপ ভুলের জন্য আমার লজ্জিত হইবারই কথা। কিন্তু আরও লজ্জিত হইয়াছি—ইতিমধ্যেই কোন একখানি পত্রিকার এক উড়ো সংখ্যা সহসা আমার উপরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়। তাহাতে দেখিলাম,—একজন জগদীশ-ভক্ত লেখক পৃথিবীর সাহিত্যকে চ্যালেঞ্জ করিয়া যে কয়জন বাংলা লেখককে বাঁশের আগায় তুলিয়া, কার্ত্তিক মাস পড়িবার পূর্ব্বেই, আকাশ-প্রদীপ জ্বালাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র যে কত উচ্চ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আর একজন অতি-বিখ্যাত আধুনিক

লেখকের সমুচিত বিনয়পূর্ণ বাণীও উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে বাণী এই—"আমরা তরুণ ব'লে আমাদের অনেক দুর্নাম আছে, সাহসের খ্যাতিও কম নেই, কিন্তু তিনি (জগদীশচন্দ্র) যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন সে-দিন—তা' আমরা খুব তরুণ বয়সেও কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি", কারণ লেখকের মতে, "জগদীশচন্দ্রই বোধ হয় প্রথমে এদেশে যৌন-মনস্তত্ত্ব নিয়ে গল্প লিখ্‌তে সুরু করেন।" পড়িয়া লজ্জিত হইয়াছি; কারণ, তারুণ্য, যৌনমনস্তত্ত্ব ও দুঃসাহস, এই তিনের কোনটাকেই সাহিত্যসৃষ্টি বা সাহিত্যিক প্রতিভার একটা বিশেষ প্রমাণ বা লক্ষণ বলিয়া জানিতাম না; মনে পড়িল, বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, ছাতা মাথায় দিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম রাজপথে বাহির হইয়াছিল, তাহার দুঃসাহস নাকি কোন বীরের তুলনায় কম নহে! যৌনমনস্তত্ত্ব যে সাহিত্যের—বিশেষত কাব্যসৃষ্টির এত বড় উপাদান, এবং (বিশ্বসাহিত্যের খবর জানি না) আমাদের সাহিত্যে এতদিন ওই উপাদানটির অসদ্ভাব থাকায়, কাব্য-সাহিত্য খোঁড়া হইয়া ছিল—বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রও যাহা পারেন নাই, তাহা তরুণেরা ও তরুণদের গুরু জগদীশচন্দ্র পারিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের নিকট বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য কতখানি ঋণী, এতদিন সাহিত্যের সেবা ও সাহিত্যরস-চর্চ্চা করিয়াও সে বিষয়ে অবহিত হইতে পারি নাই! কিন্তু সবচেয়ে লজ্জার কথা এই যে, ওই উড়ো পত্রিকা-খানির জ্ঞানাঞ্জনশলাকা আমার মত গম্ভীরবেদীর পক্ষে নিষ্ফল হইয়াছে, এ লজ্জা কোথায় রাখি ভাবিয়া পাইতেছি না; বাংলা দেশের সাহিত্যিক সমাজ ইদানীং যেরূপ রসস্থ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে কেহই যে এ লজ্জার ভাগী হইতে চাহিবেন না, তাহা জানি।

জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আমি লেখকদিগের পর পর যে নামোল্লেখ করিতেছি, তাহা

বয়স বা গুণানুসারে নয়—তাঁহাদের সাহিত্যিক খ্যাতিলাভের কালক্রম-অনুসারে; এবং তাহাও আমার নিজের যেরূপ স্মরণ হয় সেইরূপ। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত হয়তো শৈলজানন্দ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু শৈলজানন্দ তাঁহার পূর্ব্বেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্র এখনও যথোচিত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই বলিয়া মনে হয়। আমি তাঁহার সেই গল্পগুলির কথা বলিতেছি—যাহাতে মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জ্ঞেয় দৈবনির্য্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে; মনে হয়, জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার এক প্রান্তে একটা অন্ধকারময় কোণ আছে, সেখানে একটা নামহীন আকারহীন হিংস্রতা নিরন্তর ওত পাতিয়া বসিয়া আছে—মানুষ যেন তাহারই এক অসহায় শিকার; তাহার নিষ্ঠুরতা তত ভয়ানক নয়—যত ভয়ানক তাহার সেই অতিপ্রাকৃত রূপ। যাহাকে আদিম মানবের কুসংস্কার, অথবা বিকার-গ্রস্ত রোগীর দুঃস্বপ্ন বলা যায়—সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের সুস্থ বুদ্ধি যে সকল ঘটনাকে কল্পনারও বিরোধী বলিয়া মনে করে, জগদীশচন্দ্র তেমন ঘটনাকেও, শুধুই সম্ভাব্যতা নয়, এমন বাস্তবতায় মণ্ডিত করিয়াছেন যে ইংরেজীতে যাহাকে bizarre বলে, সেই ভাব আমাদিগকে পূর্ণমাত্রায় অভিভূত করে। মনে হয়, আমরা এমন একটা বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছি যাহা মানুষের বুদ্ধি বা জাগ্রত-চৈতন্যের অগোচর; সৃষ্টির নেপথ্যে যে পাঞ্চভৌতিক শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—এ সকল যেন তাহারই কচিৎ-দৃষ্ট মূর্ত্তি; আদিম মানুষের অপ্রবুদ্ধ চেতনায় বোধ হয় ইহারই ছায়া পড়িত। হয়তো এখনও সেই সকল অনুভূতি আমাদের চেতনার নির্জ্জন স্তরে সঞ্চিত আছে—অতিপ্রাকৃতের একটা বিরাট বেষ্টনী যে এখনও আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, নানা ইঙ্গিতে ইশারায় সে কথা আমরা স্মরণ করিতে বাধ্য হই। জগদীশচন্দ্রের একটি গল্পে, মৃত্যুর পরে

পুনর্জন্মের ঘটনা এবং সেই সম্পর্কে একটি স্বপ্ন, এমন ভাবে বিবৃত হইয়াছে যে—যাহা একটা লৌকিক কুসংস্কার মাত্র, তাহাও গুরুতর রহস্যভারের মত আমাদের মনের উপরে চাপিয়া বসে। এই ঘটনাটি সত্য-ঘটনা বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ কোন একটা অর্থে কোথাও ঘটিয়া থাকিবে; কিন্তু লেখকের নিজস্ব কল্পনা ও রচনাভঙ্গি ইহাকে এমন একটি রূপ দিয়াছে যে, তাহা অপেক্ষা bizarre বা 'uncanny' বাংলা গল্পে আর কোথাও ফুটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই দৃষ্টি ঠিক রস-দৃষ্টি নয়, কারণ, ইহা normal বা সুস্থ নয়; তথাপি, ইহাও আর্টের পর্য্যায়-ভুক্ত। জগদীশচন্দ্র ইহাতেও যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে একজন শক্তিশালী লেখক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* * * *

কিন্তু আমি জ্ঞাতসারে এমন একজন লেখককে বাদ দিয়াছি, যাঁহার সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র সাহিত্যে বামপন্থী হইলেও, একমাত্র তিনিই সে সাহিত্যে মৌলিকতার দাবি করিতে পারেন। তাঁহার সাধন-পন্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও, আমি তাঁহার সাহিত্যিক বিবেক ও রচনা-শক্তিকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার বিষয় এই যে, আমি তাঁহার গল্প-উপন্যাস খুব অল্পই পড়িয়াছি—এবং যাহাও পড়িয়াছি, তাহা এত কাল পূর্ব্বে যে, তাহার সম্বন্ধে এমন সুস্পষ্ট ধারণা মনে নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি তাঁহার সঠিক পরিচয় দিতে পারি। অতএব এ ত্রুটি আমারই, ইহার জন্য তিনি দায়ী নহেন।

৬

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা উপস্থিত একরূপ শেষ হইল। এই আলোচনায় আমি যাঁহাদের

উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের তুলনায় আরও দুই-চারিজন উল্লেখযোগ্যতা দাবি করিতে পারেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আমি কেবল সেই সকল লেখকের নাম করিয়াছি, যাঁহাদের খ্যাতি ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং সে খ্যাতি দল বা সম্প্রদায়গত নয়; ইহার অধিক দায়িত্ব আমি লই নাই। যাঁহারা বয়সে বা রচনার ভঙ্গিতে আরও নবীন, অথবা যাঁহাদের রচনা পরিমাণে আরও অল্প, অর্থাৎ যাঁহারা মাত্র দুই-চারিটি ভাল গল্প লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের উল্লেখ আমার এ আলোচনার অভিপ্রায়-সম্মত নয়; আমি সমসাময়িক বাংলা গল্প-লেখকগণের—যাঁহারা একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাঁহাদিগেরও—একটি গেজেট তৈয়ারি করিতেছি না। বেশ ভাল গল্প লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, এমন অনেকের নাম আমার মনে আছে, তাঁহাদের লেখায় রীতিমত মুন্সিয়ানা আছে, কিন্তু আমি, ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং আমার ধারণা অনুসারে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকারী—মাত্র কয়েকজনের সম্বন্ধে কিছু বলিবরি ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সে হিসাবে তালিকা আরও সংক্ষিপ্ত হওয়াই উচিত ছিল। যাঁহারা পূর্ণতর তালিকা চান, তাঁহাদিগের জন্য সদ্যপ্রকাশিত একখানি পুস্তকের নাম করিতে পারি, পড়িয়া তাঁহারা খুশি হইবেন। পুস্তকখানি ইংরেজীতে লেখা—*The P. E. N. Books, Indian Literatures*—গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত *Bengali Literature* by Annada Sankar and Lila Ray। এ বইখানি পড়িলে কাহারও দুঃখ থাকিবে না; বইখানি অতিশয় ক্ষুদ্র হইলে কি হয়, অতি-আধুনিক বাংলাসাহিত্যের বিবরণীটি একেবারে নামে নামে ঠাসা! কাহারও নাম বাদ গিয়াছে প্রমাণ করিতে পারিলে, বোধ হয়, প্রকাশক বা গ্রন্থকার জরিমানা দিতে রাজি আছেন।

তথাপি, দুই-একজন লেখকের প্রতি হয়তো সুবিচার করিতে পারি নাই; তাহার কারণ তাঁহাদের রচনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অতি অল্পদিন মাত্র দেখা দিয়াছে, এজন্য আমার ধারণা এখনও সুনিশ্চিত হইতে পারে নাই—পূর্ব্বপরিচিতের সহিত এই নবপরিচিতের তুলনায় আমি শেষোক্তের প্রতি হয়তো দৃষ্টি-সাম্য রক্ষা করিতে পারি নাই; যাঁহাদিগকে আমি একটু বিশেষ শক্তিমান বলিয়া ধারণা করিয়াছি—শিল্পীহিসাবে আরও দুই-একজন তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা আমার এই আলোচনাটি মনোযোগ সহকারে পড়িবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, আমি শুধুই গল্পের আর্ট বা রসসৃষ্টির নৈপুণ্যকেই এ বিচারে মুখ্য করি নাই—দৃষ্টিভঙ্গি ও স্টাইলের মৌলিকতাই বিশেষভাবে গ্রাহ্য করিয়াছি। ঔপন্যাসিককে আমি জীবনের রূপকার বলিয়াছি, তাহার অর্থ, তাঁহাকে কেবল রূপবিশেষের রেখাশিল্পী বা কোন একটি প্যাটার্নের চিত্রকর হইলেই চলিবে না; জীবনের সর্ব্ব-বিরোধ ও বৈষম্যের মধ্যেই একটি রসরূপ আবিষ্কারের দৃষ্টিও তাঁহার থাকা চাই। এই দৃষ্টি সকলেরই সমান ব্যাপক বা গভীর না হইতে পারে; তথাপি তেমন লেখকের রচনায় জীবনের সব-কিছুই একই অর্থে অর্থবান হইয়া উঠে—সে অর্থও একটা রসবোধ-মূলক অর্থ, কেবল একরূপ significance-এর অনুভূতি মাত্র। এই মাপকাঠিতে বিচার করিলেই, সকল যুগের সকল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণকে—শক্তির মাত্রাভেদ সত্ত্বেও—এক পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়। যাঁহাদের রচনায় আমি এই শক্তির নিদর্শন পাইয়াছি তাঁহাদিগকেই—শুধু কথাশিল্পী নয়—জীবনের রূপকার হিসাবে একটু পৃথক আসন দিয়াছি।

সর্ব্বশেষে আর একটি কথা বলিব। আমি পূর্ব্বে প্রসঙ্গান্তরে বলিয়াছি, সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে কোনরূপ চূড়ান্ত সমালোচনা বা

মতপ্রকাশ সমীচীন নয়, কালের কিঞ্চিৎ ব্যবধান না থাকিলে রচনার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। আমার এই আলোচনায় আমি লেখকগণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বিশেষ অপেক্ষা সাধারণ মন্তব্যই অধিক, আমি সাহিত্যিককে উপলক্ষ্য করিয়া সাহিত্যের আলোচনাই করিয়াছি। তথাপি সাহিত্যিক সম্বন্ধেও যাহা বলিয়াছি, তাহার দায়িত্ব অস্বীকার করি না, এবং কাজটা যে দুঃসাহসিক তাহাও জানি, কারণ ক্রিটিককে কতকটা prophet বা ভবিষ্যৎবক্তার কাজ করিতে হয়। আমার এ দুঃসাহসের একটা কৈফিয়ৎ এই যে, আমি একজাতীয় কাব্যসৃষ্টির সার্থকতা-বিচারে যে দুই-একটি মূল সূত্র অনুসরণ করিয়াছি, তাহা এতই বাদবিতর্কমুক্ত ও রসিকহৃদয়গ্রাহী যে, ভবিষ্যৎ পাঠক বা সমালোচক তাহাতে আপত্তি করিবেন না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

টুকরি

নিশিদিন জলস্রোত সমান না বয়,
মনোবিহঙ্গের ভাষা স্তব্ধ হয়ে আসে ;
আমি যে মানুষ তার এই পরিচয়—
মিথ্যা পাখা ঝাপটাই ভাবের আকাশে।
কোথা কি ঘটেছে জানি, বহে না বাতাস—
বার বার ভুঁয়ে প'ড়ে হতেছি হতাশ।

*   *

মৃতজন ফিরিয়া এসেছে, মৃতজন কহিয়াছে কথা,
যত শুনি কেন জানি তত বেড়ে যায় প্রাণ-ব্যাকুলতা
এপার ওপার দুই পার মাঝে অতি ক্ষীণ ব্যবধান—
আসন্ন তিমির ভয়ে তবু ভীরু দীপশিখা কম্পমান।

*   *

এলো এলো—কর আয়োজন,
এলোমেলো মিছা পলায়ন।

আগুন

আগুন জ্বলিছে, আগুন জ্বলিছে—আগুন চিরন্তন
জ্বলিছে বাহিরে জ্বলিছে মর্ম্মতলে—
জ্বলে তুষানল, জ্বলে দাবানল, জ্বলিছে বাড়বানল,
চিতার অনল হোমের অনল জ্বলে।

অগ্নি-পরশে উপল উল্কা হয়,
অগ্নি-প্রপাতে শূন্য দীপ্তিময়,
অগ্নির ঝড়ে ধ্বংস অন্ধকার,
অগ্ন্যুদ্গার বজ্র-কণ্ঠে বাজে—
পিণাকের টঙ্কার।

সমরাঙ্গণে শোণিতে আগুন জ্বলে,
মহা-উৎসবে শবের মিছিল চলে,
ছিন্নমুণ্ড গাহে আগুনের গান,
প্রতি-কবন্ধে অগ্নি-মশাল জ্বলে—
অগ্নি অনির্ব্বাণ।

অগ্নি-খড়্গে ঠিকরে অগ্নি-কণা,
অগ্নি-সর্প তুলেছে অগ্নি-ফণা,
অগ্নি-বক্ষে কালী নাচে নির্ভীকা,
লেলিহ-রসনা রক্ত-দশনা দেবী—
ললাটে অগ্নি-টীকা।

মর্ম্মের বাণী জ্বলে বিদ্যুৎ-চিড়ে,
জ্বালামুখী জ্বলে পর্ব্বত শিরে শিরে
জিহ্বা-লেলিহ ক্ষুধিতা জ্বলন্তিকা,
রুদ্র-নয়নে শুদ্ধ নিরঞ্জন
জ্বলে ধক্‌ধক্ শিখা।
জ্বলে তুষানল, জ্বলে দাবানল, জ্বলিছে বাড়বানল,
জ্বলে চিরকাল বহ্নি অনন্তিকা।

"বনফুল"

"নট গিল্টি"

আমারে আপন ভেবে ভালবেসেছিলে তুমি যবে,
মনে কি ভাবিয়াছিলে নিষ্কলঙ্ক আমি হে নিষ্পাপ ;—
ভুল করি, হাসি কাঁদি ধরণীর এই মহোৎসবে,
কভু গা বাঁচায়ে চলি, কভু অঙ্গে প'ড়ে যায় ছাপ।
প্রকৃতির প্রসন্নতা চিত্তে কভু করে যে উদার,
গূঢ় সর্প ফণা ধরে কভু চিত্তগুহাতলবাসী ;
পান করি পূর্ণ করি পানপাত্র এই বসুধার।
কভু পান করি বিষ ব্যর্থ জীবনেরে উপহাসি।
উচ্চ নীচ ভাল মন্দ এই দ্বন্দ্বে গড়া জীব আমি,
একান্ত কিছুই নই, থাকি না কাহারো মুখ চেয়ে,
পাহাড়ে উঠিতে গিয়ে প্রান্তরে কখনো পড়ি নামি,
প্রখর আলোক মাঝে অন্ধকার আসে ছেয়ে ছেয়ে।
ভেবে থাকো অন্যরূপ, সে ভুল আমার বন্ধু নয়—
আমি যে আমিই থেকে দিয়েছি আপন পরিচয়।

মানসপ্রিয়া

টেনিস খেলে ফিরতে একটু রাত হয়েছে। সুনন্দা ভয় দেখায়, যাও না—তৈরি হয়ে আছেন ঐ দালানে। আমায় ব'লে দিয়েছেন, আসামাত্রই যেন দেখা করে।

অমিয় বলে, গীতায় বসেন নি এখনও? হুঁ, সময় তো হয়ে গেছে।

মন স্থির করবার জো আছে তোমার জ্বালায়! তাই তো দুঃখ ক'রে বলছিলেন, ধর্ম্মকর্ম্ম সব চুলোয় গেল।

তবে রাত হোক আর খানিকটা। তুমি ধূপ-ধুনো জেলে দাওগে। ব'লে অমিয় স'রে পড়ছিল। সুনন্দা ডাকল, জেঠাবাবু!

এসেছে বুঝি! সঙ্গে সঙ্গে অতুলকৃষ্ণের খড়মের আওয়াজ। বলতে লাগলেন, হোস্টেলে গিয়ে থাকতে হবে; সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শিখিধ্বজ সেন আমার পুরনো বন্ধু। খুব ক'রে ব'লে এসেছি। সে বললে, মাছিঁ পালাতে দিই না হোস্টেলের ফটক দিয়ে—তা একটা মানুষ! তোমার খেলা আর আড্ডা ভেঙে দিচ্ছি এবার।

সুনন্দা সায় দেয়, হ্যাঁ জেঠাবাবু, সেই সবচেয়ে ভাল। বাইরে সারাদিন আড্ডা দেবেন বাবু, আর বাড়ি এসেই সকলকে জ্বালাতন করতে শুরু করবেন। কবে পাঠাচ্ছেন? কালই তো?

কাল আর হবে না। ঠাকুরমশায় কথকতা করবেন, বাড়িতে লোক-জন আসবে। কালকের দিনটা থাক, পরশু সকালে একখানা গাড়ি ডেকে বই-বিছানা সমেত রওনা ক'রে দেব।

অমিয় ভিতরে যাচ্ছিল। অতুল ডাকলেন, শোন, দেখি ওটা। হাত থেকে তার র‍্যাকেটটা নিয়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিলেন।

এ সমস্ত এগ্‌জামিনের পর সেই জুলাই মাসে। বুঝলে?

অমিয় রাগ ক'রে চ'লে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে বুড়া বলতে লাগলেন, একটা মাত্র ছেলে, কিন্তু মাথার প্যাঁচে প্যাঁচে ওর চালাকি, কিছুতে বাগ মানাতে পারি না। শিখিধ্বজ লম্বা লম্বা কথা বললে, আমি কিন্তু ভরসা পাচ্ছি না। একজন খুব কড়া মানুষ পেতাম, গার্জেন হয়ে সে চোখে চোখে রাখত! আমার ত্রিসন্ধ্যা আছে, ঠাকুর-দেবতারা রয়েছেন, আমি এসব পেরে উঠি না।

সুনন্দা বলে, জব্দ আমার কাছে। আপনি দেখা করতে বলেছেন শুনেই স'রে পড়ছিল। অমনই ডেকে দিলাম। আমাকে তাই দুচক্ষে দেখতে পারে না।

প্রশান্ত চোখে তার দিকে চেয়ে অতুল বললেন, সেদিক দিয়েও ভেবে দেখেছি মা, কিন্তু এক-পা এগোই তো দু-পা পেছোই। সাহস হয় না।

সুনন্দার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। কিছু না ভেবেই কথাটা সে ব'লে ফেলেছে। অতুল বলতে লাগলেন, শশিশেখরের মেয়ে তুমি—শশীর সঙ্গে কেবল দেহটাই ছিল আলাদা। আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সে চোখ বুজল। মেয়ে ছিল না, কত পুণ্যিতে মেয়ে হয়ে আমার ঘরে উঠেছ। গোপন করব না মা—খুব লোভ হয় এক এক সময় যে, ঘরের মা-লক্ষ্মী ক'রে পাকাপাকি বেঁধে রাখি। কিন্তু ও যা ছেলে, কি রকম মতিগতি হবে কে জানে, ওর সঙ্গে তোমাকে বেঁধে শেষকালে কি শশীর কাছে অপরাধী হব? মানুষ হবার লক্ষণ যদি দেখতাম, মোটেই দেরি করতাম না।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা। একটু পরেই কথকতার বসবে আসর, সুনন্দা প্রসাধনে ব্যস্ত। অমিয় এসে দাঁড়াল।

সুনন্দা আয়নায় ছায়া দেখে হেসে বললে, আজ যে বড্ড ভাল ছেলে! একদম বেরোও নি!

হুকুমের সুরে অমিয় বলে, গান গাও একটা।

বলছ কি! বাড়িতে এই ব্যাপার! চুপ, চুপ।

অমিয় বলে, তুমি আর বাবা ষড়যন্ত্র ক'রে খেলতে যাওয়া বন্ধ করেছ। একটা কিছু কাজ তো চাই।

কথা শুনে কষ্ট হ'ল সুনন্দার। বুঝিয়ে বলে, আমার গান কি ছাই, ঠাকুরমশায়ের ভাল গান শুনো একটু পরে।

ধর্ম্মকর্ম্ম সহ্য হবার বয়স তো হয় নি এখনও; বাবার মত হই আগে। যা বললাম, শুনবে কি না বল?

এত লোকজন, তার মধ্যে? ছিঃ! কিন্তু জেঠাবাবু র‍্যাকেট ফেলে দিলেন, আমায় দোষ দিচ্ছ কেন? আমি কি বলেছিলাম তাঁকে?

র‍্যাকেট তো তক্ষুনি কুড়িয়ে এনেছি। এই দেখ। র‍্যাকেট-সুদ্ধ হাত পিছনে ছিল, সামনে এনে দেখালে। বলে, কিন্তু খেলব না আর—

তবে?

যারা কথা না শুনবে, তাদের শাস্তি দোব এ দিয়ে।

সুনন্দা মুখ ফিরিয়ে নিজের কাজে লাগল।

গাইবে না?

উঁহু।

একটু চুপ ক'রে থেকে অমিয় বলে, পরের মেয়েকে পিটুনি দেওয়া ভদ্রতাসম্মত হবে না। আচ্ছা, চললাম। বাবাকে গিয়ে বলিগে।

সত্যি সত্যিই বেরিয়ে যায়। সুনন্দা প্রশ্ন করে, কেন, কি বলবে তাঁকে?

বলব, সুনন্দার সঙ্গে বিয়ের দিন ঠিক করুন।

সাহস হবে ?

হয় না, কিন্তু বলতেই হবে। নইলে তোমার মতো ডেঁপো মেয়েকে জব্দ করবার আর তো উপায় দেখছি না। পতি পরম গুরু হয়ে কি কাণ্ডটা করি দেখো। পিঠের ওপর তখন র‍্যাকেটের এক মাত্রা সকাল-বেলা, এক মাত্রা সন্ধ্যেবেলা—

সুনন্দা নির্ভয়ে বলে, বলগে তুমি। মজাটা টের পাবে। জেঠাবাবু যা মানুষ, ঠিক কানমলা খেয়ে আসবে।

তোমার নাম ক'রে বলব যে, সুনন্দা অস্থির হয়ে পড়েছে।

ডাহা মিথ্যে কথাটা মুখে আটকে যাবে না ?

কিন্তু তোমার মনের কথা। আচ্ছা, আপাতত মাপ করতে পারি, যদি আমার কথা শোন।

নাছোড়বান্দা অমিয়র হাত এড়ানো ভার। মৃদুকণ্ঠে সুনন্দা গান ধরলে।

মাঝখানে অমিয় ব'লে ওঠে, আর শোন, ভাগবত আনন্দে একেবারে মেতে থেকো না কিন্তু। শুরু হ'লেই ফাঁকমত স'রে পড়বে। বড় জোর পনরো মিনিট। কি বল, কথা দিয়ে যাচ্ছ তো ? সকালেই হোস্টেলের বনবাসে যাচ্ছি, কিন্তু কথা রয়েছে।

সুনন্দা দেখে, অমিয় একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে, দৃষ্টি যেন ব্যাকুল স্নেহে তাকে আলিঙ্গন করছে। চোখোচোখি হতে অমিয় একটু বেকুব হয়ে যায়, র‍্যাকেটটা ধাঁ ক'রে উঁচু ক'রে তুলে গীটার বাজাবার মত ভাব করে।

ও কি, থেমে গেলে যে !

তুমি ঠাট্টা করছ—

উঁহু, ঠাট্টা কে বলেছে ? চমৎকার লাগছিল, আহা !

আমার লজ্জা করে না বুঝি !

এখানে তো কেউ নেই।

তুমি রয়েছ।

অমিয় আশ্চর্য্য হয়ে বলে, আমার কাছে লজ্জা ! তুমি স্ত্রী হবে, আমি হব স্বামী। বাবারও সেই ইচ্ছে।

সুনন্দা বলে, তবু পুরুষমানুষ—

তা বটে; স্বামী হই, যা-ই হই, পুরুষমানুষ, তাতে সন্দেহ নেই। আচ্ছা লজ্জাবতী, এইবার তো আড়াল হয়ে গেল।

র‍্যাকেট সে মুখের সামনে ধরলে। সুনন্দা রাজি নয়। বলে, চোখ বোজ।

তথাস্তু।

সুনন্দা তবু বলে, হ'ল না। মুখ ফেরাও।

এককলি শেষ না হতেই আবার গান থামিয়ে বলে, ওই যে দেখছ, ঘাড় ফিরিয়েছ। দুষ্ট, দুষ্টু কোথাকার !

ছুটে গিয়ে অমিয়র মুখ সে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়। হাতে ছিল ফেসক্রিম, সুনন্দার চালাকি নিশ্চয়, তারই দাগ লাগে অমিয়র মুখে। সুনন্দা ছুটে পালাল।

কোথায় যাবে গান শেষ না ক'রে ? অমিয়ও পিছু পিছু ছোটে।

পাশের ঘরে অতুলকৃষ্ণ। সুনন্দা এসেই তাঁর পাকাচুল ভরা মাথাটা নিয়ে বসেছে। যেন কত বড় ভালমানুষ ! বলে, জেঠাবাবু, দেখুন, দেখুন, এগ্‌জামিন এসে গেছে, বই ছোঁবার নামটি নেই।

অতুল হাঁক দিলেন, শুনে যা খোকা। আমার ছেলে হয়ে এ কি রকম স্বভাব তোর ? বই যে আজকাল বাঘের মত দেখছিস।

অমিয় বলে, পড়ছিলামই তো।

মুখের দিকে চেয়ে অতুল জিজ্ঞাসা করলেন, ও দাগ কিসের ওখানে?

দাগ? তাই তো! ওঃ, এতক্ষণ কলেজের নোট সমস্ত টুকে রাখছিলাম কিনা, কি রকম ক'রে কালি লেগে গেছে।

কালি আজকাল সাদা হয়ে গেছে? সাদা কালিতেই এগ্‌জামিন দেবে, বুঝতে পারছি।

কথকতার আসর জমজমাট। মণ্ডপের সামনে বারান্দা। সেখানে দাঁড়িয়ে অমিয় বার বার হাতঘড়ি দেখছে, শিষ দিচ্ছে, ইশারা করছে। কিন্তু সুনন্দার কোন দিকে নজর নেই, তদ্গত হয়ে সে শুনছে। মেয়ে জাতটাই অমনই। কত পনরো মিনিট হয়ে গেল, ভদ্রলোককে কথা দিয়ে গেছে—সে ভুলেই মেরে দিয়েছে।

পুরানো ঝি টেঁপির মা ট্রে নিয়ে আসরের দিকে যাচ্ছিল। অমিয় তাকে ডাকল।

টেঁপির মা চুপিচুপি বলে, সিগারেট চাই বুঝি দাদাবাবু? তা নাও, কেউ নেই এদিকে।

শোন টেঁপির মা, ওই যে তোর সুনন্দা-দিদি—ওখানে ব'সে ব'সে ঝিমুচ্ছে—

কথকতা শুনছে।

কথকতা, না হাতী। সে নিষ্ঠা আছে কি আর আজকাল? ঘুণ ধরেছে। কোন কিছু দেখছে না, কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছে না—ছেলেমানুষ কিনা।

পকেট থেকে কাগজ ও ফাউণ্টেন পেন নিয়ে অমিয় খসখস ক'রে কি লিখলে।

তুই খাসা মানুষ, টেঁপির মা। দাঁতে দেওয়ার ভাল মিশি বেরিয়েছে

এক রকম, তাই কিনে দেব এক কৌটো।—বলতে বলতে অমিয় ট্রে থেকে একটা পানের দোনা নিয়ে তার মধ্যে কাগজখানা পুরল। বলে, এই পানটা দিবি তোর সুনন্দা-দিদির হাতে।

টেঁপির মা আশ্চর্য্য হয়ে যায়। বলে, ঘরের মানুষকে চিঠি পাঠালে?

চিঠি কোথায়? এইটুকুতে কি চিঠি হয় রে? বইয়ের নাম—বইটা যে কোথায় নিয়ে রেখেছে! পনরো মিনিটের মধ্যে এসে দিয়ে যাবে বলেছিল। এগ্‌জামিনের সময় কিনা—এক একটা মিনিট এখন এক একটা দিনের শামিল।

দ্বিরুক্তি না ক'রে টেঁপির মা পানের দোনাটা মুঠোয় ক'রে নিলে। অমিয় সাবধান ক'রে দেয়, গোলমাল ক'রে ফেলিস নি যেন। খবরদার। অর্থাৎ এগ্‌জামিনের ব্যাপার কিনা—কাগজ এদিক ওদিক হয়ে গেলে বিষম মুশকিল।

কিন্তু গোলমালই হ'ল। দোষ সুনন্দার। টেঁপির মা সেই পানই দিয়েছে তাকে। একবার বলেছেও, বই দিয়ে এস দাদাবাবুকে। সুনন্দা মগ্ন হয়ে শুনছিল, কোন কিছু কানে নেয় নি। পানটা মুখে পুরে অন্যমনস্কভাবে ঠোঙাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

আবার বিপদ কেমন, ঠোঙা পড়ল গিয়ে সতীশের ঠিক সামনে। সতীশ অমিয়র সহপাঠী, এই পাড়ারই ছেলে, খুব চালাক-চতুর। সে দেখলে, ঠোঙার ভিতরে সুকৌশলে কাগজ পোরা। সন্দেহ হ'ল, অলক্ষ্যে সে ঠোঙাটা তুলে নিলে।

অমিয় ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছে। তবু দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে আশা ছাড়ে নি। পিছন দিক দিয়ে সতীশ মেয়েলী ঢঙে ডাকল, প্রাণেশ্বর!

সতীশ! এ আবার কি?

আমায় যে ডেকে পাঠিয়েছ, হৃদয়বল্লভ! পানের ঠোঙায় চিঠি পেলাম।

কি বলছ তুমি?

সতীশ বলে, আমাকে নয়? ঠোঙাটা পায়ের কাছে পড়ল কিনা, তাই আমি ভেবেছিলাম—

দেখি, দেখি।

সতীশ দেখালে বটে; কিন্তু খানিকটা দূরে গিয়ে, অমিয় যাতে ফস ক'রে টেনে নিতে না পারে। স্বর ক'রে সে পড়তে লাগল, 'মানসপ্রিয়া, তুমি পনরো মিনিটের মধ্যে আসবে বলেছিলে—' এ রকম কথা বলেছিলাম আমার তো স্মরণে আসছে না প্রাণকান্ত।

আরে যাঃ, কোত্থেকে কি বাজে কাগজ উড়ে পড়েছে। আমি লিখেছি কে বললে?

সতীশ বলে, তোমার হাতের লেখা চিনি না বুঝি মানিক? আমার কাছে গোপন রেখে মোক্ষলাভ হবে না। ডুবে ডুবে কোন্ ঘাটের জল খাচ্ছ, বল দিকি?

সে কথা ঠিক, একজন কাউকে পাওয়া দরকার, সমস্ত খুলে ব'লে যার কাছে পরামর্শ চাওয়া যায়। সতীশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুনল। সকলের শেষে দুঃখ ক'রে অমিয় বলে, বাবা ঠাকুর-দেবতা নিয়ে অজ্ঞান। আর সেজেগুজে গিয়ে বিয়ের কথা বলতে আমার শরমে বাধে। এদিকে পরের মেয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। বাবার কান ভারী ক'রে ক'রে আমাকে হোস্টেলে পাঠাচ্ছে। একটা কিছু বিহিত না ক'রে যাওয়াও কাপুরুষতা। কি করা যায়, বল তো ভাই?

কথকতা শেষ হয়েছে, লোকজন চ'লে গেছে। অতুল ঠাকুর-মশায়কে উপরের ঘরে নিয়ে নিভৃতে ভক্তিতত্ত্বের দুই-একটা ব্যাখ্যা করিয়ে নিচ্ছেন। এমনই সময়ে নীলকণ্ঠ এসে খবর দিলে, এক বাবু দেখা করতে চান।

কোন্ বাবু? আমি এখন ব্যস্ত, সে কথা বলিস নি?

তা বলেছিলাম। তিনি এই কি একটু লিখে দিলেন। নীলকণ্ঠ টুকরো কাগজ দিলে তাঁর হাতে।

অতুলের চশমা রয়েছে ও ঘরে; নীলকণ্ঠকে নিয়ে আসতে বললেন। ঠাকুরমশায়কে বললেন, পড়ুন তো কি লিখেছে।

ঠাকুরমশায় পড়তে লাগলেন, মানসপ্রিয়া—

মানসপ্রিয়া? রাত দুপুরে মানসপ্রিয়া লিখে পাঠাচ্ছে, ভাল ক'রে দেখুন।

দেখছি, স্পষ্টভাবেই লিখেছে, পড়তে অসুবিধা নেই—মানসপ্রিয়া, তুমি যে পনরো মিনিটের মধ্যে আসবে বলেছিলে—

বলেন কি? এই সময়ে নীলকণ্ঠ চশমা এনে দিলে। অতুলকৃষ্ণ বললেন, দেখি দেখি। হাতের লেখা চিনতে পারছি। নীলকণ্ঠ, বোলাও, আবি বোলাও হারামজাদাকে।

সতীশ এল। অতুল ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, তুমি পাঠিয়েছ এই চিঠি?

সতীশ বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ি যাচ্ছি, ভাবলাম, কদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, আপনাকে একটা প্রণাম ক'রে যাব।

এই যে ছাইভস্ম—মানসপ্রিয়া, তোমার লেখা?

মানসপ্রিয়া! কই? কি সর্ব্বনাশ! আমি কাগজখানা কুড়িয়ে পেলাম, তারই পিঠে নামটা লিখে পাঠিয়ে দিলাম। এই দেখুন, পিঠে আমার নাম। নামের ছাপা-কার্ড আমার নেই তো।

অতুল আর কিছু না ব'লে ভাবতে লাগলেন। সতীশ প্রণাম করতে বললেন, রাত হয়েছে, এস বাবা। কাল সকালের দিকে একটিবার এস, দরকার আছে। তারপর প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, কাকে এ চিঠি লেখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পার বাবা?

সতীশ বলে, আজ্ঞে না। তবে মেয়েরা যেখানে বসেছিলেন, সেই দিকে প'ড়ে ছিল। যে লিখেছে, সে কি আর সাক্ষী-সাবুদ রেখে কাজ করেছে, সেই রকম মনে করেন?

সে চ'লে যেতে অতুল অনেকটা নিজের মনে বলতে লাগলেন, ঘোষেদের সেই ফুটফুটে মেয়েটাই হবে। আবার মাথা নেড়ে বলেন, সরকারদের কালো প্যাঁচাটাও হতে পারে। নাচতে জানে কিনা, কেবল পায়ে নাচে না, সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডুটা করাতের মত সামনে-পেছনে চালায়। ঠাকুরমশায়, পাঁজি দেখুন, মানসপ্রিয়ার মূলোচ্ছেদ করতে হবে।

তাড়াতাড়ি পাঁজি বের ক'রে দিলেন। ঠাকুরমশায় অবাক হয়ে আছেন। অতুল বললেন, বুঝলেন না? বিয়ের দিন চাই। কালই।

পাঁজিতে যদি না থাকে?

না থাকলেও ক'রে দিতে হবে মশাই। কিঞ্চিৎ কাঞ্চন-মূল্য ধ'রে দোব। যত দেরি হবে, মানসপ্রিয়া শেকড় গাড়তে থাকবে। বুঝছেন না?

ঠাকুরমশায় বললেন, তবে আর খোঁজাখুঁজির দরকার নেই। কাল গোধূলি-লগ্নেই—

হ্যাঁ, তাই। এই সময়ে বারান্দা দিয়ে অমিয় যাচ্ছিল। ডেকে বললেন, শুনে রাখ। কাল গোধূলি-লগ্নে। বিয়ের পুরুত আপনি কিন্তু ঠাকুরমশাই। যার-তার ওপর আমায় শ্রদ্ধা হয় না।

অমিয় বলে, বিয়ে? কার বিয়ে বাবা?

তোমার, তোমার। আবার কার? ইডিয়ট!

সর্ব্বনাশ! কার সঙ্গে?

সুনন্দার সঙ্গে। সর্ব্বনাশ তোর কিসের, সে তো তারই। মুক্তোর মালা বাঁদরের গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছি—তোর ভাগ্যি, তোর বাপেরও ভাগ্যি।

না বাবা, আমায় সে দুচক্ষে দেখতে পারে না। আমার নামে আপনার কাছে মিছিমিছি লাগায়। তাই বিশ্বাস ক'রে আপনি যখন তখন আমায় গাল দেন।

অতুল বিপন্ন হয়ে বললেন, আর গাল দেব না।

তা ছাড়া এগ্‌জামিন সামনে। পড়াশুনোর বড্ড চাপ। সকাল-বেলাই তো চ'লে যাচ্ছি হোস্টেলে।

যেতে হবে না হোস্টেলে।

কিন্তু—

অতুল অনুনয়ের সুরে বললেন, আর কিন্তুর কাজ নেই বাবা। একটা নতুন ভাল র‍্যাকেট কিনে দেব, যা ফেলে দিয়েছি, তার ডবল দামের।

এই সময়ে সুনন্দা এসে বলে, অনেক রাত হয়ে গেছে, শুতে যাবেন না জেঠাবাবু?

অতুল তখনও আগের কথার জের ধ'রে বলছেন, গোলমাল ক'রে ফেলিস নি কিন্তু। কাল সন্ধ্যেবেলা আড্ডা দিতে যাস-টাস নি। কেমন?

দেখবেন বাবা, র‍্যাকেটটা যেন খুব মজবুত হয়; ঘা-গুঁতো সইতে পারে। সেইটে আগে দরকার।

ব'লে সুনন্দার দিকে চেয়ে অমিয় মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

শ্রীমনোজ বসু

পিশাচ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নলিন

চিকিৎসক রোগীকে দেখিয়া যক্ষ্মারোগের সম্ভাবনা আছে জানাইয়া দিলে রোগী যেমন তিলে তিলে রোগের আগমন আতঙ্ক লইয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে থাকে, সেইরূপ নলিনও আঁতুড়-ঘরের ঘটনার জন্য আশঙ্কায় সময় কাটাইত। যে বিপদকে দৈবকৃপায় এতদিন এড়াইয়া আসিয়াছিল, তাহা এখন বীভৎস প্রমাণ লইয়া তাহাকে এবং তাহার সংসারকে আক্রমণ করিয়াছে। এ আক্রমণের কবল হইতে নিস্তার নাই, প্রকৃতি তাহার ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য খড়্গ ধরিয়াছে, বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তি তো তাহার নাই। যৌবনকে জানিবার অবকাশ পর্য্যন্ত সে যে পায় নাই, কারণ যৌবন আসিবার বহু পূর্ব্বে তাহার স্বাস্থ্যে ঘুণ ধরিয়াছিল। এতকাল স্থবিরতাকে চাপা দিয়া আসিতেছিল, এখন রাসমণির সন্তানকে নিজের নয় বলিবার উপায় নাই। পুরুষ শক্তিহীন, এ কথা সে স্বীকার করে কেমন করিয়া! নলিন মানিয়া লইল, পুত্র তাহারও।

আঁতুড়-ঘর হইতে বাহির হইবার দিন নলিন পাড়ার লোক সাক্ষী রাখিয়া একটি পুরা মোহর দিয়া রাসমণির ক্রোড়স্থিত শিশুর মুখ দেখিল। নলিনের প্রথম সন্তান, সোনা দিয়া মুখ না দেখিলে লোকে বলিবে কি! রাসমণির জন্য চওড়া লালপেড়ে পট্টবস্ত্রও কিনিয়া আনিয়াছিল। সকলেই খুশি হইল। রাসমণি স্বামীর দেওয়া কাপড়-খানিও পরিল এবং শিশুকেও নিবিড়ভাবে বক্ষে টানিয়া ধরিল। শিশুর নধর ও সুদর্শন মূর্ত্তি নলিনের নিকট একতাল নোংরা পচা মাংসের মত মনে হইতেছিল। উহার পূতিগন্ধ অসহ্য, তথাপি সকলের সামনে শিশুর গণ্ডে চুম্বন করিল। নৃশংস পরীক্ষায় নলিন তখনকার মত উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু নবাগত জীবটি তাহার পক্ষে দৃষ্টিশূল হইয়া উঠিতেছিল। এই শূলের পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কি কোন

উপায় নাই? নলিন ভাবিল, নাই কেন, অনুসন্ধান করিলেই একটা কিছু পথ বাহির হইয়া পড়িবে।



শিশুকে দৃষ্টির আড়ালে সরাইয়া ফেলিবার জন্য ব্যবসায়ীর কূট মস্তিষ্কে যেসব চক্রান্ত ঘুরিতেছিল, তাহা প্রকাশ্যে বলিবার নয়। যেখান হইতে

বিষের চলাচল শুরু হইয়াছে, সেই ক্ষতস্থানটি নলিন আবিষ্কার করিয়াছে।

মহেন্দ্র যে দিন হইতে নলিনের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সেই দিন হইতেই নলিন বুঝিয়াছে, তাহার গৃহে আগুন লাগিতে দেরি নাই। মহেন্দ্রের গতায়াতে বাধা দিবার ক্ষমতা নলিনের ছিল না, কারণ যে আকর্ষণ মহেন্দ্রকে টানিতেছিল, তাহা আগুন জ্বালাইবারই উপকরণ। নলিন অন্তর্জ্বালায় ছটফট করিতেছিল। প্রাণ খুলিয়া দুঃখকে উজাড় করিয়া ফেলিবে, সে উপায়ও নাই। নলিনের চিন্তাধারা একটি নির্দ্দিষ্ট পথ লইতেছিল। চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে মহেন্দ্রের এখানে আসা বন্ধ হইতে পারে। পাড়ার লোক এখনও কানাঘুষা করিতে আরম্ভ করে নাই, কিন্তু করিতে কতক্ষণ! গ্রামের জমিদারকে আনিতে পারিলে, যে যাহাই ভাবুক, প্রকাশ্যে কিছু বলিতে সাহস পাইবে না। প্রকাশ্যে এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিলে তাহাকে একঘরে করিয়া দিতে পারে এবং তৎসহিত ব্যবসাও যে ঢিলা পড়িয়া যাইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি আছে? টাকাই মানুষের বল। অর্থাভাব হইলে কেলেঙ্কারির বোঝা সে বহন করিবে কেমন করিয়া? পরের ঘটনায় নলিন গভীর চিন্তার পর তাহার সিদ্ধান্ত কি ভাবে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল জানা যাইবে।

গ্রামের জমিদার ছোটকর্ত্তা। নলিন একদিন বারবেলা কাটাইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। পিছনে ছিল একটি বাহক—দুইটি কাতলামাছ হাতে ঝুলাইয়া।

ছোটকর্ত্তা বৈঠকখানাতেই বসিয়া ছিলেন। ঘরটি অপ্রশস্ত নয়। সস্তায় কেনা নকল কাটগ্লাসের পাঁচ-ছয়টি দেওয়ালগিরি। মাঝখানে মখমলের টানা-পাখা, অসংখ্য তালি পড়িয়াছে; প্রথম দর্শনেই অনুমান করা চলে, পাখাটি ব্যবহার হয় না, একটু নড়িলেই মখমল খসিয়া পড়িবে। দুই-চারিটি স্প্রিঙের গদিযুক্ত প্রাচীন চেয়ার, ছেঁড়া কার্পেটের উপর হিসাব করিয়া চার কোণে চারটি বসানো হইয়াছে। চেয়ারে বসিবার উপায় নাই, কারণ স্প্রিংগুলা ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে; নরদেহের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইলেই যেন কামড়াইয়া দিবে।

কার্পেট-চেয়ারের ব্যবস্থা যে দিকটায় ছিল, ঠিক তার বিপরীত দিকে নীচু তক্তাপোশের উপর ফরাশ পাতা, ফরাশের চাদর এক মাসের আগে রজক-গৃহে যায় না, সেই কারণে তাহার দৃশ্য অস্বস্তিকর হইয়া আছে। কয়েকটি তাকিয়াও আছে, সেগুলি তুলনায় চাদরের চেহারাকেও খাটো করিয়া দিয়াছে। তক্তাপোশের নিকটে অনেকগুলি পিকদানি, প্রায় সবগুলি পরিপূর্ণ, গতকাল তাসের মজলিসে ব্যবহৃত হইয়াছিল, এখনও পরিষ্কার করা হয় নাই। নবাগত আগন্তুককে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ফরাশের দিকে অগ্রসর হইতে হয়, নিষ্ঠিবন-আধারগুলি ঠিকরাইয়া পড়িবার ভয়ে। ঘরের একটি কোণে চার-পাঁচটি বিভিন্ন চিহ্নযুক্ত হুঁকা, একটি সাধারণ ফরসি, কলকে ও টিকার সরঞ্জাম, এনামেলের একটি রং-চটা প্লেটও আছে, ইহাতে কাঁচা তামাক রাখা হয়। সংক্ষেপে ঘরের আসবাব-পত্র দেখিলেই গৃহকর্ত্তার রুচি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে।

ছোটকর্ত্তা আসলে বড়কর্ত্তার ছোট ভাই। বড়কর্ত্তা বুড়োবাবুর প্রথম পক্ষের পুত্র, বাল্যকালেই কি এক সাংঘাতিক অসুখে মাত্র এক রাত্রি ভুগিয়া মারা যান। বড়কর্ত্তার বিধবা মাতাও বৎসর খানেকের ভিতর পুত্রশোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার পথানুসরণ করেন। উভয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলে। বলুক, উপস্থিত আমাদের লোকমতের সহিত কোন যোগ নাই। বড়কর্ত্তার মৃত্যুর পর, বুড়োবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর একমাত্র সন্তান ছোটকর্ত্তাই, বংশের একমাত্র ওয়ারিস সাব্যস্ত হওয়ায়, সমস্ত সম্পত্তির মালিক তিনিই হইয়াছিলেন। ছোটকর্ত্তা দেখিতে মন্দ নয়, নধর গোলগাল চেহারা, জোরে হাঁটিলে গণ্ডদ্বয় শিশুর মতই দুলিতে থাকে। তাসের বৈঠকের লোকেরা বলে, বাবুর জমিদারের মত চেহারাই বটে। একে নধর চেহারা, তাহার উপর কাঁচা বয়স ও গ্রাম্যোপযোগী আর্থিক সচ্ছলতা থাকায় অনেক বিষয়ে তিনি আকর্ষণের কারণ হইয়াছিলেন। আকর্ষণের শক্তি যখন ছিল, তখন ধরিয়া লইতে হইবে, শক্তির ব্যবহারও হইত। কি ভাবে হইত, সকলে জানিবার সুবিধা পায় নাই।

নলিন মাছ দুইটি দরজার নিকট রাখিয়া জুতা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ

করিল এবং করজোড়ে বলিল, হুজুর, সামান্য নজর এনেছি। ছোটকর্ত্তার ভোজনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সুনাম ছিল, কাতলা দুইটি তাঁহার লাগিল ভাল। ভজা পুরাতন ভৃত্য। তাহাকে ডাকিয়া মাছ দুইটিকে ভিতরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাহার পর নলিনকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিন তোমাকে দেখি নি, বাড়ির সব খবর ভাল তো?

আজ্ঞে হুজুর, আপনার কৃপায় দিন চ'লে যাচ্ছে। হুজুরের কাছে এসেছিলাম এই বরফি চুড়িগুলো দেখাবার তরে, তা এর দামটা কি আপনার নামেই লিখে রাখব?

ছোটকর্ত্তা আকাশ হইতে পড়িলেন, সে কি! আমি রূপোর চুড়ি নিয়ে কি করব?

আজ্ঞে হুজুর, আমিও তো তাই ভাবছিলাম, তবে ওপাড়ার গয়লানী-ছুঁড়ীটা—

ওপাড়ার গয়লানীর নাম করিতেই ছোটকর্ত্তা বুঝিলেন, ব্যাপারটা গোপন নাই। এখন স্বীকার না করিলে খবরটি চারধারে ছড়াইয়া পড়িবে। গ্রামময় রাষ্ট্র হইলে জিয়ানো জীবগুলির অভিভাবকরাও সাবধান হইয়া যাইতে পারে। তা ছাড়া এসব বিষয়ে এক-আধজন জানিলে তত বেশি অসুবিধার কারণ নাই। খবর ছড়াইয়া পড়িলে সব দিক দিয়াই ক্ষতি; জামতলার জমিদার-কন্যার সহিত বিবাহের কথা চলিতেছে, বিশ হাজার টাকার বন্দোবস্ত একেবারে ফাঁসিয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব বেশি। ছোটকর্ত্তা আপ্যায়িত করিয়া নলিনকে মাটিতে বসিতে বলিলেন।

নলিন নিজের বুদ্ধিকে তারিফ করিল, কিন্তু বসিল না, জোড়হস্তে বলিল, হুজুর, আপনার সামনে—ও কি কথা বলছেন? তা হ'লে কি হুকুম হয় হুজুর?

ছোটকর্ত্তা চুড়িটা হাতে লইয়া বলিলেন, তুমি চমৎকার কারিকর তো।

হুজুর, বাপ-দাদার জাতধর্ম্ম আর আপনাদের নেকনজর নিয়ে যেটুকু ক্ষমতা আছে, তাই দিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি।

হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে, গয়লানীটা সেদিন পায়ে এসে পড়ল, ওর কি রকম বোনের বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, কয়েকটা গয়না না হ'লে মেয়েটার বিয়ে হয় না। কি আর করি, বললাম, নলিন স্যাকরাকে আমার নাম ক'রে বলিস, যা দাম হয় দিয়ে দোব। গরিব লোক, কি আর করি বল?

তা তো ঠিক কথাই হুজুর। আপনি কত বড় বংশের ছেলে, গরিবের মা-বাপ, আপনি না দিলে আর কে দেবে? স্তুতিবাক্যগুলি যেন নলিন আসিবার পথে মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিল। ছোটকর্ত্তার দানশীলতার কথা গ্রামের সকলেই জানে। আট আনার খাজনা তিনি কখনও মাপ করেন নাই। হাটের তোলায় শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি বাড়িতে পৌঁছাইয়া না দিলে জরিমানা দিয়া ব্যাপারীকে পুনরায় হাটে বসিতে হয়। ক্রিয়াকর্ম্মে বাবুর ব্যাগারী ভৃত্যগুলিকে নিমন্ত্রণ করিয়া চব্যচোষ্য না দিলে ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, এ-হেন ছোটকর্ত্তা দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নীর বিবাহের জন্য গোয়ালিনীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন কেন, নলিন বহুপূর্ব্বেই জানিত।

নলিন হাতজোড় করিয়া বলিল, হুজুর, আমার একটি সাধ আছে, ভরসা দেন তো পেশ করি।

আরে, অমন করছ কেন? তোমরা তিন পুরুষের প্রজা, তোমাদের কথা রাখতে পারলে, 'না' বলতে পারি?

হুজুর, এক-আধবার আমার গরিবখানায় যদি পদধূলি দেন তো কিতার্থ্য হয়ে যাব।

এই কথা! এর জন্যে এত ভয় পাচ্ছিলে! নিশ্চয় যাব, তা কবে যেতে হবে?

হুজুর, আমার ছেলের অন্নপ্রাশন শিগগির, আমি আবার এসে খবর দিয়ে যাব। তা হুজুর, আমার ওখানে কিছু খেয়ে আসবেন। আমার ছোটবউ রাঁধে ভাল, আপনাকে খাওয়াতে পারলে বউটাও ধন্য হয়ে যাবে।

বহুবার বধূর কথা বলিতে ছোটকর্ত্তা নিজের অজ্ঞাতেই একবার গোঁফটায় চাড়া দিয়া লইলেন, হয়তো তাহার গোপন অর্থ কিছু ছিল।

তা তোমার বউয়ের হাতের রান্না খাব, সে তো ভাল কথা। তা তোমার বউয়ের বয়েস কত? আমাকেও তো কিছু দিতে-থুতে হয়। বয়েস-হিসেবে একটা শাড়ি কিনে নিয়ে যেতে চাই, তুমি কি বল?

আজ্ঞে হুজুর, আপনাদের খেয়েই মানুষ, তা যা মর্জ্জি হয় করবেন। বয়েস আর কি বলব হুজুর, তৃতীয় পক্ষের কিনা, বুঝতেই পারছেন, আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমরা কি আর অত বয়েসের হিসেব রাখতে পারি? তবে—

ছোটকর্ত্তা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি বউয়ের হাতের রান্না খাইতে যাইবেন।

নলিন কাজ গুছাইয়া ফিরিয়া আসিল। রাসমণিকে বলিল, আমাদের ভাগ্যি ভাল, ছোটকর্ত্তা খোকার ভাতে আমাদের বাড়ি আসছেন। আমি বলেছি, তুমি রাঁধবে। ছোটগিন্নী, রান্নাটার যেন তারিফ পাই। রাসমণি স্বামীর সহিত কখনও রসিকতা করিবার সুযোগ পায় নাই, মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিল, স্বামীর আদেশ পালিত হইবে। রান্না করিবে রাসমণি, প্রশংসা প্রাপ্য রাসমণির। নলিন নিজেকে পাচকের স্বত্বাধিকারী ভাবিয়া গৌরবান্বিত হইতে চায়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে রাসমণি নলিনের সহিত সম্বন্ধটা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কঠোর করিয়া ফেলিয়াছিল। এতকাল যে অহমিকা লইয়া স্বামীর সামনে বুক ফুলাইয়া চলিত, এখন তাহা চুরমার হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন কতক লজ্জা আসিয়াছিল, লজ্জা এখন নির্দ্দয় প্রতিহিংসায় পরিণত হইয়াছে। নলিনই সব দুর্ঘটনার উপলক্ষ্য, রাসমণি নলিনকেই সব রকম অঘটনের কারণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাই লজ্জা বলিয়া কোন বস্তু এখন তাহার অন্তরে নাই। সামান্য কারণেই খিটিমিটি আরম্ভ করিয়াছে, নলিনও বাড়ি ছাড়িয়া দূরে থাকিতে পারিলে বাঁচে।

নলিন জানাইতে চাহিয়াছিল, সে কেউকেটা মানুষ নয়, গ্রামের জমিদারকে পর্য্যন্ত সে বাড়িতে আনিতে পারে। নিজের দুর্ব্বলতার পীড়নে সব সময় নলিন জর্জ্জরিত হইয়া থাকিত। জমিদারকে বাড়ি আনার মত আরও অনেক ঘটনা রাসমণির সামনে খাড়া করিয়াছে, শুধু নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য—এই ভাবিয়া, হউক সে দুর্ব্বল, তথাপি গ্রামের

মধ্যে সে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, রাসমণি যেন তাহাকে তুচ্ছ করিয়া না দেখে। যোগাড় করা অনেক ঘটনাই রাসমণি দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে। প্রতিবাদ, রসিকতা অথবা কোন চাঞ্চল্য তাহার মুখে প্রকাশ পায় নাই। রাসমণি নির্লিপ্ত থাকিয়া নলিনকে আঘাত করিয়াছে। পুনরায় নলিন নূতন ঘটনা খুঁজিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে।

জমিদার আসিতেছেন জানিয়াও রাসমণি কিছুমাত্র ঔৎসুক্য দেখাইল না। নলিন একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল, মহেন্দ্র সায়েবকেও ডাকছি। মহেন্দ্রকে শুধু 'মহেন্দ্র' বলিয়া সম্বোধন করায় গ্রামের একজন প্রাচীন ব্যক্তিকে আদালতে মানহানির জন্য জরিমানা দিতে হইয়াছিল, তাহার পর হইতে লোকে শিক্ষানুযায়ী কেহ প্রিন্স মহেন্দ্র অথবা মহেন্দ্র সাহেব বলিত। মহেন্দ্রের নাম শুনিয়াও রাসমণি কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, শুধু বলিল, কি কি আর কজনের জন্যে রাঁধতে হবে সময়মত জানিও, ব্যবস্থা করব। রাসমণি অন্য কাজে চলিয়া গেল।

নলিন ভাবিতে বসিয়া গেল—তা হউক, তবু মহেন্দ্রের চেয়ে ভাল, না হয় ছোটকর্ত্তার সন্তানকেই সে মানুষ করিবে। তিন পুরুষ ধরিয়া ওদের নুন খাইয়া ও জমিতে বাস করিয়া আসিতেছে। উক্ত চিন্তাতেও যথেষ্ট অন্তর্জ্বালা ছিল, কিন্তু মহেন্দ্র-ঘটিত চিন্তায় বৃশ্চিকের হুল ফুটানোর মত নয়। মনকে সান্ত্বনা দিবার অবকাশ পাইয়াছিল এই ভাবিয়া—পূর্ব্বপুরুষদের সে ঋণ শোধ করিতেছে।

নলিনের বাড়িতে অন্নপ্রাশনের ধুম লাগিয়াছে। পাড়ার অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ছোট মেয়ের দল নানা রঙের কাপড় পরিয়া ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমনই সময় ছোটকর্ত্তা পালকি করিয়া নলিনের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে যেখানে ছিল, ভিড় করিয়া ছুটিয়া আসিল জমিদারবাবুকে দেখিবার জন্য। চেহারা অন্যান্য সকলের মত রৌদ্রে পোড়া নয়, দেহবর্ণে জলুসের স্বাতন্ত্র্য আছে। বেশের মধ্যে শৌখিনতা উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সদালাপের প্রকাশ-ভঙ্গি অত্যন্ত সংযত। প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন মৃদু হাসিয়া। হাসিটিও কড়া শাসনের নিক্তির ওজনে প্রকাশ হইতেছে—এতটুকু বেশি নয়, এতটুকু কম নয়। সহজ জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত গ্রামবাসীরা

ছোটকর্ত্তার আচরণে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। খাস ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পাশে বসিয়া যে মানুষ কথা বলে, তাহার আচরণ আলাদা তো হইবেই।

ছোটকর্ত্তার অভ্যর্থনার জন্য সব কিছুর ভিতরই বৈশিষ্ট্য ছিল। নলিন ছোটকর্ত্তার অনুমতি লইয়া ভিতর-বাড়িতে চলিয়া গেল খাওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য। ছোটকর্ত্তা গোঁফে একটি চাড়া দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ছোটবউ নিশ্চয় সামনে বাহির হইয়া পরিবেশন করিবে। বয়সটার কথা মনে পড়িতেই আর একবার গোঁফে চাড়া দিয়া বঙ্কিম দৃষ্টিতে ডগাটা দেখিয়া লইলেন। নলিন সেই যে ভিতরে ঢুকিয়াছে আর ফিরিবার নামটি নাই। ছোটকর্ত্তার ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার হইতেছিল। পুরুষের ভিড়ও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, পাশেই আসা-সোঁটা লইয়া দণ্ডায়মান হুকুমবরদারকে ডাকিলেন। হুকুমবরদার আসলে বাগদীপাড়ার সেই নেলাক্ষ্যাপা ছোঁড়াটা। আজ কয়দিন ধরিয়া ছোটকর্ত্তা নিজে তাহাকে রঙ্গমঞ্চে রিহার্সাল দিবার অনুকরণে আদব-কায়দা শিখাইয়াছিলেন। কুনিশ করা শিখাইতে গিয়া কতবার ছোঁড়াটাকে সেলাম করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এত কাণ্ডের পর বেটা কিনা বগল চুলকাইয়া দুইটি হাত মাথার উপর রাখিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল—যেন একটি সং! সং সাজাইবার দায়িত্ব ছোটকর্ত্তা নিজেই লইয়াছিলেন। যে আচকানটি বেচারা পরিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা ঝাড়া ছয় ফীট দীর্ঘ, কোন সাজোয়ান পুরুষের ব্যবহারের জন্য ছোটকর্ত্তার পিতা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বুড়োবাবুর আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রয়োজনবোধে অনেক ঠিকা হুকুমবরদার ওই পোশাকটি পরিয়া আসিতেছে, প্রশ্ন কখনও উঠে নাই—মাত্র পাঁচ ফীট দুই ইঞ্চি খাড়াই একটি ছোকরা অতি লম্বা মানুষের পোশাক পরিলে আর কত সুন্দর দেখাইতে পারে! একে তো ওই পোশাক, তাহার উপর দুইটি হাতই জোড়া, এক হাতে আসা আর এক হাতে সোঁটা, ইহার উপর স্থানচ্যুত জরির সুতাগুলি নাকে কানে সুড়সুড়ি দিবার সুবিধা খুঁজিয়া লইয়াছে, বেচারা বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাবুর নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই নাসারন্ধ্রের ভিতর একটি করকরে সুতা নির্ব্বিঘ্নে ঢুকিয়া

পড়িয়াছিল; সে হাঁচি আটকাইতে পারিল না। যেমন হাঁচা, অমনই ধাতুনির্মিত সোঁটাটি একজনের উলঙ্গ টাকের উপর আসিয়া পড়িল; শব্দটা হইল ধাতু ও কাঠে ঠোকাঠুকির মত। আঘাতপ্রাপ্ত মানুষটি মাথায় হাত দিয়া সেখান হইতে নীরবে উঠিয়া গেল। জমিদারের হুকুমবরদার, তাহার বিরুদ্ধে এর বেশি আর কি করা চলিতে পারে! ঘটনাটির পর ছোকরা আসা-সোঁটা দুইটিই মাটিতে রাখিয়া কোনওপ্রকারে আচকান সামলাইতে সামলাইতে বাবুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পরিবার সময় বহু-পুরাতন আচকানটা দেখিয়া পরে নাই। ভিতরে একটি আরসোলা আস্তিনের গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া পরমানন্দে কর্দ্দমাক্ত ঘাম ভক্ষণে নিজেকে নিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। আরসোলার কামড় খাইয়া হুকুমবরদার কুর্নিশ ভুলিয়া যদি বগল চুলকাইয়া থাকে, তাহাতে আর দোষের কি থাকিতে পারে! ছোটকর্ত্তা তাহার ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া হুকুম করিলেন, দেখে আয়, আর কত দেরি। কাহাকে অথবা কি দেখিতে হইবে তাহার উল্লেখ ছিল না, বেচারা ফাঁপরে পড়িয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, তা বাবু, কি দেখতি বলতিছেন? ছোটকর্ত্তা তাহাকে অতি নিকটে ডাকিয়া প্রায় কানের কাছে গিয়া বলিলেন, হারামজাদা, তোর মাথা আর মুণ্ডু, আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যা।

যে আজ্ঞে—বলিয়া ছোকরা পোশাক পরিয়াই বাগদীপাড়ার দিকে রওনা হইল। আসা-সোঁটা নলিনের বাড়িতেই পড়িয়া রহিল।

নলিন ভিতরে বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ছোটকর্ত্তাকে গাত্রোত্থান করিবার কথা বলিতেই ছোটকর্ত্তা বলিয়া বসিলেন, আমার সঙ্গে অনেক লোক খাবে নাকি? আমি তো সকলের সামনে খেতে পারি না। একটু নিরিবিলি হ'লেই ভাল হয়।

নলিন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, সে কি হুজুর, আপনাকে আমি সকলের সঙ্গে এক পংক্তিতে খেতে বলতে পারি? আপনি হলেন আমাদের রাজা লোক।

ছোটকর্ত্তা হৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। গোঁফটায় চাড়া দিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, নিজেকে সংযত করিয়া কেবল আড়চোখে ডগা দুইটা

দেখিয়া লইলেন। নলিন পথ দেখাইয়া ছোটকর্ত্তাকে ভিতর-বাড়িতে লইয়া গেল।

রাসমণি জমিদার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছে, কিন্তু দেখিবার সুবিধা সে কখনও পায় নাই। যেসব বর্ণনা শুনিয়াছিল, তাহাতে গুণাধারকে দেখিবার জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার কোন কারণ ঘটে নাই। রাসমণি বৃহৎ ঘোমটা টানিয়া ছোটকর্ত্তার পদধূলি লইল। কাপড়ে সমস্ত দেহ আবৃত থাকিলেও চরণস্পর্শকালীন দক্ষিণ বাহুর পূর্ণ গঠন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। ছোটকর্ত্তা রসগ্রাহী ব্যক্তি। বাহুর গঠন-মাধুর্য্য দেখিয়া মুখটি দেখিবার জন্য আনচান করিতে লাগিলেন। নলিনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমার বিয়েতে তো আসতে পারি নি। অনেকদিন বিয়ে করলে কি হবে, আমার কাছে এখন তো তোমার ছোটবউ নতুন বউ, কি বল বাছা? তা আমাকে তোমার বউয়ের মুখ দেখাবে না? অদ্ভুত রসিকতা করিয়াছেন ভাবিয়া নিজের উক্তিতে হাসিয়া লুটাপুটি খাইলেন। জমিদার হাসিতেছে, নলিন বেচারা তাঁহার সহিত যোগ না দিয়া করে কি—নিজে তো যোগ দিলই, রাসমণিকেও হাসিতে ইশারা করিয়া দিল। রাসমণি হাসিল না, ঘোমটাও খুলিল না।

রাসমণির আচরণ নলিনের তেমন ভাল লাগিতেছিল না। অনুষ্ঠানের ব্যর্থতার সম্ভাবনা অনুমান করিয়া নলিন নিজেই রাসমণির ঘোমটা খুলিয়া দিল, তাহার পর বলিল, হুজুর, আপনার মত রাজালোকের সামনে ও তো কখনও দাঁড়ায় নি, তাই লজ্জা পাচ্ছিল।

রাসমণির চক্ষু দুইটি তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তথাপি ডাগর পাপড়ির গাঢ় রেখায় নয়ন-যুগলের পূর্ণ রূপ ছোটকর্ত্তা কল্পনায় দেখিতে পাইলেন। রং কালো, কিন্তু মুখশ্রী রাজার ঘরে শোভা পায়। ছোটকর্ত্তা প্রথম দর্শনেই মজিলেন।

নলিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার বউয়ের ভাগ্যি ভাল। কই, তোমার ছেলেকে আনতে বললে না?

নলিন ইশারা করিল, রাসমণি পুত্রকে আনিতে অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

রাসমণি পুত্রকে লইয়া ফিরিয়া আসিতেই, ছোটকর্ত্তা নলিনকে অনুরোধ করিলেন পালকী হইতে নূতন গরদের শাড়িটি লইয়া আসিতে। নলিন শাড়ি আনিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাসমণি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মাথা নত করিয়া ছোটকর্ত্তার সামনে দাঁড়াইয়া রহিল। ছোটকর্ত্তা নিকটে আসিয়া শিশুকে নানাভাবে আদর করিতে লাগিলেন। সবল দামাল শিশু মাতার ক্রোড়ে হাসিয়া খেলিয়া রাসমণিকে প্রায় নাকাল করিয়া ছাড়িতেছিল। ছোটকর্ত্তা বলিলেন, অমন জোয়ান ছেলেকে সামলানো তোমার কর্ম্ম নয়, আমাকে দাও।—বলিয়া হাত বাড়াইয়া দুষ্টকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। মাতার ক্রোড় হইতে ছোট-কর্ত্তার নিকট শিশুর আসিবার সময় যে ঘটনাটি ঘটিল, তাহাতে ছোটকর্ত্তা মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন।

নলিন শাড়ি লইয়া ফিরিয়া আসিতেই ছোটকর্ত্তা শিশুপুত্রকে নলিনের নিকট দিয়া তাহার নিকট হইতে শাড়িটি লইয়া রাসমণিকে দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। সময়টা বাড়াইয়া লইবার জন্য ছোটকর্ত্তা শাড়ি কি ভাবে কিনিয়াছিলেন, কোথায় কিনিয়াছিলেন, কত দাম দিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। চোখের সামনে নলিন এই দৃশ্যটি দেখিতে চায় নাই।

ঘটনাটি ঘুরাইবার জন্য নলিন বলিল, কাপড়টা এখন আমাকে দিন, আপনার খাবার জুড়িয়ে গেল।

আহার-সমাপ্তির পর ছোটকর্ত্তা বাহিরে আসিয়া নলিনকে একলা পাইলেন। অন্য নিমন্ত্রিতদের তখন পংক্তিতে ডাক পড়িয়াছে।

তোমার বউ কি চমৎকার রাঁধে! তা দেখ, তোমার ছেলের

মুখ দেখার জন্যেও সোনার কিছু দিতে হয়, ভুলো মন, সঙ্গে আনতে পারি নি। তা গয়লানীর বরফি চুড়ির দামের সঙ্গে তোমার ছেলের জন্যে একটা সোনার বালার দামও জুড়ে দিও, এর জন্যে তোমার বানি তেমন বেশি কিছু তো পড়বে না, হাজার হোক তোমার নিজের ছেলে, কি বল?

নলিন করজোড়ে বলিল, যে আজ্ঞে হুজুর।

উত্তর শুনিয়া ছোটকর্ত্তা বলিলেন, তুমি বড় ভাল লোক হে নলিন, তোমার মত খাঁটি লোক আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। তা দেখ, আমি দুপুরবেলা প্রায় পাখি শিকারে বের হই, তা তোমার এখানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করবার সুবিধে হতে পারে? জানই তো আমি শিকারে কাউকে সঙ্গে নিই না। কেবল কটা পালকির বেয়ারা থাকে, তা ওরা গাছতলায় ব'সে থাকবে, কি বল, অ্যাঁ?

নলিনের চেষ্টা বৃথা যায় নাই, এক কথাতেই নলিন রাজি হইয়া গেল। বলিল, হুজুর, আমি তো দুপুরবেলা এখানে থাকব না, তা রাসমণিকে ব'লে যাব, সে আপনার আরামের জন্যে সব করবে।

আহা, মেয়েমানুষকে কষ্ট দিয়ে আর কি হবে?

সে কি হুজুর! আপনার সেবা আমার বউ করলেও আমার পুণ্যি হবে, আপনি হলেন আমাদের মা-বাপ, রাজালোক। সে কি কথা হুজুর, আমি রাসমণিকে এ বিষয়ে সব ব'লে রাখবে।

রাত্রি-ভোজন শেষ করিয়া ছোটকর্ত্তা বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

প্রেম

রূপালী ব'সে আছে আলোর নীচে।

গোল গামলার মত আলোর 'বাল্‌ব' থেকে যে স্তিমিত দ্যুতি নির্গত হচ্ছে, তাতে ঘরে অন্ধকার ঘোচে সামান্য পরিমাণে, তাই লেখাপড়ার কাজের জন্যে টেবিলে রাখা আলো তার জ্বালাতে হ'ল পরিবর্ত্তে।

পুরু নীলাভ কাগজের খসখসে লুজ-লীভ খাতার ওপরে হাত দিয়ে সে চুপ ক'রে ব'সে আছে। মহাভারতের মত প্রকাণ্ড সেই খাতা— তার জীবনের ইতিহাস, বুদ্ধির দীপ্তিতে স্পষ্ট ক'রে তোলা।

রূপালীর চেহারা বর্ণনার দরকার। বয়স তার চল্লিশ, কিন্তু আমি তাকে পাঠকের সামনে দেখাতে চাই তরুণীরূপে। তাই তার পনরো বছর আগেকার সৌন্দর্য্যই আমি দেখব। রূপালীর বয়স হয়েছে বলতে আমার বাজছে। পঁচিশ বছরের রূপালীকেই আমি চিনতাম শেষ পর্য্যন্ত। তাই আজও তার ছবিই মনে জাগছে আমার।

আর সে কথা, তার জীবনের যে পরিণতির কথা বলতে চাই, সে তো শেষ হয়ে গেছে। আজ তার পরিণতি পূর্ণ। সুতরাং ভবিষ্যৎ-বর্ণনার কোন প্রয়োজন নেই। অতীতে চল।

কালো, নিকষ-কালো রেশমের মত চুল, অত্যন্ত মসৃণ বেণীতে বন্দী হয়ে হাঁটুর নীচে পড়েছে। সুদীর্ঘ সে অলকগুচ্ছ, সিল্কের মত নরম, কিন্তু পাতলা। আরও একটা দোষ আছে সে চুলের, একেবারে সোজা। কোথাও একটু কুঞ্চনরেখা অথবা তরঙ্গ নেই। সাধারণত সোজা সিঁথি করে সে। ছোট ঢালু কপালের দুই পাশ দিয়ে সোজা চুল তার শুক্তিশুভ্র কানের ওপরে নেমে আসে।

রূপালীর মুখে সকলের আগে চোখে পড়ে তার স্বচ্ছ চোখ। সমস্ত কিছুকে যেন মোহ থেকে ভিন্ন ক'রে দেখছে, এমনই একটা ভাব আর কি। তারপরে দেখা যায় তার নাক। মেয়েদের পক্ষে বেশি উন্নত। ভ্রূরেখা তার ধনুকের মত, কিন্তু ঘন নয়, একটু বেশি পাতলা। চিবুক পাথরে কাটা মূর্ত্তির মত। অধরোষ্ঠ দুইটি সরলরেখা।

আশ্চর্য্য কিন্তু তনুদেহ রূপালীর। মনে হয়, গ্রীক শিল্পী সযতনে নির্ম্মাণ করেছেন ব'সে। বেশির ভাগ সূক্ষ্ম চীনাংশুক পরত সে, লঘু দেহের প্রতিটি বক্ররেখা পর্য্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত।

আমার মুগ্ধ দৃষ্টি বহুদিন রূপালীকে অনুসরণ করেছে। আমার মনে, আমার ধারণায় সে ধরা দিয়েছে বহুদিন। কিন্তু আমি কি তাকে ভালবেসেছিলাম? সে প্রশ্নের উত্তর এখন নাই বা দিলাম। এ আখ্যায়িকা প'ড়ে তোমার যা মনে হয় ভেবে নিও।

রূপালীর কাহিনী আমি বলব নিরপেক্ষভাবে, যেন আমার এতে কোন অংশ নেই—যেমন নিরপেক্ষ, উদাসীনভাবে, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে দাঁড়িয়ে জলকল্লোল শোনে, জলের লীলা দেখে, তেমনই ভাবে। শুধু সৌন্দর্য্যের প্রশংসা ভিন্ন কোন ভাব মনে জাগে না তার।

রূপালীর মধ্যে যদি কিছু অসাধারণ থাকে, তবে সে হচ্ছে তার মন। অপূর্ব্ব কৌতূহলী সে, সর্ব্বদা নূতনত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছে; সহজ শাণিত দৃষ্টিতে জগতের দিকে চেয়ে দেখছে। দ্রুত তার হচ্ছে প্রতিক্রিয়া। সাধারণ ভাবপ্রবণতা তাকে স্পর্শ করে না।

এখন যে রূপালী আলোর নীচে ব'সে আছে, সে হচ্ছে প্রবীণা, তার কথা আমি বিশেষ জানি না। একটা যবনিকা সরিয়ে বহুদিন পূর্ব্বের রূপালীর কথাই বলছি আমি।

রূপালী সাধারণ মেয়ে নয়। তাই আমার তাকে ভাল লাগে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার, কিন্তু ধূর্ত্ত সে নয়। পনরো বছর বয়স পর্য্যন্ত সে ছিল, যাকে চলতি বাংলায় বলে, 'কুনো'। তারপর দ্রুতগতিতে তার উত্থান হ'ল।

রূপালী সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে,:রাজা জমিদার ছিলেন তার পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু ধীরে ধীরে ঐশ্বর্য্য চ'লে গেল, ফেলে গেল পিছনে কেবল একটা অপরূপ সুন্দর অতীতের গৌরব। রূপালীর বাবা বংশের মেজো ছেলে, স্ত্রীকে নিয়ে এলেন কলকাতায় অর্থোপার্জ্জন করবার জন্যে। সাধারণ চল্লিশ টাকা ভাড়ার একটা বাড়িতে রইলেন তাঁরা অনেকদিন।

রূপালীর তরুণ মন তখন সবেমাত্র বিকশিত হচ্ছে একটির পর একটি পরাগ উন্মীলিত ক'রে। তখন চাই তার সূর্য্যের আলো, চাই তার প্রশান্ত সমীরণ।

এখন যে রূপালী নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে আছে, আমি জোর ক'রে বলতে পারি, তার মনে জাগছে সেই বাড়িটি।

সম্মুখে একতলার ওপরে ছাদ একটা, খোলা ছাদ—মাথার ওপরে দেখা যেত মুক্ত নীলাকাশ। এক পাশে স্তূপ-করা মাটি-পাথরের অন্তরালে উঠেছিল ফুলের গাছ। লাল লাল ফুল সব, কিশোরীর তাম্বূলরক্ত অধরের মত। এক কোণে জলের ট্যাঙ্ক, শৈবালাচ্ছাদিত ভূমির ওপর দিয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়ত। সবসুদ্ধ জায়গাটায় যেন একটা প্রকৃতির অবারিত স্পর্শ মাখানো ছিল। যে সৌন্দর্য্য বিশাল বিটপীশ্রেণীতে, ফুলের বনে, ঝরনার জলে ছড়িয়ে থাকত, সে সৌন্দর্য্য দেখা দিয়েছিল রূপালীর সেই ফালির মত ছোট ছাদে। রূপালীর প্রকৃতি ছিল সেইখানে। তাই ছাদের বর্ণনা না দিলে রূপালীর জীবন-নাট্য অসম্পূর্ণ থাকে।

জীবনে নাটক রচনা করি নি, উপন্যাস লিখতে পারি নি, কিন্তু আমার এ প্রয়াস কেন? রূপালীর মনের খবর আমি ভিন্ন কে জানে? কার একাগ্র দৃষ্টির সম্মুখে তার মন দল খুলে বিকশিত হ'ল? যদি আমার লেখায় ত্রুটি থাকে, ক্ষমা ক'রো; যেখানে পারব না সেখানে রূপালীর খাতা থেকে তুলে দেব।

প্রথমেই বলেছি, রূপালী সাধারণ মেয়ে নয়। সাধারণ মাপকাঠিতে তাকে মাপতে যেও না, ঠ'কে যাবে। নির্জ্জনতার মধ্যে সে মানুষ হয়েছিল। তার মায়ের সংসারের কাজ সারা ক'রে প্রচুর সময় ছিল না মেয়েকে সঙ্গ দেবার। আশেপাশের বাড়িগুলো অধিকার ক'রে যারা থাকত, হয় তারা খুব বড়লোক, নয় খুব ছোটলোক। তাই তাদের সঙ্গে রূপালীর মেশা হ'ত না। অজস্র বই ছিল তাদের বাড়িতে—নাটক, গল্প, উপন্যাস। সেসবের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ক'রে ক'রে, একলা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকে থেকে রূপালীর মন যে ভাবে গ'ড়ে উঠেছিল, তার ছাঁচ আলাদা। নিজেকে বোধ হয় বুঝতে শিখেছিল সে।

রূপালীর রং ছিল রক্তহীন ফরসা, তাই নাম হ'ল তার রূপালী। দুর্ব্বল, অতি দুর্ব্বল; সমস্ত মুখের মধ্যে দুজোড়া কালো কালো চোখ ভিন্ন কিছু ছিল না তার দশ বছর বয়সে। মনে হ'ত, একে ধমক দিলেই বা এর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলেই এ গ'লে যাবে, বরফে গড়া মূর্ত্তি যেমন আগুনের আঁচে গ'লে যায়। সে যেন ছিল নিষ্পাপ শৈশবের প্রতিমূর্ত্তি, যেন দয়া ক'রে ধূলার ধরণীতে নেমে এসেছে।

রূপালীর জীবনে প্রেম এল অতি অল্প বয়সে, যে বয়সে তার উচিত ছিল বই খাতা নিয়ে শিক্ষায়তনে সারাদিন অতিবাহিত করা। কিন্তু দুর্ব্বল শরীর ব'লে একটু দেরি ক'রে সে স্কুলে গিয়েছিল। বাড়িতে তার কোন সাথী ছিল না, কোন বিষয়ে মন দেওয়া সম্ভব হ'ত না কেবল সাহিত্য ভিন্ন। তাই ভালবাসার একটা অস্পষ্ট রূপ আকার ধ'রে উঠেছিল তার মনে। ভালবাসত সে উন্মাদের মত, অতি পবিত্র সে ভালবাসা। কোন দৈহিক অর্থ ছিল না তার। যে মেয়ের মন শাণিত ছুরির মত, সে কি প্রেমকে শুধু 'প্রেম' ব'লে নিতে পারে না?

রূপালীর মন ছিল প্যাশনেট, যার বাংলা অর্থ বলা বিপদ। একদিনে নিজেকে ঢেলে দেওয়াই যে মনের ব্যবসায়, তাকেই 'প্যাশনেট' বলতে পারা যায়। যে মন তার সমস্ত জাগ্রত বুদ্ধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা একটা বিশেষ স্থানে স্থাপন ক'রে নিজেকে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে চায়, সেই মনকে বলব প্যাশনেট, সে বিশেষ বস্তু মানুষই হোক, ছবিই হোক, কবিতাই হোক। প্রেমকে আশ্রয় করেছিল রূপালীর মন। একটা কিছু দ্রব্য তার দরকার ছিল, যাকে সে ভালবাসবে; কিন্তু মনে রেখো, সে ভালবাসা শিশুর মত শুধু অবলম্বনের ভালবাসা নয়, সে ভালবাসা এক সদ্যজাগ্রত কিশোর-মনের প্রেমের ইচ্ছা। সে চায় প্রেমাস্পদ।

রূপালীকে তোমরা এঁচোড়ে-পাকা ভাবপ্রবণ ব'লো না এক নিশ্বাসে। তাকে বুঝতে চেষ্টা ক'রো—এই আমার অনুরোধ। তার জীবন ছিল যেন প্রেমের জন্য। সূতিকাগারে তার নির্ম্মল ললাটে যেন রেখা পড়েছিল—সারা জীবন তোমাকে প্রেম নিয়ে থাকতে হবে।

তার ওপর রূপালীর মন ছিল শিল্পীর মন। কবিতা লিখতে, ছবি

আঁকতে বা ভাল গান গাইতে তখনও পারত না সে, তবু ভাবাকুল শিল্পীর মত সুকুমার ছিল তার মন। প্রতিটি বস্তুর সুন্দর রূপটিই পড়ত তার চোখে। শিল্পীর মনের বৈশিষ্ট্য ছিল তার মনে—সে বৈশিষ্ট্য ভালবাসা।

রূপালীর জীবনে প্রেম এসেছিল অতি অল্প বয়সে, যখন সে বাড়িতে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজের মায়ের কাছে থাকত। প্রথম সে ভালবাসল তার পিসেমশায়কে। কেন যে তাঁর কাছে থাকতে, তাঁর কথা শুনতে, তাঁকে দেখতে ভাল লাগত, সে তা জানত না। কিন্তু অনুভব করত একটা নিগূঢ় বন্ধন। অবশ্য সে ভালবাসা—শিশুর ভালবাসা প্রথম উজ্জ্বল জিনিসটির প্রতি।

তার পিসেমশায় ছিলেন সুন্দর, তার বাবা কাকা মামার চেয়ে। মনোমোহকর ছিল তাঁর ব্যবহার, সরস কথাবার্তা, তাই তাঁকে ভাল লাগত রূপালীর। নারীর মনই এই, সে চায় ভালবাসতে। ভালবাসার মধ্যেই তার পূর্ণ পরিণতি।

সে চায় আশ্রয়প্রার্থিনী লতার নির্ভরতায় সহকারকে আলিঙ্গন করতে। যুগে যুগে, কালে কালে এইই রমণীর মন। যখন থেকে রমণীর মন জাগ্রত হয়ে ওঠে, তখনই সে চায় ভালবাসার বস্তু। এই জাগরণ সকলের এক সময়ে হয় না, কারও বা আগে, কারও বা পরে। কিন্তু এই জাগরণ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মন খুঁজে বেড়ায় ভালবাসবার পাত্রকে। তখন তার ভাল-মন্দের বিচার থাকে না। সদ্যজাগ্রত মনের ক্ষুধা মেটাবার জন্যেই ব্যস্ত, তার ভালবাসার বস্তুর যোগ্যতা-অযোগ্যতা ভেবে দেখবার সময় থাকে না। তাই অনেক সময় যোগ্যের সঙ্গে অযোগ্যের যোগাযোগ হয়। আর অনেক মেয়ে মনের স্বাভাবিক অবস্থার স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। তাদের মানসিক শক্তি রূপালীর মত মেয়েদের চেয়ে অনেক কম, তাই হয় তাদের পতন।

রূপালী চেয়েছিল ভালবাসা, কিন্তু জানে না সে, ভালবাসা কাকে বলে। শিশুচিত্ত তার সূক্ষ্ম কলাপ্রিয়তায় পরিণতি লাভ করেছিল,

কিন্তু যেসব বিষয়ে সাধারণ মেয়েরা জানে বেশি, সে তা শেখে নি বিশেষ।

আজ রূপালী এই যে ব'সে ব'সে তার প্রকাণ্ড লুজ-লীভ খাতার পাতা উল্টে যাচ্ছে, সে আজ শিখেছে ভালবাসা কাকে বলে। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে অশ্রু দিয়ে রূপালী বুঝেছে, ভালবাসা নিয়ে যতই না কেন পরীক্ষা করা যায় বর্ত্তমান যুগে, ভালবাসা লাভের বা ভালবাসবার ভাগ্য খুব কম মেয়েরই জোটে। অনেকে ভাবে, তারা ভালবাসছে; কিন্তু তখনও ভালবাসা তাদের মনে আসে নি। অথবা তারা যাকে ভালবাসছে ভেবে ভালবাসে, তাকে শেষে দেখা যায় তারা ভালবাসে নি। একটা সামান্য মোহকে তারা ভালবাসার পর্য্যায়ে ফেলেছে। হয়তো বিবাহের পর লোকে আবিষ্কার ক'রে থাকে, তারা বিবাহ করেছে যাকে, সে তাদের প্রেমের পাত্র নয়। বিবাহের পর প্রেম-পাত্রের দেখা পাওয়া মানুষের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাদ, ইংরেজী অভিধানে যাকে ক্রাইসিস বলে। রূপালীর খাতায় এই মর্ম্মের একটা কবিতা আছে। সেইটা তুলে দিলে আমার কথা ভাল ক'রে বলা হয়। কোথা থেকে রূপালী এসব কবিতা যোগাড় করে, জানি না। আমার তো আর ইংরেজী সাহিত্য রূপালীর মত ক'রে পড়া নেই।—

"Each on his own strict line we move
And some find death ere they find love;
So far apart their lives are thrown
From the twin soul which halves their own.

And sometimes, by still harder fate,
The lovers meet, but meet too late.
—Thy heart is mine!—True, true! ah, true!
—Then, love, thy hand!—Ah no! adieu!"

কিংবা তারা যাকে ভালবাসে, তাকে পথের ধারেই ফেলে আসে না চিনতে পেরে। একদিন সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে তারা, অনুভব করে,

তাদের জীবনেও প্রেম এসেছিল, কিন্তু তাকে তারা 'মোহ' ব'লে ভুল ক'রে অবহেলা করেছে। এ যেন ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোঁজা।—

"চেয়ে দেখিত না নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশপাথ'র।

* * *

অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার একপল ভর—
ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর।"

প্রেম চিনতে পারা, প্রেম পাওয়া এতই কঠিন! রূপালী সারাজীবন প্রেমের জন্য সাধনা করেছিল, কিন্তু শেষে সেও আবিষ্কার করলে যে, সারাজীবন ধ'রে দিয়েছে অনেক, কিন্তু বিনিময়ে বিশেষ কিছু পায় নি।

রূপালীর ডাইরি (বারো বছর বয়সে)—

"স্কুল থেকে ফিরে এসেছি। আমাদের ছাদের অজানা ফুলগাছগুলি পুষ্পসমাকুল হয়ে উঠেছে। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোতে ব'সে মনে হয়, আমি যেন এক রূপকথার দেশে চ'লে গিয়েছি। হয়তো এই ধূসর যবনিকার অন্তরালে এক মায়াপুরী আছে। সেই মায়াপুরীর প্রবাল-খচিত মণি-পর্য্যঙ্কে আমার রাজকুমারী চিরসুপ্তা। সোনার কাঠি কোথায়? কে তার ঘুম ভাঙাবে?

* * *

আজ স্কুলে একজন নূতন টিচার এসেছেন। তিনি বড় সুন্দর! আমি তাঁর ক্লাসে তাঁর দিকে চেয়েছিলাম শুধু, কোনও পড়া শুনি নি। তাঁর নাম মণিকা। তিনি এবার এম. এ. পাস করেছেন। এত অল্প বয়সে, এত ভাল ক'রে পাস করা কোনও টিচার আর আমাদের নেই। সুতরাং তাঁকে ভালবাসব না কেন?"

দুটো পাতা উল্টে দেখা যাক—

"মণিকাদি আজ আমার খাতা দেখে 'গুড' দিয়েছেন। ওঁর হাতের লেখাও কি এত সুন্দর! জি-এর টানটি কি চমৎকার!"

আবার কিছু পরেই রয়েছে—

"আজ মণিকাদি আমার হাত ধরেছিলেন। কেন মনে নেই, কিন্তু তাঁর সে স্পর্শ মনে আছে।"

তার কিছু পরেই রবীন্দ্রনাথের দুটো পংক্তি তোলা—

"একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি,
তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনি।"

একে কি বলা যায়? ইস্কুলে-পড়া মেয়ের অহেতুক ন্যাকামি? কিংবা অর্দ্ধবিকশিত নারী-মনের অস্বাস্থ্যকর ভালবাসার পূর্ণতার ইচ্ছা?

হয়তো আমি এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে পারব না, তবু কেবল এইটুকু বলতে চাই যে, তখনকার রূপালীর মনের এই ভাবধারার মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র খাদ ছিল না। দেহজ প্রেমের একটা অস্পষ্ট রূপই তার ধারণায় ছিল, কথাটার অর্থ তার ভাবাকুল মনের মধ্যে প্রবেশ করে নি। হয়তো তুমি বলতে পার, বারো বছরের মেয়ের পক্ষে দেহজ প্রেমের ধারণা করা অস্বাভাবিক। কিন্তু সত্যই কি তাই? আমাদের দেশে বারো-তেরো বছরে মেয়েরা অনেক শেখে। আর আমাদের দেশে কেন, সব দেশেই অল্প বয়স থেকে হয় নারী-মনের পূর্ণতা। প্রেম এমন একটা জিনিস, সেটা কোন মেয়ের শিখতে হয় না। দেহজ প্রেমের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও একটা অনুভূতি অজ্ঞাতসারে মনে এসে যায়, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'ইনস্টিংক্ট'। তবে পরিষ্কার ধারণা থাকে কারও কারও, কারুর বা সে ধারণা হবার সুযোগ বা সুবিধা থাকে না। রূপালীর ক্ষেত্রেও শেষোক্ত ক্রিয়া হয়েছিল। সে থাকত নির্জ্জনে মাতাপিতার স্নেহচ্ছায়ায়। কোনও নবদম্পতীর মিলন বা সমবয়সী মেয়েদের বিবাহ দেখে নি। উপন্যাস সে যা পড়েছিল সব আদর্শপন্থী, দেহজ প্রেমের উল্লেখ মাত্র ছিল না তাতে। এ বিষয়ে তার মা-বাবা খুব সতর্ক ছিলেন। মেয়ের অস্বাভাবিক বই পড়ার স্পৃহা জেনে তাঁরা বাড়িতে কোনও বিকৃতিরুচি পুস্তকের আমদানি করেন নি। কাজেই চোদ্দ বছর পর্য্যন্ত রূপালীর জগৎ রইল প্রেমের কাকলীমুখরিত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতিতে পূর্ণ। মানসিক প্রেম সে বুঝেছিল, কিন্তু দেহজ প্রেমের বিশেষ কিছুই বোঝে নি। তবু সমাজে বা গৃহাশ্রমে থাকতে হ'লে যেটুকু আভাস এড়ানো যায় না,

সেটুকু তার এসেছিল, অনাহতভাবে; কিন্তু তার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। অথচ অনেক বাংলা উপন্যাসের নায়িকাদের মত কলেজী শিক্ষা পেয়ে এবং যৌবনোদ্গম সত্ত্বেও অহেতুক ন্যাকামি তার ছিল না। সাহিত্যে ও-রকম অস্বাভাবিক চরিত্র-সৃজন বৃথা।

এই দেহজ প্রেমের অনুপস্থিতি রূপালীকে—নারীকে প্রেমাস্পদরূপে দেখতে সক্ষম করিয়েছিল, সাধারণ মেয়েদের মত অন্য কারণে নয়। যে প্রেমের জন্ম হৃদয়ের এক উদ্বেল ভাবধারা থেকে, সৌন্দর্য্য অনুশীলনে যার সার্থকতা, সে প্রেম প্রেমাস্পদের কাছ থেকে কি চায়? কেবল ভাবেরই আদান-প্রদান। সুতরাং নারী বা পুরুষে তার কাছে প্রভেদ কোথায়? তাই এক পরিপূর্ণ নারী-মনের সমস্ত আকুলতা এক নারীকেই আশ্রয় ক'রে জেগে উঠল যোগ্য পুরুষের অভাবে।

রূপালীর জীবনে এই নারীপ্রেমের দু-চারটে উদাহরণ দিতে পারি আমি, কারণ তার ওই বয়স থেকেই অদম্য প্রেমস্পৃহা দেখা দিয়েছিল।

বসন্তের আকুল সন্ধ্যা, সুমধুর আবেশে পূর্ণ। কলকাতার ইট-কাঠের বন্ধনের অবকাশে উতলা দক্ষিণ-সমীরণ দোলা দিয়ে যাচ্ছে রূপালীর ছাদের ওপরের 'রুমাল-উদ্যানে', দু-একটা সেই নামহীন লাল ফুল ঝ'রে পড়ছে বৃন্ত থেকে মুক্তি পেয়ে।

রূপালী ছাদে বেড়াচ্ছিল ঈষৎ দ্বিধার ভাবে। ছাদ থেকে তাদের শোবার ঘর দেখা যায়। সেখানে জানালার পাশের চেয়ারে যে একজন ভদ্রমহিলা ব'সে আছেন, তিনিই এতক্ষণ রূপালীর মনোহরণ করেছেন বোঝা যাচ্ছে। তাঁকে বর্ণনা করব কি? করা তো খুবই উচিত। নায়িকার প্রেমের উপাখ্যানে যাঁদের ভূমিকা আছে, তাঁদের দর্শকের সামনে ধ'রে তোলা গতানুগতিক পন্থা।

ভদ্রমহিলার বয়স প্রায় ত্রিশ। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম অর্থাৎ বাঙালীর ঘরের গৌর। মুখ চোখ সাধারণ। অত্যাগ্র বেশভূষা দর্শনীয়।

রূপালী ইতস্তত ভাবে বিচরণ করছে আর মাঝে মাঝে কানিসের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

মাধুরীদি তোকে ডাকছেন রূলি, এদিকে আয়।—হঠাৎ রূপালীর মা উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে ইশারা করলেন ঘর থেকে।

এক মুহূর্ত্তে রূপালীর রাগ হয়ে গেল। কি বিসদৃশ্য ব্যবহার তার মায়ের! কি অভদ্র, কি ভাল্‌গার! মাধুরীদির সামনে তিনি অত জোরে চেঁচিয়ে কথা বলেন কেন? যদি ডাকবার ইচ্ছে হয়, নিজে বেরিয়ে এসে ডাকতে পারেন না? ছি ছি, মাধুরীদি কি ভাববেন!

মাধুরীদি স্থানীয় মেয়ে-স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, বি. এ., বি. টি. পাস। তাঁর ডিগ্রীর মহিমায় ও প্রসাধনের ঔজ্জ্বল্যে রূপালী মুগ্ধা। রূপালীর বাবা পরিচালক-সঙ্ঘের অন্যতম, সেই সূত্রে রূপালীর বাড়িতে মাধুরীদির আসা।

রূপালীর রক্তহীন মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বক্ষের চাঞ্চল্য দ্রুত হয়েছে। সে এ আহ্বান আর উপেক্ষা করবে না, যাবে মাধুরীদির সামনে। নিজের কথাবার্ত্তায় জানিয়ে দেবে সে, ফোর্থ ক্লাস থেকে প্রথম হয়ে থার্ড ক্লাসে উঠেছে। এবারে যে বইগুলো প্রাইজ পেয়েছিল—আঃ, সেগুলো যে মা আবার মাসীমাকে পড়তে দিয়েছেন! নইলে মাধুরীদিকে দেখিয়ে দেওয়া যেত, সে একটি নামজাদা ভাল মেয়ে। মাধুরীদি মেয়েদের পড়ান, লেখাপড়া নিশ্চয় ভালবাসেন। সারা জগৎটাই যেন মা-মাসীর উৎপাতে তটস্থ হয়ে আছে!

রূপালী নিজের কাপড়খানা একটু ঠিক ক'রে নিলে। তার কাকার ঘরের আয়নায় একবার নিজের মুখ দেখে নিলে। তারপর ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে আলমারির কোণটা চেপে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল। এই তার অপরিচিতের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশভঙ্গি।

তার মা যে রীতিমত অভদ্র, আজ আর এ বিষয়ে রূপালীর বিন্দুমাত্র সংশয় রইল না। কি আশ্চর্য্য! এতগুলো কাচের থালা থাকতে একটা অমার্জ্জিত কাঁসার রেকাবিতে খাবার দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তার ওপর ভুক্তাবশিষ্ট যে কতক্ষণ থেকে এ ভাবে প'ড়ে রয়েছে, কে জানে! চায়ের কাপটাও রূপালী লক্ষ্য ক'রে দেখলে, বিশেষ সুবিধার নয়। কেন, তার বাবার কাপটা দিলেই তো হ'ত। বাবা অবশ্য সকলের

সেটায় চা খাওয়া পছন্দ করেন না, কিন্তু মাধুরী বোস বি. এ., বি. টি. কি সকলের মধ্যে ?

মাধুরীদি সোৎসুকে এই মেয়েটিকে দেখছিলেন। চুলগুলো কপালের ওপর থেকে টেনে বাঁধা, মুখটা পরম গম্ভীর। মেয়েদের এ বয়সে রীতিমত চঞ্চলা আর হাসিখুশি হবার কথা, কিন্তু এ মেয়েটির ভাবগতিক যেন একটু অদ্ভুত। বিবর্ণ মুখে তার কৈশোরের পবিত্রতার ছায়া পড়েছে, কিন্তু মসৃণ ললাটে আধোজাগ্রত চিন্তার ছবি। স্বচ্ছ চোখে দূরাগত যৌবনের দীপ্তিরশ্মির একটা সূক্ষ্ম আভাস দেখা যায়, কিন্তু সরল অধরোষ্ঠ শিশুর মত সুকুমার।

রূপালী মায়ের দিকে তাকিয়ে টেবিলের ওপর থালা ও গ্লাসের দিকে ভ্রূভঙ্গি করলে, কিন্তু তার মা কিছু বুঝতে পারলেন না। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের। তাঁর মেয়ের মনে যে শালীনতা, সেটা তাঁর মনে বিরল।

মাধুরীদি প্রসন্ন হাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কি বই পড় ? মুহূর্তে রূপালীর চোখে আগ্রহের আলো জ্ব'লে উঠল। দ্রুতভাবে সে যে বই পড়া হয় সেসব এবং যে বই কেবল বইয়ের তালিকাতে থেকেই ক্ষান্ত তাদের নামাবলী ব'লে গেল। পুস্তকের সংখ্যা আরও বাড়াতে পারলেই যেন বেঁচে যায় সে। গৌববটা যেন পুস্তকের সংখ্যানুযায়ী হবে।

ভালবাসা চাই, ভালবাসা! একটা জীবন্ত মানব-মন প্রেম ভিন্ন বাঁচতে পারে না। যদিও বা পারে, সে মরণের সমতুল্য জীবন। হৃদয়ের প্রতিটি বৃত্তি যখন উন্মাদ বাসনায় নৃত্য করে, যৌবনের আগমন নিজের জয়যাত্রা আরম্ভ করে, তখন মন চায় একটা আধার, যার ওপর তার এই পুঞ্জীভূত সঞ্চয় ব্যয় করতে হবে।

মাধুরীদি তাকালেন তার দিকে। এবারে একটু মনোযোগ খরচ ক'রে। মেয়ে নিয়ে কারবার তাঁর, মেয়েদের অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখতে পান বা চান। এক নিমিষে চিত্তে তাঁর বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল—এ মেয়েটি তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। এক-একটা মানুষের মন থাকে এই রকম, তারা অন্যের চিত্তে নিজের আসন দেখতে ভালবাসে,

সে রকম কোন সম্ভাবনা দেখতে পেলে তার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করে ; হয়তো মাধুরীদিও সেই জাতীয়।

নানা কথার পর মাধুরীদি বিদায় গ্রহণ ক'রে উঠলেন। যাবার সময়ে রূপালীর মাকে ব'লে গেলেন, একা থাকি—আমি আর আমার মা।. মাঝে মাঝে আপনার মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেবেন। আমার মা বড় ছেলেপিলে ভালবাসেন।

এই কথাতেই রূপালীর মন আশা ও আনন্দের সপ্তম স্বর্গে অধিরোহণ করল। তার কল্পনাপ্রবণ চিত্ত মনে মনে মাধুরীদির অদেখা গৃহাশ্রমের ছবি আঁকতে লাগল নিজের ইচ্ছামত রূপে। মাধুরীদি! তাঁর ঘর ভাবতেই রূপালীর মনে হ'ল একখানা ঘর, যার মেঝে বেশ পালিশ শানে বাঁধানো, তাদের শোবার ঘরের মত, কাকা ও ভাইদের ঘরের মত ফাটা ভাঙা নয়। ঘরে কি থাকবে? কি থাকা উচিত? খাট একটা, টেবিল চেয়ার তো বটেই, আর বই—রাশি রাশি বই। সে কি কথা কইবে? এমন কিছু বলবে, যাতে সবাই একেবারে অবাক হয়ে ভাববেন, কি আশ্চর্য্য বুদ্ধিমতী মেয়েটি! কি বিদ্যার দীপ্তি এর সর্ব্বাঙ্গে ঝকমক করছে! আর মাধুরীদিকে দেখাতে হবে, সে ছোট ব'লে চরিত্রের গৌরবে কারুর চেয়ে কম নয়। তার চরিত্র সত্যে পূত, উদার। সে দেখাবে, বাজারের আর সব মেয়েদের মত সে নয়, তার মধ্যে অসামান্যতা আছে। সে কালে মহিলা রবীন্দ্রনাথ হবে অথবা মধুসূদন দত্ত হবে। এই দুজনের লেখা তার থার্ড ক্লাসের বাংলাতে বেশি বেশি পড়তে হ'ত, তাই এই দুটো নামই তার দ্রুত মনে এল।

আচ্ছা, মাধুরীদি কি তাকে ভালবাসেন? তা না হ'লে কেন তাকে ভাববেন? অনেক তো ছাত্রী আছে তাঁর?

ভাবতে ভাবতে শ্রান্ত রূপালী বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল। লাভের মধ্যে তার রাত্রিতে খাওয়া হ'ল না।

দিন দুই পরে মাধুরীদির বাড়ি থেকে লোক এল একখানা চিঠি নিয়ে। রূপালীর মাকে 'মাননীয়া' সম্বোধন ক'রে মাধুরীদি চেয়েছেন

কয়েকখানা বই, সময় কাটে না ব'লে, আর—আর রূপালীকে একবার যেতে বলেছেন।

রূপালী আনন্দে প্রায় নৃত্য ক'রে উঠছিল, হঠাৎ নিজের সম্মান ও সম্ভ্রম মনে পড়ায় আত্মসংবরণ করলে। সত্যি, এতে কোনও সন্দেহ নেই, মাধুরীদি তাকে পছন্দ করেন।

মা রূপালীকে বললেন, যা না রূলি, তোর মাধুরীদির বাড়ি কয়েকখানা বই নিয়ে। চাকর তো দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।

চাপা গলায় রূপালী মাকে তিরস্কার করলে, হ্যাঁ, যা না ওঁর চাকরের সঙ্গে! কেন, আমাদেব চাকর কি নেই? কি ভাববেন তাতে! আর আমার এখন কাপড় ছাড়া হয় নি।

মা অবাক হলেন, বললেন, ভাববেন আবার কি? তোর যত সব ইয়ে। কাপড় ছাড়তে কত আর সময় লাগবে? চুল তো বাঁধাই আছে।

না না।—সবেগে রূপালী প্রতিবাদ ক'রে উঠল, এ রকম চুল বেঁধে আমি যাব না।

নানা কথার পর অবশেষে রূপালী গেল মাধুরীদির বাড়ি। তখন কলকাতার গলিতে গলিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্ব'লে উঠেছে, গগনের প্রান্তে নেমেছে সন্ধ্যা।

রূপালীর ডাইরি—

"সব দেখে হতাশ হলাম। আড়ম্বরহীন গৃহসজ্জা, তার মাঝে মাধুরীদি ব'সে আছেন। চোখে তাঁর চশমা নেই, কাপড় সাধারণভাবে পরা। কেমন যেন আমার ভাল লাগল না। উনি বাইরে এক রকম, ভেতরে আর এক রকম। মনে হয় না যে, এই লোককে বাইরে এত ভাল লাগে। মাধুরীদির মাকে দেখে প্রথমে আমি তাঁকে বাড়ির ঝি মনে করেছিলাম, পরে বুঝলাম মাধুরীদির মা। মাধুরীদি নিজে বোধ হয় রান্না করেন, হাতে তাঁর হলুদের দাগ। আমাকে ছাদে বেড়াতে নিয়ে গেলেন, তারপর খাবার খাওয়ালেন। আমার ভাল লাগল না। আমি চ'লে এলাম।"

আশ্চর্য্য রূপালী, তুমি সত্যই আশ্চর্য্য! মানুষের ভেতর দেখে কবে বিচার করতে শিখবে তুমি? কেবল বাইরে দেখে বিচার করায় 'প্রেম' তোমার ভাগ্যে কতবার লাভ হয়েছে, যদিও প্রেমের জন্যেই তুমি তৈরি হয়েছিলে? মাধুরীদি যতক্ষণ তোমার চোখে রঙিন-বসন-পরা, আত্মসর্ব্বস্ব ফুলপরীটি হয়ে রইলেন, ততক্ষণই তুমি তাঁর জন্যে ব্যাকুল, আকুল হ'লে; আর যখনই তিনি তাঁর শৌখিন খোলসটা ফেলে ধূলার ধরণীতে নেমে এলেন অন্য দশটা বাংলা দেশের মায়ের মেয়ে-রূপে, হাতে রান্নাঘরের ছাপ নিয়ে, তখনই তিনি হলেন তোমার কাছে সাধারণ। তোমার কাব্যলোকের স্তর থেকে যেই তোমার দেবতা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পরিচয়ে নিবিড় হয়ে উঠল, অমনই তুমি তাকে বেদীচ্যুত করলে। তুমি চাও নূতনত্ব, মোহের আবরণে চোখকে রঙিন রাখতে। পুরাতনের স্বাদ তোমার ভাল লাগে কই? মেয়েদের এমন মন হওয়া ভাল নয় রূপালী।

ভাল কথা, এই সময়ে রূপালী সবেগে কাব্যচর্চ্চা আরম্ভ করেছিল। এই উদীয়মানা কবির লেখা তার 'স্কুল-ম্যাগাজিন' ভূষিত ক'রে বার হ'ত এবং সহপাঠিনীদের ঈর্ষা প্রশংসা সমভাবে লাভ করত। এই সময়ে তার লেখা একটা কবিতা তুলে দিলে তার মনের অবস্থা বোঝানো যাবে।

রূপালীর ডাইরি—

"এস না নামিয়া প্রিয়া মর ধরণীতে,
কল্পনার ফুল তুমি থেকো নীলাকাশে,
এস না নিকটে মম নিঃশেষপ্রকাশে,
শুকায়ে যাও গো যদি ধরার বাতাসে।
আমি জানি নহ তুমি অত মনোরম,
আমি যা এঁকেছি দুটি মুগ্ধ আঁখিপাতে,
কাছে এলে প্রতিক্ষণ ম্লান তব রূপ,
স্বপনের অবসান ধূলার আঘাতে।"

সম্বোধনটি লক্ষ্য কর—'প্রিয়া', 'প্রিয়' নয়।

রূপালী যখন স্কুলে যেত, তখন তার শরীর পূর্ণতা লাভ করে নি

একেবারে। তার ছিল দেহ, যে দেহ যৌবনের আগমনমাত্রে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হয়ে দু-চার বছরে নিজেকে ব্যয় ক'রে ফেলে না। তার দেহ যৌবনের আভাস দিত, ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে ওঠার একটা আভাস দিত, যৌবন দীর্ঘস্থায়ী করবার আভাস দিত। তখন রূপালী ছিল না সুন্দর, যাকে সাধারণ মাপকাঠিতে 'সুন্দর' বলে।

সুন্দর, সুন্দর কাকে বলে? জানি না, তোমাদের মাপকাঠি কেমন? আমার চোখে সেই ক্ষীণকায়া, কালো,—তখন রূপালী স্বাস্থ্যের আমেজ পেয়ে রক্তহীন ফরসা থেকে রক্তবান শ্যাম অর্থাৎ কালোতে প্রোমোশন পেয়েছিল—সেই কালো মেয়েটির তুলনা ছিল না। আঠারো বছর পর্য্যন্ত সে আমার কাছে ছিল শিশু। দেহবাদ তার পবিত্র মনকে কলুষিত কখনও করে নি। তার ভালবাসা ছিল তারই মত পবিত্র, তারই মত সুন্দর, তারই মত অদ্ভুত। বহুবার ভালবাসা নিয়ে গবেষণা করবার ফলেও সে তার পবিত্রতা হারায় নি। শিশুর মন ছিল তার, নবজাগ্রত কৌতূহলে পূর্ণ।

জীবনে আমি সুন্দর দেখেছি অনেক। নিজের চেহারারও সুন্দর ব'লে খ্যাতি আছে। কিন্তু রূপালীর কালো চোখের ভঙ্গিমায়, সুকুমার অধরের ঈষৎ কম্পনে যে অনন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার আমি দেখতাম, তার তুলনা কোথাও খুঁজে পাই নি।

রূপালীর স্কুল-জীবন শেষ হ'ল প্রায় সতরো বছর বয়সে, কিন্তু তার আগে আরও কয়েকটি ঘটনা আমার জানানো দরকার। রূপালীর প্রেমনদী উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, সমুদ্র হ'ল তার সেকেণ্ড ক্লাসের ক্লাস-শিক্ষয়িত্রী চম্পা গুহ।

চম্পা গুহের বয়স তখন বত্রিশ। নিকষ-কালো না হ'লেও দগ্ধ-কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ। দেহ মুখ চোখ লালিত্যবিহীন, রুক্ষ। এক গোছা সোজা চুল। রূপালীর চোখে তাঁর তুলনা ছিল না, শুধু গুণে নয় কেবল, রূপেও।

চম্পা গুহ দরিদ্র গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে। কোন রকমে বি. এ. পাস ক'রে নিজের সংস্থান নিজে করবার জন্যে স্কুলে চাকরি নিয়েছেন। মন

তাঁর রুক্ষ, কর্তব্য ক'রে যান কঠিনভাবে। রসের লেশ নেই মনে তাঁর। তাঁরই মধ্যে রূপালীর প্রেমের অলকনন্দা মুক্তি পেল। কি বোকা মেয়ে!

রূপালী চম্পা গুহের ক্লাসে তন্ময় হয়ে ব'সে প্রতিটি কথা তাঁর সারা দেহ-মন দিয়ে যেন গিলত। ফলে ইতিহাসে, তখন ক্লাসে কেন, সারা স্কুলে তার জোড়া ছিল না। চম্পা গুহের প্রতিটি আদেশ রূপালীর বেদবাক্য। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে বুকের মধ্যে কম্পিত হওয়া, পদধ্বনিতে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হওয়া সবই দেখা দিল। এ প্রেমে আর পরবর্তী জীবনে পুরুষের প্রতি প্রেমে প্রভেদ কি?

এ সময়ে আবার রূপালীর প্রতি অনুরাগী দুই-একটি পুরুষ দেখা দিলে। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, মানবতায় সুকুমার মুখ যে মেয়ের, অসহায় বড় চোখে যার স্বপ্নাকুল দৃষ্টি, সে অন্য সব মেয়ের চেয়ে বহু—বহু স্বতন্ত্র, যার কোরক-চিত্তে লালসা বা সাংসারিকতা স্পর্শ করে নি, সে তো লুব্ধ পুরুষের তৃষিত দৃষ্টিপথে পড়বেই। আহা, কি অনাস্বাদিত তাজা ফল! আমার দশনের চিহ্ন এতে পড়ুক না কেন! এই গাছে-ফোটা কচি ফুলটি কেন বাসনার স্পর্শ পাবে না!

ঘৃণা! ঘৃণা! নরম ফুলতোলা কার্পেটের ওপরে রূপালীর অসাহিষ্ণু চরণ নড়ে উঠল। দু হাত মাথার পেছনে রেখে রূপালী ওপরে আলোর আধারটার দিকে চাইল। এই দেহ! সরস, স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল ক্ষীণ! বিশাল নয়ন! কি আকর্ষণ তার? সাধারণ মেয়েদের চেয়ে ভাল দেখতে সে নয়। সুন্দরীদের পাশে সে কুশ্রী। তবু এই দেহের আকর্ষণে আমার পেছনে আসত পুরুষ—পঁচিশ বছরের রূপালীর দেহ স্মরণ ক'রে চল্লিশ বছরের রূপালী ভাবছে। তা ছাড়া, কি আকর্ষণ ছিল আমার? একটা বোকা মেয়ে কৈশোরে। কথা বলতে জানে না, হাসতে জানে না সঠিকভাবে, কটাক্ষ বা ক্রন্দন শেখে নি। শিখেছে কেবল ক্লাসে প'ড়ে 'ফার্স্ট' হতে—দু-একটা বাজে তৃতীয় শ্রেণীর তরল কবিতা লিখতে, আর—আর স্বপ্ন দেখতে।

একজন আসত এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। ছাত্রাবাসে থাকত সে।

একলা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করার জন্যে ক্লান্তি এসেছিল তার। আর সে তার বোনের জা—রূপালীর মাসীমার কাছে রূপালীর প্রশংসা শুনে পূর্ব্বরাগের ভাব মনে নিয়েছিল। মন্দ কি!

রূপালীর ভালমানুষ মা মেয়ের কবিতার খাতা বার করলেন দেখাবার জন্যে। ডান হাতে সন্দেশ চিবোতে চিবোতে রূপালীর খাতা বাঁ হাতে ধ'রে রতীন্দ্র পড়ল।

বাঃ, বেশ তো লিখেছে বয়েস আন্দাজে! এক সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ আছে আমার। দুটো লেখা তাঁকে দেব ছাপাতে।

রূপালীর মন আনন্দে নেচে উঠল। তার নাম ছাপা হবে কাগজে! তার কবিতার প্রতি লাইন সহস্র লোক পড়বে!

রূপালীর বিহ্বল ভাব দেখে রতীন্দ্র আরও একটু আত্মপ্রাধান্যে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। রূপালীকেই উদ্দেশ্য ক'রে কথা চালাল সে, বুঝলে, 'চিত্রিতা' কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আর ওর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বিমানবাবু তো আমার মেসে থাকেন। তাঁদের দুজনকে ব'লে ক'য়ে দেব চালিয়ে।

রূপালীর মনে একটু বেসুরো বাজল। কেন, তার লেখা কি এমনই অচল যে, ব'লে ক'য়ে চালাতে হবে! রতীন্দ্র বলছে যেন অনুগ্রহ করার ভাবে!

রূপালীর মা চা ভিজোতে দিয়ে এসেছিলেন, উঠে গেলেন—রূপালীর সঙ্কুচিত মুখের দিকে চেয়ে। রতীন্দ্র আধুনিক সাহিত্য ও প্রেম সম্বন্ধে নানা আলোচনা করতে লাগল। তার সঙ্গে নিজের মনোভাবও জানাতে দ্বিধা করলে না ইশারা-ইঙ্গিতে।

মোটা ভাঙা গলা লোকটার, জলে ভেজা তবলা যেন। চেহারার মধ্যে স্বাস্থ্য আছে, রূপ নেই। তামাটে বর্ণ, এক জোড়া প্রবল গোঁফ। রসে হাত পড়লে হাত যেমন চটচটে হয়, তেমনই একটা বাজে ভাব-প্রবণতা, এবং তার সঙ্গে একান্ত নির্লজ্জতা। কি এক অজানা মনো-ভাবে, বিতৃষ্ণায় ও গা-ঘিনঘিন করাতে রূপালী অস্থির হয়ে উঠল। এই লোকটা তার সঙ্গে ব্যবহার করছে, যেন সেটা স্পর্দ্ধা ও অপমান।

তাই খাবার সময়ে কবিতা চাইলে রূপালী তা দিলে না এবং সেজন্তে মায়ের কাছে তিরস্কৃত হ'ল।

তারপর রতীন্দ্র আসতে লাগল ঘন ঘন। ক্রমেই বিতৃষ্ণা বাড়তে লাগল রূপালীর। শিশুকাল থেকে প্রেমে পড়া যার অভ্যাস ছিল, প্রেমার্ত্ত পুরুষকে তার প্রত্যাখানের মর্ম্ম অন্তত আমি বুঝি নি। যেসব পুরুষকে দেবতার আসনে বসিয়েছিল রূপালী, তাদের চেয়ে রতীন্দ্র বিশেষ কিছু ন্যূন ছিল না। তবে রতীন্দ্রের সঙ্গে রূপালীর বিবাহ হতে পারত—রতীন্দ্র সে আভাসও দিয়েছিল। বিবাহের মত স্থূল একটা বস্তুর সম্পর্কিত পুরুষকে তাই বোধ হয় রূপালীর বিশেষ ভাল লাগে নি। তার কবি-মন মানসলোকে বিচরণ ক'রে ফিরত, একজন সামান্য সাধারণ পুরুষের কল্যাণে শাঁখা-সিঁদুর ধারণ ক'রে তার অঙ্কশায়িনী হবার কল্পনাটা রূপালীর তরুণ চিত্তে যেন সহসা আঘাত দিলে। আভাসে ইঙ্গিতে প্রেমনিবেদনের প্রচেষ্টাও করেছে রতীন্দ্র। যদি সে রূপালীর জীবনে সমসাময়িক অন্যান্য পুরুষের মত রূপালীকে প্রেমের চক্ষে না দেখে স্নেহের চক্ষে দেখত, তবে বোধ হয় রূপালীর প্রেমনদী তাকে ঘিরে উদ্বেলিত হতেও পারত।

মাসীমার মুখে রতীন্দ্র বিবাহ-প্রস্তাব পাঠিয়েছে শুনে রূপালী কেঁদে হাট বসিয়ে দিলে, যদিও তার বাবা-মা এখন মেয়ের বিয়ে দেবেন না ব'লে আগেই 'না' ক'রে দিয়েছিলেন। মনে হ'ল রূপালীর, তার জীবনে বুঝি চরম অবমাননা এসেছে প্রথম পুরুষের বিবাহ-প্রস্তাবরূপে। বাবা-মার সামনে বার হতেও যেন তার সঙ্কোচ হচ্ছিল, তাঁরা কি ভাবছেন ভেবে। শিশুর মত যে ছিল এতদিন, রাতারাতি তাকে যুবতীরূপে কামনা ক'রে যে ব্যক্তি তার মনোজগতে বিপ্লব আনলে, জীবনে কখনও তাকে রূপালী ক্ষমা করতে পারে নি। বিষণ্ণ ভাব

দেখে মা তাকে বোঝালেন, এতে রতীন তোর সম্মান করেছে রুলি। অপমান করে নি। সম্মান না করলে কি কেউ কাকে বিয়ে করতে চায়?

উত্তরকালে এ কথা রূপালীর জীবনে বহুবার মনে করতে হয়েছিল।

এর মধ্যে ম্যাট্রিক ক্লাসের সান্ত্বনার সঙ্গে আবার রূপালীর মনোমিলন হ'ল। পাতলা হ্যাংলা চেহারার মেয়েটি সহসা একরাত্রির মধ্যে রূপালীর চক্ষে অসামান্যা ব'লে প্রতীয়মানা হ'ল। স্কুল থেকে কয়েকজন মেয়েকে 'পিট্যার প্যান' দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, রূপালী দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীরূপে সেখানে গিয়েছিল। সান্ত্বনা তার পাশের আসনে বসেছিল। ওয়েণ্ডি যখন ছায়ার পেছনে ধাবন করছে, তখন সান্ত্বনা রূপালীকে প্রশ্ন করলে, কি, লাগছে কেমন?

সঙ্গে সঙ্গে রূপালীর স্বপ্ন-তৃপ্ত চিত্ত পরম পুলকে মগ্ন হ'ল। সান্ত্বনা চক্রবর্তী অত মেয়ের মধ্যে বিশেষ ক'রে তাকে কেন জিজ্ঞাসা করলে! শক্ত ক'রে লাগানো চেয়ারে যতটা সম্ভব স'রে এসে সান্ত্বনার হাতখানা ধ'রে বিগলিত স্বরে রূপালী বললে, বেশ ভাল দেখছি। আপনি?

সেই হাত রূপালী আর ছাড়লে না, সান্ত্বনা মাঝে মাঝে ছাড়াবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও। কেমন যেন একটা সুখস্রোত তার হাত বেয়ে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছিল। শারীরিক সংসর্গের এই তার প্রথম ধারণা। উষ্ণ করতল সান্ত্বনার, একটা আরাম যেন স্পর্শমাত্রেই দেহকে আশ্রয় করে।

তারপর সামান্য কয়েকদিন সান্ত্বনার পশ্চাৎধাবন করেছিল রূপালী, জানি। যেখানে সান্ত্বনা, রূপালী সেইখানেই দেখা দিত। সান্ত্বনার গায়ের সঙ্গে একটু ছোঁয়া লাগা তার কাম্য ছিল তখন। সহপাঠিনীরা

রূপালী ও সান্ত্বনার নাম জড়িয়ে নানা হাসিঠাট্টার উপাদান কুড়িয়ে ফিরতে লাগল। তাতে রূপালীর আনন্দ দেখা দিত। সে সান্ত্বনাকে যে ভালবাসে, সে সংবাদ সকলকে জানানো তার গর্ব্ব, সে কথা অন্যের মুখে শুনেও তার তৃপ্তি।

এ 'সাফো-প্রেমে'র শেষ কেমন করে হ'ল জানি না। রূপালীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলেছিল, তারও মনে নেই।

এই সময়ে রূপালীকে উদ্দেশ্য ক'রে নীচু ক্লাসের কয়েকটি মেয়ে কবিতা লিখেছিল। ভাল ছাত্রী ও কবি ব'লে স্কুল-জীবনে রূপালীর খ্যাতি তখন বহুদূরবিস্তৃত। তাদের কথা নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই; কারণ রূপালীর চিত্ত-উন্মেষ আমাদের লক্ষ্য, অন্য-চিত্ত তাকে বেষ্টন ক'রে উন্মেষিত হয়ে উঠলেও, সেটা আমাদের প্রতিপাদ্য নয়। তবে রূপালীর মনে তখন একটু পুরুষসুলভ ভাব এল। সেই সব মেয়েদের দেখিয়ে সপ্রতিভভাবে চলাফেরা, অহেতুক তাদের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার, তাদের চক্ষে নিজেকে বড় ক'রে দেখানোর উদ্যম তার দেখা গেল। পুরুষালী ভাবে চলাফেরা করতে গিয়ে রূপালীর এলায়িত ভাবটা কেটে উঠে সপ্রতিভ চটপটে ভাব এসে গেল, যাকে বলে—স্মার্টনেস, পরবর্ত্তী জীবনে তা রূপালীর একটা প্রধান আকর্ষণ হয়েছিল।

রূপালীর জীবনে নারীপ্রেমের অধ্যায়ে এখানে ইতি। তারপর থেকে এল তার জীবনে পুরুষ—সহস্র পুরুষ। ক্ষণিকের জন্যে জীবনে ছায়া ফেলে তারা এসেছিল এক এক ক'রে, কেউ থাকে নি, কিন্তু স্মৃতি র'য়ে গেছে। যাকে রূপালী পরমপ্রার্থিত ব'লে সাগ্রহে একদিন কাছে টেনে এনেছিল, যখন তার বিসর্জ্জন হয়ে যায়, রূপালী তার জন্যে শোচনা করে না। সুখস্মৃতি তার হৃদয়ে সযত্নে রক্ষিত থাকে,—দৃষ্টি তার তখনই

দ্বিতীয় জনের সন্ধানে ছুটে চলে। এটা রূপালীর বিশ্বাসঘাতকতা নয়, এ তার চরিত্রের গঠন।

মাসতুতো দিদির ননদের বিবাহে গিয়ে রূপালী এবার প্রেমে পড়ল বিয়ের বরের সঙ্গেই। ভদ্রলোক শ্যামবর্ণ, সুস্থ সবল। অল্পবয়স্কা কিশোরীর সঙ্গে বরজনোচিত রসিকতা করেছিলেন। কথাবার্ত্তা ভদ্রলোক কম বলেন, আচার-ব্যবহার শান্ত। রূপালী ধ'রে নিলে, তাঁর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। ভদ্রলোকও রূপালীর শিশু-সুলভ সারল্য দেখে মোহিত হলেন। শালগ্রাম সামনে রেখে মন্ত্র প'ড়ে স্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেও আলাপটা তখনও চাক্ষুষ ছিল। তাই বিয়ের বরের সার্ব্বজনীন রসিকতার সুযোগ নিয়ে তিনি রূপালীর সঙ্গে একপালা প্রেমালাপ ক'রে নিলেন।

মুগ্ধা রূপালী ভাবতে লাগল—মণিদির ননদের কি ভাগ্য! এমন রসিক পুরুষ সর্ব্বদা তার পাশে থাকবে! এই অখণ্ড পুরুষরত্ন তার একলার হবে!

পরের দিনও সাগ্রহে বিয়ে-বাড়ি গেল রূপালী, বাড়িটা তাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে। যাবার সুযোগ পেতে পেতে বেলা তিনটে বেজে গেল।

কুশণ্ডিকা তখন হয়ে গেছে। শ্রান্ত নব বর যৌতুকের খাটের ওপর শুয়ে ছিলেন। মেয়েদের সঙ্গে দু-চারটি কথার পর রূপালীকে দ্বিতলে পাঠিয়ে দেওয়া হল, কারণ বরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার লোকের অভাব ঘটেছিল।

ভদ্রলোক পাশবালিশ জড়িয়ে ধ'রে রূপালীকে সম্বোধন করলেন, এই যে, এস। এতক্ষণে আসা হ'ল?

চকিতে রূপালীর মনে হ'ল, সে যেন নবপরিণীতা, তার স্বামী তার

জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে অসহিষ্ণু হয়েছেন। তার পরেই আপাদমস্তক লজ্জায় তার সর্ব্বশরীর শিহরিত হ'ল। বিবাহ? এমন একটা স্থূল বস্তুর কথা তার মনে এল কি ক'রে? অথচ অন্যের স্বামীকে কামনা করবার লজ্জার কথা ভাববার তার অবকাশ হ'ল না। তখনও স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হয় নি, কাজেই তখনও তো তিনি কুমার।

সে ভাবটা দমন ক'রে রূপালী একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। অর্দ্ধশুষ্ক ফুলের মালা, ফুল ইতস্তত সারা ঘরে ছড়ানো। নূতন জামা-কাপড়ের কেমন একটা গন্ধে, কেশতৈল, পুষ্পসার সব কিছুর সৌরভ মিশে জায়গাটিকে যেন অন্য একটা রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। সদ্য পালিশ করা খাট-টেবিল, আলনায় পাদানে সাজানো নূতন জুতো, চামড়ার সুটকেশ, নূতন কাঁসা-রূপোর বাসনপত্র। খসখসে গরদের পাঞ্জাবি, জরিপাড় ধুতি জড়ানো গায়ে, নরম পুরু শয্যায় মোটা পাশ-বালিশ আঁকড়ে শুয়ে আছে শ্রান্ত পুরুষ। পদার্পণ করা মাত্র দেহমনে যেন লালসার ভাব আসে। আমাদের দেশে বিবাহ-বাটির বৈশিষ্ট্য এই। যাদের পূর্ব্বে কখনও পরিচয় ছিল না, রাতারাতি তাদের এক করার প্রয়াসে সহায়তা করে উগ্র আলোকমালা, সানাইয়ের মধুর স্বরলহরী, রক্তাম্বরের প্রখরতা।

কি ভাবে এই পুরুষটি তার স্ত্রীকে সুখ দেবে? এই একটি খাটে পাশাপাশি তারা শয়ন করবে। এমনই আদরের স্বরে স্বামী স্ত্রীকে কাছে ডেকে নেবে। দৃঢ় বাহুর পীড়নে যেমন ক'রে আজ ভদ্রলোক বালিশকে পীড়ন করছেন, তেমনই ক'রে বুঝি নারীকে আলিঙ্গন করবেন। উষ্ণ শয্যায় পুরুষের বাহুবন্ধনে না জানি কি সুখ? সহসা রূপালীর মনের উপর বাসনা ছায়াপাত করলে। শারীরিক প্রেম সম্বন্ধে এই তার প্রথম অনুভূতি।

দেহে রোমাঞ্চ জেগে উঠল রূপালীর। মিথ্যা একটা অজুহাত দিয়ে রূপালী উঠে গেল নিরালাতে তার এই নবলব্ধ অনুভূতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে।

তারপর থেকে রূপালীর আরম্ভ হ'ল চিত্তদ্বারে কামনার অভিযান। সে ছিল কল্পনাবিলাসিনী, তাই মনে মনে যেসব আলোচনায় হ'ত তার তৃপ্তি, তা সাধারণ মেয়েদের শারীরিক তৃপ্তির সমান। তাই কাম সম্বন্ধে সজাগ হ'লেও রূপালী শারীরিক সুখের অভিজ্ঞতা লাভে উৎসুক হ'ল না। কেবল গভীর রাত্রে চোখে তার ঘুম যখন আসত না, তখন সে ভাবতে থাকত স্ত্রীপুরুষের যৌন-মিলনের কথা। তার মুদিত চোখের সামনে সে কল্পনা করতে থাকত, কত তরুণ-তরুণীর গোপন অভিসার, কত দৈহিক প্রেমের খুঁটিনাটি দৃশ্য। কল্পনা হ'ল তার তীব্র, দেহ নির্লিপ্ত। জীবনে কোন দিন রূপালী দৈহিক মিলনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব ক'রে পুরুষের কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে নেয় নি। মনের ধ্যানলোকে তার বহু প্রিয়ের সঙ্গে সে বহুবার মিলিত হয়েছে গোপনে।

ক্রমশ

শ্রীমতী বাণী রায়

সিন্ধু

হে নীল সিন্ধু, তরঙ্গ তব কভু কি শান্ত হবে,
আছা'ড়য়া তারা পড়িবে না আর ধূসর বালুকা-তটে,
বাতাসের ঘায়ে উচ্ছল ঊর্মি হাসিবে না কলরবে ?—
হে বন্ধু মম, অসীম সিন্ধু, কহ আজ অকপটে।
[নীল সমুদ্র যৌবন মম তলহীন গভীরতা,
তরঙ্গ-বাহু মেলিয়া মেলিয়া তট-বন্ধন খোঁজে,
কভু গরজায় ফেণাময় ভাষা, কভু নীল নীরবতা—
অন্তর আর বহির্দ্বন্দ্বে আপনা-আপনি যোঝে।]

পশ্চাতের আমি

প্র. না. বি. অনেকদিন নাটক লেখেন নাই কেন, খোঁজ করিতে গিয়া জানিলাম যে, লোকে তাঁহাকে রসিকমাত্র বলিয়া জানে—এই দুঃখে তিনি একখানা অভিধান লিখিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস—অভিধান শেষ হইলে ইহা যুগপৎ তাঁহার পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও নীরসতা প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি একখানা নাটক লিখিয়া দিলেন বটে, কিন্তু কমেডি কিছুতেই লিখাইতে পারিলাম না। প্র. না. বি.র ভাষায় কমেডি নির্জ্জলা, তাহাতে অশ্রুপাতের অবকাশ নাই; আর ট্র্যাজেডি কলিকাতার দুধের মত, তাহাতে সারের চেয়ে জলই বেশি। এখানা একটি সজলা ট্র্যাজেডি। প্র. না. বি. বলিলেন, আর খানকতক এই রকম ট্র্যাজেডি লিখিলেই তিনি যুগান্তরকারী নাট্যকার বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন।

বিনয়বশত প্র. না. বি. পাঠকদের জানাইতে বলিয়াছেন যে, নাটকের হীরের ক্রচটা চুরি—অর্থাৎ গল্পের ওই ঘটনাটি কোন ইংরেজী নাটক হইতে গৃহীত। নাট্যকারের নাম কিছুতেই জানাইলেন না; বলিলেন, তাহার নাটকে আরও অনেক চুরি করিবার মত পদার্থ আছে; বাঙালী লেখকদের সে খবর দিয়া নিজের ব্যবসায়ের অংশীদার বাড়াইতে রাজি নন।

সম্প্রতি তিনি চীন দেশে আবগারী বিভাগের বিশেষজ্ঞের কাজ করিতে যাত্রা করিতেছেন, কাজেই দীর্ঘ ভূমিকা লিখিতে পারিলেন না। ফিরিয়া আসিয়া লিখিবেন, তখন নাকি আবগারী বিভাগের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়া যাইবে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

নাটকের পাত্র-পাত্রী

বর্ত্তমান কাল

অরবিন্দ চৌধুরী—	এঞ্জিনিয়ার
অলকা চৌধুরী—	অরবিন্দের পত্নী
মিস এষা গুপ্ত—	অরবিন্দের টাইপিস্ট
নিবারণ—	অরবিন্দের ভৃত্য

অতীত কাল

অরবিন্দের কৈশোর,
প্রথম যৌবন
পরিণত যৌবন

স্থান—কলিকাতার অরবিন্দের বাড়ির দোতলার কক্ষ।
কাল—সন্ধ্যা হইতে রাত্রির প্রথম প্রহর।

অরবিন্দ চৌধুরীর বাড়ির দোতলার একটি কক্ষ; দোতলার এই ঘরটি তাহার আপসের খাস-কামরা, রাতবিরেতে কাজ করিবার দরকার হইলে, দরকার প্রায়ই হয়, এখানে সে কাজ করিয়া থাকে; নীচে পূরাদস্তর আপিস; উপরে নীচে টেলিফোনের তার অশরীরী বাণীর দৌত্য করিয়া থাকে। জানালার কাছে প্রশস্ত সেক্রেটারিয়েট-টেবিলে সবুজ কাচের গুণ্ঠনবতী বৈদ্যুৎশিখার বাতি; কাগজপত্র ছড়ানো, দেখিয়া মনে হয়, এইমাত্র সে কাজে বসিয়াছে; এক পাশে ফোনের আধার; টেবিলের সম্মুখে পুরু গদি আঁটা চেয়ার; স্বেচ্ছায় সেটাকে ঘোরানো যায়, এদিক ওদিক করা যায়; দেওয়ালের

কাছে কাচের আলমারিতে দুর্ভেদ্য মলাটের গ্রন্থরাজি; অদূরে ছোট আর একটা টেবিলে টাইপ-রাইটার যন্ত্র, পাশে চেয়ার; তিন দিকের দেওয়ালে তিনখানি বড় তৈলচিত্র; অরবিন্দের কৈশোরের, প্রথম যৌবনের ও ত্রিশের কাছাকাছি বয়সের। আপাতত অরবিন্দের বয়স ত্রিশের দুই-তিন ধাপ উত্তীর্ণ; সে চেয়ারে বসিয়া বিশ্রব্ধভাবে চেয়ার সহ এদিক ওদিক হেলিতেছে; চিক্কণ আদ্দির পাঞ্জাবি ও ধুতি পরিহিত; সে নাম-করা বিলিতী পাসের সিভিল এঞ্জিনিয়ার। বাড়িতেই আপিস, কাজ খুঁজিবার জন্য তাহাকে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের শরণাপন্ন হইতে হয় নাই; ক্লাইভ ষ্ট্রীট তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে শহরের দক্ষিণ পাড়ায় আসিয়াছে।

অরবিন্দ বিবাহিত; স্ত্রীর নাম অলকা; সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস করা মেয়ে; ডবল-বার্নিশ করা আসবাবের মত আপাদমস্তক ঝকঝকে; পেঁয়াজের মত ঝাঁজ আবার মুখরোচকও বটে; এই সব মেয়েই গৃহ-স্বারাজ্যের জবরদস্ত ডিক্টেটার হইয়া উঠে; বন্ধুরা যখন অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করে, কতদিন বিবাহ হইল, সে বলে, ভাই, হিন্দু-বিবাহের কি আরম্ভ আছে, সে একেবারে অনাদি; বিবাহের অনুষ্ঠানটা ফুল ফুটিবার মত, কিন্তু বীজ-বপন তাহার অনেক আগে।

সন্ধ্যাদীপের ক্ষণ; সুইচ-টেপা সন্ধ্যা কলিকাতার ঘরে ঘরে আবির্ভূত হইয়াছে। এমন সময়ে অরবিন্দের টেবিলের টেলিফোন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

অরবিন্দ। হ্যালো! হ্যালো! কে? আপিস! কি হয়েছে? কাল কি? কিসের কি? কিসের ডাক? ওঃ, বিলেতের ডাক। কবে? কাল? কালই? চিঠিগুলো? না, চিঠিগুলো তো তৈরি হয় নি। হ্যাঁ, জরুরি তো বটেই। আচ্ছা আচ্ছা, আমি রাত্রেই তৈরি ক'রে রাখব। হ্যাঁ দেখ—কে তুমি? অবিনাশ? শোন অবিনাশ, মিস গুপ্তকে ওপরে পাঠিয়ে দাও—এখখুনি। বুঝলে? আচ্ছা।

টেলিফোন স্বস্থানে স্থাপন

মাই গড! চারখানা চিঠি লেখা বাকি!

অলকার প্রবেশ; বাড়ির বাহির হইবার বেশভূষা; ছবি তুলিয়া লইলে একসঙ্গে শাড়ি, গহনা, জুতা, স্নো, পাউডার ও বাঙালী রমণীর স্বাস্থ্যের বিজ্ঞাপন বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়।

অলকা। কই, হ'ল?

অরবিন্দ। চারখানা তো?

অলকা। চারখানা কি হবে? দুখানা।

অরবিন্দ। দুখানা? তা হ'লে তো বাঁচি।

অলকা। বাঁচ তো ওঠ।

অরবিন্দ। কিন্তু আমাকে যে নীচে থেকে এখুনি ফোন করলে চারখানা।

অলকা। কে ফোন করলে? কি ফোন করলে?

অরবিন্দ। বিলেতের চিঠি।

অলকা। সে আবার কি?

অরবিন্দ। তা হ'লে তুমি কি বলছ?

অলকা। সিনেমার টিকিট গো।

অরবিন্দ। তাই বল।

অলকা। তোমার আজ হ'ল কি?

অরবিন্দ। কিছু এখনও হয় নি, যা হবার তা আজ রাত্রে হবে— সারারাত জেগে চারখানা চিঠি লিখতে হবে। কাল বিলেতের ডাক।

অলকা। তবে সিনেমায় যাবে কখন?

অরবিন্দ। কাল। আগামী কল্য, সন্ধ্যাবেলা, সন্ধ্যার প্রাক্কালে। নিশ্চয় যাব, দেখে নিও।

অলকা। রসিকতা রাখ—আজই যেতে হবে, আজকে না গেলে দুখানা টিকিটের দামের কত ক্ষতি হবে, বলতে পার ?

অরবিন্দ। তা যেন বুঝলাম। কিন্তু কালকের বিলেতের ডাক ফসকে গেলে কত টাকার ক্ষতি হবে বলতে পার? আট হাজার টাকা, এক পয়সা কম নয়।

অলকা। তা হ'লে ?

অরবিন্দ। তা হ'লে,—চল, আজই যাই।

অলকা। না না, তোমার অসুবিধে ক'রে কাজ নেই।

অরবিন্দ। তা হ'লে তুমি একাই ঘুরে এস—কালকে না হয় দুজনে যাব।

অলকা। এখনকার দিনে আজকের দিনকে বিশ্বাস আছে তো কালকের দিনকে বিশ্বাস নেই ;

অরবিন্দ। ওসব আবার কি কথা? যাও, তুমি ঘুরে এস।

অলকা। আমি সাত তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিলুম তুমি যাবে ভেবে—

অলকা অরবিন্দের চেয়ারের হাতলের উপর আলগাভাবে বসিল

অরবিন্দ। নাও ওঠ, দেরি ক'রো না। না না, ওখানে ব'সো না, এখনই আবার মিস গুপ্ত চিঠি লিখে নিতে আসবে।

অলকা। তা হ'লে কালকে ঠিক যাবে তো ?

অরবিন্দ। নিশ্চয়।

অলকা। আমি নিবারণকে ব'লে গেলাম, খাবার সময় তোমাকে হুঁশ ক'রে দেবে, কাজ পেলে তোমার তো ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্ঞান থাকে না।

অরবিন্দ। নিবারণ আমার অভ্যাস জানে, ও ঠিক ডেকে দেবে।

অলকা। তা হ'লে আমি আসি।

কিছুদূরে গিয়া ফিরিয়া আসিল

দেখ, একটা কথা মনে হ'ল, ব'লে যাই। মিস গুপ্তকে এখানে রাখা কি ঠিক হচ্ছে?

অরবিন্দ। এখানে মানে, কোথায়?

অলকা। আমাদের বাড়িতে।

অরবিন্দ। দেখছ তো। আমার কাজ চব্বিশ ঘণ্টার। এই দেখ আজ রাত্রে চিঠির তাগিদ প'ড়ে গেল—এখানে না থাকলে চলবে কেন?

অলকা। লোকে কি বলবে?

অরবিন্দ। এখনও তো বলে নি, বললে তখন যা হয় করা যাবে।

অলকা। বলে বইকি।

অরবিন্দ। বলে? কারা? তোমার বন্ধুরা? কই, আমার বন্ধুরা তো বলে না!

অলকা। তারা বোধ করি তোমাকে হিংসে করে?

অরবিন্দ। করে বইকি, তোমাকে বিয়ে করেছি ব'লে। শোন, ঠাট্টা নয়। বাঙালী মেয়ে, বিলিতী ফার্মে কাজ করতে দিলে বেচারার দুঃখের অন্ত থাকবে না।

অলকা। বিলিতী ফার্মে কাজ করতে দেবে কেন? কাজ তোমার কাছেই করুক—আলাদা বাড়িতে থাকুক না।

অরবিন্দ। অবিবাহিত মেয়ে আলাদা বাড়িতে থাকবে, সেটা কি স্বাস্থ্যকর? শুনেছ তো, বি. এ. পাস ক'রে যখন মাস্টারি করতে গিয়েছিল, তখন কি বিপদে পড়েছিল। তারপরে তো মাস্টারি ছেড়ে শর্টহ্যাণ্ড টাইপিং শিখলে।

অলকা। তা বটে।

অরবিন্দ। আর এখানে রাখাই তো সবচেয়ে নিরাপদ, একেবারে

স্বয়ং তোমার জিম্মা ক'রে দিয়েছি; চোরকে পাহারার কাজে লাগিয়েছি। কি বল?

অলকা। না না, ছি ছি, তুমি যে কি ভাব? আমি কি তোমাকে সন্দেহ করি?

অরবিন্দ। পুরুষের বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হতে নেই।

অলকা। আচ্ছা যাও, তুমি বড় দুষ্টু। আমি চললাম, তুমি চিঠিতে মগ্ন হও। ওই বোধ হয় মিস গুপ্ত আসছে। আমি চললাম।

অরবিন্দ। এস।

এক দ্বার দিয়া অলকার প্রস্থান, অন্য দ্বার দিয়া মিস এষা গুপ্তের প্রবেশ; অলকা যদি হয় পালোয়ারী বজরা; ধীর, স্থির, মন্দগতি, কারুকার্য্যে অলঙ্কৃতা; পালে এখনও তাহার বিংশ শতকের হাওয়া লাগে নাই; সে এখনও অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘাটে ঘাটে ঢাকাই মলমল ও মুর্শিদাবাদী রেশমের পণ্য বেসাতি করিয়া ফিরিতেছে; এষা যেন ছিপের নৌকা—সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত; শাড়িতে পোশাকে জুতায় যেটুকু না থাকিলে নয়, তাহার বেশি নাই; বিংশ শতকের দ্রুতলয়ের সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্য ঝড়ের মুখে আর্ত্ত নাবিক যেমন অতিমূল্যবান পণ্যও অনায়াসে জলে ফেলিয়া দেয়, তেমনই সে চুলের রাশি খাটো করিয়া ছাঁটিয়াছে; পুরাতন হাতীর দাঁতের রঙের গ্রীবা ঘিরিয়া কালো মেহগনি আভাসের চুলের গুচ্ছ; অতলস্পর্শী কালো চোখের করুণায় স্বল্পপরিসর জীবনের দুঃখের অভিজ্ঞতা দুটি নীলোৎপলের মত অত্যন্ত অসহায়ভাবে অসীম শূন্যতার দিকে চাহিয়া আছে; এ যেন কোন্ নিদারুণ বিধাতা ফুলের লতা দিয়া যষ্টি বানাইয়া সংসার-ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন; তাহার মুখে চোখে এমন নিরাশ্রয় ভাব বদ্ধমূল—সংসারে কেহ যে আশ্রয় পায়, ইহাই যেন তাহার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর।

মিস গুপ্ত। মিঃ চৌধুরী, ডেকেছেন?

অরবিন্দ। এই যে মিস গুপ্ত, আজ আপনার ভাগ্যে দুঃখ আছে।

মিস গুপ্ত। সে তো আছেই ; কি হয়েছে ?

অরবিন্দ। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, কাল্ বিলেতের ডাক। চারখানা চিঠি লেখা বাকি আছে।

মিস গুপ্ত। বেশ তো, আপনি ব'লে যান, আমি লিখে নিই, পরে টাইপ ক'রে রেখে দেব, কাল সকালে একবার দেখে সই ক'রে দেবেন।

অরবিন্দ। একবার লিখে পরে টাইপ করতে গেলে আপনাকে সারা রাত জাগতে হবে, তার চেয়ে বরঞ্চ আমি ব'লে যাই, আপনি টাইপ ক'রে যান।

মিস গুপ্ত। তাতেই যদি আপনার সুবিধে হয়, তাই করুন।

অরবিন্দ। আমি আপনার সুবিধের কথা ভাবছি।

মিস গুপ্ত। ওঃ, আমার সুবিধে !

অরবিন্দ। নিন, বসুন।

মিস গুপ্ত টাইপিং-মেশিনের টেবিলের কাছে বসিল ; অরবিন্দ ফাইল হইতে কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া প্রস্তুত হইল

অরবিন্দ। দুখানা চিঠি একটু বড় হবে, বাকি দুখানা ছোট। মিস গুপ্ত, আজ বোধ হয় আপনাকে খুব খাটতে হয়েছে।

মিস গুপ্ত। মোটেই নয়, সারাদিন ব'সেই ছিলাম।

অরবিন্দ। তার শোধ আজ রাত্রে উঠবে। নিন, আরম্ভ করা যাক।

To Messrs. Lovelock Bentham & Co.

অরবিন্দ যেমন বলিয়া যাইবে, মিস গুপ্ত তেমনই তেমনই টাইপ করিয়া যাইবে

তাই তো, ঠিকানা গেল কোথায় ? (কাগজপত্র ঘাঁটিয়া) তাই তো, যাকগে, ঠিকানাটা দয়া ক'রে আপিস থেকে দেখে নেবেন।

না না, এখন নয়, কাল সকালবেলা। বুঝলেন মিস গুপ্ত, ঠিকানা মনে নেই বটে, কিন্তু বাড়িটা বেশ চিনি।

মিস গুপ্ত। সে আবার কি রকম ?

অরবিন্দ। সেই যখন লণ্ডনে ছিলাম। আপনি বোধ করি মনে মনে হাসছেন, লোকটা একবার লণ্ডনে গিয়েছে, সারা জীবন তারই গল্প করবে। যাক, তা হ'লে আর বলব না।

মিস গুপ্ত। আমার মনের কথা বলবার ভারও যদি আপনি নেন, তবে আমি নিরুপায়।

অরবিন্দ। আচ্ছা, সেই ভাল। আপনিই বলুন আপনার মনের কথা।

মিস গুপ্ত। তবে শুনুন—

To Messrs. Lovelock, Bentham & Co.

Dear Sirs,

অরবিন্দ। ওটা আবার কি হ'ল ?

মিস গুপ্ত। মনের কথা।

অরবিন্দ। ও আবার কি হ'ল ? ও আবার কারও মনের কথা হয় নাকি ? ও তো আপিসের কথা।

মিস গুপ্ত। এমন যদি কেউ থাকে, যার মন আর আপিস এক হয়ে গিয়েছে !

অরবিন্দ। তবে তার সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। না না, আমি তা বলি নি, তার মানে কি না—

মিস গুপ্ত। মিঃ চৌধুরী, আজ যে বলেছেন আমার ভাগ্যে দুঃখ আছে, তা মিথ্যা নয়। কাজ শেষ হতে যত দেরি হবে, রাত জাগবার সম্ভাবনা তত বেড়ে যাবে।

অরবিন্দ। ইস, তাই তো বটে! আর বাজে কথা নয়—আরম্ভ করুন—

Dear Sirs,

I shall esteem it a great favour if you very kindly—

এই রে মাটি করেছে, ফাইলটা গেল কোথায়? এই, যে ফাইল আছে, কিন্তু আসল কাগজখানাই নেই। যাক, ভালই হ'ল—একখানা চিঠি লেখবার দায় থেকে বাঁচা গেল।

মিস গুপ্ত। অত সহজে বাঁচবেন না, আমি নীচে থেকে নিয়ে আসছি।

অরবিন্দ। বৃথা চেষ্টা মিস গুপ্ত, অবিনাশ চাবি নিয়ে চ'লে গিয়েছে।

মিস গুপ্ত। তার বাড়িতে ফোন করুন।

অরবিন্দ। বাড়িতে তার ফোন নেই।

মিস গুপ্ত। তবে চাকর পাঠান।

অরবিন্দ। অবিনাশ পয়লা থেকে বাসা বদলেছে, কেউ চেনে না। আর কোন সাজেস্‌শন আছে আপনার? নেই? যাক, বাঁচা গেল। দেখুন, আদৌ বাজে কথা বলছি না। নিন, এবারে দ্বিতীয় চিঠিখানা ধরা যাক।—

Messrs. Woodburn, Johnston & Co.,

317, Rowland St., Birmingham,

England

দেখেছেন মিস গুপ্ত, এবারে আর ঠিকানা ভুলি নি। যাক, বাজে কথা নয়।

হঠাৎ সচীৎকারে লাফাইয়া উঠিয়া

এই নিবারণ, পাজি, ছুঁচো, গুণ্ডা, ষণ্ডা, রাউণ্ডটেব্‌ল কোথাকার! আমার সব মাটি হ'ল তোর জন্যে।

নিবারণ বাড়ির পুরাতন চাকর; বয়স পঞ্চাশের উপরে; আগে বয়স জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, আমাদের ছোটলোকের আবার বয়েস কি? যেন বড়লোকেরই বয়স হয়; এখন বয়স্তত্ত্ব কিঞ্চিৎ বুঝিয়াছে, তাই বলে, দু কুড়ি দশ। গায়ে গেঞ্জি।

নিবারণ। কি হ'ল দাদাবাবু?

অরবিন্দ। কি হ'ল? তোর মাথা হ'ল আর আমার মুণ্ডু হ'ল। তোর মরণ হ'ল আর আমার শ্রাদ্ধ হ'ল।

নিবারণ। আহা-হা, ও কথা ব'লো নি।

অরবিন্দ। ব'লো নি! চেয়ে দেখ তো কি?

তখন সকলে চাহিয়া দেখিল, তৈলচিত্রগুলির অন্যতম-খানায়, অরবিন্দের কৈশোরের প্রতিকৃতির উপরে একটা বড় আরশোলা ঘুরিতেছে

অরবিন্দ। দেখছিস? খেয়ে ফেলবে যে আমাকে। তাই চাস বুঝি?

নিবারণ। ছবি খেলেই কি মানুষকে খাওয়া হয়?

অরবিন্দ। তোর মাথা হয়। রোজ বলি, ভাল ক'রে ঝাড়িস, ভাল ক'রে ঝাড়িস। বেটা ভূত। একদিন এমন জরিমানা ক'রে দোব।

নিবারণ। দাদাবাবু, ছবিখানার দাম কত?

অরবিন্দ। আড়াই হাজার টাকা।

নিবারণ। তবে তো আমাদের গ্রামসুদ্ধু পাইকারি জরিমানা না করলে দাম উঠবে না।

অরবিন্দ। যা এখন।

নিবারণের প্রস্থান

মিস গুপ্ত, আপনি আমার পাগলামি দেখে বোধ করি হাসছেন?

মিস গুপ্ত। হাসবার আর সুযোগ দিলেন কই? চাকরে মনিবে যা লাগিয়েছিলেন।

অরবিন্দ। আমার প্রিন্সিপ্‌ল কি জানেন? মাঝে মাঝে বিনা দরকারে চাকর-বাকরকে শাসিয়ে দিই, ইংরেজরা যেমন মাঝে মাঝে একটা আধটা অ্যাড্‌মিরাল বা জেনারেলকে গুলি ক'রে মেরে দেয়। ওতে বাকি সকলে সাবধান হয়ে যায়। এ প্রিন্সিপ্‌লটা বেশ কার্য্যকরী।

মিস গুপ্ত। আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, শুধু যে প্রিন্সিপ্‌লের খাতিরে আপনি চটেছিলেন, তা নয়; ও ছবিগুলোর ওপর আপনার বিশেষ দরদ আছে।

অরবিন্দ। থাক: অসম্ভব নয়, নিজের ছবি বটে তো।

মিস গুপ্ত। শুধু সেটুকু নয়। আমি অনেক সময়ে ঘরে ঢুকে দেখেছি, আপনি ছবিগুলোর দিকে চেয়ে ব'সে আছেন, যেন আপনাদের মধ্যে বিনি ভাষায় উত্তর-প্রত্যুত্তর চলছে।

অরবিন্দ। ঠিক ধরেছেন মিস গুপ্ত, আপনি ঠিক ধরেছেন। ছেলেবেলা থেকে আমি একান্ত নিঃসঙ্গ। বাপ-মা ভাই-বোন কেউ ছিল না, একলা ঘুরে বেড়াতাম; যখন সঙ্গহীন শূন্যতার চাপ অসহ্য হয়ে উঠল, তখন ক্রমে ক্রমে এই ছবিগুলো তৈরি করিয়ে নিলাম, জগৎহীন জগতের আদিম বিধাতা যেমন নির্জ্জনতার বিভীষিকা সহ্য করতে না পেরে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন—তেমনই।—এই এখানা আমার কৈশোরের ছবি, বয়স বোধ হয় তখন পনরো হবে। আর এখানা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাস ক'রে বেরোবার ঠিক পরেই। আর এইখানা বিলেত থেকে ফেরা আর বিয়ে—তার মাঝখানে তৈরি।

মিস গুপ্ত। আপনি এক সময়ে বুঝি খুব নিঃসঙ্গ ছিলেন?

অরবিন্দ। এক সময়ে কেন? এখনও রয়েছি। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল, সে বললে, আমরা সকলেই

নিঃসঙ্গ ; নিজের নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ের দ্বীপের ওপরে রবিন্‌সন ক্রুসোর মত ব্যাকুলভাবে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছি।

মিস গুপ্ত। ওটা তো কবিত্ব হ'ল।

অরবিন্দ। হ'লই তো। জানেন, এক সময়ে আমি কবিতা লিখতাম? হাসছেন? হোস্টেলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলাম।

মিস গুপ্ত। তবে কবি না হয়ে এঞ্জিনিয়ার হলেন কেন?

অরবিন্দ। নিঃসঙ্গতার মুখোশের বিভীষিকা সহ্য করতে না পেরে। কবিতাকে মনে হ'ল নিঃসঙ্গতার অ্যাবেটার। তাই পালিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি হ'লাম এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। দমাদম হাতুড়ির ঘা পড়তেই—

মিস গুপ্ত। বুঝেছি, শূন্যতার খোলস গেল ভেঙে।

অরবিন্দ। আর তা থেকে বেরিয়ে পড়ল ক্ষুধিত গরুড়। সে সঙ্গ চায়, প্রেম চায়, প্রাণ চায়, সে ক্ষুধার প্রত্যাশী। জানেন এষা দেবী, বর্ত্তমান জেনারেশনের বাঙালী-জীবনের ট্র্যাজেডি কি? আমরা জন্মেছি প্রমীলা রাজ্যের সীমান্তের ঠিক বাইরে। দেখতে পাচ্ছি সব; আভাসে ইঙ্গিতে অনেক কথাই বুঝতে পারি; মাঝে মাঝে বসন্তের উন্মনা বাতাসে আঁচলখানা গায়ে এসেও লাগে। কিন্তু ওখানে ঢোকবার পাসপোর্ট নেই। এর চেয়ে বঙ্কিমের যুগের নারী-হীন জগতে জন্মানো অনেক সুখের। বাস্তবে তারা ছিল না ব'লেই সূর্য্যমুখী, প্রফুল্ল, চঞ্চলকুমারী, ভ্রমরের সৃষ্টি তারা ক'রে নিতে পেরেছিল। কিন্তু আমাদের হয়েছে কি জানেন? মেয়েরা আমাদের জগতে আছে, কিন্তু আমাদের জীবনে নেই। তাদের সম্বন্ধে এটুকু জানি, যাতে তাদের আর মানসী ব'লে মনে করা যায় না; কিন্তু এতখানি জানি না, যাতে তারা বাস্তবিকা হয়ে উঠতে পারে। আমরা চাই সখী, পাই পত্নী—এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি জীবনে আর আছে?

মিস গুপ্ত। কেন ট্র্যাজেডি?

অরবিন্দ। সে আপনি বুঝবেন না—জুটোর স্বাদ যে আলাদা।

মিস গুপ্ত। যা পেয়েছেন, তার জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

অরবিন্দ। এষা দেবী, কোন কোন যুগ্ম জিনিস আছে, যার একটা পাওয়া আধখানা পাওয়ার সামিল নয়, না-পাওয়ার সামিল; সেসব জিনিস জোড়ায় পেলে তবেই পুরো পাওয়া। এষা দেবী,—

মিস গুপ্ত। কি?

অরবিন্দ। কিছুই না; আপনার নামটা উচ্চারণ করতে ভাল লাগে, তাই বললাম।

মিস গুপ্ত। To Messrs. Woodburn, Johnston & Co.,

অরবিন্দ। আমার মনে হয় কি জানেন, বিধাতা একটা ছাঁচে জুটো ক'রে মানুষ গ'ড়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন—একটি নর, একটি নারী; সংসারে আমরা সেই ছাঁচের দোসরকে খুঁজতে এসেছি; তা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য তো দেখি না। সে দোসর প্রধানত সখীর মধ্যে মেলে; কখনও কদাচিৎ ভাগ্যক্রমে পত্নীর মধ্যেও মিলে যাওয়া অসম্ভব নয়। আমার মিলেছে।

মিস গুপ্ত। 317, Rowland St., Birmingham,—

অরবিন্দ। কোথায় মিলেছে জানেন?

মিস গুপ্ত। Dear Sirs—

অরবিন্দ। Dear Madam!

মিস গুপ্ত। সে কি! কাকে বলছেন?

ক্রমশ

প্র. না. বি.

রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ

গত বৎসরের কয়েক সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে আমরা রবীন্দ্রনাথের লিখিত চিঠিপত্র ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে তাঁহার জীবনের কয়েকটি বিস্মৃত অধ্যায় রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং ওই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র এখনও যাঁহাদের নিকট অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে, তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে অথবা বিশ্বভারতীর সাহায্যে সেগুলির প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে যে রবীন্দ্রনাথের একটি সম্পূর্ণাঙ্গ সুষ্ঠু জীবনেতিহাস রচিত হইতে পারে, তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। সুখের বিষয়, ইতিমধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে এই কাজে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের পুরাতন চিঠিপত্রের দুইটি খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র সংগ্রহের মধ্যে 'প্রবাসী' ও 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় ত্রিপুরা-রাজবাটীর বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত পত্রগুলি, 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয়কে লিখিত পত্রাবলী, 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দত্তকে লিখিত পত্রাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্বলপুরের অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলিকে 'স্মৃতি' নাম দিয়া একটি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে সঞ্চয় করিয়াছেন। এগুলি তাঁহার নিজের ও আত্মীয়-পরিজনের ব্যবহারের জন্যই বিশেষ করিয়া মুদ্রিত, সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। এই 'স্মৃতি' পুস্তকের একটি খণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃপায় আমরা পাইয়াছিলাম এবং 'শনিবারের চিঠি'তে সেগুলি প্রকাশ করিবার অনুমতি চাহিয়া পত্র দিয়াছিলাম। তিনি নিজে দায়িত্ব না লইয়া শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি আনাইয়া দিয়াছেন। উভয়ের সৌজন্যে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। দুঃখের বিষয়, গোড়ার দিকে পত্রগুলিতে তারিখ না থাকাতে উপকরণ হিসাবে এগুলির মূল্য কিছু হ্রাস পাইয়াছে। আমরা 'স্মৃতি' হইতে বাছাই করিয়া পত্রগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতেছি। প্রসঙ্গত ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষক-হিসাবে শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের সহিত গোড়ার দিকে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন।

ওঁ

প্রীতি নমস্কার,

... ...

ফাল্গুনীতে সর্দ্দারের কাজটা ভিতরে থাকে গোপন—যারা তার দ্বারা চালিত হয় তাদের মধ্যেই সর্দ্দারের প্রকাশ—এইজন্যে সর্দ্দারকে আমি অধিকমাত্রায় নাড়াচাড়া করিনি।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় সম্ভাষণ,

যে ভাবে সর্ব্বপ্রকার ক্ষোভ প্রশান্ত করিয়া কার্য্যপ্রণালীকে পুনর্ব্বার নিষ্কণ্টক শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা ছিল অতিথি থাকা কালে তাহার অবসর পাওয়া অসম্ভব। প্রসন্ন চিত্তে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন তাহা করিবেন এ সম্বন্ধে আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন আমি তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে পারি। বোধহয় সদ্ভাব ক্ষুন্ন না করিয়া কাজ বিধিমত চালানো কঠিন নহে ইহা দেখানো সম্ভব। কিন্তু আপনারা যদি আমার শারীরিক মানসিক সমস্ত অবস্থা চিন্তা করিয়া আমাকে কিছু পরিমাণে নিষ্কৃতি দিতে পারেন তবে আমি নিরুদ্বিগ্ন হই।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার,

সুবোধের বৃহস্পতিবারের পত্র আজ পাইলাম। এতদিনে সে নিশ্চয়ই দিল্লি চলিয়া গেছে। আপনি ইতিমধ্যে দয়া করিয়া মীরাকে পড়াইবার ভার লইবেন। কেবল একঘণ্টা পড়াইলে চলিবে।

রথীরা মার্চ্চমাসে অ্যামেরিকায় রওনা হইবে। অতএব আপনি শীঘ্রই নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন। শরতের চিঠিখানা পড়িয়া দেখিয়াছেন তাহাতে যদিচ বেশি ভরসা দেয় নাই তথাপি আপনি গিয়া পড়িলে আপনাকে পরামর্শ আদির দ্বারা যথোচিত সাহায্য করিবে এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। একবার দুর্গা বলিয়া ঐ অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িবেন কি? বারম্বার হাল ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া বেড়ান আপনার পক্ষে কোনোমতেই শ্রেয় নহে। হুগলীর মায়াও আপনাকে ছাড়িতে হইবে,—অথচ এমন জায়গায় আপনাকে যাইতে হইবে যেখানে আপনার সহায় কেহ আছে। কাজ আরম্ভের দুর্গতি সহ্য করিতেই হইবে,—পশ্চিমে একটা সুবিধা এই যে খরচ কম—অল্প কিছু পাইলেই আপনার দিন চলিয়া যাইবে। তা ছাড়া ভাল আম এবং লিচু যখন খাইবেন তখন নিশ্চয়ই মনে করিবেন এ দেশে আসা আমার বিফল হইল না।

বিদ্যালয় অঞ্চলের খবর কি? কিছুদিন ত আপনি এণ্ট্রেন্স ক্লাসে ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। নিতান্তই কি নৈরাশ্যজনক? রথীদের অধ্যাপনা স্বাস্থ্য এবং সাহিত্য চর্চ্চাদি কিরূপ চলিতেছে জানাইবেন। বোটে আসিয়া বিশেষ আরাম বোধ করিতেছি। কলিকাতায় আমাকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা গ্রাস করিবার জন্য হাঁ করিয়াছিল—শরীরের গ্রন্থিতে দুই একটা থাবাও লাগাইয়াছিল—এখানে আগমন মাত্রেই সমস্ত বেদনা দূর হইয়াছে।

আকাশে মেঘ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আপনাদের ওখানে দৈবের অবস্থা কিরূপ? ইতি রবিবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

রেবাচাঁদ আর ফিরিবেন না। সুবোধ আজ রাত্রে বোলপুর যাইতেছে। অবিনাশ বসু নামক Kinder Garten ওয়ালা একটী শিক্ষক পয়লা আগষ্ট হইতে কাজ আরম্ভ করিবেন। আপাততঃ আপনারা সকলে ভাগ করিয়া কাজ করিবেন—দেখিবেন ছোট ছেলেদের মধ্যে কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা না দেখা দেয়—যথা সময়ে সমস্ত কার্য্য যথা নিয়মে সম্পন্ন হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আমাকে আজ রাত্রেই পুরী যাইতে হইবে। সেখানে আমার জমি আছে তাহা লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট গোল করিতেছে, তাহা নিষ্পত্তি করিয়া আসিতে হইবে। হয়ত আমার বোলপুব ফিরিতে আরো সপ্তাহ খানেক বিলম্ব হইতে পারে। আপনারা কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া হোরিকে এক ঘণ্টা করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ইংরেজী পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না কি? আমার শরীর মাঝে যেরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার চেয়ে ভাল আছে। আপনারা নূতন গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন কি? ইতি রবিবার

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

সিংহ তাহার বাড়িতে কালী পূজার দিনে রথী ও প্রেম সিংহকে লইয়া যাইবার জন্য ধরাধরি করিতেছে। এ প্রস্তাবে আমার উৎসাহ নাই। রথীর পড়াশোনার মধ্যে সম্প্রতি কোন প্রকার অনিয়ম ঘটিতে দিতে ইচ্ছা করি না—বিশেষত যদি দৈবাৎ সেখানে গিয়া অসুখ বিসুখ

হয় তবে মুস্কিলে পড়িতে হইবে—অতএব সাবধান থাকাই ভাল। প্রেমের পক্ষেও সকল দিক বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন তাহাই করিবেন।

সিংহের হাত দিয়া সেখানকার লাইব্রেরীর জন্য 9 Grant Duff's Mahrattas এবং Letters From A Mahratta Camp বই পাঠাইতেছি। আশাকরি সে যথা অবস্থায় আপনার হাতে তাহা দিবে। এ গ্রন্থ পড়িতে আপনার ঔৎসুক্য হইবে জানিয়াই কিনিয়াছি। পড়িবার সময়, যে সকল ঘটনা স্বতন্ত্র ভাবে কাব্যে নাটকে বা উপাখ্যানে লিখিবার যোগ্য বোধ করিবেন দাগ দিয়া রাখিবেন। সুবোধ এখনো আসিয়া পৌঁছিল না। সুবোধের সঙ্গে অচ্যুতের ফিরিবার কথা ছিল তাহার কিরূপ ব্যবস্থা হইল জানি না। এবারে ছাত্রদিগকে যাহাতে ভূগোল পড়ান হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিবেন। ভূগোল সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনভিজ্ঞতা অদ্ভুত ও হাস্যকর।

আশা করি রথী সন্তোষের পড়াশুনা অব্যাঘাতে চলিতেছে। নরেন্দ্র তাহাদিগকে জিয়োমেট্রি পড়াইতেছেন কিন্তু অ্যালজেব্রা ও পাটীগণিত বোধ হয় বন্ধ আছে।

আমি এখানে রোগতাপ লইয়া অত্যন্ত উন্মনা আছি। আমার স্ত্রীর রোগ এখনো সারিবার দিকে গিয়াছে বলিয়া বলা যায় না। রেণুকার এখনো sore throat চলিতেছে মীরা কাল জ্বরে পড়িয়াছে। কেবল শমী সম্প্রতি ভাল আছে। সে বোলপুরে যাইবার জন্য সর্ব্বদাই কাতরতা প্রকাশ করিতেছে। আমি যে কবে বোলপুরে ফিরিতে পারিব কিছুই বলিতে পারি না। ডাক্তার ছুটি চাহিতে ছিলেন—কিন্তু এখন আমার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে কোন ক্রমেই ছুটি দেওয়া চলে না—এই জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ সত্ত্বেও দিতে পারিলাম না।

হরিচরণ যে সংস্কৃত পাঠ লিখিতেছিলেন সেটা বোধ হয় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। হোরির খবরটা দিবেন। ইতি সোমবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার আবেদন খানি আমি সত্যের নিকট পাঠাইয়া দিলাম তিনি ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমাকে দীর্ঘকালের জন্য অনুপস্থিত থাকিতে হইবে এই জন্যেই বিশেষরূপে একজনের উপরেই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ভার স্থাপন করিয়া যাইতে হইল—আপনি যেরূপ আশঙ্কা করিতেছেন এ বন্দোবস্তে তাহা ঘটিবে না বলিয়া আশা করি। ক্লাসে পড়াইবার সময় অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে যথোচিত সংযত করিয়া রাখিবেন তাহাতে কোন বাধা নাই, ক্লাসের বাহিরে তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব একজনের উপরে থাকাই সঙ্গত—নতুবা কার্য্য প্রণালীর ঐক্য রক্ষা হয় না। ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও সংস্কার স্বভাবতই বিভিন্ন—সেইজন্য বৃহৎ কার্য্যে নিয়মের অধীন থাকিলে অধ্যাপকদের মধ্যে বাধ বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কর্ত্তব্য বিধির সহিত পরস্পর সৌহার্দ্দ্যের কোন সংঘাত হওয়া উচিত নহে।

আমি ১২ই মাঘ মেলে যাইব। আপনাদের গল্পগুলি শুনা যাইবে। আমি পণ্ডিত মহাশয় ও সতীশকে গুটি কয়েক গল্পের প্লট দিয়া গল্প লিখাইয়াছি।

রেণুকা কলিকাতায় আসিয়াছে। ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা লইয়া ব্যস্ত আছি। মীরার পড়াশুনা বোধহয় পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। হোরি চলিয়া আসায় আপনাদের

অনেকটা অবকাশ ঘটিবে। আমার সঙ্গে কয়েকটী ছাত্র যাইবে। তাহার মধ্যে A. M. Bose এর ছেলে একটি।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নিবেদন সম্ভাষণ মেতৎ,

আপনার চিঠি পাইয়া বড় আনন্দিত হইলাম। এখানে আমার উদ্বেগের কারণ দূর হয় নাই। যদিও স্ত্রীর অন্যান্য উপসর্গ শান্ত হইয়াছে তথাপি দুর্ব্বলতা এত অতিমাত্রায় বাড়িয়াছে যে আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কুঞ্জবাবু শীঘ্রই বোলপুরে যাইবেন। আশা করিতেছি তাঁহার নিকট হইতে নানাবিষয়ে সাহায্য পাইবেন। অধ্যাপন কার্য্যেও তিনি আপনাদের সহায় হইতে পারিবেন। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইতে উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে যত লোকের নিকট হইতে সন্ধান লইয়াছি সকলেই একবাক্যে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত করিয়া ইঁহাকে লিখিয়াছিলাম। সেই লেখা আপনারাও পড়িয়া দেখিবেন যাহাতে তদনুসারে ইনি চলিতে পারেন আপনারা ইঁহাকে সেইরূপ সাহায্য করিবেন।

বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব ভার আমি আপনাদের তিন জনের উপর দিলাম—আপনি, জগদানন্দ ও সুবোধ। এই অধ্যক্ষ সমিতির সভাপতি আপনি ও কার্য্য সম্পাদক কুঞ্জবাবু। হিসাবপত্র তিনি আপনাদের দ্বারা পাশ করাইয়া লইবেন এবং সকল কাজেই আপনাদের

নির্দ্দেশমত চলিবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মাবলী তাঁহাকে লিখিয়া দিয়াছি আপনারা তাহা দেখিয়া লইবেন। নিয়মগুলির যেরূপ পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করেন আমাকে জানাইতে সংকোচ করিবেন না।

রামকান্ত বাবুর ছেলে গেছেন আমি জানি। কুঞ্জবাবুর সঙ্গেও দুই একটি ছেলে যাইবে—ইহারাও বেতন দিবে।

অচ্যুতের আসা সম্বন্ধে আমি সন্দেহ করি। অক্ষয় বাবু বোধহয় বিরক্ত হইয়াছেন।

রথীদের কৃষ্ণনগরে পরীক্ষা দেওয়াই স্থির করিবেন। এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য করিবেন। আপনার Reader অগ্রসর হইয়াছে শুনিয়া বড়ই খুসি হইলাম। কপি করিয়া আমাকে পাঠাইলে আমার মন্তব্য জানাইতে চেষ্টা করিব।

ঐতিহাসিক পাঠও আপনাকে লিখিতে হইবে। যখন অবসর পান ইহাতে হাত দিবেন। ইংরাজের ভারতবর্ষ অধিকার সম্বন্ধে একটি যথার্থ ইতিহাস ছেলেদের জন্য লেখা আবশ্যক। British India নামক একটি চটি বই পাইয়াছি তাহা অবলম্বন করিলে লেখা সহজ হইবে।

এখনি ডাক্তারের বাড়ী যাইতে হইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি লিখিয়া বিদায় হইতেছি। শুনিলাম কুঞ্জঠাকুর একলা কাজ করিতে অক্ষমতা জানাইয়াছে। যথার্থ অবস্থা এবং কি করা কর্ত্তব্য আমাকে জানাইবেন। পূর্ব্বে রান্নাঘরে শরৎ নামক যে চাকর কাজ করিত বোধহয় এখন তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে—যদি তাহাকে রাখিলে কাজের সুবিধা বোধ করেন তবে রবিসিংহকে পত্র লিখিয়া তাহাকে আনাইয়া লইবেন। ইতি

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

জগদানন্দ রেমিটেণ্ট জ্বরে শয্যাগত। সুবোধ তাহার কন্যার পীড়ায় আবদ্ধ। এই সকল আশঙ্কাতেই আমি পূজার সময় বিদ্যালয় বন্ধ রাখিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলাম। যাহা হউক এখন কি করিয়া সেখানকার কাজ চলিবে ভাবিয়া পাইতেছি না। পণ্ডিত মহাশয় নানা অনুনয় করিয়া স্বদেশ হইতে তাঁহার পরিজনদের কলিকাতায় আনিতে গেছেন। সপ্তাহের মধ্যে ফিরিবার কথা আছে—কিন্তু আমার মনে সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বাড়ীতে ব্যাম লইয়া আমি নড়িতে পারিতেছি না। ইহাতে আমার মনে অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। সমস্ত যেন খেলার মত বোধ হইতেছে। সুবোধ যদি এখনও না আসিয়া থাকে তাহাকে একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিবেন। নরেন্দ্রও কি আসেন নি? তাঁহাকেও তাড়া দিবেন। এণ্ট্রেন্স ক্লাসের অঙ্কের কি গতি হইবে? রেমিটেণ্ট জ্বর সারিতে কতদিন লাগিবে এবং তাহার পরে বললাভ করিতেও কতদিন বিলম্ব হইবে কিছুই বলা যায় না—তাহার পরে ফিরিয়া আসিয়াও দীর্ঘকাল জগদানন্দ পূরা কাজ করিতে পারিবেন না এবং মাঝে মাঝে জ্বরেও পড়িবেন তাহাতে সন্দেহ নাই—এজন্য আমি বারম্বার তাঁহার কাছে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছি কিন্তু সমস্ত নিষ্ফল হইয়াছে। আমি ঠিকা লোকের চেষ্টায় রহিলাম কিন্তু উভয়ের বেতন বহন করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইবে—অতএব জগদানন্দ যে পর্য্যন্ত না আরাম হন ও পূরা কাজ করিবার বললাভ করেন ততদিন তাঁহাকে ক্ষতি স্বীকার করিতেই হইবে। ইতিমধ্যে আপনারা মিলিয়া, রথীদের অঙ্কচর্চ্চায় যাহাতে ব্যাঘাত না হয় সে চেষ্টা করিবেন। শিক্ষকাভাবে আজকাল ছেলেদের অনেকটা সময় হাতে থাকিবে—

বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন যাহাতে নষ্ট হইবার দিকে না যায়। রথীকে আপনার ঘরে শুতে দিবেন—তাহাকে প্রেম প্রভৃতির সঙ্গ হইতে দূরে রাখিবেন এবং সর্ব্বপ্রকার নিয়ম রক্ষায় বিশেষরূপে ব্রতী করিবেন। ছাত্রদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন শৈথিল্য ঘটিতে দিবেন না। আমি জানি আপনি এ সকল বিষয়ে উদাসীন নহেন তথাপি একান্ত উদ্বেগবশত আপনাকে লিখিলাম। এই অরাজকতার সময়টুকু আপনাকে বিশেষ সচেষ্ট ও সতর্কভাবে চালাইতে হইবে। ইতি বৃহস্পতিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

নমস্কার সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন,

অদ্য আপনার পত্র পাইলাম। আপনি যেরূপ ছুটী ইচ্ছা করিয়াছেন সেইরূপ লইবেন। এ পত্র যথা সময়ে পৌঁছিবে কিনা জানি না। যে যে magazines বিলাত হইতে আনাইবার কথা ছিল তাহার তালিকা সুবোধ আজও আমাকে পাঠাইল না—সেইজন্য এ পর্য্যন্ত সেগুলি আনাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। ইতি, ৩২শে আষাঢ়। ১৩০৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দু সমাজ বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবেনা। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয় যদি কুঞ্জবাবুকে নিয়মিত অধ্যাপনার কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। তিনি যদি আহারাদির তত্ত্বাবধানেই বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকেন তবে ছাত্রদের সহিত তাঁহার গুরুশিষ্য সম্বন্ধ থাকে না। ব্রাহ্মণেতর ছাত্রেরা কি অব্রাহ্মণ গুরুর পাদস্পর্শ করিতে পারে না?

আমি আগামী সোমবারে প্রাতের ট্রেনে বোলপুরে যাইব। আপনার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইতি ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩০৯

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

আমি কয়েকদিন আপনাদের সংবাদ লইবার জন্য উৎসুক ছিলাম—কিন্তু সময় পাই নাই—কয়েকদিন নিয়ম রচনায় ব্যস্ত ছিলাম। সকল বিষয়েই পাকাপাকি নিয়ম না করিলে ক্রমশঃ শৈথিল্যের দিকে যাইবে—বিশেষত আমার অনুপস্থিতি কালে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। আমি শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথকে সকল বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দিয়া অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি তিনি যেরূপ বিধান করিয়া দিবেন তাহাই সকলে সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলিলে শৃঙ্খলা রক্ষা হইবে। এখন হইতে প্রত্যেকের প্রত্যেক কাজ বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এবার শান্তিনিকেতনে আসিবার সময় আপনি এবং জগদানন্দ আপনাদের বিছানা ও ভোজন পাত্র সঙ্গে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিবেন। নরেন্দ্রনাথ কাল টেলিগ্রাফ পাইয়া চলিয়া গেছেন। বোধ করি কাজ পাইয়াছেন। তাহার স্থান শূন্য রাখিলাম। সুবোধ এখনো আসিয়া পৌঁছেন নাই—কাল সকালে আসিতেও পারেন।

হিসাব করিয়া দেখিলাম, ব্যাঙ্কে এখন আমার একবৎসরেরও সঙ্গতি নাই—বৎসর শেষে বোধ হয় অনেক টাকা অনটন পড়িবে অতএব এবারকার মত আপনার ঘর যদি না করি মাপ করিবেন—শুনিয়াছি আপনার ভাই এখনো দেশ ছাড়িবার কোনও ব্যবস্থা করেন নাই, অতএব এখন আপনার তেমন বেশি তাগিদ নাই। পূর্ব্বদিকে যে ভিত পত্তন করা হইয়াছে তাহার উপরে ল্যাবরেটরি ঘর তৈরী করিব, যতদিন না যন্ত্রাদি

সংগ্রহ হয় ততদিন কুঞ্জবাবু সপরিজনে সেখানে আশ্রয় লইবেন তাহার পরে তিনি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবেন—কাজ লইবার সময়েই তিনি বাসস্থানের কথা বলিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। এখন তাঁহাকে অসুবিধায় ফেলা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। আমি নিজের লেখাপড়ার জন্য একটি নিভৃত ঘর তৈরী করার সংকল্প করিয়াছিলাম তাহাও আপাতত স্থগিত রাখিয়াছি, যদি অর্থের সচ্ছলতা ঘটে তবে দেখা যাইবে। নরেন যদি না আসেন, তবে আপনি ও জগদানন্দ মাঝের ঘরে স্থান লইবেন, আমাকে আপনার ঘরটি ছাড়িয়া দিতে হইবে নতুবা আমার লেখা একেবারে বন্ধ। সে ঘরে দিনের বেলায় আমি কাজ করিব—রাত্রে যাহার খুসি শয়ন করিতে পারিবেন।

আপনারা কৃষ্ণনগরে স্বাস্থ্যকর স্থান পাইয়াছেন শুনিয়া খুসী হইলাম। জগদানন্দের যত্নে নিশ্চয়ই সেখানে আপনাদের কোন অভাব নাই। বোধহয় আহারাদি সম্বন্ধে নিতান্ত তপস্বীর ন্যায় আপনাদিগকে কাল যাপন করিতে হইতেছে না। ফিরিবার সময় কিছু নবদ্বীপের খইয়ের মোওয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন—শান্তিনিকেতনে আমাদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে। কৃষ্ণনগরের বাজারে এখানকার বিদ্যালয়ে ব্যবহার যোগ্য সোনামুগ প্রভৃতি কোন আহার্য্য দ্রব্য যদি শস্তা পাওয়া যায় মনে করেন (বিপিনকে বলিলেই সে সন্ধান লইবে) তবে এখানকার জন্য, যে পরিমাণ আপনাদের লাগেজের সঙ্গে সহজে আসিতে পারে লইয়া আসিবেন মূল্য এখানে হিসাব করিয়া লইলেই হইবে। আমি শুক্রবার প্রাতের মেলে কলিকাতায় যাইব—আমার ভৃত্যটিকে যথাসময়ে মুক্তিদান করিবেন। ইতি ২৯শে পৌষ ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংবাদ-সাহিত্য

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে মেদিনীপুরের স্থান অতি উচ্চে। বিগত অসহযোগ-যজ্ঞে যে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা লইয়া মেদিনীপুর আত্মাহুতি দিয়াছিল, সমগ্র দেশে এখনও তাহা বিস্ময়ের বিষয় হইয়া আছে। কোনও প্রকার লাঞ্ছনা ও পীড়নেই এই জেলার দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা দমে নাই; তাহাদের ঘরবাড়ি এবং সঞ্চিত শস্য প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হইয়াছিল, অনেকে অনাবশ্যক অপঘাত-মৃত্যু বরণ করিয়াছিল, দলে দলে কারাবরণ করিতে এই অঞ্চলের অশিক্ষিত অধিবাসীরাও দ্বিধা করে নাই। মোটের উপর, অসহ্য পীড়ন-লাঞ্ছনার মধ্যেও এখানে যে অদম্য প্রাণশক্তির প্রকাশ দেখা গিয়াছিল, তাহাতে ইহারা উচ্চনীচ সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

মেদিনীপুরের সেই অঞ্চল আজ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে; দক্ষিণের আরও অনেক স্থানেরই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, কিন্তু মেদিনীপুরের তুলনায় সে দুর্দ্দশা কম। মেদিনীপুরের ক্ষতির পরিমাণ অবিশ্বাস্য রকমের বেশি; সরকারী হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, মানুষ ও গবাদি পশু লইয়া এখানে লক্ষাধিক প্রাণী হত্যা হইয়াছে, সাত লক্ষেরও উপর বাসগৃহ ধ্বংস হইয়াছে। মারওয়াড়ী সাহায্য সমিতির হিসাবে নিহত মানুষেরই সংখ্যা চল্লিশ হাজার। মেদিনীপুরের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধাকে কৃপা ও করুণায় পর্য্যবসিত করিবার সাধু চেষ্টা দেশের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে; সাময়িক পত্রে মুহুর্মুহু আবেদন-নিবেদন প্রচারিত হইতেছে; দেশের যাবতীয় আর্ত্তত্রাণ-প্রতিষ্ঠান মেদিনীপুরের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়াছেন। আশা করা যাইতেছে, বিপন্নেরা সাময়িকভাবে কিছু সাহায্য পাইবেন।

সুখের বিষয়, সরকারী রোষও মাত্র আঠারো দিনের মধ্যেই দয়ার আকারে দেখা দিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের মেদিনীপুর-প্রীতি ইহার জন্য কতখানি দায়ী বলিতে পারি না; শাসনবিভাগের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ প্রারম্ভে যে নীরবতাজনিত শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তো আমরা হতাশই হইয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, সরকারী, আধাসরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি একযোগে কাজ করিতেছেন; স্বয়ং বাংলার লাট বাহাদুর বিমানযোগে বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া সংবাদপত্র ও বেতারযোগে জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন; দেশের সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই মেদিনীপুর সম্বন্ধে সচকিত হইয়াছেন।

কিন্তু বিগত ত্রিশ বৎসরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে বাংলা দেশে যে সকল ব্যক্তি জনসেবা ও আর্ত্তত্রাণ কার্য্যে দক্ষ ও অগ্রণী ছিলেন, এই ব্যাপারে তাঁহাদের কাহারও নামোল্লেখ দেখিতেছি না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র পীড়িত, সুভাষচন্দ্র দেশছাড়া—ইহাদের কথা ধরিতেছি না। কিন্তু প্রধান প্রধান কর্ম্মী যাঁহারা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এবং কলিকাতার ও মেদিনীপুরের অসংখ্য কর্ম্মীসম্প্রদায় আজ কারারুদ্ধ অথবা রাজরোষে নজরবন্দী হইয়া অবস্থান করিতেছেন; শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেনের নেতৃত্বেও কোনও কর্ম্মীসঙ্ঘকে দেখা যাইতেছে না। মেদিনীপুরের দুর্ভাগ্যের উপর ইহাকেই চরম দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে হইতেছে; বাংলা সরকার কি সাময়িকভাবে এই সকল বন্দীকে মুক্তি দিয়া মেদিনীপুরের আর্ত্তত্রাণ কার্য্য সহজ ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না? আমরা যাঁহাদের কথা উল্লেখ করিতেছি, তাঁহারা কেহই হিংসামনোবৃত্তিসম্পন্ন নহেন, সকলেই অহিংস সেবাধর্ম্মী, এবং মুক্তি পাইলে ইহাদের কাহারও নিরুদ্দিষ্ট অথবা পলায়নপর হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। সমগ্র দেশ ইহাদের হইয়া সরকারের নিকট জামিন হইতে পারে।

বাহিরের সাহায্য বেশি বা কম যাহাই হউক, মেদিনীপুরের এই অঞ্চলের অধিবাসী যাঁহারা আজিও জীবিত আছেন, তাঁহাদের দেহশক্তি ও প্রাণশক্তির উপর আমরা আস্থাবান ও শ্রদ্ধাবান; আমরা জানি এই ভয়াবহ বিপর্য্যয়ের আকস্মিকতায় তাঁহারা সাময়িকভাবে বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হইলেও অচিরকাল মধ্যে মানুষ হিসাবে প্রকৃতির এই আক্রমণের ঊর্দ্ধে তাঁহারা উঠিতে পারিবেন; যে আদিম দ্বন্দ্ব তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে যুগে যুগে করিয়া আসিয়াছেন, তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা ইঁহাদের রক্তের মধ্যেই আছে; সাময়িকভাবে আরাম ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে ইঁহারা হয়তো সে কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন; আমাদের বিশ্বাস, চিরপুরাতন শক্তি আবার নবভাবে স্ফুরিত হইয়া ইঁহাদিগকে প্রকৃতির সকল বিরুদ্ধতার মধ্যেই ঘর বাঁধিবার ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ক্ষমতা দান করিবে। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত শুধু বাহিরের সাহায্য আবশ্যক। মেদিনীপুরবাসীরাই মেদিনীপুরকে নব জীবন দান করিবেন; এই মহৎ কার্য্যে উপলক্ষ্য মাত্র হইবার সৌভাগ্য আমরা ছাড়িব কেন?

—•

কলিকাতার হালসিবাগানে শ্যামাপূজা উপলক্ষ্যে যে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা সকলেই মুহ্যমান হইয়াছি। সিরাজউদ্দৌলার আদেশে অনুষ্ঠিত অন্ধকূপহত্যার কাহিনী যদি সত্যও হয়, তাহা হইলেও আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, তাহাও হালসিবাগানের হত্যাকাণ্ডের মত শোচনীয় নয়। দিবা দ্বিপ্রহরে অসংখ্য পুরুষজনতার এবং এক দল খ্যাতনামা ব্যায়ামবীরের চোখের সম্মুখে এক দল নিরীহ শিশু ও নারী সামিয়ানা চাপা অবস্থায় পুড়িয়া মরিল, সংবাদপত্রে চিত্রসহযোগে বিঘোষিত না হইলে এ সংবাদ বিশ্বাসই করিতাম না। উদ্যোক্তাদের অথবা দর্শকদের কাহারও উপর দোষারোপ করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই, কিন্তু এই বাঙালী জাতির একজন হইয়া লজ্জা ও কলঙ্কের হাত হইতে আপনাকে মুক্তি দিতে পারিতেছি কই?

যদি শুনিতে পাইতাম, বিপন্নদের সাহায্য করিতে কয়েকজন বাঙালী পুরুষ দগ্ধ হইয়া হতাহত হইয়াছে, তাহা হইলেও কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতাম। এই অবিশ্বাস্য ভীরুতা ও কাপুরুষতার কথা কাপুরুষের জাতি হইয়াও বরদাস্ত করিতে পারিতেছি না। মনে হইতেছে, বেড়াজালে বন্দী অবস্থায় দগ্ধ ও নিশ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিতে মরিতে এই সকল নারী ও শিশু যে অসহায় ও করুণ আর্ত্তনাদ তুলিয়াছিল, বাঙালী জাতির ইতিহাসে তাহা চির অভিশাপের কলঙ্করেখায় কালো হইয়া রহিল। এই কলঙ্ক শত শত বাঙালী বীরের পরার্থে আত্মোৎসর্গে ক্ষালিত হইতে পারে; কিন্তু হায়, সেই বীরেরা আজ কোথায়?

* * *

ভবিষ্যতে ন্যায় ও শৃঙ্খলারক্ষী কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই সাবধান হইবেন; যথোচিত সতর্কতা অবলম্বিত না হইলে সহজদাহ্য পদার্থে নির্ম্মিত মণ্ডপে জনতা আর সমবেত হইতে পারিবে না; স্বেচ্ছাসেবক এবং অগ্নিনির্ব্বাপক দল এই জাতীয় ব্যাপারে অতঃপর প্রস্তুত হইয়া হাজির থাকিবেন—এ সকলই না হয় বুঝিলাম এবং আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করিতেছি, এই সকল সার্ব্বজনীন পূজার সার্থকতা কোথায়? তিনটি সার্ব্বজনীন পূজার সম্পাদকত্রয় যদিও সংবাদ-পত্রে প্রতিবাদ তুলিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও আমরা বলিব, সার্ব্বজনীন পূজাও তো এই। কয়েকজন ক্ষমতাপন্ন অথবা ক্ষমতালোভী ব্যক্তি আরও বহুবিধলোভের বশবর্ত্তী হইয়া দেশের অশিক্ষিত জনতাকে, বিশেষ করিয়া নারী-জনতাকে, আকর্ষণ করিবার জন্য যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়া ব্যক্তিগত অথবা পাড়াগত পূজাকে সার্ব্বজনীন করিয়া তুলেন, এ ক্ষেত্রেও তো ঠিক তাহাই করা হইয়াছিল। এই সকল সার্ব্বজনীন পূজা দেশের কোনও কল্যাণ ডাকিয়া আনে কি? দেশের শিল্পসম্ভার এগুলির সাহায্যে প্রচারিত হইবার বিন্দুমাত্র সুযোগ লাভ করে কি? স্বদেশীযুগে স্বদেশীমেলার সাহায্যে যে কার্য্যের সূত্রপাত্র হইয়াছিল, আধুনিক সার্ব্বজনীন পূজায় সে আদর্শ কুত্রাপি অনুসৃত হয় না। যাহা হয়, তাহা আমাদের কলঙ্কের কাহিনী। যাঁহারা এগুলি পরিদর্শন করিবার সুযোগ

পাইয়াছেন, তাহারাই এই সকল কলঙ্কের কথা অবগত আছেন ; প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

নিজের বাড়িতে ব্যক্তিগত পূজার অধিকার সকলেরই আছে ; যাহাদের তাহা করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা প্রতিবেশীর পূজায় যোগদান করিয়া শাস্ত্রসম্মত ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে, কিন্তু পূজামণ্ডপকে বারোয়ারি মাইফেল-আড্ডায় পরিণত করিবার এই যে আধুনিক প্রবৃত্তি, ইহা অতিশয় হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। সরস্বতী পূজার সময় কলিকাতায় এবং দেখাদেখি অন্যত্র এই চাঞ্চল্য অতিমাত্রায় প্রকাশ পায়। দেশের যুবসম্প্রদায় এই উপলক্ষ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া যে অর্থ ও শক্তি অকারণে ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা কোনও সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইলে আমাদের কলঙ্কের ইতিহাস আরও কম দীর্ঘ হইত। প্রাচীন জমিদার-বাড়িতে যাহা শোভন ছিল, যৌথভাবে তাহারই অনুকরণ যে লজ্জার বিষয়, তাহা ইহারা কবে বুঝিবেন ?

* * *

হালসিবাগানের ঘটনায় আরও একটি বিষয়ে জনসাধারণের চিন্তিত হইবার কারণ আছে। বাংলা দেশের স্থানে স্থানে যে মারাত্মক গুরুবাদ প্রচার ও প্রসার লাভ করিতেছে, সে সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। গুরুরূপ অগ্নিশিখার আকর্ষণে বহু পতঙ্গ আকৃষ্ট হইয়া এরূপ প্রত্যক্ষভাবে এবং অত্যল্পকালে না হউক, ভিতরে ভিতরে এবং ধীরে ধীরে দগ্ধ হইয়া সংসার-পরিজনকেও যে দগ্ধ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত বাংলা দেশে মোটেই বিরল নয়। এরূপ দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। এই ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতেও একজন তথাকথিত গুরুর আকর্ষণ আছে শুনা যাইতেছে। স্ত্রী ও শিশুসন্তানদের হত্যাযজ্ঞে পুরুষদের অনুপস্থিতির ইহাও একটা কারণ নয় তো ? মোটের উপর নানা দিক দিয়া আমাদের সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে।

—

শুধু যে সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙালীর অধোগতি দেখা দিয়াছে, তাহা

নহে ; আমরা ধীরে ধীরে সমাজহীন হইয়া জাতিগতভাবে দিন দিন মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছি। পল্লীজীবনে যাহা সম্ভব ছিল, নাগরিক জীবনে নানা কারণে সমাজপ্রধানদের সেই আধিপত্য আর টিঁকিতেছে না। ফলে নানাবিধ সামাজিক অনাচার আমাদের চোখের উপর অনুষ্ঠিত হইলেও আমরা প্রতিকার করিতে পারিতেছি না। কলিকাতার বাঙালী সমাজে অধুনা বেশ্যাবিবাহের প্রচলন এই সকল অনাচারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; ইহার রেওয়াজ প্রতিদিন প্রবল হইয়াই চলিয়াছে। বেশ্যা লইয়া বসবাস আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও করিতেন, কিন্তু সে গ্রামের বা নগরের প্রত্যন্তভাগে। ঠিক সমাজের বুকের উপর এই সম্প্রদায়কে সহধর্ম্মিণীর মর্য্যাদা দিয়া ভবিষ্যৎ-বংশধরদের জননী করিয়া তুলিবার মত সাহস ভূতপূর্ব্ব দুর্দ্দান্ত হুঁদে জমিদাররাও দেখাইতে পারেন নাই। দস্যু রত্নাকর কবি ও ঋষি বাল্মীকি হইতে পারে, ইহা আমরা কেহই অস্বীকার করি না; কিন্তু এরূপ ঘটনা মুহুর্মুহু ঘটিতে থাকিলে বহু রামায়ণের ঠেলায় আমাদিগকে বিপন্ন হইতে হইবে বইকি!

* * *

এই জাতীয় বিবাহের ফলে যে সকল সামাজিক সমস্যা দেখা দিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও দেখা দিবে, সমাজবিদেরা সে সম্বন্ধে এখনও অবহিত হন নাই। আর অবহিত হইলেই বা কি? দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধির মত ইহা আমাদের সমাজদেহে এমন দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করিতেছে যে, ইহা লইয়া লোকে আর বিস্ময়ও অনুভব করে না; সংবাদপত্রে ইহার সংবাদ ঘটা করিয়া বিবৃত হয়; নিতান্ত নিরীহ সামাজিক জীবেরাও ইহার তারিফ করে। মিস পাঁচুবালা, শ্রীমতী পাঞ্চালী দাসীতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া একদিন শ্রীমতী পাঞ্চালী দেবী হন এবং পরে যখন মৈত্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেব অথবা মিত্র হইয়া সমাজের অঙ্কে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হন, মৈত্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেব অথবা মিত্র সম্প্রদায়ের তখন আর আপত্তি করিবার পথ থাকে না। ব্যক্তিগতভাবে এই সকল সমাজসংস্কারকামীরা যতই প্রশংসার যোগ্য হউন ; মূঢ় অশিক্ষিত সমাজকে তাঁহারা দুর্ব্বলই করিয়া তুলেন।

সহধর্ম্মিণী হইবার জন্য সমাজে থাকিয়া যাঁহারা আশৈশব কৃচ্ছ্র সাধন করেন এবং সমাজে সহধর্ম্মিণীর সম্মান লাভ করিয়া অনেক অভাব ও অসুবিধাকে যাঁহারা তুচ্ছ করিয়া থাকেন, এই সকল ঘটনার ফলে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বিচলিত হন। ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি তাঁহাদের অনাস্থা জন্মে এবং তাঁহারাই অভিভাবকদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অভিনেত্রী হইবার জন্য আবেদন করেন। এরূপ বহু ঘরোয়া আবেদনপত্র বন্ধুবান্ধবদের কৃপায় আমরা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। শুধু আর্থিক অনটন এগুলির কারণ নহে; এরূপ আচরণের মূলে এই বিশ্বাসও আছে যে, একদা কোনও সহৃদয় সহকর্ম্মীর অঙ্কশায়িনী হইতে হইতে সহধর্ম্মিণীর গৌরবও অর্জ্জন করা চলিবে।

* * *

সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া যে ভাঙাগড়া চলিতেছে, তাহাতে এই সকল ব্যাপারের প্রতিবাদও শোভন হইতেছে কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। তবে অস্বীকার করিতে পারিব না, পুরাতন বুদ্ধি ও সংস্কার লইয়া বিচার করিতে বসিয়া এগুলি আমাদের ভাল লাগিতেছে না। পৃথিবীর আদিকাল হইতে বহু অনাচার ও ব্যভিচারকে মন্থন করিয়া সমাজধর্ম্মনীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু পরিবর্ত্তনের জন্য দুঃখভোগ ও কৃচ্ছ্রসাধন আবশ্যক। কেবলমাত্র লালসা, অমিতাচার ও ভোগের মধ্য দিয়া কোনও মহৎ পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। এখন যাহা ঘটিতেছে, তাহা সামান্য ভোগেরই প্রকাশ, ত্যাগের অগ্নিশুদ্ধি ইহাতে নাই। যাঁহাদের আছে, তাঁহারা নমস্য; কিন্তু আমাদের চারিদিকে বর্ত্তমানে যাহা দেখিতেছি, তাহা চিন্তালেশহীন সমাজবোধশূন্য স্বার্থপরদের সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত অনাচার মাত্র। বৃহত্তর সমাজে এই সকল সাময়িক ব্যাপারের প্রভাব যদি সাময়িক হইত, তাহা হইলে ইহা লইয়া বিচলিত হইবার কারণ ছিল না; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই সকল ঘটনার প্রভাবে বৃহত্তর সমাজে দিনে দিনে শৈথিল্য আসিতেছে; সকলেই গা বাঁচাইয়া চলিতে চাহিতেছেন বলিয়া এই সকল সমস্যার উল্লেখও কেহ করিতেছেন না। যুগান্তর ঘটিবার

পূর্ব্বে এ সম্বন্ধেও যদি আমরা সচেতন থাকি, তাহা হইলে পরবর্ত্তী যে যুগ আসিতেছে, সে যুগে পাপ করিলেও আমরা সজ্ঞানে করিব।

বাংলা দেশে এই বৎসরে মা সরস্বতীর মাতা শ্রীশ্রীদশভুজার পূজা-উপলক্ষ্যে "শারদীয়া সংখ্যা" নামে আখ্যাত যে সকল পত্র-পত্রিকা নির্গত হইয়াছে, দীর্ঘ পূজাবকাশে সেগুলির পঠন-পাঠনের সুযোগ পাইয়া খুব যে কৃতজ্ঞ হইয়াছি, সে কথা বলিতে পারিব না। স্বাদহীন ভোজ্যের এই বিপুল সম্ভার নিপুণ পরিবেশনেও স্বাদহীন ঠেকিয়াছে। গো-দুগ্ধ বিষয়ে ফুকা-বিরোধী আন্দোলন বর্ত্তমানে স্তব্ধ হইয়াছে; আন্দোলনকারীরা যদি সাহিত্য-গাভীদের প্রতি অত্যাচার নিবারণে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই। গো-জাতীয় মাত্রেই গোময় প্রসব করিয়া থাকে; বাঙালী মাত্রেই চেষ্টা করিলে সাহিত্য-গোবরের জনয়িতা হইতে পারে, ইহার প্রমাণ এই পত্র-পত্রিকাগুলিতে প্রচুর মিলিয়াছে। এই গোবর ঘর-লেপার কাজে ব্যবহার হইবে না বটে, কিন্তু ঘুঁটেস্বরূপ জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এগুলির ইহাই সার্থকতা। বিশেষ করিয়া ঢাউস কাগজগুলি এই ভাবেই সার্থক হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু সাদা কাগজের এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে ইহাতেও আনন্দ করিবার কারণ নাই; অনেক প্রয়োজনীয় ব্যাপারের কণ্ঠরোধ করিয়া এই যে বিরাট অপচয় সারা দেশ জুড়িয়া ঘটিয়া গেল, দেশ স্বাধীন হইলে তাহা নিশ্চয়ই ঘটিত না। ছাপাখানার লাভালাভ আমরা হিসাবের মধ্যে ধরিতেছি না, কারণ ছাপাখানাকে বাঁচানোর চাইতে কাগজ বাঁচানোকেই এখন দেশের পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে। পত্র-পত্রিকাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া ক্রেতারা যে আনন্দ পাইয়াছেন বা পাইতে পারেন, এরূপ বোধ হইল না; মনে হইল, সাধারণ মানুষের বাৎসরিক অভ্যাসযজ্ঞে দেশের বেশ কিছু পরিমাণ "গুড মনি" আহুতি দেওয়া হইল।

নিজেরা পত্র-পত্রিকার কারবারী হইয়াও বহু দুঃখে এই সকল কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। অধুনা বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটিতেছে না; অন্তত ছত্রিশটি কাগজের শারদীয়া সংখ্যা ঘাঁটিয়া উল্লেখযোগ্য কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। যাঁহারা সত্যকার দুগ্ধপ্রসূ গাভী, ফুকার জ্বালায় যে বস্তু তাঁহাদের বাঁট-নিস্থত হইয়াছে, তাহা আর যাহাই হউক, দুগ্ধ বলিয়া আত্মীয়বান্ধবকে পান করিতে দেওয়া চলে না। আমাদের দুঃখ এবং অনুযোগ ইহাদিগকে লইয়াই। বাংলা দেশে সত্যকার সাহিত্যিক প্রতিভা লইয়া এই যুগে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের গৌরবময় উত্তরাধিকারের দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। সাধনা নাই, অধ্যবসায় নাই; যে আগুনের স্পর্শে সোনাও খাঁটি হইয়া উঠে, সেই চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আগুনকে ইহারা যেন জীবনে এড়াইয়া চলিতেছেন, না হইলে এমন স্বাদহীন ভ'লো সাহিত্য তাঁহারা সৃষ্টি করিবেন কেন? শারদীয়া সংখ্যাগুলি পড়িয়া হতাশ হইয়াই এই দুঃখ করিতেছি, লেখকদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা হতাশ নই।

—

পূজাবকাশের ঠিক প্রাক্কালে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণ-দেবতা' পুস্তকাকারে আমাদের হাতে পড়িয়াছিল। শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার বর্ত্তমান সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত তাঁহার "বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য" প্রবন্ধ যখন রচনা করিয়াছিলেন, 'গণ-দেবতা' তখন প্রকাশিত হয় নাই। এই পুস্তকে আমরা সর্ব্বপ্রথম ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের শিল্পীমনের পরিচয় লাভ করিলাম, এই একটি পুস্তকে তিনি "চিরন্তনকে গৌণ করিয়া যুগ-মহিমাকেই মুখ্য করিবার লোভ সম্বরণ" করিয়াছেন; কোনও উদ্দেশ্য লইয়া নয়, গল্প বলিবার জন্যই গল্প বলিয়া গিয়াছেন। গল্প অবশ্য এখানেই সমাপ্ত হয় নাই—"চণ্ডীমণ্ডপে"র কাহিনী "পঞ্চগ্রামে" শেষ হইবে বলিয়া লেখক আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন। তারাশঙ্করের এই রচনা পূজাবকাশের সকল ক্ষোভের মধ্যে আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছে।

শ্রীরাণী চন্দ প্রণীত 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথে'র কথা আমরা গতবারে উল্লেখ করিয়াছি। এই পুস্তকখানি বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল। ইহাতে শুধুই ফোটোগ্রাফি নাই, আলাপ-আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লেখিকার জ্ঞাতসারে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শুধু লিপিবদ্ধ হয় নাই; ইহাতে শিল্পীর হাতের স্পর্শও সুস্পষ্ট; সাধারণ কথাবার্ত্তাই শিল্পরসযুক্ত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনার অবকাশ অনেকেই পাইয়াছেন, আজ তাঁহারা প্রত্যেকেই এই বলিয়া অনুতাপ করিতেছেন যে, তাঁহার বক্তব্যগুলি যদি সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতাম! শ্রীরাণী চন্দের এই পুস্তক পাঠ করিয়া অনেকের এই আক্ষেপ দূর হইবে—যাক, অন্তত একজনও তো এই কাজ করিয়াছেন! রবীন্দ্রনাথের গহনগভীর মন মাঝে মাঝে নির্জ্জন মুহূর্ত্তে ভিতরে ভিতরে আলোড়িত হইয়া বাহিরের আলোবাতাসে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—লেখিকা সেই মুহূর্ত্তগুলিকে স্থায়িত্ব দান করিয়া বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সম্পাদকের অসুস্থতার জন্য এবারের "সংবাদ-সাহিত্য" আশানুরূপ দেওয়া গেল না, সেজন্য পাঠক-সাধারণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শনিবারের চিঠি

১৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৯

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস

গত কার্ত্তিক সংখ্যায় "বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য" প্রবন্ধের এক স্থানে আমি একখানি ইতিহাস-গ্রন্থের সম্বন্ধে কিছু কঠিন মন্তব্য করিয়াছিলাম—গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও ইঙ্গিত খুব স্পষ্টই ছিল, এবং তাহার ফলে ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমার কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক-বন্ধু আমাকে অনুযোগ করিয়াছেন যে, আমার মন্তব্য অতিশয় 'sweeping' অর্থাৎ নির্ব্বিচার ও একদেশদর্শী হইয়াছে। এজন্য আমি স্থির করিয়াছিলাম, ঐ গ্রন্থখানির সম্বন্ধে আমার সেই মন্তব্যের কিঞ্চিৎ কৈফিয়ৎ দিব, অর্থাৎ আমি যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি, যুক্তিপ্রমাণসহকারে তাহার কিছু ব্যাখ্যা করিব। ইহাকেই বলে—কৃতকর্ম্মের ফলভোগ; কারণ উপস্থিত আমি অন্যবিধ কার্য্যে এতই ব্যস্ত যে, এইরূপ বাদানুবাদ লিখিবার সময় আদৌ নাই, তথাপি বিষয়টি এক হিসাবে বাংলাসাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে বহু পাঠকের চিত্তাকর্ষক না হইলেও চিন্তাকর্ষক হইবে; এজন্য আমি এই গ্রন্থকে উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকটি বিষয়ে আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রথমেই গ্রন্থখানির সহিত আমার পরিচয়ের কথা বলি। গ্রন্থকার ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক, ইংরেজী সাহিত্যে সুবিদ্বান এবং বহু কৃতী ছাত্রের গুরু। অনেক দিন পূর্ব্বে, ১৩৩০ সালে, অধুনালুপ্ত 'নব্যভারত' পত্রিকায় তাঁহার একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল; যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অতি নিপুণ বিশ্লেষণ চলিতেছিল—সেই বিশ্লেষণ-ভঙ্গিই বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি সে আলোচনার খুব ভিতরে প্রবেশ করি নাই—করিবার উপায়ও ছিল না, কারণ তখন লেখকের plan বা পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না।

কেবল ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে, ঐ প্রবন্ধ একটি বৃহত্তর গ্রন্থের অংশ-বিশেষ। পরে 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামে সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, এবং গ্রন্থকার অতিশয় সৌজন্য সহকারে আমাকে এক খণ্ড উপহার পাঠান। কিন্তু এবার যথোচিত আগ্রহ সহকারে ও সসম্ভ্রমে সেই বিরাট গ্রন্থের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে যে কিরূপ বিস্মিত ও নিরাশ হইয়াছিলাম, সে কথা এতদিন বলি নাই—বলিবার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু আঘাতটা ভুলিতে পারি নাই। তখন কেবল গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকারের কয়েকটি কথা পড়িয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে কথাগুলি এই—"আমার দুই জন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র অধুনাতন ইংরাজী-সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকের নিকট আমার ঋণ এত বেশি যে তাহা উপযুক্ত ভাবে স্বীকার করা অসম্ভব। শ্রীমান্ ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীমান্ তারাপদ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। ইঁহাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইঁহাদের সমালোচনা ও উপদেশ আমার অগ্রগতির প্রত্যেক পদক্ষেপ নিয়মিত করিয়াছে।" 'অধুনাতন ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক' নিশ্চয়ই অতি-আধুনিক সাহিত্যভাবাপন্ন, এবং তাঁহাদের 'অনুপ্রেরণা প্রতি পৃষ্ঠার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে'—কাজেই এস্থলে শিষ্যাবস্থাই গরীয়সী স্থির করিয়া আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলাম। এতকাল পরে কেমন যে দুর্ব্বুদ্ধি হইল, আমি প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কাজটি আদৌ বুদ্ধিমানের মত হয় নাই তাহা স্বীকার করি; কারণ এরূপ ক্ষেত্রে মুখ খুলিলে আর রক্ষা নাই। আরও বিপদ এই যে, এ গ্রন্থের পরিচয় খুব সংক্ষেপে দেওয়া দুরূহ, তাহার কারণ, ইহার রচনাপদ্ধতি ও আলোচনা-ভঙ্গি এমন যে, কোন একটি দিক ধরিয়া এ গ্রন্থের পরিচয় করা যাইবে না—যত পৃষ্ঠা ততই ইহার বৈচিত্র্য; এজন্য প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়া না দেখাইলে আমার মূল বক্তব্য প্রমাণ করা যাইবে না। উপন্যাসগুলির প্রত্যেকখানির বিশ্লেষণে গ্রন্থকার যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম

করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের দোষ-গুণ সমালোচনায় তিনি রীতিমত বহুরূপী সাজিয়াছেন ; 'বাস্তবানুগামিতা'র মানদণ্ডটি ছাড়া তাহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ণয়ে তিনি কোথাও একদৃষ্টির পরিচয় দেন নাই ; যেখানে যেমনটি বলিলে অপক্ষপাত ও নিরাপদ উক্তি হয়, সেখানে তাহাই করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার 'দৃষ্টিকোণ' ঘন ঘন পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ফলে, মত-প্রকাশে এমন দ্বৈধ, স্ববিরোধী বাক্যের এমন ছড়াছড়ি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনই অশেষ যুক্তি সহকারে যাহা প্রতিপন্ন করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার উল্টা মন্তব্য করিয়া যেন তাহার ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছেন—নিজের মত নিজেই খণ্ডন করিতে তাঁহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। তাহাতে এই সুবিধা হইয়াছে যে, যদি কেহ বলে—অমুক স্থানে অমুকের সম্বন্ধে আপনি অযথার্থ কথা বলিয়াছেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যের অপর পার্শ্বটি ঘুরাইয়া দেখাইলেই চলে। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই—আমি যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। তথাপি আমি এই গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করিব না, কেবল আমি যে মন্তব্য করিয়াছিলাম তাহারই কৈফিয়ৎ দিব। কিন্তু তাহাতেও আলোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে।

২

আমার প্রথম অপরাধ, আমি, 'উপন্যাসে'র একটা বিশেষ সংজ্ঞা ধরিয়া তাহাকেই একমাত্র মাপকাঠি করা এবং সাহিত্যিক রূপকর্ম্ম সম্বন্ধে ক্রমবিকাশতত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়ার বিরুদ্ধে মন্তব্য করিয়াছিলাম। সংজ্ঞার কথাটাই আগে বলি। গ্রন্থকার যদি বাংলা উপন্যাসে 'বাস্তবানুগামিতা'র মাত্রা বা প্রসার সম্বন্ধে গবেষণা করিতে চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে গ্রন্থের সেইরূপ নাম দিলেই কোন বিতর্কের কারণ ঘটিত না। কিন্তু তাঁহার আলোচনায় তিনি উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন—যথা, সামাজিক, পারিবারিক, ঐতিহাসিক, ও অতি-আধুনিক ; এবং ইহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি ও আদর্শ বিচারকালে, যেখানে যতটা সম্ভব ঐ 'বাস্তবানুগামিতা'র কষ্টিপাথর ব্যবহার করিয়াছেন। এবং উপন্যাসের ধারা নিরূপণ করিতেও, তাহার আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত

এই 'বাস্তব' ও 'কল্পনা'—'সম্ভব' ও 'অসম্ভব' ভেদ দৃঢ়রূপে ধরিয়া তাহার 'অগ্রগতি'র পদক্ষেপ গণনা করিয়াছেন। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি খাঁটি 'উপন্যাস'-এর সন্ধানেই প্রথম হইতে যাত্রা সুরু করিয়াছেন— এবং সেই খাঁটিত্বের প্রধান লক্ষণ—'বাস্তবানুগামিতা'। এই 'বাস্তব'কেও তিনি 'কল্পনা' বা 'কাব্য' হইতে অতি সন্তর্পণে পৃথক রাখিয়াছেন। তাঁহার মতে 'কৃপণের ধন'-এর সেই কৃপণের মত 'আলুর খোসা'ই উপন্যাসেরও শ্রেষ্ঠ উপাদান, এবং তাহার দ্বারা যে 'মেওয়া'-রস প্রস্তুত হয় তাহা পাক করিবার কালে যত জল সেচন করিবে ততই সেই 'মেওয়া' উপাদেয় হইবে—ঘৃত বা তৈল দিলেই মাটি! হঠাৎ মনে হয়, গ্রন্থকার একটা বিশেষ শ্রেণীর উপন্যাস লইয়া এই গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাসের সাধারণ ইংরেজী নাম Fiction—নভেল নয়; এবং উপন্যাসের নানা art form বা রসরূপ সাহিত্যের কাব্যবিভাগে দেখা দিয়াছে—পদ্যে, ও পরে গদ্যে তাহার যে সার্থকতা রসিকমাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন, তাহা তো এই 'বাস্তব'-অবাস্তব বিচারের উপর নির্ভর করে না। যাহা আর্ট বা কাব্য হিসাবে সার্থক হইয়াছে তাহা যে চিরকাল 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে; ঐ মাপকাঠিতে যদি তাহার সেই রসরূপ ধরা না দেয়, তবে মাপকাঠিই যে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে! লেখক 'বাস্তব' ও 'কল্পনা'র যে পার্থক্য বরাবর নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, তিনি সাহিত্যসৃষ্টির মূল তত্ত্বকেই স্বীকার করেন না—তাই তিনি উপন্যাসে কাব্যের সংস্রব মাত্র দূষণীয় মনে করেন। সকল সাহিত্যিক সৃষ্টিই যে কাব্য—উপন্যাসের জাতি বা গোত্র যেমনই হউক, তাহা যদি কাব্য না হইয়া থাকে তবে তাহা যে কিছুই হয় নাই, এমন কথা বলিলে তিনি বোধ হয় শিহরিয়া উঠিবেন। বাস্তবজীবনের লজিক উপন্যাস নামক কাব্যেরও লজিক নয়—কোন লেখকই, কবি-দৃষ্টি হারাইয়া কেবল 'বাস্তবানুগামী' হইয়া কোন প্রকার সাহিত্যসৃষ্টির গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। এই সৃষ্টিশক্তিই কবিত্ব, এবং কল্পনার প্রকৃতি অনুসারে অর্থাৎ রসদৃষ্টির ভঙ্গি অনুসারে উপন্যাসের প্রকৃতিও বহুবিধ হইয়াছে। এই বিভিন্নতার জন্য কালধারার প্রভাব কতখানি দায়ী—কোন্ যুগে, অর্থাৎ কোন্ ঋতুতে, কোন্ জাতের ফুল

ফুটিয়া থাকে, সে জিজ্ঞাসা স্বতন্ত্র; কিন্তু প্রত্যেক ফুলেরই নিজ নিজ বর্ণে ও রূপে ফুটিয়া উঠিবার অধিকার আছে; শুধুই এক এক যুগে নয়—একই যুগের একাধিক কবির স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে তাহারা স্বতন্ত্র আকারে ফুটিয়া উঠে; সেখানে কালানুক্রমিক বিকাশের কথাও অবান্তর। উপন্যাস যদি মানুষের জীবনালেখ্য হয় তবে তাহা বহির্জগৎ ও মনোজগতের সামঞ্জস্যমূলক বা পরস্পর পরিপূরক একটি চিত্রলিপিই নয়—সেই দুই-ই যেমন বাস্তব, তেমনই তাহারা মানুষের জীবন-কাহিনীর একটা অংশ মাত্র; এই দুই জগতের উপরে আর একটা বৃহত্তর জগতের ছায়া সর্ব্বদা ব্যাপ্ত হইয়া আছে—তাহারই যাদুশক্তির প্রভাবে বাস্তব ও অবাস্তব দুই-ই সমান মূল্যবান হইয়া উঠে। কবি-চিত্তে সেই জগতের ছায়া পড়ে—এবং তাহাতে সেই শক্তির যে ক্রিয়া ঘটে তাহারই নাম কল্পনা। এই কল্পনাই কবির সৃষ্টিশক্তি, এবং কল্পনার প্রকৃতিভেদে জীবনের আলেখ্য নানা রসরূপ ধারণ করে। কাব্যে, মহাকাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে সর্ব্বত্রই এই কল্পনা জীবনের নানারূপ ব্যাখ্যা নানা ভঙ্গিতে আমাদের রসচেতনার গোচর করে—সেই চেতনার গভীরতা ও পরিধি সকল ক্ষেত্রে সমান নয়, কিন্তু সর্ব্বত্রই অনুভূতির সত্য আছে। সে কল্পনা বা কবিশক্তি যদি জীবনের কোন রূপকে বাস্তব-অবাস্তবের ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতে পারে তবেই তাহা সার্থক হয়, অতএব কল্পনা যেমন মিথ্যা নয়, তেমনই কোন সাহিত্যিক সৃষ্টিই কাব্য না হইয়া পারে না। আমার এই কথাগুলি কেমন একটু ভিন্ন ধরনের হইল, এ ভাষা খুব সুস্পষ্ট যুক্তির ভাষা নয়—আমিও তাহা বুঝিতেছি; বিশেষত উপন্যাসের খাঁটি রূপটিকে উদ্ধার করিয়া তাহার ঐতিহাসিক অগ্রগতির ধারা যিনি প্রমাণ করিতে চান তাঁহার নিকটে এ ভাষায় কথা বলিলে আমাকেই হার মানিতে হইবে। অতএব ঐ ভাষা আমি নিজেই প্রত্যাহার করিতেছি—তাহার পরিবর্ত্তে আরও স্পষ্ট ভাষায় কয়েকটি প্রশ্ন করিব।

উপন্যাস যে একটি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র বস্তু, সেইজন্য তাহার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারে কতকগুলি লক্ষণের হিসাব রাখিতে হইবে, এ কথা মানিলাম; কিন্তু উপন্যাসও এক জাতীয় কাব্য নয় কেন? হউক তাহা

সামাজিক বা পারিবারিক বা ঐতিহাসিক,—তাহাতে যথা-প্রকৃতি ও যথোপযুক্ত কল্পনার ক্রিয়া থাকিবে না কেন? যদি বাস্তব উপাদানের কথাই হয়—তাহা স্বতন্ত্র; কিন্তু কল্পনারও তো বাস্তব আছে; গ্রন্থকার কি বলিতে চান যে, মহাকাব্য বা নাটকের যে কবিদৃষ্টি তাহা সমগ্র ভাবেও বাস্তবানুগামী নয়? উপাদানের বাস্তবতাই কি কোন সাহিত্যিক সৃষ্টির নিরিখ হইতে পারে? কবির কল্পনা যদি সেই বাস্তবকে রূপান্তরিত না করে তবে আমরা সেই বাস্তবতায় মুগ্ধ হই কেন? যে বাস্তবকে আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহাকে বাস্তব বলিয়া অনুভব করি কেমন করিয়া? আবার যে বাস্তব প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়াও কিছুমাত্র চিত্তচমৎকার অনুভব করি না, উপন্যাসে তাহাকেই নিখুঁত প্রতিফলিত হইতে দেখিয়া এমন মুগ্ধ হই কেন? গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—"[আনন্দমঠের] প্রথম চার অধ্যায় একটি ভীষণ বাস্তব চিত্র"। পড়িয়া বড়ই কৌতুক অনুভব করিয়াছি। প্রথমত, ভীষণতার দ্বারাই বাস্তবের বাস্তবতার পরিমাপ হয় না—ভীষণই হউক, আর সুন্দরই হউক, তাহার চিত্র তদনুরূপ হইলেই হইল। আশা করি, গ্রন্থকার এখানে সে চিত্রের ভীষণতা নয় (কারণ, ভীষণতাও একটা রস)—তাহার বাস্তবতার কথাই বলিতেছেন। তাঁহার এই উক্তি যথার্থ। কিন্তু ঐরূপ বাস্তবচিত্রকেও ইংরেজীতে বলা হয়—একটা 'creation', অর্থাৎ উহা রচনা করিতে উৎকৃষ্ট সৃজনাশক্তি বা কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা বাহিরের বাস্তব হইলেও, ইহার জন্যও এক ধরনের কল্পনারই প্রয়োজন হইয়াছে, কেবল কতকগুলি তথ্য সঙ্কলন করিয়া প্রমাণ সহ তাহা বিবৃত করিলেই ঐ বাস্তবকে আমরা অন্তরে অনুভব করিতাম না; এখানে বাস্তবেরও অন্তর্নিহিত একটা গভীরতর বাস্তবকে—বাস্তবের যেন প্রাণমূর্ত্তিটিকে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। তেমনই, মহাকাব্যের যে কল্পনা তাহাও জীবনের অন্তর্লোকের আর এক প্রকার বাস্তবকে আমাদের হৃদয়গোচর করে, সেখানেও সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত, রূপক ও যথার্থ—সর্ব্ববিধ উপকরণ-উপাদানের সাহায্যে, একটা একাগ্র কবিদৃষ্টি যে ভাববস্তুকে রূপ দেয় তাহাকে কবি বাস্তবের মতই প্রত্যক্ষ

করিয়াছেন—তাই তাঁহার সেই দৃষ্টি কখনও ম্লান বা মূল্যহীন হয় না। আমি এখানে এমন একটি মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত দিব, যাহার মত উৎকট কল্পনা আর কোথাও দেখা যায় নাই। আমি দান্তের (Dante) মহাকাব্যের কথা বলিতেছি। সে যুগে নভেলের সৃষ্টি হয় নাই, তাই তখনকার জীবনযাত্রার বাস্তবচিত্র উপন্যাসে প্রতিফলিত হইতে পারে নাই;—কিন্তু দান্তের মহাকাব্যই নাকি মধ্যযুগের খ্রীষ্টান য়ুরোপের আত্মার বাণী বহন করিতেছে, সে যেন সেই যুগকে একটি সুসম্পূর্ণ বাণীমূর্ত্তি দান করিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে দান্তের কল্পনা কি একটা গূঢ়তর ও বৃহত্তর বাস্তবকে দৃঢ়রূপে ধরিতে পারে নাই?

অধ্যাপক মহাশয় ইহার উত্তরে যাহা বলিবেন তাহা জানি; জানি বলিয়াই আমি এত কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি পুনরায় তাঁহার সেই 'সংজ্ঞা' ও উপন্যাস নামক একটি বিশেষ জাতীয় রচনার কথা তুলিবেন—তিনি বলিবেন, এ সকল কথা অবান্তর। আমার কাছে অবান্তর নয়—এবং তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধেও নহে। কারণ 'বাস্তবানুগামিতা' কোন এক-শ্রেণীর উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণ হইলেও, তাহাকেই 'fetish' করিয়া 'উপন্যাসে'র অগ্রগতি বিচার করা কোন সাহিত্য-সমালোচকের তো দূরের কথা—কোন সাহিত্য-রসিকেরই শোভা পায় না। এইরূপ বিধি তিনি যদি বিলাতী সাহিত্যশাস্ত্র হইতে পাইয়া থাকেন এবং সেই কারণেই বিধিসম্মত কার্য্য করাকেই তিনি গৌরবকর মনে করিয়া থাকেন তবে আমার কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু তিনি যদি নিজেরই রুচি, রসবোধ ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধির সাহায্যে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, তবে আমার এই সকল প্রশ্ন নিরর্থক নয়। তাঁহার সংজ্ঞা বুঝি, 'বাস্তবানুগামিতা'ও বুঝিয়াছি, তথাপি এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে তিনি একটা শ্রেণীতে ফেলিয়া বিচার করিয়াছেন—সেই শ্রেণীর নাম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। এই ধরনের উপন্যাস নিশ্চয়ই অগ্রগতির নিদর্শন নয়, কারণ তাহাতে 'রোমান্সের আতিশয্য' আছে, ঐতিহাসিক 'তথ্যানুগামিতা' নাই। অধ্যাপক মহাশয় উপন্যাসের ধারা সন্ধান করিতে বৌদ্ধজাতক পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছেন, কারণ, তাহাতে

বাস্তবের গন্ধ আছে—সেই 'বাস্তব' নিশ্চয়ই 'ক্রমবিকাশের ধারায়' বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পূর্ণতর বা সমগ্র বাস্তবতায় পরিণতি লাভ করে নাই। তাহা হইলে, উপন্যাস হিসাবে উহাকে সাবালক বলা যায় না। সকলই বুঝিলাম, কিন্তু ইহাই বুঝিতে পারিতেছি না যে, বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের উপন্যাস এমন কাঁচা হইয়া বা 'কাঁচিয়া' গেল কেমন করিয়া? বাহিরের আকাশভরা জ্যোৎস্না গৃহদ্বারে গবাক্ষপথে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে—ঘরের কোণের প্রদীপটির মান রক্ষা করিবার জন্য দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিব? এ কেমন শাস্ত্র, এ কেমন বিচার? বঙ্কিমচন্দ্র তো 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' লেখেন নাই, সে কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। তবু সেই ঐতিহাসিকের কোঠায় ফেলিয়া সেগুলিকে পিষিতে হইবে? ইহাও কি একটা ধান-মাড়াইয়ের মত কাজ? বঙ্কিমচন্দ্র অধ্যাপক মহাশয়ের অথবা তাঁহার বিলাতী গুরুদের (আমারও বিলাতী গুরু আছেন—তাঁহারা এমন অবিবেচক নহেন) ফরমায়েস মত উপন্যাস রচনা করেন নাই—সকল সত্যকার সাহিত্য-স্রষ্টার মত তিনি তাঁহার স্বকীয় কবিদৃষ্টি এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার নিজের আত্মিক রসোপলব্ধির প্রেরণায় যাহা রচনা করিয়াছিলেন —জাতি (class) হিসাবে তাহাদের নাম যাহাই হউক, তাহাদের সেই বিশেষ রূপের নাম—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না; কারণ, সকল সৃষ্টিই অনন্যসদৃশ (unique)। এইজন্য কোন আর্ট-কর্ম্মকে লইয়া Zoology-র মত শ্রেণীভাগ (classification) চলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—মহাকাব্য, নাটক, গীতিকাব্য, নভেল কোন শ্রেণীভুক্ত নয়, অথচ সকল শ্রেণীর লুকাচুরি তাহাতে আছে, কারণ, তাহাতে জীবনের সমগ্রতা-বোধের গভীরতর প্রেরণা রহিয়াছে, তাহা বাস্তব-অবাস্তবের ভেদ মানে না। অর্থাৎ তাহা উৎকৃষ্ট উপন্যাস, উৎকৃষ্ট কাব্য ও উৎকৃষ্ট সৃষ্টি; সেইজন্যই তাহা সাহিত্য-ব্যাকরণের সূত্র মানিয়া চলে না—তাহা নিয়তিকৃত নিয়মরহিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার অশেষ দোষ!—তাহারা ইতিহাস মানে না, চরিত্রতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্ব মানে না, সম্ভব-অসম্ভবের হিসাব রাখে না! অতএব, একপ্রকার গদ্য-কাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট হইলেও, তাহারা উপন্যাসের নাবালক বয়স

কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার বঙ্কিমচন্দ্র-সমালোচনায় যে বিশ্লেষণী বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহা যেমন চমকপ্রদ, তেমনই তাহার বাস্তব ও রোমান্স অংশ পৃথক করিয়া তাহাকে উপন্যাসের মানদণ্ডে যাচাই করিতে গিয়া নাস্তানাবুদ হইয়াছেন, সেগুলির মধ্যে সৃষ্টির অখণ্ডতা বা সমগ্রতা বোধ তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। একই উপন্যাসের কতখানি বাস্তব এবং কতখানি কাব্য, অর্থাৎ কতখানি তাঁহার সংজ্ঞাবৃত উপন্যাসের কোঠায় পড়ে, এবং কতখানি পড়ে না, তাহার বিচারকালে এ প্রশ্ন তাঁহার মনে একবারও জাগে নাই—এই দুই বিরুদ্ধ উপাদান কবির কল্পনায় কোন্ রস-রূপে সমাহিত হইয়াছে—কাব্যগুলির মধ্যে দৃষ্টির সেই সমগ্রতা কোথায়, যাহার জন্য তাহারা একটা সর্বাঙ্গসুন্দর, সুষম, সুডৌল মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে? 'রোমান্সের আতিশয্য' নাম দিয়া তিনি যে পরিচ্ছেদ যোজনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজেই বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি উপন্যাসে রসসৃষ্টির সার্থকতা—'কিন্তু' 'তথাপি' প্রভৃতি নানারূপ কৈফিয়ৎ-বাক্যের দ্বারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, নিজের যুক্তি নিজেই খণ্ডন করিয়াছেন। এই বিপাক-বিড়ম্বনার কারণ তাঁহার ঐ সংজ্ঞার বাঁধনে যে খালটি বাঁধিয়া তিনি উপন্যাসের ধারায় নৌকা বাহিতেছেন সে খালে পানি পাইতেছেন না। যে কোন পাঠক তাঁহার গ্রন্থের এই অংশ পাঠ করিবার সময় আমার মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করিবেন।

বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণার মূল্য এবং প্রয়োজন সকল ছাত্রের পক্ষে আছে এবং ইহাও ঠিক যে, সাহিত্য-বিচারে অধিকারী-ভেদ আছে; ক্লাসে ছাত্রগণের জন্য যে বক্তৃতা প্রস্তুত করিতে হয়, অথবা তাহাদের পরীক্ষার প্রয়োজনে যে ধরনের বিধিসম্মত ব্যাখ্যা বা তথ্যনির্ণয় আবশ্যক, তাহা হইতে পৃথক একটা বৃহত্তর প্রয়োজনও আছে—তাহা সাহিত্যের রসরূপ নির্ণয়, সে তত্ত্বের আলোচনা সকলের জন্য নয়। কিন্তু যিনি নিম্নতর ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে বাধ্য হন, তাঁহাকেও কতকগুলি মূলনীতির মর্যাদা রক্ষা করিতে হয়, না করিলে নিম্নাধিকারী চিরদিন নিম্নাধিকারেই রহিয়া যায়, এবং বাংলা-সাহিত্যের পক্ষেও সমালোচনার বিশুদ্ধ ও উচ্চতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা

সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। কোন এক প্রকার সাহিত্য-সৃষ্টির ধারা পৃথক-ভাবে প্রদর্শন করিবার কালেও সকল সাহিত্য-সৃষ্টি—যাহার সাধারণ নাম কাব্য—তাহার ধারণাকে যতদূর সম্ভব অক্ষত রাখাই উচিত। এজন্য একের সহিত অপরের তুলনায়, লক্ষণ-সামান্য ধরিয়া classification করার বিপদ যে কতখানি, তাহা আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ বিলাতী সমালোচকেরাও বুঝিতে পারিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যাপনার বাঁধা পথে আবদ্ধ থাকিয়া সেরূপ কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই, অথবা সেরূপ জিজ্ঞাসা তাঁহার এই কর্ম্মের পক্ষে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

সংজ্ঞার সার্থকতার সম্বন্ধে বলিয়াছি, অর্থাৎ কোনরূপ গবেষণার পক্ষে এইরূপ একটি গণ্ডির আবশ্যকতা যেমনই হউক—সেই সঙ্গে যদি সাহিত্যের রস-বিচারও করিতে হয়, তাহা হইলে ঐরূপ সংজ্ঞা যে কিরূপ অযথার্থ হইয়া পড়ে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত উপন্যাসের বীজ বা অঙ্কুরোদ্গম সম্বন্ধে কিছু বলিব। অধ্যাপক মহাশয় ভারতীয় সাহিত্যের সেই আদিযুগ হইতে বাংলা-সাহিত্যের মধ্যযুগ পর্য্যন্ত গদ্যে বা পদ্যে রচিত সর্ব্বপ্রকার কথা ও কাহিনীতে যেখানে যেটুকু বাস্তব-উপাদান লক্ষ্য করিয়াছেন সেইখানেই বীজরূপে উপন্যাসকে বিদ্যমান দেখিয়াছেন। সেই সকল রচনার আকৃতি-প্রকৃতি বা তাহাদের মূল কল্পনা-প্রবৃত্তির পার্থক্য বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র চিন্তা করেন নাই—ঐ বাস্তব-উপাদানটুকুই তাঁহার সিদ্ধান্তের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছেন। তেমন উপাদান যে অল্পাধিক পরিমাণে সকল কালের সকল রচনাতেই থাকা স্বাভাবিক, এবং কেবল সেই বস্তুই যে কস্মিন কালেও তাঁহার ঐ উপন্যাস হইয়া উঠিত না—বাংলা উপন্যাসের ধারাকে আভিজাত্য দান করিবার প্রয়োজনে, এত বড় পণ্ডিতও এই সাধারণ জ্ঞানটুকু হারাইয়াছেন! দেশ, কাল ও পাত্রের সম্বন্ধঘটিত একটা মহানিয়ম সকল সৃষ্ট বস্তুর উপরে আধিপত্য করিতেছে, তাহার ফলে সকলই ক্রমপরিণতিশীল, ইহা সত্য হইলেও, আর্টের ক্ষেত্রে এভোলিউশন বাদ পুরাপুরি খাটে না—আধুনিক বাংলা সাহিত্যই

তাহার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সাহিত্যে আর্টের যে নবতম রূপাবলী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বহুলাংশেই আগন্তুক—একই যুগের আধারে একই শিখা দীপ হইতে দীপান্তরে সংক্রমিত হইয়াছে; আর্টের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়। প্রত্যেক যুগেরই একটা বিশিষ্ট আর্ট-আইডিয়া (art idea) থাকে, তাহা সেই যুগের মধ্যেই নিঃশেষে পরিণতি লাভ করিয়া ঝরিয়া যায়। অজন্তার চিত্রাবলীতে একটা যুগের যুগোচিত আর্ট-আইডিয়া চরম-পরিণতি-শেষে ঝরিয়া গিয়াছে—তাহার সহিত পরবর্ত্তী কোন যুগের চিত্রাঙ্কণরীতির এভোলিউশন-ঘটিত সম্বন্ধ না থাকিবারই কথা। পুরাকালে এবং তাহারও যুগ-বিশেষে যে সকল সাহিত্যিক রূপ (art form) দেখা দিয়াছিল তাহাদের সঙ্গে আধুনিক উপন্যাসের দূরতম সম্বন্ধও নাই; অতএব সেরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা নিতান্তই নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আর্টের ক্ষেত্রেও ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম যদি বলবৎ হয়, তবে কোন উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক শিল্পসৃষ্টিও আর স্বয়ম্পূর্ণ হইতে পারে না—কবি-প্রতিভার কোন গৌরবই আর থাকে না। অধ্যাপক মহাশয়ের সংজ্ঞাধৃত ঐ 'বাস্তবানুগামিতা'র যদি কোন অর্থ থাকে, তবে তাহা এই যে—আধুনিক উপন্যাস-জাতীয় রচনা বাস্তবানুগামী হইয়াই রসসৃষ্টি করিয়াছে—তাহার মূলে রুচি ও রসবোধের একটা ভিন্নতর প্রেরণা আছে; এবং সাহিত্যের সেই অভিনব রসরূপ নিজ বিকাশকালের মধ্যেই পূর্ণ পরিণতি ও শেষে চরম বিকৃতি লাভ করিবে। এই সকল রসরূপের উদয় ও বিলয়ের মূলে যে বহির্গত কারণসমষ্টি আছে তাহার পর্য্যালোচনা অন্যবিধ বিদ্যা বা জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে, সাহিত্যের রূপ-রসের বিচারে তাহা সর্ব্বৈব অবান্তর।

এখানে অধ্যাপক মহাশয় বলিতে পারেন যে, তিনি সাহিত্যের রসরূপের বিচার বা তাহারই ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয় করিতেছেন না—বস্তুত তিনি সেরূপ কোন অপরিণামী রসরূপের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে, কতকগুলি বুদ্ধিগ্রাহ্য লক্ষণ লইয়া একটা বাস্তবজীবনধর্ম্মী বস্তুর ক্রমপরিণাম পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনি সাহিত্য-সমালোচনা করেন নাই—বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

করিয়াছেন। হয়তো তিনি তাহাই করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার সমালোচনার ধরন বা পদ্ধতি দেখিয়া মনে হয়, তিনি বিশ্লেষণ করিতে পটু, সংশ্লেষণ করিতে জানেন না, কারণ—বোধ হয় সত্যই তিনি রসের—অর্থাৎ রূপ-সমগ্রতার সম্বন্ধে নাস্তিক। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যরসের হিসাবও—জমা ও খরচের মত—না মিলাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, বাস্তবের দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া বাস্তব-বিরোধী কল্পনার দোষ দেখাইতে বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইয়াও অবস্তু লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন, এইজন্যই আমি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"।

ঐ বাস্তব-উপাদান ও ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার বশে, গ্রন্থকার বৌদ্ধজাতকমালার মধ্যেও উপন্যাসের বীজ দেখিতে পাইয়াছেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি ; পরে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'য় সেই বীজের অঙ্কুরোদ্গম আবিষ্কার করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে, কেবল উপন্যাসের সংজ্ঞাই নয়—সাহিত্যের জাতি-কুল-গোত্র পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। যে কোন কাব্যের অন্তর্গত বাস্তব উপাদানই যদি উপন্যাসের বীজ হয়, তবে মুকুন্দরামের চণ্ডী-কাব্যে সেই বীজ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, তাহার পর প্রায় আড়াই শত বৎসরেও বাংলা ভাষায় উপন্যাসের জন্ম হইল না কেন? অধ্যাপক মহাশয় 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র মধ্যেই তাহার সম্ভাবনা আসন্নতর হইতে দেখিয়াছেন, এবং বাংলা সাহিত্যে সেই 'কুমারসম্ভব' হইতে যে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহার জন্য দুষ্ট মদনকে অর্থাৎ দুশ্চরিত্র কবি ভারতচন্দ্রকে দায়ী করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের সেই অপচেষ্টা যদি বিপরীত মুখে এই ঔপন্যাসিক প্রবৃত্তির গতিরোধ না করিত, তাহা হইলে আমাদের সাহিত্যে নাকি উপন্যাসের জন্ম আরও শীঘ্র ঘটিত! ইহার উত্তরে দুইটি কথা বলিব। ভারতচন্দ্র প্রায় দেড় শত বৎসর পরে আসিয়াছিলেন—উপন্যাসের বীজকে অঙ্কুরিত হইবার যথেষ্ট সময় দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটি উত্থাপন করিতে আমি নিজেই লজ্জাবোধ করিতেছি। অধ্যাপক মহাশয় উপন্যাসের ধারার অনুসরণ করিয়াছেন, না—সেই ধারাকেই

অনুসরণ করাইয়াছেন? তাই যদি করিয়া থাকেন তবে তিনি ভগীরথকেও হার মানাইয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের একান্ত বশীভূত এই ধারাটি যে-কোন খাতে বহিতে আপত্তি করে না—কোন দিগ্‌দেশ বা ভৌগোলিক বাধা মানে না। ভারতচন্দ্র যত বড় অপরাধই করিয়া থাকুন, তিনি যে-ধারায় তাঁহার কাব্যখানিকে ভাসাইয়াছিলেন, তাহার খাতই যে ভিন্ন! তিনি যদি অধ্যাপক মহাশয় কথিত সেই মহা অপরাধ না-ও করিতেন, তথাপি 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র ধারা কেমন করিয়া সেই খাতে আসিয়া সেই ধারার পুষ্টি সাধন করিত? ভারতচন্দ্র একদিকে জয়দেব, বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা, মুকুন্দরাম, কাশীদাস, এবং শ্রীচৈতন্যোত্তর বিপুল ধর্ম্ম-কাব্য-দর্শন-সাহিত্যের দায়াদ, এবং অপর দিকে সংস্কৃত কাব্য-পুরাণ, ব্যাকরণ-অলঙ্কারের সংস্কৃতিমন্ত্রে দীক্ষিত কবি—তাঁহার নিজস্ব কাব্যকল্পনা যেমনই হউক। অপর সকল ভাষার মত বাংলা ভাষাতেও লোক-সাহিত্যের একটি ধারা চিরদিন ভিন্ন খাতে বহিয়া আসিয়াছে, সে সাহিত্যের প্রকৃতি ও প্রেরণা অতিশয় স্বতন্ত্র হইয়াই থাকে—তাহার ইতিহাসও স্বতন্ত্র। বিলাতী সাহিত্যের ইতিহাস কি বলে জানি না, আমি কেবল আমাদের দেশের ঐ সাহিত্যের সম্বন্ধে একটা ছোট খবর তাঁহাকে দিতে পারি—তাঁহার কাজে লাগিলে কৃতার্থ হইব; তাহা এই যে, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র ধারা এখনও লুপ্ত হয় নাই, কবি জসীমউদ্দীন সেই ধারারই আধুনিক কবি। সে ধারায় উপন্যাসের মত বস্তুর উদ্ভবও দূরের কথা, তাহা পদ্য ছাড়িয়া গদ্য রীতিকেও আশ্রয় করিতে পারে না,—কারণে সেই দণ্ডেই তাহার অপমৃত্যু হইবে।

আমার বক্তব্য বিশদ হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু অধ্যাপক সমাজ ও পণ্ডিত পাঠকগণকে আর একটু ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। এইবার সাধারণ আলোচনা ত্যাগ করিয়া গ্রন্থখানির মধ্যে তথ্য ও তত্ত্বের যে অপূর্ব্ব সন্নিবেশ আছে, তাহার কিঞ্চিৎ চাক্ষুষ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।* শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

* ইতিমধ্যে ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত এক সুদীর্ঘ প্রতিবাদ পাইয়াছি। সেই প্রতিবাদ ও মূল প্রবন্ধ-লেখকের উত্তর যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। কাগজের বর্ত্তমান দুষ্প্রাপ্যতায় এখনই দীর্ঘ উত্তর-প্রত্যুত্তর ছাপা সম্ভব নয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত সেই প্রতিবাদের কোন সম্পর্ক নাই।—স. শ. চি.।

হেঁয়ালি

জীবন-সমুদ্র-তীরে তুমি দেখ উর্ম্মি ফেনাময়,
আমি দেখি নীলসিন্ধু, অতলের লভি পরিচয়।
তুমি খেলা ভালবাস, আমি ভালবাসি ডুব দিতে,
দুজনের মাঝখানে কালসিন্ধু রহে তরঙ্গিতে।
আমার অন্তরমাঝে মুক্তারূপে শুক্তির বিকাশ,
ক্ষণে জাগো, ক্ষণে ভাঙো, তুমি ক্ষুব্ধ রহ বারো মাস;
রৌদ্রকরে ঝলকাও, বায়ুভরে হও যে উদ্বেল—
শৈবালে শুক্তির গর্ভে মুক্তা হয় কঠিন হিমেল।
তরঙ্গ-তাড়নে সে তো উর্ম্মিমুখে ভাসে না কখনো,
নিম্নে আমি ঢেউ গনি, উর্দ্ধে তুমি কলহাস্য শোনো।
তরঙ্গ-উচ্ছল সিন্ধু মাঝখানে গর্জ্জে অবিশ্রাম,
সৈকতে শুকায় ফেনা, বেড়ে যায় মুকুতার দাম।
তোমার আমার মাঝে ভাষাহীন অন্ধ ব্যবধান,
ক্ষণিকের স্পর্শ লভি ক্ষণিকা, পেয়েছ কি গো প্রাণ?

* * *

আজিকে পরম ক্ষণে আমি ধরেছিনু তব হাত,
তুমি ধরা দিয়েছিলে, বক্ষে বক্ষে বাধে নি সংঘাত;
ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলেছিল পরিপূর্ণ মিলনের আশা—
সে কি মোহ, সে কি ভ্রান্তি, হে প্রেয়সী, সে কি ভালবাসা?
কি বলিলে? সকলেই দেহ নিয়ে খেলেছে এ খেলা!
জীবন-বারিধি প্রিয়ে, পার হব এইমাত্র ভেলা,
অন্য পথ নাহি জানি, পারে যেতে মন যে উধাও;
তুমি কি কামনা কর মনে মনে মনেরে শুধাও।
তুমি নিজে ভাল জান—সব স্পর্শ এক নয় প্রিয়া,
মেঘে মেঘে সংঘর্ষেই বিদ্যুৎ উঠে না ঝলকিয়া।
যে দেহ ছুঁয়েছে বহু, এক স্পর্শে হবে তাহা শুচি—
আজিকে পরম ক্ষণে দেখেছ কি নয়নাশ্রু মুছি,
কামনার লক্ষ ঢেউ মুক্তামাঝে স্তব্ধ হয়ে আছে,
প্রেমের হীরক-দ্যুতি ঝলকিছে কামনার পাছে!

* * *

হেঁয়ালিতে কথা বলি, হেঁয়ালি আমার ভাল লাগে,
ঘুমায় রাজার মেয়ে, জাগিবে নিশ্চিন্ত অনুরাগে।
সমুদ্র শুকায়ে গেছে, বালুচরে তরী বানচাল,
কখন জোয়ার আসে, মহার্ণব হয় যে উত্তাল—
ভেসে ওঠে মায়াতরী, বালুচর নিশ্চিহ্নে মিলায়,
মন-পবনের গতি মাঝগাঙে ভেসে ভেসে যায়।
ছুঁয়ে গেল মায়াবিনী, সে কি জানে মন্ত্র তার কি যে—
কি হইল বোঝা-পড়া গূঢ় দ্বন্দ্ব মনে-মনসিজে;
উপাধানে থুয়ে মুখ তোমারেই চাহিনু ভাবিতে,
বসন্তের পুষ্পশোভা ঝ'রে গেছে হেমন্তের শীতে।
আকাশে নিবিড় মেঘ, বিজলি ঝলকি উঠে জ্বলি;
মনে হ'ল, হায় ভীরু, আপনার হৃদ্‌পিণ্ড দলি
ফিরে এলে! অন্ধকারে মনে হ'ল কাঁদে জলঢেউ—
কে জানিবে, কে বুঝিবে, ভাল হেথা বাসে না তো কেউ!

* * *

তুমি মোর জীবনের সবচেয়ে বড় যে হেঁয়ালি,
ভাবিছ কি—বহুজনবল্লভের এ শুধু খেয়ালই!
জীবনের রাজপথে বাঁকে বাঁকে পথ হয়ে পার
সোনার কাঠিটি ফেলে চ'লে এল যে রাজকুমার—
পথশ্রান্ত দেহে তার আকাশের ধারাজল ঝরি
কামনা জাগায়ে তোলে—কোথা জাগে মানস-সুন্দরী।
একদা ভাঙিবে ঘুম স্বপ্নহীন—টুটিবে আবেশ,
অনুভব হবে তার সর্ব্ব-অঙ্গে প্রেমের আশ্লেষ—
কামনা জাগিবে চিত্তে অজানা সে স্পর্শ সুনিবিড়
ঘিরিয়া ধরুক পুন; চোখ ফেটে বাহিরিবে নীর।
চ'লে গেছে প্রিয়তম, ভাসে স্মৃতি ঘুমন্ত পুরীতে,
শুক্তিগর্ভে মুক্তা রয়, নীল সিন্ধু রহে তরঙ্গিতে।
সমুদ্র-সৈকতে শুধু ফেনহাস্য আছাড়িয়া পড়ে,
মহাকাল ক্লান্তিহীন অবিশ্রাম ভাঙে আর গড়ে।

* * *

আমারে গড়িয়া তুমি, হে নির্দ্দয়া, ভেঙেছ আপনি ;
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে হেরিলাম ললাট-লেখনই—
এ প্রেম নিষ্ফল প্রেম, এ বিদায় সুচির বিদায়,
আগুন নিবিয়া শুধু কলঙ্কের দাগ রেখে যায়।
আজিকে পরম ক্ষণে আপনারে সঁপিয়াছিলাম,
তুমি নিতে পারিলে না, খড়ি পেতে কষিলে কি দাম,
সকলের সাথে তুমি একাসনে বসালে আমায়—
ফেলিয়া সোনার কাঠি রাজপুত্র ফিরে গেল হায়।
আকাশ আঁধার করি এল মেঘ, নামে বৃষ্টিধার,
নিখিলের যত আশা-ভালবাসা হ'ল একাকার।
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ—কে লিখিল, নহে, নহে, নহে,
তুলসীর বেদীমূলে প্রেম তব প্রতীক্ষিয়া রহে ;
সীমন্তে সিন্দুর তব, হাতে নোয়া, নয়নেতে হাসি,
বিরহে মিলনে দুখে কাছে ডাকে শুধু ভালবাসি।

*　　*　　*

এ জীবন রঙ্গমঞ্চ, তবু আমি জানিয়াছি সার—
ভালমন্দ অভিনয়, নয় নয় সবখানি তার।
নেপথ্যবিধান আছে, আছে ক্লেশ নিশি-জাগরণে,
হাসির ভূমিকা নিয়ে চোখে কান্না আসে অকারণে।
এই তথ্য হে প্রেয়সী, বুঝিবে একদা তুমি জানি,
বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিপথে আজিকার শুভক্ষণখানি
সেদিন পড়িবে মনে—মনে হবে রাজভূমিকায়
নেমেছিল যে দুর্ভাগা, রাজ্য তার ধূলায় লুটায়,
দীপহীন রাজপথে পথ চলি ভিক্ষুকের বেশে
আপনার মনোরাজ্য ফিরে সে পেয়েছে অবশেষে।
তোমার চপল ঢেউ সে সাম্রাজ্যে পারে না পশিতে,
মাঝখানে কালসিন্ধু অবিশ্রাম রহে তরঙ্গিতে।
অন্ধকার শুক্তিগর্ভে মুক্তি তার মুক্তারূপ ধরে—
ফেনহাস্য উচ্ছ্বসিয়া উঠে ক্ষুব্ধ তরঙ্গ-শিখরে।

রোগশয্যায়

স্বচ্ছ শরতের হাওয়া
কাঁপায় অশ্বত্থশাখা আমার এপারে।
জরাতুর ক্ষীণ দেহে লাগে শিহরণ,
লাগে তন্দ্রা, লাগে জাগরণ,
জীর্ণ গৃহ, মুক্ত বাতায়ন,
চেয়ে চেয়ে দেখি—
বসুন্ধরা
আকাশে ফিরিছে ফেরি করি
রোগ-শোক-দৈন্যের পশরা।

ভাঙে তন্দ্রা—
ওপারে ভেঙেছে বাঁধ,
ঢোকে বন্যাজল ;
পক্কপ্রায় আউসের সাথে
সদ্য-রোয়া আমনের ক্ষেত
হয়েছে নিতল।
ডোঙা চলে পাটের ডগায়।
কান পেতে শারদ হাওয়ায়
শোনা যায়—
কৃষকের ঘরে ঘরে নিরাশ নিশ্বাস—
অবশ্যম্ভাবী উপবাস।
ঘরে ঘরে ধ্বসি পড়ে
মাটির দেওয়াল,
হুমড়িয়া পড়ে চাল।
উলঙ্গ ছেলের দল
াঁশবনে কাটিছে সাঁতার।
পথে পথে পশেছে পাথার।

এপারে সমুচ্চ পাড় কোলে কোলে
জল,
স্বচ্ছ শরতের হাওয়া
কাঁপায় অশ্বত্থশাখা,
জরাতুর ক্ষীণ দেহে লাগে শিহরণ।
পল্লীপ্রান্তে দ্বিতলের জীর্ণ বাতায়ন,
নীলাকাশ, খণ্ড খণ্ড পাণ্ডু মেঘ,
ঘুরে ঘুরে উড়িছে শকুন,
কুরে কুরে কাঠের চৌকাঠ
বাসা গড়ে চিক্কণ ভ্রমর,
সহসা উড়িয়া যায় দারুণ নির্বেদে,
ঘুরে আসে অদূর ওদের ছাদে,
শুকায় যেখানে—
শিউলির বোঁটা, কমলার খোসা,
কুলোভরা পোকা-ধরা কুল,
মলিন মটকা থান, ভিজে নীলাম্বরী।
আকাশে শুকায় চুল
অপ্রাপ্য প্রেয়সী।
উঠে বসি—
মাথায় ঠেকিতে পড়ে পাড়।
চাহি পাশে,—
স্মিতহাসি আমার প্রেয়সী—
ঢেলেছে কাচের গ্লাসে ডাক্তারী
দাওয়াই ;
খাওয়াই তা চাই।
ফাটা প্লেটে দাড়িম্ব বিদরে,
থরে থরে

রসপাণ্ডু জরসন্ধী দানা,
ক'সো পেয়ারার কুচি
যদি রুচি ফিরে।
পেটে মৃত্যুঞ্জয়ী শূল
থেকে থেকে করিছে উল্লাস,
হৃদয়ে হুল্লাস চলে,
চিত্তে উপবাস।
চাবিবন্ধ খালি বাক্সে চাপা উপহাস।
ডাক্তারী দাওয়াই
খাওয়াই তো চাই।"

কেঁদে চ'লে গেল কানা মেঘ
আকাশপ্রান্তরে ;
পূবে উঠে গেল রামধনু,
ডুবে সূয্য রঙিন পশ্চিমে।
সন্ধ্যার আঁধারে
চিত্তমাঝে উঠে ধোঁয়াইয়া
হারানো পুরানো মুখ
বিস্মৃতি-বিকৃত,
ফুরানো দুঃখের যত অম্লমধু স্মৃতি।

ঘণ্টা উঠে বাজি,
গৃহদেব শালগ্রাম লভে নিত্য পূজা।
উদ্দেশে নোয়াতে মাথা
দেখিলাম, ঠিকই দেখিলাম—
পিতামহ-পিতামহী নবীন দম্পতি
চেলাঞ্চলে গ্রন্থি বাঁধা
করিছে প্রণাম,—
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।

পলক পালটি মুছি কপালের ঘাম
দেখিলাম, ঠিকই দেখিলাম—
কাশী গয়া বৈদ্যনাথধাম,
তীর্থঙ্কর প্রপিতামহের
অন্তিম জাহ্নবীযাত্রা, পূর্ণ মনস্কাম,—
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।
ঘণ্টা উঠে বাজি,
উঠে বাজি
পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষে পুরুষে
যত জন্ম, যত মৃত্যু, উৎসব
ব্যসন,
শান্তি স্বস্ত্যয়ন,
ভবতু শতায়ুঃ, সপ্তপদী, লাজ-
বরিষণ,
মধু বাতা ঋতায়তে ;—
তার মাঝে অক্ষুণ্ণ অম্লান
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।

মানুষের গৃহের দেবতা
তাই হওয়া চাই,—
গণ্ডকীর খরস্রোতে গড়াতে
গড়াতে
অনয়ন, অশ্রবণ, হস্তপদ নাই,
শিলায় শিলিত বুক
বজ্রকীটবিদ্ধ,—
তাই হওয়া চাই।
তবু কেন
সে দেবতা সে মানুষ সে ধরণী
ছেড়ে

চ'লে যেতে হবে ভেবে
শান্তি নাহি পাই ?
মনে হয়—সবই ভালবাসি,
নহে শুধু আলো, শুধু হাসি,
অন্তর-অন্তরে
বাস করে দীর্ঘ উপবাসী
যে লীলাবিলাসী,
সে আমার
রোগ-শোক-দৈন্যেরও পিয়াসী।

রোগ তবে রোগ নয় ?
শোক নহে শোক ?
দৈন্য সে কথার কথা তবে ?
এত যে যন্ত্রণা
এ সবই নেপথ্যবাসী আমারই
মন্ত্রণা ?

আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যুমদিরায়
জীবনের নেশা কাঁপে তারায়
তারায়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

খাণ্ডবদাহন

হে পাবক বহ্নিরূপী, শুদ্ধ অগ্নি চিরজ্যোতিষ্মান,
অরুচি হয়েছে পুনঃ ? আসিয়াছ নবতর বেশ—
এই দীন ধরাধামে ব্যাধিমুক্তি করিতে সন্ধান ;
কোথা পার্থ ? মনে হয় মিলিয়াছে তাহারো উদ্দেশ।
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি চলিয়াছে খাণ্ডবদাহন,
পুড়িছে মানুষ-পশু, বাহিরিতে নাহি কোনো পথ—
বহ্নি এল বন্যারূপে, শিব হ'ল শবের বাহন,
চালান শঙ্কর নিজে সৃষ্টিধ্বংসী শমনের রথ।
দাবানলে মরি পুড়ে গাণ্ডীব-টঙ্কার শুনি কানে,
তবু মোরা ভুলে যাই বহ্নি-ব্যাধি করি নিরাময়—
শিখা যদি শুদ্ধ হয় অসংখ্য পতঙ্গ-প্রাণ-দানে,
তবু ক্ষুদ্র পতঙ্গের চিত্ত হতে ঘোচে কি সংশয় ?
ঘুচুক অরুচি তব, শুচি হও শুচি ধরায়—
তোমারে ডরি না বহ্নি, ভয় করি ক্লেদাক্ত জরায়।

পশ্চাতের আমি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অরবিন্দ। Woodburn Company-র সিনিয়র পার্টনার একজন মহিলা, কাজেই Dear Madam।

মিস গুপ্ত। ওঃ, তাই বলুন! কিন্তু কাজ কিছু এগোল না।

অরবিন্দ। (ফাইল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে) দাঁড়ান দাঁড়ান, পেয়েছি, এই যে, আজ সকালে Woodburn Company-র চিঠির খসড়া ক'রে রেখেছিলাম। বাই জোভ! এই নিন, চটপট এখানা টাইপ ক'রে ফেলুন।

মিস গুপ্ত টাইপ করিতে লাগিল. কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া

মিস গুপ্ত। কি দেখছেন?

অরবিন্দ। দেখছি আপনার অনামিকার আংটির হীরের টুকরোর আলোক-ছটায় আর বিদ্যুতের বাতির আলোক-ছটায় তালে তালে সঙিন-চালনার ঝকমকি; দেখছি, আপনার আঙুলগুলো পিয়ানো-বাদনের আনন্দে নৃত্য করছে, আর লৌহযন্ত্রটার রূঢ় শব্দে আমার কানে বহন ক'রে আনছে স্বপ্নের পক্ষীরাজের ক্ষুরের ধ্বনি।

মিস গুপ্ত। এটা কি বুঝতে পারছি না। এটা 'স্টেট' না 'স্লেট'?

অরবিন্দ। দেখি দেখি, ওটা স্টেটও নয়, স্লেটও নয়; ওটা সেন্স।

মিস গুপ্ত। এ চিঠিখানা যেন কেমন কেমন!

অরবিন্দ। তার কারণ ওখানা চিঠিই নয়, কীটসের 'ওড টু নাইটিং-গেল' কপি ক'রে রেখেছিলাম, তাই আপনাকে দিয়েছি।

মিস গুপ্ত। এ আবার কি খেয়াল?

অরবিন্দ। সে সতর্কবাণী মনে আছে তো—যে আমার কোন কথা বিশ্বাস করবেন না?

মিস গুপ্ত। ভুলতে অবসর দিচ্ছেন কোথায়? কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল হ'ল কেন?

অরবিন্দ। মুখ নীচু ক'রে টাইপ করতে থাকলে আপনাকে নিরিবিলি দেখবার অবসর পাওয়া যায়।

মিস গুপ্ত। কি এমনি দেখবার মত আমার মধ্যে আছে, মিঃ চৌধুরী ?

অরবিন্দ। সেই আমার হারানো ছাঁচের দোসরকে যেন দেখতে পাই।

মিস গুপ্ত। বাঃ, আপনার কথা বিশ্বাস করতে নিষেধ ক'রে সেই সুযোগে যা তা ব'লে নেবেন !

অরবিন্দ। আচ্ছা, তা হ'লে কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা থাক। মিস গুপ্ত, দয়া ক'রে নীচের আফিস-ঘর থেকে ২৩ নম্বরের ফাইলটা নিয়ে আসুন। এই নিন আলমারির চাবি।

মিস গুপ্ত। এই তো কাজের লোকের মত কথা। এতক্ষণে আমার কষ্টের শেষ হ'ল।

অরবিন্দ। শেষ ? এইবারে সবে আরম্ভ হবে। দেখতে পাবেন, কি মজা।

মিস গুপ্তের প্রস্থান ; অরবিন্দ তাহার তৈলচিত্রগুলির দিকে একমনে তাকাইয়া রহিল ; এমন সময়ে সম্মুখের দ্বার দিয়া ব্যস্তভাবে অলকা প্রবেশ করিল

অরবিন্দ। এ কি, তুমি এরই মধ্যে ? সিনেমায় যাও নি ?

অলকা। দাঁড়াও, দাঁড়াও, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

অরবিন্দ। কি হ'ল ?

অলকা। সেই হীরে-বসানো ব্রুচটা—

অরবিন্দ। হীরে-বসানো ব্রুচ ? কোন্‌টা ?

অলকা। সেই যে গো ! যেটা তুমি আমার বিবাহের বার্ষিক তিথিতে দিয়েছিলে।

অরবিন্দ। কি হ'ল সেটা ?

অলকা। সেটা পাচ্ছি না।

অরবিন্দ। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে ?

অলকা। আঃ, কি বিপদ ! সঙ্গে নেব ব'লেই আজ বিকেলে বের করেছিলুম। তারপরে সিনেমায় গিয়ে মনে পড়ল, সেটা ফেলে গিয়েছি। বোধ হয় হারাল।

অরবিন্দ। কেমন ক'রে ?

অলকা। তোমারই দোষ! সাত তাড়াতাড়িতে সেটা পরতে মনে নেই ; এতক্ষণে কি আর আছে!

অরবিন্দ। না হয় আর একটা দেব—অত ভেবো না।

অলকা। সে তো দেবেই। কিন্তু ওটা যে আমার বিয়ের স্মারক, ওটা হারালে চলবে না।

অরবিন্দ। না না, হারায় নি। খুঁজে দেখ, নিশ্চয় বাক্সের মধ্যেই আছে।

অলকা। বাক্স থেকে বের করেছি, আমার বেশ মনে আছে। নিবারণ, এই নিবারণ!

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। কি মা?

অলকা। আমার হীরের ক্রচটা হারিয়েছে, দেখেছিস?

নিবারণ। হারায় নি তো মা, আমি চুরি করেছি।

অলকা। সে আবার কি?

নিবারণ। বাড়িতে জিনিস হারালে, চাকরে চুরি ক'রে—এ ছাড়া কেউ কি ভাবতে পারে?

অলকা। এখন ঠাট্টা রাখ।

নিবারণ। ঠাট্টা নয় মা, এর পরেই বলতে—তুই নিয়েছিস, তাই আগেই স্বীকার ক'রে রাখছি!

অরবিন্দ। যাও, তুমি নিজের ঘরে খুঁজে দেখ।

অলকা। যাচ্ছি, কিন্তু আমি সব ঘরেই খুঁজে দেখব, কাউকে খাতির করব না। আমার বিয়ের দিনে পাওয়া—

অরবিন্দ। তাতে দামী—

নিবারণ। তাতে আবার বাড়িতে একটা বোকা চাকর রয়েছে।

নিবারণ ও অলকার ভিন্ন দ্বার দিয়া প্রস্থান। টেলিফোনে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল

অরবিন্দ। হ্যালো? কে? ওঃ, মিস গুপ্ত। কি হ'ল? ফাইলটা পাচ্ছেন না? কেন? ওখানেই তো ছিল, নিশ্চয় আছে, ভাল ক'রে আর একবার দেখুন। নিশ্চয় নেই! আচ্ছা, তা হ'লে

আর কি করবেন! কি? আর একবার খুঁজে দেখবেন? বেশ বেশ, সেই ভাল। কি? উপরে? উপরে কি? উপরে কোন দরকার আছে? না, উপরে কোন দরকার নেই, আপনি যা করছেন, তাই করুন।

টেলিফোন যথাস্থানে রক্ষণ

নিবারণ, এই নিবারণ!

নিবারণের প্রবেশ

তোর মা কি করছে রে?

নিবারণ। আজ্ঞে, আমার বাক্স তল্লাস ক'রে এখন দিদিমণির ঘরে ঢুকেছেন।

অরবিন্দ। দিদিমণির ঘরে? মিস গুপ্তর ঘরে? সেখানে আবার কেন? কি অন্যায়! ক্ষেপে গিয়েছে নাকি?

নিবারণ। ক্ষেপে গিয়েছেন ব'লেই মনে হচ্ছে। কেবলই বলছেন, কারু ঘর আজ তিনি বাদ দেবেন না।

অরবিন্দ। কি অন্যায়! মিস গুপ্তর ঘরে কেন? সে কি মনে করবে? বল যে, সে ঘরে তল্লাস করতে আমি নিষেধ করছি।

অলকার প্রবেশ

অলকা, মিস গুপ্তর ঘরে কেন ঢুকেছিলে?

অলকা। কেন ঢুকেছিলাম? এই দেখ—

এই বলিয়া সে টেবিলের উপরে একটা হীরের ব্রুচ ফেলিয়া দিল

এইজন্যে।

অরবিন্দ। এটা কি ক'রে ও ঘরে গেল?

অলকা। কি ক'রে গেল! পরের জিনিস অন্যের ঘরে যে ভাবে যায়। লোকে যাকে বলে—চুরি।

অরবিন্দ। কি বলছ অলকা! চুরি কথনই হতে পারে না।

অলকা। তবে তুমিই বল, কি ক'রে গেল? ডেস্কের ডালা তুলতেই ঝকঝক ক'রে উঠল। কাঁচা চোর, এখনও হাত পাকে নি। ডালা বন্ধ করতেই ভুলে গিয়েছিল।

অরবিন্দ। না না, তা হতেই পারে না।

এমন সময়ে মিস গুপ্ত ফাইল লইয়া প্রবেশ করিল

অলকা। এই যে মাস্টারনী, কি ক'রে এটা তোমার ডেস্কের মধ্যে গেল, তোমার প্রভুকে একবার বুঝিয়ে দাও দেখি। আমরা তো ওকে চুরি ব'লেই জানি।

মিস গুপ্ত এক মুহূর্ত্তের জন্য কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; একবার অরবিন্দের মুখের দিকে চাহিল, একবার ব্রুচটার দিকে

অরবিন্দ। তা হ'লে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি—ও ব্রুচটা আমি ওঁকে দিয়েছিলাম।

অলকা। তুমি দিয়েছিলে? কেন?

অরবিন্দ। মানে, দিয়েছিলাম—আর কেন?

অলকা। ওঃ, এইজন্যেই এত দরদ! রাত না হ'লে চিঠি টাইপ করা হয় না! স্ত্রীকে একা সিনেমায় পাঠিয়ে দুজনে মিলে বিলেতের চিঠি লেখা হয়!

অরবিন্দ। চুপ ক'র—তুমি বুঝবে না। তোমার জন্যে ব্রুচ যেদিন কিনে আনি, সেদিন ঠিক এক রকম দুটো ব্রুচ এনেছিলাম, একটা ওঁকে দিয়েছি।

অলকা। কি মাস্টারনী, এ রকম আর কতগুলি ব্রুচ পেয়েছ? এর আগে যার কাছে ছিলে, সে নাকি ব্রুচের চেয়েও কিছু বেশি দিয়েছিল?

অরবিন্দ। অলকা, চুপ কর। ওঁকে কেন অপবাদ দিচ্ছ? দোষ তো আমার।

অলকা। তুমি এত ঘৃণ্য যে, তোমাকে হিসাবের মধ্যেই ধরছি না। হ্যাঁ মাস্টারনী, ওই চুল-ছাটা পাউডার-ঘষা মুখ নিয়ে বেশ ব্যবসা ফেঁদেছ তো! এ রকম উপরি-পাওনা থাকলে মাইনে না পেলেও চলে। শুধু ব্রুচ, না আরও কিছু পেয়েছ?

মিস গুপ্ত। অলকা দেবী, সত্যিই এ ব্রুচ আমি চুরি করেছি। মিঃ চৌধুরী আমাকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে দানের কথা তুলেছেন।

অরবিন্দ। মিস গুপ্ত, কি অন্যায়! কেন এমন মিথ্যা বলছেন?

মিস গুপ্ত। চুপ করুন মিঃ চৌধুরী, আমি প্রকৃত কথাই বলছি।

আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না। অলকা দেবী, আমিই চুরি করেছিলাম।

অলকা। কেন?

মিস গুপ্ত। অভাবে পড়লে লোকে কি চুরি করে না? আমার কি অভাব নেই? কতই আর মাইনে পাই!

এই স্বীকারোক্তিতে অলকার ভাবান্তর ঘটিল; মিস গুপ্তের প্রতি সমবেদনায় তাহার মন ভরিয়া গেল, এমন কি সমবেদনা কৃতজ্ঞতার রূপ গ্রহণ করিল; মিস গুপ্ত যেন কি ভয়ানক অপমান, গ্লানি ও বিপদ হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া দিয়াছে

অলকা। এষা, তুমি আমার ছোট বোনের মত। যদি তোমার দরকার ছিল, চাইলে না কেন? টাকার দরকার তো হয়ই। সত্যিই তো, কতই বা আর মাইনে দেয়! (অরবিন্দের প্রতি) তুমি বাপু এবার মাইনে কিছু বাড়িয়ে দিও। চল ভাই, আমরা যাই। এ ব্রুচটা তুমিই রাখ। তোমাকে আজ অনেক কটু কথা বলেছি।

অরবিন্দ। দাঁড়াও অলকা। ওঁর সব কথা বানানো। এ ব্রুচ আমিই ওঁকে দিয়েছি, প্রমাণ দিচ্ছি।

অলকা। নাও নাও, অনেক পৌরুষ দেখিয়েছ, আর প্রমাণ দেখাতে হবে না। ওঁর মত অপরাধ-স্বীকারের সৎসাহস আছে?

অরবিন্দ। এক মিনিট দাড়াও।

অরবিন্দের প্রস্থান

অলকা। আমার স্বামীটির ভাই মন বড় নরম, বাইরে যেমনই হোক, এই দেখ তোমাকে অপবাদ থেকে বাঁচাবার জন্যে সত্যি মিথ্যে কত কি বললেন। এখন আবার প্রমাণ দেখাতে চাচ্ছেন?

অরবিন্দের প্রবেশ, হাতে দুইখানা ক্যাশমেমো

অরবিন্দ। অলকা, এই দেখ দোকানের ক্যাশমেমো, দুটো ব্রুচের দুখানা ক্যাশমেমো, এক গড়ন, এক ওজন, এক দাম, এক তারিখ।

অলকা ক্যাশমেমো হাতে লইল; তাহার মুখে ঝড় আবার উদ্যত হইয়া উঠিল

অলকা। তাই তো, দুখানা ক্যাশমেমোই তো বটে! তবে কি—

অরবিন্দ। হ্যাঁ, আমিই দিয়েছি। চুরির কথা মিথ্যা। দোষ আমারই।

অলকা। আমি তোমার কথা মোটেই ভাবি না, তুমি যে অত্যন্ত কাপুরুষ, তা আমার অজানা নেই। কি মাস্টারনী, তুমি কি বল?

মিস গুপ্ত। দেখি ক্যাশমেমো দুখানা।

ক্যাশমেমো দুইখানা হাতে লইয়া

অলকা দেবী, দুটো ব্রুচ কিনলে ক্যাশমেমোতে ব্রুচের নম্বর আলাদা হ'ত।

অলকা। তাও তো বটে।

অরবিন্দ। এক নম্বরের ব্রুচ, নম্বর আলাদা হবে কি ক'রে?

মিস গুপ্ত। মিঃ চৌধুরী, মিথ্যা দিয়ে আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না। অলকা দেবী, দামী গহনা কিনলে সব দোকানই দুখানা ক্যাশমেমো দেয়, একখানা হারিয়ে গেলে যাতে আর একখানা থাকে। গহনা বদল দেবার সময় ক্যাশমেমো ছাড়া তো চলবে না। কোন কোন দোকানে তিনখানা ক্যাশমেমোও দেয়। তার মানে কি বুঝতে হবে, তিন জোড়া গহনা কেনা হয়েছে?

অলকা। ঠিক বলেছ ভাই, এই সাধারণ কথাটা আমার মাথায় আসে নি। আজ মন-খারাপের মুখে কত গালমন্দই তোমাকে দিলাম। আর সত্যিই যে তুমি দু জোড়া ব্রুচ কিনেছিলে, তা দুটো ব্রুচ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রমাণ করতে পারছ না, যতই না কেন চেষ্টা কর। ধন্যবাদ তোমাকে যে, অসহায় মেয়েটাকে চুরির অপবাদ থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছ।

মিস গুপ্ত। অলকা দেবী!

অলকা। অলকা দেবী নয়, অলকাদি।

মিস গুপ্ত। এবার আমাকে বিদায় দিন।

অলকা। বিদায়! কখখনও না। আবার কোথায় চাকরি করতে গিয়ে বিপদে পড়বে, সে হবে না। এই নাও ভাই, এ ব্রুচটা আমি তোমাকেই দিলাম।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। মা গো মা, কত বড় কাঁকড়া-বিছে!

অলকা। কোথায় রে?

নিবারণ। স্নানের ঘরে সাবান-গোলা জলের মধ্যে যেই হাত দিয়েছি, অমনই খচ ক'রে দিয়েছে হাতে হুল বিঁধিয়ে।

অলকা। তারপরে?

নিবারণ। তারপরে বেটাকে ধ'রে নিয়ে এসেছি। এই নাও। আর যেই হোক, বেটা চাকর যে চোর নয়, তা প্রমাণ ক'রে দিয়ে গেলাম।

এই বলিয়া সে টেবিলের উপরে অলকার হীরার ব্রুচটা ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান করিল

অলকা। এ কি! এই তো আমার ব্রুচ। স্নানের ঘরেই নিয়ে গিয়েছিলাম বটে। মাস্টারনী!

অরবিন্দ। দেখ, আমি সত্যি কথাই বলেছি।

অলকা। এর চেয়ে মিথ্যা অনেক ভাল। মাস্টারনী, এবার কি বলবে শুনি? চুরি? চুরিই করছ বটে, তবে ব্রুচের চেয়ে অনেক বেশি। কি, দুজনেই যে এবারে চুপ! ওঃ, আমি থাকতে তো আলাপ জমবে না। লেখ লেখ, দুজনে মিলে বিলেতের চিঠিগুলো শেষ ক'রে ফেল। কসমেটিক-ঘষা মুখের ছটায় কত ঘরেই না আগুন লাগিয়েছ! (অরবিন্দের প্রতি) কাপুরুষ!

প্রস্থান

এক মিনিট পরে নীরবে মিস গুপ্তও প্রস্থান করিল; অরবিন্দ উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি কবিতে লাগিল, মাঝে মাঝে নিজের প্রতিকৃতিগুলির দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল

অরবিন্দ। কেন, কেন, কেন এমন হ'ল? কে আমাকে এই সংসারহীন মরুর মধ্যে নিয়ে এল? যখন রসের প্রয়োজন ছিল, তখন রস তো পাই নি। কাঙাল মন তো সে তৃষ্ণা ভোলে নি। সে রসের দাবিতে হাত বাড়িয়েছিল। কার কাছে? অলকার কাছে? এষা দিল রস, কিন্তু তখন যে জীবনে অলকা এসে পড়েছে। সখী চেয়েছি, পত্নী পেলাম। যখন সখী এল, তখন তার দ্বার রুদ্ধ। এষা আর অলকাকে কি একসঙ্গে পাবার উপায় নেই? হায় ভগবান, এ তোমার কেমন অভিশাপ? এই বিপাকের মধ্যে কোন্ সে নিষ্ঠুর আমাকে এনে ফেলেছে? কে আমার জীবন ব্যর্থ ক'রে দিলে?

অলকার জীবন ব্যর্থ ক'রে দিলে? এষার জীবন ব্যর্থ ক'রে দিলে? কে সে? কোন্ নিষ্ঠুর?

চুপ করিয়া বসিল, আবার উঠিল

এই নিবারণ!

নিবারণ। (নেপথ্য হইতে) আজ্ঞে?

অরবিন্দ। আমি একটু বিশ্রাম করব, দেখিস, কেউ যেন বিরক্ত না করে।

নিবারণ। (নেপথ্য হইতে) আজ্ঞে, আচ্ছা।

অরবিন্দ ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, আলো নিবাইয়া দিয়া সোফায় উপরে শুইয়া পড়িল; কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন ঘুমাইয়া পড়িল; তখন শুধু ঘরে ঘড়ির টিকটিক ছাড়া আর কোন শব্দ রহিল না; জানালা দিয়া চাঁদের আলো তির্য্যকভাবে আসিয়া তৈলচিত্রগুলির উপরে পড়িল। তখন মনে হইল, অরবিন্দের কৈশোরের তৈলচিত্রখানা যেন ক্রমে সজীব হইয়া উঠিতেছে; ক্রমে ক্রমে ছবির ফ্রেম হইতে স্খলিত হইয়া কৈশোরের মূর্ত্তি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া নিদ্রিত অরবিন্দের পাশে দাঁড়াইল এবং বলিতে আরম্ভ করিল; তাহার গলার স্বরে যেন সজীব মানুষের কথার মূর্চ্ছনা নাই—একটানা এক রকম স্বর, যেন কোন্ অতিদূর অতীতের মধ্য হইতে বহির্গত

কৈশোর। সেই শেফালী-সরল বালিকাটিকে মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি রোজ সকালে উঠে তোমার জানলায় শিউলিফুলের রাশি দেখতে? কখনও কি মনে হয়েছে, কোথা থেকে এল সেই ফুল? মাঝে মাঝে তাকে ডেকে কথা বলতে ইচ্ছা হ'ত, নয়? কেন পারতে না? ইস্কুলে ভাল ছেলে ছিলে? কোন নীতি-সোপানে পড়েছিলে, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে নেই। তাই না? মেয়ে দেখলে পালাতে; কোন মেয়ে সম্মুখে এলে কান দুটো তোমার লাল হয়ে উঠত; অমনই বই খুলে ধাতুরূপ মুখস্থ করতে বসতে, ভয় হ'ত, কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে। কি বল, তাই না? হায়, সেই মেয়েটি বারে বারে যাতায়াত করত তোমার জানলার সমুখ দিয়ে—কেন, কখনও নিজের মনকে শুধিয়েছ? সে আজ চ'লে গিয়েছে তোমার জীবনের দিগন্তের বাইরে, চিরদিনের জন্যে।

তোমার মন র'য়ে গিয়েছে উপোসী, তাকে আজ কি ব'লে বোঝাবে? ভাল ছেলে ছিলে, ভাল ছেলে! বইকে মনে হয়েছিল জীবনের চেয়ে বড়!

এমন সময়ে টেবিলের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল, যেখানে ব্রুচ জোড়া চাঁদের আলোয় বুভুক্ষু অতীতের তৃষিত দৃষ্টির মত জ্বলিতেছে

ওঃ বাবা! ও দুটো কি? ও কার চোখ জ্বলছে? ও কার ক্ষুধিত, তৃষিত, অতৃপ্ত শাণ-দেওয়া চোখ? না না, ও দৃষ্টি সইতে পারব না।

তখন ছায়ামূর্ত্তি উঠিয়া গিয়া ফ্রেমের মধ্যে আশ্রয় লইল—আবার সে নির্জীব ছবিমাত্র

তখন প্রথম যৌবনের তৈলচিত্রের মূর্ত্তি সেই ভাবে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল

প্রথম যৌবন। সেই কোঁকড়া চুলের কিশোরীটিকে মনে পড়ে কি? তার খোঁপায় ছিল রক্তকরবী। কোথায় সে রক্তকরবী প্রতিদিন পেত কখনও ভেবেছ কি? সে ফুল ছিল তোমার বাগানের। তার ইচ্ছে ছিল, তোমার বাগানের ফুল তুমি আপন হাতে তুলে দেবে। যেদিন ফাল্গুনের দুপুরে শালবনের মধ্যে তপ্ত হাওয়া কেঁপে উঠত, আর কোন্ দূর বনের ফুলের গন্ধ আসত ছুটে—অদৃশ্য কস্তুরীমৃগের মত, সেদিন সে মেয়েটি পায়ে পায়ে শুকনো পাতার নূপুর বাজিয়ে কেন আনাগোনা করত তোমার ঘরের সমুখ দিয়ে, নির্ব্বোধ তুমি বুঝতে না, বুঝত আর সবাই। তুমি বুঝবে কেমন ক'রে? তুমি ছিলে 'ভক্তিযোগ'-পড়া চরিত্রবান বীর। মনে কি পড়ে, একদিন সেই মেয়েটি তোমার সঙ্গে কথা বলেছিল, চোখে উছলে উঠল তার শিশির-পড়া শিউলিফুলের উপরে রৌদ্রের দ্যুতি? তুমি কেবল বলেছিলে, বাঃ, তোমার লাল শাড়িখানা বেশ তো! তারপরে কি লক্ষ্য করেছ, রোজ রোজ কেন সে সেই লাল শাড়িখানা পরত? আজ কার দোষ, বল? জীবন তোমার কাছে ধরেছিল সুধা—আর তুমি চ'লে গেলে বিলেত!

ব্রুচ জোড়া দেখিয়া

ওঃ বাবা! ও কার চোখ? কোন্ তৃষিত, ক্ষুধিত, অতৃপ্ত শাণ-দেওয়া কোন্ অতীতের চোখ? না না না, ও আমি সইতে পারব না।

মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ গিয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। পরিণত যৌবনের চিত্রখানি নামিয়া আসিল

পরিণত যৌবন। তুমি বিলেত থেকে ফিরে এলে, তখন পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বসিত পূর্ণিমার পাত্র নিয়ে যে মোহিনী তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল, তখনও তুমি ছিলে 'ভক্তিযোগ'-পড়া নীতিজ্ঞের রেশ-টেনে-চলা নির্ব্বোধ। জীবনের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল সেই নারী। তার যুগল ভুরুর কালো খিলানের তলে ছিল ভাতি; সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে যদি তার হাত ধরতে মূর্খ, তবে সে জীবনের গোলক-ধাঁধা থেকে তোমাকে উত্তীর্ণ ক'রে দিত। ভেবেছিলাম, বিদেশের জীবলীলা দেখে জীবনের অভিজ্ঞতা তোমার হবে। জীবনের উপেক্ষায় জীবন আজ প্রতিশোধ নিতে উদ্যত। সখীর তৃষ্ণা মিটলে, তবেই পত্নীর প্রতিষ্ঠা হয়। দুজনকে এক দেহে পাওয়া যায় না, একসঙ্গে দুজনের স্থান নেই জীবনে, মূর্খ!

ক্রুচ জোড়া দেখিয়া

ওঃ বাবা! ও কি তারই চোখ? না তৃষিত, ক্ষুধিত, অতৃপ্ত জীবনের অভিশাপের দৃষ্টি? না না না, ও আমি সহ্য করতে পারি না।

মূর্ত্তি ফ্রেমে গিয়া মিলাইল

দরজায় ধাক্কা পড়িল। অরবিন্দ জাগিয়া উঠিল

অরবিন্দ। কে? কে?

নেপথ্যে। দরজা খোল।

দরজা খুলিয়া

অরবিন্দ। কে?

অলকা। এই রইল তোমার বাড়ির সব চাবি।

অরবিন্দ। কেন?

অলকা। আমি চললাম।

অরবিন্দ। কেন? মানে, কোথায়?

অলকা। চুপ কর।

প্রস্থান

অরবিন্দ। নিবারণ!

নিবারণ। (নেপথ্যে) আজ্ঞে?

অরবিন্দ। তোর মা কোথায় গেল রে?

নিবারণ। (নেপথ্যে) আজ্ঞে, তা বললেন না তো; ট্যাক্সি ক'রে চ'লে গেলেন।

অরবিন্দ। আর মিস গুপ্ত?

নিবারণ। (নেপথ্যে) তিনি তো আগেই চ'লে গিয়েছেন।

অরবিন্দ। আচ্ছা, আমাকে ডাকিস না, আমি এখন ঘুমুব।

অরবিন্দ দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইতেই চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল সেই ব্রুচ জোড়া চোখে পড়িল। সে চমকিয়া উঠিল

অরবিন্দ। ওঃ বাবা! এ কার চোখ জ্বলছে অন্ধকারে? কোন্ তৃষিত, ক্ষুধিত, অতৃপ্ত—

কথা বলিতে বলিতে ছবি তিনখানার দিকে তাকাইল। চাঁদের আলো সরিয়া গিয়া ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকারের মধ্য হইতে অরবিন্দের কণ্ঠস্বর শোনা গেল

না না না—

যবনিকা

প্রদীপ ও প্রজাপতি

গল্প লেখবার চেষ্টা করছিলাম।

সামনে ক্যাণ্ডেল-স্ট্যাণ্ড থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় মোম গ'লে পড়ছে নীচের প্লেটটার ওপর—মোমবাতির ঋজু দীর্ঘ দেহটা অতি ধীরে ধীরে হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হয়ে আসছে। বাইরে খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখছি, সামনে বরেন্দ্রভূমি বা বারিন্দার প্রসারিত ধানের ক্ষেত—গরুর গাড়ির কঠিন চাকায় ক্ষত-বিক্ষত বর্ষা-পঙ্কিল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা হাঁসমারির খাঁড়ির ওপারে জ্যোৎস্নার কুয়াশায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, দৃষ্টির অতীত ওই জ্যোৎস্নাময় পৃথিবীটা যেন এখানকার মত মৃৎপিণ্ডে তৈরি নয়, ওখানকার ব্যাপারটা যেন সম্পূর্ণ বায়বীয়। যেন জলন্ত নীহারিকার অবয়বহীন খানিকটা বাষ্পরূপ। রাত্রির আকাশের তলা দিয়ে এক ঝাঁক সরালি হাঁস শীতলীর দীঘির দিকে চ'লে গেল, নিদ্রিত আকাশের তলায় বহুক্ষণ ধ'রে বাজতে লাগল অপসৃয়মান পক্ষধ্বনির একটা দ্রুত তরঙ্গ।

এলোমেলো মন—টুকরো টকরো ছবি। আধুনিক কবিতার মত অচেতন সত্তা থেকে ভিড় ক'রে আসছে অসংলগ্ন চিন্তাধারা। 'সিলুট' ছবির মত পলকে পলকে দেখা দিয়ে যাচ্ছে ছায়াময় পরিচিত অপরিচিত অসংখ্য পটভূমিকা। কোনটাই স্পষ্ট ক'রে ধরা দেয় না, অগণিত সূচনার খণ্ড সুরগুলো সমষ্টিগত একটা ঐক্যতানের মধ্যে বার বার হারিয়ে যাচ্ছে। টেবিলের ওপর কলমটা নামিয়ে রেখে, তারই একটা সূত্র ধরবার চেষ্টা করছিলাম।

হঠাৎ বাইরে থেকে কি একটা পতঙ্গ উড়ে এল, ফরফর ক'রে পরিক্রমণ করতে লাগল মোমবাতির নীলাভ শুভ্র শিখাটাকে। তাকিয়ে দেখলাম, রাত-চরা একটা বড় আকারের প্রজাপতি। বর্ণ-গৌরবে খুব চমৎকার নয়, অন্তত কবি-কল্পনাকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু নিরাভরণ এই অসুন্দর প্রজাপতিটার দিকে তাকিয়ে চকিতে একটা কাহিনী মনে প'ড়ে গেল। সত্যিকারের কাহিনী। অনাগত অস্বচ্ছ

গল্পগুলোর ভিড় ঠেলে মনশ্চক্ষের সামনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ সত্তা নিয়ে উড়তে লাগল অনাহূত এই প্রজাপতিটার মতই।

* • * *

ছুটিতে দেশে আসতে হয়েছিল।

দু-চার দিনের জন্য গ্রাম আমার মন্দ লাগে না। কখনও কখনও অলস-কল্পনার মুহূর্তে দস্তুরমত ভাবপ্রবণ হয়ে উঠি, উচ্ছল নাগরিকতার বাইরে পলাতক জীবন যাপন করবার স্পৃহা জাগে। ছেলেবেলায় সোনা-পিসীমাদের বাড়ি এদিক দিয়ে আমার আদর্শস্থল ছিল।

গ্রামের দক্ষিণ দিয়ে ছোট একটি খাল ধানক্ষেতের আড়ালে আড়ালে এঁকেবেঁকে একেবারে সাহেবের চর ষ্টীমার-ঘাটের নীচে আড়িয়লখাঁয় গিয়ে নেমেছে। সেই খালের ওপরে নড়বড়ে বাঁশের চার বা সাঁকো পার হ'লেই সোনা-পিসীমার বাড়ি। কাঁটাফুলের এলোমেলো জঙ্গল ছাড়িয়ে সুপুরির বাগান, ঘন ছায়ার তলা দিয়ে স্যাঁত-সেঁতে কালো মাটির ভিজে পথ পায়ের দাগে দাগে চিহ্নিত হয়ে এগিয়ে গেছে মুখুজ্জে-বাড়ি পর্য্যন্ত। পথের আশেপাশে চার-পাঁচটি মঠ বা চিতা, মুখুজ্জে-বাড়ির লোকান্তরিত প্রাক্‌পুরুষদের স্মরণচিহ্ন। আমাদের পূর্ব্ব-বাংলার গ্রামে প্রায়ই কোন নির্দ্দিষ্ট শ্মশানভূমি থাকে না, নিজেদের জমির এলাকাতেই শবদাহ করবার নিয়ম।

সোনা-পিসীমারা এককালে খুব অবস্থাপন্ন ছিলেন। কিন্তু মামলা-মকদ্দমায় এবং ভূতপূর্ব্ব মুখুজ্জেদের আনুষঙ্গিক দোষে সে অবস্থায় ভাঁটা পড়েছে এখন। দোল-দুর্গোৎসব আজও হয়, কিন্তু এখন সে সব নিছক পূর্ব্বপুরুষদের ক্রিয়াকাণ্ড রক্ষা করা মাত্র। চণ্ডীমণ্ডপের অবস্থা জরাজীর্ণ, আগাগোড়াই হোগলার বেড়া বেঁধে দিতে হয়েছে। একবার বৈশাখের ঝড়ে নাটমন্দির উপড়ে পড়েছিল, তারপরেই রাতারাতি টিনগুলো যে কোথায় চালান হয়ে গেল, আজও তার হদিস মেলে নি। দোলমঞ্চটায় অসংখ্য ফাটল, বিষধর সাপের আস্তানা। তিন বছর থেকে দুর্গাপূজায় আর প্রতিমা তৈরি করা হয় না, ঘটের মাথায় ফুল-জল দিয়েই দেবীকে আহ্বান করা হয়। পিতৃপিতামহের ধারা, তাই একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া চলে না।

একেবারে অসচ্ছল অবস্থা এখনও বলা যায় না। তালুক থেকে সম্বৎসরের ধান চাল আসে, ছোট্ট সংসারটি চ'লে যায় অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ এবং পরিপাটি ভাবে। আর সোনা-পিসীমার হাতের চিঁড়ের মোয়া সারা গ্রামে সুবিখ্যাত, আমার পক্ষে সেটাও একটা দুর্ব্বার আকর্ষণ।

বাগান পেরিয়ে বাড়ির ভেতর পা দিতেই টুনু-বউদির সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম দেখা হয়ে গেল। উঠনের একপাশে ছোট চালার নীচে ঢেঁকি বসানো। টুনু-বউদি চিঁড়েই কুটছিলেন বোধ করি। নোলক-পরা ছোট একটি প্রতিবেশিনী মেয়ে ঢেঁকির সামনে ব'সে ছিল, নতুন মানুষ দেখে সে হাঁ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

গাছকোমরটা খুলে নিয়ে ঘোমটার মত ক'রে মাথায় তুলে দিলেন টুনু-বউদি। তারপর আমার দিকে একরকম ছুটে এলেন বললেই হয়। অ্যা, রঞ্জন-ঠাকুরপো যে! গরিবের বাড়িতে পথ ভুলেই এলেন নাকি?

টুনু-বউদি সেই জাতের মানুষ, যার কেবলমাত্র উপস্থিতিটাই অকারণ প্রসন্নতায় মনকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে। স্বাস্থ্যপুষ্ট শ্যামল মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল, কপালে আর সীমন্তে সিঁদুরের রক্তরাগ। রুক্ষ চুলের নীচে প্রশস্ত ললাটের প্রান্তে প্রান্তে মুক্তাচূর্ণের মত ঘামের বিন্দু জ'মে উঠেছিল।

বললাম, সত্যি, ক'দিন সময় পাই নি। তারপর সবাই ভাল তো?

টুনু-বউদির মুখের ওপর কেমন একটা ছায়া পড়ল। বললেন, না ভাই, ভাল আর কোথায়? মাকে নিয়েই বড্ড অশান্তিতে আছি।

মাকে নিয়ে? পিসীমা? তাঁর আবার কি হয়েছে?

ওঃ, আপনি জানেন না বুঝি?

বউদির চোখের দৃষ্টি ম্লান হয়ে এল। বললেন, গত বছর কার্ত্তিক মাসে খুব বেশি অসুখ হয়েছিল, কোন আশাই ছিল না। সেরে উঠেছেন, কিন্তু ডান দিকের সব অঙ্গগুলো একেবারে অসাড় হয়ে গেছে। বয়স তো আর কম হ'ল না। ঘরে চলুন না, দেখবেন।

ঘরে ঢুকতেই মুহূর্ত্তে মনটা আড়ষ্ট এবং সংকুচিত হয়ে উঠল। সোনা-পিসীমাকে এ অবস্থায় দেখবার কল্পনা কোন দিন করতে পারি নি। খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে বিকালের সূর্য্য তার রক্তরশ্মি ঘরের মধ্যে

ছড়িয়ে দিয়েছে, তারই খানিকটা অত্যন্ত করুণ হয়ে পিসীমার মুখের ওপর এসে পড়েছিল। মুখখানা বাঁ দিকে অদ্ভুত রকমে বড়শির মত বেঁকে এসেছে, ডান চোখটা ভীতিকরভাবে বিস্ফারিত, যেন তলার থেকে আর একটু ধাক্কা লাগলেই কোটর থেকে বেরিয়ে চ'লে যাবে। ঘরময় অস্বাস্থ্যকর একটা গন্ধ। যে অংশটায় আলো পড়ে নি, সেখানে অস্বচ্ছ খানিকটা ছায়া জমাট বেঁধে রয়েছে অন্ধকারের মত। কাঠের একটা বেঁটে টিপয়ের ওপর কতগুলি কবিরাজী শিশিপত্র, একটা সাদা কানা-ভাঙা চীনামাটির পাত্রে মলমজাতীয় খানিকটা সবুজ জিনিস। ঠিক বিছানার ওপরেই অপরিচ্ছন্ন একটা পিতলের পিকদানি। সবটা মিলিয়ে ঘরের মধ্যে মৃত্যুর অতি প্রত্যক্ষ বিষনিশ্বাস যেন আমি অনুভব করলাম।

বউদি বললেন, মা, রঞ্জন-ঠাকুরপো এসেছেন।

পিসীমা উঠে বসবার চেষ্টা করলেন। তাঁর বাঁ চোখটা পরিচিত স্নেহ-কোমলতায় করুণ আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। বললেন, কে, রঞ্জন? কতদিন পরে এলি বাবা! ভাল আছিস তো?

বললাম, ভালই আছি পিসীমা।

বেঁচে থাক বাবা, রাজরাজেশ্বর হয়ে থাক। বঙ্কুর কাছে শুনেছিলাম, বি. এ. পাস করেছিস তুই। শুনে কত যে খুশি হয়েছি, কি বলব। তা চাকরি-বাকরি কিছু কি জুটল?

আপাতত কলকাতায় এম. এ. পড়ছি পিসীমা।

কলকাতা? মুহূর্তে সোনা-পিসীমার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। জানলার ফাঁক দিয়ে বিকালের যে সোনালী আলো তাঁর মুখের ওপরে প্রতিফলিত হয়েছিল, সেই আলোতে তাঁকে অনেকখানি স্বতন্ত্র ব'লে মনে হ'ল।

সোনা-পিসীমা যেন অনেকটা স্বগতোক্তি করলেন, বঙ্কুর ইচ্ছে বউমাকে কলকাতা নিয়ে যায়। মেসে খাওয়া-দাওয়া ক'রে আপিস করতে ওর বড্ড অসুবিধে হচ্ছে। আর আমি তো পাঠিয়েই দোব ভেবেছিলাম, কিন্তু অসুখে প'ড়েই—

টুনু-বউদি বাধা দিলেন। ব্যস্ত হয়ে বললেন, ওসব কথা থাকুক না।

মালিশের তেলটা এনে দোব? কবিরাজমশাই তো বিকেলবেলাই মালিশ করতে ব'লে গেছেন।

সোনা-পিসীমা চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাঁকা মুখখানার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বেদনা বোধ হতে লাগল। মনে হ'ল, আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই কি একটা অলক্ষ্য বস্তুর হস্তস্পর্শ—এদের দুজনের মাঝখানে কোথায় বিচ্ছেদের একটা সূক্ষ্ম রেশমী যবনিকা দুলছে। কেউ যেন কারও কাছে স্পষ্ট ক'রে ধরা দিতে চায় না। পারিবারিক জীবনের প্রাত্যহিক পরিচয়ের আড়ালে অভিমান আর অবিশ্বাসের একটা ছায়ামূর্ত্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সোনা-পিসীমা বললেন, মালিশ একটু পরে করলেও চলবে। বিজয়ার পরে রঞ্জন এসেছে বউমা, দুটি চিঁড়ে মুড়কি দাও ওকে। যা বাবা, বাইরে ব'স গিয়ে। রুগীর ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে নেই।

রোদের সোনালী রঙ ফিকে আর কালচে হয়ে আসছে। সোনা-পিসীমার বাঁ চোখটা বুজে এল, ডান চোখ তখনও অস্বাভাবিক বিস্ফারিত। তাঁর ম্লান মুখের ওপর ছায়া ছড়াতে লাগল ক্ষীয়মান পঙ্গু জীবন আর আভাসিত পাণ্ডুর মৃত্যু।

টুনু-বউদি বললেন, চলুন ঠাকুরপো, বাইরেই চলুন। বেশি কথা কইলেই ওঁর অস্বস্তি বাড়ে।

দাওয়ায় একখানা হোগলা পেতে দিয়ে টুনু-বউদি আমার জন্যে এক থালা মোয়া আর নারকেলের সন্দেশ এনে হাজির করলেন।

অন্যমনস্কভাবে খেয়ে চলেছিলাম। ফাটল-ধরা দোলমঞ্চ আর জীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপটার দিকে তাকিয়ে নানা অর্থহীন চিন্তা মনের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পাশেই চাটুজ্জেদের প'ড়ো ভিটেতে এক বুক জঙ্গল। আজ প্রায় বিশ বছর হতে চলল, কলকাতায় গিয়ে বাস্তু বেঁধেছে তারা। ভাঙাচুরো ভিটেগুলির ওপর উইয়ে-ধরা দুটো একটা শালের খুঁটি, পচা বাঁশের টুকরো, ভাঙা মরচে-পড়া দু-একখানা টিন। গ্রামের লোকে দরজা-জানলা, কাঠ-বাঁশ যথাসম্ভব সরিয়েছে, সাপের ভয়ে

এখন আর এদিকে কেউ পা বাড়ায় না। একেবারে খালের পাশেই বহুকালের পুরনো যে হিজলগাছটা চারপাশে বুড়ির মত জটা নামিয়ে দিয়েছে, তার তলায় স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে যে শ্যাঁওলা-পড়া লম্বা বেদী, ওইটেই ছিল চাটুজ্জেদের কালীখোলা। গভীর রাত্রে খাল দিয়ে চলবার সময় 'কেরায়া' নৌকোর মাঝীরা ওখানে নাকি অসম্ভব মূর্ত্তি দেখতে পায়, শুনতে পায় অমানুষিক কান্না!

হঠাৎ চমক ভাঙল। আঁচলের কোণটা হাতের আঙুলে জড়াতে জড়াতে টুনু-বউদি হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসলেন, আপনি তো কলকাতায় থাকেন ঠাকুরপো, ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়?

বললাম, কে, বঙ্কুদা? হ্যাঁ, অনেক দিন আগে একবার পথে দেখা হয়েছিল বটে।

টুনু-বউদি অন্যমনস্কভাবে বললেন, এবার পুজোর সময় দেশে এসেছিলেন। বললেন, শরীরটা আদৌ ভাল যাচ্ছে না। মেসের খেয়ে দশটা পাঁচটা আপিস করা, বুঝতেই তো পারেন।

না বোঝবার কথা নয়। বললাম, কলকাতায় বাসা করতে চান বুঝি?

তাই তো বলছিলেন। কিন্তু মার এই অবস্থা, এখন ওঁকে ফেলে আর—

বললাম, তা ওঁকেও নিয়ে গেলে হয় না?

অপ্রসন্ন মুখে টুনু-বউদি চুপ ক'রে রইলেন। নীরবতার অর্থটা অত্যন্ত পরিষ্কার। মৃত্যু যেখানে অনিবার্য্য অথচ অকারণ বিলম্বিত, সে ক্ষেত্রে নিষ্ফল সহানুভূতির বোঝা টানতে টানতে মানুষের ক্লান্তি আসবেই। শুশ্রূষায় তিক্ততা, সেবায় বিরক্তি।

বললেন, অঢেল খরচা, তা ছাড়া নাড়াচাড়া করতেও হাঙ্গামা আছে বিস্তর। আর একটা কথা কি, জানেন? মা কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে যাবেন না, যেতেও দিতে চান না। ওঁর ধারণা, ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, বাগানের ফল-পাকড়—এর চাইতে সুখ নাকি কোথাও নেই।

তা এমন মন্দ কি?

টুনু-বউদির চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বললেন, মন্দ কি? আপনিও তাই বললেন? মাছ-তরকারি সুখটা কি এতই বড় হ'ল? শরিকী হাঙ্গামা, চোরের উপদ্রব, দিনরাত একজনের জন্যে দুশ্চিন্তা— আচ্ছা, আপনিই বলুন তো ঠাকুরপো, এতে লাভটা কি?

দৃষ্টির ভেতর দিয়ে টুনু-বউদির মনটি বেরিয়ে আসছিল। সায় দিয়ে বললাম, না, লাভ নেই।

বউদি আবার নীরব হয়ে রইলেন। সমস্ত উঠনটার ওপর দিয়ে আসন্ন সন্ধ্যার ম্লানিমা। বাড়িটা বিচিত্রভাবে নির্জ্জন, কেবল ঘরের ভেতর সোনা-পিসীমার কাসির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। বললাম, অন্ধকার হয়ে এল বউদি, এবারে চলি। যাওয়ার আগে আর একদিন আসব।

বসুন না, তাড়া কিসের? আচ্ছা ঠাকুরপো, যদি সত্যিই এমন হয়, মানে—। একবার দ্বিধা ক'রে বউদি বললেন, মানে, কলকাতায় যদি আমাদের বাসা হয়, তা হ'লে খোঁজ-খবর নেবেন তো?

বাঃ, নোব না!

টুনু-বউদির কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে স্বপ্নাতুর হয়ে আসছিল। সামনে সুপুরি-বাগানের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, আমার ভাবতে বেশ লাগে ঠাকুরপো, ছোট্ট একটি বাসা ক'রে আছি দুজনে। ছিমছাম গুছনো একটি সংসার। সন্ধ্যেবেলা উনি আপিস থেকে ফিরলে কড়ায় ক'রে খান কয়েক লুচি ভেজে দোব, চা ক'রে দোব। ছুটির দিনে দুজনে যাব আলিপুরের চিঁড়িয়াখানায়, কোন দিন যাব বায়োস্কোপ দেখতে। টকি আমার খুব ভাল লাগে ঠাকুরপো। মামার বাড়িতে থাকবার সময় দু-একবার দেখেছিলাম, তারপরে আর হয় নি।

বেশ তো, কলকাতায় গেলে প্রাণ ভ'রে টকি দেখবেন।

আর থিয়েটার! ওঁর কোন্ এক বন্ধু নাকি থিয়েটারের পাস দেয় ওঁকে। ইচ্ছে করলেই উনি বিনা পয়সায় থিয়েটার দেখতে পারেন।

টুনু-বউদির বলবার আরও অনেক ছিল, কিন্তু আমার আর বসবার সময় ছিল না। দু-চার কথার পরে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টুনু-বউদির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কেবল অন্ধকার

বাগানের পথ দিয়ে আসবার সময় সোনা-পিসীমার কাসির শব্দটা তীবের মত এসে আমার কানে বিঁধতে লাগল।

আরও কিছুদিন পরে খবর পেয়েছিলাম, সোনা-পিসীমা মারা গেছেন।

• •

কাহিনীটা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু প্রায় তিন বৎসর বাদে একদিন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেল বঙ্কুদার সঙ্গে।

ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে প্রণাম করছিলেন বঙ্কুদা। বগলে এক গাদা বই নিয়ে লাইব্রেরি-ওয়ার্কের পরে আমি ফিরে আসছিলাম ইউনিভার্সিটি থেকে। হঠাৎ বঙ্কুদার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। বিদ্যুৎবেগে হাতের সিগারেটটাকে জুতোর তলায় চালান ক'রে দিলাম। আমাকে দেখে বঙ্কুদা হাসলেন। বললেন, আরে, রঞ্জন যে, ভাল আছ?

মাথা নেড়ে জানালাম, ভালই আছি। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, দেশের সব কুশল তো?

দেশ? দেশে কে আছে আর? মা মারা যাওয়ার পরে সবই তো এখানে তুলে এনেছি।

চকিতে বহুদিনের আগেকার একটি আসন্ন সন্ধ্যা মনে প'ড়ে গেল। চমকে বললাম, বউদিও এখানে?

বঙ্কুদা সলজ্জভাবে হাসলেন।

বাঃ রে, সেটা আগে বলতে হয়! ঠিকানা দাও, কালই দেখা ক'রে আসব।

বঙ্কুদা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেও বলেছে অনেক দিন। তা তুমি যে সৃষ্টিছাড়া মানুষ ভায়া, তোমার পাত্তা কি সহজে মেলে! কয়েকবার খোঁজও করেছিলাম, কিন্তু দেখা পাই নি।

বঙ্কুদা ঠিকানা দিলেন। বাগবাজারে কি এক হরিহর দাস বাই লেন। গলিটা কখনও দেখেছি ব'লে মনে পড়ল না।

খুঁজে নিতে একটু কষ্ট হবে। জায়গাটা কি বলে—একটু ইয়ে কিনা। ওই মদনমোহনের বাড়িটা ছাড়িয়ে কয়েক পা এগোলেই। তা কবে যাচ্ছ?

বললাম, যাব একদিন সময় ক'রে। বউদিকে ব'লে রেখো।

হ্যাঁ হ্যাঁ, রাখব বইকি। আচ্ছা, তা হ'লে এখন আসি ভাই। আমার আবার টিউশনি আছে, দেরি হয়ে যাবে।

অত্যন্ত অমায়িকভাবে হেসে বঙ্কুদা চ'লে গেলেন। আধময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবির ছেঁড়া কাঁধটা তাঁর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, মুখে তিন দিনের না-কামানো দাড়ি, পুরনো ছাতাটার বর্ণসাম্যহীন তালিগুলোতে দারিদ্র্যের নগ্ন-চিহ্ন।

কয়েক দিন নানা কাজে নিশ্বাস ফেলবার জো ছিল না। বেনামীতে এক বইওয়ালাকে নোট লিখে দিয়েছিলাম, কণ্ট্রাক্টের টাকা কটা আদায় হয়ে গেলে টুনু-বউদির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

কলকাতার বহু গলির সঙ্গেই পরিচয় আছে। প্রাসাদপুরীর আলোকিত রঙ্গমঞ্চটার পেছনে মানুষের গম্য-অগম্য অনেক অন্ধকার গহ্বরেই যাতায়াত করতে হয়েছে, তাই হরিহর দাস বাই লেনকেও আবিষ্কার করতে পারলাম। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কল্যাণে একটা বড় বাড়িকে ভেঙে অনেকটা জায়গা বার করা হয়েছে, সন্ধ্যা হ'লে সেখানকার চুন-সুরকির স্তূপের ওপর বিকৃতরূপা একদল মেয়ে বিফল প্রসাধন ক'রে খরিদ্দারের আশায় ব'সে থাকে, বিড়ি টানে, অশ্লীল ভাষায় ইয়ার্কি করে, একটু দূরে যে লোকটা লোহার উনুনে পেঁয়াজ-ফুলরি ভাজছে তার সঙ্গে করে কলহ। ঠিক তারই পাশ দিয়ে ছোট্ট একটু কানা গলি—হরিহর দাস বাই লেন। সিউয়ার্ড ডিচের মত দেড় হাত প্রশস্ত অন্ধকার পথ—দু পাশে নোনা-ধরা দেওয়ালগুলো গায়ের ওপর চেপে আসবার উপক্রম করে। পায়ের নীচে পচা ভাত আর মাছের কাঁটা, খবরের কাগজে মোড়া অকথ্য আবর্জ্জনা।

ব্যাঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে বঙ্কুদার দেওয়া নম্বরটার কাছে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আমার চক্ষুঃস্থির হয়ে গেল। কোন ভদ্রলোক এমন জায়গায় বাস করতে পারে, এ কল্পনার অতীত। পুরনো একতলা বড় বাড়ি, চুন-সুরকি-খসা দেওয়ালে নগ্ন ইটগুলো কোণা বার ক'রে রয়েছে। সদর দরজায় কবাট নেই, একটা ছেঁড়া চট সেখানে পর্দ্দার মত ঝুলছিল।

কড়া নাড়বার জো নেই। গলা-খাঁকারি দিয়ে ডাকলাম, বঙ্কুদা, বঙ্কুদা আছেন ?

কে গো ?—নারীকণ্ঠে কর্কশভাবে প্রশ্ন এল, কাকে চাই ? পরক্ষণেই ছেঁড়া চটের ফাঁক দিয়ে প্রৌঢ়ার একখানা তামাটে কুৎসিত মুখ বেরিয়ে এল। শকুনের মত তীক্ষ্ণ চোখ আমার সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে নিয়ে সে মুখখানা আবার জিজ্ঞেস করলে, কাকে চাই মোশায়ের ?

সসঙ্কোচে বললাম, বঙ্কিম মুখুজ্জে এখানে থাকেন কি ?

খনখন ক'রে গলা বেজে উঠল, থাকেন না তো যাবেন কোন্ চুলোয় ? তা এখন তো তাঁর পাত্তা মিলবে না, তাঁকে পাওয়া যাবে রাত দশটার পরে। তুমি কি পাওনাদার বাপু ? তা হ'লে সোজা চ'লে যাও, তাঁর চাকরি নেই এখন।

বললাম, না, পাওনাদার নই। আমি তাঁদের আত্মীয়, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করব।

আত্মীয় ? তা অত আদিখ্যেতার দরকার কি, আগে বললেই তো হ'ত। এস এস, ভেতরে এস। এ বাড়ি আমার, আমিই এখানকার বাড়ি-উলি।

ভেতরে ঢুকতেই প্রৌঢ়া বাঁ দিকে একখানা ঘর দেখিয়ে দিলে, ওই তাদের ঘর। আর কোন দিকে যেয়ো-টেয়ো না বাপু, আমার অন্ত ভাড়াটে আছে। তাদের আবার আব্রু বড্ড বেশি।

নির্দ্দিষ্ট ঘরখানার দিকে এগোতেই ধোঁয়ায় আমার দমবন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হ'ল। একটা টিনের তোলা উনুনে সবে আঁচ দেওয়া হয়েছে, নিবিড় কয়লার ধোঁয়ায় কোলের মানুষ দেখা যায় না। তবুও তার ভেতর দিয়ে ঘরের বারান্দায় আমি টুনু-বউদিকে দেখতে পেলাম।

বললাম, টুনু-বউদি, আমাকে চিনতে পেরেছেন ?

টুনু-বউদি উঠে দাঁড়ালেন। হর্ষোচ্ছল গলায় বললেন, রঞ্জন ঠাকুরপো! এসেছেন?

কিন্তু টুনু-বউদির এ কি চেহারা! তিন বছর আগেকার সে মানুষটি আর নয়। এ তার একটা অস্থিচর্ম্মসার কঙ্কালমাত্র। চোয়ালের হাড়ের ওপর একটা পাতলা চামড়ার আবরণ, কালো গর্ত্তের ভেতর মলিন চোখ দুটো প্রায় ডুবে গেছে বললেই চলে। কাচের মার্বেলের মত অসুস্থ একটা ঘোলাটে দৃষ্টি। যেন বহুদূর থেকে সে দৃষ্টি ভেসে আসছে।

ঘরের ভেতর থেকে ছেঁড়া একটা মাদুর এনে বউদি বারান্দায় পেতে দিলেন। বললেন, উঃ, কতদিন পরে দেখা হ'ল আপনার সঙ্গে! বললাম, কিন্তু আপনার এ কি শ্রী হয়েছে বউদি! একেবারে যে চেনাই যায় না!

টুনু-বউদি ক্লিষ্টভাবে বললেন, কমাস থেকেই শরীরটা ভারী খারাপ যাচ্ছে ঠাকুরপো। রাত্রে ঘুসঘুসে জ্বর হয়, আর সেই সঙ্গে কাসি। উনি কি একটা কবিরাজী ওষুধ নিয়ে এসেছেন কদিন হ'ল, তাই খাচ্ছি একটু একটু।

স্থিরদৃষ্টিতে আমি টুনু-বউদির মুখের দিকে তাকালাম। কোন ভুল নেই। এ বাড়ির আবহাওয়ায় দিনের পর দিন যে মৃত্যুবীজেরা পুষ্ট ও লালিত হয়ে চলেছে, তাদেরই অলক্ষ্য ক্ষুধা টুনু-বউদিকে স্পর্শ করেছে এসে। বুকের প্রাণপিণ্ড দুটোকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিঃশেষে কেটে কেটে খেয়ে চলেছে তারা।

সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি পড়ল উঠনের কলতলার দিকে।

তরল কাদা আর এক রাশ উচ্ছিষ্ট। একটা কাক ডিমের খোলা ঠোঁটে ক'রে উড়ে গেল। তিন-চারটি মেয়ে কলতলায় প্রাণপণে বাসন মাজছে, একটির বক্ষোবাস অশোভন রকমে অসংযত। ছেঁড়া গামছা

পরা একজন রোমশ পুরুষ একটু দূরে একটা তোবড়ানো টিনের মগ হাতে দাঁড়িয়ে, থেকে থেকে অসংবৃত-বসনা মেয়েটির দিকে তার চোখের তির্য্যক দৃষ্টি ঘুরে আসছে। ওদিকের বারান্দা থেকে কে খানিকটা পানের পিক ফেললে, জল-কাদার সঙ্গে মিশে পিকের লাল রঙটা উঠানের অনেকখানি অবধি প্রসারিত হয়ে গেল।

দুর্ব্বল কণ্ঠে টুনু-বউদি বললেন, সত্যি, বড্ড কষ্টেই আছি। আপিসে একজন মাদ্রাজীকে নিলে, তাইতে চাকরি গেল, এখন দুটো টিউশনিই ভরসা। তবু তো দুবেলা ছুটোছুটির কামাই নেই। একটা ছেলে হয়েছিল জানেন বোধ হয়, মাস তিনেক আগে রক্ত-আমাশয়ে ম'রে গেল, একবার ডাক্তার অবধি ডাকতে পারলাম না। মাঝে মাঝে ভাবি, এর চাইতে গ্রামে থাকলেই বোধ হয় ভাল হ'ত, কিন্তু ওঁকে এভাবে ফেলে কি ক'রে যাই?

একটু থেমে আবার বললেন, আচ্ছা ঠাকুরপো, বায়োস্কোপে 'বাংলার মেয়ে' দেখেছেন আপনি?

টুনু-বউদির চোখ দুটো চকচক করতে লাগল, আশায় নয়—অশ্রুতে।

* * *

ভাবনায় ছেদ প'ড়ে গেল।

কলমে কালি ফুরিয়ে এসেছে। চোখ তুলে তাকাতেই দেখলাম, জলতে জলতে মোমবাতিটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। আর ক্যাণ্ডল-স্ট্যাণ্ডের নীচের প্লেটখানার ওপর প'ড়ে আছে সেই প্রজাপতিটা,—মৃত্যুর স্পর্শে তার প্রসারিত ডানা দুটি নিশ্চল।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

গত সোমবারে রথী ইনস্পেকটার আফিসে গিয়া তাহার দরখাস্ত (১) সহি করিয়া আসিয়াছে। বুধবারে আপনার পত্র পাইলাম ইতিমধ্যে কেবল দুই তিন দিনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে উৎসবের আমোদ হইতে বঞ্চিত করিলাম না। এখানে তাহারা সময়ের অপব্যয় করিতেছে না—যত্ন করিয়া সংস্কৃত পড়িতেছে—বিদ্যার্ণব (২) প্রতিদিন তিন চার ঘণ্টা তাহাদিগকে সংস্কৃত পাঠে নিবিষ্ট রাখিয়াছেন। তাহারা ১২ই মাঘে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে বোলপুরে ফিরিবে এবং তাহার পর হইতে কোন কারণেও তাহাদের পাঠের ব্যাঘাত হইবে না। লরেন্স সাহেব (৩) আগামী মার্চ্চ মাসে বোলপুরে যাইবে। আমি মাঘের শেষ সপ্তাহে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িব—ফিরিতে দুই তিন মাস লাগিবে। ইতিমধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য আমি নিয়ম দৃঢ়বদ্ধ করিয়া সত্যেন্দ্রের (৪) প্রতি অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি—যাহাতে নিয়ম কোন মতেই শিথিল হইয়া না পড়ে আমি বার বার তাহাকে সে উপদেশ দিয়া দিয়াছি। কঠিন নিয়মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আপনি আমাকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা আমি সঙ্গত বোধ করি। এখন হইতে, নিয়ম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে আপনারা সকলেই অনুগ্রহ করিয়া তৎপ্রতি সতর্ক থাকিবেন।

সোমবার ১১ই মাঘ উপলক্ষ্যে ছুটী থাকিবে। যদি ইচ্ছা করেন তবে

---

(১) রথীন্দ্রনাথ এই বৎসর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন, দরখাস্ত এই পরীক্ষা সংক্রান্ত। (২) শিবধন বিদ্যার্ণব। (৩) কবির শিলাইদহে অবস্থানকালে বালক রথীন্দ্রনাথের ইংরেজী শিক্ষক। (৪) মধ্যম জামাতা, রেণুকার স্বামী।

শনিবার অপরাহ্নে ছুটী লইয়া সোমবার রাত্রে বিদ্যালয়ে আসিতে পারেন। সত্যেন্দ্রকে এই সম্বন্ধে আমার সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। ইতি ৮ই মাঘ ১৩০৯ (১)

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

বোলপুরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের প্রায় আরম্ভ হইতেই আপনি এখানকার প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই এক বৎসরে আপনার সহিত আমার হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গেছে—আশা করি তাহা চিরদিন রক্ষিত হইবে।

এখানে আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকিল না, সুতরাং আপনার বিদায় গ্রহণে আমি প্রতিবন্ধক হইতে পারি না—আপনি অব্যাহত উন্নতি লাভ করিতে থাকুন এই আমার অন্তরের কামনা জানিবেন।

এখানকার এণ্ট্রেন্স ক্লাসের দুটী ছাত্রকে আপনি যেরূপ যত্ন ও দক্ষতা সহকারে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন তাহাতে আপনার নিকট প্রভূত কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। শ্রীমান রথীন্দ্র ও সন্তোষ (২) এ বৎসর এণ্ট্রেন্স দিতে পারিবে এরূপ আশার কোন্ কারণ ছিল না—আপনি রথীন্দ্রকে এক বৎসরে ও সন্তোষকে এই কয়েক মাসে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার যেরূপ যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে আশাতীত—ইহাতে অধ্যাপন সম্বন্ধে আপনার নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের প্রতি আমার একান্ত আস্থা জন্মিয়াছে। ইহার পরে আপনি যে বিদ্যালয়ে যোগ দিন না কেন আপনাকে পাইয়া যে সে বিদ্যালয় লাভবান হইবে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। এই এক বৎসর যে আপনাকে অধ্যাপক-রূপে পাইয়াছিল রথীন্দ্রের পক্ষে ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। যদি

(১) এই বৎসর ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়।

(২) কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র।

কখনো আমার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ঘটে তবে পুনরায় আপনাকে আমার সহায়রূপে পাইব এ আশা আমি মন হইতে দূর করি নাই।

চারা অবস্থায় আপনি যে বৃক্ষে জল সেচন করিয়াছেন দূরে গিয়া আপনি তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। এ বিদ্যালয়ে আপনার সেই গৃহকোণটি আপনি মাঝে মাঝে আসিয়া অধিকার করিবেন এবং অন্য কর্ম্মের মধ্যেও ইহাকে স্মরণ করিয়া ইহার মঙ্গল কামনা করিবেন। এখানে যাহাতে আপনারা আনন্দে থাকেন সে চিন্তা অহরহই আমার হৃদয়ে ছিল—তথাপি যদি না জানিয়া বা ভুল বুঝিয়া কখনো আপনার ক্ষোভের কারণ হইয়া থাকি তবে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন—এখানে যাহা কিছু আনন্দের ও আশ্বাসের ছিল এখানে এই এক বৎসরে যাহা কিছু লাভজনক বোধ করিয়াছেন তাহাই স্মরণে রাখিবেন ও আমাকে হিতৈষী বন্ধু ভাবেই চিন্তা করিবেন। ইতি ১৩ই ফাল্গুন ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

হাজারিবাগ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

আপনার লেখাটি একেবারে কালবৈশাখী ঝড়ের মত প্রচণ্ড ও আকস্মিক। কিন্তু শুধু এইরূপ দমকা হইলে চলিবে না—সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তান্তও চাই। শিক্ষামণ্ডলের কর্ত্তারা এতদিন ধরিয়া কি প্রণালীতে শিশুদের রক্ত শোষণ করিয়া আসিতেছেন তাহা বিস্তারিত করিয়া আলোচনা করা দরকার—ছাত্রদের মাথাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের জঠরের মধ্য দিয়া কি উপায়ে গজভুক্ত কপিত্থবৎ বাহির হইয়া আসে তাহা আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখান উচিত—নহিলে শুদ্ধমাত্র ঝড়কে লোকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঠেকাইবে—আপনার এ লেখা সহজে কেহ গ্রহণ করিবে না।

এখানে আসিয়া অবধি আমাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ৮।৯ দিন আমি জ্বরে পড়িয়াছিলাম। উঠিয়াছি কিন্তু কাশী ও দুর্ব্বলতা যায় নাই। তার পরে শমী (১) পড়িয়াছিল, কাল হইতে তাহার জ্বর নাই—কাশী আছে। আজ মীরা (২) পড়িয়াছে। নগেন্দ্রের (৩) স্ত্রী জ্বরে পড়িয়াছিল। পিসিমার (৪) শরীর অসুস্থ। চাকরদের অনেকেই শয্যাগত। বেণুকার প্রত্যহ ১০২° জ্বর আসিতেছে; কোনদিকেই আশাজনক কিছুই দেখি না। এখানকার একজন বাঙালী বলিলেন এ জায়গাটা ম্যালেরিয়ার পক্ষে ভাল কিন্তু পেটের পক্ষে বিশেষ ভাল নহে—এখানকার জলে লোহা আছে সুতরাং অম্ল অজীর্ণ লিভারের উপদ্রব যাহাদের আছে তাহাদের পক্ষে এ স্থান পরিত্যাজ্য। সেই বোলপুরেরই পুনরাবৃত্তি আর কি। যাই হোক্ আমাদের সকলেরই এখানে শরীর খারাপ হইয়াছে। পথটি এমন যে ইচ্ছা বা আবশ্যক হইবামাত্রই যে দৌড় দেওয়া যায় এমন জোটি নাই। মনে মনে ভাবিতেছি প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইলে তার পরে হয়ত উপকার হইতেও পারে। আমার মনটা পালাই পালাই করিতেছে। আপনারা যে দল বাঁধিয়াছেন সে খুবই ভাল কিন্তু ব্রত ভঙ্গ হইতে দিবেন না। স্ত্রীলোকের প্রতি উপদ্রব সচরাচর আপনাদের দৃষ্টিগোচর হইবে বলিয়া মনে করি না—দৈবক্রমে কদাচিৎ হয়ত আপনাদের কোন একজনের চোখে পড়িতে পারে। কিন্তু adventure খুঁজিয়া Quixotic কাণ্ড করিয়া তুলিবেন না—যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইতে পারেন এমন ভাবে কাজ করিবেন।

আজকাল ত্রিপুরায় কোন সুবিধা হওয়া শক্ত। সেখানে কোন কাজ খালির খবর কিছু পাইয়াছেন কি? যদি পাইয়া থাকেন তবে আমাকে জানাইবেন আমি চেষ্টা দেখিতে পারি। আশা করি আপনি ভাল আছেন। ইতি ১৪ই চৈত্র ১৩০৯।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১) কনিষ্ঠ পুত্র। (২) কনিষ্ঠা কন্যা। (৩) বোলপুরের তৎকালীন শিক্ষক নগেন্দ্র আইচ। (৪) বোলপুরে তৎকালীন ছাত্রগণের তত্ত্বাবধান করিতেন।

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

এখনো সুস্থির হইতে পারি নাই; রেণুকা হাজারিবাগেই আছে। আলমোরায় তাহাকে এত পথ ভাঙিয়া স্থানান্তরিত করা সম্ভব হইবে না। আমি পরশ্ব হাজারিবাগে যাত্রা করিব।

রথী মজঃফরপুর হইতে বোলপুরে আসিয়াছে, এখানে তাহার পড়াশুনার সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া গেছে। ডিগ্রির প্রতি লোভ পরিত্যাগ করিয়াছি—রথীর যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় সেইদিকেই দৃষ্টি রাখা যাইতেছে।

এখানে গরম ভয়ানক। ইতিমধ্যে একদিন ১০৫।০ ডিগ্রি তাপ উঠিয়াছিল। আজ বিদ্যালয়ের ছুটী হইয়া গেল। কয়েকটী ছেলে রহিয়া গেছে—সতীশ (১) তাহাদের দেখাশুনার ভার লইয়াছেন। অধ্যাপকরা বাড়ী গেছেন। সুবোধ (২) বোধ হয় শ্বশুরের (৩) চেষ্টায় দিল্লীতেই পোষ্ট অফিসে একটী কাজের জোগাড় করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার আর আশা করি না। আপনাদের Trinityর মধ্যে কেবল মাত্র জগদানন্দ (৪) অবশিষ্ট রহিলেন—নরেন (৫) আশ্রমে পুন প্রবেশের প্রত্যাশায় মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন। ইতি ১৪ই বৈশাখ

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ—আবশ্যক হইলে আমাদের নায়েব রামাচরণ আপনাকে নানা বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিতে পারেন।

শ্রী—

(১) সতীশচন্দ্র রায়। (২) শ্রীশচন্দ্রের ভ্রাতা (৩) জয়পুরের সংসার সেন। (৪) জগদানন্দ রায়। (৫) নরেন রায়

ভবসিন্ধুবাবু

সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য—কে কখন কাহার ছদ্মবেশ ধরিয়া দেখা দেয়, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। ফলাফল বহু পরেই নির্ণীত হয় বলিয়া ওই দুইটিকে এক কথায় মনের মধ্যে স্থান দিয়া দুঃখ বা আনন্দ প্রকাশ মানুষের স্বাভাবিক রীতি। ভবসিন্ধুবাবুকে অবশ্য আমি প্রথম আবিষ্কার করি নাই। একটি দৈব ঘটনায় আমরা পরস্পরের কাছে সহসা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িলাম। আবিষ্কৃত হইলাম, মুগ্ধ হইলাম এবং সেই মুহূর্ত্তেই মনে মনে আশা করিলাম—এই পরিচয় আমাদের প্রবাসের শুষ্ক দিনগুলিকে বহুলপরিমাণে সরস রাখিতে পারিবে। তিনি অর্থাৎ ভবসিন্ধুবাবু চাকুরির দায়ে তিন বৎসর হইল পশ্চিমের এই সমৃদ্ধ শহরে বসতি করিতেছেন, আমি যুদ্ধবিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া আপিস সমেত নিতান্ত অনিচ্ছায় ওখানে আসিয়া পড়িয়াছি। তাঁহার প্রবাসবাস খানিকটা সুসহ হইয়াছে, আমার অসহ্য বোধ হইতেছে। বাংলায় উর্ব্বরা মৃত্তিকা হইতে উপড়াইয়া পশ্চিমের রুক্ষ প্রান্তরে কতকগুলি পেলব লতাকে যেন রোপণ করা হইয়াছে। এখানকার জল ভাল, হাওয়া ভাল, খাদ্যসামগ্রী মন্দ নয়, বাড়ি-ভাড়া কলিকাতার হিসাবে সুবিধাজনক, কিন্তু সব ভালর মূলে যে শ্বেত রুধিরস্রোত, তাহাই শুধু আমাদের ধমনীতে ভাল করিয়া প্রবাহিত হইতেছে না। সব সস্তার দোহাই দিয়া ওটিকেও কর্ত্তৃপক্ষ সুলভ করিয়া রাখিয়াছেন।

দুঃখের কথা থাকুক, নিজের দেশ বা ঘর ছাড়িয়া বিদেশে আসিলেই তাহা অনিবার্য্য বেগে সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া ধরে। দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা, ভবসিন্ধুবাবুকে পাইলাম, এবং দুঃখ-পাঁচালী বিবৃতির মধ্যেই পাইলাম বলিয়া দুঃখ-অবতরণিকার ধুয়াও একটু গাহিয়া রাখিলাম।

মণ্ডলাকারে বসিয়া আলোচনা চলিতেছিল—যুদ্ধের নয়, কারণ নিরাপদবৃত্তে বসিয়া সে চিন্তাও অনেকখানি নিরাপদ ব্যবধানে সরিয়া গিয়াছে। স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনীতেই মশগুল সকলে।

আর মশাই, এলেন একেবারে গরমের মুখে! লু বইলে তিষ্ঠানো দায় হয়ে উঠবে।

আপনাদের কষ্ট হয় না ?

কষ্ট ! বক্তা ভবসিন্ধুবাবু গোল গোল চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া হাসিলেন।

বর্ত্তুলাকৃতি গালের কম্পনে মনে হইল, মুখের ভিতরে দুইটি মধ্যমাকৃতি কমলালেবু গড়াগড়ি খাইতেছে। হাসি মিলাইতে না মিলাইতে ক্ষুদ্র নাসিকা কুঞ্চিত ও উঁচু করিয়া কহিলেন, যখন বেরুবেন, এক পেট ক'রে জল খাবেন। গায়ে ইয়া মোটা কোট চাপাবেন ; মাথা ঘাড় নাক কান ঢেকে তবে বেরুবেন।

বলেন কি ! এই গরমে তা হ'লে যে মারা যাব।—শ্রোতারা শিহরিয়া উঠিলেন।

ভবসিন্ধুবাবুর মুখের মধ্যে কমলালেবু দুইটি ঘন ঘন আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পরম কৌতুকভরে কহিলেন, না হ'লেই বরঞ্চ মরবে। জানেন, এখানে লুতে বছরে কত লোক মরে ?

সংখ্যা জানিয়া আমাদের হৃদ্‌কম্প হইল। বাংলা দেশে সর্পাঘাতে এত লোক মরে না।

বহু কণ্ঠে শুষ্ক প্রশ্ন হইল, উপায় ?

ঐ জল, মোটা জামা, নাক কান ঘাড় ঢাকা, আমের শরবৎ সেবন—ইত্যাদি।

এপ্রিল মাসে অবশ্য লু বহে নাই, তথাপি আমরা সচকিত হইয়া বাহিরের দিকে চাহিলাম। বাংলার বৈশাখী রৌদ্রতেজ ইহার কাছে সুস্নিগ্ধ। অগ্নি-সমুদ্রে স্নান সারিয়া চারিদিকের রুক্ষ প্রান্তর পড়িয়া আছে। না তৃণ, না সবুজশ্রী কোন গাছের। শুধুই কি আগুনের লীলা! বাতায়ন-বাহিরে বিস্তৃত প্রান্তরের দিক্‌চক্রবাল সীমায় ঘন কুয়াশার আবরণ। কুয়াশা নয়, ধূলা। প্রচুর রৌদ্র ও প্রভূত ধূলায় মগ্ন হইয়া আছে শহর। প্রীতমনে ওদিকে চাহিবার উপায় নাই।

একজন বলিলেন, লু কখন বইবে ? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রুমালটা ঘাড় ঢাকিয়া ললাটপ্রান্তে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

ভবসিন্ধুবাবুর হাসি আর থামে না। বলিলেন, এখনও সময় হয় নি। মের শেষ থেকে জুনের শেষ—এক মাস। এখন তো পূবে হাওয়া,

ঐ হাওয়া পশ্চিমমুখী হ'লেই জানবেন, লু। আপনি যে হাসছেন?—আমার দিকে ফিরিয়া সহসা প্রশ্ন করিলেন।

কি করি বলুন! লু মহারাজকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করব, তাই ভাবছি।

বাঃ, বেশ তো কথা বলেন আপনি!

দলের মধ্য হইতে একজন টপ করিয়া বলিয়া উঠিল, উনি যে কবি।

বটে! এমন অবাক হইয়া তিনি আমার পানে চাহিলেন যে, মুখাভ্যন্তরস্থিত কমলা দুইটির আবর্ত্তন সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল, ক্ষুদ্র নাসিকা উর্দ্ধমুখী হইয়া রহিল এবং গোলাকৃতি দুইটি চক্ষুর পলক আমার মুখের উপরেই নিবদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সে পুরা এক মিনিট মাত্র, অতঃপর চক্ষু নাসিকা ও গাল দুইটিব ক্রিয়া সবেগে আরম্ভ হইল এবং আমরা পূর্ণ ভাবে পরিচিতিকৃত হইলাম।

২

নিজের নির্জ্জন টেবিলের সামনে বসাইয়া ভবসিন্ধুবাবু বলিলেন, এ বড় বিশ্রী জায়গা মশাই। খবরদার কারও সঙ্গে এখানে মিশবেন না।

বলেন কি! বিদেশে বাঙালী—

ওই—বাংলা দেশ থেকে শুনে এসেছেন, ভুলে যান। সে ছিল কোন্ যুগ, জানি না, যখন প্রথম বিদেশে এসেছিলেন ওঁরা। সম্পূর্ণ নির্ব্বান্ধব দেশ; গাছপালা, পথঘাট, মায় খাবার জিনিস পর্য্যন্ত ওঁদের আপন ক'রে নিতে পারে নি। তাই দেশ থেকে লোক এসেছে ব'লে যেচে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতেন, ছাড়তে চাইতেন না। সেটাকে বলতে পারেন, প্রবাসকালের সত্যযুগ। ছিল মোটা মাইনে, প্রচুর সম্মান, চালচলনের সমারোহ। জানেন তো, ওসব দেখাবার লোক না পেলেও স্বস্তি নেই।

দীর্ঘ বক্তৃতা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলাম। মন সব মন্তব্যেই সায় দিতেছিল না। পিতৃপিতামহ-প্রমুখাৎ বৃত্তান্তগুলি ততদিন অনুকূল আবহাওয়ায় শিকড় গাড়িয়া হৃদয়ের মৃত্তিকায় রস শোষণ আরম্ভ করিয়াছিল, ভবসিন্ধুবাবুর কথার উত্তাপে তাহার ক্রিয়া অবশ্য

বন্ধ হইল না, একটু কেমন যেন প্রখর রৌদ্রতাপে তলাইয়া পড়িল। বেদনা বোধ করিলাম।

ভবসিন্ধুবাবু গোলাকার চক্ষু দুইটি আমার ঈষৎক্লিষ্ট মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া প্রসন্নমুখে আরম্ভ করিলেন, সে সত্যযুগের কথা ছেড়ে দিন। নিজেকে জাহির করবার জন্যে তাঁরা বাংলার লোককে ডেকে ডেকে চাকরি দিতেন, নিজের বাসায় রাখতেন, খাওয়াতেন; অর্থাৎ ল্যাজ-কাটা শেয়ালের মত বাংলা ছাড়াবার ব্যবস্থা করতেন। এক কথায়, satellite না হ'লে সৌরমণ্ডলের গৌরব কি বলুন?

একটু থামিয়া কহিলেন, আপনি তো লেখক, প্রত্যেক ভাল জিনিসের বিপরীত দিকটা লক্ষ্য রাখেন নিশ্চয়। এটা তো আমাদের (অর্থাৎ লেখকদের) স্বধর্ম্ম। যাঁরা প্রবাসী বাঙালীর স্তোত্রপাঠে গদগদকণ্ঠ হন, তাঁরা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। একটু ভালভাবে থাকা, ভাল খাওয়া-পরা আর সস্তা আমোদ নিয়ে মাতামাতি—এই তো তাঁদের লক্ষ্য। এগুলি যেখানে সুসম্পন্ন হয়, সেই স্থানকেই তাঁরা স্বর্গলোক বলেন।—বলিয়া মুখাভ্যন্তরস্থিত কমলা দুইটির ঘন ঘন আবর্ত্তনের সঙ্গে সশব্দ হাসিতে দুলিতে আরম্ভ করিলেন:

হাসি থামিলে আমার পানে চাহিয়া প্রশ্নসূচকস্বরে বলিলেন, নয় কি?

এতক্ষণ অনুমোদনের প্রয়াসী হইয়া মন্তব্য করি নাই। দ্বিধাগ্রস্ত-ভাবে ঘাড় নাড়িলাম। কোন্ দিকে নাড়িলাম জানি না, তিনি কিন্তু উৎসাহিত কণ্ঠে আরম্ভ করিলেন, দুদিন থাকুন, জলের মত সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভারী বিশ্রী সমাজ মশাই। এরা বাঙালীর কাছে ঢিলে পায়জামা প'রে জানায়—আমরা তোমাদের থেকে আলাদা অর্থাৎ কিঞ্চিৎ উঁচু, অতএব সম্মান জানাও। হিন্দুস্থানীদের কাছে মিহি ধুতি প'রে দাবি করে ওই সম্মানের,—না ঘরকা, না ঘাটকা মশাই।

তবে যে শুনি বিদেশে সাহিত্যচর্চ্চা—

সাহিত্য! বাংলা সাহিত্য! যে দেশে মাটি শক্ত, সেখানে জন্মাবে রসালো গাছ? অবশ্য রসালো ফল এখানে প্রচুর জন্মায়, আর ভালও।

তবে?

কিন্তু ফলের সঙ্গে সাহিত্যের তুলনা করা ভুল। যাদের হাতে-খড়ি হিন্দী বা উর্দ্দু মারফৎ—দশটা শব্দের মধ্যে যারা পাঁচটা হিন্দী-উর্দ্দু মিশিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলছি ব'লে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তারা করবে বাংলা সাহিত্য চর্চ্চা! হেঃ—হেঃ—

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—

না, পিঠ-চুলকানি। পাঁচজনের কাছে নিজেদের উঁচু ক'রে তোলবার এটিও একটি পন্থা। বৎসরান্তে সবাই এসে একত্র হন, প্রবন্ধপাঠ কিছু হয়। আর সাহিত্য-চর্চ্চা কতটুকু হয়! তা যদি থাকেন কিছু দিন, নিজের চোখেই দেখে যেতে পারবেন। শুধু জুড়ি মোটরে চাপিয়ে, চা পোলাও কালিয়া খাইয়ে অতিথিকে নিয়ে হৈ-হৈ ক'রে বেড়ালেই সাহিত্য-চর্চ্চা হয় না। যাঁরা ওই সব সম্মেলন থেকে ফিরে যান, তাঁদের মুখে খাতির যত্ন বা খাওয়ার কথা ছাড়া সাহিত্যের কথা শোনেন কিছু?

এমন ভাবে টাকা খরচ ক'রে লাভ?

হো-হো শব্দে হাসিয়া ভবসিন্ধুবাবু বলিলেন, আপনি সাহিত্যিক নন মশাই, টাকা খরচ ক'রে নিজেদের গৌরব বাড়ানোর কি কম লাভ? আপনি নতুন বাড়ি করলে, গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে লোককে নিমন্ত্রণ করেন কেন? বিয়ে, পৈতে বা অন্নপ্রাশনে শুধু শুধু টাকা খরচ করেন কেন?

মানুষকে খাইয়ে তৃপ্তি লাভ হয়, তাই।

কথাটা সত্যি। কিন্তু সেই তৃপ্তির মূলতত্ত্ব কোন দিন অনুসন্ধান ক'রে দেখেছেন কি? নিছক আত্মীয় বা বন্ধু-প্রীতি বশত ওসব আপনি করেন না। ওর মধ্যেও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আভাস পেতে পারেন। নিজের তৃপ্তির মূলে নিজেকে জাহির করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আছে কি?

দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলিলাম, অবশ্য সব ভাল দিকেরই—

উঁহু, ভাল-মন্দের কথা হচ্ছে না। রূঢ় দিক মাত্রেই মন্দ নয়। আমরা আচার-ব্যবহার যা বহুকাল থেকে ঢেকে জনসমাজে গৌরব করি, তা আসলে আমাদের পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রথা-পূর্ণিত মনের

সংযোগ। কেন ভাল, সে তথ্য জানলেই, একটা শক পাই বটে, কিন্তু সত্যকে তো জানতে পারি।

ঠিক বুঝলাম না।

একটা দৃষ্টান্ত দোব? বিবাহ-প্রথা আমাদের কাছে বড় পবিত্র। নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ওটি অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যত মাঙ্গলিকের মোড়কেই ওটিকে মুড়ে রাখুন না কেন, যৌনজীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার ওটি যে একমাত্র পন্থা, সে বিষয়ে ভুল আছে কি? এখানে ধর্ম্মকে নিয়ে আমরা এত মাতামাতি করি যে, আসল রূপটিকে কেউ দেখিয়ে দিলেও তাকে মন্দের মত তিরস্কার ক'রে থাকি। যে সত্যকে আমরা মনে মনে স্বীকার করি, তাকে প্রকাশ করতেই যত ভয় বা সঙ্কোচ।

তা হ'লে সন্তানস্নেহের মধ্যেও—

সব—সব। চারিদিকের বৃত্তি ওসব—নিজে আমরা তার মধ্যের বিন্দু। এক-একদিন আকাশে চন্দ্রমণ্ডলের শোভা দেখেন নি? তাতে চন্দ্রের সৌন্দর্য্যকেই বাড়ায়। স্ত্রী পুত্র কন্যাও সংসারে অমনই চন্দ্রমণ্ডল রচনা ক'রে রেখেছেন।

মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইল। কথা কহিলাম না।

৩

ভবসিন্ধুবাবু একটা হাই তুলিয়া বলিলেন, যখনই কলম ধরতে শিখেছেন, তখনই অনুসন্ধিৎসু মন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন। মননশক্তি যাঁর নেই, তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি কি দুরাশা নয়?

চুপ করিয়া রহিলাম। মননশক্তি দ্বারা সুষ্ঠু ও প্রাণপূর্ণ রচনা সম্ভব জানি, কিন্তু মননশক্তি বলিতে ভবসিন্ধুবাবু কি বুঝেন, জানি না; আজকাল সাহিত্যের বাজার বাক্‌বাহুল্য ও বাহবাস্ফোটকে শব্দমুখর। একই কথার নানা ব্যাখ্যা, কিংবা বড় বড় কথাগুলিকে অর্থ না জানিয়াও সাজাইয়া বলার দক্ষতা সাহিত্য-সৃষ্টির আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। জাঁ ক্রিস্তফে বাজারে-সাহিত্য বলিয়া একটা অধ্যায় আছে,

যা আমাদের দেশের পটভূমিকায়ও বেমানান হয় না। সত্যকারের স্থষ্টির এমনই দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ সার্ব্বজনীনত্ব আছে।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, বাংলা সাহিত্যের প্রাণ আছে, প্রসার আছে—এ কথা আপনি স্বীকার করেন তো?

করব না কেন, করি। কিন্তু মননধর্ম্মী সাহিত্য খুব কমই স্থষ্টি হচ্ছে। রবিবাবু শরৎবাবুর পর আর কাউকে তো সত্যিকারের স্থষ্টি করতে দেখলাম না।

অনেকগুলি নাম কণ্ঠাগ্রে ঠেলাঠেলি করিতেছিল, জোর করিয়া বুকের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া ভবসিন্ধুবাবুর পানে চাহিলাম। কি সে মুখ! দারুণ বিতৃষ্ণায় সেখানে বহুরেখা ফুটিয়াছে—যেন রেখাসঙ্কুল গ্লোব।

ঘৃণামিশ্রিত হাসি হাসিয়া বলিলেন, কে লিখবে মশাই, ওঁরা যে চরম ক'রে গেছেন।

ক্ষীণ প্রতিবাদ করিলাম, সব দেশেই চরম স্থষ্টির পর নতুন স্থষ্টির ধারা ব'য়ে চলে। শেক্স্পীয়রের পর বার্নাড শ, টলস্টয়ের পর—

সব দেশে জন্মায়, বাংলায় নয়।—প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কণ্ঠস্বর তাঁহার সতেজ হইয়া উঠিল। মুখের উপরিভাগের রেখাগুলি ও ভিতরের কমলা দুইটি সক্রিয় হইল। এখানে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে। কম চাবুক কষিয়েছি মশায়, তবু ওদের হায়া নেই।

আধুনিক সাহিত্যিকদের কঠিন সমালোচনা করেছেন বুঝি?

সমালোচনা নয়—চাবুক। ওদের যদি গণ্ডারের চামড়া না হ'ত তো তার ঠেলাতেই ঠাণ্ডা হয়ে যেত। যাক—সাহিত্যস্থষ্টি, না আঁস্তাকুড়-ঘাঁটা! রাম বল। ঘৃণাকুঞ্চিত নাসিকা প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল।

কোন্ কাগজে লিখতেন?

লাঠিতে চাবুকে মুগুরে—কোথায় না? এত লিখে অবশ্য ফল যে হয় নি তা নয়, হয়েছিল। তিনবার গুণ্ডার হাত থেকে মরতে মরতে বেঁচে গেছি মশাই।

বলেন কি?

না হ'লে আর বলছি কি? কলমের ধারে এঁটে না উঠতে পেরে

যারা গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়, তারা আবার লেখক! তাদের কলমের চাবকানি নয়—সত্যিকারের চাবুক কষালে তবে না আনন্দ।

তাঁহার আনন্দ দেখিয়া আমাকে পুনরায় নীরব হইতে হইল।

৪

আনন্দের বেগ কাটিলে মৃদুস্বরে বলিলাম, কিন্তু তা ছাড়া আরও একদল লেখক তো আছেন, যাঁরা সত্যিকারের সৃষ্টি করছেন।

রবিবাবু শরৎবাবুর পর সত্যি বলতে কি, আর একজনও জন্মান নি, যাঁর নাম ওঁদের সঙ্গে এক নিশ্বাসে নিতে পারি। না, একজনও না।—প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আমার মন্তব্যটিকে নাকচ করিয়া দিলেন।

কিন্তু—

এর মধ্যে কিন্তু নেই। আহা, কি লেখাই লিখেছেন শরৎবাবু আর রবিবাবু! বাংলার আকাশ-বাতাস ছেয়ে রেখেছেন।

তবে কি বলতে চান, এর পরে সাহিত্য-সৃষ্টির গতি বন্ধ হয়ে যাবে?

যাবে কি মশাই, যায় নি? ওঁরাও গেলেন, সাহিত্যও গেল। না না, ওঁদের লেখা নিয়ে অমর হয়ে রইল। ওই তো পূর্ণ সৃষ্টি।

তর্ক করিতে পারিতাম, লাভ নাই জানিয়া মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলাম। আধুনিক লেখকদের উপর বিদ্বেষপোষণই যদি সু-সমালোচকের লক্ষণ হয়, তবে বাংলা সাহিত্যে দুর্লক্ষণ দেখা দিয়াছে, ভাবিতে পারি। পূর্ণত্বকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, কিন্তু অংশকে ভুলিয়া পূর্ণকে মানা, ছাদে উঠিয়া সিঁড়ির অস্তিত্ব ভুলিয়া যাওয়ার মত। সৃষ্টির পথ বিভিন্ন যুগধর্ম্ম অনুসারে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যে ও মননশীলতায় পূর্ণের নিত্য স্বরূপকেই প্রকাশ করে। সৃষ্টির গতিই হইল আসল, প্রশ্নই জগৎকে সক্রিয় রাখিয়াছে; স্থিতি বা শেষ উত্তরের খুঁটিতে বাঁধিয়া তার পূর্ণত্বের বড়াই করা হাস্যকর নহে কি!

হয়তো আমার ক্ষুব্ধ ভাব তিনি বুঝিলেন। অনেককে অবজ্ঞা করার মধ্যে আমার অপমানবোধকেও হয়তো বা অনুভব করিলেন। কণ্ঠস্বর নামাইয়া প্রশ্ন করিলেন, কোন্ কোন্ কাগজে আপনি লেখেন?

শুষ্ক হাস্যে বলিলাম, আমাদের আবার লেখা!

না না, বলুন না।

এই প্রবাসী, শনিবারের চিঠি—

হুঁ। গোলাকার মুখে অকারণ গাম্ভীর্য্য নামিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু ওসব কাগজের আর আগেকার দিন নেই, স্ট্যাণ্ডার্ড নীচু হয়ে গিয়েছে।

মনে মনে বলিলাম, আমরা লিখছি ব'লে নাকি!

বলিলেন, খালি গল্প আর উপন্যাসে ভরা। একটা ভাল কবিতা বা প্রবন্ধ নেই। থাকবে কোত্থেকে—তাতে যে পাণ্ডিত্যের বা শক্তির দরকার হয়।

একটা পেপার-ওয়েট হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম।

তিনি বলিলেন, গল্প-উপন্যাস কখনও লিখতে পারলাম না মশাই। বড় হাল্কা জিনিস। লিখতাম প্রবন্ধ, তারপর কবিতায় হাত দিই।

বই বার করেছেন কিছু?

কি হবে বই বার ক'রে? বাজারে রাবিশ কাটে, ভাল জিনিসের কদর নেই।

একজন আধুনিক লেখকের একখানি নামী উপন্যাসের নাম করিলাম। তাহার কয়টি সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহাও জানাইলাম।

ঘৃণালুপ্ত নাসিকা টানিয়া কহিলেন, ওটা কি বই নাকি?

মনে মনে সহসা উষ্ণ হইয়া উঠিলাম। স্বরেও উষ্ণতা প্রকাশ পাইল, সকলের মত তো সমান নয়। স্রষ্টা ও সমালোচক দুই আলাদা শ্রেণীর মানুষ।

আপনি বলতে চান, সমালোচনায় সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না?

ধ্বংসও কখনও কখনও ঘটে।

হো-হো করিয়া হাসিয়া ভবসিন্ধুবাবু বলিলেন, যিনি সমালোচনার হুল সইতে পারেন না, মধুচক্র রচনার সাহস তাঁর না থাকাই উচিত।

প্রশ্ন পাল্টাইয়া বলিলাম, আচ্ছা, রবিবাবুর কোন্ কবিতাটি আপনার ভাল লাগে?

চক্ষু বুজিয়া গদগদ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, 'সব। ওঁর লেখার কি উনিশ-বিশ আছে।

শরৎবাবুর কোন্ বইটা?

একখানি ভাল বই লিখে কি লেখক নাম কিনতে পারেন? ওঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই ওঁর প্রতিভা।

আর কোন প্রশ্ন করিলাম না। অগাধ জলের মাছকে সরু বঁড়সি দ্বারা বিঁধিয়া ডাঙায় তোলা কম দুরূহ নহে।

৫

ছুটির পর প্রশ্ন করিলেন, কিছু লিখছেন নাকি গল্প-টল্প? এখানকার টাঙ্গা বা এক্কা নিয়ে—কিংবা 'লু' নিয়ে লিখুন না একটা।

ওর মধ্যে আছে কি লেখবার।

সে কি মশাই, পৌরাণিক যুগকে যারা বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের প্রশস্তি গাইবেন না?

কিন্তু এখানে তো ট্রাম নেই, অল্প দূরে যাবার জন্যে যানও নেই, পৌরাণিক যুগের ভগ্নাংশ না থাকলে আমরাও যে ভগ্ন হয়ে যেতাম—রোজ দু-তিন মাইল রোদ ভেদ ক'রে আফিস ছুটতে।

তা মিছে বলেন নি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, আপনার কাছে মাসিক পত্রিকা বা বই কিছু আছে? এমনিতে তো সময় আর কাটে না।

বই কিছু আছে, তিন-চারখানা মাসিকও নিই।

দেবেন কিছু পড়তে? আজ যাব?

আজ? একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, একখানিও বাড়িতে খুঁজে পাবেন না। মাসের সাত তারিখে কাগজ আসে, পরের মাস কাবারেও আমি পাই না।

না পড়তে পেলে আপনার নেওয়া না-নেওয়া সমান কথা।

অবশ্য আমি দু-চারদিনের মধ্যে পড়ে ফেলি। তারপর সেই যে কাগজ উধাও হয়—ছ মাসের মধ্যে আর খুঁজে পাই না। আর

লোকগুলো কি ছ্যাঁচড়া দেখেছেন। পয়সা খরচ ক'রে কিনবি না, পড়বি তো চেয়ে চেয়ে, তাই না হয় সময়ে দিয়ে যা। হ্যাঁ—এ দেশে আবার সাহিত্য জন্মাবে!. কচু!

অবশ্য কচুর বদলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কদলীপ্রদর্শন করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। খানিক তাঁহার সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলিয়া, 'দরকার আছে' বলিয়া অন্য পথ ধরিলাম।

৬

পরের দিন বলিলেন, বাড়ি খুঁজছিলেন না? আমাদের পাড়ায় একটি ব্লক খালি হয়েছে, ভাড়া পনরো।

তাই নাকি?—অভ্যাসবশত কৌতূহলী হইয়াই চুপ করিয়া গেলাম।

তিনি আমার কৌতূহল লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আসুন না, বেশ তো দুজনে মিলে সাহিত্য-চর্চ্চা করা যাবে।

মাথা নাড়িয়া বলিলাম, না।

তিনি বিস্ফারিত নেত্রে আমার পানে চাহিলেন।

একটু হাসিয়া বলিলাম, আপিস তো পাকা ভাবে উঠে আসে নি, কালই হয়তো ওঠবার হুকুম হবে। কাজ কি বাসা বদল ক'রে!

ওঃ, তাই বলুন।—বলিয়া ভবসিন্ধুবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

সাহিত্যিকের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্যকে বরণ করিলাম, সে উত্তর আপনাদের কাছেই প্রত্যাশা করিতেছি।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শকুন্তলা

কণ্বের আশ্রম

"অনসূয়া-প্রিয়ংবদা, প্রিয়তম ব'লে গেছে মোরে,
অপার্থিব মোর রূপ, অকলঙ্ক মানবীর নহে—
অমরার প্রতিচ্ছবি। যেন কোন্ সুখস্বপ্নঘোরে
ধরণী আধায় পেল। বলেছে সে, আমার বিরহে
অন্তরে রূপের স্মৃতি রবে জ্বালা; দাঁড়াব সম্মুখে
প্রিয়ের প্রেমের গর্ব্বে, বহু প্রতীক্ষিত,—মাল্যহাতে
স্মৃতিশীর্ণ প্রণয়ের ব্যগ্রতায়, উদ্বেলিত বুকে
সে মোরে বরিয়া লবে। অভিজ্ঞান? সখি, মোর সাথে
নূতন সৃষ্টির মাল্যে সে যে বাঁধা,—আমার জঠরে
ভবিষ্যের চন্দ্রবংশ বন্দী আছে। হলা পিয়া সহি,
মিছে শঙ্কা; নারীত্বের সার রত্ন দিনু যার করে
অয়ি ভীরু, অসপত্না রাজৈশ্বর্য্যে সে আছে বিরহী।
অভিজ্ঞান! অঙ্গুরীর অঙ্গে আজো স্পর্শসুধা তার
সিঞ্চিত রয়েছে সখি, মাণিক্যের মূল্য কিবা আর?"

দুষ্মন্তের রাজসভা

"ভুলে গেছ মহারাজ! প্রিয়তম, আমি শকুন্তলা,
তোমার আরণ্যপ্রিয়া;—অনসূয়া প্রিয়ংবদা মোরে
অহেতুক আশঙ্কায় বলেছিল, 'বিরহ-বিহ্বলা,
অঙ্গুরী অটুট রেখো';—জানিত না কি অচ্ছেদ্য ডোরে
মোদের অন্তর বাঁধা। প্রিয়, প্রিয়তম, তব চোখে
ও কিসের তীক্ষ্ণ হাসি? ভুলে গেছ বনদুহিতার

অসংশয় আত্মদান ? মহর্ষির শান্ত তপোলোকে
আতিথ্য-প্রত্যাশী আসি, মৃগবিৎ, প্রণয়ভীতার
অন্তর-মৃগয়া—সে কি ভুলে গেলে ? ওগো, ক্ষমা কর
সর্ব্বনাশ-শঙ্কিতার বাচালতা ! রাজসভামাঝে
স্বীকারের লজ্জা যদি মোর চেয়ে এত হ'ল বড়,
তবে চুপে চুপে বল, 'শকুন্তলা, আজো মনে আছে' ।
অভিজ্ঞান ! অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, বিনা নিদর্শনে
তোরা কি ভুলিয়া যাবি, ফিরে গেলে পিতৃ-তপোবনে ?"

মারীচের আশ্রম

(আর্য্যপুত্র !) "আজি মোর সুপ্রভাত, হে রাজ-অতিথি ;
সুস্বাগত দীনাশ্রমবাসে—হায়, রিক্ত তপোবন
রাজযোগ্য সম্ভাষণ নাহি জানে—অরণ্যের প্রীতি
চিরমৌন, মহারাজ ; কাষ্ঠজীবী হানিছে মরণ
অসন্দিগ্ধ বনস্পতি তবু তার পরিচর্য্যা করে
অকুণ্ঠিত ছায়াদানে ; মৃত্যু আসে, বৃক্ষের বিলাপ
পলে পলে দিনে রাত্রে শাখা হতে ফিরে শাখান্তরে
শক্তিহীন, ভাষাহীন—পাদপের নাহি অভিশাপ,
শুধু ব্যথা, অভিমান ; মহারাজ, মূঢ় অভিমান…
ক্ষমা কর, হে রাজন ; ভুলেছিনু পথশ্রান্ত তুমি…
ও কি, নতশির কেন ? চিনিয়াছ ? লহ অভিজ্ঞান,
চন্দ্রবংশ-মধ্যমণি । সাক্ষী মোর পুণ্য বনভূমি,
নিদর্শন-বিনিময়ে (একি শুধু সুখ-স্বপ্ন মম !)
তোমারে পেয়েছি ফিরে পলাতক ! প্রিয় ! প্রিয়তম !

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

কাব্যের উপেক্ষিত

(রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে)

কবি তাঁহার সমবেদনার যত করুণাবারি সমস্তই কেবল কাব্যের উপেক্ষিতাদের অভিসিঞ্চনে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আরও যে বহুতর ম্লানমুখ ঐহিকের সর্ব্বসুখবঞ্চিত হতভাগ্য, কাব্যের উপেক্ষিতাদের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছে, কবি-ভৃঙ্গার হইতে একবিন্দু সান্ত্বনার বারিও কেন তাহাদের চিরদুঃখাভিতপ্ত নত ললাটে সিঞ্চিত হইল না! হায়, অব্যক্তবেদন উপেক্ষিতসমূহ, তোমরা প্রত্যূষের তারার মতও কাব্যের সুমেরুশিখরে একবার উদয় হও নাই, চিরকাল তোমরা জীবনে ও সাহিত্যে বিস্মৃত রহিয়া গেলে!

জগৎ-সংসারে এমন দুইটি একটি চরিত্র আছে যাহারা কবি কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াও মানব-জীবনের সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। পক্ষপাতকৃপণ কাব্য তাহাদের জন্য স্থান সঙ্কোচ করিয়াছে বলিয়াই মানবের মন অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আসন দান করে।

কিন্তু এই কবিপরিত্যক্তদের মধ্যে কাহাকে কে হৃদয়ে আশ্রয় দিবেন, তাহা পাঠক-বিশেষের প্রকৃতি এবং অভিরুচির উপর নির্ভর করে। আমি বলিতে পারি, বাংলা সাহিত্যের যজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে যে কয়টি অনাদৃতের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে "ঠাকুর"কে* আমি প্রধান স্থান দিই।

বোধ করি তাহার একটা কারণ, এমন গৌরবময় নাম বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নাই। আমাদের ভক্তিপ্রবণ চিত্তের সমস্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি চিরকালই ঠাকুরের পায়ে সমর্পিত হইয়া আসিয়াছে। দুঃখে দৈন্যে কষ্টে আমরা চিরকাল ঠাকুরের কৃপালাভের চেষ্টা করিয়াছি, ঠাকুরের করুণা লাভে আমরা ধন্য হইয়াছি। প্রাণের ঠাকুরকে আমরা হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করিয়াছি, বাপের ঠাকুরকে সভয়ে সম্ভ্রম করিয়া চলিয়াছি।

---

* ঠাকুর—হিন্দু বাবুর্চ্চি।

ঠাকুরবাড়ির শঙ্খ ঘণ্টা শব্দে শিহরণ বোধ করিয়াছি, ঠাকুরালিতে আমাদের প্রবণতা দেখাইয়া কৃতকৃত্য হইয়াছি। বাংলা সাহিত্য ও ভাষার জগদ্ব্যাপী খ্যাতি ঠাকুরবাড়ি ও ঠাকুরগোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা আমাদের জীবনে মাধুর্য্যের স্রোত আনিয়াছে। একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয়, রবীন্দ্রনাথের পদবী যদি "তালুকদার" হইত, তবে সেই ঋষিকল্প ছন্দোবিলাসী চিররসনিস্যন্দী কবির অন্তর ও বাহিরের মাধুর্য্য এই অতি-সাংসারিক নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।

অতএব এই নামটির জন্য বাংলা ভাষার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ আছি। সংসার ঠাকুরদের প্রতি অনেক অবিচার করিয়াছে, কিন্তু দৈবক্রমে তাহাদের নাম যে বাবুর্চ্চি বা মশাল্‌চি রাখে নাই, সে একটা বিশেষ সৌভাগ্য। বাবুর্চ্চি ও মশাল্‌চি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না, জানিবার কৌতূহলও রাখি না।

সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা ঠাকুরকে কদাচ দেখিতে পাই শুধু ভোজসভায় পরিবেষ্টারূপে। তারপরে যখন হইতে সে রন্ধনশালার সঙ্কীর্ণ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন হইতে আর তাহাকে একদিনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেই তাহার মূক সকুণ্ঠ নিঃশব্দচারী মূর্ত্তিটিই সাহিত্যের একটি ছায়াচ্ছন্ন অস্পষ্টতার মধ্যে চিরদিন রহিয়া গেল। এমন কি, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও* তাহার সেই ছবিটিই মুহূর্ত্তের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে—লেখক কেবল সহাস্যকৌতুকে একটিবার মাত্র তাহাকে গল্পের নায়কের আসন দিয়াছিলেন, তাহার পর বাংলা গল্প ও উপন্যাসে এত বিচিত্র সুখদুঃখের চিত্রশ্রেণীর মধ্যে আর একটিবারও কাহারও কৌতূহল দৃষ্টি এই চরিত্রটির উপর পড়িল না। সে তো কেবল বামুন ঠাকুর মাত্র।

অনতিতরুণ পটু হস্তে একদিন যে সে ভোজ্যস্থালী ধারণ করিয়াছিল, তাই ঠাকুর চিরদিনই সেই মহানসীয় পাচক মাত্র। কিন্তু সদ্য বিলাতফেরত নায়কের মনোরঞ্জনের জন্য যেদিন তরুণী নায়িকা ও তাহার

---

* প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "আমার উপন্যাস" দ্রষ্টব্য।

সখীবৃন্দ রূপযৌবনবিলাসোজ্জ্বল সান্ধ্যবৈঠকের কলাসাহিত্য-বিতর্কমুখর সঙ্গীতঝঙ্কৃত উৎসবে ব্যাপৃত থাকে, সেদিন কি এই পাচকটিও অংসের উপর গাত্রমার্জ্জনী টানিয়া গৃহকর্ত্রীর সহিত স্মিত প্রসন্ন কৌতূহলোচ্ছল মুখে মাছের কচুরি ও মাংসের শিঙাড়া রচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত থাকে না? সেদিন কি ধীরোদ্ধত নায়কের মসীনিন্দিত রূপের সহিত তুলনা করিয়া ক্ষণিকের জন্য আপনাকে প্রতিনায়ক হিসাবে কল্পনা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না? এবং পরক্ষণেই কি সে এই বাতুল কল্পনাকে সংযত করিয়া নিজের দগ্ধ ললাটকে অভিশাপ দেয় না? আর যেদিন পাড়ার যুবকদের নয়ন ও হৃদয় অন্ধকার করিয়া এক মৃতদার প্রৌঢ় জমিদার নায়িকাকে দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া বরবেশে শিয়ালদহ স্টেশনের পথে বাহির হয়, সেদিন এই পাচক ভাড়াটিয়া বাসার কোন্ নিভৃত শয়নকক্ষে ধূলিমলিন শয্যায় কর্ত্তিত ছাগের মত লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, তাহা কি কেহ জানে? সেদিনকার সেই সকল সহৃদয় হৃদয়ব্যাপী বিলাপের মধ্যে এই বিদীর্য্যমান বৃহৎ কোমল হৃদয়ের শোক কে দেখে? যে দরদী সাহিত্যিক পতিতা নারীর বিরহ-দুঃখ মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই, তিনিও একবার চাহিয়া দেখিলেন না।

নৃপতি সংবরণ তপতীর জন্য বহু প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছিলেন, সে গৌরব ভারতবর্ষের কাব্যে সাহিত্যে আজও ঘোষিত হইতেছে, কিন্তু জ্বলন্ত চুল্লীর সম্মুখে ঠাকুরের কৃচ্ছ্রসাধন কেবল পৌরাণিক কাহিনী নহে, তাহা দৈনন্দিন কঠোর সত্য। সংবরণ তপতীর জন্য কেবল নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ঠাকুর স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে অধিক অন্ন-ব্যঞ্জন দান করেন। সে কথা সাহিত্যে লেখা হইল না। ঝিয়ের অশ্রুজলে ঠাকুর একেবারে ভাসিয়া গেল।

বেতালভট্ট

তত্ত্ব-জ্ঞানী

আরাম-কেদারা 'পরে প্রসারিয়া বরবপুখানি
ব'সে আছি নিশ্চিন্ত আলসে ; দেখিতেছি দূর হতে
চলিয়াছে লক্ষ্যহীন অগণিত অসহায় প্রাণী
আবর্ত্তিত নিপীড়িত গর্জ্জমান ভয়ঙ্কর স্রোতে।
সজ্ঞান অজ্ঞান কেহ, কেহ হাসে, কারো হাসি নাই,
তীব্র তীক্ষ্ণ হাহাকারে কেহ কভু করে আর্ত্তনাদ,
করাল কুটিল স্রোতে মজ্জমান মুমূর্ষু সবাই
স্রোতের স্বরূপ ল'য়ে তবু করে বাদ-প্রতিবাদ।
জড়াইছে পরস্পরে, ডুবাইছে সবল দুর্ব্বলে—
ভাসিতেছে কেহ কেহ শবের ভেলায় করি ভর,
জীর্ণ শীর্ণ লজ্জাহীন ভাসিয়া চলেছে দলে দলে,
আহার পানীয় জল—পান-পাত্র হয়তো খর্পর।
আত্মবলি দেয় কেহ,—বিষকুম্ভ কেহ পয়োমুখ,
কামনার হলাহল পান করি কেহ ছদ্ম-শিব,
ভগবানে ডাকে কেহ উর্দ্ধে তুলি নয়ন উৎসুক ;
আমি জানি কিবা ওরা : ক্লীব সব, কাপুরুষ ক্লীব।
লভিয়াছি তত্ত্বজ্ঞান,—ব'সে আছি অতি-সাবধানী
আরাম-কেদারা 'পরে প্রসারিয়া বরবপুখানি।

"বনফুল"

সংবাদ-সাহিত্য

আমাদের বর্ত্তমান দুর্গত জীবনের সকল সমস্যাকে ছাপাইয়া অন্নবস্ত্রের নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে যে, অচিরকাল-মধ্যে রাজা, রাষ্ট্রনেতা অথবা সমাজনেতাদের চেষ্টায় কোনও প্রতিকার-ব্যবস্থা না হইলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অপেক্ষা ভীষণতর পঞ্চাশের মন্বন্তরকে ঠেকানো যাইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'আনন্দমঠে'র গোড়াতে প্রথম মন্বন্তরের যে বর্ণনা দিয়াছেন, ধীরে ধীরে তাহার সকলগুলি লক্ষণই প্রকাশিত হইতে দেখিতেছি। কেহ প্রতিকার-চেষ্টা করিতেছেন না। রাজার কর ও জরিমানার বেড়াজালে পড়িয়া প্রজার শান্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছে ; রাষ্ট্রনেতারা কারারুদ্ধ এবং সমাজনেতারা

বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সামরিক প্রয়োজনে কাগজনির্ম্মিত অর্থের অসম্ভব বাহুল্য ঘটাতে সম্রাটের নামাঙ্কিত মুদ্রার অর্থমূল্য এমনই হ্রাস হইয়াছে যে, অতি সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যও সাধারণে আর আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিতেছে না। সমাজে ঘোরতর অসাম্য ও বৈষম্য দেখা দিয়াছে। যাহারা সত্যকার গুণী ও কৃতী, তাহারা অন্নহীন; অথচ অতি অপদার্থ লোকেও হঠাৎ-গজানো ব্যবসায়ের গণ্ডিতে মাথা গলাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করিতেছে। অন্যায়-ভাবে আহৃত অর্থের সাহায্যে সাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনের মাল এক-একজনে বহুলপরিমাণে সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয় করিতেছে; ফলে স্থানে স্থানে মজুদ মাল সত্ত্বেও চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে। গবর্মেণ্ট নিজের প্রয়োজনে মুহুর্মুহু অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করিতেছেন, কিন্তু প্রজার প্রয়োজনে ন্যায়-হস্ত প্রসারিত করিতে পারিতেছেন না। এরূপ অবস্থায় একান্ত যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মানুষও অদৃষ্টবাদী হইতে বাধ্য হয়। আমরা পিনাল কোডে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় অথবা অর্থনৈতিক বিচারে কোনও হদিস না পাইয়া জ্যোতিষীর নিকট অথবা পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় প্রতিকার খুঁজিতেছি। আমাদের দুঃসময় পাইয়া "চেতাবনী"-জাতীয় বস্তুও আমাদিগকে অধিকার করিয়া বসিতেছে। আমাদিগকে ঘিরিয়া মানুষকে অমানুষ করিবার যাবতীয় আয়োজন চলিতেছে। ভবিষ্যতের আশার আলোক আমরা অতীত হইতে সংগ্রহ করিতেছি; বিজ্ঞান ভুলিয়া পুরাণ চর্চ্চা করিতেছি।

* * *

পুরাণে দেখিতেছি, বর্ত্তমান যুগ-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে :—

প্রতিগ্রহরতাঃ শূদ্রাঃ পরস্বহরণাদরাঃ।
দ্বয়োঃ স্বীকারমুদ্বাহঃ শঠে মৈত্রী বদান্যতা ॥
প্রতিদানে ক্ষমাশক্তৌ বিরক্তিকরণাক্ষমে।
বাচালত্বঞ্চ পাণ্ডিত্যে যশোঽর্থে ধর্ম্মসেবনম্ ॥
ধনাঢ্যত্বঞ্চ সাধুত্বে দূরে নীরে চ তীর্থতা।
সূত্রমাত্রেণ বিপ্রত্বং দণ্ডমাত্রেণ মস্করী ॥
অল্পশস্যা বসুমতী নদীতীরেঽবরোপিতা।
স্ত্রিয়ো বেশ্যালাপসুখাঃ স্বপুংসা ত্যক্তমানসাঃ ॥
পরান্নলোলুপা বিপ্রাশ্চণ্ডালগৃহযাজকাঃ।
স্ত্রিয়ো বৈধব্যহীনাশ্চ স্বচ্ছন্দাচরণপ্রিয়াঃ ॥
চিত্রবৃষ্টিকরা মেঘা মন্দশস্যা চ মেদিনী।
প্রজাভক্ষা নৃপা লোকাঃ করপীড়াপ্রপীড়িতাঃ ॥

স্কন্ধে ভারং করে পুত্রং কৃত্বা ক্ষুব্ধাঃ প্রজাজনাঃ।
গিরিদুর্গং বনং ঘোরমাশ্রয়িষ্যন্তি দুর্ভগাঃ॥
মধুমাংসৈর্মূলফলৈরাহারৈঃ প্রাণধারিণঃ।
এবং তু প্রথমে পাদে কলেঃ কৃষ্ণবিনিন্দকাঃ॥
দ্বিতীয়ে তন্নামহীনাস্তৃতীয়ে বর্ণসঙ্করাঃ।
একবর্ণাশ্চতুর্থে চ বিস্মৃতাচ্যুতসৎক্রিয়াঃ॥

অর্থাৎ, এই সময়ে শূদ্রেরা প্রতিগ্রহপরায়ণ ও পরস্বাপহারী হইবে। এই কালে বরকন্যার পরস্পর স্বীকারমাত্রেই বিবাহ সম্পন্ন হইবে। সকলে শঠ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা ও প্রতিদানকালে বদান্যতা প্রকাশ করিবে। কোন ব্যক্তির অপকার করণে অসমর্থ হইলে ক্ষমাপ্রকাশ করিবে, অক্ষম ব্যক্তির প্রতি বিরাগ প্রকাশে যত্নবান হইবে। সকলে পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য বাচালতা প্রকাশ করিবে এবং যশোলাভের নিমিত্ত ধর্ম্মসেবা করিবে। লোকে ধনাঢ্য হইলেই সাধু বলিয়া মান্য হইবে এবং দূরদেশস্থিত জলকেই তীর্থ বলিয়া মান্য করিবে। গলায় সূত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ হইবে এবং দণ্ড ধারণ করিলেই পরিব্রাজক হইতে পারিবে। বসুমতী অল্পশস্যা হইবেন, নদী তীরগতা হইবে। স্ত্রী বেশ্যার ন্যায় আলাপাদি করিবে, স্ব স্ব স্বামীর প্রতি তাহাদের মন থাকিবে না। বিপ্রেরা পরান্নলোলুপ এবং চণ্ডালেরা যাজক হইবে। স্বেচ্ছাচারিতাবশত স্ত্রীলোকেরা অবিধবা হইবে। মেঘ হইতে অনিয়মিত বৃষ্টির ফলে মেদিনী অল্পশস্যা হইবে। রাজাগণ প্রজাপীড়ক হইবে, প্রজারা রাজকরে অতিশয় প্রপীড়িত হইবে এবং স্কন্ধে ভার ও হস্তে পুত্রকে ধারণ করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে দুর্গম পর্ব্বত ও ঘোর অরণ্য আশ্রয় করিবে। তাহারা অরণ্যজাত মধু মাংস ও ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণে প্রবৃত্ত হইবে এবং সকলেই ভগবানের নিন্দা করিবে। কলির প্রথম পাদে এইরূপ আচরণ করিবে, দ্বিতীয় পাদে লোকে ভগবানের নাম বিবর্জ্জিত হইবে, তৃতীয় পাদে বর্ণসঙ্কর হইতে থাকিবে এবং চতুর্থ পাদে সকলেই সৎক্রিয়াবিবর্জ্জিত হইয়া একবর্ণ হইবে।

*

পুরাণবর্ণিত লক্ষণগুলি প্রায় সকলই লক্ষিত হইতেছে, বাকিগুলির মধ্যে প্রথম লক্ষণটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অব্যবস্থায় দরিদ্র জনসাধারণের যে দুরবস্থা হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের আত্মরক্ষার শেষ উপায়টি আশ্রয় করিতে আর বাধিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। চালের ও কয়লার মণ আর কয়েক টাকা করিয়া চড়িলেই প্রতিগ্রহপরায়ণ ও পরস্বাপহারী শূদ্রের অত্যাচারে দেশে বিপ্লবের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী—স্কন্ধে বিদ্যাবুদ্ধির বোঝা

লইয়া ও পুত্রের হাত ধরিয়া অরণ্যে ফলমূল ভক্ষণ করিবার জন্য তথাকথিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেই যাইতে হইবে। সম্ভবত পুরাকালে ইংরেজের সৃষ্ট এই বিচিত্র সম্প্রদায়টি ছিল না বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বিশেষভাবে ইহাদের নামোল্লেখ করেন নাই। স্মরণ হইতেছে, পূর্ব্বে একবার এই সম্প্রদায়ের বিষয় বলিতে গিয়া রহস্য করিয়া হাইড্রলিক প্রেসের উপমা প্রয়োগ করিয়াছিলাম। এখন বুদ্ধি কিছু খুলিয়াছে, দেখিতে পাইতেছি, পিষ্ট ও পীড়িত হইয়া মরিবার আশঙ্কা নাই—যদি এই সম্প্রদায়টি গোটাগুটি বিজ্ঞানের অস্‌মোসিস (Osmosis) প্রথায় নিম্নাবস্থিত বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সহিত মিশ খাইয়া যাইতে পারে, তবে আপাতত বাঁচিয়া তো যাইবেই; পরে শুদ্ধি করিয়া স্বাজাত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেও ইহাদের বাধিবে না। রুশিয়ায় নাকি এইরূপ হইয়াছে এবং হইতেছে। আমরা নিজে এই সম্প্রদায়ভুক্ত, সুতরাং এই আপৎকালে স্বভাবতই আত্মরক্ষার কথাই চিন্তা করিতেছি।

* * *

আমাদের হইয়া প্রতিকার-চেষ্টা যখন আর কেহই করিতেছেন না, তখন আমাদিগকেই বাঁচিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। যতদিন বস্তুমূল্য অপ্রাকৃত কারণে এমন অসম্ভব রকম বেশি থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে মধ্য-বিত্তীয় যাবতীয় বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। এ বিষয়ে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ স্ব স্ব পরিবারকে ক্রমশ শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন। বিবিধ প্রসাধনদ্রব্য সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া লজ্জানিবারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু বস্ত্র ব্যবহার করিয়া, চা-সিগারেট প্রভৃতি জীবনধারণে অনাবশ্যক মাদকদ্রব্য ত্যাগ করিয়া অতি সরল সহজ জীবন আমাদিগকে কিছুকাল যাপন করিতে হইবে। বিনা প্রয়োজনে যানবাহনাদির ব্যবহার কেহ করিবেন না; সকলকেই স্ব স্ব গণ্ডির মধ্যে কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া বাস করিতে হইবে। জীবধর্ম্মের প্রয়োজনে আহার যতটুকু না হইলেই নয়, ততটুকু আহার করিবেন; নিমন্ত্রণ অতিথিসৎকার জাতীয় যাবতীয় সামাজিক ব্যাপার এই কালে সম্পূর্ণ স্থগিত রাখিতে হইবে। এক বেলা আহার করিয়া ভারতবর্ষের বহুলোক বাঁচিয়া থাকে, প্রয়োজন হইলে সময় ও পরিমাণ ডাক্তারের সাহায্যে নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়া এক বেলাই আহার করিতে হইবে। জ্বালানির মূল্য যতদিন অত্যধিক থাকিবে, ততদিন এক বেলা রন্ধনই সঙ্গত। গৃহিণীরা এবিষয়ে বহুবিধ ওজর-আপত্তি প্রদর্শন করিবেন। তাঁহাদিগকে যুক্তির দ্বারা, অনুনয়ের দ্বারা স্বমতে আনিতে হইবে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহারা

অবুঝ থাকিলে গৃহকর্ত্তাকে কঠোর হইতে হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থকে ধীরে ধীরে নগরের সর্ব্বনাশা মোহপাশ কাটাইয়া পল্লীগতপ্রাণ হইতে হইবে—ভূমির সহিত অল্পবিস্তর যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইবে।

*　　*　　*

এইভাবে জীবনধারণে যদি আমরা অভ্যস্ত হইতে পারি, তাহা হইলে চুরি ও ঋণ না করিয়াও এক দিকে যেমন আমরা কিছুকাল প্রাণধারণ করিতে পারিব, অন্য দিকে তেমনই সর্ব্ববিধ বাহুল্য বর্জ্জন করার ফলে শাস্ত্রবর্ণিত শূদ্র অর্থাৎ চাষাভূষা মুটে-মজুর সম্প্রদায়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া তাহাদের ঈর্ষাজনিত আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইবে। অন্নে বস্ত্রে যদি আমরা তাহাদের সহিত কতকটা সাম্য সংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে প্রয়োজনের সময়ে তাহারাই আমাদিগকে রক্ষার ভার গ্রহণ করিবে। যে বিপ্লব আসিতেছে, তাহাতে বৃহত্তর সুতরাং শক্তিশালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই সুবিবেচনার কাজ হইবে। রাজা তাঁহার যাবতীয় শাসন-উপকরণ লইয়া প্রত্যন্ত-বিভাগের গণ্ডি রক্ষার কাজে যখন নিযুক্ত থাকিবেন, অন্তর্বিপ্লব হইতে সাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য তখন কেহই হয়তো থাকিবে না। যাহারা বিপ্লব আনয়ন করিবে, এক্ষেত্রে তাহাদেরই আত্মীয়তা কাম্য। ইহার জন্য বাহুল্য বর্জ্জন, শ্রেণীভেদ বর্জ্জন একান্ত আবশ্যক। আন্তরিক কারণে না হইলেও কৌশল হিসাবে এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহারে নিম্নশ্রেণীর লোভ উদ্রিক্ত হইলেই সর্ব্বনাশ ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

*　　*　　*

আমাদের এই সতর্কতা-বাক্যে আজ অনেকে হয়তো হাসিবেন, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিবেন—মহামন্বন্তর সম্মুখে। বাংলা দেশে অসামরিক বাঙালীর ব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ যাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিতেছেন, তাঁহারা জানেন এই অগ্রহায়ণ-পৌষে যে পরিমাণ শস্য মাঠ হইতে চাষীর ঘরে উঠিয়াছে বা উঠিবে, তাহাতে কোনও ক্রমে চৈত্র পর্য্যন্ত লোকের আহার্য্যের প্রয়োজন মিটিবে। কিন্তু তাহার পর? দুর্ভিক্ষের হাহাকারে

বাংলা দেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইবে মাত্র। এখন হইতে যদি আমরা সাবধান হইতে পারি, তাহা হইলে পরবর্ত্তী ফসল পর্য্যন্ত কোনও ক্রমে হয়তো টিকিয়া যাইতে পারিব। দেশকে সমগ্রভাবে ধরিয়া এই হিসাব করিতেছি, বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় বা ব্যক্তি এই হিসাবের বাহিরে পড়িতে পারেন। আগামী মারাত্মক সমস্যার সমাধান-চেষ্টা আরও নানা ভাবে হইতে পারে। যাঁহারা সমাজনীতি এবং অর্থনীতি বুঝেন এমন সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির আজ অগ্রসর হইয়া জাতিকে এই বিপদে পথ দেখাইতে হইবে। অদৃষ্টবাদী হইলে চলিবে না। জাতির ভবিষ্যৎ শুভাশুভ সম্মুখে রাখিয়া এই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে জাতিকে যাঁহারা পরিচালনা করিবেন, তাঁহারাই সত্যকার দেশনায়ক। ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া যাঁহারা বিব্রত থাকেন, তাঁহারা যত নামীই হউন, দেশের তাঁহারা কেহ নহেন। এই সকল স্বার্থান্ধ জননেতাস্থানীয় লোকেদের এখন হইতে পরিহার করিয়া চলিতে হইবে।

—

সমগ্র জাতির এই দুর্দ্দিনে শ্রেণীস্বার্থ লইয়া আলোচনা করা অশোভন, তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বিপ্লবসূচনায় সর্ব্বাপেক্ষা আহত হইয়াছি আমরা লেখক এবং পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশক সম্প্রদায়। গবর্মেণ্টের এক চালে সাদা কাগজের বাজার এমন ভয়াবহভাবে চড়িয়া গিয়াছে যে, আমরা আঁকুপাঁকু করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ছড়াইয়াও আর নাগাল পাইতেছি না। সংবাদপত্র নামে যাঁহারা অভিহিত, তাঁহারা বিশেষ কারণে গবর্মেণ্টের সহযোগিতা লাভ করিয়া শুধু বাঁচিয়াই যান নাই, নানাভাবে অধিকতর লাভবান হইতেছেন ; সে ক্ষেত্রে ঠকিবার বেলায় ঠকিতেছে ক্রেতা জনসাধারণ। গবর্মেণ্ট নিজ প্রয়োজনে সংবাদপত্রকে আশ্রয় দিয়াছেন ; কাগজের পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠাহিসাবে মূল্য অর্ডিন্যান্স-যোগে নির্দ্ধারণ করিয়া এবং সাদা কাগজের ব্যবস্থা করিয়া। সংবাদপত্রের আরও সুবিধা এই যে, ইহা অন্নবস্ত্রের মত না হউক চা-সিগারেটের মত দুষ্পরিহার্য্য মৌতাতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা আমাদের দেশে সে গৌরব লাভ করে নাই। অন্য দিকে অভাব ঘটিলে যে কোনও মুহূর্ত্তে ক্রেতারা এগুলিকে

জীর্ণবস্ত্রের মত পরিত্যাগ করিবে। সুতরাং উপকরণ-মূল্যের হিসাবে প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। তথাপি আমরা সহৃদয় দেশবাসীর বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া সাদা কাগজের একান্ত অভাববশত পত্রিকার পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমাইতে বাধ্য হইয়াছি। হয়তো ভবিষ্যতে আমাদিগকে আরও শীর্ণকায় হইতে হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অপ্রকাশের দ্বারাই আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইবে। ভবিষ্যতে যদি কোন দিন সাদা কাগজের অকৃপণ ধারাবর্ষণ সম্ভব হয়, তবেই আবার আমরা স্বমহিমায় ভূমিপৃষ্ঠে আত্মপ্রকাশ করিব। এই দুর্ঘটনা এখন মাত্র সম্ভাবনার কোঠায় নাই; অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে ইহা অবশ্যই ঘটিবে। বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে বাধ্য হইয়াই ধারাবাহিক উপন্যাস দুইটির ('প্রেম' ও পিশাচ') প্রকাশ স্থগিত রাখিলাম। কাগজের সুরাহা হইলেই সেগুলি সম্বন্ধে আমরা যথাবিহিত ব্যবস্থা করিব। পরিমাণে অল্প দিয়া উপন্যাস দীর্ঘকাল চালাইবার আমরা পক্ষপাতী নই।

* * *

ঘটনা এই—যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য গবর্মেণ্টের কাগজ প্রয়োজন। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় মিলগুলিতে যে পরিমাণ কাগজ উৎপন্ন হয়, তাহার শত-করা নব্বই ভাগ তাঁহাদের চাই। বাকী শত-করা দশ ভাগ সাধারণে ব্যবহারের অধিকার পাইবে। সাময়িক পত্রিকা (সংবাদপত্র নয়), পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্যপুস্তক যাঁহারা প্রকাশ করেন, তাঁহারা ছাড়া অসংখ্য বেসরকারী ছোট বড় প্রতিষ্ঠান, চিঠিপত্র, ফর্ম, প্রস্পেক্টাস ইত্যাদিতে সাদা কাগজ ব্যবহার করেন। তাঁহারা অর্থগৌরবে অপেক্ষাকৃত গরীয়ান। তাঁহারা কৃপা করিয়া উপরোক্ত শত-করা দশ ভাগের যতটুকু বাজারে অবশিষ্ট রাখিতেছেন, আমরা পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশকেরা তাহা লইয়াই কামড়াকামড়ি করিতে চাহিতেছি। ফলে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা মজা পাইয়া গিয়াছে; সাড়ে ছয় আনা পাউণ্ডের (মিলের দাম) কাগজ তাঁহারা আড়াই টাকা তিন টাকা পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করিতে ছাড়িতেছেন না। কাগজের বাজারে শোচনীয় অরাজকতা চলিতেছে।

ইহার উপর ভবিষ্যতে অধিকতর লাভের লোভে সঞ্চয়েরও বাতিক দেখা দিয়াছে। গবর্মেণ্ট সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও প্রতিকার করিতেছেন না। সন্দেহ হইতে পারে, দেশের সংস্কৃতি-রক্ষাকারী এই প্রকাশক ও লেখক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদের কাজে পরোক্ষে সহায়তা করিয়া ক্ষমতাবানেরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি কোনও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতেছেন। মোটের উপর সকল দিক দিয়া এই সমস্যা বীভৎস রূপ লইয়াছে। আমরা শক্তিহীন, লোকসান দিয়া ব্যবসা চালাইবার মত পুঁজি আমাদের নাই।

* * *

আমরা পূর্ব্ব প্রসঙ্গে বাহুল্য বর্জ্জনের কথা বলিয়াছি; আমাদের প্রস্তুত মাল এই বাহুল্যের মধ্যে পড়িলে আমাদের কিছুই বলিবার থাকিত না। নিশ্চিন্ত হইয়া হাত পা ধুইয়া জমিতে লাঙল দেওয়াব কাজে লাগিয়া যাইতে পারিতাম। সমাজের পক্ষে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখনও স্পষ্ট ধারণা আছে বলিয়া এই বিপন্ন অবস্থায় আমরা এত অধিক মনঃকষ্ট পাইতেছি। মানুষ বড় বিচিত্র প্রাণী, দেহের ক্ষুধা মিটিলেই সে বাঁচিয়া থাকে না; তাহার মনের দাবিও সর্ব্বদাই মিটাইতে হয়; এই প্রয়োজন যাহারা মিটায়, সমাজ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহাদের বাঁচাইয়া রাখে। এই বিশ্বাসই এখনও আমাদিগকে আশ্বস্ত রাখিয়াছে। আমরা যুগের প্রয়োজনে আহারে-বিহারে নিম্নশ্রেণীর সহিত আজ বেমালুম মিশিয়া গেলেও জাতিকে বাঁচাইতে হইলে জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেও রক্ষা করিতে হইবে। এই কাজ যাঁহারা করেন, তাঁহাদের দায়িত্ব অতিশয় গুরু। আপৎকালে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ধাত্রীপান্নার মত জীবন বিপন্ন করিয়াও তাঁহাদিগকে জাতির সংস্কৃতিকে রক্ষা করিতে হইবে। ব্যবসায়ীর মুখে ইহা বিজ্ঞাপন বা অহমিকার মত শুনাইলেও যে প্রবৃত্তির বশে মানুষ বহু কষ্টে শত্রুর বিমান-আক্রমণ হইতে জাতীয় লাইব্রেরিগুলি রক্ষা করিতেছে, সেই প্রবৃত্তির বশেই জাতীয় সাহিত্যকে রক্ষা করিবে; বৈদেশিক শাসনকর্ত্তাদের এ বিষয়ে কোনও মাথাব্যথা না থাকিতেও পারে।

মনটা এবম্বিধ চিন্তায় খুব তেজী পরদায় চড়িয়া গিয়াছিল, মাথায় হাওয়া লাগাইয়া মনকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য হেদুয়া পুষ্করিণীর শরণাপন্ন হইলাম, কিন্তু দুই পাক দিতে না দিতেই কলুর ঘানির কথা মনে হইল। ঘানি হইতে স্বতই তৈল-প্রসঙ্গে মন গেল। সকালেই গৃহিণীর নিকট সংবাদ পাইয়াছিলাম, সরিষার তেলের মণ ত্রিশ মুদ্রায় উত্থিত হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন আমার একটা বিলাস, গৃহিণী শাসাইয়াছেন ওরূপ নবাবী আর চলিবে না। নবাবরা নিশ্চয়ই গাত্রে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিতেন না, কিন্তু সে ঐতিহাসিক তর্ক গৃহিণীর সহিত করিয়া লাভ নাই। স্মরণ হইল, গোপালদা এ. আর. পি. পদ-নিবন্ধন সেদিন আশ্বাস দিয়াছিলেন, তেল, চিনি, আটা জাতীয় কোনও পদার্থ সুলভ মূল্যে সংগ্রহ করিতে হইলে তাঁহাকে খবর দিলেই হইবে। গোপালদার বাসা কাছেই, সুতরাং তাঁহার কাছেই গেলাম। দেখিলাম, গোপালদা একটি চটি ইংরেজী পুস্তিকা লইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই যেন কিঞ্চিৎ ভরসান্বিত হইয়া বলিলেন, কি মুশকিলেই যে পড়েছি ভাই! দেখ দেখি, এটা বুঝতে পার কি না।

পুস্তিকাটি হাতে লইয়া দেখিলাম—প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী অধ্যাপক সৌরীন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিত *In Basic*—basic ইংরেজীতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা। গোপালদা যে স্থানটায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছিলেন তাহা এই—"I 'll now dazzle and soothe, or you should hang up. What bunk, now, you ask this showman, or is show boy the English? Passing show, I answer, from the S. E. S. to the I. E. S., and as days rush past, kicking holes in us, we may cease to lament that we are not in the B. E. S. or the B. S. E. S."

আমার হাতে এক খণ্ড 'সম্প্রতি' ছিল। এই সুযোগ—একটা বাৎসরিক পত্রিকার এমন সুষ্ঠু প্রয়োগ আর করিতে পারিব না; চট করিয়া ৬২ পৃষ্ঠায় ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তীর "পরিচয়" কবিতাটি বাহির করিয়া বলিলাম, basic

বাংলাতে অমিয়বাবু এর অর্থ করেছেন দেখুন; জলের মত পরিষ্কার। গোপালদা পড়িলেন—

নামুক সহসা অনির্ণয়
মর্ত্ত্যের আত্মীয় ক্ষুদ্র পরিচয়।
জটিল সংস্কৃত ইচ্ছা ভয়
ছায়া করে আছে আধুনিক পটে।
দাঁড়িয়ে সমুদ্রভাঙা তটে
মূর্চ্ছা মন কিছুই চেনে না;
খানিক সময় যায় কাল হতে চির কালে পথ চেনা।
ঘর্ঘর অভ্যস্ত মর্ত্ত্য অন্ধ,
হোক, হোক স্তব্ধ।

পড়িতে পড়িতে ছেলেমানুষের মত লাফাইয়া উঠিলেন, মার দিয়া কেল্লা, ফুল মার্ক্‌স কে ঠেকায়।

প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, গোপালদাদের ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় উপরোক্ত ইংরেজী অংশের বাংলা করিতে দেওয়া হইয়াছে। যাহার অনুবাদ শ্রেষ্ঠ হইবে, সে লিফ্‌ট পাইবে। তৈল-প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া আমি গোপালদার লিফ্‌ট সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিন্ত হইয়াই বাড়ি আসিলাম।

* * * *

দুই দিন পরে খবর লইয়া জানিলাম, গোপালদা সেকেণ্ড হইয়া গিয়াছেন, ফার্ষ্ট হইয়াছে দপ্তরী পাড়ার নবী হোসেন, উক্ত 'সম্প্রতি'র ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত "সাম্প্রতিকী" প্রয়োগে মিয়াসাহেব কাজ হাসিল করিয়াছেন। ধূর্জ্জটিবাবুর উপর রাগ হইল, তিনিই তো গোপালদার এই ক্ষতিটা করিলেন।

—

কাগজের নিদারুণ অভাব! কিন্তু এই অভাবের মধ্যেই তথাকথিত "প্রগতিপন্থী" ও "প্রগতিশীল" সাহিত্য-পত্রিকাগুলি ঢাকা হাওড়া প্রভৃতি প্রগতি-বাদী জিলা হইতে নিয়মিতভাবে বাহির তো হইতেছেই—এখনও নূতন

প্রগতিমূলক কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া চমকাইয়াও উঠিতেছি। গুহায় নিহিত ধর্ম্মের তত্ত্বের মত শত-করা ৯০ পার্সেন্টের রহস্য ইহার মধ্যেই নিহিত নয় তো? কে জানে!

সাহিত্য-পত্রিকাই বটে! একটির সাহিত্যের কিছু নমুনা দিতেছি।—

"বার্লিনে লাড্ডুর ভিয়েন চেপেছে, জাপানী রেডিও মারফৎ তার গন্ধ পেয়েই এঁরা প্রায় মুক্তকচ্ছ—সত্যি যদি কোনদিন সে-লাড্ডু প্রাপ্তি ঘটেই যায় এঁদের তখনকার লাংগুল-গোময়-সংযুক্ত অবস্থা কল্পনা করাও আজকের দিনে গবেষণা-সাপেক্ষ। 'জাপানকে রুখতে হবে'—আরে রামঃ, তা হলে নিজেদের বোনেদের কৌমার্যভংগের দায়িত্ব নেবে কে? সুধু দিনযাপনে ও প্রাণধারণের একমাত্র আদর্শের যে ফলপ্রাপ্তি শ্রীমতী সহধর্ম্মিণীর দ্বারা বছর বছর ঘটেছে, এ over-population-এর বাজারে সে-দুষ্কার্যের সৎকারই বা কে করবে?"

মেদিনীপুরের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশবাসীর উপর উৎপীড়নের যে বিবৃতি সেদিন ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে বাংলার ভূতপূর্ব্ব রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন, সন্ধান করিয়া তাহা পাঠ করিলেই উপরোক্ত প্রশ্নগুলির জবাব এই প্রগতিবাদীদের মিলিবে। যে দুর্দ্দশা আমাদের বর্ত্তমানের সহচর, তাহার ভবিষ্যৎ কল্পিত সম্ভাবনা অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া লাঞ্ছিত স্বদেশ-বাসীর অধিকতর লাঞ্ছনা করার মধ্যে বীরত্ব নাই। যাঁহারা নিজের বা অপরের প্রচারকার্য্য চালাইতে চান তাঁহারা স্বচ্ছন্দেই তাহা করিতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের নামে এই মিথ্যাচার কেন?

—

সাহিত্যের সংবাদ এই। যুদ্ধের সংবাদ বাংলা দেশের পক্ষে অত্যন্ত আশাপ্রদ। ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি মাননীয় ওয়াভেল সাহেব ও 'যুগান্তর'-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় অনেক যুক্তি পরামর্শের পর বহু দিক বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, বর্ত্তমানে বাংলা দেশের জাপান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

কার্ত্তিকের 'শনিবারের চিঠি'র "সংবাদ-সাহিত্য" বিভাগের ১৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত পত্র-প্রসঙ্গে ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন—

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে, আপনার জনৈক "শ্রদ্ধেয় বন্ধু"র সীলেট হইতে প্রেরিত একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে আমার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। আপনার "শ্রদ্ধেয়" পত্রলেখককে যদি যথার্থ সনাক্ত করিতে পারিয়া থাকি, তা হইলে তিনি আমারও "পরম শ্রদ্ধেয়"। তথাপি তাঁহার দুইটি প্রমাদ দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি—নিজের ও কবিসম্রাটের প্রতি দায়িত্ব-বোধে।

১ম। উক্ত পত্রের শেষ ভাগেরই প্রথমে উল্লেখ করি। রবীন্দ্রনাথ উক্ত সভার পরে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যে "তাঁহার ন্যায় একজন 'অ-সভ্যকে' ব্রাহ্মসমাজের শ্রেণীতে উন্নীত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল" এ কথা আমি এই প্রথম শুনিলাম। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি কোন সাক্ষ্য দিতে পারি না।

২য়। উক্ত সভার উপলক্ষ্য ও পরিচালনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা অনুমতি করিলে, দ্বিতীয় প্রমাদটি বুঝাইয়া দিতে পারি।

পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তখন নিতান্ত সম্প্রতি তিরোধান করিয়াছিলেন। গৌহাটি ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার শ্রাদ্ধসভা আহূত করা পূর্ব্বেই ধার্য্য করিয়াছিলেন। কবিবর হঠাৎ গৌহাটি আসায়, তাঁহাকেই সভাপতি করা পরে সাব্যস্ত হয়। আমিই সেই সভার একমাত্র মনোনীত বক্তা ছিলাম।

সভাস্থলে গিয়া দেখি সভামণ্ডপের তোরণে ও অন্যান্য ভাগে কবিসম্বর্দ্ধনা-সূচক পতাকা ঝুলিতেছে। শোভাযাত্রা করিয়া, কবির জয়-ধ্বনি করিতে করিতে সভাপতিকে আনা হইল। শ্রীপ্রফুল্লশঙ্কর গুহ (আমার পরম স্নেহাস্পদ প্রাক্তন ছাত্র, সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী) কবিপ্রশস্তিসূচক স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিলে, সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। এ পর্য্যন্ত সভাস্থলে শাস্ত্রী মহাশয়ের নামও উচ্চারিত হয় নাই।

৺শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি এই অবমাননা, অন্তত অবজ্ঞার ইঙ্গিতে আমি

বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি। এবং ইহার প্রতিবাদ করিতে মনস্থ করি। সুতরাং সভাপতি মহাশয়, আমায় আহ্বান করিলে, আমি যথেষ্ট কৈফিয়ৎ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া আমার বক্তব্য আরম্ভ করি। আমি বলি "Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more"; বা কবির নিজের ভাষায় "পিতৃকোলে বসি, আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু, পূর্ণচন্দ্রপানে"। এতদ্ব্যতীত, আমি ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর পুত্র। তিনি কবিবরের সমালোচনা করিয়া কবির সহিত অনেক তর্কযুদ্ধ করিয়াছিলেন।* "His mantle has since fallen on my unworthy shoulders"। স্মরণ করাইয়া দিই যে, অল্পদিন পূর্ব্বে 'নব্যভারতে' কবির ধারাবাহিক সমালোচনা-সূত্রেও আমি ঐ কথাই বলি; "Save the poet from his uncritical admirers." আমি আরও বলি যে, রবীন্দ্রনাথের নানামুখী প্রতিভার পূজায় আমি কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করি না—সে কি কবি, কি রাজনৈতিক, কি সমাজ-সংস্কারক হিসাবে। এই শেষ "দফা"র উদাহরণস্বরূপ আমি বলি, "He is the only member of the else conservative Tagore family who accorded his blessings on a recent inter-caste marriage in the family"।

তৎপরে আমি ৺শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে কিছু বলি। কিন্তু "শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বাধীন চিত্ত ও তেজস্বিতার পরিচয় দিবার" বা অন্য কোন সম্পর্কেই বলি নাই যে "মহর্ষির সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের মনান্তর হয়, এবং তিনি অন্য সমাজে চলিয়া যান।"

ব্রাহ্ম-সমাজের একজন বালকের পক্ষেও এ ভুল করা কষ্টসাধ্য। আমার পরিণত বয়সে, ও ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর পুত্র হইয়া এ ভুল করা অসম্ভব। কেন না ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াও যে কয়জন তেজস্বী যুবক নববিধান সমাজ হইতে বহিষ্ক্রমণ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গড়েন, আমার ৺পিতা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

---

* এ সকল "পুরাতন প্রসঙ্গে" যদি পাঠকবর্গের অভিরুচি থাকে, অন্যবার সে সকল কাহিনী শুনাইব।—প্র চ রা চৌ

এতবড় anachronism ও solecism কোন ব্রাহ্মই সজ্ঞানে করিবেন না। আপনার ও আমার "শ্রদ্ধেয়" ব্যক্তি "অ-সভ্য" বলিয়াই, এবং ২০৷২৫ বৎসরের ঘটনার খুঁটিনাটি বিস্মৃতিবশতই, এই প্রমাদে পড়িয়াছেন।

অবশেষে, কবিবরের সেদিনের অসম্ভাবিত উত্তেজনার একটি কারণ বোধ হয় নির্দ্দেশ করিতে পারি। সেকালে 'নব্যভারতে' আমি তাঁহার রচনাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কটু আলোচনা করিতেছিলাম। তাঁহার একজন নিকট আত্মীয়ার নিকট শুনিয়াছিলাম তিনি সেজন্য আমার উপর বেশ একটু রুষ্ট হইয়াছিলেন। 'প্রবাসী' সে রোষাগ্নিতে ইন্ধন প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যথা—আমি আমার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম Carlyle উদ্ধৃত করিয়া "Had I but two potatoes in the world' &c.। তাহাকে ইঙ্গিত ও উদ্ধৃত করিয়া "আলুর দম বথ্‌শিষ" শীর্ষক এক রসিকতা 'প্রবাসী'তে বাহির হয়। তাহার ভাবার্থ— "জনৈক ইংরাজী-নবিশ লেখকের প্রবন্ধের অর্থ যদি কেহ করিতে পারেন তাঁহাকে 'প্রবাসী' অফিস হইতে এক সের আলুর দম বথ্‌শিষ দেওয়া হইবে।" [এ প্রবাসে উক্ত 'প্রবাসী' যোগাড় করিতে পারিলাম না। সুতরাং এই অংশটুকু স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি]। ইতি

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় (চৌধুরী)

আমাদের থানা-বিভাগে কয়েকটি সাহিত্যশিল্প-বিষয়ক চুরি ও আইন-ভঙ্গের সংবাদ আসিয়াছে। থানা-অফিসারেরা সম্প্রতি যুদ্ধসংক্রান্ত নানা গুরুতর কাজে ব্যাপৃত থাকায় আমরা ময়না-তদন্তের সময় পাই নাই। এখন কেবলমাত্র কেসগুলি ফাইল করিয়া রাখিলাম—যথাকালে এগুলি সম্পর্কে তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করিব। যাঁহাদের সম্বন্ধে নালিশ আসিয়াছে, তাঁহাদের নামের তালিকা মাত্র প্রকাশিত হইল ; ১। শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ২। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ৩। শিল্পী Hors de Combat, ৪। শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তী, ৫। কাজি আফসার উদ্দিন।

কয়েকটি ভাল বই এই কালের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' প্রচলিত সংগ্রহের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খণ্ড পূজাবকাশের

এক মাসের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-উপন্যাস-প্রবন্ধের সুষ্ঠু পুনর্মুদ্রণ ছাড়াও এই খণ্ডগুলিতে সম্পাদকীয় যে সকল মন্তব্য পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইতেছে, সেগুলি অতিশয় মূল্যবান। অনেক নূতন সংবাদ এগুলির মধ্যে আছে। রবীন্দ্রনাথকে এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ রচনা বুঝিবার পক্ষে এগুলি যথেষ্ট সহায়তা করে। এই দুই খণ্ডে সংযোজিত চিত্রগুলিও উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আর দুইখানি পুস্তকও উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' রবীন্দ্রনাথ-রচিত যাবতীয় বাংলা পুস্তকের একটি নির্ভরযোগ্য কালানুক্রমিক পরিচয়। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ' রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও সাহিত্যের সার্থক বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিবেন, তাঁহারা ব্রজেন্দ্রবাবুর পুস্তিকাখানিকে বাদ দিয়া চলিতে পারিবেন না। গুপ্ত মহাশয়ের বইটি রবীন্দ্র-সাহিত্যের পথপ্রদর্শক।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ এবং 'সাহিত্য-বিতান' বাংলার সমালোচনা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে কয়েকটি নূতন রচনা যোজিত হইয়াছে। 'সাহিত্য-বিতান'—'সাহিত্য-কথা'র সমপর্য্যায়ের বই; বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের পক্ষে অপরিহার্য্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় আরও দুইটি মূল্যবান জীবনচরিত যোজনা করিয়াছেন, একটি শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত 'রাধাকান্ত দেব' এবং অন্যটি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'দীনবন্ধু মিত্র'। এগুলির প্রয়োজনীয়তা আজ সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইতেছে।

হুমায়ুন কবিরের 'বাঙলার কাব্য' একজন প্রগতিশীল মুসলমানের দৃষ্টিতে বাংলার কাব্যধারার বিচিত্র বিশ্লেষণ। কাব্যের ধারাকে একটা মনগড়া তত্ত্বের খাতে প্রবাহিত করাইতে হইলে যে জিদের প্রয়োজন, কবির সাহেবের তাহা আছে। তিনি অদ্ভুত মুন্সিয়ানা সহকারে বাংলা কাব্যের ক্রমবিকাশের ধারা ও তাহার উপর ইস্‌লামের প্রভাব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তথ্যাংশ এই কারণে স্থানে স্থানে বিকৃত হইলেও সমগ্র রচনাটি সুখপাঠ্য হইয়াছে—ইহা আমাদের কৌতুক ও কৌতূহলেরও উদ্রেক করে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া

এইভাবে বাংলা কাব্যের ধারা বিশ্লেষিত হইলে একদিন তাহার যথার্থ স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকট হইবে। এরূপ প্রচেষ্টার সমর্থন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে করি। পুস্তকটির গঠন ও বহিরাবরণ (get-up) চমৎকার, এ বিষয়ে কবির সাহেব ভাগ্যবান।

শ্রীচিন্তামণি করের 'ফরাসী শিল্পী ও সমাজ' বাংলায় একটি নূতন ধরনের বই, চিন্তামণিবাবু স্বয়ং শিল্পী, শিল্পীমন লইয়াই তিনি ফরাসী শিল্পী ও সমাজের সুখপাঠ্য পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিগুণে সাধারণ পাঠকের মনেও এই সমাজ সম্বন্ধে সম্ভ্রম জাগে। বইটি সুচিত্রিত।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *Begams of Bengal* সরকারী কাগজপত্র হইতে অতীব ক্লেশ সহকারে সংগৃহীত বাংলার কয়েকজন বেগমের চিত্তচমৎকারী ইতিহাস। সার্ যদুনাথের ভূমিকা এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

* * *

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি' যে বিচিত্র আয়োজন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে শিল্পগুরুর উপযুক্ত হইয়াছে। কোয়ার্টার্লির অষ্টম বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা (মে-অক্টোবর, ১৯৪২) অবনীন্দ্র-সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিবিধ প্রবন্ধগৌরব ছাড়াও এই সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশটি আর্টপ্লেট আছে—তন্মধ্যে ২৬টি বহুবর্ণ। অবনীন্দ্রনাথের এতগুলি প্রসিদ্ধ ছবির একত্র সমাবেশ অন্যত্র দেখি নাই। যাঁহারা ভারতীয় শিল্পকে ভালবাসেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিবেন। বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতার বাজারে এতগুলি রঙিন আর্টপ্লেটযুক্ত এই সংখ্যার দাম ৮৲ মোটেই বেশি নয়।

মেদিনীপুরের দুর্গতদের সাহায্যার্থ শনিমণ্ডলের পক্ষে যে সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, তাহাতে এখন পর্য্যন্ত ১৫১৲ টাকা জমা হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুধীর মুখোপাধ্যায় (C/o Messrs. King & Co., Afzulgunj, Hyderabad, Deccan) ৫০৲, কিং এণ্ড কোং'র চ্যারিটি ফাণ্ড (ঐ) ২০৲, Hakim Kankaya (ঐ) ১০৲, শ্রীযুক্ত নেমিচাঁদ পাণ্ডে (কলিকাতা ও কিষণগড়) ২৫৲, শ্রীযুক্ত অজিতনারায়ণ চৌধুরী (কলিকাতা) ১০৲ দিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৯

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস

(দ্বিতীয় পাঠ)

উপন্যাসের সংজ্ঞা ও তদনুযায়ী বাংলা উপন্যাসের বিচার এই গ্রন্থে যেরূপ হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া কেন যে সহজ নয়, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি অতঃপর সে সম্বন্ধে এই গ্রন্থ হইতে কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধৃত করিব, এবং সেই সঙ্গে আমার বক্তব্যও কিঞ্চিৎ সবিস্তারে বলিব। এবার গ্রন্থকার-কল্পিত উপন্যাসের ধারাটিই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে।

ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি ও পরিণতির যে একটি কালক্রম পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়া থাকেন, তাহার পক্ষে উক্ত সাহিত্যে প্রচুর সাক্ষ্য বিদ্যমান; এজন্য তাহা হইতে একটা ক্রমবিকাশের ধারণা হওয়া অসঙ্গত নয়, যদিও সাহিত্যিক রূপ-কর্ম্মের বিচারে এইরূপ উৎক্রান্তিবাদ আশ্রয় করার পক্ষে বাধাও যথেষ্ট আছে। কেহ কেহ তাহা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি, ইংরেজী তথা য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রবৃত্তিই স্বতন্ত্র, সেখানে যাহা যে কারণে যে কালে সম্ভব হইয়াছে, আমাদের সাহিত্যেও তাহা সেই কারণে সেই নিয়মে সম্ভব নয়। সকল বস্তুর আদিম রূপ প্রায় এক হয় বলিয়া আমাদের ভারতীয় সাহিত্যেও ওই স্তরের রূপসাদৃশ্য অসম্ভব নয়, তাই বলিয়া তাহার বিকাশের-ধারা বা পরিণতির নিয়ম এক না হইবারই কথা। নভেল নামক বিলাতী উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ—তাহার character বা ব্যক্তি-চরিত্রাঙ্কণ; ইহার মূলে আছে সমাজ বা গোত্র-চেতনার বিপরীত একরূপ ব্যক্তি-চেতনার উন্মেষ। সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে যদি ভাব-প্রেরণার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকে, তবে এ বিষয়ে আমাদের সাহিত্যের প্রেরণা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। আমাদের জাতির তুলনায়

য়ুরোপীয় জাতি সকলের ব্যক্তি-চেতনা বা স্বাতন্ত্র্য-বোধ যে কিছু উগ্র তাহা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে। এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ তাহাদের সাহিত্যে বহুদিন পর্য্যন্ত ব্যক্তি-আদর্শের প্রতিষ্ঠা না করিলেও, অতি পূর্ব্বকালেই য়ুরোপীয় সাহিত্যে পৌরুষের যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের আদর্শ তাহা হইতে অতিশয় বিলক্ষণ। তথাকার প্রাচীন সাহিত্যে যে দুইটি কাব্য-রূপের বিকাশ হইয়াছিল, সেই 'এপিক' ও 'ট্র্যাজেডি'র মধ্যে এমন একটি বস্তুর দর্শন পাওয়া যায়, যাহা আমাদের সুপরিপুষ্ট প্রাচীন সাহিত্যের নাটকে বা মহাকাব্যে কখনও স্থান লাভ করে নাই। এই বস্তুর নাম দেওয়া যাইতে পারে—পুরুষের আত্মশক্তির দুর্দ্দমনীয়তা-বোধ, বা বিশুদ্ধ পৌরুষ, যে পৌরুষ কোন দৈব বা অধ্যাত্ম-শক্তির বশ্যতা স্বীকার করে না। একজন আধুনিক ইংরেজ কবি একালেও এই কয়টি কথায় সেই আদর্শের জয়গান করিয়াছেন—

> It matters not how strait the gate,
> How charged with punishments the scroll,
> I am the master of my fate :
> I am the captain of my soul.

—এখানে সেই প্রাচীন 'হিরো'-আদর্শ ও আধুনিক 'ব্যক্তি'-আদর্শ চমৎকার মিলিয়াছে; তাহাতে আরও প্রমাণ হয় যে, এককালে যাহা কেবল বীর-চরিত্রের আদর্শ ছিল তাহার মধ্যেই ব্যক্তিমাত্রের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য-বোধ নিহিত আছে। আমাদের সাহিত্যে, বিশেষত প্রাক্-আধুনিক সাহিত্যে, এইরূপ ব্যক্তিত্ব-ঘোষণার দৃষ্টান্ত সুলভ নহে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিদ্রোহমাত্রেই এইরূপ শক্তির প্রমাণ নয়—সে প্রবৃত্তির মূলে প্রবল ধর্ম্ম-বিশ্বাস থাকিতে পারে; আবার, প্রেমের মত প্রবল হৃদয়াবেগের বশে সমাজ বা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করার যে দুঃসাহস তাহাতেও আত্ম-চেতনা অপেক্ষা আত্মবিস্মৃতির মাত্রাই অধিক।

পৌরুষের এই য়ুরোপীয় আদর্শ তথাকার সমাজ-জীবনকে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, ভারতীয় জীবনে তেমন না হওয়াই স্বাভাবিক। য়ুরোপে মধ্যযুগের জমিদার-তন্ত্র ও যাজক-তন্ত্র এই চেতনাকে অনেক

পরিমাণে নিপীড়িত করিয়া রাখিলেও সে জাতির প্রকৃতিগত সেই স্পৃহা কখনও সম্পূর্ণ দমিত হয় নাই ; তাই রাষ্ট্রে ও সমাজে বার বার বিপ্লব ঘটিয়াছে, এবং শেষে সেই চেতনাই পূর্ণ মুক্তি লাভ করিয়া সাহিত্যেও নূতনতর রসরূপের প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। এই কারণে বিলাতী সাহিত্যে নভেল নামক উপন্যাসের লক্ষণ—তাহার বীজ বা পূর্ব্বাভাস—একটা ক্রমবিকাশের ধারণা জন্মাইতে পারে। তথাপি ক্রমবিকাশকে সাহিত্যের রূপ-বিবর্ত্তনে একটা অব্যর্থ নিয়ম বলিয়া গণ্য করা যায় না। কালে কালে সাহিত্যে যে সকল রস-রূপের উদ্ভব হয়—গৌণভাবে রাষ্ট্রিক বা সামাজিক চেতনা তাহাদের মূলে যতটুকুই বিদ্যমান থাকুক, শেষ পর্য্যন্ত কবির প্রতিভাই তাহাদের স্রষ্টা এবং নিয়ামক। এক একটি অতি মৌলিক প্রতিভা বাহ্য প্রতিবেশ-প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াই অভিনব রসদৃষ্টির অধিকারী হয়, এবং তাহার সৃষ্ট সেই কাব্যজগৎ হইতেই নূতন ভাবধারা উদ্ভূত হইয়া সাহিত্যের ইতিহাসে এক একটি ঋতুর সৃষ্টি করে—যেন মাটির সঙ্গে, বাস্তবের সঙ্গে, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতিরেকেই সাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র জীবন শুরু হইয়া থাকে। তথাপি জাতির স্বধর্ম্ম ও প্রাকৃতিক প্রতিবেশ প্রভৃতির কারণে সেই প্রতিভারও শুধু ব্যক্তিগত নয়, একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য থাকিবেই ; আমাদের সাহিত্যে যেমন কোন কালেই হোমার বা শেক্স্পীয়ারের আবির্ভাব হয় নাই, তেমনই য়ুরোপীয় সাহিত্যেও রামায়ণ বা রঘুবংশের মত কাব্যের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অতিশয় আধুনিক কালে পৃথিবীময় ভাবের যে আদান-প্রদান বা সামাজিক সংস্পর্শের অবাধ সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহাতে বহুদূরান্তরিত বিবিধ ভাবধারার সংমিশ্রণে, বর্ণ-সঙ্করের মত সাহিত্যেও যে রূপ-সঙ্কর অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই সকল রস-সন্ততির জাতি-নির্ণয় যেমন দুষ্কর তেমনই তাহাদের ভিতরে কোন একটা ধারার সন্ধান পাওয়া যাইবে না, সকল ধারাই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

অতএব শেষ পর্য্যন্ত এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্যের রূপ-বিবর্ত্তনে দুইটি বস্তুই প্রধান—কবি-প্রতিভা ও তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য, এবং কালের ধারা নয়—এক একটা ঋতুর আবির্ভাব। সাহিত্যের

জগতে এই ঋতুগুলি যেমন অসংখ্য, তেমনই তাহাদের কোন কালানুক্রম বা নির্দ্দিষ্ট আবর্ত্তন-চক্র নাই, বরং তাহাদের মধ্যে অভূতপূর্ব্বতা বা আকস্মিকতার লক্ষণই প্রবল। সাহিত্যে নব নব ঋতুর সৃষ্টিও যেমন শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভারই ধর্ম্ম, ঋতুর নিয়ত পরিবর্ত্তন যেমন তাহার উন্মেষের পক্ষেও বড় প্রয়োজন, তেমনই তাহার আত্মিক প্রবৃত্তিতে যে জাতীয়-বৈশিষ্ট্য আছে তাহাও সে প্রতিভার এক অলঙ্ঘনীয় নিয়তি; এ যেন একই আধারে একটা নিত্য-সত্তার সহিত অনন্ত অনিত্য-রূপের লীলা-বিলাস। ইহার একটি দৃষ্টান্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যেই জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মত এমন অভিনব ও বহুরূপী প্রতিভার উদয় আমাদের সাহিত্যে আর হয় নাই, এমন সর্ব্বাশ্রয়ী রসচেতনার প্রমাণ আর কোথাও মিলিবে না; কিন্তু তাঁহার ভাবকল্পনার সেই সার্ব্বভৌমিকতা—তাহার সেই অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যেও, তিনি একান্ত-ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় আদর্শের এমনই বশীভূত যে, তাঁহার সেই মুক্তির কারণও—সেই বন্ধন। আমার এই কথাগুলি একটু বড় হইয়া পড়িল তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা-কালে কেবল কতকগুলি বাহ্যিক ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে গূঢ়তর ও ব্যাপকতর সত্যকে হারাইতে হয়, বিশেষের আলোচনাতেও সমগ্রের চিন্তা অপ্রাসঙ্গিক নয়, বরং তাহাতেই অনেক রহস্যের সমাধান হইতে পারে।

উপন্যাস বিশেষ করিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জিনিস,—বাংলা গদ্যের ইতিহাস যেমন বেশি দূর পূর্ব্বে টানিয়া লওয়া যায় না (গবেষকগণ সেরূপ হাস্যকর চেষ্টাও করিয়া থাকেন), তেমনই বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস অথবা তাহার বিকাশ-ধারা আধুনিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নিকট বা দূর-কাল হইতে টানিয়া আনা পাণ্ডিত্যমূলক গবেষণার একটা জবরদস্তি মাত্র। একটা অতিশয় সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের যে নানা রূপ দেখা দিয়াছে, তাহাতে একটা ঋতুর কথাই উঠিতে পারে—সে ঋতুকে কবি-প্রতিভার উন্মেষক

একটা যুগসন্ধিক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত; সে একটা বৃহৎ accident-এর মত;—নানা ঘটনার যোগাযোগ ও নানা অবস্থার অপ্রত্যাশিত সংযোগে, য়ুরোপীয় কাব্য-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে, আমাদের রস-চেতনায় যে সাড়া জাগিয়াছিল তাহাতেই আমাদের সাহিত্যে উপন্যাস দেখা দিয়াছে। এই সাড়া মুখ্যত ভাব-কল্পনার বা সাহিত্যিক প্রেরণার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ—সমাজ বা ব্যক্তি-জীবনের বাস্তব অবস্থার সহিত তাহার সম্পর্ক খুবই সামান্য। তথাপি, এই নূতনের প্রেরণায় আমাদের পুরাতন ভাব-সংস্কারে কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছিল, কি কারণে আমাদের উপন্যাসে বিলাতী উপন্যাসের ধারা রক্ষিত হয় নাই—সত্য ও কল্পনা, বাস্তব ও আদর্শ তাহার কতখানি সহায়তা করিয়াছে—এ সকল বুঝিবার জন্য সেই যুগ বা ঋতুর পরিচয় ছাড়াও, প্রাচীন সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মের ইতিহাস হইতে জাতির প্রাণমনের বিশিষ্ট ভঙ্গি, তাহার রক্তগত সাধনা ও সংস্কৃতির বীজ সন্ধান করিবার প্রয়োজন আছে। আর সকল দিক অগ্রাহ্য করিয়া কেবল কোথায় কতটুকু বাস্তবতা বা জীবধর্ম্মের অকুণ্ঠিত প্রকাশ আছে তাহাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া সংগ্রহ করা ও তাহা হইতে আধুনিক বাস্তববাদ, জীবনবাদ, ব্যক্তি-আদর্শ প্রভৃতির প্রবণতা প্রমাণ করা—অর্থাৎ, তাহা দ্বারা উপন্যাসের ক্রমবিকাশের সূত্র নির্ম্মাণ করা—সেও একটা মনগড়া উপন্যাস বা উপ-বিন্যাস। সাহিত্যের কোন একটা রসরূপ—ছাঁদ বা ছাঁচ—এক সাহিত্য হইতে অপর এক সাহিত্যে সংক্রামিত হইতে পারে; কিন্তু যেহেতু এক জাতির জীবন-ধারা অপর জাতি হইতে স্বতন্ত্র, একের বাধাবিঘ্ন যেমন—অপরের তেমন নয়, সেই হেতু, জীবনের সঙ্গে যদি সাহিত্যের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই থাকে, তবে সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি ভিন্ন হইতে বাধ্য। ভারতবর্ষ ও য়ুরোপ এই দুইয়ের জীবন-ধারায় প্রবৃত্তির পার্থক্য যেমন আছে, তেমনই উভয়ের আধ্যাত্মিক বিকাশের ধারাও এক নহে। খ্রীষ্টধর্ম্ম য়ুরোপের পক্ষে পরধর্ম্ম; পাশ্চাত্যের প্রাকৃতিক প্রতিবেশপুষ্ট যে জীবন, সেই জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া এই প্রাচ্য ধর্ম্মের বীজ যেরূপে তথাকার জল-মাটিতে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ

সে পথে সে ধারায় হয় নাই; কারণ, এখানকার অধ্যাত্মসংস্কার এ দেশের মাটি ও জলবায়ুরই ফল—এ দেশের সকল ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম; এজন্ত আমাদের সামাজিক জীবনেও যেমন, ভাবজীবনেও তেমনই একটা মূল আদর্শের বিকাশ সমান ও সুসমঞ্জস ধারায় বহিয়া আসিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের যে রূপগুলি খাঁটি প্রতিভার সৃষ্টি—যেগুলি দুর্ব্বল বা বিকলাঙ্গ নয়, অজীর্ণ ও অমেধ্য অনুকরণও নয়, তাহাদের মধ্যে জাতির গভীরতর আত্মিক সংস্কার ও বহুকালাগত বিশিষ্ট সংস্কৃতির প্রভাব যাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াই থাকে, তেমন ব্যক্তি ঐতিহাসিক গবেষণার অজুহাতে এক রাশি তুচ্ছ ও নিরর্থক জঞ্জাল ঘাঁটিয়া বস্তু ও অবস্তুর ভেদ পর্য্যন্ত লোপ করিয়া ফেলিবেন। যিনি বিলাতী চশমার উপরেই নির্ভর করিবেন তাঁহার বিলাতী দৃষ্টিতে, শুধু আমাদের সাহিত্যের ধারাই নয়—ইতিহাসের বৃহত্তর ধারাও ধরা পড়িবে না। সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের, বিশেষ করিয়া চীন ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা—এ দুই দেশের মানব-ইতিহাসের ধারা—য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের ধারণায় কিছুতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে না, তাহাকে একরূপ পাশ কাটাইয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। মিশর হইতে পারস্য পর্য্যন্ত একরূপ বুঝিতে পারা যায়—মানব-সভ্যতার জন্মস্থান, তাহার আদি কেন্দ্র ও পরিধি ওই ভূভাগের মধ্যেই সমাপ্ত হইয়া আছে; তাহার পরে আর দৃষ্টি চলে না। আধুনিকতম বিদ্বান ঐতিহাসিক পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে বসিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু লিখিবার আবশ্যকতা বোধ করেন না—তাহার কারণ, ভারতবর্ষের সকল-কিছুই কিম্ভূত রকমের; ব্রহ্মার পাঁচ মুখ ও গণেশের গজমুণ্ড দেখিয়া, তাঁহারা বোধ হয় ভারতবর্ষকে মানব-সভ্যতার ইতিহাসের বহির্ভূত বলিয়াই মনে করেন। সেকালের এক বিখ্যাত বিলাতী সাহিত্যিক—William Archer-এর একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থে এই মনোভাব অতিশয় খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, ভদ্রলোক একটি *enfant terrible*-এর মতই তাঁহার স্বদেশীয় পণ্ডিত-সভায় নিজেদের মনের কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের দেশের ইংরেজীশিক্ষিত পণ্ডিতেরা তাঁহাদের বিলাতী গুরুদের মতই ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সাধনা সম্বন্ধে নাস্তিক; তাঁহাদের কেহ যদি

আধুনিক বিদ্যায়, অর্থাৎ বিজ্ঞানের পরা-তত্ত্বে পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করেন তবে তাঁহার সেই নাস্তিকতার দম্ভও অভ্রভেদী হইয়া উঠে। এত কথা বলিলাম এইজন্য যে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও য়ুরোপীয় আদর্শ আরোপ করিয়া এবং তাহারই অনুসারে কোন একটি লক্ষণকে মূল্যবান ও অপর সকলকে মূল্যহীন বিবেচনা করিয়া সাহিত্য-সমালোচনার যে পাণ্ডিত্য তাহারও মূলে এই মনোভাব বিদ্যমান। এইজন্যই এ সাহিত্যে নভেলের বীজ খুঁজিতে গিয়া সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যকে, এবং তদ্‌প্রভাবিত বলিয়া আরও অনেক কিছুকে গালি দিতে হয়। নভেলের মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজ-ঘটিত যে নব-মনোভাবের প্রেরণা রহিয়াছে, তাহা এই অতি প্রাচীন সমাজের মানব-মনে সুদীর্ঘ কালেও সম্ভব হয় নাই কোন্ গূঢ়তর কারণে,—গ্রন্থকার তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই; অথবা তিনি কেবল বিলাতী বিদ্যারই সাধনা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের সাধনা ও সংস্কৃতির সহিত কোনরূপ সাক্ষাৎ-পরিচয় তাঁহার ঘটে নাই; যদি তাহা ঘটিত তবে একটা বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হইতে পারিতেন—তাহা এই যে, এ দেশের ব্যক্তিত্ব-সাধনা বা ব্যক্তি-মন্ত্র আরও গূঢ়, আরও দুর্দ্ধর্ষ; সে সাধনা সাক্ষাৎ সমাজসম্পর্কিত নয়, বরং সকল সামাজিক প্রয়োজনকে তুচ্ছ করিয়া তাহা অতি নির্জ্জন ব্যক্তি-মানসের দুর্গম দুর্গে আপনাকে দৃঢ়-রক্ষিত করিয়া আছে। এই ব্যক্তিত্ব-চেতনা বা আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ য়ুরোপীয় বা অন্য কোন সমাজের মত একটা মানস-বৃত্তি বা চিত্তের চারিত্রিক প্রবৃত্তিই নয়,—ইহার মূল এমন স্থানে এমন দৃঢ় হইয়া আছে যে, ইহাকে কোন যুগ-প্রভাব এখনও বিচলিত করিতে পারে নাই। এই কারণে, ধর্ম্মসাধনায়, আচারে-অনুষ্ঠানে, কাব্য-সাহিত্যে, কারুশিল্পে—যাবতীয় বার্ত্তাবিধিতে—যাহা কিছু ভারতীয় তাহাই অতিশয় অনন্যসাধারণ।

৩

এই মূল সত্যটি অধ্যাপক মহাশয় গ্রাহ্য করেন নাই, করিলে তাঁহার ঐ গ্রন্থরচনায় বিশেষ বাধা ঘটিত। তিনি বিলাতী সাহিত্যের নজিরে

বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশ-ধারা ধরিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছেন, কাজেই এ সকল চিন্তা তাঁহাকে সবলে পরিহার করিতে হইবে। তিনি 'বাস্তব' ছাড়া আর কিছুর দিকে তাকাইতে পারেন না, এজন্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, সংস্কৃত পুরাণ ও কথা-কাহিনীতে, সমাজের বাস্তব চিত্র দেখিতে না পাইয়া তিনি বৌদ্ধজাতকমালার শরণাপন্ন হইয়াছেন, এবং বাস্তববিদ্বেষী হিন্দু-সমাজ ও সংস্কৃত সাহিত্যের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বাস্তব উপাদানের একান্ত অভাব তাঁহাকে এমনই নিরাশ করিয়াছে যে, তিনি কেবল—সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য নয়—হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজকে পর্য্যন্ত বাস্তবতাহীন বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন; সে এমনই যে—বৌদ্ধধর্ম্ম, এমন কি মুসলমান-ধর্ম্মের প্রাত্যহিক আচার-অনুষ্ঠান আমরা যতটা অবগত আছি—হিন্দু-সমাজের জীবনযাত্রার সহিত ততখানিও পরিচিত নহি; যেহেতু ঐ ধর্ম্ম তপোবনবাসী অতএব এই হিন্দুধর্ম্ম-প্রভাবিত সংস্কৃত সাহিত্য একেবারে বাস্তবতাবর্জ্জিত। অধ্যাপক মহাশয়ের উক্তি আমি হয়তো ঠিক বুঝিতে পারি নাই, তাই পাঠকগণের বোধশক্তির পরীক্ষার জন্য আমি নিম্নে সেই উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া, ইহার সহিত আমাদের যেরূপ বিস্তারিত ও ব্যাপক পরিচয় আছে এমন বোধ হয় মুসলমান ধর্ম্ম ছাড়া আর কোন ধর্ম্মের সহিত নাই। ইহার রীতি, নীতি ও অনুশাসন, ইহার কার্য্য-প্রণালী ও ধর্ম্ম-বিস্তার-চেষ্টা, বিশেষতঃ সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ প্রাত্যহিক সম্পর্ক—এ সমস্তই আমাদের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত। হিন্দু ধর্ম্মের ভিতর একটা প্রবল অনাসক্তির, একটা বিশাল ঔদাসীন্যের ভাব জড়িত রহিয়াছে। ঋষির তপোবন গৃহীর প্রাত্যহিক জীবন হইতে বহুদূরে অবস্থিত; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংস্পর্শের চিহ্ন অতি বিরল। তপোবনের আদর্শ শান্তি গৃহস্থের শত শত ক্ষুদ্র কলরবে, তুচ্ছ কোলাহলের দ্বারা বিচলিত হয় নাই। কচিৎ কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসু রাজা ঋষির চরণোপান্তে শিষ্যের ন্যায় আসিয়া প্রণত হইয়াছেন; ঋষিও তাঁহাকে তত্ত্বকথা শুনাইয়া তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করাইয়াছেন, তাঁহার পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ কৌতূহল-প্রবৃত্তির পরিচয় দেন নাই।—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', পৃঃ ৭

কেবল এইখানে এই উক্তিই নয়—বহু স্থানে একই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মহাশয়ের বিলাতী বাস্তবানুরাগ হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসংস্কৃতি, সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের আদর্শ এবং সংস্কৃত ভাষারও অত্যুক্তিবিলাস ও বাগাড়ম্বরকে

সহ্য করিতে পারে নাই*; কারণ, তাহাতে 'বাস্তবের' মাটি ও বাস্তবের ফুল ঢাকা পড়িয়াছে।• বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই আহেল-বিলাতী পাণ্ডিত্য 'স্বচ্ছন্দ বনজাত' শাক এবং সাধারণ গণ-মনের উপাদেয় মৃত্তিকাগন্ধী বস্তুরসের পিপাসাকে এমনই মহিমান্বিত করিবার পক্ষপাতী যে, আদিতে এই বৌদ্ধজাতক ও পরে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' তাঁহার চক্ষে বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন মাত্রার আদর্শ ঔপন্যাসিক ধর্ম্ম অর্থাৎ 'বাস্তবানুগামিতা'য় অভিষিক্ত হইয়া পরমবস্তু হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির আখ্যায়িকাগুলি ভাষান্তরের সাহায্যে (কৃত্তিবাস, কাশীদাসের হাতে) "দেবভাষার অতিরঞ্জন-স্ফীত, অলঙ্কার-মুখর, শব্দৈশ্বর্য্য-ভারাক্রান্ত বর্ণনাগুলিকে কতকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া" এই বাস্তবতার দিকে 'আর একপদ অগ্রসর হইতে' পারিয়াছিল। হায় বাল্মীকি-ব্যাস! হায় রামায়ণ-মহাভারত! ভাষা হিসাবেও অধ্যাপক মহাশয় রামায়ণ-মহাভারতকে ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয়ের 'বাস্তবতা' অতিশয় নিবিড় নিরন্ধ্র হওয়া সত্ত্বেও, সর্ব্বত্র তাহা বস্তুঘটিতই নয়; ভাবঘটিত আদর্শও যদি জাতির বৈশিষ্ট্যমূলক হয় তবে তাহা যে বাস্তব, ইহা তিনি প্রয়োজন হইলে স্বীকার করেন, নতুবা নহে; সংস্কৃত মহাকাব্য একটা জাতির যে বিশিষ্ট ভাবাদর্শ প্রতিফলিত করিয়াছে, তাহা কোন অর্থেই 'বাস্তব' নয়; কিন্তু—

তরণীসেন-বধ ও চন্দ্রকেতু-বিষয়ক উপাখ্যান এইরূপে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বঙ্গদেশের বিশেষ ভাবমাধুর্য্য দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, বাঙ্গালীর ভক্তি-রস ও সুকুমার স্নেহ দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া, আমাদের বাস্তব জীবনের একটি পৃষ্ঠায় রূপান্তরিত হইয়াছে।—পৃঃ ১৪

ইহার পর 'মৈমনসিংহ গীতিকা'। [গ্রন্থখানির এই যে খণ্ড খণ্ড পরিচয় দিতেছি ইহার জন্য আমি গ্রন্থকার ও পাঠক উভয়ের নিকটই অপরাধ স্বীকার করিতেছি, কিন্তু উপায় নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি আমার পূর্ব্ব মন্তব্যগুলির কৈফিয়ৎ দেওয়া ব্যতীত আর কিছু করিব না; তবে আমার এ বিশ্বাস আছে যে, সেই উদ্দেশ্য সাধনে আমি কোন অসাধু উপায় অবলম্বন করিতেছি না। পাঠকগণ আমার মন্তব্য ও উদ্ধৃত প্রমাণগুলি মিলাইয়া দেখিবেন।] এই 'মৈমনসিংহ

গীতিকা' সম্বন্ধে লিখিবার কালেও লেখক পুনশ্চ তাঁহার বাস্তবানুরাগকে অবাস্তব আদর্শবাদের বিরুদ্ধে কিরূপ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন, এবং তাহাতে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির বাহন—সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাষা—তাঁহার কিরূপ বিরাগভাজন হইয়াছে নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম—

সংস্কৃত প্রভাবে অনুপ্রাণিত বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা বঙ্গ-সমাজ ও -প্রকৃতির যে চিত্র পাই, তাহা ঠিক খাঁটি জিনিসটি নয়, তাহার মধ্যে দেবভাষার সংশোধন- ও পরিমার্জ্জন-চেষ্টা যেন বিশেষভাবে প্রকট। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল শাল্মলীতরু, বা তমালতালীবনরাজিনীলা সমুদ্র-বেলাভূমি এমন কি বৈষ্ণব সাহিত্যের কেলিকদম্বকুঞ্জ—ইহারা কেহই বাঙ্গালার বহিঃ-প্রকৃতির খাঁটি প্রতীক নহে—ইহাদের মধ্যে একটা ভাবমূলক আদর্শবাদ নিছক বস্তুতন্ত্রতার চারিদিকে একটি সুষমাময় বেষ্টনী রচনা করিয়াছে। যুগব্যাপী অনুকরণের ফলে এইরূপ প্রকৃতি-বর্ণনা বৈশিষ্ট্যহীন প্রথাবদ্ধতায় দাঁড়াইয়াছে। সেইরূপ মনে হয় যেন পৌরাণিক আদর্শ আমাদের অন্তঃ-প্রকৃতিকে প্রভাবান্বিত করিয়া ইহার স্বাধীন স্বচ্ছন্দ লীলাকে এক বিশেষ ছন্দের নিগড়ে নিয়মিত করিয়াছে।—পৃঃ ১৯

এখানে লেখকের বাস্তবতার আদর্শ কিরূপ কোমল হইয়া উঠিয়াছে—যাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্স তাহাও কেমন বাস্তব নামে অভিহিত হইয়াছে, পাঠকগণকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলি। লেখক পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"এই বাস্তব উপাদানের প্রাচুর্য্যের জন্যই উপন্যাস সাহিত্যের অগ্রদূতের মধ্যে মৈমনসিংহ গীতিকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে", পরে বৈষ্ণব সাহিত্য প্রভৃতির নানা দোষ উল্লেখ করিয়া এই 'মৈমনসিংহীয়' বাস্তবতার জয়গান করিয়াছেন; যথা—

আমাদের বহিঃ-প্রকৃতির মধ্যে যেমন একটা অসংস্কৃত আরণ্য উগ্রতা, ঘন-বিন্যস্ত তরুলতার দুর্ভেদ্য জটিলতা, খাল-বিল-জলাভূমি-পার্ব্বত্যনদীর দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-সঙ্কুলতা আছে, সেইরূপ আমাদের অন্তরেও নম্র কমনীয়তা ও ধর্ম্মানুরাগের সহিত একটা দুর্দ্দমনীয় তেজস্বিতা, দৃপ্ত আত্মসম্মান-বোধ ও আবেগের অন্ধ মাদকতা ছিল। আমাদের ধমনীতে যে অনার্য্য রক্ত প্রবাহিত ছিল, তাহাই আর্য্য সভ্যতা ও ধর্ম্ম-সংস্কৃতির প্রভাব উল্লঙ্ঘন করিয়া এইরূপ উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ময়মনসিংহ-গীতিকায় আমরা এই আরণ্য বহিঃ-প্রকৃতি ও অন্তঃ-প্রকৃতির সাক্ষাৎ পাই, যাহা বঙ্গসাহিত্যের অন্যত্র সুদুর্লভ। ইহার নায়িকারা শাস্ত্রের অনুশাসন-বাহুল্যের দ্বারা বিড়ম্বিত না হইয়া সতীত্বের আসল মর্য্যাদা ও গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, দেশাচার লঙ্ঘন করিয়া নিজ হৃদয়-বাণীর অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। ইঁহাদের অন্তরের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শাস্ত্রানুশীলনের শান্তিবারি সেচনে একেবারে

স্তিমিত-নির্ব্বাপিত হইয়া যায় নাই। ইঁহাদের চরিত্রদৃঢ়তা ও দুঃসাহসিকতা ইঁহাদিগকে অসাধারণ গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে।—পৃঃ ২০

—এখানে ইহার নায়িকারা যাহা করিয়াছেন বলিয়া অধ্যাপক মহাশয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা যে বাস্তব সমাজের চিত্র বা কাহিনী নয়, একেবারে খাঁটি রোমান্স—"দেশাচার লঙ্ঘন করিয়া নিজ হৃদয়-বাণীর অনুবর্ত্তন করা" যে বাস্তব চরিত্রচিত্রণের দৃষ্টান্ত নয়, তাহা এতবড় পণ্ডিত ব্যক্তিও বিস্মৃত হইয়াছেন। বৈষ্ণব কাব্যের নায়িকারা কি ইহা অপেক্ষা অধিকতর অবাস্তব কার্য্য করিয়া থাকে? তবে, একটা কথা আছে বটে—বৈষ্ণব কবিতার ভাষাটা নিতান্তই অবাস্তব—মাটির এমন সোঁদা গন্ধ তাহাতে নাই; আবার, সমাজ-জীবনের মধ্যেও যেখানে শাস্ত্রানুশাসনের সংস্কার আছে, সেখানে তাহা বাস্তব হইতেই পারে না।

কিন্তু আমি অধ্যাপক মহাশয়ের আবিষ্কৃত উপন্যাসের ধারার কথা বলিতেছিলাম। বিলাতী সাহিত্যে নভেল নামক উপন্যাসের জন্ম—যে ব্যক্তি-আদর্শ, মানুষ মাত্রের সমান অধিকার প্রভৃতি নূতনতর চেতনার উন্মেষ হইতে ঘটিয়াছে, এবং তাহাও যে-সকল রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিপ্লবের ফল—আমাদের দেশে এই জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে তেমন কিছুর পরিচয় পাওয়া যায় না। যে-জাতীয় উপন্যাসকে একজন বিলাতী সমালোচক 'Epic of Democracy', বা—সাহিত্যের 'Declaration of Independence' বলিয়াছেন, এ দেশে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-সমাজে তাহার কোন সজ্ঞানতাই ছিল না। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে, মহাকাব্যের পরে যে নূতন গীতিকাব্যের যুগ সহসা আবির্ভূত হইয়াছিল, কবি-কল্পনার গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে ফিরিয়াছিল—ইংরেজী রোমান্টিক কাব্যের প্রভাবই তাহার কারণ। এই যুগে রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম গল্পে ও কবিতায় জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ প্রকাশগুলিকে একটা মহিমা দান করিয়াছিলেন, অতিশয় সাধারণ মানব-চরিত্রকে নূতন আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার একটি প্রবন্ধে ('পঞ্চভূতে'র "মনুষ্য") কবি-কল্পনার এই নূতন দায়িত্বের কথা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন—'Dignity of man as man'-এর ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাও অনেক পরের কথা। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথও অতিউচ্চ আদর্শবাদী, তিনিও ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত 'ব্যক্তি-মানুষে'র পরিবর্ত্তে 'মনুষ্যত্ব'কেই একটি ভাব-স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এজন্য তখনও অধ্যাপক মহাশয়ের সেই অতিবিশুদ্ধ বাস্তবতা বাংলা সাহিত্যে প্রকট হইয়া উঠে নাই।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম যে ভাবে যে কারণে হইয়াছে, তাহা যে-কোন অনুসন্ধিৎসু ছাত্র সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন—অধ্যাপক মহাশয়েরও তাহা অবিদিত নাই, তিনিও সে সকল কথা বলিয়া তাঁহার গবেষণাকে দোষমুক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন; এইরূপ স্বীকারোক্তি করিয়াই তিনি তাঁহার উপন্যাসের ধারা বা বাস্তবতা বিষয়ক গবেষণাকে নিরঙ্কুশ করিতে চাহিয়াছেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস,—ইহার জন্ম কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল, এবং উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা অনুবর্ত্তী একাধিক ঐ জাতীয় রচনার দর্শন মেলে কি না—এ সকলের সদুত্তর দেওয়া দুরূহ। তথাপি ঐ একখানি উপন্যাস লইয়াই বাংলা নভেলের প্রথম যুগ! সেকালের বাঙালী-জীবনে এরূপ উপন্যাসের জন্ম-কারণ সন্ধান করিতে গিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

> তখন সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করিল তাহা ইংরেজী সভ্যতার সহিত সংস্পর্শজনিত আমাদের সমাজ ও পরিবারের মধ্যে একটা তুমুল বিক্ষোভ ও আন্দোলন। এই বিক্ষোভ ও আন্দোলনই আমাদের নব-উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম এবং প্রধান উপাদান হইয়া দাঁড়াইল।—পৃঃ ২৫

এবং—

> আমাদের বঙ্গসাহিত্যে যখন উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাবের সূচনা হইল, তখন সমাজ ভাবী ঔপন্যাসিকের সম্মুখে এই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের চিত্রখানি তুলিয়া ধরিল এবং আমাদের প্রথম যুগের উপন্যাসগুলি এই বিক্ষোভকেই নিজ বর্ণনার বিষয় করিয়া লইয়াছে।
> —পৃঃ ২৬

কিন্তু তখনই মনে পড়িয়া গেল "অবশ্য ইহা সত্য নহে যে, এই বিদ্রোহের উন্মাদনা ও আবেগ আমাদের প্রথম যুগের উপন্যাস সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।" কি সতর্ক 'পদক্ষেপ'! আর একটু অগ্রসর হইয়া গ্রন্থকার 'বিদ্রোহে'র পরিবর্ত্তে 'পারিবারিক বৈষম্য' ও তাহা হইতে 'জীবনেও একটা বৈচিত্র্য ও জটিলতার সঞ্চার'কে আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু

সর্ব্বশেষে এই সকল ভয়ানক ঘাত-প্রতিঘাতের যে শেষ ফল উপন্যাসে দেখা দিয়াছে তাহার সম্বন্ধে স্পষ্টই কবুল করিয়া বলিতেছেন—

বাস্তবতার রস তাঁহাদের উপন্যাসের মধ্যে অতি ক্ষীণভাবে প্রবাহিত; এবং তাঁহাদের অঙ্কিত চরিত্রগুলিও বেশ জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। তাহারা অধিকাংশই typical, অর্থাৎ শ্রেণীবিশেষের সাধারণ প্রতিনিধি মাত্র; ব্যক্তিত্বের চিহ্ন (individualising touches) তাহাদের মধ্যে বিশেষ স্ফুট হয় নাই।—পৃঃ ২৯

অতএব বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, সামাজিক ও পারিবারিক আলোড়ন সকলই যথারীতি হওয়া সত্ত্বেও, শেষে উপন্যাসে বাস্তবতার দর্শন মিলিল না। গ্রন্থকার ইংরেজী উপন্যাসের ইতিহাসকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া বাংলা উপন্যাসেরও সেইরূপ একটা জন্মকারণ নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; না পারিলেও তিনি তাঁহার বাস্তব-নিষ্ঠায় এতটুকু বিচলিত হন নাই। তিনি প্রথম যুগের সামাজিক 'উপন্যাসগুলি' ও 'ঔপন্যাসিকগণ' (মনে রাখিতে হইবে, এ সকলই গৌরবে বহুবচন) সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তাঁহার (প্যারীচাঁদ মিত্রের) 'আলালের ঘরের দুলাল'ই বোধ হয় বঙ্গভাষায় প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস।" তাঁহার অন্যান্য রচনাতেও "বাস্তবতার সুরটি এতই তীব্র ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে···যে তাহারা এই হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত অতুলনীয়।" অর্থাৎ 'বাস্তবতা' জিনিসটি অধ্যাপক মহাশয়কে এমনই কাণ্ডজ্ঞানহীন করিয়াছে যে, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা' প্রভৃতিও সেই গুণে "বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়"! গ্রন্থকারের এই বাস্তবতা-ব্যাধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া শেষে প্রতিক্রিয়া-মুখে তাঁহাকে অবাস্তবতার হাতে কি শোচনীয় লাঞ্ছনা ভোগ করাইয়াছে—সে পরিচয় তাঁহার 'অতি-আধুনিক উপন্যাসে'র বিচার-প্রসঙ্গে পাওয়া যাইবে। আসল কথা, বাস্তব ও রোমান্স এই দুইয়ের ভেদ, ও তাহাদের কাব্যঘটিত গুণের ধারণা অধ্যাপক মহাশয়ের রসবোধের পক্ষে এতই বিভ্রাটজনক হইয়াছে যে, এই গ্রন্থে তিনি প্রায় সর্ব্বত্র নাকালের একশেষ হইয়াছেন। কিন্তু উপস্থিত সে কথা নয়—উপরে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলাল' সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি করিয়াছেন তাহার সহিত তাঁহার পরবর্ত্তী এই উক্তিটি সকলকে পাঠ করিতে বলি—

যে উপন্যাস কেবল বাস্তববর্ণনাতেই পর্য্যবসিত, যাহা দৈনিক তুচ্ছতার উপর

কল্পলোকের রঙ্গীন আলোক ফেলিতে না পারে, যাহা আমাদের সাধারণ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গভীর ও সনাতন ভাবগুলির নিগূঢ় লীলা দেখাইতে না পারে তাহার স্থান অপেক্ষাকৃত নীচে। এই কারণে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের সহিত একাসনে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত।...সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গলার উপন্যাসের পথ-প্রদর্শক মাত্র, ইহার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হইবার স্পর্দ্ধা রাখে না।—পৃঃ ৩২-৩৩

—ইহাকেই বলে সমালোচনার কঠোর অপক্ষপাত, এমনই করিয়া সকল উক্তির ভারসাম্য রক্ষা করা যেমন ন্যায়সঙ্গত তেমনই নিরাপদ। এখানে আমার একটি গল্প মনে পড়িতেছে, পাঠকগণকে না বলিয়া পারিলাম না। এক অতিশয় সজ্জন ও সাধু ব্যক্তির একটি বড় অদ্ভুত ব্যাধি ছিল—তিনি যখন তখন এমন অত্যুক্তি করিয়া বসিতেন যে, তাহাতে নিজেই শেষে বড় লজ্জা পাইতেন। ভদ্রলোকের এক বুদ্ধিমান ভৃত্য ছিল, সে প্রভুর এই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিকারের আর কোন উপায় না দেখিয়া শেষে স্থির করিল যে, বাবু যখন বৈঠকখানায় গল্পে মত্ত হইয়া উঠিবেন তখন সে দ্বারদেশে একটু দূরে দাঁড়াইয়া থাকিবে, এবং যখনই বাবু কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিবেন, তখনই নিজের নাকে হাত দিয়া অথবা কাসিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিবে। একদিন বৈঠকখানায় বাবু তাঁহার দেশের বিষয়সম্পত্তির সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—আমাদের যে পৈতৃক প্রাচীন বসতবাটী, সে এক বিরাট ব্যাপার—লম্বায় প্রায় পাঁচ মাইল। এমন সময়ে ভৃত্য কাসিয়া উঠিল, বাবু তখনই সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—কিন্তু প্রস্থে আধ ইঞ্চি। ইহার দ্বারা পূর্ব্ব উক্তির ভারসাম্য রক্ষা করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন। অধ্যাপক মহাশয়ের এই ধরনের উক্তি অনেকটা সেইরূপ কি না পাঠকগণ বিচার করিবেন।

৪

কিন্তু ধারা লইয়া যে মুশকিল তাহার আসান তো এইখানেই হইল না—সামাজিক উপন্যাসের যাহা হয় একটা গতি করা গেলেও—অন্য উপন্যাসও আছে। বাস্তবতার বীজ বাংলা সাহিত্যে অঙ্কুরিত হইবার ক্ষেত্র তিনি বহু যত্নে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেদিকে যে প্রবল প্রবণতা তিনি বৌদ্ধজাতক হইতে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' পর্য্যন্ত প্রমাণ

করিয়াছেন, তাহাতেই 'বাস্তবানুগামী' খাঁটি নভেলজাতীয় উপন্যাসের গোড়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ঐ যুগে 'উপন্যাসের ধারা'র যে সকল ক্ষিপ্র যুগান্তর একই সঙ্গে দেখা দিয়াছে তাহাদের লইয়া তিনি কিরূপ বিপন্ন হইয়াছেন, এবং কি উপায়ে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার কথা বলিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার নিজের কয়েকটি কথা এইখানেই বলিয়া রাখি।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ক্রম-বিবর্ত্তন হয় নাই—'সম্পূর্ণাবয়ব' 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর' উপন্যাস—যথার্থ creation-এর মতই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সে যেন একেবারে কবচকুণ্ডলধারী কর্ণের মতই আমাদের ভাষায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। ইহাকেই বলে সৃষ্টি, ইহা কোন বিশেষ আয়োজনের অপেক্ষা রাখে নাই—সে যুগের পূর্ব্বে অথবা সমসময়েও এমন বস্তুর দর্শন কোথাও মেলে নাই; তাই 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র আবির্ভাব একটা স্পষ্ট যুগান্তরের সূচনা করিয়াছিল, সেকালের ইংরেজী-শিক্ষিত পণ্ডিত-মহলে একটা বড় আশার সঞ্চার করিয়াছিল। সে যেন সত্যই একটা আবির্ভাব—যেমন আকস্মিক, তেমনই বিস্ময়কর। তথাপি ইহারও কারণ নির্দ্দেশ করা দুরূহ নয়। প্রথম কারণ—কবির স্বকীয় প্রতিভা, যাহার মত কারণ আর নাই; দ্বিতীয় কারণ—ঐ যুগেরই বিলাতী সাহিত্যে উপন্যাসের অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে —পারিবারিক, সামাজিক, রোমান্স, ইতিহাস—যে লক্ষণই থাকুক, তাহাতে জীবনকে দেখিবার যে দৃষ্টি-ভঙ্গি আছে তাহা সর্ব্বত্রই এক, সে দৃষ্টি কবির দৃষ্টি, তাহার ফলে যাহা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা উৎকৃষ্ট উপন্যাস, বা মানবজীবন-কাহিনীর উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য; বাংলা সাহিত্যে ইহাই উপন্যাসের আদি-রূপ, এবং ইহার কোন পূর্ব্বধারা অথবা কোন অপরিণত-রূপ সন্ধান করিতে যাওয়াই পণ্ডশ্রম। কিন্তু গ্রন্থকার 'বাস্তব উপাদান' ও 'বাস্তব-প্রবণতা'র যে গ্রহের ফের স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছেন, তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া কঠিন—ইহাতে তাঁহার রসবোধও যেমন পদে পদে বিড়ম্বিত হইয়াছে, তেমনই 'পূর্ব্বাপর-বিকাশের ধারা'ও আলেয়ার মত বার বার তাঁহাকে দিশাহীন প্রান্তরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। গ্রন্থের প্রথম দিকে তিনি যেটুকু ধারানুবর্ত্তী হইবার

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, শেষে তাহার কোন চিহ্নও আর নাই—কেবল ক্ষীণতর কণ্ঠে মাঝে মাঝে তাঁহার ঔপন্যাসিক 'বাস্তব'-দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়াছেন। কিন্তু সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক উপন্যাসের আবির্ভাবই প্রথম—নিজেই গ্রন্থকার তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাহা হইলে দ্বিতীয় কোন্‌টি? অধ্যাপক মহাশয়ের আলোচনার ধারায় 'ঐতিহাসিক' উপন্যাসই দ্বিতীয় হইয়াছে; কিন্তু শেষে হঠাৎ যেন কি কারণে তাঁহার মনে হইয়াছে—ঐতিহাসিক উপন্যাস আরও পূর্ব্ববর্ত্তী, অর্থাৎ সামাজিক উপন্যাসের পূর্ব্বে বহু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হইয়া থাকিবে; অবশ্য সেগুলি 'আলালে'র মত পূর্ণাবয়ব ছিল না; অর্থাৎ, 'আলাল'-জাতীয় উপন্যাস এক হিসাবে প্রথম, আর এক হিসাবে দ্বিতীয়ও বটে। ঐতিহাসিক উপন্যাস কিন্তু পরিণতির দিক দিয়া সামাজিক উপন্যাসের পরবর্ত্তী, কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের পূর্ব্বেই শেষোক্ত উপন্যাস 'আলালে' পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থে এ বিষয়ে এইরূপ সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে পরে বলিব। উপস্থিত, প্রথম যুগের প্রাথমিক 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র যে একটি পূর্ব্বপুরুষ গ্রন্থকার আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্রমবিকাশ বা বংশধারা রক্ষা করিয়াছেন তাহার একটু নিদর্শন দিব। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন—

> ঐতিহাসিক উপন্যাস যে এই যুগের নূতন সৃষ্টি তাহা বলা যায় না। বোধ হয় সময়ের দিক্ দিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসই সামাজিক উপন্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। আমাদের বাস্তব পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি উপন্যাস-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা ইতিহাসের কল্পনাময় অনেকটা অবাস্তব রাজ্যে স্বচ্ছন্দ গতিতে বিচরণ করিতেছিলাম। উপন্যাস-রচনার প্রাথমিক যুগে সামাজিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাসই যে অধিক সংখ্যায় রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।—পৃঃ ৩৫

ইহার পর এই 'প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র অপরিণতি ও নানা অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা চলিয়াছে, কিন্তু ইহারা যে কাহারা, অনেকদূর পর্য্যন্ত তাহার উল্লেখ নাই। পড়িতে পড়িতে প্রায় হতভম্ব হইয়াছিলাম, কারণ, বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগেও যে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ছিল তাহা না জানিয়া এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম, আজ

এতকাল পরে এ সংবাদে একটু বিমূঢ় বোধ করিবারই কথা। অবশেষে অধ্যাপক মহাশয় নিজেই সর্ব্বসংশয় ভঞ্জন করিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ ও তাহার পরে বটতলা হইতে যে অসংখ্য উপন্যাস বাহির হইয়াছিল, লেখকসহ তাঁহাদেরই কতকগুলির নাম, তাহাদের আখ্যান-বস্তুর পরিচয় ও সমালোচনা—তিনি ঐতিহাসিক নিষ্ঠা সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঠকগণকে শুধু এইটুকু স্মরণ করাইয়া দিলেই চলিবে যে, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ 'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্ব্ব না হইলেও বেশি পরবর্ত্তী নয়, মাত্র দশ বৎসর। দেখিয়া অবাক হইয়াছি, ঐতিহাসিক ধারা বা ক্রমবিকাশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এমন করিয়াই কি গবেষণা করিতে হয়? বাল্যকালে আমরা যখন চুরি করিয়া নভেল পড়িতে শিখি, তখন কত যে এই বটতলার রোমাঞ্চকর উপন্যাস পড়িয়াছি, পড়িয়া কত বিনিদ্র রাত্রি অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিয়াছি, তাহা মনে পড়িল; আজ এই বয়সে সেই-গুলিকে শুধু স্মরণ করাইয়া দেওয়া নয়, এমন সম্মানের আসন দান করায়, অধ্যাপক মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেছি না। কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি আশার সঞ্চার করিয়াও বড় নিরাশ করিয়াছেন, ঐ তারিখগুলা না দিলেই ভাল করিতেন; তাহাতে তাঁহার ক্রমবিকাশও যেমন রক্ষা পাইত, তেমনই, আমরাও কল্পনা করিয়া সুখী হইতাম যে, বঙ্কিমচন্দ্রও এককালে আমাদের মতই চুরি করিয়া সেই রস পান করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে পরে উপন্যাস রচনায় এমন হাত পাকাইয়াছিলেন।

কিন্তু ইহা তো হইল কালক্রমিক বিকাশের কথা—'বাস্তবানুগামী' নভেলের জন্মঘটনার মূলে আর একটা কথা আছে, যথা, সামাজিক বিপ্লব, ব্যক্তিমনোভাবজনিত বিদ্রোহ ইত্যাদি,—এখানে এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রেরণামূলে রহিয়াছে ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে সকল পুরাতন সংস্কার শিথিল হইয়া গিয়াছিল—প্রাচীন শাস্ত্র বা সমাজবিধির প্রতিও যেমন, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিও তেমনই, বিদ্রোহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল, তাহার ফলে বাঙালী যে আপনার বাঙালী-কুলশীল ও বাঙালী-জীবনকেই, অর্থাৎ 'বাস্তব' ও গণমনোভাবকেই প্রশ্রয় দিবে, ইহাই স্বাভাবিক; এরূপ অবস্থায় যদি কোন আদর্শের উন্মাদনাও অনুভব করে, তবে তাহার স্বজাতিরই অতীত ইতিহাস স্মরণ করিবে—খাঁটি

বাঙালী-প্রতিভা ও পৌরুষের রোমান্টিক স্বপ্ন দেখিবে, লুইপাদ ও ভুসুকুর মত দূর-কালের কবি, এবং লাউসেন বা চাঁদ-সদাগরের মত বাংলা-পুরাণোল্লিখিত বীরগণের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে, এবং সে উপন্যাসের ভাষা হইবে সংস্কৃতশব্দবর্জ্জিত প্রাকৃত বা প্রকৃত বাংলা ভাষা। 'ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে' ইহাই তো হওয়া উচিত। অধ্যাপক মহাশয় ইতিপূর্ব্বে যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের কথা বলিয়াছেন তাহার মূলে ছিল ব্যক্তিত্ব-চেতনার উন্মেষ, কারণ তাহাই নভেল নামক বাস্তবানুগামী উপন্যাসের অনুকূল। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও—সংস্কৃত পুরাণ, শাস্ত্র, ভাষা প্রভৃতির শাসনমুক্ত গণমনোভাবের জাগরণ হওয়া সত্ত্বেও, 'আলালে'র মত এমন 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণাবয়ব' নভেলের আদর্শও ভাসিয়া গেল, তাহার সেই 'বাস্তবানুগামিতা'কে নিষ্ফল করিয়া যে উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইল তাহা শুধুই একটা ভিন্ন বস্তু নয়, তাহার ভিতর দিয়াই বাংলা গদ্যসাহিত্য ও বাংলা গদ্যভাষা প্রকৃষ্ট প্রাণধর্ম্মে সঞ্জীবিত ও অতুলনীয় ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল; তাহা 'বাস্তবানুগামী' নভেল নয়—ভাবকল্পনাময় রোমান্স; এবং তাহাও প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ, ভাষার সংস্কৃত ঐশ্বর্য্য বা Sanskrit Eloquence, ও ভারতীয় মধ্যযুগের কাল্পনিক ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়াছে। এই ঘটনাটি এতই প্রত্যক্ষ ও অবিসংবাদিত যে, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নির্ণয় করিতে হইলে এবং তাহার পূর্ব্বাপর বিকাশের নিয়মটিকে বুঝিতে হইলে—'বাস্তব' ও 'বাস্তবানুগামিতা'র সকল ভাবনা বিসর্জ্জন দিতে হয়; অর্থাৎ বিলাতী সাহিত্যের নজির একেবারেই চলে না। অধ্যাপক মহাশয় গোড়াতেই ভুল করিয়াছেন—যাহাকে বলে 'বিস্‌মোল্লায় গলদ'। Saintsbury অথবা অপর কোন বিলাতী লেখকের রচিত ইংরেজী উপন্যাসের ইতিহাস হইতে তাহার কাঠামোটি উদ্ধার করিয়া সেই কাঠামোর উপরেই বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস যোজনা করিতে যাওয়া বিদ্বানের কাজ হইলেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 'বাস্তবানুগামিতা'র Spirit বা ভাব-সংস্কার এ জাতির ধাতুতে এত শীঘ্র ও এত সহজে উপ্ত হইবার নয়। 'ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে' সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বাঙালী কেবল স্বপ্ন দেখিয়াছিল। বাঙালী জাতির

প্রকৃতিতে যে অসাধারণ ভাবপ্রবণতা আছে তাহারই কারণে, এবং ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের অপূর্ব্ব রূপ-রস আস্বাদন করার ফলে, তাহার সুপ্ত সাহিত্যিক প্রতিভা, বাস্তব-রস-রসিকতায় নয়—কল্পজগৎ-সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল ; সেই কল্পনাশক্তির বলেই সে গদ্যে ও পদ্যে যে কাব্য-জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা যেমন সার্থক সাহিত্যের গৌরবে, তেমনই একটা বৃহত্তর ও গূঢ়তর সত্যের মহিমায় শুধু অটুট হইয়া নাই—জাতির ভবিষ্যৎ যাত্রা-পথের দিক-নির্ণয় করিয়াছে।

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া কেবল কতকগুলা তথ্য সংগ্রহ ও সেইগুলির ভিতর দিয়া—বাস্তবানুগামিতার বজ্র-সমুৎকীর্ণ পথে, একটা মন-গড়া ক্রমবিকাশের সূত্র চালাইয়া দেওয়া শুধু ব্যর্থ-প্রয়াস নয়, তাহাতে একটা সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ত্বের স্থাপনা করা হয়। যে কালে নব্য বাংলা সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল—উনবিংশ শতাব্দীর সেই শেষার্দ্ধে বাস্তবানুগামিতা সাহিত্যিক প্রতিভার সহচর হয় নাই—সে প্রেরণা যদি কোথাও কিছুমাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে তাহা জাতির সমগ্র চেতনায় সঞ্চারিত হয় নাই—তাহাতে জাতির জীবনে নবজাগরণ তথা বাংলা সাহিত্যে সেই Renaissance ঘটে নাই। এই 'উপন্যাস' যেমন বাংলা সাহিত্যে গদ্যের মতই একটা অভিনব বস্তু—তেমনই প্রকৃত বাংলা উপন্যাসের আদি স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র কেবল ঔপন্যাসিক নহেন, তিনি সেই Renaissance-এর নায়ক। এই Renaissance-এ মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্রেরও অগ্রবর্ত্তী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি কেবল সাহিত্যিক রূপকর্ম্মে, ও কাব্যের নবজীবন সঞ্চারেই সীমাবদ্ধ ছিল ; পরে কবি মধুসূদনকেও অতিক্রম করিয়া ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কেবল সাহিত্যে নয়—জাতির সমগ্র মনোজীবনে, তাহার আত্মিক-উৎকণ্ঠা ও অকুতিতে—নবচৈতন্য সঞ্চার করিয়াছিলেন। বঙ্কিম-মধুসূদনের পূর্ব্বে শুধু যে উপন্যাসের জন্ম হয় নাই তাহা নয়, নব্য বাংলা সাহিত্যেরই জন্ম হয় নাই—সত্যকার সৃষ্টিশক্তির নিদর্শন কোথায়ও দেখা দেয় নাই।

'আলালের ঘরের দুলাল' যে প্রবৃত্তির পরিচয় দেয় ও তাহাতে সেই প্রবৃত্তির যেটুকু সাফল্য লক্ষ্য করা যায়—তাহাতেই, সেই একখানি মাত্র পুস্তককে সেই যুগের যুগপ্রবৃত্তির নির্দ্দেশক তো বলা যায়ই না, উপরন্তু তাহার সাহিত্যিক মূল্য অপেক্ষা ঐতিহাসিক মূল্যই অধিক, এবং সে মূল্যও পরবর্ত্তী সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির বিচারে খুব সামান্যই বলিতে হইবে। জাতির গভীরতর চৈতন্যে তখনও সাড়া জাগে নাই—নবজন্মের সূচনা মাত্র হইয়াছে। নবজীবনের উন্মাদক ভাবধারা তখনও আগল ভাঙে নাই, তাই তখনও প্রতিভার জন্মও হয় নাই। বঙ্কিম-যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে উপন্যাস-রচনার যে প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহাতে মৌলিকতা বা সৃষ্টিশক্তির একান্ত অভাবই অতিশয় লক্ষণীয়—প্রায় সবগুলিই অনুবাদ বা অনুসরণ। কিন্তু তথাপি তাহার সাধারণ প্রবৃত্তি বাস্তবানুগামিতা নয়—রোমান্স-রস-পিপাসা। সেকালের রসিকচিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল যে ধরনের 'উপন্যাস' তাহা 'আলালের ঘরের দুলাল' নয়—'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'কাদম্বরী', 'পৌল-বজ্জিনী'; এবং টেলিমেকাস, রাসেলাস ছাড়াও মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নামক এক লেখক বহু গল্পের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য্য কৃষ্ণকমল 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' নামে বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে যে উপন্যাস রচনা করেন তাহাও ভাষায় ও রচনাভঙ্গিতে বঙ্কিমপূর্ব্ব যুগের সূচনা করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকখানির পরিচয় দিয়া ও তাহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া ঐতিহাসিকের একটা বড় উপকার করিয়াছেন—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালের বিশিষ্ট গদ্যলেখক ও সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছিলেন—

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা-রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ ত কাদম্বরী নয়, বেতাল পঁচিশ নয়, তারাশঙ্করও নয়, প্যারীচাঁদও নয়—এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া, আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বার বার তিনবার পাঠ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না।... বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষণে, স্থলে স্থলে সংস্কৃতের মত। ক্রিয়াপদগুলি অনেক স্থলেই খাঁটি বাঙ্গালা।...আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।

গ্রন্থকার এ সকলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই, যদিও তিনি সকল তথ্যই সংকলন করিয়াছেন—আরব্য-উপন্যাস, গোলেবকওলি, হাতেমতাই প্রভৃতি মুসলমানী কেচ্ছা ও কেতাবের বাংলা অনুবাদ যে সেকালের পাঠকমণ্ডলে প্রচার লাভ করিয়াছিল তাহারও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই; কিন্তু তাঁহার বাস্তবানুগামিতার পক্ষে এ সকলের তাৎপর্য্য তেমন অনুধাবনযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই।

বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম যে সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নভেল নয়, ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়,—তাহা রোমান্স-জাতীয় বস্তু; তাহার পূর্ব্বে আর কোন জাতীয় উপন্যাসই জন্মলাভ করে নাই—ইহা একটি অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক সত্য। গ্রন্থকার যদি এই সত্যকে স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের মতই 'স্বর্ণলতা' বা 'আলাল'ও যে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের মৃত্তিকা-তলস্থ কোন বীজের সহিত সম্পর্কিত নয়, তাহা যেমন বুঝিতে পারিতেন, তেমনই তিনি যাহাকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নাম দিয়া নানা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই উপন্যাসকেই বাংলা উপন্যাসের আদিরূপ বুঝিয়া, তাহার বীজ বিদেশ হইতে আমদানি হইলেও, তাহার উপযোগী আবহাওয়া ও জলমাটি যে সেযুগে নানা কারণে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল—অন্তত সেটুকু বলিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন। তিনি যে তাহা পারেন নাই তাহার কারণ, তিনি জাতির ঐতিহ্য ও ভাবজীবনের দৃঢ়-মূল সংস্কৃতিকে যেমন অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তেমনই, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাতে তাহার চেতনার যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল—তাহার প্রাণমূল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া যে আধ্যাত্মিক সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং রামমোহন হইতে আরম্ভ

করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর দিয়া বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে শক্তির স্ফুরণ দ্বারা সেই সঙ্কট হইতে সে রক্ষা পাইবার সাধনা করিয়াছিল— তিনি তাহার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেন নাই। তিনি বাস্তবানুগামিতার মোহে এমনই অন্ধ যে, যে প্রবল গভীর ও উদ্বেল ভাবাকুলতাকে বঙ্কিমচন্দ্র একটা সুগঠিত ও সুনিরূপিত আদর্শবাদে সংহত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রেরণায় তিনি একটি অপূর্ব্ব বাণীকে উপন্যাসের আকারে অসামান্য রূপলাবণ্যে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিয়াছেন— তাহার রসবিচারেও তিনি যেমন পদে পদে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন, তেমনই ছুতার-মিস্ত্রীর মাপকাঠির দ্বারা সেই কল্পনাকে মাপিতে গিয়া বার বার তাহাকে আঘাত করিয়াছেন। তাই আমি আমার সেই পূর্ব্ব প্রবন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলাম, গ্রন্থকার-ধৃত বাংলা উপন্যাসের ধারাটিকে আবার গোড়া হইতে সংশোধন করিতে হইবে, বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাবকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে বাস্তবানুগামিতার মাপকাঠিখানি ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; আর সেযুগের পক্ষে তাহার যে প্রয়োজনীয়তাই থাকুক—বঙ্কিম হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে-যুগ সেই যুগের প্রধান প্রবৃত্তি বাস্তবানুগামিতা নয়; এজন্য গ্রন্থকারের এই ঐতিহাসিক গবেষণা যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হউক, তাহা বাস্তবসত্যের অনুগামী হয় নাই। আমি অতঃপর এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিব না, কেবল দুইটি বিষয়ে আমার কৈফিয়ৎ বাকি রহিল—(১) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে গ্রন্থকারের আলোচনাপদ্ধতি, (২) অতি-আধুনিক উপন্যাসের রসনির্ণয়ে তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শ-নিষ্ঠা, ভাষাজ্ঞান ও রসবোধের পরিচয়। আশা করি, তাহা হইলেই আমি এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাইতে পারিব।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ

ওঁ

[17 April 1903
Calcutta]

সবিনয় নমস্কার,

আমি ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। রেণুকাকে আলমোরায় লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতে কলিকাতায় আসিয়াছি। আবার শীঘ্র যাইতে হইবে। আমার শরীর ভাল নহে। এই সকল কারণে, চিঠির জবাব দিতে পারি নাই। কতদিনে সুস্থির হইয়া বসিব কে জানে। আপনি কুষ্টিয়া গেছেন শুনিয়া খুসী হইলাম—জায়গাটি ভাল—মাছ দুগ্ধের অভাব নাই। আমাদের সঙ্গে কুষ্টিয়ার নানা সম্বন্ধ। আমাদের ম্যানেজারের সহিত আলাপ করিবেন তিনি আবশ্যক মত আপনাকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Thomson House
Almora

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

আপনি আমাকে অত্যন্ত ভুল বুঝিয়াছেন। কুঞ্জবাবুর (১) প্রতি আপনার চিত্ত যেরূপ একান্ত বিমুখ হইয়াছে তাহাতে তাঁহার সংক্রান্ত

---

(১) শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জামাতা কুঞ্জলাল ঘোষ; ইনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইবার পূর্ব্বে উচ্চবর্ণেতর হিন্দু ছিলেন, পূর্ব্ব সংখ্যায় এই কারণেই ইঁহাকে ছাত্রেরা পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে পারে কি না, এই প্রশ্ন একটি চিঠিতে উত্থাপিত হইয়াছিল।

কোন আলোচনা আপনার কাছে করা আমি অকর্ত্তব্য জ্ঞান করি। তিনি আপনার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন এ কথা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়াও উচিত নহে, করেন নাই বলিয়াও আপনাকে অকারণ পীড়ন করা অনাবশ্যক। এইজন্য কুঞ্জবাবু সম্বন্ধে আমি চুপ করিয়া গিয়াছিলাম। রথীর প্রতি আপনার যে স্নেহের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে আশা করি তাহা ক্ষণিক নহে। অবকাশ মত রথীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সংবাদ লইবেন তাহাকে পরামর্শ দিবেন ইহা আমি আনন্দের বিষয় জ্ঞান করি। কুঞ্জবাবুর উপস্থিতিতে আপনার এ সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত হওয়া উচিত হয় না। আপনি অনায়াসেই শান্তি-নিকেতনে অতিথি থাকিয়া যতদিন ইচ্ছা কাটাইয়া আসিতে পারেন।

অবশ্য এটুকু আপনি বোঝেন, কুঞ্জবাবু বিদ্যালয়ের কাজ করিতেছেন —বিদ্যালয়ে তাঁহার সহিত আপনার কোন সংঘর্ষ কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। আপনার দ্বারা তাহা হইবেই বা কেন?

বিদ্যালয়ের অধ্যাপন বিধি নির্দ্ধারণ ও তত্ত্বাবধানের ভার মোহিত-বাবুর (২) উপর দিয়াছি। জগদীশ, মোহিতবাবু এবং দুর্গাদাস গুপ্ত ডাক্তার আপাততঃ এই তিনজনে কামটা বাঁধিয়া বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিবেন এইরূপ স্থির করা গেল। মোহিতবাবু এখান হইতে কাল রওনা হইয়া প্রথমে বোলপুরে নামিবেন—সেখানে সমস্ত বিধিবদ্ধ করিয়া কলিকাতায় যাইবেন। মাসে একবার করিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া যাইবেন এই ভাবে চলিলে বিদ্যালয়ের উন্নতি আশা করি।

আজ হেমবাবু (হেমচন্দ্র মল্লিক) এখানে আসিবেন—কাল মোহিতবাবু যাইবেন—ইহাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত আছি। ইতি মঙ্গলবার

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২) মোহিতচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীর সম্পাদক।

ওঁ

Thomson House
Almora

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

রেণুকাকে লইয়া আলমোড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পথের কষ্ট যথেষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। পথে এত বিভ্রাট আছে তাহা পূর্ব্বে কল্পনা করিলে যাত্রা করিতে সাহসই করিতাম না। কিন্তু তবু আসিয়া ভালই করিয়াছি। এত ক্লেশেও রেণুকার বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই এবং আশা করিতেছি কিছুদিন বিশ্রাম করিতে পারিলেই সে এখানকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর পূরা উপকার লাভ করিতে আরম্ভ করিবে। স্থানটি রমণীয় সন্দেহ নাই—বাড়িও বেশ ভাল পাওয়া গেছে—বাতাসটি বেশ সুখপ্রদ বলিয়া মনে হয়—নীচেকার অসহ্য গরম হইতে এখানে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়াছে। শীত এখানে তেমন কড়া রকম বোধ হইতেছে না। গরম কাপড় পরিয়া থাকিতে হয় বটে, কিন্তু আমাদের দেশের শীতের মত হাড়ের কাঁপুনি ধরাইয়া দেয় না। কাল পরশু বৃষ্টি হইয়া বাতাস বেশ পরিষ্কার হইয়া গেছে—মাঝে মাঝে কুহেলিকার আবরণ সরিয়া গিয়া তুষার শিখর শ্রেণীর আভাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

রথীর সম্বন্ধে এখনো সম্পূর্ণ কিছু স্থির করি নাই। তবে তাহাকে যখন আমেরিকা বা য়ুরোপে পাঠাইতেই হইবে তখন এফ্, এ, পরীক্ষার পড়া পড়াইয়া এই সময়টা নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না। এই দুই বৎসর তাহাকে যথারীতি শিখাইলে বিদ্যা চর্চ্চার পথে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দেওয়া যায়। সম্মুখে পরীক্ষার উত্তেজনা নাই বলিয়া যে তাহাকে শিথিলভাবে পড়ানো হইবে তাহা মনে করিবেন না। যতদূর জানি সে মনোযোগ দিয়া পড়া করিতেছে। শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার লেখা তো আমি আর পাই নাই। হাজারিবাগে থাকিতে কেবল একটী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাইয়াছিলাম—সে সম্বন্ধে আপনাকে লিখিয়াওছি। আপনি বিস্তারিত ভাবে লিখিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু সে লেখা ত আজও আমার হস্তগত হয় নাই।

আপনার সেই রামময়ের স্ত্রীর গল্প সম্বন্ধে শৈলেশকে একটা তাগিদ দিয়া পত্র লিখিবেন—শৈলেশ সেটা সমালোচনীতে বাহির করিবেন বলিয়াছিলেন।

মনে হইতেছে আমি বোলপুর হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কুঞ্জবাবুর কাছ হইতে শুনিয়া আসিয়াছি যে তিনি আপনার প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া দিয়াছেন। যদি তাঁহার ভুল হইয়া থাকে আমাকে জানাইবেন।

কুষ্টিয়ায় আশা করি আপনি ভালই আছেন। সেখানে আপনার কাজ কিরূপ চলিতেছে? ইতি ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঙ

Thomson House
আলমোড়া

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

রেণুকার সম্পূর্ণ আরোগ্য অপেক্ষা করিয়া আমাকে বোধ হয় এখানে কিছু দীর্ঘকালই থাকিতে হইবে। ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে রথীর পড়ার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। সুবোধও চলিয়া গেছেন—আপাতত শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক আছেন। আরও তিনজনের আসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে দুইজন এম, এ, (বর্ত্তমানে অন্যত্র অধিক বেতনে হেডমাষ্টারি করিতেছেন) ব্রহ্মবিদ্যালয়ে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কার্য্য লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইঁহারা অস্থায়ী হইবেন বলিয়া আশঙ্কা করি না। আর একজন বি, এ, ইনিও কোনো স্কুলে প্রধান গণিত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। আপাতত এই কয়জন হইলে রথীকে শেখানো ও বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ চলিয়া যাইবে। রথীর ছয়মাসের পাঠ্য আমরা স্থির করিয়া পাঠাইয়াছি। ছয় মাস হইয়া গেলে তাহার রীতিমত পরীক্ষা হইবে। মোহিত বাবু সাহিত্য ইতিহাসে পরীক্ষকতা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

মোহিত বাবু আলমোড়ায় আসিয়া আমার অতিথিরূপে আছেন। তিনি এখানে দিন ১৫ থাকিবেন।

কুষ্টিয়ার কাজে কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে আপনার বনিবার সম্ভাবনা নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। জায়গাটি মন্দ নহে। সেখানে উকিল চন্দ্রময় বাবুর সঙ্গে কি আপনার আলাপ হইয়াছে? লোকটি অত্যন্ত সৎপ্রকৃতি, শান্ত—তাঁহার প্রতি সেখানকার সকলেরই শ্রদ্ধা আছে। আপনি বোধ-হয় তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলিলে সুবিধা পাইতে পারিবেন।

রথী প্রথম শ্রেণী এবং সন্তোষ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস হইয়াছে বোধ-হয় খবর পাইয়াছেন।

যে একশত টাকা আপনার প্রাপ্য আছে সে আমি নিজেই দিব—সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। সম্প্রতি আমি নিতান্তই জড়িত হইয়া পড়িয়াছি—কবে নিষ্কৃতি পাইয়া সচ্ছল অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব জানি না। আমি একটু মাথা তুলিতে পারিলেই আপনাকে স্মরণ করিব। নরেন তাঁহার বৈদ্যবাটীর কাজ ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছেন। বোলপুরে পুনরায় কাজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক আছেন—কিন্তু যাঁহারা সেখানকার কাজেই স্থায়ি ভাবে আত্ম সমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহাদিগকে কিছুদিনের মত রাখিয়া বিদ্যালয়ের ক্ষতি করিতে পারি না। সুবোধ আমার এই অনুপস্থিতি কালে হঠাৎ চলিয়া গিয়া বিদ্যালয়ের বড়ই অনিষ্ট করিয়াছেন। নতুন শিক্ষক যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ের রীতি পদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত করাইয়া দিবার প্রায় কেহই নাই।

আশা করি আপনার পরিজনবর্গ সকলেই ভাল আছেন। আপনার সেই অজীর্ণের ভাব এখন কমিয়াছে? ইতি ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

ভবদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রি-মহিমা

সর্ব্বব্যাপী বিরাট তিনের কথা কেহ একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ?

প্রথমেই দেখুন দ্রব্য কি প্রকারে। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল এই ত্রিভুবনে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-রূপ ত্রিকালে দ্রব্য চিরদিন তিন প্রকারই রহিয়াছে ও থাকিবে—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। তিনটি আয়তনে (Three Dimensions-এ) তাহার পরিমাণ বুঝিতে হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারিবেন না—বৈজ্ঞানিকেরা এই কথা বলেন। আর পারিবেনই বা কি করিয়া ? প্রণব ওঙ্কারের ওঁ-ই তো অ+উ+ম মিলিয়া ত্র্যক্ষর হইয়াছে ; নারায়ণ স্বয়ং ত্রিভঙ্গ।

"কোনও গুণ নাই তার কপালে আগুন" পাটনির নিকট এই ব্যঙ্গোক্তি করিবার সময় দেবী ভগবতী ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, শিবের কপালে এই আগুন না জ্বলিলে তাঁহার নিজের কপালই পুড়িত। এই তৃতীয় নেত্র যাহাদের নাই, তাহারাই মদনের দাসানুদাস।

দেবাদিদেব হরিও এই তিনের জন্য জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। পৌরাণিক উপাখ্যানটি এই।—হরির তিন স্ত্রী ছিলেন—লক্ষ্মী (ওরফে পদ্মা), গঙ্গা ও সরস্বতী। একদিন হরি রসাবিষ্ট হইয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া তির্য্যক হাসিলে সরস্বতী অত্যন্ত মান করেন এবং গঙ্গার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক কটূক্তি করেন। হরি বেগতিক বুঝিয়া পলায়ন করেন। লক্ষ্মী মধ্যস্থা হইতে চেষ্টা করিলে সরস্বতী তাঁহাকে বৃক্ষদেহ প্রাপ্ত হইতে অভিসম্পাত দেন। গঙ্গা সরস্বতীকে শাপ দিলেন, যেখানে পাপীরা থাকে সেইখানে তুমি নদী হইয়া থাকিবে। সরস্বতীও গঙ্গাকে অভিশাপ দিলেন, পাপীদের আবাসে তুমিও নদীরূপ গ্রহণ করিবে। (বলা বাহুল্য পাপীদের আবাস ও পাপীগণ যথাক্রমে ভারতভূমি ও ভারতবাসী) 'পরিস্থিতি' ক্রমশ জটিল ও গুরুতর হইতেছে দেখিয়া হরি পুনরায় আবির্ভূত হইলেন এবং আক্ষেপোক্তি করিলেন :—

"তিস্রো ভার্য্যাস্তিস্রি শালাশ্চ ত্রয়ো ভৃত্যাশ্চ বান্ধবাঃ।
ধ্রুবং বেদবিরুদ্ধাশ্চ ন হেতি মঙ্গলপ্রদাঃ॥"

অর্থাৎ তিনটি পত্নী, তিনটি গৃহ, তিনটি ভৃত্য ও তিনটি বন্ধু থাকা মঙ্গলপ্রদ নহে। ইহা বেদ-বিরুদ্ধ।

ধর্ম্মসাহিত্যে ও অর্চ্চনায় তিনটি সংস্কৃত কথার সমাবেশের প্রভাব যে কত বেশি, তাহা আমরা আবহমানকাল হইতে দেখিয়া আসিয়াছি, যথা—"শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্", "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্", "রসো বৈ সঃ", "ওঁ তৎ সৎ" ইত্যাদি। এরূপ বহু আছে।

পালি ভাষায় বুদ্ধের বাণী ও শিক্ষা গ্রন্থাকারে তিনটি "পিটকে" (অর্থাৎ ঝুড়িতে) রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম-পুস্তকের নাম "ত্রিপিটক"। বুদ্ধের সার বাণী তিনটি—অহিংসা প্রেম ও মৈত্রী। জন্ম মৃত্যু বিবাহ তিনটিই মানুষের কর্তৃত্বের বাহিরে বলিয়া মানুষের বিশ্বাস।

ত্র্যহস্পর্শের (বা তিনটি তিথির সংযোগ) জন্য নিষিদ্ধ যাত্রা অতিক্রম করিয়া যদি তীর্থে বাহির হইয়া পড়িতে পারেন, তবে সেখানে ত্রিরাত্রি বাসের ব্যবস্থা আছে। প্রথম রাত্রি রেলগাড়ির বা অন্য যানের ঝাঁকানি-জনিত শরীরের বেদনা সারাইতে কাটিয়া যায়; দ্বিতীয় রাত্রি কাটে ঠাকুর-দেবতা দেখিবার জন্য সমস্ত দিন হাঁটাহাঁটিতে পদযুগলে যে ব্যথা হয় তাহার ঔষধস্বরূপ নিদ্রার প্রলেপ দিতে; তৃতীয় রাত্রি, অন্তত সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, অন্যত্র যাইবার প্রোগ্রাম আলোচনা করিতে ও বোঁচকা-বুঁচকি বাঁধিতে বা ডেরাডাণ্ডা তুলিতে কাটে। অতএব, দেখিতেছেন যে ত্রিরাত্রি বাসের প্রয়োজন তীর্থে কত বেশি।

এই তো গেল তীর্থের কথা। তীর্থ করা মহা পুণ্য। ইহা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু পাপ তো সকলেই করেন। কুব্রুত্তে কোন পণ্ডিতঃ। জানেন কি যে পাপও তিন প্রকার—মহাপাতক অতি-পাতক ও উপপাতক। ইহা শুনিয়া যদি মনে পরিতাপ হয় আর তিনকুলে যদি কেহ না থাকে, তবে ত্রিকুটপর্ব্বতচারী কোনও ত্রিকালদর্শী সাধুর নিকট গিয়া বলিবেন, প্রভো, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণের মধ্যে আমার মধ্যে শেষোক্তটিই অতি প্রবল। তমোনাশ করিয়া দাও, দয়াময়! আমার ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন দুঃখ হরণ কর। ত্রিদণ্ডের মধ্যে বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড বা কায়দণ্ড যাহাই দিবে, তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইব।

বলিবেন, ইহা পারিব না। আমরা গৃহী, তিনকুলে সকলেই বর্ত্তমান এবং বর্ত্তমান অবস্থায় ত্রিকুট পর্ব্বতেও যাইতে পারিব না। বেশ। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পড়ুন। ত্রয়ী (অর্থাৎ তিন বেদ—সাম, ঋক্ ও যজু। ঋগ্বেদ-অনুবাদক উইলসন সাহেব ও অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে অথর্ব্ব বেদ নহে) মুখে থাকিত বলিয়া পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের নাম ত্রয়ীমুখ ছিল। এখন মুখে থাকা তো দূরের কথা, গৃহেও একখানা বেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। অথচ ত্রিবেদী তেওয়ারী ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান রহিয়াই গিয়াছে। বিষয়, ধন ও আভিজাত্য এই ত্রিমদে কলির ব্রাহ্মণ মত্ত; ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিকও অনেকে করেন না।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখিবেন তিনটি ডাকিনীর সৃষ্টি করিয়াছেন শেক্স্পীয়ার। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ Cuckoo-কে তিনবার স্বাগত অভিনন্দন জানাইয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত বহু। ভাব-ভাষা-ছন্দ কাব্যের প্রধান তিনটি উপাদান ছাড়িয়া সরসীলাল সরকার মহাশয় 'রবীন্দ্র-কাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা' করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়িয়া স্থানীয় উদাহরণ লউন—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দের "ত্রয়ী" নাটিকা ও "বনফুলে"র "ত্রি" নামক তিন লাইনের কবিতাবলী। ত্রিপদী ছন্দের কথা তো সকলেই জানেন।

প্রাথমিক রং তিনটি—লাল, সবুজ ও বেগুনি। Union Jack ও কংগ্রেসী জাতীয় পতাকাতে তিনটি করিয়া রং আছে। ত্রিবর্ণের পতাকা আরও আছে বা ছিল—United States, France, Germany Russia, Italy, Austria-Hungary, Netherland, Belgium, Norway, Rumania, Bulgaria, Servia, Brazil ও Chile-র।

গ্রীক্ "ট্রাইস" (TREIS); ল্যাটিন্ "ট্রেস" (TRES); জার্মান "ত্রাই" (TRI); ইংরেজী "থ্রি", সংস্কৃত "ত্রি" ও আমাদের "তিন"—সবই এক। Romam Triumvirate এখন এদেশে হইয়াছে—কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মোস্লেম লীগ।

মুসলমান স্বামী তাহার স্ত্রীকে তালাক দিবার সময় তিনবার বলে—তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে তালাক

দিলাম। নতুবা পত্নীত্যাগে আইনের খোঁচা একটু থাকিয়া যায়। নিলাম শেষ হয় তৃতীয় বার হাতুড়ি ঠুকিবার পর। তিন বৎসরের পর বহু স্বত্ব ও অধিকার তামাদি দ্বারা বারিত হইয়া যায়।

সমাজেও দেখুন স্বামী-স্ত্রী এবং প্রেমিক অথবা প্রেমিকা লইয়া Eternal Triangle-এর সৃষ্টি হয়। এই চিরন্তন ত্রিভুজের আকর্ষণে নর-নারী এ-ভুজে ও-ভুজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কে কবে কাহার ভুজে আবদ্ধ হইবে তাহা ত্রৈরাশিক নিয়মেও জানা যায় না। বলা বাহুল্য, এই ত্রিকোণ-শক্তিতে তৃতীয়-প্রকৃতির (অর্থাৎ ক্লীবের) কোন স্থান নাই। সকলকেই 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপ হইতে হইবে।

সমাজে থাকিতে গেলে খাওয়াইতেও হয়। অনেকে শুধু খাইতেই জানেন, খাওয়াইতে জানেন না। পোলাওয়ের আকৃনির জলে ত্রিজাতক (অর্থাৎ জৈত্রী, এলাচ ও তেজপাতা) সিদ্ধ করিলে সেই পোলাও খাইয়া ত্রিবর্ণ—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, যে জাতিই হউক না কেন, পরিতুষ্ট হয়। তবে বেশি পোলাও খাইলে কণ্ঠ ও উদরের মাংসে সঙ্কোচজনিত ত্রিবলী রেখাত্রয় অতিশয় পরিস্ফুট হইবে, মেদাধিক্য হইবে, পীড়া হইবে। তখন ঔষধ খাইতে হইবে। আজকাল বাজারে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ পাওয়া শক্ত; সুতরাং হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধই খাইতে হইবে। দেখিবেন মহাত্মা হানিম্যানও তিনকে ছাড়েন নাই। ঔষধের তৃতীয় ডাইলিউশনে রোগ সারিবে, কিন্তু দ্বিতীয় বা চতুর্থ ডাইলিউশনে হয় কিছু হইবে না, না হয় হিতে বিপরীত হইবে; বাত-পিত্ত-কফ ত্রিদোষ বাড়িয়া যাইবে, তখন হোমিওপ্যাথিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া কবিরাজী ত্রিকটু—শুঁঠ-পিপুল-মরিচ অথবা ত্রিফলা—হরীতকী-আমলকী-বহেড়া, ঘৃত-মধু-শর্করা এই ত্রিমধুর সহিত মাড়িয়া খাইতে হইবে। অসুস্থ অবস্থায় অনেকে নিশিডাক শুনেন। গভীর রাত্রে নাম ধরিয়া কেহ যদি তিনবার ডাকে তিনবারের একবারও সাড়া দিবেন না, চতুর্থ ডাকের পর সাড়া দিবেন। যাঁহারা তন্ত্রের বা spiritualism-এর A. B. C. পর্য্যন্ত জানেন না, তাঁহারাই এই কথায় হাসিবেন। প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলি পরীক্ষা পাস করিলেই যে পার্থিব অপার্থিব সব কিছু জানিয়া ফেলিলেন—ইহা মনে করিবেন না।

খেলাধূলাতেও তিনের প্রভাব কম নহে। One-Two-Three বলিলে এবং তিন বলিবার পর ছেলেমেয়েরা দৌড়ায়। জিতিলে থ্রি-চিয়ার্স দেয়। ফ্লাস নামক তাসের জুয়াতে তিনটি একপ্রকার তাস পাওয়াই Trio বা চূড়ান্ত জিত। ঘোড়দৌড়ে প্রথম তিনটি ঘোড়ার টিকিট কিনিতে না পারিলে টাকা জলে গেল। রেলগাড়িতেও পূর্ব্বে ফার্স্ট, সেকেণ্ড ও থার্ড—এই তিনটি ক্লাস ছিল। অসচ্ছল অবস্থার মানী ব্যক্তিদের জন্যই (অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য) মধ্যম শ্রেণীর সৃষ্টি পরে হইয়াছিল মাত্র।

উদারা-মুদারা-তারা এই তিন সপ্তকে ওড়ব, খাড়ব, ও সম্পূর্ণ এই তিন প্রকার রাগ-রাগিণী সুর-তাল-লয় সংযোগে শুরু হয়, কিন্তু সারা হয় সাধারণত ত্রিতালের তেহাইতে।

তিন সত্যি, তে-কাঠা, তেকোণা, তে-পায়া, তে-মাথা, তে-মোহানা আপনারা সকলেই জানেন। এ সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে একটা কথা শুনিবেন, আজকাল ত্রিপান্তর মাঠের ত্রিসীমানাতেও যাইবেন না। A. R. P.-র নির্দ্দেশ।

ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা হিন্দু ও খ্রীষ্ট উভয় ধর্ম্মেই আছে। হিন্দুমতে কালী, তারা ও ত্রিপুরা—এই তিন দেবী ত্রিশক্তি। বাইবেলের মতে ভগবানের তিন রূপ—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। হিন্দুমতে জগৎ-পালন কাজটা দেবগণ ভাগ করিয়া লইয়াছেন। সৃষ্টি ও স্থিতির জন্য দুই জনের আপিস দরকার। মহেশ্বরের আপিস শ্মশানেই। সম্প্রতি তাঁহার কাজ খুব বাড়িয়াছে। তাঁহার ডিপার্টমেণ্টেও আবার তিনটা সেক্‌শন—খণ্ডপ্রলয়, দৈনন্দিন প্রলয় ও মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ই এখন প্রবল।*

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায়

---

* তিন পাতার মধ্যে লেখাটিকে ঠাসিতে পারিলে 'ত্রি-মহিমা' আমাদের পক্ষে মহিমান্বিত হইত। লেখক তিনের মহিমা পাঁচ পাতায় বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে বিপন্ন করিয়াছেন। তিন লাইন কাটিতে বাধ্য হইয়াছি।—স. শ. চি.

বিশ্বাস

পলে পলে দুঃখ সহি, পদে পদে সহি অত্যাচার,
অপমান-কশাঘাতে জর্জ্জরিত দেহ-প্রাণ-মন,
তবু বাঁচি আশায় আশ্বাসে ; অন্তরের হাহাকার
নিরুদ্ধ করিয়া রাখি, মনে মনে জপি সারাক্ষণ—
কোথা তুমি ভগবান, দৈত্য-দাপে কাঁপে বসুন্ধরা ;
জানি তুমি আসিবে নিশ্চয়—কহ, কত দেরি আর ?
এখনও কি হয় নি সময় ? ভরে নি পাপের ভরা ?

বিশ্বাস করিয়া আছি—অবতীর্ণ হও অবতার।
বিশ্বাস করিয়া আছি রাম আসি হানিবে রাবণে,
দুঃশাসন-বক্ষোরক্ত পান করি ভীম-বৃকোদর
পাঞ্চালীর বেণীবন্ধ করিবে রচনা রণাঙ্গনে,
ছিন্নজটা ধূর্জ্জটির তীক্ষ্ণ রুদ্র রোষ ভয়ঙ্কর
মূর্ত্ত হবে বীরভদ্রে,—দক্ষযজ্ঞ হবে ধ্বংস-স্তূপ,
বিদীর্ণ করিয়া স্তম্ভ দেখা দিবে নরসিংহ-রূপ।

"বনফুল"

অবিশ্বাসী

হায় গো বন্ধু, শ্রীচেতাবনীতে বিশ্বাস নাই দেখছি তব,
সম্বল দেশে কল্কি-দেবতা জন্ম নিয়েছে, এলেন ব'লে ;
আর কত দিন ? মাস ছয় আরো দুখ-যন্ত্রণা আমরা সবো,
পুনরো শ্রাবণ মোরা সাধুজন সত্যযুগেতে যাবই চ'লে।
অসুরেরা মরে কাটাকাটি ক'রে, আমরা তাদের সঙ্গদোষে
বিপাকে যদিও পড়েছি আজিকে, কেল্লা তো প্রায় দিয়েছি মেরে ;
সর্ব্বনাশটা কান ঘেঁষে বুঝি কেটে গেছে এই দারুণ পোষে,
পাঁজি ও গণকে বিশ্বাস রাখো, নতুবা পড়িবে বিষম ফেরে।

উৎসর্গ

অরুণ তাহার প্রকাশকের নিকট হইতে বাড়ি ফিরিল নয়টারও পরে। ক্লান্ত পদে তিনতলার সিঁড়ি ভাঙিয়া যখন নিজের ছোট ফ্ল্যাটটিতে সে চাবি খুলিয়া ঢুকিল, তখন যেন আর আলো জ্বালিবার মতও দেহের অবস্থা নাই। অবশ্য আলো জ্বালিবার খুব বেশি প্রয়োজনও ছিল না, পূবের জানালায় শুধু সার্শি দেওয়া ছিল, তাহারই মধ্য দিয়া প্রচুর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, ঘরের মধ্যে প্রায় সব কিছুই আবছা দেখা যায়। সে পাঞ্জাবি ও গেঞ্জিটা খুলিয়া আলনায় টাঙাইয়া রাখিল, তাহার পর ঘরের জানালাগুলি সব খুলিয়া দিয়া একটা ক্যাম্বিসের চেয়ারের উপর দেহ এলাইয়া দিল।

নীচে তখনও কর্ম্মমুখর কলিকাতা ঘুমাইয়া পড়ে নাই। তখনও ট্রাম-বাস পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছে, দোকানপাটও সব বন্ধ হয় নাই। শহরের কর্ম্মব্যস্ততার এই মিলিত কোলাহল এতটা উপরে আসিয়া কেমন যেন মধুরই লাগে। নীচেকার উজ্জ্বল আলো এখানের চন্দ্রালোককে ম্লান করিতে পারে না, কিন্তু তাহার একটা বেশ এ পর্য্যন্ত পৌঁছায়। বেশ লাগে অরুণের এ ব্যাপারটা। সে নিজের একান্ত কাছে কলরব পছন্দ করে না, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে নির্জ্জনবাসেও তাহার যেন প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। সেইজন্য ইচ্ছা করিয়াই শহরতলীতে যায় নাই, শহরের জনতামুখর এই বিশেষ ব্যস্ত রাজপথটিতেই আসিয়া ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়াছে।

ফ্ল্যাট তো ভারী! মোট দেড়খানা ঘর। ঘর বলিতে এই একটি, পাশে যে স্থানটি আছে তাহাকে আধখানা ঘর বলিলেও বেশি সম্মান করা হয়—চলনসই মাত্র। একটি ছোট টেবিল পড়িলেই আর নড়িবার উপায় থাকে না। অন্যান্য ফ্ল্যাটগুলি হইতে তিল তিল করিয়া স্থান বাঁচাইয়া এই অদ্ভুত তিলোত্তমা তাহার অদৃষ্টে গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এক পক্ষে তাহা ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে, নহিলে পনরো টাকা ভাড়ায় একটা পৃথক ফ্ল্যাটই বা মিলিত কোথায়? অরুণের এখন যা মানসিক অবস্থা, মেসের বাসা সে কল্পনাও করিতে পারে না। অথচ শুধু একজন পুরুষকে ঘরও বড় একটা কেহ ভাড়া দিতে চায় না। আর যদি বা পাওয়া যায়ও, সে বড় গোলমাল।

তাহার চেয়ে এটুই বেশ। পনরোটি টাকা ভাড়া দেয়, আর এই বাড়িরই দারোয়ানকে দেয় সাতটি টাকা, সে দুই বেলা রান্না করিয়া দিয়া যায়। হিন্দুস্থানী দারোয়ান, সুতরাং মাছ মাংস সে খায় না, দিতেও পারে না, কিন্তু তাহাতে অরুণের বিশেষ অসুবিধা হয় না, নিরামিষই তাহার ভাল লাগে। আর একটি ঠিকা ঝি আছে, সে প্রত্যহ সকালে আসিয়া ঘরের কাজ করিয়া দিয়া যায়। এইই তাহার সংসার।

ইহার বেশি আজ আর সে চায়ও না, বরং এইটুকু স্বাচ্ছন্দ্য বরাবর বজায় থাকিলেই সে খুশি। মাস ছয়েক আগে এই ব্যবস্থার কথাও সে কল্পনা করিতে পারিত না। দুইটি কি তিনটি গোটা পাঁচ-ছয় টাকার টিউশনি সম্বল করিয়া যাহাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত, মেসের দুই বেলা ভাত এবং কোনমতে কোথাও একটু মাথা গুঁজিবার স্থান, এইই ছিল তাহার পক্ষে বিলাস।—একেবারে সম্প্রতি, মাত্র ছয় মাস আগে। ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, চল্লিশ টাকা মাহিনার একটা মাস্টারি মিলিয়াছে, এবং চাকরিটা টিকিয়া যাইবে বলিয়াই সে আশা করে। অন্তত সেই ভরসাতেই সে মাস-তিনেক আগে এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া লইয়াছে।

অবশ্য শুধু মাস্টারিই আজ আর তাহার একমাত্র অবলম্বন নয়, প্রায় বৎসর দুয়েক আগে গভীর বেদনা এবং নৈরাশ্যের মধ্যে উপার্জ্জনের আর একটা পথও হঠাৎ সে খুঁজিয়া পাইয়াছিল। খুব ছেলেবেলায় স্কুলের ম্যাগাজিনে সে কবিতা ও গল্প লিখিত, এতদিন পরে মানসিক অবসাদে যখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন সে সেই পুরাতন অভ্যাসের মধ্যেই আবার সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইয়াছিল। এবার আর কবিতা লিখিবার চেষ্টা করে নাই, শুধু গল্প। একে একে দুই-একটি সাময়িক-পত্রে সে গল্প ছাপাও হইল, ক্রমে তাহার দরুন পাঁচ টাকা সাত টাকা দক্ষিণাও মিলিতে লাগিল। সেদিন যাহা ছিল অঙ্কুর, আজ তাহাই মহীরুহে পরিণত হইয়াছে—বাংলা দেশের এক বিখ্যাত প্রকাশক একেবারে তিন শত টাকা দিয়া তাহার একখানি উপন্যাস লইয়াছেন, এবং সেটি ছাপাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আজ তাহারই শেষ কয় পৃষ্ঠার প্রুফ, এবং বাকি এক শত টাকার চেক প্রকাশক দিয়া দিয়াছেন।

অরুণ একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল। প্রুফটা দেখিতে হইবে, আলোটা জ্বালা দরকার। প্রকাশক মোহিতবাবু অনুরোধ করিয়াছেন, ইস্কুল যাবার পথেই প্রেস পড়বে, যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে যাবার পথে প্রুফটা প্রেসে ফেলে দিয়ে গেলে বড্ড ভাল হয়। তা হ'লে কাল ছাপা শেষ হয়ে পরশু বইটা বেরিয়ে যেতে পারে।

প্রথম উপন্যাস বাহির হইবে। তাহার নিজের আগ্রহও বড় কম নয়। সে আলোটা জ্বালিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল মোহিতবাবুর আর একটা কথা, টাইটেলের চার পাতা বাদ দিয়েও আর দুটো পাতা বাঁচছে। 'উৎসর্গ' করার যদি কাউকে থাকে তো লিখে দিন না। প্রথম বই আপনার কাকে উৎসর্গ করবেন ভেবে দেখুন।

কথাটা খুবই সাধারণ। কিন্তু ইহার পিছনে কতখানি অপ্রীতিকর চিন্তা এবং স্মৃতিই না জড়াইয়া আছে!

অরুণ আর আলো জ্বালিবার চেষ্টা করিল না। নীচে কোলাহল-মুখর, আলোকোজ্জ্বল রাজপথের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর আবার চেয়ারেই ফিরিয়া আসিয়া বসিল। তাহার প্রথম বই কাহাকে উৎসর্গ করিবে—এই প্রশ্নটার সামনাসামনি দাঁড়াইয়া আজ এই সত্যটাই সে গভীরভাবে উপলব্ধি করিল যে, পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই। আত্মীয় বন্ধু স্নেহভাজন, কোথাও এমন কেহ নাই, যাহার হাতে তাহার বহু বিনিদ্র রজনীর ফল, বহু সাধনার বস্তু এই বইখানি তুলিয়া দেওয়া যায়।

অথচ আজ তাহার সবই থাকিবার কথা। মা খুব অল্প বয়সে মারা গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাবা সে অভাব জানিতে দেন নাই কখনই। অতি যত্নে মানুষ করিয়া, বি. এ. পাস করাইয়া অফিসেও ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন এবং সংসারে লোকের অভাব বলিয়া অনেক খুঁজিয়া সুন্দরী পুত্রবধূও ঘরে আনিয়াছিলেন। সেদিন জীবনকে তাহার রঙিন বলিয়াই বোধ হইয়াছিল।

কিন্তু একটি বৎসর কাটিতে না কাটিতে কি কাণ্ডটাই না হইয়া গেল! বাবা মারা গেলেন, তাহারই মাস কয়েকের মধ্যে হঠাৎ

অফিসটিও উঠিয়া গেল। সেই যে চাকরি গেল, আর কিছুতেই কোথাও কোন কাজ মিলিল না। এক মাস, দুই মাস, বৎসর, দুই বৎসর কাটিয়া গেল। বাবা বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, সুতরাং একে একে নীলিমার গহনাগুলি সব গেল, তাহার পর ঘরের আসবাবপত্র, সবশেষে বাসনকোসন। মধ্যে মধ্যে দুই-একটি ছোটখাট টিউশনি হয়তো পায়, কিন্তু সে পাঁচ-সাত টাকার, তাহাতে খাওয়া-পরা বাড়ি-ভাড়া সবগুলি চলে না। বাড়ি ছাড়িয়া ফ্ল্যাটে আসিল, সেখান হইতে ভাড়াটে বাড়ির একখানা ঘর, নীচের তলায় অন্ধকার ঘর। তবু ভাড়া দেওয়া যায় না। অপমানের ভয়টা বড বেশি ছিল বলিয়া বেশি ধার করিতে সে পারিত না। যাহা কিছু সামান্য পাইত কোনমতে ঘর-ভাড়াটা দিয়া দিত, সুতরাং নিজেদের ভাগ্যে দিনের পর দিন চলিত উপবাস।

উঃ, সেদিনের কথা মনে হইলে আজও বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়। শুধু নৈরাশ্য আর তিক্ততা। এতটুকু আশা, এতটুকু আনন্দের আলোও কোথাও নাই। সারা দিনই প্রায় কাজের চেষ্টায় ঘুরিত, গভীর রাত্রে ক্লান্ত দেহ ও ভগ্ন মন লইয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখিত, হয়তো নীলিমা তখনও শুষ্ক মুখে তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। আগে আগে সে প্রশ্ন করিত, নয়তো একটু ম্লান হাসিত, ইদানীং তাহাও আর পারিত না। উপর্যুপরি উপবাসে তাহার সমস্ত প্রাণশক্তি গিয়াছিল ফুরাইয়া। দিনের পর দিন এই একই ঘটনা ঘটিয়াছে, তবু একটা কুড়ি টাকা মাহিনার চাকরিও সে জোটাইতে পারে নাই।

অরুণের আত্মীয়স্বজনরা দারিদ্র্য দেখিয়া বহুদিনই ত্যাগ করিয়াছিলেন, নীলিমারও বিশেষ কেহ ছিল না; রূপটি দেখিয়া নিতান্ত গরিবের ঘর হইতেই অরুণের বাবা তাহাকে আনিয়াছিলেন। সুতরাং এক বেলা আশ্রয় দিতে পারে, খাদ্য দিতে পারে, শেষ পর্য্যন্ত এমন কেহই যখন আর রহিল না, তখন কোন প্রকার ধার করা বা সাহায্য চাওয়ার চেষ্টাও অরুণ ছাড়িয়া দিল, তখন চলিতে লাগিল শুধু উপবাস। দুই দিন, তিন দিন অন্তর হয়তো ভাত জোটে, তাও এক বেলা।

অবশেষে নীলিমা আর সহিতে পারিল না। আশ্রয় দিবার আত্মীয়

ছিল না বটে, কিন্তু রূপ যথেষ্ট ছিল বলিয়া সর্ব্বনাশ করিবার লোকের অভাব ঘটিল না। অরুণের চরম দুর্দ্দিনে তাহার ভার বহন করিবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়া নীলিমা একদিন চলিয়া গেল। যাইবার সময় শুধু এক ছত্র চিঠি রাখিয়া গেল—

আমি আর সইতে পারলুম না। আমাকে মাপ ক'রো। আমার ভার ঘুচলে তুমিও হয়তো এক বেলা খেতে পাবে।

অরুণ অকস্মাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথা দিয়া তখন যেন আগুন বাহির হইতেছে। সে বাথরুমে গিয়া মাথায় খানিকটা জল থাবড়াইয়া দিল, তাহার পর মুখ-হাত মুছিয়া জোর করিয়া আলোটা জ্বালিয়া প্রুফ দেখিতে বসিল। কাজ সারিতেই হইবে, বৃথা চিন্তা করিবার সময় নাই।

কিন্তু প্রুফ ছিল সামান্য, শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। আবার সেই 'উৎসর্গে'র প্রশ্ন। সামনে কাগজগুলা খোলাই পড়িয়া রহিল, টেবিল-ল্যাম্পের আলোটা নিঃশব্দে জ্বলিতে লাগিল, সে জানালার মধ্য দিয়া রাস্তার ওপারে আর একটা বাড়ির কার্নিসে, যেখানে এক ফালি চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মন তাহার চলিয়া গিয়াছে তখন কত দূরে, অতীতের এক কুৎসিত কর্দ্দমাক্ত, মেঘ-ঘন দিনে। সেখানে আলোর রেখা মাত্র নাই, সেদিনের কথা মনে পড়িলে আজও আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করে—

সেদিন হয়তো তাহার মরাই উচিত ছিল। নিজের স্ত্রী ভরণ-পোষণের অক্ষমতার জন্য যাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়, সে আবার সেই কালামুখ লইয়া বাঁচিয়া থাকে কি বলিয়া? কিন্তু মরিতে সে পারে নাই। হয়তো স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু আসিলে সে আদর করিয়াই বরণ করিত, কিন্তু স্বেচ্ছায় জীবনটাকে বাহির করিতে সে পারে নাই, অত দুঃখের পরেও না। বরং গৃহস্থালীর সামান্য যে দুই-একটা তৈজস অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বেচিয়া একটা মেসে গিয়া উঠিয়াছিল, এবং নিজের মনেও স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা হয়, দুই বেলা ভাত খাইতে পাইয়া সে যেন স্বস্তির নিশ্বাসই ফেলিয়াছিল। সেই হইতেই সে নিশ্চিন্ত এবং নিঃসঙ্গ।

সেই হইতে আবার একটু একটু করিয়া সে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে, আজ বরং তাহার অবস্থা সচ্ছলই, কিন্তু এই সচ্ছলতা একদিন যাহার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল, দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত্তে তাহার সেই জীবনসঙ্গিনীই গিয়াছে হারাইয়া। আজ আর এ স্বাচ্ছন্দ্যের যেন কোন মূল্যই নাই। কোথায় আছে সে কে জানে, সুখে আছে কি আরও দুঃখে আছে! কাহার আশ্রয়ে আছে তাই বা কে জানে, সে কেমন লোক! হয়তো বা বাঁচিয়াই নাই। দুঃখে, কষ্টে, দারিদ্র্যে—হয়তো অকালে এ পৃথিবী হইতে বিদায়ই লইয়াছে।

কথাটা ভাবিতেই অরুণের দুই চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া আসিল। বেচারী অত দুঃখই সহিল, আর কয়েকটা দিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে হয়তো আর ইহার প্রয়োজনই হইত না। আজ এই স্বাচ্ছন্দ্যের সেও অংশ লইতে পারিত। আজ আর তাহার প্রথম উপন্যাস কাহাকে উৎসর্গ করিবে, এ প্রশ্নই উঠিত না। সে হয়তো আজও বাঁচিয়া আছে, অথচ এ সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিতেছে না অরুণ কিছুতেই—

নীলিমাকেই সে উৎসর্গ করিবে নাকি শেষ পর্যন্ত? কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে? দোষ কি?

চিন্তাটা মাথায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন অস্থির হইয়া উঠিল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিয়া সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু করিয়া দিল।

বেচারী নীলিমা; তাহারই বা অপরাধ কি? কি কষ্টটাই না করিয়াছে সে! দিনের পর দিন নিরম্বু উপবাস করিয়াছে, লজ্জা-নিবারণের কাপড় পর্য্যন্ত জোটে নাই। বহুদিন তাহাকে গামছা পরিয়া একমাত্র ছেঁড়া কাপড় শুকাইয়া লইতে হইয়াছে। তবু—তবু সে গঞ্জনার একটি শব্দও মুখ দিয়া উচ্চারণ করে নাই, কোন প্রকার অনুযোগ করে নাই। আগে হাসিমুখেই সব সহিয়াছে, ইদানীং হাসিতে পারিত না, তবু সহিয়াছে—নীরবে নিঃশব্দে। ভাত জুটিলেও সে ভরসা করিয়া পুরা খাইতে পারে নাই, আবার স্বামী খাইবে বলিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত যদি সে একদিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াই থাকে তো সে এমন কিছু অপরাধ নয়।

অরুণ তাহার মনের মধ্যে বহু দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া, আজ বোধ করি প্রথম, লক্ষ্য করিল যে, সেখানে নীলিমার সম্বন্ধে কোন অভিমান, কোন অনুযোগই আর অবশিষ্ট নাই। হয়তো আছে বেদনাবোধ, কিন্তু তাহার জন্য দায়ী তাহার নিজেরই অদৃষ্ট। যতদিন নীলিমাকে সে পাইয়াছে, কখনও কোনও অভিযোগের কারণই তো সে ঘটিতে দেয় নাই। স্নেহে, প্রেমে, সেবায়, লীলাচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ তাহার সেই কিশোরী বধূর কথা মনে পড়িলে আজও সারা দেহে রোমাঞ্চ হয়। না, যতদিন সে পাইয়াছে, আশ মিটাইয়াই পাইয়াছে। এমন দুর্ভাগ্য খুব অল্প লোকেরই হয় বটে, কিন্তু এমন সৌভাগ্যও কদাচিৎ দেখা যায়। প্রথম যৌবনে, সেই নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার এক-একটি বিনিদ্র রজনীর যে মধুস্মৃতি তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত আছে, শুধু সেইগুলি অবলম্বন করিয়াই তো একটা জীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতে পারে। তবে, তাহার কি কোন মূল্যই নাই, সেজন্য কোন কৃতজ্ঞতা নাই? অরুণের নিজের দোষে, অসীম দুঃখের ফলে, একটি মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় যদি তাহার পদস্খলন হইয়াই থাকে তো সেইটাই কি সে মনের মধ্যে বড় করিয়া রাখিবে, আর অতখানি প্রেম, অতটা নিষ্ঠা, সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে?

না, মনের এই দুর্ব্বলতা, এই অন্যায় সংস্কারকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না, নীলিমাকেই সে তাহার প্রথম বই উৎসর্গ করিবে।

নীচে তখন রাজপথ জনবিরল হইয়া গিয়াছে, দোকানপাটগুলি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার আলোও হইয়া উঠিয়াছে ম্লান। শহরের অশান্ত বিক্ষুব্ধতার উপরে যেন চমৎকার একটি সুষুপ্তি নামিয়া আসিয়াছে, সমস্তটা মিলিয়া একটা করুণ অথচ মধুর শান্তি।

সে খানিকটা যেন কিসের আশায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাশের ফ্ল্যাটে তখনও স্বামী-স্ত্রীর আলাপের গুঞ্জন শোনা যাইতেছে, নীচে কোথায় একটা ছেলে কাঁদিতেছে একটানা সুরে। আর সব শান্ত, স্তব্ধ।

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার চেয়ারে বসিল, তাহার পর দৃঢ় হস্তে প্রুফের কাগজগুলা টানিয়া লইয়া উৎসর্গ-পৃষ্ঠাটি লিখিয়া দিল। বেশি কিছু নয়, শুধু—"শ্রীমতী নীলিমা দেবী, কল্যাণীয়াসু"।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলাই বই বাহির হইয়া গেল। প্রকাশক মোহিতবাবু এক কপি হাতে করিয়া রাত্রে আসিলেন তাঁহার রক্ষিতার বাড়ি। উপরে উঠিয়া তাহার সামনে বইখানা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, এই নাও, তোমার সেই বই বেরিয়েছে। সে বসিয়া কি একটা বুনিতেছিল, তাড়াতাড়ি সেগুলি নামাইয়া রাখিয়া সাগ্রহে বইটা তুলিয়া লইল। চমৎকার বাঁধাই, উপরে রঙিন ছবি, তাহারই মধ্যে ঝকঝক করিতেছে বই ও লেখকের নাম। খানিকটা নাড়িয়া-চাড়িয়া বইটা বিছানার পাশে একটা টিপয়ের উপর সযত্নে রাখিয়া দিয়া সে উঠিয়া মোহিতবাবুর স্বাচ্ছন্দ্যের তদ্বিরে মন দিল। চাদর ও জামাটা খুলিয়া তাহার হাতে দিতে দিতে মোহিতবাবু বলিলেন, বাবা, বাঁচলাম! যা তাগাদা তোমার, ওই বইটা যেন আমার সতীন হয়ে উঠেছিল।

তাহার পর নীচের ঢালা বিছানায় দেহ এলাইয়া দিয়া কহিলেন, রামটহল গেল কোথায়? একটু তামাক দিতে বল। বেরুল তো, এখন খরচাটা উঠলে বাঁচি। তোমার কথা শুনে একগাদা টাকা দিয়ে বইটা নিলাম, ওর আদ্ধেক টাকাও কেউ দিত না।

ও পক্ষ তখন কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, নিশ্চয়ই উঠবে। অত ভাল লেখা, লোকে নেবে না?

মুখটা বিকৃত করিয়া মোহিতবাবু কহিলেন, কে জানে কি লেখা, আমি কি আর কোনটা পড়েছি ছাই। তুমিই খালি ওর নাম করতে গ'লে পড়।

হ্যাঁ গো মশাই, শুধু বুঝি আমি? ভালই যদি না হবে, তা হ'লে অতগুলো মাসিক-পত্র ওঁর লেখা ছাপে কেন?

মোহিতবাবু একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ করিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, ওদের তো ভারী বুদ্ধি, ওরা যা পায় তাই ছাপে। তোমারও যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, যতগুলো কাগজ অরুণবাবুর লেখা ছাপে, সবগুলোই তো তুমি নিতে শুরু করেছ দেখছি।

কি করব, একলা একলা সময় কাটে কি ক'রে আমার? তুমি কিছু ভেবো না, ও বই নিশ্চয়ই ভাল বিক্রি হবে। সব কাগজে পাঠিয়ে দাও, দেখবে, ভাল সমালোচনা বেরুলেই বিক্রি হতে শুরু হবে।

হ'লেই বাঁচি। একেবারে নতুন লেখক, ভয় করে বড্ড।

মোহিতবাবু খানিকটা চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। একটু পরে রামটহল তামাক দিয়া যাইতে উঠিয়া বসিয়া গড়গড়ার নলটা হাতে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, হ্যাঁ, আর একটা ভারী মজার ব্যাপার বলতে ভুলে গেছি। শুনেছ, ওর বউয়ের নামও নীলিমা।

নীলিমা হেঁট হইয়া জল-খাবারের থালা রাখিতেছিল, অকস্মাৎ তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল, কে বললে?

মোহিতবাবু জবাব দিলেন, ওই দেখ না বইটা খুলে, উৎসর্গ করেছে তার নামে।

নীলিমা তাড়াতাড়ি বইটা খুলিয়া উৎসর্গ-পৃষ্ঠাটা বাহির করিল। মিনিটখানেক সেদিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু ও যে ওঁর বউয়ের, তা কেমন ক'রে জানলে?

মোহিতবাবু মুখ হইতে নলটা সরাইয়া বলিলেন, বললে যে। নামটা দেখে ভারী মজা লাগল। বলতে তো পারি না কিছু, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে মশাই? অরুণবাবু জবাব দিলেন, আমার স্ত্রী। অদ্ভুত মিল, না?

নীলিমা কোন উত্তর দিল না। তখনও তাহার চোখের সামনে সেই উৎসর্গ-পৃষ্ঠাটা খোলা, কিন্তু অক্ষরগুলি তখন তাহার চোখে পড়িতেছিল না, সব যেন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল।

আরও মিনিট দুই পরে বইটা বন্ধ করিয়া রাখিয়া ঈষৎ রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, দেখি, তোমার চাটা নিয়ে আসিগে।

কিন্তু তখনই সে নীচে গেল না। ওপাশের বারান্দায় দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ গলির উপরের এক ফালি অন্ধকার আকাশের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কে জানে কাহাঁর উদ্দেশে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

মোহিতবাবু ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

কুরুক্ষেত্রের পরে

ঘরে ঘরে কেন শুনি রোদনের রোল
কুরুনাথ? ঘরে ঘরে কেন দেখি হায়,
অস্ত-আরক্তিম-আঁখি ঊর্দ্ধপানে চেয়ে
আকাশপ্রদীপ? কাশশুভ্র-ধরা সম
কেন দেখি আজ বিধবার শ্বেতাম্বর
ব্যাপ্ত দিকে দিকে? দিগ্বধূর আঁখি কেন
অশ্রু-ছলছল শ্মশানের চিতাভস্ম-
ধূমে? যৌবনে যোগিনী সম বসুন্ধরা
কেন অস্থিমালী, কাপালিকা, মৃতশয্যা-
ভস্মের ভৈরবী? নরমুণ্ড-রুদ্রাক্ষের
অক্ষমালা করে এ কি ধ্যানে সমাসন্ন
নিস্তব্ধ প্রকৃতি? কে ঘুচাল ভেদ বল
দিবস-রাত্রির? শিবাধ্বনিপ্রহরিত
দিবস? নিশীথে উঠিছে শুনি জাগ্রত
পক্ষীর অবিরাম আর্ত্ত হলহলা? কি
জন্য পর্জ্জন্যের দুষ্ট এই অভিলাষ
রক্তবৃষ্টিপাতে? বৃষ্টি নহে? নররক্ত?
ক্ষুধিত, অপুষ্ট, শীর্ণ, ছায়ালাঞ্ছ দেহে
এত রক্ত ছিল? অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
কত সংখ্যা তারা? সেই যে মোদের গ্রাম
সরস্বতী-তীরে তার চেয়ে বেশি হবে?
কি লজ্জায় অধোমুখ? এই তো গৌরব!
তোমাদের শস্যক্ষেত্র-সীমা নির্দ্ধারণে
নিঃক্ষত্রিয় সারাদেশ! পার্ব্বত্য গান্ধার
হতে লোহিত্যা নদের, কুমারিকা হতে
কোন্ দূর হিমাদ্রির অগণ্য ক্ষত্রিয়

এসে বধিয়াছে পরস্পরে ; নাহি ছিল
পরিচয়, নাহি ছিল মিত্রতা, নামেও ?
অজ্ঞাত ! কেন যে জানি। পাণ্ডবে কৌরবে
হবে ভিটা ভাগাভাগি ! ভুট্টাক্ষেত্র হতে
কে কতটা শস্য পাবে তাহারি বিবাদে
দুই পক্ষ অসিব্রতী। 'এস পৃথিবীর
ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্মযুদ্ধ স্থানে !' কি আহ্বান !
কি উদার, কি উদাত্ত ! নিজ স্বার্থ টারে
কি কৌশলে নরনাথ তুলেছ সাজায়ে
জগতের স্বার্থ-বারবধূ ! সকলেরি
ভোগ্যা এ যে ! সম্পদে সন্ধান নাই, আর
বিশ্বতরে মুক্তদ্বার বিপদের দিনে।
মহারাজ, এ তো ক্ষুদ্র রাজনীতি নহে,
গৌতমের স্বপ্নে-দেখা এ যে বিশ্বপ্রেম !

জান কি গো নরনাথ, যুদ্ধ কারে বলে ?
দেখে এস রণস্থলী। বিধাতা নির্দ্দয়,
আর তুমি অন্ধ। কোন্ পুণ্যে অন্ধ তুমি,
তাই ভাবি আজ। কুরুক্ষেত্র মরু 'পরে
যে মৃত্যুর মরীচিকা কাঁপিছে আভাসে,
বৈতরণী আভাচ্ছবি ! শত্রু মিত্র দোঁহে
ঘনতর আলিঙ্গনে লুটাইছে সেথা।
শেল, শূল, গদা, ধনু, কিরীচ, পট্টিশ,
মুষল, মুদ্গর, শক্তি, শঙ্খ, ভিন্দিপাল,
তূরী, ভেরী, চর্ম্ম, বর্ম্ম, দুন্দুভি, দামামা,
তোমর, ভোমর, কৌন্ত ;···সত্য মহারাজ,
বিজ্ঞানের কি মহিমা ! সামান্য মানুষ
বিধাতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, বহু বুদ্ধিমান
বিধাতার চেয়ে। বিধাতা দিলেন লৌহ,

অস্ত্র তাহে গড়িল মানব। নহে শুধু
স্রষ্টার সে বড়, পশু হতে মহত্তর
নর। পশু কি গড়িতে জানে কভু অস্ত্র
অগ্নিষ্কর? নখরাস্ত্রে তারা শুধু করে
হানাহানি। হায় পশু, তোমা হতে শ্রেষ্ঠ
যে মানব!
কি ভাবিছ রাজা, কি শুনিছ
বসি? বেদনা-বধির কর্ণে শুনিতে কি
পাও অরুন্তুদ ঐক্যতান মর্ম্মভেদী
বিশ্ববেদনার! ধরণী-লুণ্ঠনব্রতে
তব পুত্রগণ ছুটিয়াছে দিগ্বিদিকে;
কোথা চম্পা, কোথা লঙ্কা, কোথায় বাহ্লীক,
সুমাত্রা, সুবর্ণ, বলি, শ্যাম, ব্রহ্ম, চীন;
কারো স্বর্ণ, কারো রৌপ্য, কারো তৈলখনি,
ভূস্তর-প্রোথিত; গজদন্ত, মৃগনাভি,
চন্দন, অগুরু; হীরক, গোমেদ, পান্না,
মাণিক্য, স্ফটিক; অভ্র, চুনি, মরকত
অংশুক, মৌক্তিক; হায়, নিখিল পৃথ্বীর
অশ্রুসিক্ত ঐশ্বর্য্যের চৌর্য্যে রমণীয়
এ হস্তিনাপুরী। প্রত্যেক পাথরখানা
তব প্রাসাদের জান কি কাহিনী বহে?
মাতার চোখের জলে, সতীর লজ্জায়,
ভ্রাতার হৃদয়রক্তে, ভগ্নীর বিলাপে,
দুগ্ধপোষ্য বালকের ক্রীড়নক-কাড়া
ভগ্নখেলা মনোরথে গঠিত এ পুরী,
স্বরগের সুচতুর ছদ্মবেশ-পরা
এ নব নরক! বিশ্বের বেদনা আজ
আসিয়াছে ফিরে রাত্রিচর বাদুড়ের
পাটল পাখায়—অতল গহ্বরে যথা

ছিন্নমস্তা-ধ্বনি। নিখিল ক্রন্দন, শোন,
মাথা কুটে মরে পাষাণ-প্রাকারে তব
অনুক্ষণ; অভিশাপে ভস্মিত এ শোক-
জতুগৃহ।

তাই আজি মুখে মুখে পাই
শুনিবারে মহৎ সঙ্কল্প যত; তাই,
নব কোষ্ঠী-সংরচন-ধুরন্ধর যত
বহু স্কন্ধ সমাবেশে ধরিবারে চায়
কৃত্রিম বাস্থুকি-গর্ব্বে স্খলিত-ভিত্তির
প্রাচীন জগৎখণ্ড! হায় মহারাজ,
রোগশয্যা সাধু-ইচ্ছা এ যে! মেঘ-কাটা
নভে সেই পুরাতন সূর্য্য, সেই রাহু!
নবযুগ! কোথা বল নবত্বের ঠাঁই?
সেই আমি, সেই তুমি, সেই পুরাতন
লক্ষ সংস্কার। ধনীর অনন্ত লোভ,
ঈর্ষ্যা দরিদ্রের; প্রবলের দম্ভ আর
দুর্ব্বলের ভীতি; রক্তসিন্ধু অতিক্রামী
শত স্বার্থ-তরী লুব্ধ যত বাণিজ্যের;
দুঃখের হাতুড়ি-ঘায়ে করিছে রচনা
নূতন কিরীচ আজো অস্ত্রব্যবসায়ী;
রাষ্ট্রনীতি আজো সেই পুরাতন চালে
গুপ্ত সন্ধি-প্রণয়ের শব্দভেদী বাণ
হানে অসতর্ক বুকে; হঠাৎ কখন
বণিকের মিষ্ট হাসি শাণিত অসির
লভে তীব্র ধার; খ'সে যায় ভদ্রতার
শেষ ছদ্মবেশ। তারপরে? তারপরে
জান মহারাজ, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
অষ্টাদশ দিনে! নব যুগ? এরো পরে?

রোগশয্যা-সাধু-ইচ্ছা-কুয়াশা মিলাবে
নবসূর্য্য-স্বাস্থ্যোদয়ে, করিও না ভয়।
স্বর্ণস্তূপ-সংরচনে স্পর্দ্ধিবে ধনিক
সুমেরুর তুঙ্গতারে ; লুণ্ঠনলোলুপ
দস্যু সাজিবে বণিক ; মারণ-চতুর
দক্ষতর সূক্ষ্মতর অস্ত্র-উদ্ভাবনে
জ্ঞানী যাবে যন্ত্রশালে।
তেমনি উল্লাসে
নারী-করতালিপুষ্ট বালখিল্য যত
বসনব্যসনদৃপ্ত মদির উৎসাহে
সাজিবে সৈনিক। এই তো নবীন যুগ,
বহু অভীপ্সিত ! সেই সূর্য্য, সেই রাহু !
আবার পুঞ্জিত পাপ তীক্ষ্ণতর শূলে
বিদারিবে শুভ্রতারে ! আবার মানুষ
অর্ব্বুদ অস্ত্রোপচারে করিবে মোক্ষণ
রক্ত কলুষিত। বৃহত্তর কুরুক্ষেত্র,
দুঃখ দক্ষতর। আবার, আবার সেই !
যতদূর চক্ষু চলে, চিত্ত দূরতর—
পুরাতন মূঢ়তার সেই আবর্ত্তন
অনাদ্যন্ত।..

চক্ষে কেন অশ্রু কুরুপতি ?
সূর্য্যাস্ত-কিরণে-গলা অস্ত গিরিশায়ী
হিমশৃঙ্গ ও কি ? ও কি নব সূর্য্যোদয়ে
বিগলিত আনন্দাশ্রু উদয়গিরির
হিমানী-নিঃস্রাবে ? শোকে ও কি পুরাতন
যুগের ব্যত্যয়ে ? ভয়ে ও কি নবতন
আসন্ন যুগের ? হাঃ হাঃ মহারাজ, দুই
মিথ্যা, দুই মিথ্যা জেনো। মিথ্যা ভীতিশোক।

সেই পুরাতন শয্যা, সেই সিংহাসনে
প্রচ্ছাদিত। পুরাতন কণ্টক বিষম
পুরাতন ক্ষতে আর করে না আঘাত
নব সংঘর্ষেব। পুরাতন ব্রণ যত
পদক সম্মানে তুলিবে বক্ষের 'পরে
সগৌরবে। তুমি আমি সেই পুরাতন।
মেদস্ফীত আরামের সঙ্কীর্ণ শয্যায়
নূতনের স্থান কোথা? পুরাতন নভে
সেই সূর্য্য, সেই রাহু! হাঃ হাঃ মহারাজ,
নিঃসাড় হৃদয়ে এস করি আবর্ত্তন
প্রত্যহের রেখাঙ্কিত পুরাতন পথে
যুগোত্তর, বৃহত্তর, মহত্তর, রণ-
ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পানে, কুরুপতি!

শ্রীপ্রথমনাথ বিশী

অপ্রস্তুত

সমাপ্ত হয়েছে শিক্ষা—জল বালি প্রাচীর খানার,
নয়া পিচকারি ল'য়ে শিখিয়াছি নব দোলখেলা;
আলোক আড়াল করি চাল শিখে ভিখারী-কানার,
এ-বাড়ি ও-বাড়ি পারি ফিরিবারে ঘোর রাত্রিবেলা।
সারবন্দী দাঁড়াইয়া শিখেছি কিনিতে চাল চিনি,
ঠাকুর চাকর ঝির অভাবে উনান ধরায়েছি;
বাস ট্রাম বিনা দেখ, বেপাড়ার পথ চিনি চিনি
যথাকালে ঘরে ফিরে বেলিয়েছি পরোটার লোচি,
ব্লেডের অভাব, তবু নিত্য চাঁছিতেছি নিজ দাড়ি,
ধোপা বিনা সাবানেতে রজকদুরস্ত মোরা আছি;
নারীর অভাবে আজো ছাড়ে নাই পুরুষের নাড়ী।
দুধটি মরিয়া মাত্র হইয়াছি খোয়াক্ষীর-চাঁচি।
সকলি হয়েছে শেখা, শিখি নাই পাড়িতে বিছানা,
কতকাল করি বল, বোমা-ভয়ে এখানা-ওখানা।

একাল

লেখা চাই।

কিন্তু কল্পনার সে মুক্ত আকাশ-বিহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেখানে প্রলয়ের ঘনঘটা, সুকুমার সাহিত্যের জন্য অভিযান বিড়ম্বনা মাত্র। এই আতঙ্কে-অবরুদ্ধ মনকে দিয়া সৃষ্টি করাই কি করিয়া? ওপার হইতে তাগিদ আসিতেছে ঘন ঘন, অমোঘ হুঙ্কারে। এই যে 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা'-অবস্থা, এতে বরং একটু পরকালের চিন্তা করাই শাস্ত্র-সঙ্গত, লেখার কথা ভাবিব এমন অবসর কই? তবু লেখা চাই-ই, সম্পাদকীয় কড়া তাগাদা; সম্পাদক যমের চেয়ে ন্যূন কিসে?

আকাশ তো গিয়াছেই, যেটাকে ভূতল বলা হয়, সেটাও ত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় লইয়াছি। পাতাল শুনিতাম মৃত্যুর দোসর। সম্পূর্ণ না হউক, কথাটা অর্দ্ধসত্য তো বটেই। ভাবিয়াছি, লেখাই থাক না—এই সশব্দ সাগ্নিক মৃত্যুর নিকট হইতে পলাইয়া শব্দহীন হিমস্পর্শ অর্দ্ধমৃত্যুর আশ্রয়ে কোন একটা সুরাহা হয় কি না।

হেঁয়ালি নয়, সত্যই বোমার ভয়ে নীচের তলা আশ্রয় করিয়া আছি। নীচের তলা বলিলে ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার না হইবারই কথা। যুগ যুগ ধরিয়া এতদিন পর্য্যন্ত লোকে যেটাকে 'নীচের তলা' বলিয়া আসিয়াছে, শুধু বাঁচিবার আশায় তাহারও নীচে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। মানুষের উপরের গতি শেষ হইয়াছে। তবু মানুষই তো! সে চলিবেই। তাই আধুনিক প্রগতির লক্ষণ অধোগতি; ঘরবাড়িও সেই তালে পা ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ক্রমাগতই অবান্তর কথায় আসিয়া পড়িতেছি। কি করি? অগ্নির আঁচ হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়াও গায়ের জ্বালা মিটিতেছে না। কারণটা আপাতত বোমাও নয়, সাইরেনও নয়—যদিও উভয়ের সঙ্গেই একটা সূক্ষ্ম সম্বন্ধ আছে। শরীর এবং মনকে সঙ্কুচিত করিয়া লইয়া সম্পাদক মহাশয়ের তাগিদ মিটাইবার যোগাড়যন্ত্র করিতেছি, আমার ভূতলাশ্রিত পরিবার-মহলে একটা গোলযোগ উঠিল। যা

বলিতেছেন, জানি না বাছা, কেমন যেন কালেরই দোষ। ছেলে কোথায় তার ঠিক নেই, তার মুখের কথা হ'ল—সেপাই হব, যুদ্ধ করতে যাব! তা যাবি, সব বীরপুরুষ হয়েছিস, আটকাবে কে? কিন্তু তার আগে আমায় যেতে দিন ভগবান—

কন্যা বোধ হয় স্কুল হইতে এইমাত্র ফিরিয়াছে—পড়ার ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিতেছে, কথায় কথায় একালের নিন্দে তোমার একটা রোগ দাঁড়িয়েছে ঠাকুমা। না, যুদ্ধে যাবে কেন? চারিদিকে অন্যায়ের আগুন লেগেছে, ও তোমাদের কালের কর্ত্তাদের মত ব'সে ব'সে চণ্ডীমণ্ডপে তামাক পোড়াতে শিখুক, আর—

আমার কনিষ্ঠ পুত্র দোতলায় কি একটা আবদারের সঙ্গে পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া যাইতেছে। স্পষ্ট শুনিতে না পাইলেও বুঝিলাম, সমস্ত ব্যাপারটা তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া।

ঠাকুরমা-নাতনীর কথা-কাটাকাটি ক্রমে রসিকতায় গড়াইয়া পড়িলেও, উহারই মধ্যে বেশ ঝাঁজালোও। আমার বয়সটা মারই বেশি নিকটবর্ত্তী; মাথায় বোমা পড়া অপেক্ষা মেয়ের মাথায় এই সব আজগুবি আধুনিকতার সমাবেশ কম বিপজ্জনক মনে করি না। এরা কি দেশটাকে রাতারাতি নব্য তুর্কী করিয়া গড়িয়া ফেলিতে চায় নাকি? আমাদের এই পাতাল-প্রবেশের সুযোগে ইহারা আরও কি সব বিপ্লবী মতলব আঁটিতেছে, কে জানে? নীচে হইতে গলাটাকে রাশভারী করিয়া বলিলাম, কমলী, সব শুনছি। মনে হচ্ছে, নিজেও তা হ'লে বোধ হয় নারী-বাহিনী কি ঐ রকম একটা কিছু তোদের চুলোর প্রগতির ব্যাপারে নাম লিখিয়ে এসেছিস। কাল থেকে স্কুল যাওয়া বন্ধ, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। একটা এ. আর. পি.-তে নাম লিখিয়েছে; আমার মাথার ঠিক নেই, এর ওপর যদি তোর মুখে ঐসব—

কন্যার মাতা দুয়ারের কাছে উপস্থিত হইল, কোলে ক্রন্দনপরায়ণ শিশুপুত্র। তর্জ্জন-সহকারে বলিল, সামলাও বীরপুরুষ ছেলেকে, নাজেহাল ক'রে দিয়েছে। দোষ ঠাকুরপোর, ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে হাসপাতালে গেছে, আরও কোথায় কোথায় নিয়ে গিয়ে লড়াইয়ের সব

যন্ত্রপাতি, উড়োজাহাজ, গ্যাস-মুখোশ—এই সব দেখিয়েছে। ভাইপোর এখন শখ হয়েছে, সেপাই সেজে লড়াই করতে যাব, জাপানীদের মারব। পায়ে একটা ন্যাকড়া জড়িয়ে চোট-খাওয়া সেপাই হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অলক্ষণ ব'লে মা যেই সেটা কেড়ে নিয়েছেন, আর—

বলিলাম, তোমাদের কাণ্ডখানা কি গো! একটা তিন বছরের শিশু লড়াইয়ে যাবে ব'লে বায়না ধরেছে, মা, ঠাকুমা, বোন সবাই মিলে বাড়িতে ডাকাত-পড়া লাগিয়ে দিয়েছ! আমি মনে করি, বড় খোকাই বুঝিবা বন্দুক ঘাড়ে ক'রে যুদ্ধ করতে চলল। যাও, বাজে গোলমাল বন্ধ কর গিয়ে।

ছেলেটা আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য গলাটা নরম করিয়াছিল, কিন্তু সুরটা ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে প্রশ্ন করিলাম, বড় বীর হয়েছ, না? সেপাই সেজে লড়াইয়ে যেতে হবে?

কথাটা সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

উহার মাতাকে বলিলাম, নিয়ে যাও তোমার অভিমন্যুকে, আমায় বিরক্ত ক'রো না, একটা কাজ নিয়ে বসেছি।

বলিল, বলছি—দেখ একটু, কোনমতেই থাকবে না আমাদের কাছে, ঠাকুরপো ওর মাথায় যে কি খেয়াল সাধ করিয়ে দিয়েছে! নিজে তো বোমা মাথায় ক'রে পুরুদ্দম ক'রে বেড়াচ্ছে এ. আর. পি. নিয়ে, কে যে সামলায় ভাইপোকে, ছিষ্টির পাট প'ড়ে আছে।

বলিলাম, কমলীকে দাওগে, আমার এখন মরবার ফুরসৎ নেই, যাও।

•

উপরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে ছেলে সুর চড়াইল এবং মায়ের কাছে একটা চাপড় খাইয়া সেটাকে সপ্তমে ঠেলিয়া তুলিল; ধুয়া—নড়াই-করা ছেপাই হব, বোমা কখন ফাটবে?

রাগ চাপিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মনটা ক্রমেই অধিকতর উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, একটা সামান্য শিশু যে এর মূলে—এ জ্ঞানটুকুতে ফল হইতেছে না, মায়ের মতই সমস্ত যুগটার উপর মনটা বিষাইয়া উঠিতেছে, কলম এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কমলীর গলা শুনিতেছি, ছেলে ভোলাইবার সমস্ত কলা-ই ভাইয়ের উপর পরীক্ষা

করিতেছে বেচারী ; ভাইয়ের সেই এক কথা—লড়াই-করা ছেপাই হব, বোমা কোথায় ?

মা আরও চটিয়াছেন, একালের সঙ্গে আরও নানা রকম ব্যাপার টানিয়া আনিয়াছেন। ওর নিজের মাত্রাও ক্রমেই অধিকতর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহার মন্তব্যের মধ্যে ছেলের পিতার উল্লেখ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। বোনও এক-একবার বিরক্ত হইয়া ঝাঁঝিয়া উঠিতেছে। সকলের উপর ছেলের কণ্ঠস্বর, যেমন উৎকট তেমনই উচ্চ —সব মিলিয়া বাড়িটা একটা ছোটখাট কুরুক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কলম রাখিয়া দিলাম। হাঁকিলাম, কমলী, নিয়ে আয় হতভাগাকে, যুদ্ধের খানিকটা নমুনা ওকে দেখাই—অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে ! আনলি ?

মা চেঁচাইয়া উঠিলেন, খবরদার, এর ওপর মারধোর করবি না শৈল, ছেলে আবদেরে কাঁদুনিতে হাক্লান্ত হয়ে উঠে এমনই ভিরমি যাওয়ার দাখিল হয়েছে। আমায় যেতে দে, তারপর যা খুশি করিস, বলতে আসব না।

রাগিয়া বলিলাম, তা হ'লে কি করতে বল ? ঠাণ্ডা কথায় তো তোমরাও হার মেনেছ। বাড়িতে কাক-চিল বসতে দিচ্ছে না, এমন ক'রে কতক্ষণ—

উহার মাতা কমলীর নিকট হইতে ছেলেটাকে টানিয়া লইয়া এবার একেবারে নীচে নামিয়া আসিল, আমার পায়ের নিকট ধপ করিয়া বসাইয়া দিয়া চাপা ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, কেন, যত সব আদাড়ে গল্প লিখে লিখে দেশের তাবৎ বুড়োদের মন ভোলাচ্ছ, একটা শিশুকে ঠাণ্ডা করবার হদিস জান না ? না, তাতে যে গেরস্তর একটু উবগার হবে !

মেজাজের উপর এখতিয়ার ছিল না, একটা রাগারাগি করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ পায়ের কাছে ছেলেটার মুখের উপর দৃষ্টি পড়ায় নিজেকে সামলাইয়া লইলাম। উপর হইতে সহসা এই প্রায়ান্ধকার পাতালপুরীতে আসিয়া এবং বাপ-মায়ের উগ্র দৃষ্টির মাঝে পড়িয়া সে যেন কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গিয়াছে। কান্নাটা একেবারে থামিয়া গিয়াছে এবং অবরুদ্ধ কান্নার আবেগে মুখটা সিঁদুরবর্ণ হইয়া গিয়াছে ; উদ্গত

অশ্রুকে ঠেলিয়া রাখিবার জন্য এক-একবার ঢোঁক গিলিতেছে এবং এক প্রকার অসহায় আর্ত্ত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া আছে।

অবস্থাটা যেমন করুণ, তেমনই আশঙ্কাজনক। আমি উহার মাতাকে বলিলাম, আচ্ছা, যাও, সবার মুরোদ বোঝা গেল; একটা ছেলেকে ঠাণ্ডা করতে হবে, সেখানেও শর্ম্মা না হ'লে চলবে না।

উত্তর যাহা পাইলাম, তাহা এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর বলিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম না।

খোকার জননী চলিয়া গেলে উহাকে উঠাইয়া লইয়া নরম কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কাঁদছিলে কেন খোকা? কি হয়েছে? গপ্প শুনাব একটা?

খোকা একবার ভাল করিয়া ফোঁপাইয়া লইয়া রুদ্ধ দমটাকে মোচন করিল উত্তর করিল, হুঁ।

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া উৎসাহের সহিত বলিলাম, তা বেশ তো, শুনবি, এর জন্যে কান্না কেন? এমন সব বেয়াক্কেলে, খোকা গপ্প শুনবে, তাকে উলটে ধমকাচ্ছে! আয়, কোলে উঠে আয়।

খোকা উঠিয়া কোলে গুছাইয়া বসিল। আর কালক্ষেপ না করিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে আরম্ভ করিলাম।—

মস্ত এক তেপান্তরের মাঠ। তার এক ধারে প্রকাণ্ড এক অশথ-গাছ; কতদিন থেকে সে এক ভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বলতে পারে না। সেই আদ্যিকালের অশথগাছে—বুঝেছিস খোকা? এক থাকত ব্যাঙ্গমা আর এক থাকত ব্যাঙ্গমী। আহা, সব্বাই তো চায় আমাদের খোকার মত লক্ষ্মী একটি ছেলে হোক? কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে যায়, ছেলে আর তাদের হয় না। দুঃখে, মনের কষ্টে দুজনে একটা ডালের ওপর ব'সে হাপুস নয়নে কাঁদে—হাপুস নয়নে কাঁদে—হাপুস নয়নে—

খোকা মুখ নীচু করিয়া শুনিতেছিল, হঠাৎ যেন মনে হইল, চাপা ফোঁপানির আওয়াজ শুনিলাম। রচনা যে এত হৃদয়স্পর্শী করিয়া তুলিতে পারিয়াছি, ইহাতে পুলকিত হইয়া মাথাটা নামাইয়া বলিলাম, তুইও কাঁদছিস নাকি খোকা? কান্না কিসের? এক্ষুনি হবে ওদের ছেলে।

খোকার ঠোঁটটা কাঁপিয়া উঠিল, কান্নার ভাবটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিল, "যুড্ডুর গপ্প ছুনব, এলোপেলেনের।"

বুড়া বয়সের বাতিক, ওদিকে মা এখনও এযুগের কথা লইয়া গরগর করিতেছেন।

কতকটা রচনার অমর্য্যাদাজনিত নৈরাশ্যে, কতকটা এই এক্ ফোঁটা ছেলের বেয়াড়া জিদে খানিকক্ষণ বাক্‌স্ফূর্তি হইল না। ইচ্ছা হইল, ঘাড়টা ধরিয়া একটা আছাড় দিয়া এরোপ্লেনের খানিকটা আস্বাদ দিয়া দিই—নগদা-নগদি। নিজেকে অনেক কষ্টে সম্বৃত করিয়া লইলাম। একটু চিন্তা করিলাম, তাহার পর স্থির করিলাম, এমন উগ্র গল্পের অবতারণা করিব যে, আতঙ্ক মিটিতে কিছুটা দিন কাটিয়া যাইবে। বলিলাম, বেশ, এরোপ্লেনের গল্পই বলছি, এ আর এমন শক্ত কি? তবে শোন—বলিয়া স্বরটা যথাসম্ভব গুরুগম্ভীর এবং চক্ষু যথাসম্ভব আয়ত করিয়া আরম্ভ করিলাম।—

তুই তখন ঘুমুচ্ছিলি খোকা। হঠাৎ কড়কড় কড়কড় কড়াৎ! আকাশ যেন চৌচির হয়ে ফেটে গেল! সে যে কি ভয়ঙ্কর আওয়াজ, তোকে কি বলব! ধড়মড়িয়ে সবাই উঠে প'ড়ে পড়ি-তো-মরি করতে করতে করতে গেলাম ছুটে। ছাতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ! চড়কগাছ দেখিস নি তো কখনও? দেখাব একদিন, সেই আকাশ পর্যন্ত উঠে বনবন ক'রে ঘুরতে থাকে। ছাতে উঠে সবার চক্ষু চড়কগাছ! হবে না? একটা নয়, দুটো নয়, একেবারে পঞ্চাশখানা এরোপ্লেন আকাশে উঠে—

খোকা শোধরাইয়া দিল, একছোথানা।

কটু এবং গুরুপাক হইলেও ডেঁপোমিটা হজম করিয়া গেলাম। মনের রাগ মনে চাপিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্, একশোখানা এরোপ্লেনের আকাশে উঠে সে কি তর্জ্জন-গর্জ্জন আর ডানা-ঝাপটানি! এরোপ্লেনে এরোপ্লেনে সমস্ত আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল, আর তালগাছের মত বোমা সব আগুন ছড়াতে ছড়াতে দুমদাম ক'রে নীচে এসে পড়তে লাগল। যেখানটা পড়ছে, বুঝেছিস কিনা খোকা, ভেঙে-চুরে একাকার ক'রে দিচ্ছে! ওদিকে বোমা-ফাটার বিদকুটে শব্দ,

এদিকে দোতলা, তিনতলা, চারতলা বাড়ি পড়ার হুড়মুড়ুনি, ভয়ে আতঙ্কে আমরা তো—

খোকা গলাটা একটু দোলাইয়া নাকী সুরে অনুযোগ করিল, আমাদের বাড়ি পলল না ?

কি অলক্ষণে কথা কচি ছেলের মুখে! তবু, আর ঘাঁটাইলাম না, বলিলাম, না, আমাদের বাড়ি পড়বে কেন ? আমাদের বাড়ি খোকার মতন লক্ষ্মী ছেলে রয়েছে, ঠাকুর বাঁচিয়ে দিলেন।

খোকা তেমনই অনুযোগের স্বরে মন্তব্য করিল, ঠাকুর ডুট্টু।

প্রসঙ্গটা আর না বাড়াইয়া বলিলাম, তারপর কি হ'ল শোন খোকা। জাপানীরা যখন ওপরে খুব বাড়াবাড়ি লাগিয়েছে এই রকম, নীচে থেকে হাজারখানা এরোপ্লেন বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভঁইভঁই ক'রে ওপরে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের আরও এরোপ্লেন সব এসে পড়ল, এদেরও আরও হাজার হাজার এরোপ্লেন উঠল, ওদেরও আরও সব কোথা থেকে এসে জুটল, আরও এদের, আরও ওদের—এরোপ্লেনে এরোপ্লেনে আকাশে আর এত্তোটুকু জায়গা নেই! তারপরে বেধে গেল ভীষণ যুদ্ধ, সে যে কি ভীষণ তোকে কি বলব খোকা! হাজার হাজার বোমা ফাটছে, লাখো লাখো কামানের গোলা ছুটছে, ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন ডানা ভেঙে ওলটাতে পালটাতে, ওলটাতে পালটাতে কত বাড়ি ভেঙে, কত ঘোড়া, মোষ, মানুষ মেরে নীচে এসে পড়ছে, হাজার হাজার মানুষ ওপর থেকে ছিটকে যে কোথায় গিয়ে পড়ছে ঠিকানা নেই, কারুর মুণ্ডু উড়ে গেছে, কারুর পা নেই, কারুর হাতের একখানা কেটে বেরিয়ে গেছে, কারুর বুকের ওপরে গোলা লেগে হাড় পাঁজরা সব—

একবার আড়চোখে চাহিলাম, ঔৎসুক্যে ভরা কিন্তু ভয়লেশহীন দুইটি চক্ষু আমার মুখের ন্যস্ত করিয়া খোকা বসিয়া আছে, থামিতে সামান্য যে-একটু রসভঙ্গ হইল তাহাতেই খানিকটা অধৈর্য্যভাবে তাগাদা দিল, হুঁ, তালপল ?

বিরক্তিটা আর চাপিতে পারিলাম না। না হয় কান্নাটাই থামিয়াছে, কিন্তু এত ফলাও করিয়া গল্প বলিবার তো আমার আরও কিছু উদ্দেশ্য ছিল! আর, বিভীষিকা-সৃষ্টির আমার যতটুকু ক্ষমতা তাহারও চরমে

আসিয়া পড়িয়াছি, সবই জলে পড়িতেছে তো! ভয়ের সঞ্চার কোথায়? গল্পটা গুটাইয়া লইলাম, বলিলাম, তারপর আর কি? অত হুলুস্থুলের মধ্যে কি কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ তামাশা দেখতে পারে? আমরা তাড়াতাড়ি হুড়মুড়িয়ে নেমে এসে এই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। মাঝে মাঝে গুমগাম শব্দ শুনছি, আর ঠাকুরকে বলছি, ঠাকুর, আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে রাখ।

খোকা অপ্রসন্ন মুখে একটু চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, আল কাকা?

উদ্দেশ্যটা বুঝিলাম, এবং কোথায় একটু লজ্জাও অনুভব করিলাম। কাকা ওর আদর্শ, ওর হিরো, তাহাকে আমাদের দলে টানিয়া আর ওকে নিরাশ করিতে মন সরিল না। বলিলাম, না, কাকা তোমার এল না, সেও একখানা এরোপ্লেনে বন্দুক বোমা নিয়ে ওপরে উঠে গেল আর জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু ক'রে দিলে। এইবার তুমি একটু নাম দিকিন খোকা, আমায় কাজ করতে হবে। এক্কেবারে গোলমাল ক'রো না, শুনলে তো যুদ্ধুর ঘটাটা? ওরা আবার কাঁদুনে ছেলেদের বেশি ক'রে খুঁজছে, একটু কান্নার আওয়াজ পেয়েছে কি ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে সে—ই এক্কেবারে আকাশের ওপর—। যাও, নাম।

নিশ্চিন্তে নিরিবিলিতে লেখা লইয়া কয়েক ছত্র অগ্রসর হইয়াছি, আবার ফোঁপানি! ধৈর্য্য ধরিয়া আছি, ফোঁপানি স্পষ্টতর কান্নায় উঠিল। কলম রুখিয়া সংযত স্বরে প্রশ্ন করিলাম, কি হ'ল আবার?

কোন উত্তর নাই, কান্নাটা আর এক পর্দা উঠিল মাত্র। আর ধৈর্য্য ধরিয়া রাখা যায় না। চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িয়া লেখার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত অসংযত স্বরেই প্রশ্ন করিলাম, কি হ'ল শুনি, আবার কান্না কিসের?

কাকাল ছঙ্গে যুড্ডু করতে যাব।

গায়ে যেন আগুন ছড়াইয়া দিল; মনে হইল, সমস্ত শরীরটাকে বোমা করিয়া লইয়া এ ছেলের গায়ে ফাটিয়া পড়িতে পারি তো কতকটা রাগ মেটে। শান্ত কণ্ঠেই বললাম, কাকা যুদ্ধ করতে যায় নি, কেরোসিন তেল কিনতে গিয়ে কিউ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কণ্ঠস্বর আজও এক পর্দ্দা উঠিল, কাকা যুদ্ধ্ করতে গেছে।

আর রাগ চাপিতে পারিলাম না, চেয়ারটা একটু সরাইয়া লইয়া ঠাস ঠাস করিয়া কয়েকটা বেশ ওজনদুরস্ত চড় কষাইয়া দিয়া বলিলাম, ঘরেই যুদ্ধের সরঞ্জাম আছে, এই দেখ; আর বাইরে যেতে হবে না কষ্ট ক'রে।

খোকা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; গলা খা বাহির করিল তাহার তুলনায় পূর্ব্বের কান্না কোথায় পড়িয়া থাকে। মুখে ঐ এক বুলি, যুদ্ধ্ যাব। নড়াই-করা ছেপাই হব।

উহার মাতা ছুটিয়া আসিল। বলিল, পারলে না তো, আমি জানি, তোমার দ্বারা এটুকুও হবে না।

মেয়েও ছুটিয়া আসিল। তাহার কথাবার্ত্তা তাহার মায়ের মতই ব্যঙ্গপ্রবণ, শুধু শিক্ষার জন্য একটু মার্জ্জিত; দরজার নিকট আসিয়া বিস্মিত কণ্ঠে শান্তভাবে বলিল, ওগুলো তোমার থাপ্পড় ছিল বাবা? সর্ব্বরক্ষে! আমি ভাবলাম, বোমা ফাটল বুঝি! সত্যি, এখনও আমার বুক-ধড়ফড় করছে!

মা ছুটিয়া আসিলেন, তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, তুই দুধের বাছাকে ঐ রকম ক'রে মারলি? ককিয়ে গেছে যে!

বলিলাম, ও সেপাই হবে, যুদ্ধে যাবে! চুপ না করে তো আরও ঠ্যাঙাব, হয়েছে কি এখন?

মা ঝঙ্কার করিয়া উঠিলেন, যাবে যুদ্ধে, এমন নৃশংস বাপের কাছে থাকার চেয়ে সে লাখো গুণে ভাল। একটা কচি শিশু বায়না ধরেছে, তা—

খোকা চীৎকার করিয়া চলিয়াছে, আমি ছেপাই হব—কাকা গো!

মা তুলিতে যাইতেই এমন আছাড়ি-পাছাড়ি খাইয়া পড়িল যে, তিন-জনে হয়রান হইয়াও বাগ মানাইতে পারে না। সমস্ত শরীর রাঙা হইয়া উঠিয়াছে; ঘাম অশ্রুর সঙ্গে মেঝের ধূলা মিশিয়া হালকা কাদায় সর্ব্বাঙ্গ মলিন হইয়া গিয়াছে, এক এক জায়গায় কি করিয়া ছড়িয়া গিয়া রক্তের রেখা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, দারুণ চীৎকারে মুখে ফেনা উঠিতেছে, বুলি—আমি নড়াই-করা ছেপাই হব, বোমা কোথায়? কাকা গো!

তিনজনে ওদিকে একেবার নাকানি-চোবানি খাইয়া যাইতেছে। আমি আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে ঠাণ্ডা করিবার জন্য দুই-একবার অগ্রসর হইলাম, কিন্তু তিনজনের ব্যূহ ভেদ করিতে অসমর্থ হওয়ায় নিষ্ফল ক্রোধে ওর অনুপস্থিত কাকার উপর ঝাল ঝাড়িতেছি, এমন সময় সে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ. আর. পি.-র খাকীতে আপাদমস্তক মোড়া, হাতে কাগজে লেপটানো একটা বাণ্ডিল, তাহার মধ্যে খাকী কাপড়েরই আরও পোশাক-টোশাক কি আছে বলিয়া মনে হইল। ওর চলাফেরা আজকাল সামরিক কায়দায়—সর্ব্বত্র শোভা না পাইলেও বোধ হয় অভ্যাসের দোষে সামলাইতে পারে না। দুয়ারের কাছে জুতার গোড়ালিতে গোড়ালিতে ঠুকিয়া যুক্তপদে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, ব্যাপারখানা কি ?

ঝঙ্কার করিয়া বলিলাম, ব্যাপার অনেক। কি সব আজগুবি খেয়াল মাথায় সাঁধ করিয়ে ব'সে আছিস, না শোনে আদর, না মানে ভয়—সেপাই হব, বোমা কোথায় ? নিজে ধিঙ্গি হয়েছিস, কারুর বারণ না শুনে কোথায় বোমা ফাটবে, কার ঘর পুড়বে—এই সব নিয়ে রয়েছিস, ওকে সামলায় কে ? চারটে লোকে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে একটা ছেলের পেছনে।

মাও আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। ওর ভাজ কিছু বলিবার সুবিধা পাইল না, তবে ভাইঝি বলিল, কিন্তু তাহার মধ্যে কতটা কাকাকে তিরস্কার আর কতটা আমার অতি-সতর্কতা ও ভীরুতার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি তাহা নির্ণয় করা শক্ত। ওর কাকা অবিচলিত এ. আর. পি. পদ্ধতিতে খানিকটা শুনিল। আমাদের বকুনির জন্য চটিয়াছে, কি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কি খোকার উপর চাপা রাগে সংযতবাক্ হইয়া গিয়াছে কিছু বোঝা গেল না। গটগট করিয়া নামিয়া আসিয়া খোকার সামনে দাঁড়াইল, গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, কাঁদছিস কেন ?

খোকা হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। কাকার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বা যে কারণেই হউক, ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছে এবং বেশ বোঝা যায়, জোর করিয়া কান্নাটাকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। কাকার প্রশ্নে একবার মুখটা তুলিয়া তাহার পানে চাহিল এবং—নড়াই-করা ছেপাই হব, যুদ্ধু —বলিতে বলিতে আবার ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ওর কাকা সামরিক বা স্টেজের প্রথায় তর্জ্জনীটা উল্টা দিকে বাঁকাইয়া সেই রকম গম্ভীর ভাবেই বলিল, বেশ, চ'লে আয়।

আমরা সবাই থ হইয়া কাকা-ভাইপোর অভিনয় দেখিতেছিলাম। উহারা উপরে উঠিয়া গেলে মা শাসাইলেন, খবরদার, মারধোর করবি নি বলছি, বড় খোকা। তুই আবার ঐ পাঁশুটে রঙের ছাইভস্ম গায়ে দিয়ে অবধি বড় গোঁয়ার হয়ে পড়েছিস।

বড় খোকা ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, মারি কাটি যা খুশি হয় করব। তোমরা আর কথা ক'য়ো না, চারজন মিলে একটা কচি ছেলেকে এঁটে উঠতে পারলে না! খালি তুলোয় শুইয়ে 'ষেটের বাছা' 'ষষ্ঠীর দাস' ক'রে ক'রে একেবারে মাটি করতে বসেচ। একটু রক্ত দেখলে, কি একটু আঁচড় লাগলে—

আমি কতকটা আশঙ্কায় এবং কতকটা লজ্জায় ওরই তরফে হইয়া মাকে বলিলাম, ঠিক বলছে, যেমন ক'রে পারুক করুক শায়েস্তা।

ভগ্নী কতকটা ভয়ে কতকটা কৌতূহলে পিছু লইয়াছিল, কাকার ধমক খাইয়া থামিয়া গেল।

ভাইপোকে লইয়া বড় খোকা একেবারে তেতলার ছাদে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল; নীচে হইতে শব্দ লক্ষ্য করিয়া যতটা বোঝা গেল, তাহাতে মনে হইল, না, বেশ মোলায়েম ভাবে লইয়া যাইতেছে।

* * *

প্রায় আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার হইবে। খোকার কান্না নাই, কোন রকমই আওয়াজ নাই। বড় খোকার মেজাজ আজকাল যেমন রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, খোকাকে কোন অন্তরটিপুনি দিয়া থামাইয়া রাখিল কি না, চিন্তা করিতে করিতে লেখায় কখন অভিনিবিষ্ট হইয়া গিয়াছি,—ওরে সর্ব্বনাশ করেছে, খুন করেছে ছেলেটাকে হতভাগা!—বলিয়া মা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উপর দিকে চাহিয়া আমিও একেবারে শিহরিয়া উঠিলাম।

খোকার মাথায় খামচা খামচা টিংক্চার আয়োডিনে ভেজা মোটা পট্টি বাঁধা, কপালের ডান দিকের পট্টিটা ভিজাইয়া দিয়া একটু একটু রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। বাঁ হাতটায় আগাগোড়া একটা পট্টি এবং

মণিবন্ধে একটা ফাঁস লাগাইয়া হাতটা গলার সঙ্গে ঝোলানো—ভাঙিয়া গিয়াছে। নাকের ডান দিকটায় একটার উপর আর একটা আড়াআড়ি করিয়া ক্রশের আকারে ষ্টিকিং-প্ল্যাস্টার সাঁটা, ডান নাসারন্ধ্র দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। বীভৎস দৃশ্য একটা!

মা ছুটিয়া আসিতেছেন, ওরে, খুমখুন করেছে ছেলেটাকে হতভাগা, কান্নার আওয়াজও বেরুতে দেয় নি—কি খুনে গোঁয়ার!

খোকার মাতাও চায়ের সরঞ্জাম ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিতেছে, ও ঠাকুরপো, ও কি করলে! সাড় নেই যে ছেলের!

ওদিককার ঘর হইতে উহার ভগ্নীও হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

ততক্ষণে প্রথম ভয়ের ঝোঁকটা কাটিয়া গিয়া জখমীর নূতন খাকী শার্ট, খাকী হাফপ্যাণ্ট আর খাকী মোজার দিকে আমার নজর গিয়াছে; তাহার দাঁড়াইবার নির্ব্বিকার—বরং কতকটা দৃপ্ত ভঙ্গিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 'নড়াই-করা ছেপাই'-এর অর্থ বুঝায় মুখে হাসি ফুটিয়াছে আমার।

মা আসিয়া পড়িয়াছেন, ওর নিজের মা ও ভগ্নীও আসিয়াছে।

মার বুঝিতে বোধ হয় একটু দেরি হইল। বুঝিয়াই কিন্তু চেঁচাইয়া উঠিলেন, খোল, শিগগির খুলে দে বলছি। শখ! বাবাঃ, এখনও বুকের ধড়ফড়ানি ঘোচে নি। কাল উলটে গেল একেবারে! খোল বলছি বড় খোকা, কচ্ছেলের গায়ে অমন বেশ দেখতে নেই চোখে। ষাট! ষাট! আর ও বোম্বেটেও দাঁড়িয়ে আছে, কেমন দেখ না! সে কান্নাই বা কোথায় গেল!

উহারা উভয়েই ততক্ষণে বাহিরের দরজার দিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাকা প্রশ্ন করিল, কোন্ হাসপাতালে ভর্ত্তি হবি রে খোকা?

জখম সেপাই অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল, বলো হাচপাতালে।

দুই জোড়া জুতার দর্পিত মশমশানি বাহিরের রাস্তায় ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বোমার হিড়িক

সাইরেন বাজল রে
বাজল আবার!
আব্বার পড়ল বোমা—
গুদাম সাবাড়!
শোনা ছিল বোমা নাকি ওড়ার সহায়,
বোমা পড়লেই সব কোথা উড়ে যায়—
কিছু রহে কি?
বলব কি, হেথা যেই পড়ল বোমা,
উড়ে গেল কত কি যে, তাই তো ওমা!
মারা গেল যত তার ঢের গেল উড়ে—
তাই তো দেখি!
শুধু কি উড়েই গেল, গেল খোট্টাও,
গুজরাটী, মাড়োয়ারী—সবাই উধাও,
আত্মীয়-পরিজন—হরিজনরাও,
কাবুলীও ফাঁক।
ঘুম গেল উড়ে—সাথে লেপ বিছানা,
সিঁড়ির তলায় হ'ল বোটুকখানা,
মৌমাছি উড়ে গেল কোন্ ঠিকানা
ফেলে মৌচাক!
আবার বাজল বাঁশী—
বাজল আবার!
রাস্তায় রেষারেষি
ভিড় পালাবার!

নামল আকাশ থেকে
নামল আবার!
মিটে গেল শখ যত
ট্রাম পোড়াবার!
বেমক্কা হাতবোমা কোথেকে ভাই,
কার ঘাড়ে এসে পড়ে কিছু ঠিক নাই,
স্বদেশী কিনা!
আসল বোমার যেই আসল হিড়িক,
অমনি কি টের পেল নিজের নিরিখ,
তার চোটে তারাও কি উড়ে গেল ঠিক—
নোটিশ বিনা?
ট্রাম-ভাঙা থেমে গেল এটাই যা সুখ।
কলেরায় সারে যথা পেটের অসুখ,
গেঁটে বাত সেরে যায় পক্ষাঘাতে—
ঠিক সে রকম
উড়ে গেল আমাদের দিশী চুনকাম,
দোকান বাজার হাট উড়ল তামাম—
কোথায় যে উড়ে গেল কোন্ তফাতে
পড়তেই বম!
নামল আকাশ থেকে
সব ওড়াবার—
সন্দেশও নেই—লোক
'আবার খাবার'।

বৃথাই বাজল বাঁশী
বোমার বিলাস !
অমন চাঁদনী রাতে
ওই রাহু গ্রাস !
নামল স্বর্গ হতে নর্ত্তকী যে,
পথে পথে নেই তার গর্ত্ত কি হে
পদচিহ্নের ?
ঘর বাড়ি পথ ঘাট সব বেমালুম
ঠিকঠাক ! এরই নাম বোমার জুলুম ?
মাঝখান থেকে শুধু ভাঙল কি ঘুম ?
ভাঙল যে ঢের !
খাঁদা নাক আর দাদা বাধায় না ত্রাস,
জাপানী আমারে ভাই করেছে হতাশ !
নয় এ ঝঞ্ঝাবাত, 'মলয়' বাতাস—
অকথ্য বাত !
গুনগুন রবে অলি জুটবে কি ফের ?
কোথায় foolরা আছে পাবে সে কি টের ?
ওরা যদি ফেল করে—মোদের পাসের
খারাপ বরাত !
ফের কি বাজবে বাঁশী,
বাজবে আবার ?
স্বর্গে মর্ত্ত্যে খুব
হবে কারবার ?

শুধাও আমার কথা—
বলি কি রকম!
আমারো বোমার মজা
লেগেছে বিষম!
সাইরেন না বাজলে আসে নাকো ঘুম,
বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুম—দুম—দুম
শুনতে আরাম।
কাছাকাছি যেটা এত মিষ্টি শোনায়,
দূরে গেলে সেটা আরো বাড়ে রসনায়,
শুনবে বেজায় জোর ব'সে পাটনায়—
সেকি ধুমধাম!
যেমন ওদের ভাই মিষ্ট আওয়াজ,
তেমনি কি মোলায়েম তার কারুকাজ।
চোখে যা এলেম দেখে ঘুরে চারদিক—
সুবিধের নয়।
মজবুতমত ভাই একখানা ওর
যুতমত না পড়লে এই ঘাড়ে মোর
ষোলো আনা উপভোগ হচ্ছে না ঠিক—
অতি নিশ্চয়!
ফের কি কাঁদবে বাঁশী
ওঁয়াও-ওঁয়ায়—
আকাশের শিশু হবে
ভূমিষ্ঠ হায়?

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

সংবাদ-সাহিত্য

কিছুকাল পূর্ব্বে জাপানী বোমার আক্রমণের সম্ভাবনাতেই আমরা যেরূপ আতঙ্কিত হইয়াছিলাম এবং কলিকাতা শহরের অনেকে ঘর-বাড়ি-সম্পত্তি ব্যবসা-বাণিজ্য চাকুরি ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে যে ভাবে পলায়ন করিয়াছিল, গত এক বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে মানসিক শক্তি সঞ্চয়ের ফলে আসল আক্রমণের সময় আমরা ততটা আতঙ্কিত হই নাই ; গত ডিসেম্বর মাসের বড়দিন-সপ্তাহে এই ব্যাপারটাই আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণ করিয়াছিল। এই অবিচলতার আরও দুইটি কারণ থাকিতে পারে ; এক, যাতায়াতের অকথ্য হয়রানি ও অতিরিক্ত ব্যয় এবং মফস্বল বা প্রবাসবাসের সর্ব্ববিধ অসুবিধা সম্বন্ধে পলায়িতদের অভিজ্ঞতা ; এবং দুই, জাপানী বোমাকৃত ক্ষতির পরিমাণের সামান্যতা। তবে এই সঙ্গে ইহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, নানা কারণে সাধারণের মনে জাপানীদের ভারতীয়-প্রীতি সম্বন্ধে যে আশ্বাস ছিল, কলিকাতার কয়েকটি অতি নিরীহ অঞ্চলে বোমাপাতের ফলে সে আশ্বাস টলিয়াছে। এই ধরনের বিশ্বাসভঙ্গের পরেও যে লোকে কলিকাতায় টিকিয়া আছে, তাহাতে তাহাদের মানসিক দৃঢ়তাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ইহা শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সমাজের কথা। যাহাদের না হইলে এই সমাজের একদণ্ড চলে না, সেই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কিন্তু এই আক্রমণে বিশেষভাবে বিচলিত হইয়াছে। ফলে কানের আকর্ষণে মাথার মত মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় অটুট মানসিক স্বাস্থ্য সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছে না।

* * *

কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থা সংক্ষেপে ইহাই। তবে চাকর-ঠাকুর মুটে-মজুর মেথর-ধাঙ্গড় প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় মানুষের নিদারুণ অভাব সত্ত্বেও কলিকাতার লোকে আগামী পৌর্ণমাসীর দিকে কাতরভাবে চাহিয়া আছে, এই ফাঁড়াটা কাটিয়া গেলেই শহরের পূর্ব্বাবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসিবে মনে মনে

এই বিশ্বাস সকলে পোষণ করিতেছে; পলায়িতেরা ফিরিয়া আসিবে, বাজার-হাট পূর্ব্ববৎ বসিবে, শহরের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া কাটিয়া উঠিতে বিলম্ব হইবে না। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্ত্তন যদি না ঘটে, উর্দ্ধতন স্তরের সকল সাহস এবং ভরসা সত্ত্বেও কলিকাতাবাস কাহারও পক্ষে সুখকর এবং নিরাপদ—সুতরাং সম্ভব হইবে না।

* * *

এরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একটি বিষয়ে অবহিত হইবেন; সাধারণভাবে বাঙালী-সমাজের নিদারুণ অসহায়তার কথা তাঁহাদিগকে আতঙ্কিত করিবে। যাহারা পলাইয়াছে, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জিলার সামান্য কয়েক শত পাচক ও ভৃত্য ব্যতিরেকে তাহাদের অধিকাংশই ভিন্ন প্রদেশবাসী, বাংলার বাহিরের লোক। কলিকাতায় ছোটখাট ব্যবসা করিয়া খায় এমন বৈশ্যশ্রেণীয় লোকের শতকরা নব্বইজনই ভিন্ন প্রদেশের; বড় রাস্তার ফুটপাথে অথবা অলিগলিতে ভোর হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য, নয়ন-মনোহর মনিহারি দ্রব্য এবং কপি-আলু কেরোসিনতেল-কয়লা-ঘুঁটে প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সকল ফিরি করিয়া যাহারা শহরের বিপুল প্রাণশক্তিকে নিত্য চঞ্চল করিয়া রাখিত, তাহাদেরও অধিকাংশই অবাঙালী; ইহা ছাড়া প্রত্যেকটি বড় বড় বাঙালী প্রতিষ্ঠান, বড়লোকের বসতবাটী প্রভৃতিতে লাঠি-বন্দুক হাতে অথবা খালি হাতে গোঁফে চাড়া দিয়া যাহারা দ্বার রক্ষা করিত, সেই বীর পুরুষেরাও বাংলা দেশে প্রবাসী; মুটে-মজুররা ইলেক্‌ট্রিক ও জলের কলের মিস্ত্রীরা সকলেই তাই; ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইতে চোর-ডাকাতের নজর বাঁচাইয়া যাহারা প্রত্যহ ব্যাঙ্কে টাকা লইয়া যায় অথবা নিরাপদ স্থান হইতে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে টাকা লইয়া আসে, তাহারাও পশ্চিমের দোবে-চৌবে-সম্প্রদায়-ভুক্ত। ইহাদের অর্থোপার্জ্জনের লোভ যেমন, প্রাণের ভয় ততোধিক; আত্মীয়-পরিজন হইতে দূরে বাংলা মুল্লুকের এই একদা-সৌভাগ্যবান এবং অধুনা-অভিশপ্ত নগরীতে বেঘোরে মারা যাইতে ইহারা কেহই প্রস্তুত নহে বলিয়া এই বিরাট

শহরটি এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় নিরাশ্রয় এবং অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালীজাতি যে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে কতখানি দুর্ব্বল, তাহা এই আত্ম-বিস্মৃত সমাজকে বুঝাইবার জন্যই উক্ত মৃদু রকমের জাপানী বোমার আঘাত প্রয়োজন ছিল। রূপকথার দেশের মত একদিন প্রত্যূষে উঠিয়াই আমরা যেন দেখিতে পাইলাম, সকল সম্পদ সত্ত্বেও আমাদের গৃহদ্বার অবারিত, আমাদের ধনসম্পত্তি এবং কুলরমণীদের রক্ষা করিবার জন্য যাহারা নিযুক্ত ছিল তাহারা অত্যন্ত অসময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে; আমাদের আহার-বিহারের সকল ব্যবস্থা বিকল, অধরা উনানে হাঁড়ি চড়ে না, ধোপায় কাপড় কাচে না, নাপিতে দাঁড়ি চাঁছে না। ইহা অপেক্ষা একটা জাতির দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে!

যে আঘাতে আমাদের চৈতন্যোদয় হইল, তাহার আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই যদি প্রতিকার-ব্যবস্থাও করিতে পারি, তবেই আমরা বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইব; নচেৎ সকল শিক্ষা ও বুদ্ধির বালাই লইয়া অতি হীন অপমৃত্যু আমাদের অবধারিত। শহরে ভদ্রবেশধারী বাঙালী স্ত্রী ও পুরুষ ভিক্ষুকের অত্যাচারে আমরা প্রতিদিন পীড়িত হইতেছি, গ্রামে প্রত্যহ প্রাতে এবং মধ্যাহ্নে দলে দলে বুভুক্ষুরা প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া আমাদের দৈনন্দিন মুখের গ্রাসকে কটু করিয়া তুলিতেছে এবং শহরে মফস্বলে সর্ব্বত্র অতিদূর হইতে অতিনিকট বেকার আত্মীয়-পরিজনের অবাঞ্ছিত ভারে প্রত্যেক বাঙালী-গৃহস্থ ঘাড়মুড় ভাঙিয়া পড়িল বলিয়া; অথচ বাংলা দেশে চাকুরি দিলে লইবার লোক নাই। ভিক্ষায় যাহাদের সম্মানহানি হয় না, চাকুরি লইতে বলিলে তাহাদের অভিমান হয়। ফলে বাঙালী স্বগৃহে এবং স্বদেশে একান্তভাবে পরমুখাপেক্ষী এবং পরের হাতধরা হইতে বাধ্য হইয়াছে; ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা আজ বাঙালীর সদরে অন্দরে সর্ব্বত্রই বেতন লইয়া প্রভুত্ব করিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশীয় অভিজাত-সম্প্রদায়ের মত সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য অবস্থায়

আমরা যে আর দীর্ঘকাল চোখ রাঙাইয়া ঠাট বজায় রাখিতে পারিব না, এতদিনে তাহাই প্রমাণ হইতেছে।

* * *

এই কারণেই আমরা গত বারে সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সহিত মধ্যবিত্ত-সমাজের আত্মীয়তার প্রয়োজনের কথা তুলিয়াছিলাম। দূরে দূরে থাকিয়া আমাদের বাহ্য চটকের মোহে এই নিম্নশ্রেণীকে আমরা এমনই মোহান্ধ করিয়াছি যে, তাহারাই আপন আপন কর্তব্য ও সত্তা বিস্মৃত হইয়া বাবু হইয়া পড়িয়াছে, পদমর্য্যাদা ভুলিয়া নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারিয়াছে। এ পাপ আমাদের অর্থাৎ শিক্ষিত-সমাজের; উহার ফলভোগ আমরাও কম করিব না। সমস্ত জাতির নিম্নাঙ্গকে দুর্ব্বল করিয়া মিথ্যা স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্যের গৌরব মনে মনে পোষণ করিয়া আমরা আরব্য উপন্যাসের সমুদ্রতীরবর্ত্তী বৃদ্ধের মত যাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া ছিলাম, তাহারা যে অপরিমিত মূল্যের বিনিময়েও শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বহন করিবে না—এই জ্ঞান যখন আমাদের হইল, তখন আতঙ্কিত বিস্ময়ে অনুভব করিলাম যে, আমাদের নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবশ হইয়া পড়িয়াছে, পরের সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা চলৎশক্তিরহিত। এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত নিম্নসমাজকে যদি আমরা আবার বাঁচাইয়া তুলিতে পারি এবং তাহাদের সহিত আমাদের সম্পর্কের গৌরব, মিথ্যা স্তোকবাক্যে নয়, সত্য আত্মীয়তার দ্বারা তাহাদের মনে জাগ্রত করিতে পারি, তবেই আত্মনির্ভরশীল হইয়া আমরা বাঁচিতে পারিব।

* * *

নানা কারণে বাংলা দেশে তথাকথিত উচ্চ ও নীচ এই দুই আপাত-পৃথক্ সম্প্রদায়ের পরস্পর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রয়োজন হইয়াছে। যে সকল স্থলে ভিন্ন প্রদেশের কর্ম্মীরা আসিয়া ধীরে ধীরে বাঙালীর অর্থ-নৈতিক প্রচেষ্টাকে পঙ্গু করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যও অপহরণ করিতেছে, সেই সকল স্থল যাহাতে অবিলম্বে বাঙালী কর্ম্মীদের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে প্রত্যেক বাঙালীরই সে বিষয়ে চেষ্টিত হওয়া উচিত। আমরা হীন প্রাদেশিকতা প্রচার করিতে চাহিতেছি না, আত্মরক্ষার অধিকারটুকুমাত্র অর্জ্জন করিতে

চাহিতেছি। কাজ না করিয়া করিয়া কাজের অভ্যাস বাঙালী হারাইয়াছে। বেকার বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার এমনই অধোগতি হইয়াছে যে, গতর খাটাইয়া অন্ন সংস্থান করাতেই তাহার লজ্জা, ভিক্ষা-অন্নে বাঁচিতে লজ্জা নাই। নিম্ন-শ্রেণীকে শিক্ষিত ও উৎসাহিত করিয়া এবং বেকার আত্মীয়দের আশ্রয়হীন করিয়া বাংলা দেশের একান্ত প্রয়োজনীয় মুটে-মজুর পাচক-ভৃত্য ফিরিওয়ালা দারোয়ান প্রভৃতির কাজে বাঙালীকেই নিয়োগ করিতে হইবে। পৃথিবীব্যাপী যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দুই-এক বৎসরেই মিটিয়া যাইবে না, বোমার আক্রমণের ভয় আজ কাটিয়া গেলেও কালই আবার পূর্ণোদ্যমে সে আক্রমণ ঘটিতে পারে, বৎসর বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক ঋতুতে এরূপ ঘটাও অসম্ভব নয়। আর যাহারাই পারুক, বাঙালী স্বদেশ স্ব-সমাজ ছাড়িয়া পলাইতে পারিবে না; তাহার সর্ব্বস্ব যেখানে, সেখানে তাহাকে থাকতেই হইবে; এবং থাকিতে হইলে যাহারা তাহাকে ফেলিয়া পলাইবে না, তাহাদের লইয়াই থাকিতে হইবে। বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারখানা ঘর-গৃহস্থালী অচল করিয়া দিয়া অবাঙালীরা পলাইতে পারে, কিন্তু বাঙালীর হাতে এগুলির পরিচালনার ভার দিতে পারিলে সে আশঙ্কা নাই। দুই-দশ দিনের আতঙ্কে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলেও শেষ পর্য্যন্ত বাঙালী কর্ম্মীরা বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য। জাপানী বোমার আদিপর্ব্বের এই মহতী শিক্ষা যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তবেই মহাপ্রস্থানপর্ব্ব আসিতে বিলম্ব ঘটিবে।

—

বর্ত্তমান যুদ্ধ এবং বোমা প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন, সে বিষয়টি আরও vital, আরও সঙ্গিন, আমাদের প্রাত্যহিক উদরান্নের সংস্থান-সংক্রান্ত। এই সমস্যা যে কর্ত্তৃপক্ষের সম্যক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে না, তাহার প্রমাণ দৈনিক সংবাদপত্রেই মিলিবে। বাংলা দেশের সর্ব্বত্র খাদ্যাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে, প্রত্যেক জিলার প্রত্যেক মহকুমার প্রত্যেক শহরের এবং প্রত্যেক গ্রামের সংবাদে এই অন্ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবই মুখ্য বিষয়। চুরি ও ডাকাতির হিড়িকও প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে—এবং এগুলিও যে

খাদ্যাভাবের ফল, তাহাতে সংশয় নাই। মন্বন্তরের ঠিক পূর্ব্বাহ্ণে যেরূপ ঘটা উচিত, ঠিক সেরূপই ঘটিতেছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কোলাহল উঠিয়াছে আহার্য্য ও অপর প্রয়োজনীয় বস্তুর বিক্রয় এবং বণ্টনের অব্যবস্থায়। এই অব্যবস্থার জন্য প্রথমত দায়ী—যাঁহাদের হাতে দেশের শাসনভার আছে তাঁহারা। কিন্তু তাঁহারা আজ শত্রুর আক্রমণে নানা দিক দিয়া বিপন্ন। সাম্রাজ্য রক্ষার কাজে তাঁহারা একান্তভাবে ব্যস্ত, প্রজার প্রাণরক্ষা-বিষয়ে নজর তাঁহারা কষ্টে দিতে পারিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা এদেশীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হাতে এদেশীয়দের অন্নবস্ত্রসমস্যা সমাধানের ভার দিয়া ভগবান ও বিবেকের কাছে দোষমুক্ত আছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদিগকে দোষী করিলে চলিবে না, এবং মিথ্যা তাঁহাদিগকে গালি পাড়িয়া চীৎকার করিলেও কোনই প্রতিকার হইবে না।

* * *

সমস্যাটি একান্তভাবে আমাদের নিজস্ব, সুতরাং সমাধানের দায়িত্বও আমাদের। দেশে আহার্য্য যে পরিমাণ মজুত আছে, যে পরিমাণ উৎপন্ন হইতেছে এবং যে পরিমাণ আমদানি হইতেছে, তাহাই একুন করিয়া বণ্টন করিয়া লইলে সমস্যার কতকটা সমাধান হয়, কিন্তু ব্যবসায়ী মানুষের লোভ এই শ্মশানযাত্রাকালেও এমন বিকট হইয়া উঠিয়াছে যে, লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃতকল্প হইলেও তাহারা আহার্য্য দ্রব্য মজুদ করিয়া ভবিষ্যতে লক্ষপতি হইবার আশা ছাড়িতেছে না। যুদ্ধ-সংক্রান্ত কাজে যানবাহনাদির অত্যধিক ব্যবহারে আমদানির দিক দিয়া যে অসুবিধা, তাহা থাকিবেই। কিন্তু মজুদ ও উৎপন্ন দ্রব্যের যথাযথ বণ্টন হইলে সকলেই হয়তো একবেলা খাইতে পাইত; লক্ষ লক্ষ লোককে নিরম্বু উপবাসে রাখিয়া হাজার হাজার লোক রাজভোগ খাইতে পারিত না। এই মজুদের প্রবৃত্তি এমনই মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে যে, বাজার হইতে অখাদ্য রেজকিও অন্তর্দ্ধান হইয়া বহু মানুষের ঘরে ঘরে সঞ্চিত হইতেছে—লেনদেন কেনাবেচা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। শুনিতেছি, গবর্মেণ্টের লোক কণ্ট্রোলের ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু আমাদের স্বভাব এমনই হইয়া পড়িয়াছে যে, আমরা নিজের বাজার করিতে গিয়াও পয়সা চুরির

লোভ সামলাইতে পারি না। কণ্ট্রোলের মাল যাঁহারা পাইতেছেন, তাঁহারাও আমরাই। পঞ্চাশ মণ মাল বিক্রয়ার্থ পাইয়া দশ মণ আইনসঙ্গতভাবে বেচিয়া বাকি চল্লিশ মণ চোরাবাজারে দিয়া একদল চোরকে ধনী করিয়া তুলিতেছি, এমন ঘটনা প্রত্যহ প্রত্যেক পাড়ায় ঘটিতেছে। যাহারা ক্ষমতা পাইতেছে, তাহারাই চুরি করিতেছে। ফলে দিনের পর দিন সারবন্দী দাঁড়াইয়াও নিরীহ ক্রেতারা মাল পাইতেছে না; নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোককে মাল বেচিয়া প্রত্যহই বলিয়া দেওয়া হইতেছে, আজ আর নাই, কাল আসিও। সারবন্দী দাঁড়ানোর মধ্যেও চুরি আছে—আজ যাহারা মাল পাইল, কৌশলে কাল আবার তাহারাই মাল পাইতেছে, বহু ব্যক্তি এই ভাবে মাল কিনিয়া ব্যবসাও শুরু করিয়া দিতেছে। কিন্তু যাহারা ভদ্র, যাহারা শান্ত সংযত, তাহারা কোনও দিনই মালের মুখ দেখিতে পাইতেছে না। এক কলিকাতাতেই আমরা জানি, বহু পরিবার অনাহারে কাল কাটাইতেছে। ইহারা যে ভদ্র এবং শান্ত, তাহার প্রমাণ এখনও লুটপাট-রাহাজানিতে ইহাদের প্রবৃত্তি নাই। অন্য যে কোন শ্রেণীর লোক হইলে এরূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রক্তগঙ্গা বহিয়া যাইত।

* * *

গবর্মেণ্টকে দোষ দেওয়া বৃথা; নিজেদের চরিত্রবল ক্ষীণ হওয়াতে যে সকল অনাচার সমাজে প্রবেশ করিতেছে, তাহার ফল আমাদিগকেই ভোগ করিতে হইবে। চাল, কয়লা, আটা, নুন, চিনি ও কেরোসিন তেল সম্পর্কে সর্ব্বত্র অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ইহার প্রতিকার না হইলে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হইবে না। যুদ্ধ ও বোমার হাঙ্গামার মধ্যে যাহারা এখনও কলিকাতার মত শহরে দৃঢ়-চিত্ত আছেন, এই দ্রব্য বিক্রয় ও বণ্টনের অব্যবস্থায় তাঁহারাও যে বিচলিত হইতেছেন, এই কথাটাই কর্ত্তৃপক্ষের ভাবিবার বিষয়; বোমা প্রয়োগ না করিয়াও যে জাপানীরা তাহাদের মতলব হাসিল করিবে, যুদ্ধরত ইংরেজদের পক্ষে তাহা মোটেই কাম্য হইতে পারে না। যাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হইয়াছে, তাহারা যখন চরিত্রদোষে বিশ্বাসভঙ্গ করিতেছে, তখন অন্য পন্থা অবলম্বন করা উচিত। আমাদের প্রস্তাব এই যে, কলিকাতার প্রত্যেক পাড়ায় আহার্য্য দ্রব্য

বিক্রয় ও বণ্টনের কেন্দ্র খুলিয়া প্রত্যেক গৃহস্থকে লোকসংখ্যা ও প্রয়োজন অনুযায়ী টিকিট (ration card) দিয়া মালসংগ্রহে সাহায্য করা উচিত। টিকিট বণ্টনেই যা একটু বেগ পাইতে হইবে, কিন্তু একবার ইহা বিলি হইয়া গেলে এই টিকিট দেখাইয়া গৃহস্থের পক্ষে যে কোনও লোক মাল লইয়া আসিতে পারিবে। লোভী ব্যবসায়ীরা আর নিজেদের ইচ্ছামত মূল্যনিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে না। কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় এবং বাজারে বাজারে ঘোরাফেরা করা যাহাদের অভ্যাস আছে, তাঁহারাই এই অব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন; যাঁহারা দরজা বন্ধ করিয়া ঘরে থাকিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা আজ কল্পনা করিতেই পারিবেন না যে চারিদিকে ইন্ধন প্রস্তুত হইয়া আছে, যে কোনও স্ফুলিঙ্গস্পর্শে মহামারী কাণ্ড ঘটিয়া যাইতে পারে। মফস্বলের অবস্থা আরও খারাপ—সেখানে লোক-সংখ্যা কম, কিন্তু শৃঙ্খলা-রক্ষার লোক আরও কম। কয়েকজন লোভী দালালের লোভকে প্রশ্রয় দিয়া সমগ্র দেশে অশান্তি ডাকিয়া আনিতে কোনও রাজাই চাহেন না, আমাদের গবর্মেণ্টও চাহিবেন না।

বোমা এবং মালবণ্টন হইতে মনটা স্বতঃই বিশ্বব্যাপী অশান্তির পাপচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল; এই পৃথিবী তো বেশ ছিল, কোথা হইতে এই অশান্তির উদ্ভব হইল? সেদিন এক পাশ্চাত্য মনীষীর একখানি বই পড়িতেছিলাম—তিনি বলিতেছেন, মানুষ প্রগতির মূল্য দিতেছে। তিনি যত্নসহকারে দেখাইয়াছেন, এই প্রগতি ভুয়া, অন্তঃসারশূন্য। ইহা চটক মাত্র। ইহা স্থায়ী হইবে না, হইতে পারে না। মানুষের দুইটি আদিম প্রবৃত্তিই শেষ পর্য্যন্ত মানুষকে রক্ষা করিবে। সর্ব্বশেষে গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন—

"Our culture is superficial today, and our knowledge dangerous, because we are rich in mechanisms and poor in purposes. The balance of mind which once came of a warm religious faith is gone; science has taken from us the supernatural bases of our morality, and all the world seems consumed in a disorderly individualism that reflects the chaotic fragmentation of our character. We face again the problem that harassed Socrates: how shall we find a natural ethic to replace the supernatural sanctions that have ceased to influence the behavior of men? Without philosophy, without that total vision which unifies purposes and

establishes the hierarchy of desires, we fritter away our social heritage in cynical corruption on the one hand, and in revolutionary madness on the other; we abandon in a moment our pacific idealism and plunge into the cooperative suicide of war; we have a hundred thousand politicians, and but a single statesman. We move about the earth with unprecedented speed, but we do not know, and have not thought, where we are going, or whether we shall find any happiness there for our harassed souls. We are being destroyed by our knowledge, which has made us drunk with our power. And we shall not be saved without wisdom.*

পড়িয়া উত্তেজিত মনটা শান্ত হইল। নিজের দেশের প্রতি যে একটা অশ্রদ্ধা ও ধিক্কার আসিতেছিল, ধীরে ধীরে তাহা দূর হইল; কারণ অনুভব করিলাম, সমস্ত পৃথিবী এক অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্য দিয়া আবর্ত্তন করিতেছে। Wise men এবং wisdom-এর অভাবে পৃথিবীর নিরীহ জনসাধারণের পনরো আনা তিন পাইয়ের দুর্গতি ও লাঞ্ছনার আর অন্ত নাই। আমাদের বাংলা দেশে যেমন, পৃথিবীর অন্যত্রও তেমনই; এই সকল জ্ঞানী ব্যক্তির অভাব ঘটিয়াছে; মানুষকে অশান্তি এবং পাপের ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলিয়া মৃত্যুগহ্বরে ঠেলিয়া দিবার জন্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা উদ্যত হইয়া আছে, যে সত্য সহজ এবং কঠিন, সেই সত্যের সন্ধান দিবার লোক নাই।

* * *

আমার দুশ্চিন্তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া নবোদিত অরুণের মত দ্বারপথে গৃহিণী দর্শন দিলেন। কলিকাতায় বোমা পড়া ইস্তক তাঁহার দেমাক কিছু বাড়িয়াছে, তিনি বুকটা চেতাইয়া চলিতেছেন—ভাবখানা এই, দেখছ তো, ও জাপানী জুজুর ভয়ে তোমাদের মত আমি কাতর নই! তিনি তাঁহার সেই প্রাণঘাতী স্বভাবসুলভ ঠোঁট-বাঁকানো হাসি ও তির্য্যক দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া অত্যন্ত সহজভাবে একটি কঠিন সত্যের সন্ধান দিলেন, বলিলেন, খুব তো কলম পিষছ, এদিকে চাল বাড়ন্ত যে!

সর্ব্বনাশ! একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া অনুযোগ করিলাম, চাল নেই তো আগে বল নি কেন?

গৃহিণী একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া আমার লেখার দিকে অপাঙ্গে একটি

---

* ইহার বাংলা করিতে পারিলাম না, পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন।

দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন, ও আমার পোড়া কপাল! হেবো যে কুই থেকে ফিরে এসে অনর্থ করলে, পাড়ার লোক জড় হ'ল—তুমি ছিলে কোথায়?

গৃহিণী "কিউ"কে কুই বলেন। লেখার অজুহাত দিব কি না ভাবিতেছি, দেখি, তিনি নিজেই প্রসঙ্গটা তুলিলেন। বলিলেন, "এই না শুনছিলুম, সাদা কাগজ সোনার দরে বিকোচ্ছে, তা এই ছাইভস্ম লিখে সাদা কাগজগুলোর মাথা না খেয়ে এক তাল সোনাও তো কিনে রাখতে পারতে!

পারিতাম, সন্দেহ নাই কিন্তু বাস্তবিক বড় বালাই। নিতান্ত অপ্রস্তুতভাবে বলিলাম, আমি এক্ষুনি গোপালদার কাছ থেকে চাল নিয়ে আসছি।

কণ্ট্রোলের কল্যাণে এ. আর. পি. ও সিভিক গার্ডদের আর যাহারই অভাব থাকুক, চাল-চিনির অভাব নাই। দেখিলাম, গোপাল্দা-বউদি লক্ষ্মীর কৃপায় ভাঁড়ার-ঘরে অন্নপূর্ণার ঝাঁপি খুলিয়া বসিয়াছেন। গোপালদা বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়া কি লিখিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়াই উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, আরে এস ভায়া, তোমাকেই খুঁজছিলাম। এই দেখ, সকাল থেকে ব'সে ব'সে তোমাদের জন্যে "সংবাদ-সাহিত্য" লিখে ফেলেছি কটা। নশু বিশু এরা সব বলছিল, তোমরা ভারী সিরিয়াস হয়ে পড়েছ। অবিশ্যি দিনকাল যা এসে পড়েছে, তাতে গম্ভীর না হয়ে উপায় নেই, মুখ ভেংচিয়ে হাসতে গেলেই লোকে হৃদয়হীন বলবে। তবু খেয়াল গেল, আমি একটু চেষ্টা করেছি, দেখ, তোমাদের চলে কি না। ভাল কথা, তুমি কি মনে ক'রে এই সকালে?

চাউল-প্রসঙ্গ তুলিলাম এবং চকিতেই সমস্যার মীমংসা হইয়া গেল। গোপালদা অনুযোগ করিয়া বলিলেন, এখনও আমাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে যখন, তার সুযোগ নিতে ছাড়বে কেন? কয়েক মণ চাল আর এক বস্তা চিনি মজুদ ক'রে রাখ, দুঃসময় আসতে কতক্ষণ? গোপালদার চাকর চাল পৌঁছাইতে গেল, আমি তাঁহার "সংবাদ-সাহিত্য" লইয়া পড়িলাম। মন্দ লাগিল না। গোপালদা বলিলেন, তোমরা প্রসঙ্গের হেডিং দাও না, তাতে রসোপভোগের বড় ব্যাঘাত হয়। আমি হেডিং দিয়েছি। ওগুলো রেখো।

গোপালদা-লিখিত "সংবাদ-সাহিত্য" যথাযথ ছাপিতেছি।—

হ

সম্প্রতি ভারতবর্ষে "হ"য়ের বড় দুর্দ্দিন যাইতেছে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হীরালাল হালদার ও হরদয়াল নাগের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে "হ"য়ের বিপদ শুরু হইয়াছে। অবশ্য হাওয়াই এবং হনলুলু আমাদের প্রসঙ্গের মধ্যে পড়ে না; হেস ও হিটলারের যে দুর্গতি ঘটিতেছে, তাহা লইয়াও আমরা মাথা ঘামাইব না। আমরা আমাদের হালসিবাগান-দুর্ঘটনার ভয়াবহতায় বিমূঢ় হইয়াছি। তারপর এই সেদিন হাতিবাগান ও হরি ঘোষ ষ্ট্রীটের মুখে যে দুর্ঘটনার ঝড় বহিয়া গেল, তাহাতেই তো সমগ্র কলিকাতা শহর বিচলিত হইয়াছে। হায়াৎ খাঁ (সেকেন্দর) ও হাজি ওসমান (কলিকাতা করপোরেশন) "হ"য়ের কারসাজিতে অকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। হেণ্ডারসন সাহেবের মৃত্যুও শোচনীয়। হোমি (অমল) শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু মহাশয়ের "সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ" সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধের দুটি তথ্যের ভুল দেখাইতে গিয়া এমন গালাগালির ফেরে পড়িয়াছেন যে, 'অমৃতবাজার'-'আনন্দবাজারে'র ঐতিহাসিক বিবাদ সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি এরূপ কদর্য্যতা সাংবাদিক-জগতে আর ঘটে নাই। হালদারকে বিবাহ করিয়া একজন চলচ্চিত্র শিল্পীর শোচনীয় পরিণতি সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। "হ"য়েদের জন্য আমরা সত্য সত্যই চিন্তিত আছি।

বম্

জাপানী বিমান ব্যোমপথে আসিয়া কলিকাতা শহরের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া শহরবাসীকে বিমনা করিয়া দিয়াছে। বামনেরা চাঁদে হাত দিতে চায়, ইহাই আমরা জানিতাম; কিন্তু চাঁদের আলোর সাহায্যে তাহারা যে কাণ্ড করিল, তাহা তাহাদের বম্বেটেপনা হইতেও ভয়ঙ্কর; শুনিতেছি একটা বমারু নাকি বমাল ধরা পড়িয়াছে, সেটি বোম্বাই পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইবে। এদিকে বোমাভয়ে গৃহস্থ বামা-কুলের পলায়নে পাড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে বামী-বিমি নামধেয়া ঝি-কুলের প্রতাপ বাড়িয়াছে; ঠাকুর-বামুনেরা পলায়নপর হওয়াতে তাহারাই বামনাই করিতেছে। মহাকালরূপী বামদেবের তাণ্ডবে অনঙ্গ বামদেব বহুবিধ

অঘটন ঘটাইতেছেন, পথে ঘাটে বামাচারীরা বমি করিয়া নিরীহ পথচারীদের জুগুপ্সার উদ্রেক করিতেছে; লোহা ও কাঠের বুমের বাজারে টাকার যেন ব্যুমেরাং চলিয়াছে; শুধু কেসের অভাবে বীমাকোম্পানিগুলি সামান্য বিচলিত; আমরা জানি, লক্ষ্মী তাঁহাদের প্রতি বাম নন। এক দিকের লোকসান তাঁহারা অন্য দিকে পোষাইয়া লইতেছেন। অনেকে বাড়ি পোক্ত করিবার জন্য বীম পাল্টাইতেছেন। যাহারা আমাদের মত দরিদ্র ও নিরুপায়, তাহারা বম ভোলানাথ হইয়া বসিয়া আছে।

সাবধান

বোমার আতঙ্ককে অনেকে নানাভাবে কাজে লাগাইতেছেন; পাওনাদারেরা সাবধান হইবেন। যাঁহারা জীবনে হাওড়া পুল পার হন নাই, তাঁহারাও ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পশ্চিমে পাঠাইবার ওজুহাতে ইনকামট্যাক্স মামলার তারিখ লইতেছেন। বই ধার করিয়া যাঁহাদের লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা অভ্যাস, তাঁহারা লাইব্রেরি ও শেল্টার-রুমে ছুটাছুটি করিতে গিয়া অনেক ধার করা বইয়ের সন্ধান পাইতেছেন না। আমাদের সন্দেহ হইতেছে, এই সুযোগে মারাত্মক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের সহিত পরিচর্য্-সূচক চাকতি বদল করিয়া কেহ কেহ বীমা-কোম্পানিকে ফাঁসাইয়াও বসিবেন। শহরত্যাগী গৃহিণীদের সাবধান করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা করিব না; স্বজাতিদ্রোহের তুল্য পাপ নাই।

ছিন্নপত্র

একজন স্ত্রী চতুর্থ আক্রমণের পর কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীকে যে মর্ম্মস্পর্শী পত্র লিখিয়াছেন, তাহার শেষাংশ এই: "রান্নাঘরের কোণে একটি ছোট বালতিতে চাকি চাপা দেওয়া কয়েকটি সিঙ্গি ও কই মাছ আছে, ঝিকে সেগুলি রাঁধিয়া দিতে বলিবে; ভাঁড়ারঘর সর্ব্বদা তালাবন্ধ রাখিবে এবং রান্নাঘরের কালো আলমারিতে যে নুনের খোরা আছে সেটি ভাঁড়ার-ঘরে সরাইয়া দিবে। ঝিয়ের দিকে সর্ব্বদা নজর রাখিবে।" বলা বাহুল্য, স্বামী সহৃদয়া পত্নীর কথা মান্য করিয়াই চলিতেছেন।

রাজেশ্বর

বাংলার বীরবলের ঠুংরি-প্রতিনিধি 'ধূর্জ্জটিপ্রসাদ 'পরিচয়'-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে লিখিয়াছেন : "আমি যতটা তাকে জানি তাতে মনে হয় সে প্রগতি-বিরোধী···সুধীন মাত্র চায় বাঁচতে, একটু ভালভাবে বাঁচতে।··· সুধীনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিগত মূল্য ও অর্থের তরফ থেকে, এবং সমাজ যতটা বাধা দিচ্ছে সে ভাবে কিংবা যতটা সমর্থন দিতে পারে, ব'লে সে আশা করে ততটাই সে তার রচনায় সমাজের তোয়াক্কা রাখে।···সে মাত্র ভাবে ও লেখে, এবং ভেবে লেখে, এতে টাকাই ওড়ে, সাহিত্যিক হওয়া যায় না।"

বিশেষণটা অতিশয় লম্বা হইল, সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী নয়। আমরা তাই ধূর্জ্জটিপ্রসাদের বর্ণনা-অনুযায়ী এক কথায় সুধীন্দ্রনাথকে "রাজেশ্বর" উপাধি দিতে চাই। বর্দ্ধমানের ও নাটোরের রাজেশ্বররা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যাহা করিয়াছেন, ধূর্জ্জটিপ্রসাদের মতে সুধীন্দ্রনাথ তাহাই করিতেছেন। আশা করি, ইহাতে 'পরিচয়ে'র অন্যতম সম্পাদক হিরণকুমার সান্যাল ও লেখক অধ্যাপক সুশোভন সরকারের আপত্তি হইবে না।

বিনুর বিনয়

বিনু যখন খোকা ছিল তখন তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, খোকা, তোমরা ক ভাই? খোকা চটপট উত্তর দিয়াছিল, কেন, ছ ভাই। আমি, বড় পিসী, বাবা, ন্যাস্ত, পাঁচী আর হরিয়া। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত নাম দুইটি ঝি ও চাকরের। অর্থাৎ খোকা-বিনু কাহাকেও বাদ দেয় নাই।

সেই বিনু আজ বড় হইয়াছে, তাহার খোকা-অপবাদ আর নাই। তবে চটপটে সে তেমনই আছে। পি. ই. এন. নিখিল-ভারত কেন্দ্র হইতে বিনুকে বাংলা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিতে বলা হইয়াছিল; চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে বিনু *Bengali Literature* লিখিয়া হাজির হয়। এ এক অদ্ভুত কীর্ত্তি বিনুর! ঝানু-বিনুর কীর্ত্তি হইলেও ইহা হইতে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই বিখ্যাত উক্তিটিই প্রমাণিত হয়—শিশুই প্রমাণসই মানুষের জনক। খোকা-বিনুর সেই সর্ব্বগ্রাসী প্রতিভার পরিচয় এই বইটিতেও আছে;

বড় পিসী, বাবা, নান্তু, পাঁচী, হরিয়া কাহাকেও সে বাদ দেয় নাই, শুধু বিনয়বশত "আমি"কে বাদ দিয়াছে। বিনুর বিনয় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

আধুনিক কবিতা

দুই বন্ধুতে আধুনিক কবিতা লইয়া তর্ক হইয়াছিল। ক বলিয়াছিল, আধুনিক মনের সকল সমস্যার সমাধান পুরাতন কাব্যে নাই, প্রত্যহ আমাদের চারি পাশে যাহা ঘটিতেছে, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে নানা চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত হয় আধুনিক কাব্যে সেই চিন্তারই প্রকাশ-চেষ্টা দেখি। খ বলিল, থিয়োরিটা ভাল, কিন্তু প্র্যাকটিসে যাহা দেখিতেছি তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত, সামঞ্জস্যহীন কতকগুলা এলোমেলো কথার সমষ্টি কখনই সাহিত্য নয়; সুতরাং কাব্যও নয়। তর্ক শেষে বাজিতে দাঁড়াইল। ক বলিল, আধুনিক কবিতা বলিয়া যাহা ছাপা হয়, তাহাতে ছন্দমিলের কর্কশতা থাকিলেও কিছু বলিবার একটা ব্যাকুলতা আছে। খ বলিল, সম্পূর্ণ বাজে কথা, যে কোনও লোক উদ্ভট কতকগুলা শব্দ ও পংক্তি পর পর সাজাইয়া আধুনিক কবি হইতে পারে।

খ যে শেষ পর্য্যন্ত বাজি জিতিয়াছিল, তাহার প্রমাণ কার্ত্তিক সংখ্যা 'কবিতা'র (১৩৪৯) ৮৯-৯০ পৃষ্ঠায় আছে। খ-এর প্ররোচনায় মৈমনসিংহের শ্রীযুক্ত অমিতাভ সেন দুইটি আধুনিক কবিতা 'কবিতা'-সম্পাদককে পাঠাইয়াছিলেন; সম্পাদকের বিচারে ফক্কুড়ি দুইটি কবিতা-মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। একটি নিম্নে মুদ্রিত হইল—

ভিত্তি

(ধ্যানচাঁদ-কে)
আকাশের কোণগুলো ভেদ করে
অসহ্য আশ্চর্য ঝড়
ক্রমে এসে হল উপস্থিত।
আমি তাই চেখে দেখে—সন্ধ্যার মতন—বটের আঁধারে হয়ে চিত
জানালাম মৌরীর হাঁড়িকে :
"এই সব বাতাসের ধোঁয়া
ঘূর্ণি রচে নিয়ে মেঘ আর যত কাকের ঔরসে
(—মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্য যেন—)
শেষে যদি যায় তবু ফেঁসে ?"
নিরুত্তর হয়ে গেল প্রশান্ত প্রতিভা। কর্ণাটক-তীরে
মধুব্রতমদমত্ত পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমরকে ঘিরে
গুঞ্জরণ স্তব্ধ হয়ে এল। বিশিষ্ট প্রাসাদ

লীন হয়ে গেল পাকিস্থানে। সমুদ্রের শুক্তির শিখরে
নেমে এল ক্লান্ত ছিন্ন আশাহীন মৌন অবসাদ ॥

ক-খ-এর বাজির যাহাই হউক, এই কবিতাটি পাওয়া ইস্তক ধ্যানচাঁদ মাঠ ছাড়িয়া হকি-ষ্টিক হাতে দক্ষিণ-কলিকাতাব অলিতে-গলিতে "কাকের ঔরস" খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

প্রলাপ

মৃত্যুর মুখে অতি মনোহর পুষ্পশোভায় শোভিলে তুমি,
আমার সোনার শস্যশ্যামলা নদীমাতৃক জন্মভূমি!
চূর্ণ চূর্ণ হতেছে প্রাসাদ, নগর-তোরণ বিজনে কাঁদে,
রক্তে-মাংসে-ধূলি-ইষ্টকে ধ্বংস-দেবতা পড়েছে ফাঁদে—
লোহায় পাথরে শোণিত-বন্যা, বজ্রনিনাদ খেলিছে নভে;
মন ভেঙে যায়, তারি মাঝে হায়, তুমি মাতিয়াছ মহোৎসবে।
দুটি ছোট হাত বাড়ায়ে আমারে বুকেতে জড়ায়ে বলিলে, "শোনো,—"
আমি শুনিলাম—অনাদি কালের, ভবিষ্যতের বাণী কি কোনো?
ধরণীর ত্বকে মারি-গুটিকার চিহ্ন মিলাল শুভক্ষণে,
মির‍্যাকল-যুগ এখনো কাটে নি; মেরীপুত্রের নয়নকোণে
জমেছে অশ্রু, ধরণী-গাত্রে লাগিল সহসা পরশ তার,—
তোমার পরশে নিমেষে কাটিল আমার মনের অন্ধকার।
বিমান হইতে বোমা নাহি পড়ে, রজত-জ্যোৎস্না জমিছে চাঁদে,
প্রেমবন্যায় অতলে ডুবিয়া নগর-তোরণে বিরহী কাঁদে।
সমুখে মৃত্যু তারি মাঝখানে মনোহর বেশে শোভিলে তুমি,
আমার সোনার শস্যশ্যামলা নদীমাতৃক জন্মভূমি।

*　　　*　　　*

যুগ যুগ ধরি বসিয়া ছিলাম, তুমি আসিয়াছ এমন দিনে,
দোকান-পসরা বন্ধ হয়েছে, কে দিবে সিঁথির সিঁদুর কিনে!
আমার রক্ত তোমার রক্তে মিলিলে পাবে না প্রাণের সাড়া,
সন্ধ্যার হাসি যামিনীর শেষে নয়নে রচিবে অশ্রুধারা।
চরণ ছুঁইয়া হইবে বলিতে, "প্রিয়তম, তুমি করিও ক্ষমা,
মোর অধিকার পেলাম না আজ, মোর তরে থাক সকলি জমা।"

তবুও বলিবে, ধ্বংস-দেবতা এসেছে বিষাণ উচ্চে তুলি ?
কঙ্কাল সব দেখে কি শ্মশানে শুভদিনক্ষণ পাঁজিটি খুলি !
বজ্রপ্রহারে সকলি ভাঙিছে, লক্ষ্মণ, তব গণ্ডী আজো
অটুট রয়েছে—সোনার হরিণ এখনো মরে নি ; বীরেরা, সাজো।
দুটো ঘর আর একটা বাজার সাবাড় হয়েছে খবর এই,
লক্ষ লক্ষ নগরবাসীরা পালিয়ে বেঁচেছে পায়ে হেঁটেই।
চারিটি তোরণ খাঁ খাঁ করিতেছে, বাজে সাইরেন কান্না-ছাঁদে,
কাঁধে মাথা রেখে কাঁদো প্রিয়তমে, চিরবিরহিণী বাণী যে কাঁদে
মৃত্যুপুরীর দুয়ারে দুয়ারে—এই অসময়ে সহসা তুমি
রাজরাণী বেশে এলে মনোহরা আমার শ্যামলা জন্মভূমি।

* * *

জননীরে আজ প্রেয়সীর বেশে দেখিতেছি চোখে লেগেছে নেশা,
আমার বিরহে দেখি বিরহিণী কাঁদে সাদা ফুলে শুভ্রবেশা।
পরাধীনতার জন্ম দিব না, তাই হোক মাতা, সেই তো ভালো।
এই ব্ল্যাক-আউট কেটে যাক, পুন তোমার ললাটে লাগুক আলো
আমি থাকিব না, তুমি চিরদিন বহন করিও স্বাধীনা বাণী—
নব ধমনীতে নূতন রক্তে নবীন প্রেমিকে জন্ম দানি।
তুমি সেজে থাকো চিরমনোহরা, মোর শবদেহ ধূলায় মিশে
তব জয়গান গাহিয়া বেড়াক, নহিলে তাহার তৃপ্তি কিসে!
বুকে তুমি মোরে দিয়েছ যে ঠাঁই, নিলে না মাটির অন্ধকারে
মোর বেদনার চেতনার কণা, কাঁদে জীবনের তোরণ-দ্বারে
মানুষের প্রাণ, হায় রে মানুষ—রক্তে-মাংসে গঠিত মায়া,
ছিঁড়ে ভেঙে গেলে ধূলায় গড়ায়, চাঁদের আলোকে ছিন্নকায়া!
থাক থাক প্রিয়ে, কুঞ্চিতকেশ মাথাখানি রাখো আমার কাঁধে।
সাইরেন আজ কাঁদিবে কি রাতে ? পরশ খুঁজিয়া চিত্ত কাঁদে।
এত কাল গেল, মৃত্যুর মুখে জ্যোৎস্নাধারায় শোভিলে তুমি—
সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা আমার সোনার জন্মভূমি।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৯

তিমি

আধুনিক প্রাণীদের মধ্যে তিমি সবচেয়ে বড়। এই জন্তুটি মহাকায়, কিন্তু সাধারণত ক্ষুদ্রভোজী, ছোট ছোট মাছ শামুক ইত্যাদি খেয়েই জীবনধারণ করে। পুরাণে আর একরকম জলজন্তুর উল্লেখ আছে—তিমিংগিল, যারা এত বড় যে তিমিকে গিলে খায়। পৌরাণিক কল্পনা এখানেই নিরস্ত হয় নি, তিমিংগিলেরও ভক্ষক আছে, যার নাম তিমিংগিলগিল। তভোধিক গিলগিলান্ত-নামধারী জন্তুরও উল্লেখ আছে। পুরাণকর্তাদের প্রাণিবৃত্তান্ত যতই অদ্ভুত হ'ক তাঁরা মাৎস্য ন্যায় বা power politics বুঝতেন।

জন্তুর মধ্যে যেমন তিমি, দেশের মধ্যে তেমন আফ্রিকা, ভারত, চীন, ইণ্ডোচীন প্রভৃতি। এসব দেশ আকারে বৃহৎ, কিন্তু ক্ষুদ্রভোজী, অর্থাৎ অল্পে তুষ্ট। এদের অল্পাধিক পরিমাণে কবলিত ক'রে যারা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে তারা তিমিংগিল জাতীয়, যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, হলাণ্ড, ইটালি, জাপান। এইরকম পরদেশগ্রাস বহু যুগ থেকে চ'লে আসছে, অবশ্য কালক্রমে গ্রস্ত আর গ্রাসকের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেকালের তিমিংগিলরা সরলস্বভাব ছিল, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে গিলত, কোনও সাধু সংকল্পের দোহাই দিত না। রোমান, হুন, তুর্ক, পাঠান, মোগল প্রভৃতি বিজেতারা এই প্রকৃতির। এই গ্রসননীতি প্রাচীন ভারতেও কিছু কিছু ছিল, শরৎকাল পড়লেই পরাক্রান্ত রাজারা খামকা দিগ্‌বিজয়ে বার হতেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের দৌড় ছিল সংকীর্ণ, আশেপাশের গোটাকতক রাজ্য করায়ত্ত ক'রেই নিজেকে সসাগরা ধরার অধীশ্বর ঘোষণা করতেন।

আধুনিক তিমিংগিলদের চক্ষুলজ্জা আছে, তারা স্বজাতির সমালোচনাকে কিঞ্চিৎ ভয় করে। তাই শ্বেতজাতির বোঝা, সভ্যতার বিস্তার, অনুন্নত দেশের উন্নতি, শান্তি ও সুনিয়ম প্রভৃতি বড় বড় কথা শোনা যায়। এইসব নীতিবাক্যে তিমিংগিলদের আত্মপ্রসাদ বজায় থাকে, তাদের মধ্যে যারা একটু সন্দিগ্ধ তারাও বেশী আপত্তি তুলতে পারে না। এই ধর্মধ্বজী তিমিংগিল সম্প্রদায়ের আধিপত্য এতদিন অবাধে চলছিল, কিন্তু সম্প্রতি একশ্রেণীর নবতর জীব গোলযোগ বাধিয়েছে, এরা তিমিংগিলগিল, যথা জার্মানি ও জাপান। এরা ভাবে—পৃথিবীতে যত তিমি আছে সবই তো তিমিংগিলদের কবলে, আমরা খাব কি? অতএব প্রচণ্ড মুখব্যাদান ক'রে তিমিংগিলদেরই গ্রাস করতে হবে। তাতে প্রথমটা যতই কষ্ট হ'ক, অবশেষে যা পাওয়া যাবে তা একবারে তৈরী সাম্রাজ্য, অন্যের চর্বিত খাদ্যের পুনশ্চর্বণ দরকার হবে না, মুখে পুরলেই পুষ্টিলাভ হবে। জার্মানি চায় সমস্ত ইওরোপ, জাপান চায় সমস্ত পূর্ব এশিয়া — পশ্চিম এশিয়া কার ভক্ষ্য হবে তা এখনও নির্ধারিত হয় নি। অবশ্য এর পর দুই গিলগিলের মধ্যেও বিবাদ বাধতে পারে। বিজয়ী জার্মানি যদি ফ্রান্স আর হলাণ্ড কবলস্থ ক'রেই রাখে তবে এই দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ইণ্ডোচীন জাভা প্রভৃতি জাপানকে খোশমেজাজে ছেড়ে দেবে না। যদি এশিয়ার ঐশ্বর্য না মেলে তবে জার্মানির পক্ষে এমন মরণপণ যুদ্ধের সার্থকতা কি? বোধ হয় জার্মানি মনে করে যে ব্রিটেন আর আমেরিকাকে জব্দ করার পর জাপানকে সাবাড় করা অতি সহজ কাজ। সম্প্রতি একজন ব্রিটিশ জাঁদরেল বলেছেন জাপানীরা বানর মাত্র। জার্মানিও মনে মনে তাই বলে। অবশেষে হয়তো কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ উৎপাটিত হবে। ইটালি বেচারা উভয়সংকটে পড়েছে। সেও গিলগিল হ'তে চেয়েছিল, কিন্তু এখন তার

গিলন্তও যেতে বসেছে। জার্মনি যদি জেতে আর দুই একটা হাড় দয়া ক'রে দেয় তবেই ইটালির মুখরক্ষা হবে।

তিমিংগিলগিলদের চক্ষুলজ্জা নেই, কিন্তু তাদের ব্রত আরও মহৎ। জার্মনি বলে — সমগ্র পৃথিবী অতিমানব আর্যজাতির (অর্থাৎ তার নিজের) শাসনে আসবে এই হচ্ছে বিধাতার বিধান। জাপান একটু মোলায়েম ক'রে বলে — হে এশিয়ার নির্যাতিত জাতিবৃন্দ, আমাদের পতাকাতলে এসে আমাদের সঙ্গে সমান সমৃদ্ধি লাভ কর।

মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রনেতাদের যুদ্ধোত্তর সংকল্প কি তা স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত হয় নি। ভারতবর্ষে আমেরিকার কোনও প্রত্যক্ষ স্বার্থ নেই। এ দেশের সংবাদপত্রে আমেরিকান প্রেসিডেণ্টের যে বাণী ঘোষিত হচ্ছে তাতে চতুর্বিধ আশ্বাস আছে — বাক্য ও ধর্মের স্বাধীনতা, অভাব ও ভয় থেকে মুক্তি। কিন্তু যে স্বাধীনতা সকলের মূল তার উল্লেখ নেই। অস্পষ্ট উক্তির একটা কারণ — সংকল্পই স্থির হয় নি। আর একটা কারণ — এই সংকটকালে নিজের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করলে বন্ধুবর্গ চটতে পারে অথবা পরাধীন প্রজারা চঞ্চল হ'তে পারে। তথাপি ব্রিটেন আর আমেরিকার দুচারজন উচ্চাদর্শবাদী মাঝে মাঝে উদার কথা ব'লে ফেলছেন, যথা — কোনও দেশ পরাধীন থাকবে না, স্বভাবজাত সম্পদে কোনও রাষ্ট্রের একচেটে অধিকার থাকবে না, সমগ্র মানবজাতির হিতসাধনই একমাত্র লক্ষ্য, জাপানী সহসমৃদ্ধি নয়, সার্বজাতিক সহসমৃদ্ধি।

উত্তম সংকল্প। কিন্তু জগতে ধর্মরাজ্যস্থাপনের ভার যাঁরা নেবেন তাঁদের কার্যক্রম কি? অপ্রতিহত ক্ষমতা হাতে পেলে তাঁদের মতিগতি কি হবে বলা যায় না। ধরা যাক তাঁরা নিষ্কাম, সমদর্শী, সর্বলোকহিতৈষী। তথাপি মানুষের বর্তমান অভিজ্ঞতা আর সাধারণ বুদ্ধির বশেই তাঁরা চলবেন এবং ভুলও করবেন। তাঁদের পন্থা কল্পনা ক'রে দেখা যেতে পারে।

তাঁদের প্রথম করণীয় হবে — পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে নিজের সুবুদ্ধি দান করা। সম্রাট্ অশোক সীরিয়া ইজিপ্ট গ্রীস প্রভৃতি দেশের হিতার্থে

ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। এই প্রচারের অন্তরালে কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না, অশোকের দূতরা বিদেশে রাজ্যস্থাপন করে নি, নিগৃহীতও হয় নি। অনেক ইওরোপীয় রাষ্ট্র থেকেও পররাজ্যে প্রচারক গেছে, কিন্তু বহু স্থলে পরিণাম অন্যরকম হয়েছে। 'Germany acquired the province of Shantung in China by having the good fortune to have two missionaries murdered there.' (Bertrand Russel)। অশোক শুধু ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করেছিলেন সেজন্য বাধা পান নি। কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্রসংস্কারকদের উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের আর্থিক ও রাজনীতিক উন্নতিসাধন, সুতরাং স্বার্থের সংঘাত হবে এবং বাধা ঘটবে। সদুপদেশ বা propagandaই প্রকৃষ্ট পন্থা, কিন্তু যেখানে তা খাটবে না সেখানে প্রহারই সনাতন উপায়, কারণ লোকের মত-পরিবর্তনের জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করা চলবে না। প্রহার অবশ্য নিষ্কামভাবে সর্বজনহিতার্থে দেওয়া হবে, যেমন বাপ দুষ্ট ছেলেকে দেয়। তার পর কি হবে তা রাজনীতিক নেতাদের আধুনিক উক্তি থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে, যথা—দুরন্ত জাতির সংযমন, নাবালক জাতির শিক্ষক ও রক্ষক নিয়োগ, জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধোপকরণের সংকোচ, প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য বিভাগ, নূতন আর্থনীতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি।

সব দেশ সমান নয়, সব মানুষও সমান নয়। এই অসামঞ্জস্য দূর করার উপায় — সর্বদেশের ঐশ্বর্য সর্বমানবের ভোগযোগ্য করা এবং সর্বজাতিকে সমান শিক্ষিত করা। কিন্তু প্রথম উপায়টি সাধ্য হ'লেও দ্বিতীয়টি সহজ নয়। সকলের জ্ঞানার্জনক্ষমতা সমান না হ'তে পারে, ক্ষমতা সমান হ'লেও শিক্ষাকালের বিলক্ষণ তারতম্য হ'তে পারে। কোনও ধনী ব্যক্তির যদি পাঁচটি ছেলে থাকে তবে সমান সুযোগ পেলেও সকলে সমান কৃতী হয় না। বাপ যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন অপক্ষপাতে সকলকে সুখে রাখতে পারেন, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে অকৃতীরা কষ্ট পায়। অতএব বাপের বেঁচে থাকা দরকার। কিন্তু সমস্ত মানবজাতির পিতৃস্থানীয় কে হবে? যাঁরা সংস্কার আরম্ভ করবেন তাঁরা চিরকাল বাঁচবেন না, কোনও দলের দীর্ঘপ্রভুত্বও লোকে সইবে না। মনু প্রজাপতি, রাজচক্রবর্তী, ডিক্‌টেটার, অ্যারিস্টোক্রাসি, অলিগার্কি

প্রভৃতি সমস্তই এখন অচল। ডিমোক্রাসির উপর এখনও সাধারণের আস্থা আছে, কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে জনকতক স্বার্থপর ধূর্ত লোকেই সকল দেশের রাষ্ট্রসভায় প্রবল হয়। এই দোষের প্রতিকার হবে যদি নির্বাচকমণ্ডল (অর্থাৎ জগতের বহুলোক) সাধু ও জ্ঞানবান্ হয়। শিক্ষার প্রসার হ'লে জ্ঞান বাড়বে, কিন্তু সাধুতা? এইখানেই প্রবল বাধা।

সম্প্রতি Geoffrey Bourne একটি বই লিখেছেন—'Return to Reason'। এই বহুপ্রশংসিত বইটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে — ডাক্তার উকিল প্রভৃতির মতন পার্লিমেণ্টের সদস্যকেও আগে উপযুক্ত শিক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে, শুধু বাগ্মী আর দলবিশেষের প্রতিনিধি হ'লে চলবে না। কিন্তু কেবল বিদ্যাশিক্ষার সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি দূর হয় না, সাধুতাও আসে না।

সংঘবদ্ধ চেষ্টায় এবং বিজ্ঞানবলে বহু দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে, সভ্যতা বেড়েছে, রোগ কমেছে। কিন্তু এসবের তুলনায় মানুষের চারিত্রিক উন্নতি যা হয়েছে তা নগণ্য। যেটুকু হয়েছে তা প্রাকৃতিক নিয়মে মন্থর অভিব্যক্তির ফলে, এবং পুণ্যাত্মা, কবি ও সাহিত্যিকদের প্রভাবে, রাষ্ট্রের বা বিজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রিত চেষ্টায় হয় নি। বিজ্ঞানের প্রেরণা এসেছে মুখ্যত মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল থেকে এবং গৌণত ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা থেকে। অথচ যে স্বার্থ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক তা বিজ্ঞান কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েছে। চরিত্রতত্ত্ব বিজ্ঞানের বহির্ভূত নয়। ব্যক্তির চরিত্র শোধিত না হ'লে সমষ্টির পরম স্বার্থজ্ঞান আসবে না, নিষ্কলুষ প্রজাতন্ত্র তথা বিশ্বরাষ্ট্রব্যবস্থাও হবে না। সাম্রাজ্যবাদীরা মাঝে মাঝে enlightened self-interest এর কথা বলেন, তার মানে — অধীন প্রজাকে বেশী শোষণ না ক'রে এবং প্রতিপক্ষকে লাভের কিছু অংশ দিয়ে সুদীর্ঘকাল নিজের স্বার্থ বজায় রাখা। এরকম ক্ষুদ্র কুটিল নীতিতে জাতিবিরোধ দূর হয় না। সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলামঙ্গল এক সঙ্গে জড়িত—এই উজ্জ্বল স্বার্থবুদ্ধির প্রসার না হ'লে সব ব্যবস্থাই পণ্ড হবে।

২৬-১-৪৩ রাজশেখর বসু

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস

তৃতীয় পাঠ

১

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশাল গ্রন্থ সম্বন্ধে যেভাবে যে আলোচনা করিতেছি, তাহা যে কত বিপদসঙ্কুল, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিপদ একরূপ নয়—গ্রন্থখানিতে যে পরিশ্রম অধ্যাপক মহাশয় করিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর; তাহার উপর ইহাতে যে গবেষণা, পাণ্ডিত্য, বিচার ও রস-বিশ্লেষণ আছে, তাহা বুঝিতে হইলে যেমন বিদ্যা তেমনই মস্তিষ্ক-শক্তির প্রয়োজন—তেমন বিদ্যা আমার কেন—বাংলা সাহিত্য লইয়াই যাঁহারা কারবার করেন তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই আছে। ইহার উপরেও আবার দুইটি বড় বাধা আছে,—প্রথম, অধ্যাপক মহাশয় পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ দুই পক্ষেরই মান রাখিয়া এমন ধীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন যে, প্রায় কোন কথাই তিনি বলিতে বাকি রাখেন নাই, সকল যুক্তি, সকল আপত্তিই এমনভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, কোন একটি দিক ধরিয়া তাঁহাকে জবাবদিহি করা বড়ই দুরূহ হইয়া পড়ে; পণ্ডিত মানুষ—জানেন সবই, তাঁহাকে কিছুই স্মরণ করাইবার বা জানাইবার নাই; কিন্তু বিপদ হইয়াছে এই যে, সেই সর্ব্ববিধ তথ্য ও তত্ত্বের দুই পক্ষীয় দুই পার্শ্ববর্ত্তী ঘনসন্নিবিষ্ট বীথির মধ্য দিয়া চলিবার সময়ে দুই দিকই এমন সমভাবে পাঠকের সামান্য বুদ্ধিটুকুকে আকর্ষণ করিতে থাকে যে একবার এদিক ও আরবার ওদিক চাহিয়া পদে পদে দিক্‌ভ্রম হয়, কলিকাতার চাঁদনীর বাজারে প্রবেশ করিলে গ্রামবাসী ক্রেতার যেমন হইয়া থাকে। উপন্যাসের ধারা এবং বঙ্গসাহিত্যে তাহার উৎপত্তি, বিকাশ ও উৎকর্ষের বিবরণ পড়িতেছি; পড়িবার সময়—উপন্যাস কাহাকে বলে; রোমান্স কি; ঐতিহাসিক উপন্যাস কোন্ পদার্থ; ইতিহাস ও রোমান্স; রোমান্স ও উপন্যাস; উপন্যাস ও আধুনিক উপন্যাস; সামাজিক উপন্যাস এবং উপন্যাস; ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং উপন্যাস; উপন্যাসে বাস্তবতা ও আদর্শবাদ; ঐতিহাসিক উপন্যাসে

কল্পনার বা রোমান্সের আতিশয্য ও সত্যনিষ্ঠা; মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা;—এ সকলই এমন ওতপ্রোতভাবে ধারাটিকে তরঙ্গভঙ্গিম করিয়া তোলে যে, শেষ পর্য্যন্ত উপন্যাস বস্তুটি যে কি, তাহার দুরধিগম্য আদর্শ যে কেমন ভাবে কি প্রকার রচনায় রক্ষিত হইতে পারে, বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের বাজারে ঢুকিয়া সে বিষয়ে সকল জ্ঞানই হারাইতে হয়, এবং এত বিচার ও বিশ্লেষণের শেষে কেবল ইহাই ধারণা হয় যে, একই উপন্যাস এক হিসাবে যেমন উৎকৃষ্ট, আর এক হিসাবে তেমনই অপকৃষ্ট—এক দিকে যাহার কোন যথার্থ গুণ নাই, আর এক দিকে তাহা সেই সকল গুণের অভাব সত্ত্বেও পরমোৎকৃষ্ট। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস যেমন এক হিসাবে বঙ্কিমের উপন্যাস হইতে শ্রেষ্ঠ, তেমনই অপর হিসাবে বঙ্কিম রমেশচন্দ্র অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কোনও উপন্যাস অবাস্তবতা-দোষে অতিশয় নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু কল্পনার ঐশ্বর্য্যে তাহা পরম উপাদেয়; ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার অভাবে যেমন কোন উপন্যাস ঐতিহাসিক হইতে পারে নাই, তেমনই আর এক কারণে তাহার সেই সত্যনিষ্ঠার অভাব দূর হইয়াছে—ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব অথবা বিরোধ থাকিলেও কল্পনাটা ঐতিহাসিক বটে, Historical conscience ঠিক আছে; অতএব, তাহা খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে পারিল না বটে, এমন কি, সে হিসাবে একেবারে মাটি হইয়াছে বলা যাইতেও পারে—কিন্তু তথাপি কি সুন্দর, কি চমৎকার তাহার ঐতিহাসিক কল্পনা! রোমান্সই হউক আর ঐতিহাসিক উপন্যাসই হউক—আদর্শবাদ বা মহাকাব্য গীতিকাব্যের মত কবিত্ব তাহার পক্ষে অতিশয় মারাত্মক, কারণ তাহাকে সর্ব্বোপরি উপন্যাস হইতে হইবে; অর্থাৎ ঘটনা অবিশ্বাস্য হইলে চলিবে না, ইতিহাসের তথ্য ঠিক থাকা চাই, চরিত্রাঙ্কণে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ যথোপযুক্ত পরিমাণে হওয়া চাই, সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা থাকা চাই—এক কথায়, জীবনের, সমাজের, ইতিহাসের, মনস্তত্ত্বের, যুক্তি ও নজিরের যত কিছু বিশ্বাস-উৎপাদক উপাদান সবই নির্ভুল মাত্রায় মিশাইয়া বোতলটিকে ভাল করিয়া নাড়া দিয়া দেখিতে হইবে, তলায় কিছু পড়িয়া থাকে কি না,—যদি না থাকে, তবেই তাহাতে লেবেল আঁটিয়া সেবনযোগ্য বলা যাইতে পারে। কল্পনা বা

রোমান্স থাকিলে আপত্তি নাই—এই সকল থাকার পরে তাহা থাকাই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার উপন্যাসেই ঐ বাস্তব সত্যই মুখ্য, তাহার ব্যতিক্রম এতটুকু হইলে চলিবে না। তাই গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিয়াছেন—"কল্পনা ও সত্যের মধ্যে সত্যই আদরণীয়, কিন্তু সত্য যেখানে প্রাণহীন, সেখানে কল্পনার রাজ্য হইতে জীবন-স্পন্দন আনয়ন আর্টের পক্ষে অধিকতর কাম্য।" এই একটি উক্তির দ্বারাই গ্রন্থকারের রস-বিচারের পদ্ধতি ও তাহার মূল নীতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ সত্যের সন্ধানই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য,—কিন্তু সত্য যদি প্রাণহীন হয়, তবে আর্টের খাতিরে কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে; উপন্যাসেও সত্যই মুখ্য, কল্পনা গৌণ। উপন্যাস যে প্রকৃতিরই হউক, তাহাতে মহাকাব্যের বিশালতা, গীতিকাব্যোচিত উন্মাদনা, আদর্শবাদ প্রভৃতি অতিশয় দোষাবহ; কারণ তাহা আমাদের প্রাত্যহিক, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ক্ষুণ্ণ করে—আমাদের সত্য-বিশ্বাসকে আঘাত করে; সেরূপ কল্পনাকে মাটির উপর দিয়া পায়ে হাঁটিয়া অনুসরণ করা যায় না। ইহার উপর যদি অতিপ্রাকৃতের ছায়া কোন দিক দিয়া আসিয়া পড়ে, তবে তাহার ঔপন্যাসিক জাতিরক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে,—কারণ, তাহা আর যাহাই হউক, উপন্যাস হইতে পারিবে না। এই তত্ত্বের উপরেই অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার উপন্যাস-বিচার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং নানা শ্রেণী-বিভাগ করিয়া তিনি যেমন শ্রেণী-বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন, তেমনই শ্রেণীভুক্ত করার জন্য উপন্যাস-বিশেষের বিশেষ রসরূপকে অস্বীকার করিয়াছেন। এক দিকে যেমন সকলকেই একটা সংজ্ঞাধৃত উপন্যাসের আদর্শাধীন হইতে হইবে, তেমনই ঐতিহাসিক উপন্যাসকে ঐতিহাসিক হইতে হইবে; আবার ঐতিহাসিক হইলেও রোমান্সের আতিশয্য চলিবে না; ঐতিহাসিক উপন্যাসেও ইতিহাস অপ্রধান হওয়া যেমন দোষের, তেমনই প্রধান হওয়াও কম দোষের নয়; তাহার ঐতিহাসিক অংশ ও পারিবারিক কাহিনীর অংশ—এই দুইয়ের মিশ্রণ বা মিলনে কোনটা মাত্রাতিরিক্ত হইলে চলিবে না—তাহার রোমান্সও সত্যকে অতটুকু লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। এই লছমন-ঝোলার উপর দিয়া যিনি চলিতে না পারিবেন, তাঁহার উপন্যাস সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া

বিবেচিত হইবে না। আমি এই সকলের একটু বিস্তৃত পরিচয় এইবার দিব। কিন্তু বিপদের কথা বলিতেছিলাম ; এ সকল তো আছেই, কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হইয়াছে এই যে, তাঁহার উপন্যাসের আদর্শ যতই দুরধিগম্য হউক—তাঁহার ভাষাও কম দুরধিগম্য নয়, এজন্য আমার ভয় হয়, আমি বোধ হয় সর্ব্বত্র তাঁহার বক্তব্য ঠিকমত বুঝিতে পারি নাই ; একে তাঁহার অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, তত্ত্ব ও তথ্যের ঘন সন্নিবেশ দিশাহারা করিয়া তোলে, তাহার উপর, সেই পাণ্ডিত্যের উপযোগী ভাষাও পদে পদে বিমূঢ় করিয়া দেয়। এজন্য আমার এই কৈফিয়ৎও হয়তো কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে—ইহাকেই বলে কর্ম্মবিপাক, একবার আরম্ভ হইলে তাহার শৃঙ্খল বাড়িয়াই চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অধ্যাপক মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে আমি প্রথমেই এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।—

প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্য হইতে বাস্তবরসসিক্ত জীবনের খণ্ডাংশগুলি পৃথক করিয়া তাহাদিগকে উপন্যাসের দিকে অগ্রসরণের চিহ্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে কেহ কেহ আপত্তিও করিতে পারেন। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে যে এ আপত্তি বিশেষ মারাত্মক নহে। ইহা নিশ্চিত যে, যে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, কাব্যগ্রন্থ ও গল্প-আখ্যায়িকা হইতে এই সমস্ত বাস্তবতার চিহ্নাঙ্কিত অংশ বাছিয়া লওয়া লইয়াছে, তাহাদের লেখকদের মধ্যে কাহারও উপন্যাস লিখিবার কল্পনা ছিল না, বা উপন্যাস বলিয়া যে সাহিত্যের একটা দিক আছে, তাহারও অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞ ছিলেন। তথাপি এই বাস্তব অংশগুলিকে উপন্যাসের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া নিতান্ত অসংগত হইবে না। গল্প বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; এবং এই সর্ব্বদেশ-সাধারণ গল্পের মধ্যেই উপন্যাসের মৌলিক বীজ নিহিত ছিল। এই গল্প বলিবার একটি বিশেষ ভঙ্গিকে—গল্পের মধ্য দিয়া মানুষের প্রকৃত জীবনের ছবি আঁকিবার চেষ্টা, ঘটনা-সংঘাতে তাহার চরিত্র-স্ফুরণের উদ্যোগ, সামাজিক মানুষের মধ্যে যে অহরহঃ একটা আকর্ষণ বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহারই সুক্ষ্ম আলোচনা, ও এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়া মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধে একটা বৃহত্তর, ব্যাপকতর সত্যকে ফুটাইয়া তোলা—ইহাকেই উপন্যাস বলা যাইতে পারে। সুতরাং যেখানেই গল্পের মধ্য দিয়া—তা সে গল্প যে উদ্দেশ্যেই লিখিত হোক না কেন—বাস্তবের প্রতি আকর্ষণের কোন লক্ষণ দেখা গিয়াছে, সাধারণ রক্তমাংসের নরনারীর চিত্র অস্পষ্ট ছায়ারেখায়ও চারিদিকের কুহেলিকা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে—সেখানেই উপন্যাসের মৌলিক বীজের দর্শন লাভ করিয়াছি বুঝিতে হইবে। সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের ইহাই সাধারণ নিয়ম। বিশেষতঃ আমাদের ন্যায় ধর্ম্মপ্রধান, বাস্তবতাবিমুখ, পরমার্থপর সাহিত্য, যেখানে সমগ্র পার্থিব ব্যাপারকে একটি বৃহৎ মরীচিকার ন্যায় সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা

হইয়াছে, যেখানে উচ্চতর ধর্ম্মের নামে আমাদের প্রকৃত জীবনের ভাষার নির্ম্মমভাবে কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে, সেখানে এই সমস্ত অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ বাস্তব চিত্রেরও মূল্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সেই পরিমাণে অধিক। অন্ততঃ এইগুলি আমাদের উপন্যাস-রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যথাসম্ভব আয়োজন; বাস্তবতার দিকে এইটুকু প্রবণতা লইয়াই আমরা ইংরেজী উপন্যাসের পদাঙ্ক-অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।—পৃ. ২৩-২৪

উদ্ধৃত অংশ একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িল; তাহা হউক, আমার নিজের দিক হইতেও ইহার সব-কথাগুলিরই প্রয়োজন আছে; ইহাতে লেখক মহাশয়ের যে মত ব্যক্ত হইয়াছে পাঠকগণের পক্ষে তাহা জানা এবং আমার পক্ষে তাহা জানানো দুইই উচিত। আমার মনে হয়, এই একটি স্থানেই গ্রন্থকারের গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য, তাঁহার নিজের আদর্শ, তাঁহার মত ও সেই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি, আপত্তি-খণ্ডনের যুক্তি, উপন্যাসের সংজ্ঞা, ক্রমবিকাশতত্ত্ব, বাস্তবতার দিকে প্রবণতা, ইংরেজী উপন্যাসের পদাঙ্ক-অনুসরণ—একাধারে তাঁহার সকল বক্তব্যই পরিস্ফুট হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে ভাষার অর্থভারপীড়িত বাক্য-বিকলতাও প্রকাশ পাইয়াছে। "বিশেষতঃ···পরিমাণে অধিক" এই বাক্যটি পাঠকগণ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন, আমি কোন্ বিপদের কথা বলিতেছি। উপরি-উদ্ধৃত কথাগুলিতে আর একটি বিষয়ের প্রমাণ সকলেই পাইবেন—তাহা এই যে, গ্রন্থকার যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার সকল দিক সম্বন্ধে তিনি নিজেও পূর্ণ সচেতন—আপনারা সেখানে যে আপত্তি করিবেন তাহা তিনি জানেন, কারণ সে আপত্তি অতিশয় স্বাভাবিক ও সঙ্গত, সাহিত্যজ্ঞানী যাঁহারা তাঁহারা সে আপত্তি করিবেনই; অতএব, তাহার উল্লেখ বা স্বীকৃতির দ্বারা তিনি সে পথ বন্ধ করিয়াছেন; এইরূপ সর্ব্বত্র। আবার সম্পূর্ণ স্ববিরোধী উক্তি বা মন্তব্য তিনি যে কত করিয়াছেন, এবার তাহার আরও দৃষ্টান্ত দিব। কিন্তু সেই সকল উক্তি করিবার কালে একটু ফাঁকও তিনি রাখিয়া থাকেন, চাপিয়া ধরিবার জো নাই—এ দিক দিয়া ধরিতে গেলে আর এক দিক দিয়া বাহির হওয়া যায়; অর্থাৎ, সেরূপ করিতে গেলে ক্রমাগত বৃত্তাকারে ঘুরিতে হইবে। অতএব সেই গোলকধাঁধায় একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই। আমার অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে। তথাপি আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।

উপরের ওই উদ্ধৃত কথাগুলিই লওয়া যাক। অধ্যাপক মহাশয় নিজেই বাস্তবতার চিহ্নিত অংশ বাছিয়া লওয়ার কথা বলিয়াছেন, এবং আরও বলিয়াছেন, সেই সকল 'লেখকদের মধ্যে কাহারও উপন্যাস লিখিবার কল্পনা ছিল না', তারপর 'তথাপি·· অসঙ্গত হইবে না'; কারণ কি? না—'গল্প বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম', অতএব ঐরূপ গল্পের মধ্যেই উপন্যাসের 'মৌলিক বীজ' নিহিত ছিল। যুক্তিটা অবশ্য কিছুই হইল না, কারণ, উহা লজিকশাস্ত্রসম্মতও নয়। কিন্তু এখানে সম্ভবত শব্দার্থের গূঢ়তা আছে—উপন্যাসের 'বীজ' না বলিয়া 'মৌলিক বীজ' বলা হইয়াছে; হয়তো, এখানে ঐ 'মৌলিক' শব্দটির অর্থ বুঝিতে পারিলে যুক্তিটাও ঠিক হইয়া যাইবে। তারপর 'উপন্যাসে'র একটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, ঐ সংজ্ঞার মধ্যে 'প্রকৃত জীবন' 'ঘটনাসংঘাতে চরিত্রস্ফূরণ', 'আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব ও তাহার সূক্ষ্ম আলোচনা' এবং সর্ব্বশেষে "মনুষ্য জীবন সম্বন্ধে একটি বৃহত্তর ব্যাপকতর সত্যকে ফুটাইয়া তোলা"—এই সকল ব্যাপার আছে; সুতরাং বাস্তবের প্রতি আকর্ষণের ('বিকর্ষণ' অবশ্য নয়) কোন লক্ষণ থাকিলেই হইল—'চারিদিকের কুহেলিকা হইতে অস্পষ্ট ছায়ারেখায় স্বতন্ত্র' হইয়া উঠিলেই হইল—তবেই উপন্যাসের 'মৌলিক বীজে'র দর্শন পাওয়া গেল, অর্থাৎ, যদি কোনও প্রাচীন গল্পে কোথাও মা ছেলেকে একটা চড় মারে, অথবা স্বামী স্ত্রীকে গালি দেয়, কিংবা চোর চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়ে, তবেই বুঝিতে হইবে উহা "ধর্ম্মপ্রধান বাস্তবতা-বিমুখ, পরমার্থ-পরায়ণ সাহিত্য" নয়, এবং ঐখানেই উপন্যাসের—'বীজ' না হইলেও—'মৌলিক বীজ' উঁকি দিতেছে। লেখক উপন্যাসের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে চলিবে না,—কারণ পূর্ণ গর্ভবাসের পর ভূমিষ্ঠ হওয়া, আর ভ্রূণ অবস্থায় থাকা তো এক নয়। 'বায়োলজি' কি বলে জানি না, কিন্তু বীজরূপী ভ্রূণের খুব মৌলিক অবস্থায় তাহা যে কোন্ প্রাণীর ভ্রূণ তাহা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে স্থির করা দুরূহ হইলেও সাহিত্য-বৈজ্ঞানিকের পক্ষে আদৌ দুরূহ নয়। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল এই যে—'বাস্তবের প্রতি আকর্ষণ' থাকিলেই বুঝিতে হইবে উহাই ভবিষ্যৎ উপন্যাসের মৎস্য অথবা কূর্ম্ম-অবতার। তাহা হইলে,

উপন্যাস একটা বিশিষ্ট আর্ট নয়—তাহা জীবনধর্ম্মী এবং তাহার একটা নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের ধারাও আছে! অধ্যাপক মহাশয়ের যুক্তিটা আরও স্পষ্ট হইত যদি তিনি বলিতেন, যেহেতু উপন্যাসের ক্রমবিকাশ আছেই, সেইহেতু ঐ প্রাচীন সাহিত্যে তাহার "মৌলিক বীজ" অবশ্যই আছে। কিন্তু তারপরে 'সমস্ত পার্থিব ব্যাপার মরীচিকার ন্যায় মুছিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা', 'প্রকৃত জীবনের ভাষার নির্ম্মমভাবে কণ্ঠরোধ' প্রভৃতির জন্যই সেই সকল "অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ বাস্তবচিত্রের মূল্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সেই পরিমাণে অধিক"। কণ্ঠরোধ করিলে অবশ্য ভাষা বাহির হইতে পারে না; সাহিত্যের মরুভূমি (উপমা মাফিক) হইতে 'পার্থিব ব্যাপারের মরীচিকা' কিন্তু নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া ফেলা কঠিন—কারণ, মরীচিকা কিছুতেই মুছিয়া যাইতে চায় না, ক্রমাগত দূরে সরিয়া যায় বলিয়াই উহা এত মারাত্মক। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উপমা-মূলক (তাঁহার ভাষা প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ উপমার ভাষা) যুক্তির অর্থ বোধ হয় এই যে, কণ্ঠরোধ করার জন্যই পিপাসা তেমন প্রচণ্ড হইতে পারে নাই—যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হইতেই সাগরশোষণ-পিপাসার অস্তিত্ব অনুমান করিতে হইবে; এবং "মুছিয়া ফেলিবার নিদারুণ ব্যবস্থার" ফলে যে রেখাগুলি অস্পষ্ট হইয়া আছে, তাহা সেই মরীচিকা হইতেই জোর করিয়া আদায়-করা একটুকু শ্যামলিমা; অতএব তাহা কম কিসে? সেই তৃণচিহ্ন ধরিয়াই আমরা উপন্যাসের বনভূমিতে প্রবেশ করিব। "বাস্তবতার এইটুকু প্রবণতা লইয়াই আমরা ইংরাজী উপন্যাসের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।" এতক্ষণে গ্রন্থকার আসল কথাটি বলিলেন—এই কথাটি বলিবার জন্যই এত আয়োজন, এত যুক্তি, এত উপমা। আমি এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না—আমার যাহা বলিবার তাহা বহুপূর্ব্বে বলিয়াছি—এবার গ্রন্থকারকেও বলিবার সুযোগ দিলাম; পাছে কেহ মনে করেন আমি ভুল বুঝিয়াছি, তাই অনেক বাছিয়া এই অংশটি উদ্ধৃত করিলাম।

২

বাংলা উপন্যাসের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা নির্ণয়ের পূর্ব্বে গ্রন্থকার এই যে ভূমিকা করিয়াছেন তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ঐ

বাস্তবতার দিকে প্রবণতার চিহ্নগুলিই তাঁহার এই গ্রন্থরচনার পক্ষে 'যথাসম্ভব আয়োজন'; পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, "এই আয়োজনের পর্য্যাপ্ততার উপরেই আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ভর করিতেছে।" কিন্তু সর্ব্বশেষে এই উপন্যাস-সাহিত্য যে 'ধার-করা' সাহিত্য তাহাও স্বীকার করিয়াছেন, কেবল সেই 'ধার-করা' জিনিসকে 'আমাদের সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্থলের সহিত কতদূর ঘনিষ্ঠভাবে যোগ করিতে পারিয়াছি তাহাই আলোচিত হইবে।'—ইহাই তাঁহার গ্রন্থের প্রস্তাবনা। উপন্যাসের সংজ্ঞা তিনি পূর্ব্বেই দিয়াছেন; সেই সংজ্ঞা অবশ্য ইংরেজী উপন্যাসের সংজ্ঞা, বাংলা উপন্যাসও ইংরেজী হইতে ধার-করা—এই ধার-করা উপন্যাসের ধার-করা সংজ্ঞা বাংলা উপন্যাসের পক্ষে কতখানি সার্থক হইয়াছে, অর্থাৎ সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্থানে কতখানি তাহারা যুক্ত হইতে পারিয়াছে, ইহাই তাঁহার গবেষণার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

অতঃপর এই খাঁটি বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে যাবতীয় বাংলা উপন্যাসের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার আরম্ভ হইল। কাজটি খাঁটি বৈয়াকরণের কাজ, একেবারে সূত্রধৃত (সুতা-ধরা) সোজা বাঁধা-পথে যাত্রা শুরু হইল। গ্রন্থকার ইহার পরে যেমন যেমন প্রয়োজন হইয়াছে উপন্যাসের নানা শ্রেণী ও তাহাদের সংজ্ঞাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক উপন্যাসকে সেই ছাঁচের মধ্যে পূরিয়া কে কতখানি তাহাতে ফিট্ করে—চুল-চেরা বিশ্লেষণ করিয়া অঙ্ক কষার মত কষিয়া তাহার হিসাব দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি কেবল ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি বিশেষতঃ ঐশ্রেণীভুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে ধরনের আলোচনা, ও যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব; এবং তাহাও যতদূর সম্ভব তাঁহার ভাষাতেই দিব। ইহাতেই আমার মূল মন্তব্যের প্রমাণ মিলিবে।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস কি না? উত্তর—কতকগুলি সেই জাতীয় বটে। গ্রন্থকার উপন্যাসকে বরাবর উপন্যাসই বলিয়াছেন—অর্থাৎ, সামাজিক জীবন—প্রকৃত মনুষ্য-জীবন, বাস্তব-চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি তাহার অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ—এই লক্ষণ

সর্ব্বত্র যথাসম্ভব বজায় থাকা চাই; ইহার ব্যত্যয় ঘটিলেই উপন্যাস জাতিভ্রষ্ট হয়, কারণ, সত্যের উপরে কল্পনার অধিষ্ঠান হইলে তাহা কিছুতেই নির্দ্দোষ উপন্যাস হইতে পারে না। সত্যকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া কল্পনা যদি কিছু করিতে চায় তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু সাবধান! সত্য যেন এতটুকুও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়! ঐতিহাসিক উপন্যাসে অতীতের কল্পনা আছে, তাহাতে সত্যকেও কল্পনা করিয়া লইতে হয়—কিন্তু সে কেবল ঘনসন্নিবিষ্ট তথ্যের ফাঁকগুলি পূরণ করিবার জন্য। কল্পনা যদি তদতিরিক্ত হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলিবে না—রোমান্স বলাই সঙ্গত। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসগন্ধী হইলেও রোমান্স—ইহা গ্রন্থকার শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন; তথাপি, তাহাদের ঐতিহাসিকতা এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে তাহাদের ব্যর্থতার পরিমাণ আলোচনায় কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করেন নাই, এবং দুইখানিকে 'প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলিয়া পৃথক নির্দ্দেশও করিয়াছেন। গ্রন্থের ৪৭-৪৯ পৃষ্ঠায় তিনি যাহাদিগের ঐতিহাসিকতার বিচার ও তদনুযায়ী একটা ভাগও করিয়াছেন—৮৮ পৃষ্ঠায় তাহাদের সবগুলিকেই রোমান্স-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—"'সীতারাম' ও 'দেবী চৌধুরাণী' খাঁটি পারিবারিক উপন্যাস।" আবার, ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে স্পষ্টত দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—novel ও romance; 'নভেল' অর্থে 'সম্পূর্ণ বাস্তব, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাই যাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।' দ্বিতীয় শ্রেণী (রোমান্স) ঐতিহাসিক বা অসাধারণ ঘটনাবলীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। এখানে রোমান্স অর্থেও দুই প্রকার বুঝাইতেছে—(১) ঐতিহাসিক (২) অসাধারণ ঘটনামূলক। আমি অতঃপর কেবল লেখকনির্দ্দিষ্ট এই দ্বিতীয়টির পরিচয় দিব। তাহাতে দেখা যাইবে তিনি 'ঐতিহাসিকে'র মধ্যে রোমান্সের অবতারণাও যেমন দোষাবহ মনে করেন—তেমনই রোমান্সকেও রোমান্স হিসাবে বিচার করিতে নারাজ। আবার যাহাকে মুখ্যত পারিবারিক বা সামাজিক বলিয়াই স্বীকার করেন তাহারও ঐতিহাসিকতা লইয়া যেমন বহু বিতর্কের সৃষ্টি

করিয়াছেন, তেমনই যাহাতে খাঁটি ঐতিহাসিক লক্ষণ আছে তাহার পারিবারিক বাস্তবতার অভাব বা 'ক্ষীণতা' যে একটা বড় ত্রুটি, এমন কথাও বলিয়াছেন। তিনি যে কোন্ বিষয়ে ঠিক কি বলিতে চান পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া তাহা যতই বুঝিবার চেষ্টা করি ততই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়; তিনি সব কথাই বলেন, কিন্তু একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ ধরি ধরি করিয়াও ধরা যায় না, এমন গোলোকধাঁধা, এমন ধরা-ছোঁয়া না দেওয়ার খেলা আর কোনখানে দেখি নাই।

লেখক প্রথমেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের এইরূপ আদর্শ স্থাপনা করিয়াছেন—

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত আদর্শ দুরধিগম্য; ইতিহাসের বিশাল সংঘটনের ছায়াতলে আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের চিত্র আঁকিতে হইবে; দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার যোগসূত্রগুলি, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে ইতিহাসের বিপুলতা, ঘটনা-বৈচিত্র্য ও বর্ণসম্পদ ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে; অন্যদিকে আমাদের বাস্তব জীবনের কঠিন নিয়ম শৃঙ্খল, সত্যের কঠোর বন্ধনের দ্বারা ইতিহাসের কল্পনা-প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে; এবং সর্ব্বোপরি উভয়ের মিলনটি সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে—যেন সমস্ত উপন্যাসটির আকাশ বাতাসের মধ্যে একটা নিগূঢ় ঐক্য আনিতে পারা যায়।—পৃ. ৩৫-৩৬

ইহার মধ্যে, উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতা বিচারে তিনি এক স্থানে য়ুরোপীয় ঔপন্যাসিকের উপন্যাসসমূহে সেই উপাদান সম্বন্ধে বলিতেছেন—"তাঁহারা (স্কট প্রভৃতি) সর্ব্বজনবিদিত সুপরিচিত ঐতিহাসিক আখ্যান-গুলিকেই আপনাদের উপন্যাসের অঙ্গীভূত করিয়াছেন···ইতিহাস-বিশ্রুত ঘটনাসমূহই তাঁহাদের উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে।" "অবশ্য প্রাচীন বা মধ্যযুগের বিবরণে তাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপটি, প্রাণের আসল স্পন্দনটি ধরিতে পারিয়াছেন কি না সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু তাঁহাদের বর্ণিত উপাখ্যানগুলির ঐতিহাসিকতা অবিসংবাদিত।" (পৃ. ৩৯) কিন্তু এই 'প্রাণের স্পন্দন' সম্বন্ধে ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"প্রত্যেক যুগেরই সাধারণ জীবন, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার-সম্বন্ধে Scott-এর জ্ঞান এতই ব্যাপক ও গভীর ছিল, প্রত্যেক শতাব্দীরই বিশেষ প্রাণস্পন্দন তিনি এতই সূক্ষ্ম সহানুভূতির সহিত ধরিতে পারিতেন যে, সমাজচিত্রের কেন্দ্রস্থলে রাজাকে স্থাপন করা তাঁহার

প্রয়োজন হইত না।" তাহাতে বুঝিলাম, লেখক 'প্রাণ-স্পন্দন' কথাটি দুই জায়গায় দুই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপ শব্দার্থের গোলযোগ ছাড়িয়া দিয়া আমি ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই আদর্শটিই গ্রহণ করিলাম। এক্ষণে রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির বিচারে এই আদর্শের অনুসরণ ও তাহার ফলে সেগুলির উৎকর্ষ-অপকর্ষ কিরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাই দেখাইব। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে গ্রন্থকার প্রথমেই লিখিতেছেন—

বঙ্গসাহিত্যের প্রতিকূল আকাশ-বাতাসের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যতদূর বৃদ্ধি ও পরিণতি হওয়া সম্ভব রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে সেই চরম পরিণতিরই পরিচয় পাওয়া যায়।—পৃ. ৫২

তারপর—

প্রথম দুইখানি ('বঙ্গ-বিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণ') উপন্যাসের বর্ণনীয় বস্তু ও মুখ্য চরিত্রগুলি প্রধানতঃ কাল্পনিক; কেবল ঐতিহাসিক আবেষ্টনের-মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তাহারা ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে।—পৃ. ৫৩

তারপর—

'বঙ্গ-বিজেতা'—একটা অপরিণত হস্তের চিহ্ন ইহার সর্ব্বত্র বিরাজমান। ইহার ঐতিহাসিক অংশ...একেবারে শুষ্ক, নীরস, প্রাণহীন; কোন স্কুলপাঠ্য ইতিহাস হইতে সঙ্কলন বলিয়া বোধ হয়।...চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়াও এক বিরাট প্রাণহীনতা এই গ্রন্থের পাতাগুলি অধিকার করিয়া বসিয়াছে।—পৃ. ৫৩-৫৪

তাঁহার প্রথম রচনার সমস্ত অপরিপক্কতা ও অস্পষ্টতার মধ্যে এই এক যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ বাস্তবপ্রিয়তা ও একটা প্রকৃত আবেগ দেখা যায়। তাঁহার রক্তের মধ্যে কোথাও একটা রণোন্মাদ, একটা যুদ্ধ-সঙ্গীতের ঝঙ্কার সুপ্ত ছিল; তাঁহার পরবর্ত্তী উপন্যাসসমূহে এই যুদ্ধ-সঙ্গীত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে এবং একটা গীতি-কাব্যোচিত উন্মাদনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।—পৃ. ৫৫

তারপর, 'মাধবীকঙ্কণ'—

মাধবী-কঙ্কণ মূলতঃ একটি পারিবারিক উপন্যাস। ইতিহাস ইহার অপ্রধান অংশ।—পৃ. ৫৬

অর্থাৎ, 'স্বর্ণলতা' ও 'মাধবীকঙ্কণ' একই শ্রেণীর উপন্যাস! ইহাতে ইতিহাস যখন অপ্রধান, এবং ইহাতে যখন পারিবারিক ঘটনার প্রাধান্যই আছে, তখন ইহা 'রোমান্স'ও নয়! কিন্তু তাহার পরেই—

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও আমরা এই বিপদসঙ্কুল গৌরবময় বীরত্ব-কাহিনীপূর্ণ অতীত যুগে নীত হই। এই হিসাবে রমেশচন্দ্র স্কটের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য।—পৃ. ৫৭

এবং—

তারপর, বারাণসীর, ও নরেন্দ্রের বন্দী হওয়ার পর দিল্লীনগরে, যে জনবহুল সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ চিত্র ও মোগলরাজ-অন্তঃপুরের যে ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্য্য-বর্ণনা পাই তাহা কবিত্ব-হিসাবে বঙ্কিমের রাজসিংহের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা হইতে নিকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে সত্যের সুরটি প্রকটতর হইয়া উঠিয়াছে।…জেলেখার ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী. নরেন্দ্রের স্বপ্নাবিষ্ট উদাসীন মনের মধ্য দিয়া একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মত অনুরণিত হওয়ায় ইহার রহস্যময় সৌন্দর্য্যটি গাঢ়তর হইয়াছে। বাস্তবিক জেলেখার প্রেমটি, ইহার বিপদসঙ্কুল আরম্ভ হইতে বিষাদময় পরিণতি পর্য্যন্ত, যেরূপ অভ্রান্ত-ভাবে একটি সূক্ষ্ম যবনিকার অন্তরালে রাখা হইয়াছে, একটা আলো-আঁধার মেশা অস্পষ্টতার মধ্য দিয়া নীত হইয়াছে, তাহা খুব উচ্চ অঙ্গের কলাকৌশলের পরিচায়ক। এই অস্পষ্ট সাঙ্কেতিকতাই (Suggestiveness) এই প্রেমের রোমাণ্টিক সৌন্দর্য্যটি নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে।—পৃ. ৫৭-৫৮

এই প্রথম দুইখানি পুস্তক যেমন হউক, পরবর্ত্তী দুইখানি ('জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা') "প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ঐতিহাসিক; সাধারণ মানবের জীবনের কথা তাহাদের মধ্যে স্থান লাভ করে নাই" (পৃ. ৬২)। অর্থাৎ, প্রথম দুইখানিতে ইতিহাস-অংশ অল্প ছিল বলিয়া তাহাদের একখানি ('বঙ্গবিজেতা') ঐতিহাসিক হিসাবে শুষ্ক ও প্রাণহীন (যদিও কল্পনাপ্রধান) এবং অপরখানি ('মাধবীকঙ্কণ') 'পারিবারিক উপন্যাস।' কিন্তু শেষের দুইখানি—

উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের সহিত সাধারণ মানব জীবনের যে একটা সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য ও নিগূঢ় বন্ধন থাকে এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। অবশ্য ইতিহাসের উদ্দীপনা, বিপুল ঘটনাপুঞ্জের পরস্পর সংঘাতের যে আকর্ষণ তাহা ইহাদের মধ্যে যথেষ্টই আছে; কিন্তু মানব মনের যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, যে তীব্র আবেগ ইতিহাসকে সরস ও কলা-কৌশলের দিক হইতে সার্থক করিয়া তোলে, তাহার এখানে একান্ত অভাব। ইতিহাসের বিপুল বেগের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য জীবনকে নিয়মিত করিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই; এক কথায়, এই উপন্যাস দুইখানির মধ্যে আমরা উপন্যাসের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব অনুভব করি।—পৃ. ৬২

তথাপি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবেই এই দুইখানি "বঙ্গসাহিত্যের শূন্য পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে";—অর্থাৎ সার্থক হইয়াছে; কারণ, লেখক বলিতেছেন, ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিশ্লেষণ না থাকিলেও চলে;

'বিশ্লেষণ' অর্থে অবশ্য 'মানব মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ', পারিবারিক জীবনের ক্ষীণ, করুণ, রসবিচিত্র সুর প্রভৃতি ; লেখক বলিতেছেন—

কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস বিশ্লেষণের অভাব অন্য দিক দিয়া পূরণ করে। ঘটনা-বৈচিত্র্যে, একটা সমগ্র যুগের ব্যাপক বর্ণনায়, উচ্চভাব ও আদর্শের বিকাশে ও বীরত্ব-কাহিনীর প্রাচুর্য্যে ইহা মানুষকে এমন একটি তৃপ্তি দেয়, এমন একটি বর্ণবহুল সৌন্দর্য্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে, যাহা সাহিত্যের অন্য কোনও শাখা আমাদিগকে দিতে পারে না।—পৃ. ৬৭

পাঠক দেখিলেন, রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি ঐতিহাসিক হইয়াও নানা কারণে তাহারা যেমন অন্যবিধও হইয়াছে ; তেমনই, তাহাদের দোষ গুণ তৌলদণ্ডে অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া দেখা গেল যে, যদিও তাহারা খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে পারে নাই—ইতিহাসকে খর্ব্ব করিয়া অথবা ইতিহাসকে মান্য করিয়া তাহারা, কোথাও কল্পনার আধিক্যে কোথাও বা কল্পনার অভাববশত, ঔপন্যাসিক আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে—তথাপি, তাহারা "বাস্তবজীবনের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া এক বিচিত্র রসের আস্বাদ আমাদিগকে দেয়।" আসল কথা—তাহারা যে দিক দিয়া যেমন করিয়াই আমাদিগের যে রসপিপাসাই তৃপ্ত করুক না কেন—উপাদানের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন ঠিক রাখিতে পারে নাই—recipe-র ভুল আছে। প্রথম দুইখানি তো কাঁচা হাতের প্রথম কীর্ত্তি ; কিন্তু শেষের দুইখানিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল না। উপায় কি? ফ্রেমে ফিট করিতে পারা গেল না—কোন্ না কোন দিকে ছোট বা বড় হইয়া যায়! কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা উচ্চপ্রশংসার যোগ্য হইবে না কেন? গুরুতর দোষত্রুটিগুলি দেখাইয়া দেওয়া সমালোচকের অতি কঠোর কর্ত্তব্য মাত্র ; সমালোচক হইলে যে রসিক হইতে হইবে না, এমন তো কোন কথা নাই ; তাই শেষে গ্রন্থকার তাঁহার রসগ্রাহিতার প্রমাণ-স্বরূপ লিখিয়াছেন—"'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা' বঙ্গসাহিত্যে দুইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস। বঙ্গসাহিত্যে তাহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।" সমালোচনা যে কি বস্তু—রসবিচার ও সমালোচনা যে এক নয়, তাহা এমন করিয়া আর কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে এক বিচিত্র পত্রলিখন-পদ্ধতির কথা মনে পড়িয়া গেল।

এক কৃষকে
করিয়াছিল মের দুর্গেশনন্দিনীই উচ্চাঙ্গের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস—(পৃ. ৪৩)।
ও 'রাজসিংহ'—ইহারা মূলত ঐতিহাসিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক ব্যক্তিই
ছিল, তাই মু বং তাহাদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ই ইহার আখ্যানবস্তু (পৃ. ৪৫)। 'দুর্গেশ-
গ্রামের দাঁঠাকু মনতা ক্ষীণ বটে, সামাজিক চিত্রাঙ্কণের দিক দিয়া ইহার মধ্যে বাস্তব-
বলিল, পত্রখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে (পৃ. ৪৭)
ক্রোধ এবং ভালব ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে, ইহা
"নরম-গরম কার্য্যক্ষ্যাগে ব্যাপারেরই বিবৃতি।...অবশ্য ইতিহাসের বিশাল ঘটনার
তোর গরুতে ধান র অন্তরঙ্গ যোগ আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ বলিয়া
যাইতেছে, সাহিত্য-সম চন্দ্রের কোন উপন্যাসেই প্রকাশিত হয় নাই।—পৃ. ৪৮
নিরাপদ। ন্যাসে ইতিহাস কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া নিজ সত্যরূপ
ত্যনিষ্ঠাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। 'আনন্দমঠ' এই

বচিত্র্যের কারণ মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, কোন
হয় নাই। 'মৃণালিনী'তে ঐতিহাসিক অংশ—
ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করে না
গুলির বিচার দেখিবার পর এইবার আপ্তবাক্য হিসাবেই শিরোধার্য্য; কারণ,
হইবে, তাই আমি রমেশচন্দ্রের উপন্যাতে 'মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ে'র প্রভাব
পরিচয় দিয়াছি; সে বিচার যে কিরূপ কতখানি হইয়াছে তাহা বুঝিবার
অনেকখানি আভাস ইহা হইতে পাইয়াছেন,
কল্পনা বা রোমান্সের আতিশয্য, অসম্ভব অপ্রাকৃতের হত্যাগ, এবং মীরকাশিম ও
মূলক ব্যাখ্যা, ঘটনার বিশ্বাস্যতা, ঐতিহাসিক উপাদানে বলিনীর জড়িত হওয়া
অভাব, গার্হস্থ্যজীবনের সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনা বা আখ্যানে যোগসূত্র নিতান্ত
উপন্যাসের মধ্যে মহাকাব্য, গীতিকাব্য, অত্যুচ্চ আদর্শবাদ, প্রভৃতি মধ্যে
মারাত্মক বস্তুর অবতারণা ও বিচার; এবং পাঠকগণ ইহাও আশা
করিতে পারেন যে, অধ্যাপক মহাশয়ের মত অতিকঠোর অপক্ষপাত
পরীক্ষকের হাতে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন বিষয়ে নম্বর যতই কম পান না কেন,
শেষকালে aggregate-এ তিনি প্রায় ফুলমার্কস্‌'ই পাইবেন—উচ্ছ্বসিত
প্রশংসা তাঁহার ভাগ্যেও মিলিবে। বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া সবচেয়ে বড়
বিপদ হইয়াছে তাঁহার উপন্যাসগুলির শ্রেণীবিভাগে; অবশ্য, মুশকিল
যেমনই হউক, লেখক মহাশয় তাহার আসান করিতেও সিদ্ধহস্ত।

'বিশ্লেষণ' অর্থে অবশ্য 'মানব মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ', পারিবারিক ণ, যথা—
ক্ষীণ, করুণ, রসবিচিত্র সুর প্রভৃতি ; লেখক বলিতেছেন— ।); প্রকৃত

কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস বিশ্লেষণের অভাব অন্য দিক দিয়া পূরণ তাহা ছাড়া,
বৈচিত্র্যে, একটা সমগ্র যুগের ব্যাপক বর্ণনায়, উচ্চভাব ও আদর্শে 'পারিবারিক'
কাহিনীর প্রাচুর্য্যে ইহা মানুষকে এমন একটি তৃপ্তি দেয়, এমন একটি ই যে, বঙ্কিমচন্দ্র
দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে, যাহা সাহিত্যের অন্য কোনও শাখা অ বড় অপরাধ প্রায়
না।—পৃ. ৬৭ আদৌ নাই ; এজন্য

পাঠক দেখিলেন, রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি তাই নয়—তথ্য হিসাবে
নানা কারণে তাহারা যেমন অন্যবিধও হইয়াছে ও চরিত্রের মূলে যে
দোষ গুণ তৌলদণ্ডে অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া অর্থাৎ, তাহাতে তথ্যের
তাহারা খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে সত্য আছে ; ইহাও
খর্ব্ব করিয়া অথবা ইতিহাসকে মান্য করিয়া পক্ষে কম বিপজ্জনক নয়।
আধিক্যে কোথাও বা কল্পনার 'অভাবব র যে সকল ঘটনায় বা চরিত্রে
ভ্রষ্ট হইয়াছে—তথাপি, তাহারা "বাস্তবস্ত উপন্যাসের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন,
বিচিত্র রসের আস্বাদ আমাদিগকে অতি-উন্নত সন্দেহ বা অবিশ্বাসকে
যে দিক দিয়া যেমন করিয়াই আমা যে দাবাইয়া রাখেন—পায়ে হাঁটিয়া
না কেন—উপাদানের প্রেস মাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইলেও তাহার
recipe-র ভুল আছে। র চক্ষু ধাঁধিয়া যায়, আমরা কেমন যেন
কিন্তু শেষের দুইখানি -আমাদের প্রাণমনকে বশে রাখিতে পারি না।
ফিট করিতে পা বলিয়া যেমন একটা কথা আছে, ইহাও যেন সেই-
যায়! কিন্তু র অত্যাচার'; সমালোচকের পক্ষে ইহা আরও নিদারুণ,
গুরুতর তই সাবধানে যেমন করিয়াই যত বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রয়োগ করা
কর্ত্তব্য, কিছুতেই কূল পাওয়া যায় না—যে কথাটাই বলিতে যাই তাহাই
আবার সামলাইয়া লইতে হয়, এমন কি, কথার ঠিক রাখিতে পারা যায়
না, ক্রমাগতই উল্টাপাল্টা হইয়া যায়। পাঠকগণকে আর বেশিক্ষণ
ধাঁধার মধ্যে রাখিব না ; আমি এক্ষণে কেবল কতকগুলি উক্তি যেখান
সেখান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিব। গ্রন্থকারের মূল প্রতিপাদ্য এই যে,
বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসই লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু
পারেন নাই ; যথা—

(১) বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীই উচ্চাঙ্গের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস—(পৃ. ৪৩)। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'রাজসিংহ'—ইহারা মূলত, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক ব্যক্তিই ইহাদের নায়ক এবং তাহাদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ই ইহার আখ্যানবস্তু (পৃ. ৪৫)। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র ঐতিহাসিকতা ক্ষীণ বটে, সামাজিক চিত্রাঙ্কণের দিক দিয়া ইহার মধ্যে বাস্তব-প্রিয়তা বা সত্যনিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে (পৃ. ৪৭)

(২) 'রাজসিংহে' ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে, ইহা একটি প্রকৃত ইতিহাসবর্ণিত ব্যাপারেরই বিবৃতি।...অবশ্য ইতিহাসের বিশাল ঘটনার সহিত সাধারণ জীবনের যে অন্তরঙ্গ যোগ আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসেই প্রকাশিত হয় নাই।—পৃ. ৪৮

(৩) দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে ইতিহাস কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া নিজ সত্তারূপ বিসর্জ্জন দিয়াছে, ভাবপ্রাবল্য সত্যনিষ্ঠাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। 'আনন্দমঠ' এই শ্রেণীর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।—পৃ. ৪৮

(৪) ইতিহাস কেবল ঘটনা-বৈচিত্র্যের কারণ মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, কোন উচ্চতর কলাকুশলতার প্রয়োজনে নিযুক্ত হয় নাই। 'মৃণালিনী'তে ঐতিহাসিক অংশ—মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়—চরিত্র সৃষ্টির উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করে না (পৃঃ ৪৮)। [এ সকল কথা গ্রন্থকারের আপ্তবাক্য হিসাবেই শিরোধার্য্য; কারণ, 'মৃণালিনী'তে চরিত্র সৃষ্টি হইয়া থাকিলেও তাহাতে 'মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ে'র প্রভাব যে কেমন হইতে পারে, এবং হইয়া থাকিলেও তাহা কতখানি হইয়াছে তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি আমাদের নাই]।

(৫) চন্দ্রশেখরে লরেন্স ফষ্টরের সহিত শৈবলিনীর গৃহত্যাগ, এবং মীরকাশিম ও ইংরাজদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধজালে দলনী বেগম ও শৈবলিনীর জড়িত হওয়া ইতিহাসের সহিত পারিবারিক জীবনের যোগের প্রমাণ, কিন্তু এই যোগসূত্র নিতান্ত ক্ষীণ।—পৃ. ৪৮

(৬) 'সীতারাম' বা 'দেবী চৌধুরাণী' খাঁটি পারিবারিক উপন্যাস। ইহাদের মধ্যে যাহা-কিছু ঐতিহাসিকতা, তাহা কেবল ইহারা অতীত যুগের আখ্যায়িকা বলিয়া। কোন গুরুতর ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত ইহাদের সংযোগ নাই।—পৃ. ৪৯

(৭) 'কপালকুণ্ডলা'তেও রোমান্সের অপরূপ মায়ার পার্শ্বে ইতিহাস নিতান্তই ক্ষীণ ও বিশেষত্ববর্জ্জিত বলিয়াই বোধ হয়।—পৃ. ৫০

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য আমাদের সত্যই বড় দুঃখ হয়; তাঁহার এ দুর্ম্মতি কেন হইয়াছিল, তিনি কেন ইতিহাসের গায়ে হাত দিতে গিয়াছিলেন? গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন—

উপন্যাসের বাস্তবতার দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই অগ্রাহ্য ও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য; বাস্তব জগতের শেষ সীমা বা চরম সম্ভাবনার মধ্যেও তাহাদিগকে স্থান দিতে পারি না।—পৃ. ৮৪

বঙ্কিমের আদর্শবাদ, জাতির ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে তাঁহার প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার উচ্ছ্বসিত দেশভক্তি ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে বিশেষভাবে অনুরঞ্জিত করিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির উপর কোথাও বা মহাকাব্যের বিশালতা, কোথাও বা গীতিকাব্যের উন্মাদনা আনিয়া দিয়াছে।—পৃ. ৪৩

কল্পনাকুশল বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ উপন্যাসেই ঐতিহাসিক উপাদানের রূপান্তর সাধন করিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।—পৃ. ৪৭

তথ্যের যে পরিমাণ ঘনসন্নিবেশ হইলে একটা বৃহৎ ঐতিহাসিক ব্যাপার আমাদের চক্ষে সত্য ও জীবন্ত হইয়া উঠে, তাহা বঙ্কিমের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব ছিল; সেইজন্য তথ্যের অভাব কল্পনার বাষ্প-স্ফীতিদ্বারা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।—পৃ. ৯৭

এ 'গরম' মন্তব্য আর অধিক উদ্ধৃত করিব না; এক্ষণে 'নরম' কয়েকটি তুলিয়া দিই; তাহাতে বঙ্কিমভক্তগণ প্রচুর সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবেন; যথা—

(১) স্থানে স্থানে তিনি কেবল প্রতিভাবলেই কোন অতীত যুগের ঠিক প্রাণস্পন্দনটি ধরিয়াছেন, বা কোন ইতিহাসবিখ্যাত পুরুষের আসল ব্যক্তিত্বটুকু ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন, ইহা প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও অনুভব করা যায়।...এই সমস্ত ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রমাণনিরপেক্ষ সহজ সংস্কারের দ্বারা ইতিহাসের একেবারে মর্ম্মস্থানে গিয়া হাত দিয়াছেন, সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারের মধ্যে যুগবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের আসল স্বরূপটি টানিয়া বাহির করিয়াছেন।—পৃ. ৫০-৫১

(২) বঙ্কিম মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গজয়ের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা কতদূর ইতিহাস-সম্মত তাহা বলিতে পারি না, তবে তাহাকে উচ্চ অঙ্গের ঐতিহাসিক কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করিতে আমাদের বিশেষ দ্বিধা হয় না।...কেবল কল্পনাশক্তির দ্বারা ঐতিহাসিক সংঘটনের যতদূর মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা যায় তাহাতে বঙ্কিম কৃতকার্য্য হইয়াছেন।—পৃ. ৯৭-৯৯

(৩) ইতিহাসের দিক হইতে স্বাভাবিক এই সমস্ত প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাই না। একটা অসাধারণ আদর্শের জ্যোতিতে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়; খুব নিকট হইতে ইহাকে দেখিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।—পৃ. ১১৬

(৪) অবশ্য এই ইতিহাসের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বঙ্কিম যে যুদ্ধ করেন নাই এমন নহে; ইতিহাসের গ্রাস হইতে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আংশিক কৃতকার্য্যতা লাভও করিয়াছেন।—পৃ. ১৪৯

(৫) শৈবলিনী ও প্রতাপের গঙ্গা-সন্তরণ, দলনীর বিষপান, প্রতাপের মৃত্যুকালে আজীবন-রুদ্ধ প্রেমের জ্বালাময় অভিব্যক্তি এবং সর্ব্বোপরি বিরাট কল্পনার দ্বারা মহিমান্বিত শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্তের বিবরণ আমাদের মনের মধ্যে সুগভীর রেখায় কাটিয়া বসে এবং বিচিত্রভাব-নিলয় এই মানব হৃদয় ও গূঢ় রহস্যাবৃত এই মানব জীবনের প্রতি একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে।—পৃ. ১০৭-৮

কিন্তু হইলে কি হয়—'উপন্যাস' এবং 'ইতিহাস' অথবা 'বাস্তবতা' এবং 'তথ্যনিষ্ঠা' এই দুইয়ের কোনরূপ ধর্ম্মহানি গ্রন্থকার কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না—কবিত্ব বা রোমান্স, এবং তজ্জনিত কেবল একটা সাহিত্যিক রস-প্লাবন তাঁহাকে কিছুতে সমালোচকের কঠিন কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। তাই নিছক কলা-সৌন্দর্য্যকে স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে—

সকলের শেষে, বঙ্কিম রোমান্সের বর্ণোচ্ছ্বাস গাঢ়তর করিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত বিরলবর্ণ জগৎকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। কবি আসিয়া ঔপন্যাসিকের হস্ত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছে। 'চন্দ্রশেখরে'র কল্পনাশক্তির সমৃদ্ধি ও সুসঙ্গতি আমরা উপভোগ করি, ইহার কলাসৌন্দর্য্য আমাদিগকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়; কিন্তু উপন্যাস ক্ষেত্রে কবিত্বের এই অনধিকার-প্রবেশে যে ভবিষ্যৎ বিপদের বীজ নিহিত আছে ইহাও অনুভব করি।—পৃ. ১১০-১১১

—কি বিড়ম্বনা! সমালোচনা যে কি কঠিন কাজ তাহা আমাদের দেশে কয়জন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে? হায় বঙ্কিমচন্দ্র! তুমি গোবিন্দলালের দুঃখ বুঝিয়াছিলে, কিন্তু সমালোচকের দুঃখ কি কিছুই বুঝিতে পার নাই? তাহা হইলে 'ইতিহাস' ও 'বাস্তবতা' লইয়া এমন নির্ম্মম তামাসা করিতে পারিতে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে দুইখানি 'ঐতিহাসিকতার' দুই প্রান্তে অবস্থিত—'রাজসিংহ' ঐতিহাসিকতম, এবং 'আনন্দমঠ' অনৈতিহাসিকতম। গ্রন্থকার এই দুইখানিকে এইরূপ কৌলিন্য দান করার পরে তাহাদের যে সমালোচনা করিয়াছেন, অতঃপর তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব; এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের তিনি কিরূপ রস-বিচার করিয়াছেন তাহার দুই-চারিটি নমুনাও উদ্ধৃত করিব।

'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

(১) এই উপন্যাসদ্বয়ে ('আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী') পাঠকের মনে যে সন্দেহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তাহা এই—সত্যানন্দ ও ভবানীপাঠক যেরূপ জ্বলন্ত দেশভক্তি, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠান-গঠন-কুশলতা দেখাইয়াছেন, তাহা সে যুগের কোন বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব ছিল কি না এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের এরূপ আশ্চর্য্য কল্পনা-প্রসার থাকিলেও তাহাকে একটা বাস্তব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার শক্তি রাজনীতি-শিক্ষাহীন, দেশাত্মবোধবর্জ্জিত বাঙ্গালী জাতির ছিল কি না।—পৃ. ১১৩

(২) সন্তানদের আনন্দকাননের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে লেখক কোন কথাই বলেন নাই; তাহার অনতিদূরে মুসলমান শক্তির আশ্রয়স্থলস্বরূপ যে 'নগরে'র কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও একটা নামধামহীন ছায়ার মত অশরীরী হইয়াছে।—পৃ. ১১৬

(৩) আনন্দমঠে সত্যানন্দের গরীয়ান্ আদর্শটি বাদ দিলে আর কিছুই থাকে না।—পৃ. ১২০

(৪) আনন্দমঠ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই অনুমান হইবে যে, ইহা উপন্যাস অপেক্ষা বরং মহাকাব্যের লক্ষণান্বিত। বঙ্কিম এখানে কেবল উপন্যাসের বাহ্য আকৃতির ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র; উপন্যাসের ছাঁচে তাঁহার উচ্ছ্বসিত দেশভক্তি, তাঁহার বিরাট রাজনৈতিক কল্পনা ঢালিয়াছেন মাত্র। বাস্তবিক 'আনন্দমঠে'র উপন্যাসোচিত গুণ যে খুব বেশি আছে তাহা বলা যায় না। অতীতের চিত্র আঁকিবার ছলে বঙ্কিম ভবিষ্যতের দিকে অর্থপূর্ণ অঙ্গুলির সঙ্কেত করিয়াছেন। আনন্দমঠের চরিত্র-গুলি সম্পূর্ণ বাস্তব নহে, তাহাদের একপদ বাস্তবলোকে ও অপরপদ আদর্শলোকে স্থাপিত রহিয়াছে।—পৃ. ১২১

[অর্থাৎ, 'আনন্দমঠ' মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত অথবা রোমান্স-আক্রান্ত বটে, সে দিক দিয়া তাহার রস যেমনই হউক—'উপন্যাসোচিত গুণ' তাহার কোথায়? 'আদর্শ লোকের কল্পনা' আদর্শলোকে বিহার করিলেই ভাল হইত—"বাঙ্গালীর নাম ধরিয়া কতকগুলি কল্পনাবস্তু" উপন্যাসরাজ্যে বাস করিতে আসিল কেন? বঙ্কিমবাবুর কি এ জ্ঞান ছিল না যে, তিনি উপন্যাস লিখিতেছেন? উপন্যাসে যাহাই কর আপত্তি নাই, কল্পনা, আদর্শ, ইতিহাস সবই আনিতে পার; কিন্তু দেখিও, যেন তাহা অবাস্তব অপার্থিব না হয়—কল্পনাকেও বাস্তব হইতে হইবে, কারণ 'উপন্যাস' যে।]

(৫) আনন্দমঠের মধ্যে দুই-একটি বাস্তব স্তরও আছে; উপন্যাসের সাধারণ অবাস্তবতা হইতে এই দৃশ্যগুলিকে সহজেই পৃথক করা যায়। প্রথম চারিটি অধ্যায় একটি ভীষণ বাস্তব চিত্র; আর নিমির চরিত্রেও এই খাঁটি বাস্তবতার সুরটি পাওয়া যায়।—পৃ. ১২২

[এই 'বাস্তবের স্তরই' তাহার কাল হইয়াছে—নহিলে সম্ভবত 'উপন্যাসের' দায় হইতে বাঁচিয়া যাইত। লেখক কিন্তু ঠিকই ধরিয়াছেন ; উপন্যাসের দেহটিকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া 'স্তর' বিশ্লেষণে তাঁহার তীক্ষ্ণ ছুরিকাখানি কেমন অভ্রান্ত !]

এ সকল সত্ত্বেও গ্রন্থকার মহাশয় 'আনন্দমঠ'কে একেবারে বঞ্চিত করেন নাই ; উপন্যাস হিসাবে কিছু না হইলেও তাহার গৌরব অল্প নহে।

কিন্তু আনন্দমঠের প্রকৃত গৌরব বাস্তব উপন্যাস হিসাবে নহে। বাঙ্গালার পাঠক সমাজের উপর ইহা যে বদ্ধমূল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা এক ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন্ প্রকার সাহিত্যের ভাগ্যে ঘটে নাই। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, আনন্দমঠ আধুনিক বাঙ্গালার জন্মদান করিয়াছে, আধুনিক বাঙ্গালীর হৃদয় ও মনোবৃত্তি গঠিত করিয়াছে। যে দেশাত্মবোধ আজ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাধারণ মানস সম্পত্তি, বঙ্কিমই তাহার প্রথম অঙ্কুর রোপণ করিয়াছেন।...পৃথিবীর যে কয়খানি যুগান্তকারী গ্রন্থ আছে, 'আনন্দমঠ' তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। 'বন্দেমাতরম্' আধুনিক বাঙ্গালীর বেদমন্ত্র। সেই জন্যই 'আনন্দমঠ'কে কেবল সাহিত্য হিসাবে বিচার করিলে ইহার সম্পূর্ণ মহিমা ও প্রভাব বুঝা যাইবে না। ইহার স্থান সাধারণ সাহিত্য-লোকের অনেক উর্দ্ধে।"—পৃ. ১২২-২৩

'আনন্দমঠ' তো মহাকাব্য অর্থাৎ ঐতিহাসিকের ঠিক বিপরীত ; কিন্তু "রাজসিংহ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ; এখানে ইতিহাসই প্রধান বিষয় ; ব্যক্তিগত জীবন-সমস্যা ইতিহাসের অনুবর্ত্তন করিয়াছে মাত্র।" (পৃ. ১৪৫)

'রাজসিংহে' ইতিহাস তাহার উদাসীন দূরত্ব ত্যাগ করিয়া একেবারে অতিসন্নিহিত হইয়া পড়িয়াছে ও আমাদের পারিবারিক জীবনকে প্রায় স্পর্শ করিয়াছে।—পৃ. ১৪৬

তবে কি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবেও 'রাজসিংহ' কাঁচিয়া গেল—বঙ্কিমবাবু কি এখানেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন না? গ্রন্থকার বলিতেছেন, এ উপন্যাসে—

(১) আমাদের সাধারণ মনোবৃত্তিসমূহ, আমাদের প্রেম, ঈর্ষা, বন্ধুত্ব প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবননাট্যের অভিনেতৃবর্গ ইতিহাসের ভ্রূকুটী-কুটিল দৃষ্টির তলে, ইতিহাসের নির্ম্মম-অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চালিত হইয়া একটা অলঙ্ঘনীয় প্রয়োজনের পেষণে আপন আপন অংশ অভিনয় করিতে বাধ্য হইয়াছে।—পৃ. ১৪৬

(২) 'রাজসিংহ' উপন্যাসটিকে মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ হিসাবে দেখিতে গেলে পদে পদে এই স্বাধীনতা-সঙ্কোচের পরিচয় পাওয়া যায়।—পৃ. ১৪৬

(৩) আবার অন্যদিক দিয়াও ইতিহাস পারিবারিক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে, ও তাহার তুচ্ছতম ব্যাপারের সহিত একান্ত অপ্রত্যাশিত কঠোর পরিণতির সংযোগ স্থাপনা করিয়া দিয়াছে।—পৃ. ১৪৭

(৪) 'রাজসিংহে' এইরূপ দুই চারিটি দৃশ্য ছাড়া উপন্যাসোচিত গুণ খুব বেশি নাই। চরিত্র-বিশ্লেষণ যদি উপন্যাসের প্রাণ হয়, তবে 'রাজসিংহে' তাহার অবসর অপেক্ষাকৃত কম। ইতিহাসের প্রবল স্রোতে চরিত্রের বিশেষত্ব ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।—পৃ. ১৫১-৫২

তাই বলিয়া বঙ্কিমভক্তগণের নিরাশ হইবার কারণ নাই—গ্রন্থকার সর্ব্বত্রই 'নরম-গরম কার্য্যক্ষাগে' নীতিটি বজায় রাখিয়াছেন। 'ঐতিহাসিক' ও 'উপন্যাস' এই দুইয়ের ধাক্কায় 'বানচাল' হওয়া সত্ত্বেও শেষে কিন্তু 'রাজসিংহ' উদ্ধার পাইয়াছে; যথা—

কিন্তু কেবল আখ্যায়িকা হিসাবে, একটা জাতিসংঘর্ষমূলক মহাযুদ্ধের জীবন্ত ও উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণনা হিসাবে, 'রাজসিংহ' অতুলনীয়। ইহার গঠন-কৌশলও (constructive power) অনবদ্য; দৃশ্যের পর দৃশ্য দ্রুতবেগে পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও অনাবশ্যক বাহুল্য নাই, কোথাও গতিবেগ মন্থর হইয়া আসে নাই, কোথাও কেন্দ্রাভিমুখী রেখা হইতে তিলমাত্র বিচ্যুতি হয় নাই। অবশ্য স্থানে স্থানে দুই একটি দৃশ্য অসম্ভবতা-দোষে দুষ্ট হইয়াছে।—পৃ. ১৫২

আগামীবারে সমাপ্য

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ

[পূর্বানুবৃত্তি—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র]

(১) শিলাইদহ কুমারখালি

আমি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম ডাকঘরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখিব না—কিন্তু ঠিকটি ঘটিয়া উঠিল না—পোষ্ট আফিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। তাই ইতিমধ্যে আপনার চিঠি পাইলাম।

সাতই পৌষের উৎসবে আপনি নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতনে যাইবেন নতুবা আপনাকে ক্ষমা করিব না। অনেকদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

আপনার প্রবন্ধে আপনি বড় বেশি ঝগড়া করিয়াছেন—দেখা হইলে এ সম্বন্ধে আপনার সহিত কথাবার্ত্তা হইবে। এবার কিছু দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে কাটাইবেন—আলোচ্য বিষয় অনেক আছে।

এখনি বোট ছাড়িয়া দূর চরে যাইতেছি—তাই তাড়াতাড়ি এই চিঠি লিখিয়া ডাকে দিলাম। ৭ই পৌষে নিরাশ করিব না। আমি সম্ভবত আগামী রবিবার মেলে বোলপুর যাইব। ইতি ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩১০

(২) [শিলাইদহ]

আপনার পত্র শান্তি-নিকেতন হইতে ঘুরিয়া আজ এইমাত্র শিলাইদহ আসিয়া পৌঁছিল। তখন আপনার দুটি ছাত্র রথী ও সন্তোষ এবং অধ্যাপক সুবোধ পদ্মার জলে নামিয়া সাঁতার কাটিতেছিল আমি তীর হইতে তাহাদিগকে সুসংবাদ জানাইলাম। ইহাতে স্নানকারীদের আনন্দ-আন্দোলনে পদ্মার তরঙ্গ-চাঞ্চল্য দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সকলেই ভোজের প্রত্যাশা করিতেছে। যদি এখানে উপস্থিত হইয়া আনন্দ-উৎসব সম্পন্ন করেন তবে পদ্মার টাট্‌কা ইলিষ অত্যন্ত সুলভ মূল্যে পাইবেন। অতএব অবিলম্বে এখানে আসিবেন।

অধ্যাপক-সমিতিতে আপনার স্থায়ী অধিকার আমরা সাদরে রক্ষা করিব। শুদ্ধ তাহাই নহে আমাদের বিদ্যালয়ের মন্ত্রণা-সভাতেও আপনার আসন আমরা পাতিয়া রাখিব এবং সে আসন যেন শূন্য না থাকে আমাদের এই দাবী রক্ষা করিবেন। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমকে আপনি নিজের জিনিস বলিয়া মনে রাখিবেন এই আমার অনুরোধ। ৯ই মাঘ

পর্য্যন্ত আমি এখানে আছি। রথীরা ১৭ই-১৮ই পর্য্যন্ত থাকিবে। যদি অল্প স্বল্প পড়াইবার সুবিধা করিতে পারি তাহা হইলে মাঘ মাসটা তাহারা এখানেই কাটাইয়া যাইবে। এই সময়টি এখানে বড়ই রমণীয়। জগদানন্দও আসিবেন এমন কথা আছে—তাহা হইলে আপনাদের সেই বোলপুর মাঠের অধ্যাপক-Trinity একবার এই পদ্মার উর্ম্মিলীলার মধ্যে মিলিত হইতে পারিবে। মনে রাখিবেন এখানে খেচর ভূচর জলচর ও উভচর কোনো শ্রেণীর খাদ্যই নিষিদ্ধ ও দুর্লভ নহে, সুবোধ প্রত্যহ তাহার প্রমাণ পাইতেছেন। আপনি যেদিন ছাড়িবেন তাহার আগের দিন যদি আমরা খবর পাই তবে চরে আসিবার জন্য কুষ্টিয়া হইতে আপনার নৌকার ব্যবস্থা করিয়া দিব। ইতি ৩০শে পৌষ ১৩১০

(৩) শিলাইদহ কুমারখালি

দীনেশবাবুর[১] প্রবন্ধ অত্যন্ত অযোগ্য হইয়াছে। ছাপার পূর্ব্বে দেখি নাই, ছাপার পরে লজ্জিত হইয়া আছি। ওটা যে বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল তাহা একেবারে ভুলিবার চেষ্টায় আছি, দোহাই আপনার, এ প্রবন্ধ লইয়া আপনি আন্দোলন জাগাইবেন না। কোনো তর্ক না তুলিয়া সাধারণ ভাবে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করিবেন। এই লেখাটা বাহির করিবার জন্য আমি শৈলেশকে[২] যথেষ্ট ভৎর্সনা করিয়াছি।

আপনার সাংসারিক দুর্ঘটনার সংবাদে ব্যথিত হইলাম। আপনি কোথায় কাজ আরম্ভ করিতেছেন, কিরূপ বুঝিতেছেন, সে সমস্ত সংবাদ কিছুই লেখেন নাই। এখানে বিদ্যালয় তুলিয়া আনিয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া আছি। মোহিতবাবু কাজে যোগ দিয়াছেন। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ আবার বোলপুরে যাইব। ১৫ই বৈশাখ বিদ্যালয়ের ছুটী—ছুটীর এক মাসও আমি এইখানে কাটাইব মনে করিতেছি। ইতি ১৮ই ফাল্গুন ১৩১০

(৪) শিলাইদহ কুমারখালি

আমি এখানকার নায়েবের কাছে আপনার কথা বলিয়া রাখিয়াছি। নায়েব আপনার ওকালতীর উপক্রমণিকায় যথোচিত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যখন অবকাশ পান এখানে আসিবেন এবং শামলা-মুকুট গ্রহণ করিবেন।

---

১ দীনেশচন্দ্র সেন ২ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, 'বঙ্গদর্শনের কর্ম্মাধ্যক্ষ

কিন্তু ব্যায়াম-শিক্ষক মহাশয়কে আমার মিনতি জানাইয়া বলিবেন কাহারো কাছে কোন প্রকার উমেদারি করা আমার বয়সে আর সাজে না। সামাজিক ভিক্ষা-বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছি, আবার সেই পরিত্যক্ত ঝুলি কাঁধে করিয়া কাহারো দ্বারে গিয়া হাজির হইতে পারিব না।

আমাদের বিদ্যালয় হইতে পত্রিকা বাহির করিতে সতীশের* অত্যন্ত আগ্রহ ছিল—তাহার কতক কতক লেখাও ছিল। তখন সে আমাকে একপ্রকার রাজি করিয়া তুলিয়াছিল কিন্তু সুবোধের উপর নির্ভর করিয়া তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুডুপেনাস্মি সাগরং অবস্থা যদি আমার হয় তবে গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।

তা ছাড়া আমার শরীর মন নিতান্ত পরিশ্রান্ত। যা কাজ ঘাড়ে লইয়াছি তাহার ভার অল্প নহে। তা ছাড়া অর্থ-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি রাখিলে মনের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয় না। সুবোধ ইতিমধ্যে প্রখর পদ্মাস্রোতে স্নান করিতে গিয়া পা মচকাইয়া পড়িয়াছিল—সেই অবধি নিজের পদসেবায় অহরহ নিযুক্ত আছে। সন্তোষও সপ্তাহ দুয়েক পা ভাঙিয়া চিকিৎসাধীনে আছে। মোহিতবাবুরও সেই অবস্থা। অধ্যাপকদিগকে স্ব স্ব পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছি।

আমরা এখানে প্রায় আষাঢ়ের আরম্ভ পর্য্যন্ত থাকিব। ইতিমধ্যে আপনার সাক্ষাৎকার আশা করা যাইতে পারিবে। ইতি ৯ই চৈত্র ১৩১০

(৫) শিলাইদহ কুমারখালি

আমার শরীর বড় ভাল নয়। রোজই অল্প অল্প জ্বর আসিয়া ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ডাক্তারের পরামর্শের জন্য একবার কাল কলিকাতা যাইব।

আপনার অল্প বয়স। ভাগ্যকে লইয়া আর অধিক দিন খেলা করিবেন না। মনস্থির করিয়া ফেলুন। না হয় কোমর বাঁধিয়া হেড মাষ্টারিতেই লাগিয়া যান্ না কেন। যতই দ্বিধা করিবেন শরীর মন ততই বিকল হইতে থাকিবে। কিন্তু পরামর্শ জিনিসটা অত্যন্ত সহজ ও

* সতীশচন্দ্র রায়

শস্তা, তাহাতে প্রায় কোন ফল হয় না—তবু না দিয়া থাকিতে পারিলাম না, কিছু মনে করিবেন না। ইতি ২৯শে চৈত্র ১৩১০

(৬) একটি বৃহৎ কাজের ভার লইলেই নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হইবার অবকাশ পাওয়া যায়। আমিও আমার স্বভাবের অসম্পূর্ণতা নানারূপেই অনুভব করি। তৎসত্ত্বেও আমার উপরে যে ভার পড়িয়াছে তাহা আমাকে বহন করিতেই হইবে। ভার লাঘব করিবার জন্য আপনারা সকলেই আমার যথার্থ সহায় হইবেন এই আশা আমি সর্ব্বদা একান্তমনে অন্তরে পোষণ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আপনি লিখিয়াছেন আমারই অন্যায় ও দুর্ব্বলতা আপনার কর্ম্ম পরিত্যাগের কারণ। কিন্তু আমার চেয়ে আমার কাজকে যদি আপনি বড় করিয়া দেখিতেন তবে কোন সঙ্কটেই আপনি আমাকে ত্যাগ না করিয়া সত্য এবং কল্যাণের জয় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। আমিও আমার নিজের বা আর কাহারো কোন ত্রুটি দেখিয়া আমার কর্ম্ম পরিত্যাগ করি নাই। কিন্তু আপনি নিজেকে ভুলিতে পারেন নাই। আপনি ব্রহ্ম বিদ্যালয়কে আপনার করিয়া লন নাই। এ বেদনা আমার আজও মনে আছে। ইতিমধ্যে যে কোন ঘটনাই হউক্— আপনি, সুবোধ এবং জগদানন্দ আমার অন্তর অধিকার করিয়া আছেন—আমরা আত্মীয় ভাবেই ছিলাম—সে ভাব ভোলা কঠিন। সেই জন্যই বিদ্যালয়ের প্রতি আপনাদের অনাসক্তি ও বিমুখতা আমার পক্ষে চিরকালই ক্লেশকর হইয়া থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া এই অন্যায় কথা আপনি মনেও স্থান দিবেন না যে বিদ্যালয়ের পক্ষে কোন আশঙ্কা বা অবনতির কারণ ঘটিয়াছে। প্রতিদিনই আমি এই বিস্ময় অনুভব করিতেছি যে, সমস্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া বিদ্যালয় নবতর প্রাণ ও প্রবলতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। ঠিক এই সময়ে বিদ্যালয় তাহার অনেক বালাই কাটাইয়া একটি মহিমময় নবযৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছে। সে সকল ভিতরের কথা আপনি জানিতে পারিবেন না। বস্তুত বিদ্যালয়ের ঠিক ভিতরের মর্ম্মটি আপনি কোনদিন একান্তভাবে আপনার অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। আপনি বাহির হইতে সংশয়ের চক্ষে পরের মত করিয়া দেখিয়াছেন।

সেইজন্যই আজ আপনি ইহার অভ্যুদয়জ্যোতি দেখিতে পাইতেছেন না কিন্তু আপনারা নিঃসংশয় হইবেন এমন দিনও আসিবে।

কিন্তু বিদ্যালয়ের কথা ছাড়িয়া দিন, ইহার ভার যদি ঈশ্বর আমার উপর দিয়া থাকেন তবে সমস্ত বিঘ্ন-বিপদের মধ্যেও তিনি ইহাকে সফলতা দিবেন—এ ভার যদি অপহরণও করেন তবু আমার কিছুদিনের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু আপনাদের সহিত আমার যে বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে তাহা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। বিদ্যালয়ের সূত্রে আপনাদের সহিত যোগ না থাকিলেও অকৃত্রিম সহজ সৌহার্দ্যের সহিত আপনাদিগকে বরাবর নিকটে পাইব এ আশা ত্যাগ করিব না। কয়েক দিন হইল রেণুকার মৃত্যু হইয়াছে। এখানে আসিয়া অবধি তাহাকে লইয়া একান্ত উদ্বেগে ছিলাম সেইজন্য পত্র লিখিতে পারি নাই—মনে করিয়াছিলাম দেখা হইবে তাহাতেও নিরাশ হইয়াছি। ইতি ২রা আশ্বিন ১৩১১

(৭) গিরিডি

আমার বিজয়ার সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। আমি ইতিমধ্যে বুধগয়ায় ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি কিছু দিনের জন্য গিরিডিতে আশ্রয় লইয়াছি। এখানে আছি ভাল। এখানকার ঐ শীর্ণধারা উশ্রি নদীর দ্বারা আলিঙ্গিত প্রান্তরের উপরে স্নিগ্ধ শুভ্র শরৎকালটি বড় মধুর ভাবে আবির্ভূত হইয়াছে।

কিন্তু আপনি সার্ভে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন কি না বলুন। দ্বিধা ও নিশ্চেষ্টতার মধ্যে জীবনটাকে ব্যর্থ করিবেন না। এইবার একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন।

ছুটির পর হইতে বোলপুর বিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্তন করা যাইতেছে। বড় ছেলেদের একেবারে বিদায় করা গেল। নগেন্দ্রবাবু গেলেন—মোহিতবাবুও থাকিবেন না। কেবল মাত্র কুড়িটি অল্প বয়সের ছাত্র স্কুলে রাখিব তাহার অধিক আর লইব না—এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার দিকে না তাকাইয়া রীতিমত শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা যাইবে। বিদ্যালয়ের আরম্ভকালে আপনারা ইহার মধ্যে যে একটি হৃদ্যতা ও শান্তি দেখিয়াছিলেন পুনরায় তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিব। আপনাদের পুরাতনের মধ্যে এখন কেবল জগদানন্দ বাকি। যাহাই হউক, পুরাতন

সম্বন্ধ বিস্মৃত না হইয়া এই বিদ্যালয়ের মধ্যে আপনার হৃদয়কে প্রেরণ করিবেন। ইতি ৪ঠা কার্ত্তিক ১৩১১

(৮) ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি আপনার কাছে সম্প্রতি কিছু অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে—কিন্তু এ কথা মনে রাখিবেন তাঁহার তাণ্ডব লীলার উপদ্রব আপনার চেয়ে অনেক বেশী সহিয়াছে এমন লোক চারিদিকেই আছে। ইহাতে কোন সান্ত্বনা পাইবেন কিনা জানি না, কিন্তু ইহা বুঝিতে পারিবেন এত ঝাঁকানিতেও এ সংসারের সন্ধিস্থলগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় নাই। আমার সুখ দুঃখে কি আসে—জগন্নাথের রথ চলিতেছে এবং ইচ্ছা করি বা না করি আমাকে তাহা টানিতেই হইবে। মুখ ভার করিয়া মনে বিদ্রোহ রাখিয়া টানাই পরাজয়—প্রফুল্ল মুখে চলিতে পারিলেই আমার জিৎ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ং
প্রাপ্তম্ প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনাপরাজিতা।

*

সুখ বা হোক দুখ বা হোক
প্রিয় বা অপ্রিয়
অপরাজিত হৃদয়ে সব
বরণ করি নিয়ো।

বরণ ত করিতেই হইবে, পেয়াদায় করাইবে, তাহার উপরে হৃদয়কে কেন পরাস্ত হইতে দেওয়া? তাহাতে কি শিকি পয়সার লাভ আছে? বরঞ্চ যাহা কিছু হইতেছে তাহাকে সহজে স্বীকার করিয়া লইলে বিশ্বশক্তির একটা আনুকূল্য হৃদয়ের মধ্যে লাভ করা যায়। আমি এই বুঝিয়া বসিয়া আছি—বেদনার কারণ ঘটিলে যে বেদনা পাই না তাহা নহে, কিন্তু আমার সেই বেদনার মেঘে জগতের সমস্ত আলোককে আমি আচ্ছন্ন করিতে দিই না। মাথাটাকে যদি মেঘের উপরে রাখিতে পারি তাহা হইলে ধ্রুব জ্যোতি কখনো ম্লান হয় না—যদি নিজের মাথা ধূলায় অবনত করি তাহা হইলেই ভ্রম হয় যে জ্যোতি বুঝি অন্তর্দ্ধান করিয়াছে ইতি ৯ই কার্ত্তিক ১৩১১

সোনার পদ্ম

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময়—১৮৭২ সাল

রায়বাবুদের কালীবাড়ি। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। মন্দিরের সম্মুখেই নাট-মন্দিরের বড় চারিটি থাম দেখা যাইতেছে। দুইটি থামের গায়ে বড় বড় শাণিত খাঁড়া ঝুলানো। নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে বড় একটি যূপকাষ্ঠ। কালীমন্দিরের মধ্যে বড় প্রদীপ জ্বলিতেছে। আরতি হইতেছে। কাঁসর ঘণ্টা জয়ঢাক বাজিতেছে। ভিতরে পুরোহিত আরতি করিতেছে। রায়কর্ত্তা ধনদাপ্রসাদ নামাবলী গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। আর কতকগুলি লোক। আরতি শেষ হইতেই লোকগুলি চলিয়া গেল। ধনদাপ্রসাদ নাটমন্দিরে একখানি বিছানো আসনের উপর বসিল। সম্মুখে একটি প্রদীপ এবং সান্ধ্যকৃত্যের আয়োজন

ধনদা। কালী, কালভয়বারিণী মা! (উপবেশন)

পুরোহিত মন্দিরদ্বার বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল

ধনদা। অতিথিশালায় আজ অতিথি কজন ভটচাজ?

সান্ধ্যকৃত্যের আয়োজনগুলি গুছাইয়া লইতে আরম্ভ করিল

ভট্টা। আজ্ঞে হুজুর, দিনের বেলায় যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চ'লে গেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কেবল একজন এসেছেন।

ধনদা। তাঁর প্রয়োজনমত ব্যবস্থা হয়েছে সমস্ত?

ভট্টা। আয়োজন সবই ক'রে রেখেছি হুজুর, কিন্তু এসেই যে তিনি কোথায় গেলেন—

ধনদা। কোথায় গেলেন মানে? কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে চ'লে যান নি তো?

ভট্টা। আজ্ঞে না। সন্ন্যাসী মানুষ—বোধ হয় গঙ্গার ঘাটে-টাটে গিয়ে থাকবেন।

ধনদা। খোঁজ কর, এখুনি খোঁজ কর। আলো নিয়ে দেখ।

ভট্টা। এই যাই হুজুর। (প্রস্থান)

ধনদা। কি আশ্চর্য্য! অতিথি কোথায় গেল খোঁজ-খবর রাখ না তোমরা?

রঙ্গমঞ্চের এক প্রান্তের থামের পাশে আপাদমস্তক আবৃত একটি লোক শুইয়া ছিল

লোক। কোথাও যাই নি আমি। আমি এই আছি।

সে উঠিয়া বসিল এবং আপাদমস্তক আবরণের চোখ দুইটি শুধু খুলিল

ধনদা। কে? কে তুমি?

লোক। আমিই সন্ধ্যেবেলায় এসেছি হুজুর।

ধনদা। হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু কে তুমি? তোমার গলার আওয়াজ আমার চেনা মনে হচ্ছে।

আলো লইয়া অগ্রসর হইল এবং মুখের কাছে ধরিল

কে? কে? কে তুমি?

প্রদীপের আলোটা নিবিয়া গেল। লোকটা হাসিয়া উঠিল সশব্দে

ধনদা। আলো! আলো! আলো!

লোক। ভয় পেলে হুজুর?

ধনদা। না না, ভয় পাই নি। কিন্তু তুমি—তুই—তুই—

লোক। হ্যাঁ, আমি কালীচরণ।

ধনদা। কালীচরণ? কেলে? তুই বেঁচে—

লোক। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বেঁচে আছি। ভয় পেও না হুজুর, আমি ভূত নই।

ধনদা। আলো! আলো! আলো!

লোক। না না। আমাকে চিনতে পারবে। আমি ফেরারী।

আলো হাতে (চৌকা লণ্ঠনের মধ্যে বড় প্রদীপ) পূজকের প্রবেশ

পূজক। হুজুর!

ধনদা। লণ্ঠনটা এইখানে রাখ। আলোটা নিবে গেছে।

পূজক। আজ্ঞে, অতিথিকে—

ধনদা। আছে, আছে। তার সঙ্গেই আমি কথা বলছি।

পূজক। আমি চারিদিক—

ধনদা। যাও যাও, তুমি যাও এখান থেকে।

পূজক। আজ্ঞে, ওঁর সেবার আয়োজন—

ধনদা। আমার মহলে। আমার সঙ্গে—আমার সঙ্গে খাবেন অতিথি। বাড়িতে বউমাকে ব'লে যাও তুমি।

পূজক। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

ধনদা। এইবার তোর মুখের কাপড় খোল্ কেলে, তোকে একবার দেখি। আজও গিন্নী বেঁচে থাকলে বড় খুশি হতেন কালী।

কালীচরণ ধনদাবাবুকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া মাথার মুখের কাপড় খুলিল এবং হাসিল

ধনদা। তেমন টাঙ্গির মত গোঁফ-জোড়া কামিয়ে ফেলেছিস কেলে? সেই গালপাট্টা, সেই বাবরী চুল, সব কামিয়ে ফেলেছিস রে? করেছিস কি?

কালী। চিনতে পারলে কোম্পানি ফাঁসি লটকে দেবে হুজুর, তাই কামিয়ে ফেলতে হ'ল।

ধনদা। ফাঁসি লটকে দেবে? কেন, আবার কি করেছিস তুই?

কালী। সেপাই-হাঙ্গামায় মেতে গিয়েছিলাম হুজুর।

ধনদা। মিউটিনিতে?

কালী। আজ্ঞে হ্যাঁ। কোম্পানির গোরার সঙ্গে লড়াই করেছি হুজুর। পাঁজরার পাশ দিয়ে একটা গুলি চ'লে গিয়েছিল। এই দেখ দাগ।

ধনদা। পনরো বছর আগে ইংরেজী ১৮৫৭ সালে মিউটিনি, তখন তো তোর জেলে থাকবার কথা কেলে। লাট কাষ্টগড়ার সীমানা নিয়ে দাঙ্গায় তোর না সাত বছরের জেল হয়? সে দাঙ্গা ১৮৫৪ সালে, তোর খালাস পাবার কথা ৬১ সালে।

কালী। সেপাইরা ক্ষেপে উঠে জেল খুলে দিয়েছিল, কয়েদীরা বেরিয়ে পড়ল। কতক যোগ দিলে সেপাইদের সঙ্গে, অনেকে চ'লে গেল বাড়ি। আমার হুজুর কেমন মাতন লেগে গেল। আমি ভিড়ে গেলাম সেপাইদের দলে। তারপর আজ পনরো বছর ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। তারপর আর থাকতে পারলাম না। ভুলাম, একবার

দেখতে এলাম। ইচ্ছে ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে চ'লে যাব। কিন্তু বুকটা টনটন করছে হুজুর। যেতে মন চাইছে না। ছেলে, মেয়ে, পরিবার, ঘর, ভিটে, গাঁ, তুমি—হুজুর, যাবার কথা মনে হ'লে—এই দেখ হুজুর, আমার চোখ ফেটে জল এসেছে। ধর, আলোটা তুলে ধর, দেখ।

ধনদা। ভয় নেই কালীচরণ, রাজ্য এখন আর কোম্পানির নয়। ভারতের মহারাণী এখন কুইন ভিক্টোরিয়া। তিনি ঘোষণা ক'রে সব মাফ দিয়েছেন। তোকে পালাতে হবে না, লুকিয়ে ফিরতে হবে না, তুই থাকবি, যেমন ছিলি তেমনই থাকবি।

কালী। মহারাণীর জয় হোক। তুমি সত্যি বলছ হুজুর?

ধনদা। ভয় নেই তোর, আমি বলছি।

কালী। পায়ের ধুলো দাও হুজুর। তুমি রাজ্যেশ্বর হও। আজ তিন দিন আমি এসেছি হুজুর। রোজ রাত্রে ভেবেছি, চ'লে যাই। কিন্তু পারি নি। সোনার চাঁদ ছেলে, হুজুর, ভল্লা বাগদীর ছেলে তারাচরণ আমার লেকাপড়া শিখেছে, গান বাঁধে, কবি গায়। পরিবার টগরকে দেখলাম হুজুর, সিঁথির সিঁদুর ডগডগ করছে। আমাদের ঘরের মেয়ে, আজ চোদ্দ বছর স্বামী ছেড়ে আছে, দেখলাম, আমার লাঠিটাকে তেল সিঁদুর দিয়ে পূজো করে। দুঃখের মধ্যে দুঃখ, পদ্ম ম'রে গিয়েছে। পদ্ম আমার সোনার পদ্ম। ফুটফুটে গোরো রং, তেমনই চোখ, তেমনই নাক। আমি যখন জেল যাই, তখন পদ্ম বারো বছরের। সে কি কান্না পদ্মর! পদ্ম আমার বোন হ'লে কি হবে, আমার মেয়ের বয়সী। মা আমার হাতে হাতে দিয়ে গিয়েছিল পদ্মকে।

ধনদা। (ধরা গলায়) কালী!

কালী। হুজুর!

ধনদা। (অন্যমনস্ক ও চিন্তান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল) তাই তো কালী, তাই তো রে!

কালী। কি হ'ল হুজুর? কোন কাজ ভুলেছ বুঝি?

ধনদা। না।

কালী। তবে?

ধনদা। তুই এক কাজ কর কালী। তুই—। কালী, তুই আমাদের লাট রত্নপুরে গিয়ে বাস কর। এ গ্রামে থাকা তোর ঠিক হবে না।

কালী। কেন হুজুর? (ধনদা নীরব) ও হুকুম তুমি ক'রো না হুজুর। হুজুর, আমার পরিবার-ছেলের মায়াতেই কি শুধু ফিরেছি মনে করছ? তুমি তো জান, বেটাছেলে মরদ, দ্বীপান্তরে গিয়ে সেইখানেই কত জন্ম বিয়ে ক'রে বাস করে। আমার এই গাঁ, আমার পিত্তিপুরুষের ভিটে—আজ সাত বছর অহরহ আমার মনে পড়েছে। হুজুর, সেদিন চাঁদনী রাতে যখন নদীর ওপারে এসে দাঁড়ালাম, তখন নদী দুকূল পাথার, নদীর টানের কলকল শব্দ শুনে আমার বুকও শিউরে উঠল। থমকে দাঁড়ালাম। চাঁদনী রাতে বুড়োশিবের মন্দিরের চূড়োর পানে তাকালাম, তোমাদের দুধবরণ চিলেকোঠার ছাদ ঝলমল করছে দেখলাম। আমাদের পাড়ার অশথগাছের ডগাটা দেখলাম হিলহিল ক'রে বাতাসে কাঁপছে। হুজুর, নদীর জলের শব্দ যেন আর শুনতে পেলাম না। দুকূল পাথার জল চোখে যেন দেখতে পেলাম না। বুকের মধ্যেটা আনচান ক'রে উঠল। 'জয় কালী' ব'লে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম নদীতে। সোজা সাঁতার কেটে এসে উঠলাম তোমাদের অন্দরের ঘাট—বউমানিকের ঘাটে। গাঁ ছাড়তে ব'লো না হুজুর। জোড়হাত করছি তোমাকে।

ধনদা। না না না, সে কথা নয় কালীচরণ।

কালী। হুজুর, তুমি কি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না।

ধনদা। পদ্মর মৃত্যুর খবর তোকে দিলে টগর—তোর পরিবার?

কালী। হ্যাঁ, বললে, কলেরা হয়ে—

ধনদা। কালী, তোকে রত্নপুরে গিয়েই বাস করতে হবে। সেখানে তোকে আমি পঁচিশ বিঘে জমি দোব।

কালী। ও। আমার চাকরান জমি কেড়ে নিয়েছ হুজুর, তাই বলছ? যা কেড়ে নিয়েছ, তাই ফিরে দিলে তোমার মাথা হেঁট হবে। বুঝেছি হুজুর।

ধনদা। হ্যাঁ, তোর পাইক-সর্দ্দারী চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালীচরণ।

কালী। দোষ তোমার হয়েছে হুজুর। আমার বাবা দ্বীপান্তরে মরেছে হুজুরদের চর দখলের দাঙ্গার মামলায়, আমার হ'ল সাত বছর মেয়াদ। তবে অন্যে না বুঝুক, আমি জানি, তুমি কেন আমার চাকরান কেড়ে নিয়েছ।

ধনদা আশ্চর্য্য হইয়া কালীর মুখের দিকে চাহিল

ধনদা। তুই জানিস কালীচরণ?

কালী। তুমি তারাচরণকে জব্দ করবার জন্যে কেড়ে নিয়েছ জমি, সে আমি জানি। সেই কথাই আমি বললাম তারাচরণকে—বেটা, তুমি হয়েছ দৈত্যকুলের পেহ্লাদ, লাঠিয়াল বাগদীর ছেলে—লাঠি ছেড়ে কবিয়াল হয়েছ, লেকাপড়া শিখেছ, দুঃখ তোমার হবে না?

ধনদা। আঃ! কালী!

কালী। হুজুর!

ধনদা। চুপ কর তুই, চুপ কর।

কালী। কতকাল পরে হুজুরের পায়ের তলায় এসে পড়েছি, অভয় পেয়েছি, আজ আর চুপ করতে পারছি না হুজুর। শোন শোন হুজুর, তারাচরণ কি বললে শোন, নিজে বেঁধে একখানা গান শোনালে আমাকে। বেটার গলাখানি, বড় মিঠা হুজুর। গানখানিও বেশ, সুন্দর গান—"যে বাঁশেতে লাঠি হয় রে মন, সেই বাঁশে হয় মোহনবাঁশী।" হুজুর, হতভাগা কর্ম্মফেরে শাপভ্রষ্ট হয়ে আমার ঘরে বাগদী-বংশে এসে পড়েছে। গান শুনে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না তারাচরণকে। (হাসিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) তা, তারাচরণ হুজুরের কাজ করে নাই, জমি কেড়ে নিয়েছ, এইবার আমি ফিরে এসেছি, আবার লাঠি ধ'রে হুজুর-সরকারের কাজ করব, আমাকে জমি ফিরে দেবে। কাছারিতে সবারই সামনে আমি তোমার পায়ে ধ'রে চেয়ে নেব।

একটি তরুণী আবছা আলোর মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া ধনদাপ্রসাদের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল

পদ্ম। বাবু, বড়বাবু! বিচার কর বড়বাবু, বিচার কর।
কালী। কে? কে? (চমকিয়া উঠিল)
ধনদা। (কালীচরণকে) স'রে যা, তুই এখান থেকে স'রে যা—কালীবাড়ির বাইরে। আমি আসছি। তুই স'রে যা।

তরুণীটি কালীচরণের কণ্ঠস্বর শুনিয়া উঠিয়া বসিল

পদ্ম। দাদা!
ধনদা। (ধমক দিয়া বলিলেন) কালীচরণ!
কালী। প—দ্ম!
ধনদা। (অধিকতর রূঢ়তার সহিত বলিলেন) কেলে!
কালী। পদ্ম! পদ্ম! পদ্ম!
ধনদা। হ্যাঁ, পদ্ম। পদ্ম এখন বোষ্টম। তুই বাইরে যা কালীচরণ।
কালী। বোষ্টম! ও! বাগদিনীর গায়ে বোষ্টমী গোবর মাখিয়েছ? বোষ্টমী এখন বুঝি তোমার বাগান-বাড়িতে থাকে?
ধনদা। কালীচরণ, তুই বাইরে যা।
কালী। তোমার লজ্জা হচ্ছে হুজুর? তোমার লজ্জা হচ্ছে? (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সহসা হাসি থামাইয়া) ও, এইজন্যেই বুঝি তুমি বলছিলে লাট রতনপুরে গিয়ে থাকতে?
ধনদা। বল তোর পদ্ম, কি হয়েছে? আগে বল, তারপর দাদার মুখের দিকে তাকাবি।
পদ্ম। কি হয়েছে? এই দেখ।

সে তাহার বাহুমূলের কাপড় তুলিল, সেখানে কয়েকটা চাবুকের আঘাতের চিহ্ন

ধনদা। আঃ! কে—কে মেরেছে এমন করে? কে?
পদ্ম। বলব? বল, বিচার করবে?
ধনদা। বল, বল, আগে বল।
পদ্ম। বড় খোকাবাবু।
ধনদা। বড় খোকাবাবু? প্রমদা?
পদ্ম। হ্যাঁ।
ধনদা। কিন্তু কেন?

পদ্ম চুপ করিয়া রহিল

ধনদা। পদ্ম!

কালী। ছাড়ান দাও বাবু, ও কথা ছাড়ান দাও।

ধনদা। পদ্ম!

পদ্ম। আমি পান সাজছিলাম তোমার জন্যে। খোকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে, বারান্দায় উঠে আমাকে পান চাইসে। আমি বললাম, এ তোমার বাবার পান, তোমাকে সেজে দিচ্ছি আলাদা ক'রে। সে বললে—আমি ওই পানই নোব। আমি দিই নাই, তাই বসিয়ে দিলে চাবুক—চাবুকের ওপর চাবুক। বড়বাবু, আমি বাগদীর মেয়ে, চাবুকটা আমি কেড়ে নিতে পারতাম। তা ছাড়া যে কথা সে আমাকে বলেছে, তা তোমার কাছে বলতে আমারও লজ্জা হয়। কিন্তু সে তোমার ছেলে ব'লে—

ধনদা। তারা, তারা মা!

ধনদা থামে ঝুলানো খাঁড়াখানা টানিয়া লইল

কালী। (হাসি থামাইয়া) বড়বাবু!

ধনদা। পথ ছাড় কেলে। এতবড় পাপ—

কালী। পাপ তার নয় বড়বাবু, পাপ তোমার।

ধনদা। প্রমদাকে কেটে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব আমি, পথ ছাড়।

কালী। খাঁড়াখানা ছাড় আগে।

ধনদা। কেলে!

কালী। (খাঁড়াখানা কাড়িয়া লইয়া হাসিল) এক আখড়ায় খেলেছি বড়বাবু, আমার চেয়ে তোমার কম জোর ছিল না। কিন্তু ব'সে ব'সে খেয়ে তোমার ভুঁড়ি বেড়েছে, সে ক্ষমতা তোমার আর নাই। আর—আর—বড়বাবু, মহাপাপ—তুমি মহাপাপ করেছ।

ধনদা। তুই যা জানিস না কেলে, তা নিয়ে কথা বলিস নি। পদ্মকে আমি তন্ত্রমতে—

কালী। থাম বড়বাবু। খাঁড়াখানার শানের পালিশ চকমক করছে। মুখ দেখা যায়। একবার দেখ দেখি নিজের মুখ, এই আলোর কাছে ধরেছি, দেখ, দেখ।

ধনদা। কেলে!

কালী। আগে তাকিয়ে দেখ বড়বাবু, তারপরে কথা বলবে। দেখ, তাকিয়ে দেখ। তোমার বাঁ গালে আঁচিল আছে, আমার বাঁ গালেও আঁচিল আছে, পদ্মর মুখরে দিকে চেয়ে দেখ—তারও আছে। তোমার মুখের ছবি দেখে আমার মুখ মিলিয়ে দেখ। বড়বাবু, আমার বাবা বাগদী নয়। বাগদীর ছেলের রং এত ফরশা হয় না।

ধনদা। (সভয়ে) কালীচরণ, কালীচরণ!

কালী। আমি তোমার ভাই। তবে মা আমার বাগদিনী। পদ্ম—

পদ্ম। দাদা! দাদা!

কালী। আমার মা আমাকে নিজে ব'লে গিয়েছে। ওই হতভাগী পদ্মর বিয়ের লেগেই সব খুলে ব'লে বলেছিল, ভাল ঘর দেখে ওর বিয়ে দিস। জান বড়বাবু, মায়ের মুখে আমি আগুন দিই নি। রাত্রে মা মরবে বুঝতে পেরে আমি সন্ধ্যেতেই চ'লে গিয়েছিলাম তোমাদের একটা বাজে কাজের ভার নিয়ে।

ধনদা। (নত মস্তকে পদচারণা করিয়া) কালী, এক কাজ কর, পদ্মকে তুই আজই ছিপে ক'রে কাশীতে গিয়ে রেখে আয়।

কালী। না হুজুর, না। তোমার পাপ, আমাদের বাপের পাপ, আমার মায়ের পাপ—আমিই মাথায় ক'রে নিলাম। পদ্ম! উঠে আয় বোন, উঠে আয়।

পদ্ম। দাদা! দাদা গো!

কালী। (সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া) পদ্ম, তুই আমার সোনার পদ্ম রে! আয়, আমার সঙ্গে আয়, বাড়ি আয়।

ধনদা। দাঁড়া কালীচরণ। আমার খাস জোতের উৎকৃষ্ট আওয়ল জমি—পঞ্চাশ বিঘে তোকে আমি দান করলাম।

কালী। দান করলে হুজুর? (হাসিল)

ধনদা। হ্যাঁ। আর, আয় আমার সঙ্গে, অন্দরে আমার সঙ্গে তোর খাবার ব্যবস্থা করেছি—

কালী। ব্যান্নেনে নুন আছে হুজুর। মাপ কর হুজুর, তোমার নুন খেতে আর পারব না। তোমার জমিও তুমি নৈবুতা-ব্রাহ্মণকে

দিও হুজুর, ও জমির তাতে আমি—আমার বংশ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। পঞ্চাশ বিঘে জমি বড়বাবু? ভাই ব'লে যদি সম্পত্তির ভাগও দিতে চাও, আজ তাও নিতে পারব না। পদ্ম আয়, চ'লে আয়। (প্রস্থান)

ধনদা। কালীচরণ, কালীচরণ!

অনুসরণ করিতে গিয়া—নাটমন্দিরের সর্বশেষ থাম ধরিয়া দাঁড়াইল, তারপর ফিরিয়া মন্দিরের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িল

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামপ্রান্তের পথ

তারাচরণ, রাজা মিয়া, জমিদারের গোমস্তা

রাজা। যাও যাও, বেশি কথা বুলিয়ো না গমস্তা ঠাকুর। ইয়ার আর বুলবা কি? কি বলব, তারা-ভাই বারণ করছে। লইলে দেখাইতাম একবার। মেলা তুমাদের লণ্ডভণ্ড কর্যা দিতাম।

গোমস্তা। মিয়া সাহেব, কথা আমি তোমাকে বলি নাই। বলছি আমি তারাচরণকে। তারাচরণ, তুমি দুঃখ ক'রো না। ব্রাহ্মণ বর্ণগুরু—

রাজা। রাখ ঠাকুর তোমার বেরাম্মন! বামুন হইছে তো হইছে কি? কবি গাইতে আসছে, পয়সা লিবে, যার সাথে পাল্লা দিতে বুলবে তারই সাথে পাল্লা দিবে। কেনে? আণ্টুনী ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রার মতন কবিয়াল কে আছে শুনি? তারাচরণ বাগদী হলিও কবিয়াল। কেনে, তার সাথে পাল্লা দিবে না কেনে?

গোমস্তা। তারাচরণ, এই মিয়া সাহেবই কি তোমার কথা বলবে বাবা?

রাজা। হ্যাঁ, বুলবে।

তারা। রাজা-ভাই, তোমাকে জোড়হাত করছি আমি।

রাজা। তুমার অপমান করলে তারা-ভাই, আর তুমি বুলছ চুপ করতে?

তারা। ব্রাহ্মণ, আমাদের মাথার মণি রাজা-ভাই।

গোমস্তা। এই। ও অপমান তোমার আশীর্ব্বাদ।

তারা। (হাসিয়া) কাঁটা—সোনার কাঁটা হ'লেও অঙ্গে বিঁধলে ব্যথা করে গমস্তা মশায়। যাক উ কথা, আমি কিছু মনে করি নাই। আমি বাড়ি যাচ্ছি প্রভু, আমি চ'লে যাচ্ছি।

গোমস্তা। শোন। ধর। (হাত বাড়াইল)

তারা। কি?

গোমস্তা। টাকা। দুটি টাকা বাবু তোমাকে বকশিশ দিয়েছেন।

তারা। বামুনের জুতোর দক্ষিণে লাগে না প্রভু।

গোমস্তা। তা হ'লে আমার দোষ নাই কিন্তু। আচ্ছা, তা হ'লে আমি আসি।

টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে প্রস্থান

রাজা। আমি তুমাকে বুলছি তারা-ভাই, বামুন তুমার গান শুন্যা হারবার ভয়ে ওই প্যাঁচটি মারলে। বাগদীর ছেল্যের সাথে—বামুন আমি—পাল্লা দিব না আমি।

তারা। আর কবি গাইব না রাজন, আর কবি গাইব না।

রাজা। হাজারবার গাইবা, লাখোবার গাইবা।

তারা। না, বাবা আমার সেদিন বলেছিল, ঠিক বলেছিল। বলেছিল কি জান? বলেছিল, বাগদীর ছেলে, লাঠিয়ালি ছেড়ে কবিয়াল হ'লে তুমি, কপালে তোমার দুঃখ্ আছে। পিতৃবাক্য ফ'লে গেল।

রাজা। রাগে দুখে চোখে আমার জল আসছে তারা-ভাই।

তারা। এই মরেছ, রাজন। কাঁদবে কি দুঃখে? রাগই বা কিসের? ছাড়ান দাও ও কথা। চামড়ার মুখ ফসকে কত রকম বেরিয়ে যায়; ঢোলের বাদ্যি বাঁধা বোল—তাই কত তাল কাটে। যাও যাও, শ্বশুর-বাড়ি যাচ্ছিলে, চ'লে যাও। তোমার রাণী-বিবি যুবরাজ-মিয়াকে কোলে ক'রে এতক্ষণ ঘর বার ক'রে সারা হ'ল।

রাজা। এই দেখ—আমাকে কি বুলছ আবার? কি বিবি?

তারা। রাণী-বিবি। যুবরাজ-মিয়া। তুমি যখন রাজা-মিয়া, তোমার বিবি তখন বিবি-রাণী—মানে বেগম।

রাজা। আলবাৎ।

তারা। ছেলে তখন যুবরাজ-মিয়া—মানে শাজাদা।

রাজা। বহুৎ আচ্ছা ওস্তাদ।

তারা। শোন শোন—

রাজার ঘরের ঘরণী—মহামান্যা বিবি-রাণী,
তিনি খান বড় বড় ফেণী—
সর্ব্বলোকে বলে।

বিবির জন্যে মেলা থেকে বড় বড় ফেণী কিনে নিও, বুঝলে?

রাজা। তাই তো ভাই তারা, তুমার সাথে তো পয়সা-কড়ি—

তারা। আচ্ছা বদরসিক তুমি। শোন, তারপর শোন—

রাজার বেটা যুবরাজা, তেজার বেটা মহাতেজা,
খায় সে খাস্তা খাজা গজা—
বিদিত ভূমণ্ডলে।

রাজা। শুন তারা-ভাই। আগে আমার কথা শুন।

তারা। বল।

রাজা। তুমার কাছে পয়সা-কড়ি তো কিছু নাই?

তারা। শোন। এইটে বলে—খাব খাব, এইটে বলে—কোথা পাব—

রাজা। থাম তারা-ভাই, তুমি থাম। তুমার ভাবনা হয় না তারা-ভাই?

তারা। তুমি হাসালে রাজন। ঘরে দেখে এসেছি, চাল বাড়ন্ত, মায়ের রূপোর খাড়ুটা পর্য্যন্ত মা লুকিয়ে বেচেছে। এতকাল পরে বাবা ঘরে ফিরল, আমি উপযুক্ত ছেলে, তাকে নিশ্চিন্তি করতে পারলাম না। বাবা গেছে বীজনগর সিংহীবাবুদের বাড়ি—তাদের নাকি পাইক-সর্দ্দারের দরকার আছে। বড় আশা ক'রে আমি মেলায় গাওনা করতে এসেছিলাম। গাওনার পাল্লায় চাটুজ্জে-কবিকে হারিয়ে দোব, আমার নামডাক হবে; তা—চাটুজ্জে মশায় বাগদী ব'লে কবিই গাইলে না আমার সঙ্গে। আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বগ্গে যায় না রাজন।

রাজা। শুন, ধর। আমি বুলছি ধর।

তারাচরণের হাতে কিছু গুঁজিয়া দিল

তারা। এ কি? এ যে টাকা।

রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার কাছে দুটি ছিল, তুমি একটি লাও, আমি একটি নিয়া চললাম।

তারা। না রাজন।

রাজা। আরে বাবা—দেখ তারা-ভাই, ই গাঁয়ের বেটীরা সব ভাঁজো পরব লাগাইছে হে। দেখ—কেমন নাচছে দেখ।

তারাচরণ পিছন ফিরিয়া চাহিতেই রাজা চলিয়া গেল

তারা। (ঘুরিয়া) রাজা-ভাই, রাজন! দাঁড়াও, দাঁড়াও!

ভাঁজোর ডালা মাথা পল্লীর নিম্নশূদ্রশ্রেণীর মেয়েদের প্রবেশ। তাহারা দুই দলে বিভক্ত

সকলে একসঙ্গে। ভাঁজো আমার—সোনার ভাঁজো—
ও আমার সুন্দরী গো!
আদুরী লো—এলি ভাদরে—ইঁদ রাজার অপ্সরী গো!

তারাচরণের পুনঃপ্রবেশ

১ম দলের জয়া। আমার ভাঁজোর গলায় দিব পদ্মশালুক মালা—
লায়ে থেকে আনব সিঁদুর ভাঁজো করবে আলা—
চাঁদ-কপালে সিঁদুরফোঁটা—মরি মরি হায়, মরি গো!

২য় দলনেত্রী। তোর ভাঁজোতে মোর ভাঁজোতে পাতিয়ে দোব সই,
গয়না কিন্তু লারব দিতে মুড়কিমালা বই।
সই—সই—সই পাতালে—নীলপরী লালপরী গো!

১ম দলের জয়া। মুড়কিমালা তোরই থাকুক, গুড়-মাখানো খই,
আমি বরং কিনে দোব এক পয়সার দই।
নীল পরী কালিন্দী লাজে মরি—গলায় দড়ি লো!

২য় দলের মেয়ে। হ্যাঁলা, জয়া দাসী, বলি গোরো রং কারুর হয় না নাকি?

১ম দলের জয়া। হয় বইকি। তবে হ'লেই এমনই দেমাক হয়। "মিনি হলুদে গোরো গা, গরব কেন হবে না?"

২য় দলের নেত্রী। চল লো, চল, আমরা ভিন ঘাটে ঘট ভ'রে আনি।

কে জানে ভাই, কালো হাতের ছোঁয়া জলের ছিটে লাগে যদি সুন্দরীর গায়ে!

জয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল

তারা। (দ্বিতীয়ার প্রতি) তুমি জবাব দিতে পারলে না ভাই?

জয়ার দলের মেয়ে। ও মাগো! এ আবার কে লো?

জয়া। 'বন থেকে বেরুল টিয়ে, লাল গামছা মাথায় দিয়ে।'

তারা। (দ্বিতীয়াকে) বল তো আমি জবাব দিয়ে দিই।

জয়া। (গান ধরিল)

নীল পরীর বঁরাতি ভাল, পথে জুটল সয়া—
সইয়ের বদলে সয়া—সবই ভাঁজোর দয়া।
দয়াময়ী ভাঁজো লো তোর চরণেতে গড় করি গো!

(দলসহ প্রস্থান)

তারাচরণ গাহিল সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়াও গাহিল

নীল-পরীর সই জুটেছে—তাই জুটেছে সয়া—
আমার ভাঁজোর চেয়ে লো সই তোমায় ভাঁজোই পয়া।
তোমার গলায় ফুলের মালা—আমার গলার দড়ি গো!

দ্বিতীয় দলের মেয়েরা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। জয়া ঘুরিয়া আসিয়া তারাচরণের সম্মুখে দাঁড়াইল

জয়া। জানিস, আমি বাগদীর মেয়ে।

তারা। নাকি? তা জানতাম না, এই জানলাম।

জয়া। না, এখনও জানতে কিছু বাকি আছে, এই নে, জেনে নে।

সজোরে চড় কষাইয়া দিতে গেল, কিন্তু তারাচরণ খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। জয়া তৎক্ষণাৎ বাঁ হাত চালাইল, তারাচরণ সে হাতও ধরিয়া ফেলিল

তারা। (হাসিয়া) ওরে বাপ রে, তুমি বাগদিনী নও, বাঘিনী। দু হাতে সমান থাবা চালাচ্ছ! তবে কি জান, আমিও বাগদীর ছেলে।

জয়া। হাত ছেড়ে দাও। হাত ছাড়।

তারা। উঁহু।

জয়া। ছাড় বলছি।

তারা। হাত ছাড়লেই তো তুমি ফস ক'রে আবার চড়িয়ে দেবে ?
জয়া। না। ছাড় তুমি।

তারা হাত ছাড়িয়া দিল। জয়া দ্রুতপদে যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিল

জয়া। পালিও না তুমি।
তারা। মানে ?
জয়া। বাবাকে দাদাকে ডেকে আনি আমি।
তারা। ওঃ, তুমি খুব রসিক লোক তো ! আমাকে মার দেবার জন্যে তুমি লোক ডেকে আনবে, আর আমি দাঁড়িয়ে থাকব ? তার চেয়ে তুমিই তো বলতে পার—তুমি পিঠ পাত, আমি মারব।
জয়া। ভয়ে পালাবে তুমি, কি রকম বাগদীর ছেলে ?
তারা। বুদ্ধিমান বাগদীর ছেলে। তুমি দশজনাকে ডেকে আনবে, আর আমি একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাব, বাগদীর ছেলে হ'লেও সে রকম বেকুব নই আমি।
জয়া। আচ্ছা, পালিয়েই বা কতদূর যাবে তুমি, আমি দেখি। এইখান থেকেই ডাকছি। দাদা ! দাদা ! বাবা !

নেপথ্য মুখে দাঁড়াইল

কালো মেয়ে। তুমি পালাও। জয়ার বাবা ভয়ানক রাগী, ভয়ঙ্কর লেঠেল। ওর চার দাদা, তারাও ভয়ানক লোক। পালাও তুমি।
তারা। উঁহু। গোরো মেয়ে জাত তুলে কথা ব'লে গেল। বললে, ভয়ে পালাবে, কি রকম বাগদার ছেলে তুমি ? এর পর পালিয়ে বাবার সামনে দাঁড়াব কি ক'রে ? কীর্ত্তিহাটের কালী-বাগদীর ছেলে আমি, বাবার নাম ডোবাতে পারব না।
কালো মেয়ে। কীর্ত্তিহাটের কালীচরণ ভল্লা মাশায়ের ছেলে তুমি ?
তারা। হ্যাঁ।
কালো মেয়ে। তুমি কবিয়াল তারাচরণ ?

জয়া ফিরিল

জয়া। তুমি কবিয়াল তারাচরণ ?
তারা। হ্যাঁ গো। কবিয়ালও বটে, লাঠিয়ালও বটে। ওই যে, বাবা

তোমার এসে পড়েছে দেখছি। (লাঠি বেশ করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল)

জয়ার বাপের প্রবেশ

জয়ার বাপ। কি রে জয়া? চেঁচাচ্ছিলি কেনে রে?

জয়া। বাবা, কবিয়াল তারাচরণ। তুমি আফশোশ করছিলে না, মেলায় বামুন কবিয়াল, বাগদীর ছেলে বলে তারাচরণের সঙ্গে পাল্লা দেয় নাই। তুমি খোঁজ করছিলে তারাচরণের, এই দেখ তারাচরণ কবিয়াল।

জয়ার বাপ। তুমি তারাচরণ? কীত্তিহাটার কালীচরণের ছেলে? তোমার বাপ আর আমি এক ওস্তাদের সাকরেদ। আমার নাম ভীম ভল্লা।

তারা। আপনি ভীম ভল্লা? (প্রণাম করিল)

ভীম। বেঁচে থাক। তোমার বাবা ফিরে এসেছে শুনলাম? কোম্পানির গোরার সঙ্গে নাকি বন্দুক চালিয়ে লড়াই করেছে?

তারা। আজ্ঞে হ্যাঁ। পাজরার পাশ দিয়ে একটা গুলিও চ'লে গিয়েছিল।

ভীম। যাব, একদিন দেখে আসব।

তারা। যাবেন। আপনার পায়ের ধূলো পড়বে, সে তো আমাদের ভাগ্যি।

ভীম। এমন ক'রে কথা আমরা বলতে পারি না বাবা। তুমি ভল্লার ছেলে হয়ে কবিয়াল হয়েছ, কত বড় কথা! কাল রাত্রে মেলায় যখন বামুন বললে—বাগদীর ছেলের সঙ্গে কবি গাইব না। আসর ভেঙে গেল, কত খোঁজ করলাম তোমার। কিন্তু পেলাম না। এস, আমার বাড়ি এস। আজ থেকে যেতে হবে। আমি নেমন্তন্ন করছি।

জয়া। আজ কিন্তু আমাদের ভাঁজো। সমস্ত রাত গানে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে।

তৃতীয় দৃশ্য

কালীচরণের বাড়ি। বাহিরের পাঁচিল নাই। বেড়া দেওয়া। বাড়ির বাহিরে একটা ভাঙা দাওয়া। সম্মুখে গ্রাম-পথ। চারিদিকে গাছ

পদ্ম ও টগর। পদ্ম দাওয়ার উপর বসিয়া ছিল। টগর একটা ঝুড়ি কাঁখে কতকগুলা কাঠ লইয়া প্রবেশ করিল

টগর। পদ্ম!

পদ্ম টগরের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল

টগর। এমন ক'রে থাকিস না পদ্ম, তুই পাগল হয়ে যাবি।

পদ্ম আবার সম্মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল

টগর। (পদ্মের কাছে আসিয়া) একে বড়লোক তায় বামুন। ওদের রকমই এই। একটা দুখের মেয়েকে ভুলিয়ে দুদিন পরে হঠাৎ ধম্মিষ্টে হয়ে উঠল! শুনেছি নাকি ফলজল ছাড়া কিছু খায় না। চারিদিকে আগুন জ্বেলে ব'সে থাকে; কি বলব?

পদ্ম। তুমি জান না বউদিদি, তুমি জান না।

টগর। না, জানি না। বাবুদিগে আমি খুব জানি।

পদ্ম একটু ম্লান হাসি হাসিল

টগর। আমি একবার যাব পদ্ম, বড়বাবুর কাছে। বলব—বড়বাবু, এই তোমার বিচার?

পদ্ম। না না, বউদিদি, না না।

টগর। কেন পদ্ম?

পদ্ম। তুমি আমাকে শুধিও না। কিছু শুধিও না।

টগর। তুই আমার মেয়ের বয়সী পদ্ম। বারো বছর বয়েসে আমার বিয়ে হয়েছিল, পনেরো বছরে ঘর করতে এলাম। তখন তুই শাশুড়ীর কোলে। শাশুড়ী তোকে আমার কোলে তুলে দিয়ে বলেছিল—তুই ওকে মানুষ কর বউ। এক বছর পরে তারা আমার কোলে হ'ল। তুই আর তারা আমার ভিন্ন ন'স? যখন তুই

বড়বাবুর বাগানে চ'লে গেলি পদ্ম, তখন সাতদিন আমি কেঁদেছিলাম।

পদ্ম। তোমার পায়ে পড়ি বউদিদি,.তোমার পায়ে পড়ছি আমি।

টগর। তুই খাওয়া-দাওয়া ছেড়েছিস, অষ্টপ্রহর ভাম হয়ে ব'সে আছিস।

পদ্ম। বউদিদি, আমি যদি আজ ম'রে যাই—

টগর। পদ্ম!

পদ্ম। না বউদিদি, আমি মরব না। যে পাপ করেছি, তার ওপর আত্মহত্যের পাপ আর বাড়াব না। কিন্তু জান বউদিদি, বড় খোকাবাবু কিছুতেই আমাকে শাস্তি দেবে না।

টগর। ছি ছি ছি! কি বলব, মুনিব, নইলে—

পদ্ম। নইলে আমিই একদিন বউদিদি এক কোপে ওকে সাবাড় ক'রে দিতাম। ওকে যখন দেখি বউদি, তখন জীবন আমার ছি-ছি ক'রে ওঠে।

টগর। তুই ভাবিস্ না পদ্ম, আজ আমি বড় খোকাবাবুকে বারণ ক'রে দোব।

পদ্ম। ওই দেখ, ওই দেখ বউদিদি।

টগর। তুই ঘরের ভেতর যা। (পদ্ম উঠিয়া চলিয়া গেল) বড় খোকাবাবু নাকি গো?

প্রমদাচরণের প্রবেশ। ঈষৎ মত্ত সে

প্রমদা। কে? সর্দ্দার-বউ?

টগর। পেনাম।

প্রমদা। সর্দ্দার কই? কালীচরণ?

টগর। সে গিয়েছে বীজনগর সিংহীবাবুদের বাড়ি—কাজের সন্ধানে।

প্রমদা। কেন, আমার কাছে কাজ করুক না। বাবা তো কাজকর্ম্ম ছেড়ে কালীবাড়িতে পড়েছে। সম্পত্তির ভার আমার ওপর। আমি কাজ দোব সর্দ্দারকে। জমি দোব, তনখা দোব—

টগর। শোন খোকাবাবু।

প্রমদা। পদ্ম কই রে, পদ্ম?

টগর। তুমি আমাদের পুরনো মনিবের বংশ। তোমাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি। এই আশপাশে একটা বাঘিনী এসেছে। তুমি এদিকে এমন ক'রে আর এসো না।

প্রমদা। (পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া) আমার কাছে পিস্তল আছে সর্দ্দার-বউ।

টগর। (হাসিয়া উঠিল) পিস্তলের ওপর ভরসা ক'রো না খোকাবাবু। পিস্তলের গুলি খেয়েও বাঘিনী তোমাকে শেষ ক'রে দেবে। জান তো, ঘা খেলে বাঘিনী সাক্ষাৎ মরণ?

প্রমদা। আচ্ছা, আমি হুঁশিয়ার হয়েই ফিরব। (পিস্তল বাহির করিল)

টগর। তাতেই বা কাজ কি খোকাবাবু? বাঘ-সাপ তো মানুষকে এড়িয়ে বনে জঙ্গলে গর্ত্তের ভেতর অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে। তোমাদিগে তো তারা এড়িয়েই চলতে চায়। তোমরা যদি জোর ক'রে তাদের আস্তানা মাড়াতে যাও, তাতে যদি তারা ক্ষেপে ওঠে, তবে দোষটা কার? ও পথে তুমি হেঁটো না খোকাবাবু।

প্রমদা। আচ্ছা, সে ভেবে দেখব। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) ভাল কথা মনে হয়েছে সর্দ্দার-বউ, কাল সদরে গিয়েছিলাম, জেলার বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল। সাহেব কালীচরণের কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

টগর। সর্দ্দারও ভাবছিল বড় খোকাবাবু, জেলখানায় সর্দ্দারের ভাতের হাঁড়িটা ফেলে দিলে, না, আছে? ফেলে দিয়ে থাকলে আবার কিনতে হবে। তুমি বরং সুপারিশ ক'রে দিও, হাঁড়িটা যেন না ফেলে।

প্রমদা। সর্দ্দার-বউ, তোদের আস্পর্দ্ধা বড্ড বেড়েছে।

টগর। হেই মা গো! আস্পর্দ্ধা আমাদের হয়, না হতে পারে?

প্রমদা। আমার এলাকায় চোর বদমাস ডাকাত দাঙ্গাবাজ, এদের আমি নির্ম্মূল করব।

টগর। মূল তো তোমরাই গো। ডাকাতি, দাঙ্গাবাজি, এসব তো তোমাদের নেগেই—

প্রমদা। সর্দ্দার-বউ! (ধমক দিল)

টগর। (হাসিতে লাগিল) টান পড়তেই এত বেদনা খোকাবাবু, নির্ম্মূল করবে কি ক'রে?

পদ্ম বাহির হইয়া আসিল, হাতে একখানা দা

টগর। পদ্ম!

পদ্ম। দাখানায় শান দোব—বউদিদি। দাখানায় শান দোব।

টগর। যাও খোকাবাবু, তুমি এখান থেকে যাও।

প্রমদা পিস্তল হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল

টগর। পদ্ম!

পদ্ম। আমাকে একটু ধর বউদিদি, একটু ধর।

টগর। ব'স, এইখানে ব'স। আমার কোলে মাথা রেখে একটু শুয়ে থাক বরং।

পদ্ম কোলে মাথা রাখিয়া শুইল

তুই কাঁদছিস পদ্ম? বল পদ্ম, বল, কি হয়েছে? আমাকে বলবি না?

পদ্ম। না না না।

টগর। পদ্ম!

পদ্ম। আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যাচ্ছে বউদিদি, মনে হচ্ছে, গাঙের তলায়, না হয় জলন্ত আঙারের ওপর অহরহ শুয়ে থাকি আমি।

কালীচরণের প্রবেশ

কালী। টগর-বউ! এ কি, পদ্ম! আমার সোনার পদ্ম শুয়ে কেন দিদি?

পদ্ম উঠিয়া বসিল, এবার সে সত্যই একটু মিষ্ট হাসি হাসিল

পদ্ম। বউদিদির কোলে একবার শুয়েছিলাম দাদা।

টগর-বউ চলিয়া গেল

কালী। ছেলেবেলায় তারাচরণ আর তুই টগর-বউয়ের কোলের জন্তে যে ঝগড়া করতিস দুজনে !

টগর জলের ঘটি লইয়া আসিল

টগর। নাও, হাত মুখ ধোও।

কালী। ও বাবা ! ভদ্রলোকের মত হাত-মুখ ধোবার জল ! এ যে সেই অতিভক্তি—

টগর। তা ব'লে আমি চোর নই।

কালী। চোর ন'স ? শোন পদ্ম, তবে বলি শোন। বিয়ের পর এসেই— বারো বছরের বউ—বোশেখ মাসের দুপুরবেলা চ'লে গিয়েছে বাবুদের খাস বাগানে কাঁচামিঠে গাছের আম পাড়তে। আমি যাচ্ছি পথ দিয়ে, দেখি গাছের ডাল নড়ছে। মারলাম হাঁক, কে রে ? জবাব এল, আমি যে হই রে মুখপোড়া। তুই কে রে ?

টগর। তুমি ধরতে পেরেছিলে আমাকে ?

কালী। না, তা পারি নাই। বুঝলি পদ্ম, আমি যেই হাঁক মেরেছি —আমি কালী ভল্লা—বাস, অমনি গাছের ওপর থেকে মেরে দিলে লাফ। আমি ভাবলাম, ম'ল রে ! ও বাবা ! আমি আহা ব'লে যেতে যেতে তখন টগর-বউ দাঁড়িয়ে উঠেই বোঁ-বোঁ ছুট। ও ! তখন কি বাহারই ছিল টগর-বউয়ের !

টগর। থাম বাপু, পদ্ম আমার মেয়ের সমান।

কালী। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) পদ্ম তোর মেয়ের সমান। পদ্ম আমার সোনার পদ্ম। (সহসা আক্রোশভরে) আমার এক এক সময় মনে হয় কি জানিস ?

সহসাই সে থামিয়া গেল, রুদ্ধ আক্রোশ ও আক্ষেপে একপাক ঘুরিয়া বেড়াইল

পদ্ম। ব'স, দাদা। তারপর তোমার কাজের কি হ'ল ? বীজনগরের বাবুরা কি বললে ?

কালী। জুতো ঘুরিয়ে দিতে বললে পদ্ম, আমাকে—কালীচরণ ভল্লাকে জুতো ঘুরিয়ে দিতে বললে !

পদ্ম। জুতো ঘুরিয়া দিতে বললে ?

কালী। বীজনগরের বাবু আমাদের বড় খোকাবাবুর মত। সায়েবী-কেতাদোরস্ত। গদি-মোড়া কেদারা, মেঝেতে গালচে বিছানো। মদ খেয়ে টোর। সেলাম ক'রে দাঁড়ালাম তো বল'ল—প্রজা শাসন করতে পারবে? বললাম—প্রজা তো হুজুরের ছেলে, তা শাসনের দরকার হ'লে ধমক দোব। বললে—ধমক নয়, দরকার হ'লে ঘরে আগুন দিতে হবে। জোতের ফসল গরু লাগিয়ে খাইয়ে দিতে হবে। যেমন হুকুম করব করতে হবে। বললাম—হুজুর, ওসব একদিন করেছি, তার সাজাও ভগবান দিয়েছেন। ওসব অন্যলোক দিয়ে করাবেন। আমার বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, আমাকে অন্য কাজ দেন। বাবু হেসে বললে—তবে আর কি কাজ করবে তুমি? আমি বললাম—হুজুরের বাড়ি পাহারা দোব, আমার জান থাকতে হুজুরের ঘরে ডাকাত, দে'শমন ঢুকতে দোব না। হুজুর বড়লোক, হুজুরের তো দোশমনের অভাব নাই; হুজুরের পাশে পাশে থাকব আমি, আমার জান না গেলে হুজুরের পায়ে কাঁটা ফুটবে না। বাবু হেসে আমাকে একটা পিস্তল দেখালে। আমি হেসে পাঁজরার গুলির দাগ দেখিয়ে বললাম—হুজুর, ওটা তো আপনার খোকা বন্দুক, এই দেখুন আপনার মরদ বন্দুকের গুলির দাগ। বাবু বললে—ভেবে দেখি। তুমি আজ থাক। আমি সেলাম ক'রে চ'লে আসছি, তখন আবার ডেকে বললে—ওহে, ওইখানে আমার চটি-জোড়াটা আছে, দাও তো।

টগর। তুমি কি বললে?

কালী। লাঠির ডগা দিয়ে জুতো-জোড়াটা ঠেলে দিয়ে আবার একবার সেলাম ক'রে চ'লে এলাম।

টগর। বেশ করেছ। তোমার বাবা ছিল—

কালী। থাক টগর বউ, বাবা চিতেয় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ভুলে যা ওসব কথা।

পদ্ম মাথা নত করিল, কালী পদচারণা করিতে করিতে পদ্মর মুখ তুলিয়া ধরিল

পদ্ম। কাঁদছিস দিদি! না না, ভুলে যা ওসব কথা। ভুলে যা। শোন শোন। আমি মনে মনে কি ঠিক করেছি শোন। আর

চাকরি নয়, গোলামি আর কারু করব না। চাষ করব—চাষ। নদীর ধারে বড় চর উঠেছে। সেইখানে চাষ করব। তারাচরণকেও আর কবিয়ালি করতে হবে না, বাপ-বেটায় চাষ করব। নিজেরা কোদাল ধ'রে জমি ভাঙব। বাপ-বেটায় কোদাল ধরলে—দুজনায় আটজনার কাজ তো করবই। সঙ্গে টগর তুই দুজনায় খাটবি। ক্ষেত করব, খামার করব, হাল করব, গরু করব। নদীর ধারের চন্দনের মত মোলাম মাটি চ'ষে খুঁড়ে ফসল লাগাব, মা-লক্ষ্মী এসে মাটির বুক পুরে এসে বসবেন—

নেপথ্যে তারাচরণ

তারা। মা!

পদ্ম। তারাচরণ—

তারাচরণ ও জয়ার প্রবেশ

তারা। তোমাদের দাসী নিয়ে এলাম পদ্ম-পিসী।

টগর। দাসী নিয়ে এলি?

পদ্ম। (উঠিয়া) তুই বিয়ে ক'রে এলি তারাচরণ?

ভীমের প্রবেশ

ভীম। ভাল আছ, কালী-ভাই? তোমার ছেলেকে পেলাম রাস্তায়। ধ'রে আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।

কালী। ভীম-ভাই! জয় গুরু, কি ভাগ্যি আমার! তুমি তারাকে ধ'রে তোমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছ। বেশ করেছ। আমার ভাগ্যি—আমার ভাগ্যি। ওরে বেটা তারা, কবিয়ালি করতে গিয়ে বিয়ে ক'রে এলি তুই?

তারা। হয়ে গেল বাবা। ভাঁজোর পাল্লা দিতে গিয়ে এমন হ'ল যে,—শ্বশুর বললেন, আজ হয়ে যাক বিয়ে।

কালী। আর তুমি বেটাও রাজি হয়ে গেলে! হারামজাদা শূয়ারকি বাচ্চা, বাপ ব'লে মনেও পড়ল না! যা, এখন মাল নিয়ে আয়—মদ মদ!

ভীম। (জয়াকে) হারামজাদীর কাণ্ড দেখ! দাঁড়িয়ে আছিস কি হারামজাদী, শ্বশুর-শাশুড়ীকে পেনাম কর।

জয়া কালীকে প্রণাম করিতে গেল

কালী। এ যে সোনার প্রতিমে ভীম! আমার ভাগ্যি, আমার ভাগ্যি ভীম-ভাই! আগে আমাকে নয়, আগে আমাকে নয়। (পদ্মকে দেখাইয়া) আগে এই তোমার পিসশাশুড়ীকে, ওই আমার ঘরের কর্ত্তা, আগে—

ভীম। পদ্ম! পদ্ম এখানে ক্যেনে কালী-ভাই?

কালী ঘুরিয়া দাঁড়াইল

কালী। ক্যেনে ভীম-ভাই? বিধবা বোন আমার যাবে কোথায়?

ভীম। তারাচরণ, তুমি তো আমাকে এ কথা বল নাই?

তারা। আপনি তো কই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

ভীম। জয়া, ফিরে আয়, বাড়ি চল।

কালী। তোমার হাতে লাঠি আছে, আমি লাঠি ধরব নাকি ভীম-ভাই? আমার ঘর থেকে তুমি আমার বেটার বউ কেড়ে নিয়ে যাবে?

তারা। (জোরে হাঁকিয়া উঠিল) খবরদার!

ভীম। জয়া, আয়।

টগর। ওগো বাছা নতুন বউ, স্বামীর ঘরে থাকবে তো দাওয়ায় উঠে এস। নইলে তোমার বাপ ডাকছে—

জয়া উপরে উঠিয়া গেল

টগর। ওরে মা লক্ষ্মী আমার!

ভীম। লাঠি আর ধরব না কালী-ভাই। জামাইকে যৌতুক দেবার জন্যে লাঠিগাছটা এনেছিলাম। নাও, ধর তারাচরণ।

কালী। ভীম-ভাই, তোমার হাতে ধ'রে বলছি—

ভীম। আমি চললাম, আমি চললাম কালী-ভাই। আমি চললাম।

(প্রস্থান)

পদ্ম। দাদা, দাদা, বেয়াইকে ফেরাও। আমি—

টগর। না।

কালী। শাঁক বাজা পদ্ম, জলধারা দে, বউ বরণ ক'রে ঘরে তোল। পদ্ম, যে গেল সে যাক। যেতে দে। তোকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছি, তোর পয়ে ঘরে আমার বউ এল। ওরে, এখুনি বলছিলাম জমির কথা। এই দেখ, তোর পয়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী পায়ে হেঁটে আমার ঘরে এসেছেন। চন্দনের মত মাটিতে উনো ফসল দুনো হবে, আমার সেই ফসল পাকবে সোনার বরণ হয়ে, রাশি রাশি,—রাশি রাশি ফসল তুই, টগর-বউ, বউমা, ঝুড়িতে ক'রে মাথায় ক'রে ঘরে তুলবি—মরাইয়ে মরাইয়ে ভ'রে উঠবে খামার। লাঠি নয় সড়কি নয়, দাঙ্গা নয়, হাঙ্গাম নয়, সুখে স্বচ্ছন্দে নতুন বস্ত্রে পুরনো অন্নে জীবন কেটে যাবে; সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঘরে এসেছে, আমার ভাবনা কি?

পদ্ম। বউ বরণ কর বউদি।

কালী। স'রে যা, স'রে যা, ভেতরে যা সব। কে? কে? এত রাত্রে ও কে? আমার লাঠি?

টগর। কে? কে?

কালী। (ধমক দিয়া) স'রে যা। ভেতরে যা। পদ্ম, ভেতরে যা। তারা ভেতরে যা? আমার লাঠি? (লাঠি লইল)

সকলে ভিতরে চলিয়া গেল

ধনদা প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসীর বেশ

কালী। (অগ্রসর হইয়া) কে?

ধনদা। আমি কালীচরণ।

কালী। (সবিস্ময়ে) কে? বড়বাবু? (পরমুহূর্তে কঠিন দৃষ্টিতে ধনদার মুখের দিকে চাহিল) কি চাই বড়বাবু? এত রাত্রে? (পরমুহূর্তে সবিস্ময়ে আবার বলিল) এ কি পোশাক তোমার বড়বাবু?

ধনদা। আমি তীর্থ করতে বেরিয়েছি। মহাপাপ—মহাপাপ করেছি কালীচরণ, প্রায়শ্চিত্ত—তার প্রায়শ্চিত্ত করতে বেরিয়েছি।

কালী। বড়বাবু, তুমি সন্ন্যাসীর সাজে সেজেছ বড়বাবু? তোমার ওপর আমার আর কোন মায়া নাই। তবু আমার দুঃখ হচ্ছে—

ধনদা। যাবার আগে তোর সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করতে পারবি না কালী ?

কালী। না বড়বাবু।

ধনদা। যদি কোন দিন পারিস, ক্ষমা করিস।

কালী উত্তর দিল না

আমি যাই কালী। (সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইল)

কালী। বড়বাবু, তুমি একা ? চল, ছিপে তুলে দিয়ে আসি, চল।

ধনদা। (ফিরিয়া) ছিপ নাই কালী। (হাসিল)

কালী। ছিপ নাই ?

ধনদা। লুকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। একা পায়ে হেঁটে সমস্ত তীর্থ ঘুরব আমি। (অগ্রসর হইল)

ধনদা। (ফিরিয়া) হ্যাঁ, শোন। এইটে, এই ছোরাটা—এই ছোরাটা নে, পদ্মকে দিস।

কালী। বড়বাবু ?

ধনদা। আমি খবর পেয়েছি, প্রমদা আজও এদিকে এসেছিল। দিস, পদ্মকে এটা দিস।

ধনদা। না না, ভোঁতা নয়। বাঘ শিকারের ছোরা আমার। এই দেখ।

ছোরাটা কালীর হাত হইতে লইয়া নিকটস্থ গাছে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল
কালীচরণ টানিয়া ছোরাটা বাহির করিয়া লইল

কালী। ছোরার ধার আমি চিনি বড়বাবু। দেখছিলাম, বাঁটটা কি সোনার ?

ধনদা। সোনার পাত দিয়ে মোড়া আছে।

কালী দাঁত দিয়া বাঁটের পাত টানিয়া ছাড়াইয়া ধনদাকে দিল

কালী। এটা তুমি নিয়ে যাও। ছোরাটা আমি পদ্মকে দোব।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাস্তব ও স্বপ্ন

একটু আগেই এসেছিলে তুমি, না দেখে চলিয়া গেছ,
ঘরের স্মুখে পায়ের জুতোর কাদা ছোপ আছে আঁকা,
কোথা গেছি আমি ডাকিয়া কারেও সে কথা কি শুধায়েছ ?
দেখা না মেলায় হয়তো কোনও অর্থ করেছ বাঁকা !
এমনিতরই ঘটনা ঘটেছে অনেক জন্ম ধ'রে—
শত-সহস্র বাঁধন-নিষেধে মেলে নি মনের ছোঁয়া,
তাই যতবার ঘুরে ঘুরে আসি আবার তেমনি ক'রে
তোমার আমার মাঝে ব্যবধান রচে না-বোঝার ধোঁয়া।
প্রিয়তম, তুমি হৃদয় তোমার অবাধে মেলিয়া ধর—
জেনে নেব তাতে কতখানি আছে খাঁটি সোনা আর খাদ,
ভালমন্দের পাওনাদেনার চরম হিসাব কর—
জীবন-পন্থা হোক আমাদের পরম-নির্ব্বিবাদ।
স্বর্গ হইতে বিদায় মোদের হয়েছে অনেক কাল,
এবার মাটির ফসলে আমরা সাজাব মাটির থাল।

* স্বপ্নের মাঝে তোমার পত্র পেলাম কালকে রাতে,
খামখানি ছিঁড়ে আগ্রহভরে পড়িতে গিয়েছি যেই—
ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে প'ড়ে গেল শুধুই কল্পনাতে
তৃপ্তি-বিকার, বাস্তবে কিছু আসল বস্তু নেই।
কটাক্ষপাত করিবে কি হেসে মনস্তত্ত্ববিদ,
জটিল মনের গহন পন্থা সব কি ওদের জানা !
জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে মর্ম্মভিদ
হয়তো তারাই আজো অতৃপ্ত স্বপ্নেও দেয় হানা।
তুমি আর আমি আমরা সবাই মুখোস পরিয়া আছি,
প্রয়োজনমত বিনিময় করি টেলি-গ্রাফিক ভাষা,
অদৃশ্য কোন চুম্বক বলে যত আসি কাছাকাছি
স্থিরনিশ্চয় তবু জানি মিছে মন মেলিবার আশা।
ঘুম আসে আর ঘুম ভেঙে যায় মেলে শুধু চিঠিগুলি—
পড়িতে পারি নে অক্ষরমালা সরল দৃষ্টি তুলি।

শ্রীউমা দেবী

প্রাচীন পারসীক হইতে

১

এই কথা মনে ক'রো—অন্তরে যখন
বেদনা-বিদ্যুৎ-কশা উঠিবে ঝলকি,
যে-কবি উদ্‌ভ্রান্ত করে প্রকৃতির মন,
তাহারে উদ্‌ভ্রান্ত তুমি করেছিলে সখী।
এই কথা মনে ক'রো—তোমার নয়ন
মানসের ক্রৌঞ্চদ্বার রচিয়াছে সখী ;
যে-কবি উদ্‌ভ্রান্ত করে প্রকৃতির মন
তাহারে উদ্‌ভ্রান্ত তুমি করেছ পুলকি।

এই কথা মনে ক'রো—কবি একজন
হৃদয়ের পাদপীঠে স্থাপিয়াছে তোমা ;
চরাচর সন্ধানিয়া তাহার নয়ন
কোনখানে পায় নাই তোমার উপমা।

এই কথা মনে ক'রো—অস্তিত্ব তোমার
অধিকার করিয়াছে স্থান কবিতার।

২

এই কথা মনে ক'রো—সে যবে বসিয়া
তব নাম-গুঞ্জরণে করে নর্ম্মলীলা,
ধ্বনির গোলাপকুঞ্জ ওঠে বিকসিয়া ;
প্রতিটি অক্ষর হতে যেন সে দুহিলা
সুরভির সুধাবিন্দু ; তোমার চোখের
সুচিক্কণ তুলিকায় ওঠে যে পুলকি
নবরঙ্গে বঙ্কিমাটি ইন্দ্রধনুকের ;
এই কথা চিত্ততলে নিত্য স্ম'রো সখী।

বসন্তে উতলা-করা ওই তব আঁখি,
অকালে গোধূলি-আনা পুঞ্জ কেশপাশ,
হৃদয়-উপত্যকায় চক্র, চক্রবাকী,
অনাহুতি-অগ্নিচ্ছটা অধর-আভাস।

পায় নাই মুগ্ধ কবি এদের তুলনা,
এই কথা মনে ক'রো, ওগো অবর্ণনা।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শ্রী-যু—

অয়ি শুদ্ধা, সুনির্ম্মলা, অয়ি দেবী কুন্দেন্দু-বরণী,
শঙ্খশুভ্র হংস তব চিরকাল মেলে আছে পাখা
অন্তরের অন্তরীক্ষে : দেবী তুমি তিমির-হরণী
জ্যোতির্ম্ময়ী চিরকাল মানবের মর্ম্ম-পটে আঁকা।

যুগে যুগে নব-মূর্ত্তি : সোম-রস এনেছ সন্ধানি
মোহিয়া গন্ধর্ব্ব-কুল, লভিয়াছ অন্তরের স্তুতি
হেরা ও মিনার্ভা রূপে, পুস্তকশ্রী তুমি বীণাপাণি,
ক্রুশকাষ্ঠে আপনারে হাসিমুখে দিয়েছ আহুতি।

এসেছে নূতন যুগ, নব-মূর্ত্তি লহ সরস্বতী,
নিবেছে আনন্দ-দীপ অন্ধকারে চলে হানাহানি—
পাপের প্রবল-হস্তে ভুঞ্জিতেছি নির্ব্বাক দুর্গতি,
রক্ত-শতদল 'পরে মূর্ত্ত হও মর্ম্মন্তুদ বাণী।

ভাষাহীন লাঞ্ছিতেরে ভাষা দাও, কর দুঃখ দূর,
বীণাতন্ত্রে রুদ্র সুরে ঝঙ্কারিয়া তোল নব সুর।

"বনফুল"

বন্ধন-মুক্তি

সব বন্ধন মুক্তির রূপ ধরে—মনের আকাশ যদি বা মুক্ত রয়,
তারকার মালা শোভে নীল অম্বরে—সুনীল আকাশ যখন নিশীথময়।
দিবসে আমার তপনপ্রভায় যারা—ঢেকে রেখেছিল প্রখর বহ্নিতাপে,
তারাই আজিকে স্তিমিত স্নিগ্ধতারা—তরল তিমিরে গোপন পুলকে কাঁপে।

একদা ও এখন

কাছাকাছি ব'সে থাকি, মনে হয় বাহুটি বাড়ায়ে
তোমারে টানিয়া ধরি, বুকে চেপে চুমা খাই গালে,
পরশের কামনায় লক্ষ কথা যায় যে হারায়ে—
কবিতা তো অর্থহীন, ছন্দ শুধু স্পর্শ কানে ঢালে।
সম্মুখে পথের 'পরে অবিশ্রাম জনস্রোত চলে,
ছায়াছবি সম তারা ভাসে চোখে গতিমাত্র সার;
ভীরু পদে সন্ধ্যা আসি মালা দেয় দিবসের গলে—
বাতায়ন-পথে ঘরে থরে থরে ঢোকে অন্ধকার।
পাশাপাশি ব'সে থাকি, সদ্যরচা কাব্য কর পাঠ,
আমার বুকের মাঝে সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জ্জন
তোমারে ফেলিবে গ্রাসি; রুদ্ধ করি মনের কপাট
দেহের আগল ভাঙি। তুমি বন্ধ কর বাতায়ন;
ঘরের প্রদীপ জ্বালো—ইডেনের স্বপ্ন যায় টুটে,
কবিতার খাতাখানি দৃঢ় করি ধর করপুটে।

* * *

ইশারা-ইঙ্গিত প্রিয়ে, ক্রমে ক্রমে হয়েছে অসহ,
ভাষা মূক হয়ে থাকে ধমনীতে রক্ত কথা কয়,
তব বাক্য মুখরতা থেমে আসে, মৃদু মৃদু কহ—
"কি বলিছ?" চক্ষে তব মনোহর আতঙ্ক-বিস্ময়।
'কাছে এস' মন বলে, মুখে ফোটে বৈরাগ্যের ভাষা,
মুক্ত দ্বারপথ যেন চেয়ে থাকে সতর্ক প্রহরী;
দুটি বক্ষে জেগে উঠে স্তিমিত যে অন্তহীন আশা—
প্রহরে প্রহরে শুধু বেজে যায় দেয়ালের ঘড়ি।

আমাদের মাঝখানে হে প্রেয়সী, দুর্লঙ্ঘ্য সাগর—
এ সমুদ্রে খেঁয়া নাই, তরঙ্গের বার্ত্তা শুধু চলে;
কাছে এসে যদি চাও বাঁধিবারে দুদিনের ঘর,
তটের বন্ধন ছেদি ঝাঁপ দিতে হবে ক্ষুব্ধ জলে।
ইঙ্গিতের ধোঁয়া সখী, ছেয়ে আছে মোদের আকাশ,
ধোঁয়া ভাল নাহি লাগে, বহ্নি-দীপ্তি হোক সুপ্রকাশ

* * *

আমার অনেক আছে, তবু আমি তোমারেও চাই।
হে প্রেয়সী, নয় নয় প্রলুব্ধের লোলুপ কামনা,
সুনিবিড় অন্ধকারে হাতে হাত মিলিয়াছে তাই—
স্পর্শমুগ্ধ চিত্ত মোর করিবে না আলোক-সাধনা?
তোমার নয়নে আমি হেরিলাম জ্যোতির ইঙ্গিত,
ভ'রে গেল মনপ্রাণ, অন্ধকার টলমল করে,
আমার সকল অঙ্গে ধ্বনি' উঠে ব্যাকুল সঙ্গীত—
কি যে অজানিত ভয়ে চারি চক্ষু মেলে পরস্পরে!
সহসা দাঁড়াও উঠি, মুক্তি মাগো মুক্ত বাতায়নে
প্রাণহীন পুষ্পমালা মৃতকণ্ঠে বিলম্বিত হয়,
রক্তহীন ওষ্ঠাধর সম্মিলিত অন্তিম-শয়নে—
ধরণীর ধূলি হতে বিদায়ের ভীতি ও বিস্ময়!
সম্বিৎ ফিরিয়া আসে মৃতদেহ কাঁপে থরথরে
তোমার আয়ত চক্ষে অকস্মাৎ সলিল সঞ্চরে।

* * *

শরমের মৃদু হাসি—তবু মানি সার্থক জীবন,
অন্তহীন বৃন্ত 'পরে ফুটে ওঠে মুহূর্ত্তের ফুল,

সফল হবে না জানি ক্ষণিকের পুষ্প-আবেদন,
নেশা না জমিতে পুরা ভেঙে যাবে মাতালের ভুল।
ভেঙে যাক, তবু মিথ্যা নাহি হবে ক্ষণ-উন্মাদনা
দয়িতের চিতাশয্যা তাও হয় মিলন-বাসর ;
ক্ষণিক ঘটনা মাঝে ডুবুক অনন্ত সম্ভাবনা—
খণ্ডপ্রলয়ের পরে আসুক অখণ্ড অবসর।
তখন ভাবিব জানি, টানি নাই আরো কেন কাছে,
শরম সংশয় আসি প্রাণবহ্নি নিবাল সহসা,
অনন্ত অসীম শূন্যে পাখী যবে পাখা মেলিয়াছে,
কে অদৃশ্য শূন্যে থাকি হানে তারে সুনির্ম্মম কশা ?
ভগ্নপক্ষ পড়ে ভূমে, ঊর্দ্ধে ডাকে সুনীল আকাশ—
হোক চিরস্মরণীয় ক্ষণিকের ক্ষণ-ইতিহাস।

*　　　*　　　*

এ জীবন-জলধির এক পারে তুমি থাক প্রিয়ে,
অন্য পারে থাকি আমি, মাঝখানে তরঙ্গ-বিক্ষোভ,
কভু পাব তোমারে কি আপনার পরিচয় দিয়ে—
চিরদিন দূরে থাকি, চিরদিন রহিব নির্লোভ ?
আমার সকল দেহ হতেছে উন্মুখ পিপাসায়,
দূরে রাখি আপনারে ভুলি যে তরঙ্গ-ব্যবধান,
চৈত্রের তপস্যা-শেষে নির্ঝরিণী প্লাবনধারায়
দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত-বাধা ভেঙে ভেঙে করে খানখান।
প্রাণের পরশ খুঁজি, দেহ ছাড়া প্রাণ কোথা রয় !
সে দেহে করিয়া তুচ্ছ, প্রেয়সী, হয় না ভালবাসা—
একদা আষাঢ় নামে, ভাসে কুল টুটে সর্ব্বভয়,
সত্য হয় বর্ত্তমান, দূরে যায় ভবিষ্যের আশা।
একদা গিয়েছে ফিরে, সর্ব্বদার বাধা কর দূর,
কেন গাহিবে না গান, মনে যদি আসিয়াছে সুর ?

সংবাদ-সাহিত্য

সমস্ত পৃথিবীকে স্বাধীন করিবার গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া যাঁহারা পরাধীন ভারতবর্ষের দৈনিক সংবাদপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় মুহুর্মুহু শতাধিক ইঞ্চির সচিত্র আশ্বাস-বিজ্ঞাপন বাহির করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতের স্বাধীনতা-অপহারী ইংরেজের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব পৃথিবীর অষ্টম তাজ্জব কি না, তাজ্জববাদীরা এখনও তাহা বিচার করিয়া দেখেন নাই। যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতেছেন এবং যাঁহারা তাহা প্রকাশ করিতেছেন—এই উভয় পক্ষের রহস্যপ্রিয়তা আমরা উপভোগ করিতেছি।

* * *

আধা সাম্রাজ্যবাদী এবং আধা ধনতন্ত্রবাদী ইংরেজের সহায়তায় ভারতবর্ষে আধা গণতন্ত্রবাদী ও আধা শ্রমতন্ত্রবাদী সোভিয়েটের প্রসারও অনুরূপ তাজ্জব ব্যাপার। সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া এখন তাজ্জবের কালই চলিতেছে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন ব্যবহারের এবং অপরিহার্য্য আহার্য্য-দ্রব্যের শোচনীয় অভাবে আমরা সর্ব্বদা অন্যমনস্ক (অন্নমনস্ক!) থাকি বলিয়াই এই জগৎব্যাপী প্রহসনকে বিয়োগান্ত নাটকের মর্য্যাদা দিয়া বসিতেছি। আমাদের বুদ্ধি যদি অনাবিল থাকিত, তাহা হইলে আমরা একচোট বেদম হাসিয়া আয়ু বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারিতাম। আমরা না হাসিলেও যিনি হাসিবার, তিনি হাসিতেছেন।

* * *

ভারতবর্ষের দফা সারিয়া ইহাকে অধীন রাখিবার জবাবদিহি-স্বরূপ যে পঞ্চাশটি দফা ভারত-সরকার কর্ত্তৃক আমেরিকার অবগতির জন্য দাখিল করা হইয়াছে, তাহাতে দফাদারির দাক্ষিণ্য ও দক্ষতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। চিকিৎসকের হাতে রোগীর মৃত্যু যখন অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তখন একটা বড় রোগের নামোচ্চারণ করিয়া তাহাকে মারিতে পারিলে চিকিৎসকের সহৃদয়তাই প্রকাশ পায়।

* * *

ধৃতরাষ্ট্রের আমলে বিদুর যাহা করিয়াছিলেন, সার্ জন হার্বার্টের আমলে আমাদের শ্যামাপ্রসাদ তাহাই করিয়া শাসকমহলে বদনাম কুড়াইয়া

বেড়াইতেছেন। বিদুরের বক্তৃতা ও বচনগুলি প্রকাশ্যে বারিত (banned) হইয়াছিল, শ্যামাপ্রসাদেরও হইয়াছে। ব্যবস্থাপক-সভায় খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ সেকালেও ছিল, একালেও আছে। বিদুরের মত শ্যামাপ্রসাদ উক্ত প্রতিষ্ঠানে সেই সুযোগ লইতেছেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যিনি দেবতা, তিনি সেদিন যেমন হাস্য করিয়াছিলেন, আজও তেমনই করিতেছেন।

* * *

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিজস্ব প্রতিনিধি মিঃ ফিলিপ্‌স ও তুর্কী সাংবাদিক-দলের শান্তি বিঘ্নিত করিয়া গান্ধীজী যে কাণ্ড করিয়া বসিলেন, তাহা তাঁহার মত রসিক ব্যক্তির যোগ্য হয় নাই। তাঁহার রসবোধের প্রমাণ লর্ড লিন্‌লিথগোকে লেখা চিঠিগুলির ছত্রে ছত্রে আছে। তবে এ কথাও আমরা বলিব যে, ভারতবর্ষে উপবাস অনেকে করিয়াছে এবং আজিও করিতেছে; কিন্তু উপবাসের মত এমন একটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারকে এমন জাতিগত মহিমায় মহিমান্বিত করিতে আর কেহই পারেন নাই। এইখানেই তাঁহার মাহাত্ম্য। এই ভারতীয় সাত্ত্বিক ব্যাপারে তামসিক গুণে গরীয়ান ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্ট পর্যন্ত হকচকাইয়া গিয়াছে।

* * *

স্বেচ্ছাকৃত উপবাসকে দৈহিক ও আত্মিক কল্যাণের কারণস্বরূপ বিবেচনা করিতে এ দেশে আমরা অভ্যস্ত। তবে কল্যাণকর জিনিসের আতিশয্যে অকল্যাণ আসা অসম্ভব নয়। এই কারণেই আমরা শঙ্কিত হইয়াছি। যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে বিপজ্জনক কাজে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিলে আমরা যেমন নিরুপায়ভাবে বিচলিত হইয়া পড়ি, এ ক্ষেত্রেও তেমনই বিচলিত হইতেছি। একুশ দিন ব্যাপী এই বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব কি না, এই কল্পনাতেই অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছি।

* * *

সংবাদপত্রে সপ্রশ্ন সংবাদ দেখিলাম, জার্মানিতে হিটলারের নাকি উদ্দেশ নাই। এরূপ ঘটনা বাংলার সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শের ফল কি না, তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ফুটবল ক্রিকেট টেনিস প্রভৃতি বৈদেশিক খেলার পরিবর্ত্তে কিছুকাল ধরিয়া নূতন এক ধরনের খেলা প্রসারলাভ করিতেছে—দাঙ্গাদাঙ্গি খেলা। শুনিতেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই খেলার একটি ইণ্টারন্যাশনাল, রুল-বহি প্রস্তুত করিতেছেন। এই খেলার প্রবর্ত্তক মিঃ জিন্নার পদ্ধতি তাঁহারা সর্ব্বাংশে মানিতে প্রস্তুত নহেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরাও পাকিস্থানী স্কীমের অন্তর্ভুক্ত কি না, শেষ টুর্নামেণ্ট তাহা লইয়াই সংঘটিত হইয়াছে। রেফারির পলায়নে খেলা শেষ হয় নাই। আমরা আগ্রহ-ব্যাকুল চিত্তে ১৪ই মার্চ পুর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিব।

মিঃ জিন্না ও মিঃ রাজাগোপালাচারীকে এক হালে জুড়িয়া ভারতবর্ষ-চাষের পরিকল্পনা এখনও কার্য্যকরী হয় নাই। ক্রিপসের নির্দ্দেশানুযায়ী মিঃ আমেরি অথবা লর্ড লিন্‌লিথগো কেহই লাঙ্গল ঠেলিতে প্রস্তুত নহেন। ওয়াভেল সাহেব অন্যত্র ব্যস্ত, তিনি হাল ধরিলে একটা এস্পার ওস্পার হইতে পারে।

—

মাঘের 'পরিচয়ে' "ভাস্কর" লিখিত "পরস্মৈপদী" শীর্ষক একটা চমৎকার নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পরের কারণে যাঁহারা হামেশাই স্বার্থ বলি দিয়া থাকেন, তাঁহারা রচনাটি পড়িলে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন। আমরা করিয়াছি। লেখক বলিতেছেন—

"'পরস্মৈপদী' কথাটির প্রকৃত অর্থ যাহাই হউক, চলিত ভাষায় উহার একটি অর্থ এই যে কোন কাজ বা দায়িত্ব কৌশলে অন্যের দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লওয়া। নিজের কর্ত্তব্য কৌশলে অন্যকে দিয়া করাইয়া লওয়া ব্যাপারটা অবশ্য খুব শোভন নয়, হয়তো ন্যায়ধর্ম্মসম্মতও নয়। কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে এবং ব্যবহারে সর্ব্বদা অতটা 'খুঁতখুঁতে' হইলে বোধ হয় আমাদের চলে না।...

অধ্যাপক রাম ভাল নোট বই লেখেন, কিন্তু সব বইয়ের নোট লিখিবার তাঁহার শক্তি নাই, সময়ও নাই। এস্থলে শ্যামকে দিয়া, যদুকে দিয়া, মধুকে

দিয়া নোট লিখাইয়া তাহার দুএক স্থলে একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া অথবা না করিয়া সেই নোটগুলি সবই রাম-নামে চালান যাইতে পারে। শুধু নোট নহে, অন্যান্য বিষয়ের পুস্তকও সম্পূর্ণ অন্যকে দিয়া লেখাইয়া যে কোন পরিচিত বা বিখ্যাত লেখকের নামে প্রকাশ করা যাইতে পারে।"

* * *

"ভাস্কর" স্বয়ং অধ্যাপক, অধ্যাপকদের মনোবৃত্তি তিনি নিখুঁত সমবেদনার সহিত উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। ফাল্গুনের 'প্রবাসী'র ৪১৯ হইতে ৪২৩ পৃষ্ঠায় এই অধ্যাপকীয় পরস্মৈপদী মনোবৃত্তির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকটিত হইয়াছে। "রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদিপর্ব্ব" নিবন্ধের লেখক অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগ "পরস্মৈপদী"-তন্ত্রে পারঙ্গম এবং সৌভাগ্যের বিষয় তিনি মোটেই "খুঁতখুঁতে" নন।

সুতরাং শ্যাম যদু ও মধু নামধেয় ব্যক্তিদের পরিশ্রমলব্ধ পরস্মৈপদী "নোট" আত্মনেপদ-মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করেন নাই। এই ফরাসী (ফরাসী ছুটির মত) আত্মসাৎ "রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদিপর্ব্ব"-মহিমায় 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়াছে; পরবর্ত্তী প্রস্তাবিত "সভাপর্ব্ব"-মহিমা যে তিনি কাহাদের কোতল করিয়া প্রকাশ করিবেন, সভয়-বিস্ময়ে তাহাই ভাবিতেছি।

"আদিপর্ব্বে" যে সকল সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে, তাহার একটি ছাড়া সকলগুলিই পুরাতন; ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের 'শনিবারের চিঠি'তে (কার্ত্তিক-পৌষ) "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী" নামক ধারাবাহিক রচনাটিতে এগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত অনেক সংবাদও সেখানে আছে। "সম্প্রতি জানা গিয়াছে" বলিয়া "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" গান সম্পর্কে যে যুগান্তকারী সংবাদ নাগ মহাশয় দিয়াছেন, তাহাও ঐ "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী"তে আছে। তাহা ছাড়া ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসের যাবতীয় ইংরেজী-বাংলা দৈনিকপত্রে বড় বড় হেডিং-এ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনে এই গান ও "অভিলাষ" কবিতাটির

আবিষ্কার-সংবাদ ঘোষিত হয়। আবিষ্কর্ত্তা হিসাবে এই অধম লেখকই সেকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল! পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন, এই পরস্মৈপদী আলোচনায় নিরুপায় হইয়া আমাদিগকে আত্মনেপদী হইতে হইতেছে। আজ পূরা তিন বৎসর পরে ওই পুরাতন সংবাদগুলিকেই 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় ঘটা করিয়া প্রচার করা হইতেছে কেন, বৃহত্তর ভারতের মাহাত্ম্য জানিয়াও আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কাগজ শ্বশুরের হইলেও পাঠকেরা সকলেই তো শ্বশুরবাড়ির লোক নয়!

*

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নাগ মহাশয়ের "আদিপর্ব্বে"র একটি ছাড়া সকলগুলি সংবাদই পুরাতন। এই একটিও পরস্মৈপদী—অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের কথা', তৃতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত। সংবাদটি এই যে, রবীন্দ্রনাথের "ভারতভূমি" নামক একটি কবিতা ১২৮০ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। "ভারতভূমি" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনা হইলে ইহাই নিঃসংশয়ে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা। নাগ মহাশয় স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে এই আবিষ্কারটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ প্রকাশ করিলেও 'প্রবাসী'তে সম্পূর্ণ কবিতাটি মুদ্রিত করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে পূর্ণ এক পৃষ্ঠাব্যাপী গুরুগম্ভীর আলোচনা করিয়া এই নূতন পরস্মৈপদী আবিষ্কারের প্রচার-গৌরবের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। লেজে হাত দিয়াই ছাড়িয়া না দিয়া যদি একটু উত্তোলন করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি এই আবিষ্কারটি যে ঝুটা, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু সত্য বা অনুসন্ধান লইয়া তাঁহার কারবার নয়, তিনি দ্বান পাঁঠীকে পাঁঠার দরে বিকাইয়া দিতে। এই কাজ তিনি এমন আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকিলে তাঁহারও তাক লাগিয়া যাইত।

*

এখন "ভারতভূমি"র বিষয়ে একটু বিচার করিয়া দেখা যাক। ১২৮০ াব্দের মাঘ মাসে এটি প্রকাশিত হয়; রচনাটির উপরে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের

মন্তব্য ছিল—"এই কবিতাটি এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি।" ১২৮০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথের বয়স হয় বারো বৎসর সাত মাস। সাড়ে বারো বৎসরের বালককে চৌদ্দ বৎসরের বলিয়া উল্লেখ করার মত ঢিলা বুদ্ধি বঙ্কিমের ছিল না। তা ছাড়া, বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম রচনা প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ তাহা বিস্মৃত হইতেন না এবং 'জীবন-স্মৃতি'তে বা অন্যত্র তাহা নিশ্চয়ই সগৌরবে ঘোষণা করিতেন।

রবীন্দ্রনাথের কোনও রচনা বঙ্কিম-সম্পাদিত বা পরিচালিত 'বঙ্গদর্শনে' বাহির হয় নাই—বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ যখন হয় (১৮৭৬, ৩১ জানুয়ারি, সোমবার, শ্রীপঞ্চমী) তখন তিনি পঞ্চদশবর্ষ-বয়স্ক বালক। 'জীবন-স্মৃতি'তে 'বঙ্গদর্শনে'র অভ্যুদয় ও হৃদয় লুট করার বিবরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, কেমন করিয়া "মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া" পড়িবার সুযোগ পাইয়াছেন। 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় বৎসরেই যদি নিজের কোনও রচনা তাহাতে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে এই সম্ভ্রম ও মোহের অনেকখানিই কাটিয়া যাইত।

আমরা যখন রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী লইয়া কাজ করি, তখন এই রচনাটির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অনুসন্ধান করিয়া আমরা জানিতে পারি, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র (সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র) জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। তিনি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথের দেড় বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং রচনার প্রকাশকালে তাঁহার বয়স ঠিক চৌদ্দ বৎসরই ছিল আমাদের এই উক্তির প্রমাণ স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত 'পঞ্চপুষ্পে'র পৃষ্ঠায় আছে। হাতের কাছে পত্রিকাটি না থাকাতে সংখ্যা ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

* * *

দেখিতেছি, কালিদাসবাবু চমকপ্রদ হইবার লোভে চিন্তিত হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারেন নাই ; তাঁহার মত বেগবেগা-জাতীয় প্রতিভার এই অস্থৈর্য্যেই অপমৃত্যু ঘটে। কিন্তু মৃত্যু হইলেও এই মৃত্যু মহিমময়। এমনই মুন্সিয়ানার সহিত রবীন্দ্র-মহাভারতের এই বেদব্যাস তাঁহার আদিপর্ব্বটি রচনা করিয়াছেন যে, "পড়িলেই পাঠকের মনে হইবে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের গবেষণা করিতে করিতে তিনি ন্যুব্জদেহ কুব্জপৃষ্ঠ হইয়া আসিয়াছেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'বঙ্গদর্শনে'র ফাইল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাঁহার আঁখি-পাখী অন্ধ হইল বলিয়া! অনুকম্পায় পাঠকের হৃদয় যখন প্রায় অশ্রুপ্লুত হইবে, তখন দেখা যাইবে, আসল কালিদাসবাবু লেক-অঞ্চলের কোথাও সোলাহ্যাট মাথায় মজুর খাটাইয়া বেড়াইতেছেন—বৃহত্তর ভারতীয় আর একটি নিকেতন প্রস্তুত হইতেছে। কান্না তখন হাসি হইয়া পাঠক-চিত্তকে উল্লসিত করিবে এবং বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় তিনি অবনত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইবেন।

শ্রীযুক্ত করালীকান্ত বিশ্বাস লিখিয়াছেন—

"ঊনবিংশ শতকের কবিরা বাহ্য জগৎ যে দৃষ্টিতে দেখিতেন আধুনিকের দৃষ্টি সেরূপ নহে। অবশ্য পূর্ব্বে যাহা নিঃসংশয়ে বর্জ্জিত হইত, এখন তাহা নিঃসংশয়ে কবিতায় স্থান পাইতেছে, আধুনিক কবিতার ইহাই লক্ষণ নহে। শিল্পী এবং সাহিত্যিকেরা এখন বাস্তবকে নূতনরূপে অনুভব করিতেছেন। আধুনিক জীবনের দৈন্য, নিঃস্বতা ও কর্কশ কোলাহল কিছু তাঁহারা কুরূপ বলিয়াই বর্জ্জন করেন নাই। একান্ত সহনীয় বিষয়ের অভাবে এই জীবন তাঁহাদের কাছে একটি বিরাট waste বলিয়া মনে হইতেছে। তাই বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য কিছুর সন্ধানে তাঁহারা নিজেদের নিয়োগ করিয়াছেন। যশ এখনও সকলে লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু নিরলস চেষ্টার চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।"—'পরিচয়' মাঘ ১৩৪৯, পৃ. ৪৮১

* * *

দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া মরিতেছিলাম, এমন সময় খোলা জানালার পথে চাঁদের আলোর সঙ্গে একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত এলোমেলো করিয়া দিল।

অনেকগুলি সাময়িকপত্র টেবিলের উপর রক্ষিত ছিল, সবগুলিই গুরুগম্ভীরভাবে গ্যাঁট হইয়া রহিল; যেন আমাদের আশ্বাস দিবার জন্যই পৌষের 'কবিতা'র পাতাগুলি ফরফর করিয়া উড়িয়া ১৩৪ পাতায় থামিয়া গেল। দৈবের নির্দেশ! হুমড়ি খাইয়া পত্রিকাটি তুলিয়া লইয়া পড়িলাম—যাহা চাহিতেছিলাম, ঠিক তাই।—

"একটি নীরব লোক মাঠের উপর দিয়ে চুপে
ঈষৎ স্থবিরভাবে হাঁটে।
লাঙ্গল ও বলদের এক গাল স্থির ছায়া খেয়ে
তাহার হেমন্তকাল দুই পায়ে ভর দিয়ে কাটে।
নিজের জলের কাছে ভাগীরথী পরমাত্মীয়।
চেয়েও পায় না তাকে কেউ তার সহিষ্ণু নিভৃতে
লাসকাটা ঘরের ছাদের পরে একটি দোয়েল
পৃথিবীর শেষ অপরাহ্ণের শীতে
শিষ তুলে বিভোর হয়েছে।
কার লাস! কেটেছিল কারা?
সারা পৃথিবীতে আজ রক্ত ঝরে কেন?
সে সব কোরাসে একতারা।
অপরাহ্ণের চাষা ভুল বুঝে হেঁটে যায় উচ্ছ্বলিত রোদে
নেই, তবু প্রতিভাত হয়ে ওঠে নারী।
মর্গের মৃতদেহ দোয়েলের শিষে মিটে গেলে—
আদিম দোয়েল এলে—অনুভব করে নিতে পারি।"

কবিতাটি আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবির রচনা; অমিতাভ সেনের কবিতার মত ইহাকে ব্যঙ্গ-কবিতা বলিলে নাটোরের বনলতা সেন মানহানির নালিশ করিবেন। আধুনিক জীবনের বিরাট ওয়েষ্টের মধ্যে ইহাই কি "বিশ্বাস-যোগ্য, নির্ভরযোগ্য কিছুর সন্ধান"? পাগলা-গারদের বাহিরে নানাভাবে উত্তেজিত এবং নিপীড়িত আধুনিক মানুষের পক্ষে কোনও আশ্বাস এই কবিতা

বহন করিতেছে কি? আধুনিক কবিতার ব্যতিক্রম এই কবিতাটি নয়, ইহা একটি টাইপ কবিতা। রবীন্দ্র-কাব্যের ক্ষীর-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া যাহারা কাব্যের অগ্নিমান্দ্যে ভুগিয়া এই জাতীয় কবিতা উপভোগ করিতে চাহিতেছে, তাহাদিগের প্রতি আমরা অনুকম্পা প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু তাহাদের ফতোয়া বাংলা দেশ মানিবে কেন?

সমালোচনার এই বিকৃত রুচি শুধু কাব্যের ব্যাপারেই নয়, গল্পে-উপন্যাসেও দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পর বাংলা কথা-সাহিত্যে অতি-আধুনিকতার নামে যে জ্বরবিকার দেখা দিয়াছিল, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, "বনফুল" প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যশিল্পীর সাধনায় সেখানে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু রোগীর জগৎ এবং সুস্থের জগৎ কখনই এক নহে। রোগীর নিকট এই স্বাস্থ্যই বীভৎসতারূপে গণ্য হইতেছে। সুতরাং বিশ্বাস মহাশয়ের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে আমরা বিস্মিত হই নাই :—

"বনফুল এবং তারাশঙ্কর···যে জগৎ হইতে গল্পের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করেন তাহা নিম্ন মধ্যবিত্তের জগৎ। উহার পরিধি স্বল্প। এই স্বল্প পরিধির জগতে উপরিস্থিত গ্লানির দিকটাই দুইজনের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। উহার গভীরতার পরিচয় তাঁহারা পান নাই।···লুপ্তপ্রায় ঐশ্বর্য্যের অতীত স্মৃতি সন্তর্পণে আবৃত করিয়া বহির্জগতের দিকে চাহিয়া চতুর্দ্দিকের কুশ্রীতা ও গ্লানিই তিনি (তারাশঙ্করবাবু) দেখিতে পাইয়াছেন। এই দৃষ্টি লইয়া তিনি যে গল্প রচনা করিয়াছেন তাহাও অন্ধকার ও পূতিগন্ধময়।···তাঁহার রচিত গল্পে 'মানবমনের গূঢ় পরিচয়' দূরের কথা, সমাজের বাস্তব রূপও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। বিকার ব্যতীত অপর কিছু তিনি অবলম্বন করিতে পারেন না।···

অবসরসময়ে সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া তিনি (বনফুল) অনায়াসেই কালাতিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক উত্তরোত্তর এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল যে তাঁহাকে জীবন পরম্পরায় ইহার মধ্যেই থাকিতে হইবে, এই চিন্তাতেই

তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার আত্মতৃপ্ত ঔদাসীন্যে রূঢ় আঘাত লাগিল। এজন্য তিনি আধুনিক কালকে, এবং বয়সের হিসাবে আধুনিকদের দায়ী করিলেন। আধুনিক কালের স্বরূপ তিনি বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই, আধুনিক সমস্যা তাঁহার ন্যায় চিত্তবৃত্তির অধিকারীদের পক্ষে অনধিগম্য। তথাপি তিনি নানাভাবে আধুনিককে আক্রমণ করিয়াছেন।"—'পরিচয়', মাঘ ১৩৪৯, পৃ. ৪৮৬-৮৭

করালীকান্ত বিশ্বাস কে জানি না, 'পরিচয়'-সম্পাদকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, উপরের উক্তির অর্থ কি তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন? করেন নাই, কারণ কোনও অর্থই ইহার হয় না। দুইজন প্রবল প্রতিপক্ষকে নস্যাৎ করিতে হইলে রণাঙ্গনে ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণের আবির্ভাব সমীচীন ছিল, শল্যকে পাঠাইয়া তাঁহারা ভাল করেন নাই।

* * *

তারাশঙ্কর ও বনফুলের রচনা সমালোচক অল্পই পড়িয়াছেন; তাহার প্রমাণ, ইঁহারা কদাচিৎ নিম্ন মধ্যবিত্তের জগৎ হইতে বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সমাজের সকল শ্রেণীর; বিশেষ করিয়া অভিজাত-শ্রেণীর (ইঙ্গবঙ্গ অভিজাত নয়) মধ্য হইতে ইঁহারা অনেক গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা নির্ব্বাচন করিয়াছেন; একেবারে নিম্নশ্রেণীও বাদ যায় নাই। "লুপ্তপ্রায় ঐশ্বর্য্যের অতীত স্মৃতি সন্তর্পণে আবৃত্ত করিয়া বহির্জ্জগতের দিকে চাহিয়া চতুর্দ্দিকের কুশ্রীতা ও গ্লানিই দেখিতে পাইয়াছেন"—এই বাক্যের অর্থ রাজেশ্বর সুধীন্দ্র দত্ত স্বয়ং করিবার চেষ্টা করিবেন কি? অপর সম্পাদক হিরণকুমার সান্যাল নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক, তাঁহাকে এই কঠিন কাজে আহ্বান করিব না।

* * *

করালীচরণের করাল বাক্যের যদি কোনও অর্থ থাকে, তাহা সম্ভবতঃ এই যে, তারাশঙ্কর অ্যাব্‌নর্মাল এবং বনফুল রি-অ্যাক্‌শনারি। তাঁহার প্রবন্ধে তিনি যদি ইহাই বুঝাইতে চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা বলিব, তিনি ভুল করিয়াছেন। তারাশঙ্করের 'ধাত্রী দেবতা', 'রাইকমল' ও 'গণদেবতা' এবং বনফুলের

'দ্বৈরথ', 'মৃগয়া' ও 'রাত্রি' এই উক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য এই যে, 'ঝালিন্দী' এবং 'তিনশূন্য'ই তারাশঙ্করের প্রতিভার, এবং 'তৃণখণ্ড', 'বৈতরণীর তীরে' ও 'নির্মোক' বনফুলের প্রতিভার চূড়ান্ত পরিচয় নয়। মোহিত-লাল মজুমদারের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া বিশ্বাস মহাশয় উলুখড় জ্ঞানে যাঁহাদিগকে উৎখাত করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদের শিকড় যে ইতিমধ্যেই মৃত্তিকাগর্ভে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, এই জ্ঞান অন্তত 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর থাকা উচিত ছিল।

ফাল্গুনের 'ভারতবর্ষে' নরেনদার "কলিকাতার চিঠি" নামক কবিতায় কলিকাতাবাসী আমাদের গত বোমাবিভ্রাটে দুঃখদুর্দ্দশার ফিরিস্তি পড়িয়া ভারী ভাল লাগিল। সব চাইতে ভাল লাগিল ওই "হি-শি"র জায়গাটা। অনুরূপ আনন্দ পাইয়াছিলাম 'কমলাকান্তের দপ্তরে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের "চন্দ্রালোকে" পাঠে; সেখানেও তিনি চাঁদকে লইয়া ইংরেজীতে 'হি শি' করিয়াছিলেন। নরেনদার 'হি-শি'—মোর প্র্যাক্টিকাল, মোর ইন্টিমেট। আমরাও যখন ও-বোঝা মাথায় লইয়াছি এবং জন্মনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করি না, তখন বুঝিতেই পারিতেছেন, এই নিদারুণ শীতে কাঁথা-বেষ্টিত অবস্থায় কি কষ্টটাই না ভোগ করিয়া থাকি! চন্দ্রালোকে ইহার সামান্যই প্রতিকার হয়। যাহা হউক, নরেনদার কবিতার কথা বলিতেছিলাম। নরেনদা লিখিয়াছেন—

"বন্ধ ঘরের অন্ধকারের করাল কবলে ঢুকে
মধুসূদনের নাম জপি দাদা ভয়কম্পিত বুকে।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাবার, কেটে যায় বুঝি নিশি—
মেয়ে জেগে বলে 'জল খাব বাবা', ছেলে উঠে বলে 'হি-শি'।"

* * *

এই জাতীয় আরও ইন্টিমেট কথা লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁহার রবীন্দ্রনাথকে লইয়া লেখা 'জীবনশিল্পী' পুস্তকের শেষ নিবন্ধ "বিনু"তে। রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

"কিন্তু এই সব পড়াশুনার সদ্য ফল কিছুমাত্র ছিল না। বিনুর মাসিক বন্ধ হয়ে গেছল,…সে প্রায় সমস্তক্ষণ পড়ত।"—পৃ. ৭৭

ইহার পর আমরা বিনুর কাছে অনেক সুফল প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু পোড়া কপাল আমাদের, পর্ব্বত ক্রমাগত মূষিক প্রসব করিয়াই চলিয়াছে!'

যাঁহাদের বিশ্বাস পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসবোধ হাত-ধরাধরি করিয়া চলিতে পারে না, তাঁহাদের বিশ্বাসের মুখে চুনকালি দিয়া ডক্টর সুবিমলচন্দ্র সরকার, এম-এ (ক্যাল), পি-এইচ-ডি (অক্সন), এম, আর, এ, এস, ফেলো অব দি পাটনা ইউনিভার্সিটি প্রণীত 'ধোপার পাট' নামক যুগান্তকারী নাটিকাটি বাজারে বাহির হইয়াছে। ডক্টর সরকারের আরও পরিচয় আছে, তিনি পাটনা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। এত সব গুণের কথা শুনিয়াও যদি কাহারও শক্ত মাথা নত না হয়, তাহাকে কাত করিবার জন্য আর একটি সংবাদ ঘোষণা করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার "মনকে গড়ে তুলেছে আচার্য্য, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সঙ্গীত।"

এহেন ডক্টর সুবিমল সরকার "সিনেমার জন্য আলাদা করে নতুন ধরণের নাটক" মাত্র "তিন সপ্তাহ; ২১ দিনে" রচনা করিয়া "কয়েকজন সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র-নিপুণ বন্ধুদের তারিফ" পাইয়াছেন। এই একুশ দিনের সহিত মহাত্মা গান্ধীর একুশ দিনের প্রায়শ্চিত্ত-ব্রতের কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তাহা প্রকাশ নাই।

এই "ছায়াভাব" নাটিকাটির প্রকাশের ফলে বাংলা চলচ্চিত্র-জগতে যুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং ইহার আখ্যানবস্তুর পরিচয় আবশ্যক। মোদ্দা কথাটা হইতেছে—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। মধ্যযুগে বঙ্গদেশে কীর্ত্তিপুরের রাজপুত্র কাঞ্চন-নাম্নী রজক-কন্যার সহিত বৈধপ্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বহু বাধাবিঘ্ন ও কামোন্মাদিনী রাজকন্যা রুক্মিণীর প্রেম-নিবেদন অতিক্রম করত শ্বশুর গোবর্দ্ধন ধোপার প'ড়ো ভিটের উপর মন্দির স্থাপন করেন। সেই মন্দিরের নাম "ধোপার পাট।"

এই এক ধোপীপাট আছাড়ে বাংলা দেশের সমস্ত সাহিত্যিক এবং পাশ্চাত্য যাবতীয় যৌনতত্ত্ববিদ কি ভাবে ঘায়েল হইয়াছেন, তাহা দেখিবার মত। আমাদের স্থানাভাব, তথাপি বিভিন্ন শিরোনামায় কিছু কিছু নমুনা ছাড়িতেছি।—

ফিল্ম টেকনিক ১। কাঞ্চন একলা ঘরে ঘুরে ফিরে চুল বাঁধতে ও কাপড় ছাড়তে লাগল। পৃ. ৪

২। কুমার বাঁশী হাতে বেরিয়ে এসে কাঞ্চনের [ভিজে কাপড়ে কলসি কাঁখে] খালি বাহু ও হাতখানি দু'হাতে চেপে ধ'রে, ধীরে ধীরে তার মুখের কাছে মুখ আনতে লাগল। কাঞ্চন বলিল—'আঃ দিনের বেলায় কি যে কর সখা।' পৃ. ১০

৩। রুক্মিণী। কেউ দেখবে না কুমার,—এই দিকে সরে এসো, আমার আঙ্গিনায়—[টেনে ভিতরের আঙ্গিনায় নিয়ে গিয়ে মাঝের দরজা বন্ধ করে দিল] এখানে আমার মহল—কোনো বাধা নেই।···

কুমার। [হাত ছাড়াতে চেষ্টা]

রুক্মিণী। [সাবেগে] না, ছাড়বনা, তুমি আমার,—[জাপটে জড়িয়ে ধরল] ···[সঘনে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে] চেয়ে দেখ দেখি আমার দিকে [ওড়না আঁচল ফেলে দিয়ে, এলো-খোঁপা খুলে দিয়ে···] মুখ তোলো—দেখ আমাকে··· [ছুটে এসে দুহাতে গলা জড়িয়ে বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে] দেখি, কেমন পুরুষ তুমি,—আমায় জড়িয়ে ধরে দেখে নাও, আমার বুক কি ফুলের মত, ঠোঁট কি মধুর মত নয়? [মুখ তুলে চুম্বনে উদ্যত] পৃ. ৬৫-৬৮

ডায়ালগ ১.। ধাত্রী।···কাঞ্চনের নাগরটি কেড়ে নেবার ফন্দি করেছিস বুঝি?

রুক্মিণী। [কৃত্রিম বিরাগে] ছি ছি, নাগরে অরুচি,—ধোপানীর এঁটো—

ধাত্রী। হ'লই বা, রাজার ছেলে সবাই এঁটো,—তোর মাও তো সাত-এঁটো জীবন ভোর সুখে ভোগ করে গেল, সব রাজকন্যেই তাই করে···। পৃ. ৬১

২। ভট্চায্। রাণীর তো শোনা যায় রাজায় অরুচি হয়েছে, চাটনির জন্যে মাধব রায়ের ডাঁশা ছেলেটিকে আচারে মজানো হচ্ছে।—পৃ. ১২০

৩। রুক্মিণী।···সেই কুমারই এখনো ভুলল না—ধোপানীরই ধ্যান হচ্ছে এখনো, খেনো মদের নেশা, ঘেন্না ধরে যায়, নিজের ওপরেও,—ছি ছি, বাসরী

সাজিয়ে রাজকন্যা বসে থাকো নিতিনিতি,—আর রাজপুত্তুর রক্ষিতার ভাবে ভোর হয়ে পড়ে আছেন বারবাড়িতে সারারাতি,—নাঃ আজ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি···ফেরাতে না পারি, কেঁদে আর মরছি নি তার জন্যে···রাজকন্যেও তাহলে বাইরে পীরিত করবে,—রাজপুত্তুররা করলে প্রেমিক, সুজন, রাজকন্যেরা করলে নয় কেন ? [মুখ টিপে হেসে] বসনের ভাইটি তো ছিপ ফেললেই টোপ গিলবে,···সব মাছই আমিষ, রুই আর কাতলা।—পৃঃ ১২৬-৭

৪। হাত ছাড়ো বঁধু আমার,···কি বল ভাই, বনফুল,···বাইরে ভিজো না ধন, কাঁদছ কেন মণি,···এসো নববধূ আমার,···একি মাণিক, কাঁপছ কেন এত,··· তুমি কি ক'রে পারবে সোনা, তুমি জল খেয়েছ মনা।

* * *

ভূমিকায় নাট্যকার বলিয়াছেন—"যত দূর জানি এই পাঁচ বছরেও এ ধরনের নাটিকা কেউ লেখেন নি···নাটিকাটি আধুনিক সমাজের মনে লাগবে, মর্ম্মেও আঘাত করতে পারে।" বটতলার 'বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন' অথবা 'পীরিতের কাঠপিঁপড়ে' জাতীয় গ্রন্থের লেখকের হাতের রচনা হইলে এই ভূমিকায় আমরা আপত্তি করিতাম না। লেখক পঞ্চাশোর্দ্ধে পা দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ভবিষ্যতের কথাও তুলিব না। এ যুগে রুচির কথা তুলিয়াও আমরা গোঁড়ামির অপবাদ লইতে প্রস্তুত নই। আমাদের আপত্তি রবীন্দ্রনাথকে লইয়া। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও সঙ্গীতে গড়িয়া ওঠা মনে এতখানি 'আদি-রস জমিল কেমন করিয়া ? এই রস গড়াইয়া অধ্যাপক মহাশয়ের ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা ঘটাইবে কি না, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার বিচার করিবেন।

রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' তৃতীয় খণ্ড বাহির হওয়াতে তাঁহার পারিবারিক জীবনের অজ্ঞাত পরিচয় আরও খানিকটা প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডের ৬৭টি পত্র পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত। তাঁহার কাব্য ও কর্ম্ম-জীবনের বহু জ্ঞাতব্য সংবাদও এই চিঠিগুলিতে আছে। কবি রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ বুঝিবার পক্ষে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই চিঠিপত্রগুলির প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কর্তৃক প্রকাশিত শান্তিদেব ঘোষ প্রণীত 'রবীন্দ্র-সংগীত' পুস্তকখানিও উল্লেখযোগ্য। এই বইটির নিছক টেক্‌নিকাল অংশ বাদ দিলেও সাধারণ পাঠকের জানিবার মত অনেক খবর ইহাতে আছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গান ও সেগুলির রচনা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা শুনিতে শুনিতে মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও অনেক কথা জানিতে পারিয়া লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছি।

'সাতই পৌষে রবীন্দ্রনাথ'—শ্রীসুধীরচন্দ্র করের একটি সুলিখিত সুখপাঠ্য পুস্তক। শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য্য এবং এই উৎসব-দিবসকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথের দীক্ষা উপদেশ ও কয়েকটি পত্র এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র প্রথম ভাগের প্রকাশ সাহিত্যামোদীগণের নিকট একটি স্মরণীয় ঘটনা। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি ভারতচন্দ্র—প্রথম শব্দশিল্পী ও ছন্দশিল্পী ভারতচন্দ্রের কাব্য-জ্যোতি প্রতিদিন উজ্জ্বলতর হইতেছে। এখন পর্য্যন্ত এই কবির কাব্যগুলির নির্ভরযোগ্য সংস্করণ ছিল না। সাহিত্য-পরিষৎ অনেকগুলি পুথি ও প্রাচীন মুদ্রিত সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া পাঠ-ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া এবং টীকাটিপ্পনি যোগ করিয়া সাধারণ পাঠকের ও ছাত্রগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। প্রথম ভাগে প্রচলিত 'অন্নদামঙ্গল' অংশ মুদ্রিত হইয়াছে এবং ভূমিকায় কবির জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ ও অন্যান্য কাব্য সমুদয় প্রকাশিত হইবে।

—

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার প্রণীত ১২ খানি আধুনিক মানচিত্র সহ 'এ যুগের যুদ্ধ'—আধুনিক যুদ্ধবিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কিত একখানি নূতন বই। এই মহাযুদ্ধে কোন্ কোন্ সামরিক নীতির সংঘাত হইতেছে, তাহা পুস্তকের প্রথম ভাগে আলোচনা করিয়া লেখক বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রত্যেকটি পর্ব্ব সেই আলোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং এই যুদ্ধের শিক্ষা কি, তাহাও নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। এই বইয়ের সাহায্যে আমরা যুদ্ধ সম্পর্কে মাতৃভাষায় একটা মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিতে পারিব।

ক্যামেরার ওস্তাদ শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর 'ক্যামেরার ছবি' বাংলা ভাষায় একটি অভিনব চিত্তাকর্ষক বই। ক্যামেরা-ব্যবহারকারী বাঙালী মাত্রেরই সঙ্গী হইবার দাবি এই পুস্তকখানি রাখে। গ্রন্থকারের তোলা আর্টপ্লেটে মুদ্রিত ১৬ খানি ছবি শিল্পের সম্মান পাইবার যোগ্য হইয়াছে।

প্র. না. বি.র 'ডিনামাইট' লঘুভঙ্গিতে লেখা চারিটি নাটকের সমষ্টি; নাটিকাগুলি শুধু সুখপাঠ্য নয়, সু-অভিনয়েরও দাবি রাখে। এই দুর্দ্দিনে এই ধরনের তীক্ষ্ণ হাস্যোজ্জ্বল রচনা সকলেরই আদরণীয় হইবে।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *Bengali Stage* বাংলা নাট্যমঞ্চ লইয়া তাঁহার দীর্ঘকালের গবেষণার ফল। বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁহার বৃহত্তর পুস্তকের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যই এই পুস্তকে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করিয়া এই বইটি প্রকাশ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসুর 'গান্ধীজী' বাংলা দেশের সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের জন্য লিখিত একটি চমৎকার জীবনকাহিনী; সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গীতে লেখা। অতি সহজ ভাষায় লেখক গান্ধীজীর স্বরূপটি স্বল্প পরিসরে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মলাটটি মনোরম।

'মহারাণা প্রতাপসিংহ' শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর একখানি বই। গল্পের ভঙ্গীতে লেখা হইলেও ইতিহাস কুত্রাপি খণ্ডিত হয় নাই। যে স্মরণীয় বীরপুরুষের কাহিনী ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, তাঁহার জীবনের সহিত বাংলা দেশের প্রত্যেক বালকবালিকার পরিচয় হওয়া এই অবনত যুগে একান্ত আবশ্যক।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি

চৈত্র ১৩৪৯

লুপ্তোদ্ধার

স্থান—কৈলাস

উমা। জয়া, একবার দেখে আয় দিকি কর্ত্তা কি করছেন? ধ্যানস্থ কি?

জয়া। তাঁকে আবার জ্বালাতন করা কেন?

উমা। আমি একা আর কত জ্বালাতন হব, আমি যে গেলুম! দিন-রাত "মা মা" ক'রে ছেলেরা যে অস্থির করছে! আবার কি হ'ল? একটা না একটা লেগেই আছে!

জয়া। নতুন কিছু নয়, সে তো দুই-তিন বছর চলছে।

উমা। দুই-তিন বছর?, কই, তা তো কিছু জানি না?

জয়া। আমার নন্দীর কাছে শোনা। তারা বহু দূরের, সেই অন্তর্গামীর দিকে থাকে কিনা, "মা মা" করে না, তাই শুনতে পাও নি। তারা নিজেকেই জানে, নিজের ওপর নির্ভর রাখে।

উমা। সত্য-যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে বুঝি,—বেদান্ত-চর্চ্চা করছে? ভালই হয়েছে—

জয়া। না, অতটা হয় নি, অহংকে আঁকড়ে ধ'রে মিথ্যাকে একদম সাফ ক'রে ফেলেছে, তাকে না সরালে সত্যের স্থান হয় না যে।

উমা। বলিস কি! ভেতরে ভেতরে ঠিক ভুলটি ধরেছে তো। হবে না, একদিন হতেই হবে, তা জানতুম। বড় আনন্দ পেলুম, বেঁচে থাক সব। ভারত একদিন আচার্য্যের আসন নেবে বইকি। কিন্তু কি লজ্জার কথা বল, দিকি? ওঁর অপেক্ষা কেউ করলে কি, কেউ পুছলে? কতদিন আর সইবে? যাই, একবার শুনিয়ে আসি—(দ্রুত চ'লে গেলেন)

জয়া। (নিজে নিজেই) তাই তো, নন্দীর কথা শুনে কি করলুম! সেও তো টানে, না টেনে ওঁকে দেয় না। মিছে হ'লে ধমক খেয়ে না আসেন। যাই, বেলতলাটা ঝাঁট দিতে দিতে একটু শুনিগে। (প্রস্থান)

শিব আসনে ব'সে ঘন ঘন হাই তুলছেন,—চক্ষু বুজেই আছেন।

উমার প্রবেশ। তাঁর গতিটা একটু তরস্থ ছিল, শব্দ শুনে নন্দী ভেবে—

শিব। হারামজাদা, এখন তোমার হুঁশ হ'ল? আজ না অমাবস্যা, রাত আর কতটুকু আছে? আমার সব কাজ বাকি—

উমা। রাত আবার কি? একপোর বেলা হয়ে গেছে। তিনটে চোখেও কুলুচ্ছে না নাকি?

শিব। কে, উমা নাকি—এত রাত্রে? কার্ত্তিক ভাল আছে তো?

উমা। আবার রাত? একবার চেয়েই দেখ না।

শিব। (হাই তুলে, চোখ না খুলেই) ইস্, তাই তো!

উমা। (রুষ্টভাবে) আমার মাথা,—চোখ বুজেই—

শিব। পারি না বুঝি, এই দেখ। (ভুরুটা কেবল কোঁচকালেন।)

উমা। তাই তো, খুব হয়েছে। আর কাজ নেই, শেষ কালিদাসকে আবার জন্মাতে হবে। "উমাবিলাপ" লিখতে থাক, এদিকে যে শিবত্ব ঘোচে।

শিব। ঠিক বলেছ, পঞ্চত্ব ওই হারামজাদাই পাওয়াবে। রাত পোয়ায়—বেটার হুঁশ নেই। হাই তুলে তুলে হাঁ বেড়ে গেল। একবার দেখ না, বেটা ঘুমুচ্ছে বুঝি—

উমা। ফের—আবার রাত?

শিব। আহা, বুঝছ না—বেটা গণ্ডমূর্খ, "ন দিবা শাপ্সি" ও জানে না। একটা ইংরিজী-জানা লোক দেখ—ওকে নিয়ে আর—

উমা। ঐ ইংরিজী-জানা পণ্ডিতদের কথাই তো বলতে এসেছি।

শিব। আঃ, বাঁচালে দয়াময়ী! এত দিকে নজরও রাখতে পার! শুনেছ বুঝি—এখন দরোয়ান পিওনদেরও ম্যাট্রিক পাস ক'রে চাকরি পেতে হয়? দূর ক'রে দাও, দূর ক'রে দাও হারামজাদাকে,—অভাব কি? এখন ভিখিরীও ভিক্ষে নিয়ে থ্যাঙ্ক্স দেয়, আর এ গর্দ্দভ— পোড় কলকে দেয়! বেইমান, ব্রুট—এইবার বুঝবে বেটা—

উমা। এখন তুমি বুঝলে যে বাঁচি।

শিব। দেখে নিও। আমার এ "মরদ্‌কি বাৎ"।

উমা। ওদিকে মন্দামি যে যায়! তোমার গেঁতোমি দেখে সুস শিক্ষিতেরা তোমার তক্কা না রেখে নিজেদের বুদ্ধির ওপর নির্ভ

করেছে, "পুরুষকারে" পৌঁছে গেছে। বেদান্তের সারে পৌঁছে গেলে আমাদের আর পুছবে কে? তারা আর "বাবা বাবা"ও করে না, "মা মা"ও করে না—স্বয়ংসিদ্ধ। নিজেকেই জানে, নিজের ওপরেই বিশ্বাসী। বলে—সায়েন্সই সবার বড়, বুদ্ধির জোরে তাকে হাত করতে পারলে, কোনও মিঞার পরোয়া রাখি না।—কানের তো পলক নেই—শুনছ?

শিব। একটু আছে বইকি—ঐ জটাগুলো।

উমা। আরও ঘটা ক'রে বাঘ-ভাল্লুকের বাসা বানাও।

শিব। সাপগুলো মাথায় উঠেছে, দিন কত আনন্দ করুক না। ওরা নিজের ছেনা নিজেরা খায়—

উমা। কথাটা বুঝছ না, তুমি ধ্বংসের মালিক কিনা, এখন তারা তাইতে মাথা দিয়েছে ধ্বংসের কল বানিয়েছে—বানাচ্ছে। "গেল গেল" রব প'ড়ে গেছে দুনিয়াময়।

শিব। আমার পরম সহকারী ভক্ত বল!

উমা। সহকারী নয়—কীর্তিহরী। তোমাকে বাতিল করাই উদ্দেশ্য—ক'রেই দিয়েছে। বুঝেছ—দেবতা আবার কি? সব আমরা। আরও চোখ বুজে থাক—ভিক্ষেও মিলবে না। আমার কার্তিক—(স্বরটা ক্রন্দনের আওয়াজ দিল)

শিব। আহা, শোন না। আমার কাজের বাধা তো তুমিই। সাধে কি চোখ বুঝেছি? একবার 'মা' বললেই মাফ! ওদের 'সায়েন্সে' সেটি পারে না—শিশু-সুদ্ধ মা সাফ। দোষী নির্দ্দোষ নেই। দেখ দিকি, কেমন সোজা রাস্তা! একে বলে বুদ্ধি,—তাদের বুদ্ধি হবে না? যাক, কাদের এত বুদ্ধি বাড়ল? ভারতবাসীর?

উমা। ওমো না, তারাই তো "মা মা" ক'রে আমায় জ্বালাচ্ছে।

শিব। এখনও মুখ খুরা আছে? যেতে দাও না, দু নৌকোয় পা দিয়ে দিয়ে থাকা কেন, যাক না। বছর বছর বাপের বাড়ি যাও কি চোখ বুজে? কেবল আমাকেই চোখ বুজতে দেখ! ওর যে আরাম কত, তা তো জান না।

উমা। কেন আমি চোখ বুজে যাব কেন? বাড়ি, ঘর, রাস্তা

ক্রমেই পাকা হয়ে যাচ্ছে—দেখব না কেন? তুমি একবার চক্ষু সার্থক ক'রে এস না—মা কত বলেন—

শিব। বটে, সব পাকা হয়ে যাচ্ছে! আর তাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত, আমাকে উৎসর্গ করা মন্দিরগুলো সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে! রাতে গরুর গাড়ি ক'রে কেউ আমার গঙ্গাজলী ক'রে আসছে, কেউ পাকা বাড়ির ভিতে গোর দিয়ে বাড়ি পোক্ত করছে, না? পরের মুখে ঝাল খাওয়া বিদ্যে শিখছে—বুদ্ধি বাড়ছে, ক্রমে পইঠে বাসাবে, সেইটের অপেক্ষা করছি। পথ পাও তো এইবার দেখে এস—বাপের বাড়ি খুঁজে নিতে হবে কিন্তু। আর 'কণকাঞ্জলির' লোভ যেন না থাকে।

সচকিত ভাবে কানঢাকা জটাগুলো সরিয়ে

বীণাবাদ্য না?

বীণা হস্তে নারদের প্রবেশ

নারদ। এই যে, মাও উপস্থিত! (উভয়কে প্রণাম)

উমা। এস, নারদ এস। অভীষ্ট লাভ কর।

শিব। এত রাত্রে যে? সব মঙ্গল তো?

উমা। আবার ঐ কথা?

শিব। না, এত বেলায় যে? (নারদের প্রতি) উনি বুঝতে পারছেন না, রাত কি দিন। (উমার প্রতি) হারামজাদাকে একবার ডেকে দাও না, হাই তুলতে যে আর পারছি না।

রুষ্ট হাস্যে উমার প্রস্থান

(নারদের প্রতি) দুনিয়ার হালচাল কি দেখে এলে, সব ভাল তো?

নারদ। (মাথা চুলকুতে চুলকুতে) মরবার বয়স পেরিয়ে গেলুম, কিন্তু ঐ "ভালর" অর্থটা মাথায় ঢোকে নি প্রভু। একজনের ভাল, আর একজনের মন্দ না হ'লে তো বড় দেখতে পাই না। কার কথা বলব—একটা খুঁট ধরিয়ে দিন।

শিব। ধর—এই যেমন 'সায়েন্স'।

নারদ। ও, ও তো আপনার ডিপার্টমেণ্টের কথা। তার প্রভাবই তো এখন পৃথিবীময়। প্রধান স্থান সেই নিয়েছে। বাহবা প'ড়ে গেছে। আপনাকে আর আসন ছেড়ে উঠতে হবে না, কাজ

আপসে চলছে ও চলবে। তোফা জিনিস বানিয়েছে, একটা ছাড়লেই হাজার লোক ফিনিশ। দেবরাজের বজ্র তার কাছে এখন চীনে পটকা—আপনার 'টিকে' ধরাবার কাজে লাগতে পারে বটে।

শিব। বল কি হে নারদ—এমন?

নারদ। বলেছি আর কই! অমন কত কি করেছে; এক রকম তো নয়। একটার কথা বললুম। ফলে আপনাকে আর ভাবতে হবে না।

শিব। বাবাজীর নামটি কি?

নারদ। সেটা পরে শুনবেন, আমার সাহসে কুলুচ্ছে না। আর একটার কথা বলি।

শিব। সে আবার কি, তাঁর কাজ?

নারদ। তিনি উভচর, যাতে ঠেকেন, তিনি আর টেঁকেন না, তা জলেই কি আর স্থলেই কি। রাজপ্রাসাদকে স্পর্শ করলে দ পড়িয়ে হ্রদ বানায়, না হয় মরুভূমি। সমুদ্রে লৌহদেহ মানোয়ারি জাহাজে ঠেকেছে কি তিনি মাল-মানুষ সমেত তলসই। তাঁর নাম 'টরপেডো'। একটা গ্রাম গ্রাস করতে একটিই যথেষ্ট।

শিব। বড় সুখবর শোনালে নারদ। হ্যাঁ, ঐ প্রথমটির নামটি যে শোনা হয় নি।

নারদ। অভয় দিতে হবে কিন্তু, না অনুমতি নিয়ে একটা বড় অপরাধ ক'রে ফেলেছি প্রভু। বয়স হয়েছে, স্নায়ু দুর্ব্বল, সহজেই ক্রোধের উদয় হয়, সইতে পারি নি।

শিব। সে তো আমারও গো। এই দেখ না, নন্দী হারামজাদা আজ জুতো খাবে দেখছি। ভাগ্যে তা নেই, তাই বেঁচে যাচ্ছে। আজ আর রাগের ভাগ অন্যে পাবে না, তুমি অসঙ্কোচে বলতে পার। দুনিয়ার খবরের জন্যে আমি উৎসুক নই, তারা স্বাধীন জাত, মারতে জানে, মরতে জানে, আমার কাজ সহজেই চালাতে পারবে। পেন্‌শন নেবার বয়স হয়ে গেছে, কেবল কার্ত্তিকবাবুর জন্যে এক্সটেন্‌শনে থাকতে হয়েছে। বেটার পোশাক এসেন্স আর চুল-ছাঁটার বিলেই পিলে শুকুচ্ছে। আবার কে 'পেলিটি' আছেন,

তিনিই ছেলেটির মাথা খেলেন। যাক, আমাকে ভারতের খবরটি শোনালেই হবে।

নারদ। (স্বগত) ফেললে গাড়ি নন্দামায়। (মাথা চুলকে প্রকাশ্যে) সব চাকুরে কিনা, আপিসে অধিকাংশেরই কোপি করা কাজ, তাই সব বিষয়েই তারা অনুকরণপ্রিয়, দাগা বুলুতে দক্ষ হয়ে প'ড়েছে, দোষ বড় নেই। বিদেশীদের যা দেখে, তাই শেখে। তাই পূজাপাঠ উঠে গেছে—ওদের নেই কিনা। মন্দিরগুলোয় লোক ঢোকে না, ঢোকে ছুঁচো প্যাঁচা আর চামচিকে। শ্যাল-কুকুরের আড্ডাও হয়েছে। নাম আর করব না, সেদিন দেখি মন্দিরগুলো মিউনিসি-প্যালিটিকে বেচেছে, তারা মন্দির ভেঙে— ; আর শুনে কাজ নেই।

শিব। (জটা খাড়া হ'য়ে উঠছিল) বল, বল, শেষ কর—

নারদ। (বল পেয়ে) শেষ হবার দেরি নেই, আপনিই হবে। পূজো মনে মনেও চলে, চলতও, কিন্তু 'বম্‌বম্‌'টা এক-একবার সাড়া দিত। কোথাও তা কানে এল না, তখন প্রাণে এল রাগ, অপরাধ ক'রে ফেলেছি প্রভু, ক্ষমা চাইতেই এসেছি।

শিব। (ক্রমোচ্চ স্বরে) তারপর, তারপর? (বলতে বলতে তৃতীয় চক্ষু ধকধক ক'রে জ্ব'লে উঠল) বল, বল, তারপর?

নারদ। (কাঁপতে কাঁপতে, স্বগত) তাই তো, করলুম কি? (প্রকাশ্যে) থাকতে পারলুম না প্রভু। সায়েন্টিস্টদের ঠিকানা জানি না। একে ওকে জিজ্ঞাসা করি, বুড়ো আর এই চেহারা দেখে সব পাগল ভাবে—কেউ লালবাজারের থানা, কেউ ধাপার মাঠ দেখিয়ে দেয়। ভাবছি ব্রেহ্মার শরণ নিই, এমন সময় হঠাৎ এক বিকট কান্নার স্বর। বাঙালীদের কি দয়ার শরীর, মেয়ে মদ্দে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে, বোধ হয় সান্ত্বনা দিতে। ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল। কি গা, কি হয়েছে—কোথায়, কার? কেউ কথা কয় না। একজন পাজামা-পরা প্রবীণ আমাকে ধাক্কা মেরে বললে, সত্বর একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়, সাসিওয়ালা বাড়ি না হয়। বাইরে উঁকি মারবার চেষ্টা ক'রো না—শিগগির। ছুটলেন। আর একজন আমাকে হিড়হিড় ক'রে টেনে একটা বাড়িতে ঢুকিয়ে দিলে। সেটা বাইরের ঘর, আরও

কজন ছিল, সব কাঁপছে আর ত্রাহি ত্রাহি দুর্গানাম। কথা কইলেই ধমক দেয়। তিন মিনিটেই আকাশ ফুঁড়ে উল্কা! চন্দ্র সূর্য্য যেন চারদিকে আলো ক'রে নামছে, আবার তার আওয়াজ কি! বজ্রপাত মেঘগর্জ্জন, তার কাছে বোবা মেরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শহরময় হৈ-চৈ—পরেই হাহাকার, গেল গেল রব। পরে শুনেছি, উনিই সেই প্রথম নম্বরের তিনি, নাম "বোম্"।

শিব। (উত্তেজনার সহিত) কিছু কাজ হয়েছে?

নারদ। কিছু হয়ে থাকবে বইকি, বস্তুটি কাঁচাখেগো কিনা। তবে ঠিক খবরটা কে রাখে? যাদের কেউ গেছে, তারা রাখে বটে।

শিব। যে নাম শোনালে সে অকেজো হতেই পারে না, যমের সঙ্গে 'বমে'র অমন সুমিল যখন রয়েছে, কাজ করেছে বইকি। ধর্ম্মরাজের লিস্টখানা তলব করলেই পাব।

নারদ। শুনলুম, তারা যা ছেড়েছিল, তা নাকি কিছুই নয়, খেলাঘরের পটকা, লোককে একটু ভয় দেখানো। এখনও আসল মাল ছাড়ে নি।

শিব। (উৎফুল্ল হয়ে) শনৈঃ পন্থাঃ।

নারদ। আমার ঐতেই কাজ হয়ে গেছে প্রভু। এখন মেয়ে-মদ্দ, এণ্ডা-বাচ্চা, বালক-বৃদ্ধ সবার মুখে দিনরাত বম বেরুচ্ছে। বম ছাড়া কথা নেই। মোটর মেরে বাইরে বেড়ানো থেমে গেছে।

শিব। ওটা যে তেলের কাজ, তেল ফুরিয়েছে বুঝি—(অদূরে উমাকে ও পশ্চাতে নন্দীকে কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে আসতে দেখে) নারদ, কথা বদলাও, কথা বদলাও। তোমার ছিঁচকাঁদুনি মা-টি আসছেন। ওল্ড ফিমেল, বুঝেছ তো, হোল্ড ইওর টাং।

উমা এসে পড়লেন

(নন্দীর প্রতি) আর ফুঁ দিতে হবে না রাস্কেল। ওতে কিছু আছে কি? টেনে এনেছ তো?

কলকে নিয়ে একটানে চতুর্দ্দিক ধূম্রাকার

উমা। (চোখে মুখে আঁচল ঢেকে) ধোঁয়ে যে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

শিব। হবে না? আগুনে জল পড়ল যে! কলকে নয়, বেটা ফায়ার ব্রিগেড এনেছে। হ্যাঁ, নারদ, যা বলছিলে এইবার বল, উনিও

এসেছেন, শুনুন। চোখে তো দেখতে পাব না, শুনেই সুখ। ওই তোমার দ্বারিক মোদকের দরবেশের কথাটা হে।

নারদ। বললুম তো।

শিব। ছাই শুনেছি। তখন কি আমার শোনবার অবস্থা ছিল ?

উমা। বল না নারদ, আমিও শুনি।

নারদ। মা, সে আর কি বলব, দ্বারিক মোদক এমন তোফা মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার খুলেছে, আর এমন সব জিনিস বানাচ্ছে, আগেকার পক্কান্নো, মোণ্ডা, মেঠাই, রসগোল্লা সব গোল্লায় গেছে, এখন তারা কেউ 'পরিতোষ', কেউ 'পরিমল', কেউ 'প্যারিজাত'। পার্শেলের প্যাকেট, সুটকেসের বাছারা ব'য়ে নিয়ে যায়।

উমা। কোথায় ?

নারদ। যেখানে বাঙালী আছে মা—পেশোয়ার, ফ্রন্টিয়ার সর্ব্বত্র। তৃতীয় নয়নটি তো খুলবেন না, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ষষ্ঠীবাটার ঘটা যদি দেখতেন! একেবারে অমৃত বণ্টন হচ্ছে! চাটগাঁ পর্য্যন্ত তার সুগন্ধ পৌঁছেছে। রাজবাড়ি, জমিদারবাড়ি নিত্য বরাদ্দ। লোকের ভিড় কি! মোদকের দেরাজে প্রশংসার পদক আর ধরছে না, দেশের অবস্থা ভালই মা। পুরুষেও নাচে, বলে শিব-নৃত্য। কই বাবাকে তো কোন দিন নাচতে দেখি নি।

শিব। দেখবে দেখবে, দেখাব।

উমা। তোমার বাবার তরে দুটো মিষ্টান্ন আনতে হয়।

নারদ। লজ্জা দেবেন না মা, মনে যে হয় নি তা নয়। বাবুদের গান শুনিয়ে কিছু টিকিটও যোগাড় করেছিলুম।

উমা। টিকিট!

নারদ। সকলের পকেটেই ওই, তাইতেই পয়সার কাজ হয়, অথচ ছোঁয়াটে রোগ চালান দেয় না। এমন সময় দেখি, আমারই মত পাকাদাড়ি একটি প্রবীণ রাস্তায় দাঁড়িয়েই একটা 'সরোজকলি'তে কামড় দিয়েছে। একেবারে বেহাল, রসে দাড়ি ভেসে বসুধারা শুরু। মৌচাক যেন খোঁচা খেয়েছে। লোকটি অপ্রস্তুত, ফেলে দিয়ে বাঁচে। তাই সাহস হ'ল না মা, পাহাড়ী পথে—

শিব। হয়েছে, থাম, আর বর্ণনা বাড়িও না। (উমার প্রতি) ও আর শুনবে কি, ওইসব কথায় এতক্ষণ আমার মাথা খাচ্ছিল, ভাগ্যিস এসে পড়লে।

উমা। (নারদের প্রতি) বেশ করেছ যে, আন নি বাবা, পথে বিপন্ন হতে। গণশাকে যেন শুনিও না, একে পেটুক, তায় পেটের অসুখ লেগেই আছে! ভালই করেছ। সেখানে ছেলেরা খাচ্ছে, তাতেই আমার তৃপ্তি, তারা ভাল থাকুক। (শিবের প্রতি সহাস্যে) শুনেছ? ভারি মজা হয়েছে! আশ্চয্যি কাণ্ড! তোমার তরে নন্দীকে বলতে গিয়ে দেখি, একমনে ইংরিজী পড়ছে। হতভাগা তোমার সঙ্কল্পটা শুনলে কার কাছে?

শিব। সেটা আমি জানি, যার মা আছে তার শোনবার অভাব থাকে না। কিসেরই বা থাকে? (নন্দীর প্রতি) কি শিখেছিস, একটু শোনা দিকি, এদিকে আয়।

নন্দী। Rifle বলে বন্দুককে, Cannon হন কামান
বড় বড কেল্লার গর্ব্ব এক গোলাতেই থামান।
Shell হন তোপের গোলা—গুলির ঠাকুরদাদা,
পাথরের প্রাকার ভেঙে বানায় বালির গাদা।
Tommy gun তোপের বাচ্চা—কাজ সারেন দ্রুত,
দ্বাপরের অভিমন্যু—অর্জ্জুনের সুত।
মাসতুতো ভাই Machinegun—হন হাজারীলাল,
ছারপোকার বংশ ছাড়েন—কামড়েতে কাল।
চাকায় চ'ড়ে সর্দ্দার আসেন—নাম তাঁর Tank
অস্ত্রের গুদাম তিনি—সবার বড় Rank,
Torpedo ও রাখেন পেটে—তাঁর জলে স্থলে গতি
দুর্গ কি জাহাজের যম—ধ্বংসই নিয়তি।
Gunboat, Uboat কিংবা Cruiser,
Destroyer হউন না কেন স্পর্শেই প্রাচার।
Battleship সে সামনে পেলে Cattle সম মারে,
ডুব মেরে Submarineগুলো সহজে কাজ সারে।

নানাবিধ Gasও হাজির, নাকে ঢুকলেই জখম,
হাসায় কাঁদায় অক্কাও দেয়, আছে কত রকম।
হ্যাঁ, Fire আগুনকে কয়, Steel ইস্পাৎ,
এই দুই কর্ত্তা মিলেই বাধায় উৎপাত্।
তার চেয়ে জানা ভাল Hemp মানে গাঁজা,
বলেন তো এক ছিলিম সেজে আনি তাজা।

শিব। (উৎফুল্ল হয়ে) যা যা, শিগগির যা। চাকরির তরে আর ভাবিস নি রাস্কেল, এখন সাতপুরুষ বন্ধামুক্ত, সরকারী ভাষার গুণই ওই। বেঁচে থাক।

কলকে নিয়ে আনন্দে নন্দীর প্রস্থান

(উমার প্রতি) ছাই তো গো, বেটা দরকারী কথা সবই শিখে ফেলেছে দেখছি। এমন ওস্তাদ মাস্টার পেলে কোথায়?

উমা। তুমি তো আমার গ্র্যাজুয়েট কার্ত্তিককে দেখতে পার না।

শিব। বটে, তার এত বিদ্যে? বিলেত যাক, বিলেত যাক। আমার সোনার চাঁদ ছেলে এখানে মাটি হয় কেন?

তাজা ছিলিম হাতে নন্দীর প্রবেশ

ওকে আজ দুখানা বিস্কুট খেতে দিও। যাও, এখন সব ছুটি।

নন্দীর প্রস্থান

উমা। (যেতে যেতে নারদের প্রতি) না খেয়ে যেন যেও না বাবা।

নারদ। প্রসাদ না পেয়ে তা কি পারি মা? এখানে চাল কত ক'রে পাচ্ছ মা?

উমা। (সহাস্যে) তোমার সে খোঁজে কাজ কি?

শিব। চারদিকে ঘোরে কিনা, খুব সস্তা দেখে এসেছে, এই সুযোগে এখানে এনে ব্যবসা করতে চায়। ঢেঁকি তো সঙ্গেই আছে। আমাদের কুটবে বোধ হয়।

উমা। তোমার যেমন কথা! সস্তা শুনে স্বস্তি পেলুম, ছেলেরা পেট ভ'রে খাক। (চ'লে গেলেন)

শিব। (নারদের প্রতি) কতদিন স্নান করা হয় নি মনেই নেই। চল, একবার মানস-সরোবরটা হয়ে আসি। রাজহাঁসগুলো কেমন সুখে সাঁতার দিচ্ছে দেখে আসি, কদিন আর দেখতে পাব, কে জানে!

নারদ। কেন, স্নান করেন নি কেন ?

শিব। (সহাস্যে) একটা অষ্টবজ্র যোগ খুঁজছি, একেবারে মুক্তিস্নানের ইচ্ছা, ছোটখাট বিয়োগ-যোগ আর নয়, অনেক হয়েছে। সাপগুলোও মুখ চেয়ে থাকে, শীতে মরে, তাই পারি না। তাদের খুশি রাখতে হয়।

নারদ। আহা! দেবতার দয়াতেই চ'লে যাচ্ছে।

শিব। ওরাই তো নিশ্চিন্ত ক'রে রেখেছে, মাছিটি পর্য্যন্ত ঘেঁষতে পায় না, লাফিয়ে কামড়ায়। ধ্যানের বড় সুখ।' সুখে ডুবিয়ে রেখেছে। তেল মাখবে কি ? বোধ হয় নেই। (উভয়ের প্রস্থান)

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গণদেবতা

জনগণদেব জাগিল কি আজি—তাই এ বিশ্বে সাড়া ?
অথবা ক্ষুব্ধ অনন্ত দিল সহস্র-ফণা নাড়া !
দিকে দিকে দিকে ধরার ভিত্তি কেঁপে উঠে চারিধার—
যে ভূমিকম্পে জীর্ণ মেদিনী, মন্থিত পারাবার !
মন্দিরে আজি বন্দনা নাই—সবই দেখি ধূলিসাৎ !
কোথা বিগ্রহ ? কোন্ নিগ্রহে লুকাল জগন্নাথ ?

মৌন মাটির বুকের বেদনা, ছিল যা অন্ধকারে,
যুগে-যুগে যাহা হইয়াছে জমা পুঞ্জিত অনাচারে ;
গরুড়ের মত বাহিরিল নাকি ভেদ করি আবরণ,
স্বর্গের দ্বারে ঘোষিবারে তার শক্তি-নিমন্ত্রণ !
কম্পিত-হিয়া নারায়ণ নিজে মুক্তি লভিতে তাঁর
শান্তির লাগি চাহেন কি দিতে অমৃতের ভাণ্ডার !

বিনতা-মাতার দুঃখের দিন হ'ল নাকি অবসান ?
জয় গণদেব সিদ্ধি-বিধাতা, জয় জয় ভগবান !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস

তৃতীয় পাঠ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪

পূর্ব্বে যে সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার সহিত আর কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করিলে আশা করি আমার বক্তব্য এবং পূর্ব্বমন্তব্যের অর্থ আরও স্পষ্ট হইবে। লেখকের অনেক উক্তিই প্রায় এইরূপ পরস্পর-বিরোধী হইতে দেখা যায় ; যথা—

(১) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে "রাজনৈতিক প্রচেষ্টা" ও 'বাস্তব-জীবন, এবং নায়ক-নায়িকার "প্রেমাভিব্যক্তি" সম্বন্ধে—

আমাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা একটা ইন্দ্রজালরচিত আকাশ-সৌধের ন্যায় বাস্তব-সংস্পর্শশূন্য হইয়া পড়ে।...আমাদের প্রেমাভিব্যক্তি একটা বহু পুরাতন মন্ত্রের প্রাণহীন আবৃত্তির মত শুনায়। 'আনন্দমঠ', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রতিভা এই কেন্দ্রস্থ ও অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজকে ব্যথিত করিয়াছে, অসাধারণ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যেও একটি গূঢ় ব্যর্থতার বীজ রাখিয়া গিয়াছে।—পৃ. ৯০-৯১

কিন্তু কিছু পরেই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে, ইতিহাসের ধারা ও গার্হস্থ্য-জীবন সম্বন্ধে—

চন্দ্রশেখর বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-সমূহের মধ্যে অন্যতম। ইহাতে আমাদের পারিবারিক জীবনের সহিত বৃহত্তর রাজনৈতিক জগতের সম্মিলন সংসাধিত হইয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে আদর্শ, তাহার দিকে 'চন্দ্রশেখর' পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাস অপেক্ষা বেশি অগ্রসর হইয়াছে। আবার ইতিহাসের বৃহত্তর ধারার সহিত আমাদের ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য জীবনের সংযোগ প্রায় স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে।—পৃ. ১০১

এবং ঐ উপন্যাসে নায়িকার 'প্রেমাভিব্যক্তি'র সম্বন্ধেও গ্রন্থকার আর এক স্থানে বলিতেছেন—

যে প্রবল ঝটিকা তাহাকে (শৈবলিনীকে) তাহার শান্ত গৃহকোণ ও সুরক্ষিত সমাজ-জীবন হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে, তাহার প্রকৃত জন্ম তাহার নিজ অশান্ত হৃদয় তলে। লরেন্স ফষ্টরের সহিত তাহার সম্পর্ক অত্যাচারিত-অত্যাচারীর ন্যায় নহে। বিদ্যুৎ-শিখা যেমন মেঘের আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ শৈবলিনীর অন্তর্গূঢ়

জ্বালাময়ী প্রবৃত্তি কষ্টয়ের রূপমোহ ও দুঃসাহসিকতাকে অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিয়াছে ও দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।—পৃ. ১০৩

কিংবা—

শৈবলিনীভ্রমে ইংরেজ তাহাকে বন্দিনী করিয়া লইয়া গেল, এবং নবাবের আগতপ্রায় ক্ষমার সীমার বাহিরে আসন্ন উদ্ধারের স্পর্শ হইতে দূরে ফেলিয়া দিল।...এই অসাধারণ অদৃষ্ট-মন্থনে একদিকে যেমন বিপদে হলাহল ফেনাইয়া উঠিয়াছে, তেমনি আর একদিকে অন্তরের আলোড়নে ভাবের অমৃত বিষরক্ষ ছাপাইয়া বাহিরে আসিয়াছে। বাহিরের বিপদ সংঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরেও একটা গভীর আলোড়ন চলিয়াছে, এবং হৃদয়ের গভীর বৃত্তি ও ভাবসমূহ আশ্চর্য সমৃদ্ধির সহিত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।—পৃ. ১০৭

(২) কপালকুণ্ডলা-চরিত্র এবং 'ইতিহাস'—

'কপালকুণ্ডলা'র অনুপম, সমাজবন্ধনমুক্ত চরিত্রমাধুর্য্যের সঙ্গে চক্রান্তকুটিল রাজনৈতিক ইতিহাসের সংযোগ বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এখানেও ইতিহাসের উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর আছে।—পৃ. ৫০

কিন্তু 'চরিত্রে'র সহিত না থাকিলেও—'নিয়তি'র সহিত ইতিহাসের উপযোগিতা আছে—

এমন কি সুদূর মোগল রাজধানীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও অন্তঃপুরিকাদের ঈর্ষ্যাদ্বন্দ্ব পর্য্যন্ত বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার নিয়তির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, যে অগ্নিতে সে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে তাহার ইন্ধন যোগাইয়াছে।—পৃ. ৯৫

(৩) ইতিহাসের রণঢক্কায় জীবনের ক্ষীণ করুণ সুর—

কিন্তু মোটের উপর এখানে ইতিহাসেরই একাধিপত্য, রণঢক্কার নিনাদে ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের ক্ষীণ, করুণ, রসবিচিত্র সুরটি ঢাকিয়া গিয়াছে। ইতিহাস-মহাবৃক্ষের ছায়ায় আমাদের সাংসারিক ফুল-গাছটি বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই।—পৃ. ৬৩

তথাপি, 'এমন একটি বর্ণবহুল সৌন্দর্য্য'—

কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস বিশ্লেষণের অভাব অন্যদিক দিয়া পূরণ করে। ঘটনা-বৈচিত্র্যে, একটা সমগ্র যুগের ব্যাপক বর্ণনায়, উচ্চভাব ও আদর্শের বিকাশে ও বীরত্ব-কাহিনীর প্রাচুর্য্যে ইহা মানুষকে এমন একটি তৃপ্তি দেয়, এমন একটি বর্ণবহুল সৌন্দর্য্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে, যাহা সাহিত্যের অন্য কোনও শাখা আমাদিগকে দিতে পারে না। —পৃ. ৬৭. [তাহা হইলে পূর্ব্ব মন্তব্যের প্রয়োজন কি ?]

(৪) ইতিহাসের ক্ষেত্রে মানব-প্রকৃতির স্ফুরণে কোন বাধা নাই—

অবশ্য ইতিহাসের ক্ষেত্রেও মানবপ্রকৃতির স্ফুরণ ও মানব-হৃদয়ের বিশ্লেষণের যথেষ্ট অবসর আছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎক্ষেপেও যেমন, আমাদের নিভৃত-গৃহকোণস্থিত

স্তিমিত দীপশিখাতেও তেমনি, একই উপাদান, একই রূপ স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান আছে। সাধারণ জীবনের মুক্ত প্রান্তর ও সমতল ভূমি দিয়া যে নদী ধীর শান্ত প্রবাহে বহিয়া যায়, ইতিহাসের উপলসঙ্কুল, বাধাবিঘ্নভূয়িষ্ঠ ক্ষেত্রে তাহাই ফেনিল ও দুর্নিবার হইয়া উঠে। ইতিহাসের বিপুল ঝঞ্ঝাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া আমাদের এই ক্ষীণ জীবন-স্পন্দন উগ্র ও প্রচণ্ড হইয়া ওঠে, একটা হিংস্র, তীব্র ভীষণতা লাভ করে, এবং নানা বিচিত্র ও বিস্ময়কর বিকাশের মধ্যে ফুটিয়া বাহির হয়।—পৃ. ৬২

ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘটনাবাহুল্যের মধ্যে মানুষ এক পাশে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া আছে; আধুনিক উপন্যাসে ঘটনার ভিড় যতদূর সম্ভব কমাইয়া মানুষকে প্রধান আসন দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার মানসিক বিক্ষোভের চিত্রটি অতি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাহ্য ঘটনা অনেকটা দুর্দ্দান্ত দস্যুর মত আসিয়া পড়িয়া মানুষের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিতেছে এবং তাহাকে অধিক চিন্তার অবসর না দিয়া তাহার মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ একটা জবাব আদায় করিয়া লইতেছে।—পৃ. ৬৬

(৫) অতএব এই দুই জাতীয় উপন্যাসে সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্র-রচনা ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের উপযোগিতা সমান নহে; গ্রন্থকার কিন্তু শ্রেণী-বিভাগ, জাতি-বিভাগ সত্ত্বেও সমালোচনা-কালে এ বিষয়ে কোন প্রভেদ কার্য্যত মানেন না, দেখা যায়। পরের উদ্ধৃত উক্তিটিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে—

শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্তের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, সাধারণ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক দিয়া তাহার মূল্য কত বলা সুকঠিন।...কিন্তু সমস্ত দৃশ্যটির মধ্যে যে অপরূপ কল্পনাসমৃদ্ধির ও আশ্চর্য্য কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টির (poetic vision) পরিচয় পাই, তাহা গদ্য সাহিত্যে তুলনারহিত। তাহা মিণ্টন, দান্তের নরক-বর্ণনার সহিত প্রতিযোগিতার স্পর্দ্ধা করিতে পারে। বঙ্কিম এখানে কবির বিশেষ অধিকার দাবী করিয়া, ঔপন্যাসিকের যে কর্ত্তব্য,—মন্থর পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য কারণের শৃঙ্খল-রচনা—তাহা হইতে নিজকে অব্যাহতি দিয়াছেন; এবং প্রতিভার বিদ্যুৎশিখার সম্মুখে সমালোচকের চক্ষুও তাহার বিচার বুদ্ধি পরিচালনা করিতে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতির ত্রুটি ধরিতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।—পৃ. ১০৪

—অর্থাৎ, "আশ্চর্য্য কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টি" সত্ত্বেও "মন্থর পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্ববিশ্লেষণ" নাই, কারণ 'অলৌকিক শক্তি'র অবতারণা রহিয়াছে—

উপন্যাস মধ্যে রমানন্দ স্বামীর ন্যায় অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষের অবতারণা এবং শৈবলিনীর সম্বন্ধে তাঁহার সদা-সতর্ক দৃষ্টি ও অভ্রান্ত ব্যবস্থা আমাদের বিশ্বাসকে বিদ্রোহোন্মুখ করিয়া তোলে।—পৃ. ১০৫

'রাজসিংহে' এই চরিত্র-বিশ্লেষণ অন্য কারণে ভাসিয়া গিয়াছে—

রাজসিংহে এইরূপ দুই চারিটি দৃশ্য ছাড়া উপন্যাসোচিত গুণ খুব বেশি নাই। চরিত্র-বিশ্লেষণ যদি উপন্যাসের প্রাণ হয়, তবে রাজসিংহে তাহার অবসর কম। ইতিহাসের প্রবল স্রোতে চরিত্রের বিশেষত্ব ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।—পৃ. ১৫১-৫২

এইরূপ ব্যাসকূট এই গ্রন্থে অনেক আছে; অধিক উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। এইবার আমি গ্রন্থকার কর্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রসবিচার স্থানে স্থানে কিরূপ মৌলিকতার দাবি করিতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

(১) আখ্যায়িকার নবাব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মীরকাশিম না হইয়া সম্পূর্ণ কল্পনারাজ্যের জীব হইলেও উপন্যাসের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না। মীরকাশিমের চরিত্র-চিত্রণ ঠিক ইতিহাসানুযায়ী হইয়াছে কি না, এইটুকুই ইহার ঐতিহাসিক সমস্যা, নতুবা ইতিহাসের সহিত দৈনন্দিন জীবনের অন্তরঙ্গ যোগ-সাধন, যাহা ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি মূল লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা 'চন্দ্রশেখরে'র বঙ্কিমের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসেও মিলে না।—পৃ. ৪৫

(২) 'মাধবীকঙ্কণে'র এই দৃশ্যগুলি স্বভাবতঃই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তুলনার কথা স্মরণ করিয়া দেয়। নরেন্দ্র-হেমলতার প্রেমের সহিত চন্দ্রশেখরের প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমের একটা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এই উভয় প্রেমচিত্রের তুলনামূলক সমালোচনা করিলে রমেশচন্দ্রকেই শ্রেষ্ঠ আসন না দিয়া পারা যায় না।—পৃ. ৬০

(৩) রমেশচন্দ্রের শক্তির প্রসার যে বঙ্কিম অপেক্ষা অনেক কম, এবং কল্পনার ইন্দ্রজাল রচনা যে তাঁহার সত্যনিষ্ঠ প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এই সরল সত্যনিষ্ঠাই আমাদের পরিণত বিচারবুদ্ধির নিকট তাঁহার নরেন্দ্র-হেমলতার প্রেমচিত্রকে বঙ্কিমের প্রতাপ-শৈবলিনীর চিত্র অপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ ও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে।...রমেশচন্দ্রের এই বাস্তব প্রেমের সহজ অকৃত্রিম চিত্র বঙ্কিমের সমস্ত উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা অপেক্ষা আমাদের হৃদয়কে অধিক গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। ঐন্দ্রজালিক যে অল্পসময়ের মধ্যে বীজ হইতে বৃক্ষ ও বৃক্ষ হইতে ফল উৎপাদন করে, তাহা নিশ্চয়ই সমধিক বিস্ময়কর; কিন্তু মোটের উপর গাছের ফলই বেশী রসযুক্ত ও মিষ্ট। এক্ষেত্রে প্রকৃত ও গভীর রসের দিক দিয়া রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।—পৃ. ৬১-৬২

(৪) অবশ্য (চন্দ্রশেখরে) ভাবা ও উপযোগিতার দিক দিয়া সমস্ত দৃশ্যই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। আর ভাষার দিক দিয়াও, বিশেষতঃ কথোপকথনের সময়, একটা আলঙ্কারিক শব্দাড়ম্বর সময় সময় বাস্তবতার স্বরটিকে ঢাকিয়া ফেলে, পুষ্পাভরণপ্রাচুর্য্যে মৃত্তিকার রস ও গন্ধ অন্তরালে

পড়িয়া যায়।...মোটের উপর কতকগুলি দৃশ্য কতকটা ভাষা-গত অতিরঞ্জনের জন্য, আদর্শ সৌন্দর্য্য হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ভ্রষ্ট হইয়াছে।—পৃ. ১০৮

(৫) নগেন্দ্রের চরিত্রমধ্যে দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত না থাকিলে এই দয়াপ্রকাশের ফল এত বিষময় হইত না। সুতরাং উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিণতিকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সন্দেহাতীত করিতে হইলে লেখককে নগেন্দ্রের এই আংশিক দুর্ব্বলতার উপরই জোর দিতে হইবে, তাঁহার পদস্খলনের কেবল ঘটনামূলক নহে, মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দিতে হইবে। বঙ্কিম প্রথমতঃ কেবল ঘটনামূলক ব্যাখ্যা দিয়াছেন; অর্থাৎ প্রেম-প্রকাশের পূর্ব্বলক্ষণগুলিই বিবৃত করিয়াছেন; সেগুলি কেন ঘটিয়াছিল তাহা বলেন নাই, বা নগেন্দ্রের চরিত্রগত কোন বিশেষ দুর্ব্বলতার সহিত সম্পর্কান্বিত করেন নাই।—পৃ. ১৭২

[বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনাতত্ত্বই বুঝিয়াছিলেন, মনস্তত্ত্ব বুঝিতেন না; অর্থাৎ স্রষ্টা-কবির দৃষ্টিই তাঁহার ছিল, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী বুদ্ধি ছিল না—এ অপরাধ তো সামান্য নহে!]

(৬) নগেন্দ্রের আদর্শ চরিত্রই তাঁহার পদস্খলনের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের মনকে অবিশ্বাসী করিয়া তোলে।—পৃ. ১৭৪

এই শেষের মন্তব্যটির পরে আর কিছু উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইবে না; ওই একটিতেই গ্রন্থকার যে বিচারবুদ্ধি ও রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমি শুধুই লজ্জা বোধ করি নাই—মনে হইয়াছে, গ্রন্থখানির সম্বন্ধে এই যে আলোচনা আমি করিতেছি তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র, কিন্তু উপায় নাই—কর্ম্মফল। এই একটিমাত্র উক্তি হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনায় মূলে একটা দিকভ্রান্তি ঘটিয়াছে। সেই যে 'উপন্যাস' আর 'বাস্তব' তিনি গ্রন্থের সূচনা হইতে ধরিয়া রাখিয়াছেন—কি ঐতিহাসিক, কি রোমান্স, কি পারিবারিক, সর্ব্ববিধ উপন্যাসে তাহারই প্রতিষ্ঠা না করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের —'রাজসিংহ' 'চন্দ্রশেখরে'র মূলেও যে রসকল্পনা রহিয়াছে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রজনী' ও 'বিষবৃক্ষে'র মূলেও তাহাই আছে—এই অতি সহজ তত্ত্বটি তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—পারিলে তিনি 'বাস্তব' ও 'রোমান্স', 'ঐতিহাসিক' ও 'পারিবারিক', চরিত্রের ঘটনাতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব —সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্বের সমন্বয় করিতে পারিতেন, এবং নগেন্দ্র-গোবিন্দলাল যে সীতারাম-মবারক-প্রতাপ হইতে মূলে ভিন্ন নয়, তাহাদের সকলেরই

চরিত্রে নায়কোচিত গুণ কোন না কোনরূপে বিদ্যমান থাকা যে অতিশয় প্রয়োজন, তাহা যেমন বুঝিতে পারিতেন, তেমনই মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা যে বঙ্কিমচন্দ্রের নাটকাত্মক গদ্য ট্র্যাজেডির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন, তাহাও বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না। তিনি সম্ভাব্যতা ও বিশ্বাস্যতার সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি নানা যুক্তিতর্কের সাহায্যে দৃঢ় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন—সেরূপ আপত্তি শেক্সপীয়ারের নাটকীয় উপাখ্যানের বহু স্থলে উত্থাপন করা যায়। তিনি আপত্তি করিবেন—এ যে উপন্যাস, সে যে নাটক! এ আপত্তির জবাব এখানে দিবার অবকাশ নাই—এখানে কেবল ইহাই বলিয়া রাখিতে চাই যে, বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাস উপন্যাসই বটে, সাহিত্যিক পরিভাষায় তাহাকে সেই নামই দিতে হইবে; কিন্তু তাহার গোত্র অতিশয় স্বতন্ত্র, সেই গোত্র স্থির করিতে হইলে, ব্যাকরণ বা অলঙ্কারশাস্ত্রে কুলাইবে না—একেবারে সাহিত্যের সাক্ষাৎ রসস্বরূপের ধারণা করিতে হইবে। এ প্রসঙ্গে সর্ব্বশেষে আমি এই গ্রন্থ হইতে আরও দুই-চারিটি স্থান উদ্ধৃত করিব, তাহাতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, গ্রন্থকার জানেন সবই, বইখানির মধ্যে প্রজ্ঞাবাদের অভাব নাই—তাই, আমি লিখিয়াছিলাম—"অশোচ্যানন্ব-শোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"।

(১) তাঁহার সব কয়টি উপন্যাসের মধ্যেই একটা সতেজ ও সমৃদ্ধ ভাব খেলিয়া যাইতেছে, জীবনের গভীর রস ও বিকাশগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং জীবনের মর্ম্মস্থলে যে নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহার উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। অবশ্য আধুনিক বাস্তব-প্রবণতার জন্য উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের রুচি ও আদর্শের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে; উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা যেরূপ নিখুঁত বাস্তবতার দাবী করি, রোমান্সের আকাশ-বাতাসে পরিবর্দ্ধিত বঙ্কিম ততখানি দাবী পূরণ করেন না। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে একটা সাধারণ সত্য ধারণা দেওয়া যদি ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব হয়, এবং বাস্তবতা যদি সেই সত্যলাভের অন্যতম উপায়মাত্র হয়, তাহা হইলে বাস্তবাতিশয্যের অভাব বঙ্কিমের গুরুতর দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবে না; কেন না, তাঁহার সমস্ত উপন্যাসের উপরই একটি বৃহত্তর সত্যের ছাপ বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।—পৃ. ৭৯

(২) বঙ্কিমের ঐতিহাসিক বিবেক (historical conscience) বা সত্যনিষ্ঠা যে ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকদের অপেক্ষা কম, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই; তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রামাণিক সত্যের অংশ যে পরিমাণে কম কল্পনার প্রসার ঠিক সেই পরিমাণেই বেশী হইতে বাধ্য, নচেৎ একটি পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকা গড়িয়া উঠিতে পারে

না। বঙ্কিম তাঁহার কাল্পনিক চিত্রের দ্বারা ইতিহাসের শূন্যরন্ধ্র পূরণ করিয়া যদি অতি সাহসের পরিচয় দিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাদের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে অপরিহার্য্য।—পৃ. ১৪৪

(৩) কিন্তু আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিভিন্ন যুগের সামাজিক অবস্থা-সম্বন্ধে আমরা এতই অজ্ঞ যে, আমাদের নিকট এক যুগ হইতে অপরের ভেদরেখা অতি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট। সুদূর হিন্দু অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এমন কি মুসলমান অধিকারের পরেও কোন শতাব্দীরই বিশেষ-রূপ-সম্বন্ধে, সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে; আমাদের বেশ স্পষ্ট ধারণা নাই।—পৃ. ৪৬

এবং—

স্কট বা থ্যাকারের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে এরূপ বিচ্ছেদ সাধন সম্ভবপর নহে; [অর্থাৎ,—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পারিবারিক জীবনে ইতিহাস প্রবেশ করিতে পারে নাই যেমন বিলাতী ঐতিহাসিক উপন্যাসে পারিয়াছে।] এই প্রভেদের কারণ বোধ হয় এই যে, আমাদের দেশে ইতিহাস-ধারার গতি ও প্রবাহ য়ুরোপ হইতে বিভিন্ন।...সাধারণ লোকে অতি গুরুতর রাজনৈতিক বিপ্লবকেও নিজ প্রাণের মধ্যে কখনও গ্রহণ করে নাই।—পৃ. ৪৯

(৪) আমরা উপন্যাসের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সমালোচনার আদর্শের খাতিরে যতই বিধি-নিষেধের গণ্ডি রচনা করি না কেন, উপন্যাস কিন্তু এই সমস্ত সমালোচক-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাপত্র অবজ্ঞার সহিত লঙ্ঘন করিয়া নিজ বিস্ময়কর, অফুরন্ত রূপ-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতেছে।—পৃ. ৫১৩

আমাদের সাহিত্যে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ঠিক শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা-অনুযায়ী রচিত হওয়া যে সত্যই দুরূহ—তাহা গ্রন্থকার মহাশয় উত্তমরূপেই জানেন, এবং ইহাও নিশ্চয় জানেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তাহা জানিতেন—তাই তিনি তাঁহার উপন্যাসগুলির 'ঐতিহাসিকতা' দাবি করেন নাই; তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র যে একজন অতি উচ্চ স্তরের সাহিত্য-স্রষ্টা—তিনি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা সত্যকার সৃষ্টি, ইহাও অবিসংবাদিত; অতএব কতকগুলি সংজ্ঞার মাপকাঠি তৈয়ারি করিয়া তাহা দ্বারা তাঁহার উপন্যাসগুলিকে এইরূপ মাপিয়া তাঁহাদের অন্তর্গত নানা উপাদানের বিশ্লেষণ, এবং বাস্তব, ঐতিহাসিক, রোমান্স প্রভৃতি স্তরভাগ করিয়া এই যে স্রেফ গবেষণার পাণ্ডিত্য—ইহার কি প্রয়োজন আছে? ভাবের মধ্যে, প্রতি পদে নানা তর্কজাল এবং বহু স্থলে স্ববিরোধী উক্তির দ্বারা সমস্ত আলোচনাটিকে মানস-ব্যায়ামের একটা প্রকাণ্ড প্রয়াস করিয়া তোলা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির

খণ্ড খণ্ড বিশ্লেষণ অনেক স্থলেই নৈপুণ্যের পরিচায়ক হইলেও, তাহাদের প্রত্যেকের মূলে যে একটা সুবলয়িত, সুসমন্বিত, সৃজনী-কল্পনা রহিয়াছে—যে পূর্ণ-দৃষ্টির মণ্ডলবর্ত্তী হইয়া তাহাদের সমস্ত খণ্ডতা ও উপাদানগত বিরুদ্ধতা একটা সুডৌল সুসম্পূর্ণ আকার লাভ করিয়াছে —তাহার সন্ধান গ্রন্থকার দিতে পারেন নাই। বঙ্কিম-সাহিত্যের সমালোচনায় যে উৎকৃষ্ট রস-দৃষ্টি-প্রয়োগের সুযোগ ছিল—যাহার মত সুযোগ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুব অল্পই আছে—সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের গুরুতর অভাব পূরণ করিতে পারেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ—ঐ সংজ্ঞাগুলির প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত নিষ্ঠা এবং বিলাতী ইতিহাসের অন্ধ পদাঙ্ক-অনুসরণ। এ প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করিলাম।

অতি-আধুনিক বাংলা উপন্যাসের প্রতি গ্রন্থকারের মনোভাব সম্বন্ধে আমি যে মন্তব্য করিয়াছিলাম তাহারই কৈফিয়ৎ দিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, আমি এ প্রসঙ্গে কেবল কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিব, এবং তৎপূর্ব্বে দুই-চারিটি কথা মাত্র বলিব। গ্রন্থকার তাঁহার এই গ্রন্থে, উপন্যাস যে শ্রেণীর হউক, তাহার বিচারে একটা আদর্শই সর্ব্বত্র উদ্যত রাখিয়াছেন—সে আদর্শ বাস্তবতার; ইহারই কারণে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির বিচারেও সমালোচকের কঠোর দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। বেশ মনে হয়, তিনি যেন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির রসসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াও হইতে পারিতেছেন না. কোথায় যেন বাধিতেছে। কিন্তু কয়েকজন আধুনিক লেখকের রচনার সমালোচনা ব্যপদেশে তিনি প্রশংসার আবেগে প্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন—বাস্তব-অবাস্তবের ভেদ ভুলিয়াছেন; অতিশয় কৃত্রিম, মানসব্যাধিগ্রস্ত কষ্ট-কল্পনার অবাস্তব ভাব ও অনুভূতি, এবং অতিশয় বিকৃত বিকট ভাষায় তাহাদের প্রকাশ-চেষ্টাকে তিনি একটা অপরিমিত গৌরব দান করিয়াছেন; স্বীকার করিয়াছেন বটে যে, এই ধরনের উপন্যাস মূল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন ধারার অভিমুখী, তথাপি তাঁহার আলোচনা পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি যেন ইহাদের মধ্যেই তাঁহার নিজের রসপিপাসার

চরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলি হইতে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।—

(১) ইঁহাদের উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইঁহারা খুব ব্যাপক ও গভীরভাবে গীতি-কাব্য-ধর্ম্মী। অবশ্য উপন্যাসের মধ্যে গীতিকাব্যের উন্মাদনা ও ঝঙ্কার মোটেই নূতন উপস্থিতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। বঙ্কিমের অনেক উপন্যাসই গীতি-কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা কেবল যে কবিতার অফুরন্ত নির্ঝরে উৎসারিত হইয়াছে তাহা নহে, গদ্যের কারুকার্য্যখচিত পাত্রকেও ভরিয়া তুলিয়াছে। —পৃ. ৫৭৭ [অর্থাৎ ইঁহারা বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনীয় !]

(২) জীবনের বিশেষ মুহূর্ত্তগুলিকে দেখিবার ভঙ্গী, জীবন-সমালোচনার প্রণালী ইঁহাদের সম্পূর্ণ কাব্যানুপ্রেরিত। জীবনের উপরিভাগের দ্বন্দ্ব-সংঘাত চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের তীক্ষ্ণ কোণ ও অতর্কিত পরিবর্ত্তন ছাড়াইয়া যে নিঃসঙ্গ গভীর শব্দহীন তলদেশে আত্মার নৈর্ব্যক্তিক রহস্য অবগুণ্ঠিত থাকে সেখানে অবতরণ করিয়া সেই আত্মবিস্মৃত আত্মার অবগুণ্ঠন মোচনে প্রয়াসী ইঁহারা হইয়াছেন। সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারা শতখণ্ডিত, ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছদ্মবেশাবৃত আত্মার নগ্ন, জ্যোতির্ম্ময় নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ ইঁহারা ভাষার স্বচ্ছ দর্পণে ধরিতে চাহেন। কোন বিশেষ মানসিক অবস্থা বা কোন বিশেষ ঋতু বা সময়ের নিগূঢ় সাঙ্কেতিকতা ফুটাইয়া তোলাতে ইঁহাদের প্রবণতা ও কৃতিত্ব দেখা যায়। ইঁহাদের প্রকৃতি বর্ণনা এমন কি বেশভূষা বা গৃহসজ্জা বর্ণনার চারিধারে একটা সাঙ্কেতিকতার অর্দ্ধভাস্বর জ্যোতির্ম্ময়গুলের পরিবেষ্টনী অনুভব করা যায়। ইঁহাদের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাস হইতেই এই বিশেষত্বের উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।—পৃ. ৫৭৮

(৩) সৌম্য ও বনানীর মধ্যে যে নিবিড় রহস্যময় সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, নগ্ন মানবাত্মার যে ব্যাকুল আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছে মনস্তত্ত্বের মাপকাঠিতে তাহার মূল্য নির্দ্দেশ চলে না, ইহা গীতি-কাব্যেরই বিষয়। সৌম্যের সহিত বনানীর সহজ আলাপ ও বনানীর গৃহস্থ-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিতকে অতিক্রম করিয়া উদ্বেলিত মানবাত্মার সমুদ্র-কল্লোল বা গুরুতার অতলস্পর্শ গহনতা তরঙ্গিত হইয়াছে।…মানবের চিত্ততলে অর্দ্ধচেতন আত্মার কারাগৃহে যে অন্ধকার গহন বন আছে, সে যেন তাহারই প্রতীক ও প্রতিচ্ছবি, সৌম্যের চরিত্রে শিপ্রা ও বনানীর সাহচর্য্যে দুইদিক বিকশিত হইয়াছে, তাহার ব্যক্তিত্ব যেন স্বপ্নবিধুর ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আধ্যাত্মিক অনুভূতির তটহীন তরলতায় বিগলিত হইয়াছে।—পৃ. ৫৮৪-৫৮৫

'ভাষার স্বচ্ছ দর্পণ'—এই উক্তিটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাও সর্ব্বত্র গ্রন্থকার মহাশয়ের মনঃপূত হয় নাই ; তাহার প্রমাণ—

অবশ্য ভাষা ও উপযোগিতার দিক দিয়া সমস্ত দৃশ্যই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। আর ভাষার দিক দিয়াও, বিশেষতঃ

কথোপকথনের সময়, একটা আলঙ্কারিক শব্দাড়ম্বর সময় সময় বাস্তবতার স্বরটিকে ঢাকিয়া ফেলে, পুষ্পাভরণ প্রাচুর্যে মৃত্তিকার রস ও গন্ধ অন্তরালে পড়িয়া যায়।—পৃ. ১০৮

কিন্তু রমেশচন্দ্রের ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

তাঁহার কথোপকথনের মধ্য দিয়াও একটা বাহুল্যবর্জ্জিত, পুরুষোচিত ছন্দ বহিয়া গিয়াছে। এই সহজ, সরল তেজস্বী ভাষার মধ্যে দৃঢ়পেশীবদ্ধ কমঠ শরীরের ন্যায় একটা সতেজ সৌন্দর্য্য। আমাদের বঙ্গ সাহিত্যে এই বীরোচিত, ওজস্বী অতি-নাটকীয়ত্ব-বর্জ্জিত ভাষার প্রথম প্রবর্ত্তনের গৌরব রমেশচন্দ্রের প্রাপ্য।—পৃ. ৭০

এই নবীন লেখকদিগের যে ভাষা গ্রন্থকারের প্রাণমন কাড়িয়া লইয়াছে তাহার নমুনা—গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উদ্ধৃত তাঁহারই পরম লোভনীয় বচনগুলিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি গ্রন্থকার নিজেও তাহার সহিত পাল্লা দিয়াছেন, যথা—

(১) অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্ণনার মধ্যে অন্ধকার ও স্তব্ধতার পটভূমিতে মানবাত্মার নগ্ন নিঃসহায়তার অনুভূতি—"তার থেকে জেগে উঠছে অন্তরের চিরন্তন নিঃসঙ্গতা, চিরন্তন বিরহ, যখন আমরা (?) উন্মোচিত, উদঘাটিত, উন্মথিত, চেতনার তীরে পড়ে—নগ্ন, আক্রমণীয়, নিঃসহায়"।—পৃ ৫৭৮

(২) "তার রশ্মি-বিদ্ধ প্রখর উন্মোচন, তার উন্মেধের সৌগন্ধ, তার জীবন্ময় অরেণ্য বৈকল্য"।—পৃ ৫৭৯

(৩) "মৃত্যু দিয়ে মাখানো, প্রতীক্ষায় নিমজ্জিত—সমস্ত বা ডর উপর বিশাল একটা ছায়া যেন পাখা মেলে আছে"।—পৃ ৫৮০

(৪) "এখন সমর্পণের সমতলতা থেকে অভিজ্ঞতার চড়ায় উঠে এসেছে। তার সেই প্রথম ক্ষণিক চিরন্তনতা থেকে নেমে এসেছে প্রত্যহের প্রয়োজনে'।—পৃ ৫৮৫

(৫) "রেখাগুলি এমন ক্ষুরধার, স্পষ্ট রঙ্গে এসেছে বিহ্বল প্রগল্‌ভতা, ভাবে কামনার উত্তাপ, ভাষার আর্ত্তনাদের লেলিহান বহ্নিচ্ছটা'।—পৃ. ৫৮৯

গ্রন্থকার মহাশয় যেভাবে এইসকল ভাষা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, তিনি ঐরূপ বাক্যযোজনার প্রতি আমাদের সভক্তি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, শুধুই বাক্য নয়—"পারম্পরিক বোধগম্যতা", "ধূসর মধ্যবিত্ততা", "পরম্পরের সূক্ষ্ম-উপস্থিতি" প্রভৃতি বাক্যাংশগুলিকেও তিনি উদ্ধৃতি-চিহ্ন দিয়া মর্য্যাদাযুক্ত করিয়াছেন। ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের আদর্শও যে কত আপ-টু-ডেট তাহার প্রমাণ গ্রন্থের এই অংশে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তিনি নিজে এইরূপ ভাষা লিখিয়াছেন—

(১) চাঁদের ডাইনি-প্রভাবের রহস্যময় শিহরণ ভাবার ইন্দ্রজালে ফুটাইয়া তোলার অপূর্ব্ব চেষ্টা।—পৃ. ৫৭৯

(২) রেবার মধ্যবর্ত্তিতার ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ও পলাশের জন্ত গোলাপ ফুলের উপহার এই প্রেমের স্পর্দ্ধিত প্রকাশুতার আত্মপরিচয় ঘোষণা।—পৃ. ৫৮২

(৩) কুবের এবার সুশান্তর অভিভাবকত্বের ক্লান্তিকর তীব্রতা হইতে অব্যাহতি পাইবার আবেদন জানাইয়াছে।—পৃ. ৫৮৯

(৪) হীরার হৃদয়-মন্থনজাত ঈর্ষা-ফেনিল বিদ্বেষ-হলাহলই সে [অর্থাৎ হীরা ?] কুন্দের মুখের নিকট আনিয়া ধরিল।—পৃ. ১৭১

(৫) শৈবলিনীভ্রমে ইংরেজ তাঁহাকে বন্দিনী করিয়া লইয়া গেল, এবং নবাবের আগতপ্রায় ক্ষমার সীমার বাহিরে আসন্ন উদ্ধারের স্পর্শ হইতে দূরে ফেলিয়া দিল।—পৃ. ১০৭

(৬) উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ ও তাহার উৎপীড়নমূলক নিরোধই রূপকথার সূতিকাগার।—পৃ. ১৮

সাধারণভাবে গ্রন্থকার মহাশয়ের ভাষা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই—আমি এই আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার ভাষা যথেষ্ট উদ্ধৃত করিয়াছি—তাহার উপর আর কিছু বলিলে পাঠকগণ ক্ষুন্ন হইতে পারেন। আমি এখানে তাঁহার ভাষার যে দুই-একটি নমুনা দিলাম, তাহার কারণ, ভাষার স্টাইলই লেখকের আসল সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের পরিচয়—লেখকের মধ্যে যে রসিক ব্যক্তিটি আছেন তাঁহাকেও এই ভাষার দ্বারাই চিনিয়া লওয়া যায়। অতএব, অতি-আধুনিক লেখকদিগের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, তাহার মূলে আছে তাহাদের সহিত তাঁহার আত্মিক সমধর্ম্মিতা—এবং সেই সমধর্ম্মিতা প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার ভাষায়। তাই এই প্রসঙ্গে তাঁহার ভাষার একটু পরিচয়ও দিতে হইল। এইরূপ আদর্শ যাঁহার—ভাষার এই রীতিকেই যিনি বরণীয় করিয়াছেন, তিনি যে অতি-আধুনিক ব্যভিচারকে এত বড় মর্য্যাদা দান করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এ হেন ব্যক্তির নিকটে বাংলা উপন্যাসের সুবিচারিত মূল্যনির্ণয় আশা করাই অন্যায়। এত বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে এরূপ বিচার-বিভ্রাট এবং শেষে এমন অপ্রকৃতিস্থতার পরিচয় দিয়াছেন, ইহা নিরতিশয় লজ্জা এবং ক্ষোভের বিষয়। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সনিশ্বাসে সেই শ্রুতিবাক্য স্মরণ করিয়াছি—"ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সোনার পদ্ম

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রায়-বাড়ির সদর-মহল

ধনদাপ্রসাদের খাস কামরা

ফরাশ ও চেয়ার প্রভৃতি আসবাবের সমন্বয়ে ঘর সাজানো। পুরানো রুচি এবং পাশ্চাত্য রুচির সংমিশ্রণ পরিস্ফুট। ঘরের মধ্যে ধনদাপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞানদাচরণ, জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমদা ও একজন পুলিস-কর্ম্মচারী উপবিষ্ট। জ্ঞানদাচরণ উনবিংশ শতাব্দীর ইয়ং-বেঙ্গল নব্যতান্ত্রিক, বিদ্যাসাগর-ভূদেবের প্রভাবে প্রভাবান্বিত যুবক। প্রমদাচরণ বিপরীতধর্ম্মী—বিলাসী, মদ্যপ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ; সে মত্ত অবস্থাতেই কথা বলিতেছে।

দারোগা বসিয়া আছে

দারোগা। এ সন্দেহ আপনাদের পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল জ্ঞানদাবাবু। কর্ত্তাবাবুর নিরুদ্দেশ আজ দেড় বৎসর হয়ে গেল। এখন প্রমদাবাবু যা বলছেন, তাই যদি ঘটেই থাকে, তবে তার সন্ধান আজ আর সোজা হবে না। লাস তো পাওয়া যাবেই না, অন্য কোন চিহ্ন, প্রমাণ—

প্রমদা। বাবার শিকারের ছোরার চেয়ে আর কি প্রমাণ চান আপনি? পদ্ম বাগদিনীর হাতে আমি নিজের চোখে সে ছোরা দেখেছি।

জ্ঞানদা। তুমি ভাল ক'রে মনে কর দাদা। বাবার ছোরা তুমি ঠিক দেখেছ? মদের ঝোঁকে তুমি ভুল দেখ নি তো?

প্রমদা। ভুল? নেশা? মদ খেলে নেশা হয় জ্ঞানা? রায়-বংশের ছেলের? (উচ্চহাস্য) শোন জ্ঞানী, তার আধ ঘণ্টা আগেই গঙ্গার ধারে একটা চিতেবাঘ শিকার করেছি। নিশানা করেছিলাম মাঝ-কপালে, ছোট চিতে, কপালটা ঠিক মাঝখানে একেবারে দু ফাঁক হয়ে গেছে। ফেরবার পথে আমি আর মদ খাই নি, ফুরিয়ে গিয়েছিল। নেশা? (হাসিল) বাবার ছোরা আমি পদ্মর হাতে

দেখেছি। সোনার পাতে বাঁটটা মোড়া ছিল—কেবল সেই পাতটা নেই।

দারোগা। আপনার বাবার ছোরাই যদি হয়, তবে পদ্ম কি সেটা আপনার সামনে বের করবে প্রমদাবাবু?

প্রমদা। জেরার উত্তর আমি দিই না দারোগাবাবু। আরও একটা কথা আপনাকে ব'লে দিই, মিথ্যে কথা আমি বলি না।

জ্ঞানদা। কিন্তু তুমি ওদের বাড়ি কেন গিয়েছিলে?

প্রমদা। জ্ঞানদা, তুই আমার সঙ্গে ওরকমভাবে কথা বলবি না।

জ্ঞানদা। তুমি একটা পশু।

প্রমদা। ইয়েস, আমি পশু, এ বিস্ট—কিন্তু শেয়াল নই, বাঘ। আমি গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি। পদ্মর জন্যে গিয়েছিলাম। পদ্ম আমাকে ছোরাটা দেখিয়ে শাসালে। মুখে না বললেও, তার মনের কথাটা আমি বুঝলাম। বলতে চাইলে, এই ছোরাতে তোমার বাবাকে শেষ করেছি, তোমাকেও—। (উচ্চহাস্য) ভয় দেখাতে চায় আমাকে। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করলাম, কিন্তু ইচ্ছে হ'ল না। পদ্ম-পুষ্প ঝরাতে ইচ্ছে হ'ল না।

জ্ঞানদা। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। পদ্মর সঙ্গে বাবার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘৃণিত, তবু তার সামনে মাথা হেঁট করা উচিত আমাদের। ছি! ছি! ছি!

প্রমদা। আঃ! আঃ! আঃ! জ্ঞানা, তুই চুপ কর্।

জ্ঞানদা। ভবিষ্যতের জন্যে তোমাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি। শোন, তোমাকে পাগল হিসেবে ঘরের মধ্যে আমি বন্ধ ক'রে রেখে দেব।

প্রমদা। বন্ধ ক'রে রেখে দিবি? আমাকে? তুই? (অবজ্ঞায় হাসিল)

জ্ঞানদা। তোমার কতবড় অধঃপতন হয়েছে, তুমি একবার ভেবে দেখ না।

প্রমদা। (উচ্চহাস্য) অধঃপতন!

জ্ঞানদা। যেদিন তোমার এই জঘন্য চরিত্রের কথা মা প্রথম জানতে পারেন, মায়ের সেদিনকার কান্না মনে পড়ে না?

প্রমদা। আঃ! আঃ! (উঠিয়া দাঁড়াইল)

জ্ঞানদা। তোমার এমন স্ত্রী, প্রতিমার মত রূপ, দেবীর মত অন্তর—

প্রমদা। আঃ জ্ঞানা! চুপ কর তুই, চুপ কর। (অস্থির হইয়া পদচারণা করিয়া) তুই জানিস না জ্ঞানা, তুই জানিস না। সে একটা আগুন, চিতার আগুনের মত আগুন, রাবণের চিতা জ্ব'লে শেষ হয় না। স্ত্রী-পুত্র, জাত-ধর্ম্ম, সম্বন্ধ—ওরে জ্ঞানা, পায়ের তলার মাটির কথা পর্য্যন্ত ভুলে যাই।

জ্ঞানদা। ব'স, স্থির হয়ে ব'স।

প্রমদা। না না না। এই কেষ্টা, শূয়ারকি বাচ্চা, মদ, মদের বোতল—

প্রস্থান

জ্ঞানদা মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

দারোগা। ওসব কথা ছেড়ে দিন ছোটবাবু। ও নিয়ে মন-খারাপ করবেন না আপনি। ও রকম তো আকছার হচ্ছে। এখন কাজের কথা—

জ্ঞানদা। (মুখ তুলিল, স্থির দৃষ্টিতে আপন মনেই বলিল) হতভাগ্য দেশ, প্রেতে ভরা সমাজ! রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব এঁদের কথা দেশ শুনলে না। এরই জন্যে দেবেন ঠাকুরের মত মহাত্মা, কেশব সেনের মত মহাপুরুষ সমাজ পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেল। (আপন মনেই আবৃত্তি করিল) "কতকাল পরে বল ভারত রে, দুখসাগর সাঁতারি পার হবে!"

দারোগা। (হাসিল। তারপর জ্ঞানদার আবৃত্তি শেষ হইতেই সম্মুখে নিকটে আসিয়া বলিল) শুনুন ছোটবাবু, কাজের কথাটা শেষ ক'রে নিতে চাই আমি।

জ্ঞানদা। বলুন।

দারোগা। আপনি কি করতে বলেন? কর্ত্তাবাবু খুন হয়েছেন—এই কথা কি আমাকে ডায়েরি করতে বলেন?

জ্ঞানদা। সমস্যার কথা দারোগাবাবু। দাদা মদ খান, কিন্তু মাতাল যাকে বলে তা তিনি হন না। মিথ্যে কথাও তিনি বলবেন ব'লে আমি মনে করি না। তবে ভুল হতে পারে।

দারোগা। তা হ'লে সন্ধান ক'রে একবার দেখাই উচিত।

জ্ঞানদা। সত্যকে গোপন আমি করতে চাই না, ক'রেও ফল নেই, কারণ পদ্মকে ভৈরবী ক'রে বাবা বাগানবাড়িতে রেখেছিলেন—এ কথা এ অঞ্চলের সকলেই জানে। কালীচরণ যেদিন এখানে প্রথম আসে, সেই দিনই সে পদ্মকে কেড়ে নিয়ে যায়। বাবা যদি মতি-ভ্রমের বশে রাত্রে পদ্মর সন্ধানে কালীচরণের বাড়ি গিয়ে থাকেন, তা হ'লে—কালী বাগদী দুর্দান্ত হিংস্রপ্রকৃতির লোক, তাকে বিশ্বাস নেই।

দারোগা। অত্যন্ত সন্দেহজনক ব্যাপার, তাতে কোন ভুল নেই। আর কর্ত্তা যদি সন্ন্যাসীই কোন কারণে হয়ে থাকেন, দেড় বৎসর হয়ে গেল, তবুও একটা খবরও কি দিতেন না তিনি? আর সন্ন্যাসী হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও যে দেখতে পাচ্ছি না। কিছু মনে করবেন না ছোটবাবু, কর্ত্তার অবশ্য ধর্ম্মে-কর্ম্মে আচারে-অনুষ্ঠানে অনুরাগ ছিল, কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন ঘোর বিষয়ী, ভোগ-বিলাসে প্রবল আসক্তি ছিল তাঁর। পদ্মই তার প্রমাণ। তিনি কেন সন্ন্যাসী হতে যাবেন?

জ্ঞানদা। যা হয় আপনি করুন দারোগাবাবু। এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

দারোগা। আমি জমাদারকে কালীর ঘর খানাতল্লাস করতে পাঠিয়েছি। ধ'রে আনতেও বলেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন, আদালতে এই কেলেঙ্কারি—

জ্ঞানদা। কেলেঙ্কারি যখন সত্য, তখন সহ্য না ক'রে উপায় কি? আপনাদের কর্ত্তব্য আপনারা ক'রে যান।

দারোগা। সাধ্যমতে আমরা কসুর করব না।

জ্ঞানদা। প্রমাণ যদি নাও পান, তবু কালী বাগদীর মত লোকের যাতে উচ্ছেদ হয়, তাই আপনাদের করা উচিত! পাপ—মূর্ত্তিমান পাপ।

দারোগা। আপনারা সাহায্য করুন, কেন করব না?

জ্ঞানদা। আমি প্রাণপণ সাহায্য করব আপনাদের। এই সব ক্রিমিনাল—বরুন ক্রিমিনালদের একজনকেও রাখব না আমি

এ এলাকায়। চুরি-ডাকাতি এদের নেশা। দাঙ্গা-খুন এদের পেশা। এসব হ'ল এদের গৌরবের কাজ। সুন্দরী মেয়ে হ'লে এরা টাকার লোভের ভদ্রলোককে বিক্রি পর্য্যন্ত করে। হাবে-ভাবে প্রলুব্ধ ক'রে ভদ্রলোকের ছেলের অধঃপতন ঘটানো এদের মেয়েদের গোপন ব্যবসা। সমাজ-দেহে এরা ওয়েস্টিং ডিজিজ, রাজযক্ষ্মা।

ঠিক এই সময়ে দরজার পাশে উঁকি মারিল ফুরু বাগদীর মুখ। তোষামোদিহাস্যস্মিত, অথচ ভয়ার্ত্ত একখানি মুখ। চোখে ধূর্ত্ততা। ফুরু বাগদী আসলে ছিঁচকে চোর, প্রমদাচরণের লালসাবহ্নির হবি-সংগ্রাহক, উপরন্তু সংগোপনে পুলিসের গুপ্তচর। লোকটি আপন রুচি এবং জাতি-সংস্কৃতির মাপকাঠিতে শৌখিন ব্যক্তি। মাথায় বাবরী চুল, গালপাট্টা, সূচালো গোঁফ। নিঃশব্দ লঘুপদে চলা-ফেরা করে, মধ্যে মধ্যে চকিত ভয়ার্ত্তের মত এদিক ওদিক চায়। চোখের পাতা ঘন ঘন পড়ে। সুবিধা পাইলে হাতের কাছে যাহা পায়, তাহাই কাপড়ে লুকাইয়া আত্মসাৎ করে

জ্ঞানদা। (ফুরুর মুখ উঁকি মারিতেই দরজায় খুট করিয়া শব্দ হইল, সেই শব্দে জ্ঞানদা মুখ ফিরাইল) কে ?

সঙ্গে সঙ্গে ফুরুর মুখ অন্তর্হিত হইল

দারোগা। (ফিরিয়া) কে ?

আবার দরজা দিয়া ফুরুর মুখ উঁকি মারিল, সে সভয়ে আঙুল দিয়া জ্ঞানদাকে দেখাইল

দারোগা। (হাসিয়া) আয়, ভেতরে আয়। ভয় নেই।

জ্ঞানদা। ওটাকে কেন দারোগাবাবু ? ওকে আমি বাড়ির এলাকায় ঢুকতে বারণ ক'রে দিয়েছি। দাদার অধঃপতনের ওটা একটা শয়তান।

কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ফুরু ধীরে ধীরে মুখ সরাইয়া লইল

দারোগা। বাঘের সন্ধান রাখতে হ'লে ফেউ না হ'লে চলে না ছোটবাবু। ফুরুকে কিছু বলবেন না। ও আমাদের ফেউ—স্পাই।

কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ফুরুর মুখ ধীরে ধীরে আবার বাহির হইল

আয় ফুরু, ভেতরে আয়।

ফুকুর প্রবেশ

ফুকু। (সভয়ে হাসিয়া) আমি হুজুরদের গোলাম, ছিচরণের দাস।

সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িল

জ্ঞানদা। লোকটা চ'লে গেলে আমাকে ডাকবেন দারোগাবাবু।

ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল

ফুকু। কেল্লাফতে হুজুর। ছোরা বেরিয়ে গিয়েছে।

দারোগা। ছোরা বেরিয়েছে।

ফুকু। আজ্ঞে হ্যাঁ। বালিশের ভেতরে রাখত পদ্ম। আমি আবার বড় খোকাবাবুর চর তো, তাতেই আমাকে দেখেই বালিশ থেকে টেনে ছোরাটা বার ক'রে বললে, তোকে আজ শেষ করব। আমি টেনে দিলাম ছুট। এসেই ব'লে দিলাম জমাদারবাবুকে। জমাদারবাবু বার করেছে ছোরা। এখন ব'সে আছে কালীচরণ আর তারাচরণের জন্য। কোথা গিয়েছে দুজনায়।

দারোগা। হুঁ। পদ্ম কি বললে?

ফুকু। আমি আর ছামনে যাই নেই হুজুর। হুজুর, তারাচরণের পরিবারকে আজ দেখলাম হুজুর।

দারোগা। আঃ। যা এখন তুই, বাইরে যা। ছোটবাবু, জ্ঞানদাবাবু।

পিছন ফিরিয়া জ্ঞানদাকে ডাকিতেছিল, ফুকু অবসর পাইয়া একটি পিতলের ফুলদানি তুলিয়া কাপড়ে ঢাকিয়া লইয়া চলিয়া গেল, ফুকু যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দরজা দিয়া

জ্ঞানদার প্রবেশ

দারোগা। প্রমদাবাবুর কথা সত্যি, ছোরা পাওয়া গেছে ছোটবাবু।

জ্ঞানদা। ছোরা পাওয়া গেছে?

দারোগা। জমাদার ওদের গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে আসছে।

জ্ঞানদা ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল

জ্ঞানদা। হ্যাঁ হ্যা হ্যাঁ। আমি একবার কালীচরণের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই।

দারোগা। আপনি এত অস্থির হবেন না জ্ঞানদাবাবু।

জ্ঞানদা চেয়ারে বসিল এবং চোখ মুদিয়া কপালে টিপিয়া ধরিল। জমাদার প্রবেশ করিল এবং সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

দারোগা। আসামী হাজির?

জমাদার। হ্যাঁ হুজুর। এই সেই ছোরা। (জমাদার ছোরা বাহির করিল)

জ্ঞানদা। দেখি দেখি। (হাত বাড়াইয়া ছোরাটা লইল) হ্যাঁ, বাবার ছোরা।' বাঁটের সোনার পাত ছাড়িয়ে নিয়েছে, কিন্তু এই দেখুন, ছোরার গায়ে বাবার নাম লেখা।

দারোগা। নিয়ে এস, আসামী নিয়ে এস এইখানে। পদ্ম বাগদিনীকেই আগে নিয়ে এস।

জমাদার চলিয়া গেল

জ্ঞানদা। আমার ইচ্ছে হচ্ছে কি জানেন দারোগাবাবু? ইচ্ছে হচ্ছে, ওই ছোরাটা আমি কালী বাগদীর বুকে বসিয়ে দিই।

দারোগা। জ্ঞানদাবাবু!

জ্ঞানদা। ছোরাটা আপনি নিয়ে রাখুন। (ছোরাটা দিল)

জমাদার ও পদ্মর প্রবেশ

পদ্ম। ছোট-খোকাবাবু, এই তোমাদের বিচার? আজ পৌষ-সংক্রান্তির দিন, আজ তুমি ঘর-গুষ্টিকে ধ'রে আনলে? পুলিস দিয়ে ঘর-তল্লাসি করালে? কেন, কি করেছি আমরা?

জ্ঞানদা। আগেকার আমল হ'লে তোকে আমি—

জমাদার। এই এই। না না। আসতে পারবি না তুই।

কালী। আরে। পথ ছাড় তুমি জমাদার। পথ ছাড়।

জমাদারের হাত ছাড়াইয়া তাহাকে ঠেলিয়া কালী প্রবেশ করিল

কালী। বল ছোট-খোকাবাবু, সে আমল হ'লে কি করতে বল, শুনি।

দারোগা। তুই কালী বাগদী?

কালী। হ্যাঁ। তুমি দারোগা সায়েব? সেলাম।

দারোগা। বিনা হুকুমে কেন ঘরে ঢুকলি তুই?

কালী। আমার বোনকে আনবার সময় তোমরা আমার হুকুম নিয়েছ? তাই বিনা হুকুমে আমাকেও ঢুকতে হ'ল। আমার বোন রয়েছে এখানে, আমি থাকব দারোগাবাবু। যা জিজ্ঞাসা করবে আমার সামনে কর।

দারোগা। জমাদার, সিপাহী ডাকো।

কালী। সেপাই ডেকো না দারোগা-সায়েব, খুনখারাপি হয়ে যাবে। নইলে যা জিজ্ঞাসা করবে, কর। আমি কিছু বলব না।

দারোগা। চুপ ক'রে ব'স তবে ওইখানে।

পিস্তল বাহির করিয়া ধরিল

কালী। (হাসিল) পিস্তল রাখ তুমি দারোগাবাবু, অন্যায় ক'রে হাঙ্গামা আমি করব না।

দারোগা। তুই পদ্ম বাগদিনী?

পদ্ম। হ্যাঁ।

দারোগা। এ ছোরা তুই কোথায় পেলি?

পদ্ম। বড়বাবুর ছোরা, বড়বাবু দিয়েছিল আমার দাদাকে, আমাকে দেবার জন্যে।

আনদা। বাঁটের সোনার পাতটা ছাড়িয়ে ফেলেছিস কেন তা হ'লে?

কালী। ছোট-খোকাবাবু—

দারোগা। কালীচরণ, তুই চুপ কর

পদ্ম। সোনার পাত ছিল না।

আনদা। ছিল।

কালী। ছিল। আমি সে পাত ছাড়িয়ে বড়বাবুকেই দিয়েছি—ফিরিয়ে দিয়েছি।

আনদা। সোনার পাত ছাড়িয়ে বাবাকেই দিয়েছিস?

কালী। হ্যাঁ।

আনদা। হুঁ। কিন্তু বাবা ছোরাটা হঠাৎ পদ্মকে দিতে গেলেন কেন? টাকাকড়ি দিলেন না, ছোরাটা দিলেন কেন?

পদ্ম। শুনবে ছোট-খোকাবাবু?

আনদা। হ্যাঁ হ্যাঁ। কেন?

পদ্ম। তোমার ওই দাদা, বড়-খোকাবাবু যদি—। ওই বড়-খোকাবাবুর বুকে বসিয়ে দিতে দিয়ে গিয়েছিল।

আনদা। হুঁ। বাপ ছেলের বুকে বসাবার জন্যে ছোরা দিয়ে গেছে! আর তোরা সেই ছোরার বাঁটের সোনার পাতটা ছাড়িয়ে তাকে ফেরত দিয়েছিস! বুঝেছি।

কালী। বুঝতে তুমি পার নাই ছোট-খোকাবাবু, বুঝতে তুমি পারবে না।

পদ্ম। বুঝতে তুমি চেও না ছোট-খোকাবাবু। বিশ্বাস কর তুমি, ছোকা আমরা চুরি করি নাই। তোমার মায়ের মত—

জ্ঞানদা। চোপ রও হারামজাদী।

কালী। (গর্জ্জন করিয়া উঠিল) ছোট-খোকাবাবু।

দারোগা। (ধমক দিলেন) এই কালী বাগদী।

কালী। ইচ্ছে হয় পিস্তলটা তোমার দেগে দাও দারোগাবাবু। হারামজাদী, হারামজাদী! ছোট-খোকাবাবু ও ব'লে, গাল দিও না তুমি। মহাপাপ—

পদ্ম। দাদা। দাদা!

কালী। (সহসা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল) না না। দাও, দাও, হাজার বার গাল দাও তুমি আমার বাপকে।

জ্ঞানদা। কালী, হেসে আমাকে ভোলাতে পারবি না তুই।

কালী। ছোট-খোকাবাবু, কাঁদতেও তোমার কাছে আমি কোন দিন আসি নি। তোমার বাবা চাকরান জমি কেড়ে নিয়েছিল, পদ্মকে নিয়ে—(স্তব্ধ হইল) খোকাবাবু, সেদিন যখন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেদিন আমি কাঁদি নি। তারপর নদীর ধারে চর ভেঙে জমি করলাম মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, সে জমি তুমি কেড়ে নিলে। কালো মেঘের বরণ মন-ভোলানো ধান—হাতী লাগিয়ে খাইয়ে দিয়েছ তোমরা। ঘরে বেঁধেছি, তবু তোমাদের কাছে দরবার করতে আসি নি। আবার আজ চুরি করেছি ব'লে ধ'রে এনেছ। হাসব না ছোটবাবু? (হাস্য)

জ্ঞানদা পদচারণা করিয়া ফিরিয়া কালীর সম্মুখে দাঁড়াইল

জ্ঞানদা। বাবাকে তোরা খুন করলি কেন?

কালী। খুন?

পদ্ম। না না না, ছোট-খোকাবাবু, না।

কালী। ও, তাই বল; তুমি তাই মনে করেছ ছোটবাবু? না না ছোটবাবু, না। তিনি সন্ন্যেসী হয়ে গিয়েছেন।

জ্ঞানদা। আর কাউকে ব'লে যান নি, তোকে বলে গিয়েছেন ?

কালী। হ্যাঁ, গিয়েছেন।

জ্ঞানদা। হঠাৎ তিনি সন্ন্যাসী হলেন কেন ?

কালী। ছোট-খোকাবাবু, আর তুমি কোন কথা শুধিও না, বলতে আমি পারব না।

জ্ঞানদা। কালী!

কালী। না না ছোট-খোকাবাবু, না।

জ্ঞানদা। তোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে কালী।

কালী। ঝুলব ছোট-খোকাবাবু, তবু বলতে পারব না।

জ্ঞানদা সহসা কালীর গলা ধরিল

জ্ঞানদা। বল। বল।

দারোগা। জ্ঞানদাবাবু!

কালী হাত ছাড়াইয়া দিল

কালী। তোমাদের হাত নরম খোকাবাবু, কালী বাগদীর গলা পাথরের, খুললে বন্ধ হয় না, চাপা পড়লে আর খোলে না।

জ্ঞানদা। কালী!

কালী। ছোটবাবু, ফাঁসির ব্যবস্থাই কর তুমি। সে কথা আমি বলব না।

পদ্ম। আমি বলব। শোন ছোট-খোকাবাবু—

কালী। না না না পদ্ম, না।

পদ্ম। না না, আমি বলব। তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে আমি দেব না। শোন—

কালী। পদ্ম!

সে আসিয়া পদ্মর মুখ চাপিয়া ধরিল

দারোগা। কালী!

জ্ঞানদা। কালী!

পূজকের প্রবেশ

পূজক। হুজুর।

জ্ঞানদা। কি চাই তোমার এখানে ?

পূজক একটি মোড়ক ও একখানি চিঠি তাহাকে দিল

পূজক। একজন সন্ন্যাসী এইটে এখুনি আপনাকে দিতে বললেন।

জ্ঞানদা। কি? কি এটা?

মোড়ক খুলিল, মোড়কের মধ্যে ছোরার বাঁটের সোনার পাত

এ কি? এ যে—(তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়িল) কই? কোথায়? কোথায় তিনি?

পূজক। গঙ্গার ধারে কালীবাড়ির ঘাটে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

দারোগা। ব্যাপার কি জ্ঞানদাবাবু?

জ্ঞানদা। ছেড়ে দিন, এদের ছেড়ে দিন দারোগাবাবু। আমি আসছি।

প্রস্থানোদ্যত

দারোগা। ছেড়ে দেব?

জ্ঞানদা। বাবা বেঁচে আছেন, বাবা বেঁচে আছেন। এক সন্ন্যাসী তাঁর খবর নিয়ে এসেছেন, তাঁর হাতের চিঠি এনেছেন। ওদের ছেড়ে দিন। (প্রস্থান)

কালী পদ্মের মুখ ছাড়িয়া দিল

দারোগা। যা, তোরা বাড়ি যা।

কালী। আঃ! পদ্ম, আয় বোন, বাড়ি আয়।

পদ্ম। আমার ছোরা?

কালী। (টেবিল হইতে ছোরাটা তুলিয়া লইয়া) ছোরাটা আমরা নিয়ে চললাম দারোগাবাবু।

পদ্ম ও কালীর প্রস্থান

দারোগা। চল হরলাল। মিছে হয়রানি হ'ল। (দারোগা ও জমাদারের

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। কই, কই? জ্ঞানদা!

দরজার পাশ হইতে ফুরু উঁকি মারিল

হুজুর!

কই, গেল কোথায় সব? ওকে কোথায় নিয়ে গেল?

ফুরু প্রবেশ করিল

ফুরু। ভেল্কির খেল হয়ে গেল হুজুর। বড়কর্ত্তা বেঁচে আছে। কোন্ সন্ন্যেসী চিঠি এনেছে। ছোটবাবু ছুটে গেল। দারোগা ফিরে গেল। পদ্ম-কালীকে ছেড়ে দিলে।

প্রমদা। জ্ঞানদা! জ্ঞানদা! (প্রস্থানোদ্যত) (পরে পুনরায় ফিরিয়া) যাক, বেঁচে বাবা। ফুরু, আজ রাত্রে—আজ রাত্রে—দরকার হয় কেলেকে আমি গুলি ক'রে মারব।

ফুরু। বকশিশ হুজুর। (সেলাম করিল)

প্রমদা। (একটা টাকা ছুঁড়িয়া দিয়া) আজ রাত্রে—আজ রাত্রে—

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামপ্রান্তের পথ। কাল—সন্ধ্যা

গঙ্গার ঘাটের দিকে পল্লীর মেয়েরা যাইতেছে, পৌষ-অর্চ্চনার ব্রত পালন করিতে। মেয়েদের কতকজনের হাতে অর্চ্চনার সামগ্রী-সাজানো গোল ডালা। কাহারও হাতে জলের ঘটি। কাহারও হাতে শাঁখ। তাহারা ধীর মন্থর গতিতে পৌষ-অর্চ্চনার ব্রত-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। শান্ত মন্থর গতি

গান গাহিয়া মেয়েরা চলিয়া গেল। যে দিক হইতে তাহারা আসিল সেদিক—অর্থাৎ গ্রামের দিক হইতেই সন্ন্যাসীবেশী ধনদাপ্রসাদের প্রবেশ

জ্ঞানদা। (নেপথ্য হইতে) দাঁড়ান, আপনি দাঁড়ান।

ধনদাপ্রসাদ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। সত্যিই আপনি! (জ্ঞানদা প্রণাম করি[illegible]

ধনদা। কল্যাণ হোক। ভগবান তোমাকে রক্ষা ক[illegible]

জ্ঞানদা। ফিরে আসুন।

ধনদা। সন্ন্যাসীর সে নিয়ম নয় জ্ঞানদা।
গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে বকটা আমার টনটন[illegible]

জান? মনে হ'ল, রায়-বাড়ির খিলেনে খিলেনে ঠাট্টার হাসি বেজে উঠবে।

জ্ঞানদা। কি অপরাধে আপনি আমাদের ত্যাগ করছেন?

ধনদা। আমাদের ব'লো না জ্ঞানদাচরণ, আমাকে বল। গ্রামে যখন ঢুকলাম, তখন আশা করেছিলাম—হ্যাঁ, আশা করেছিলাম, রায়-বাড়ির দেউড়িতে পুত্রশোক আমার জন্যে লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে। আশা করেছিলাম, শুনব—প্রমদা নেই। কিন্তু এসে আমাকেই মাথা হেঁট করতে হ'ল।

জ্ঞানদা। তাকে পাগল ব'লে হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখে দেব আমি।

ধনদা। তাই দিও। আর যেন মহাপাপ রায় বংশকে স্পর্শ না করে। আজ মনে হচ্ছে, ভগবানের দয়া যেন এখনও আছে। মহাপাপের ওপর আর এক মহাপাপ থেকে ভগবান আজ রক্ষা করেছেন। পুরী থেকে ফিরছিলাম কাশী। আশ্চর্য্য মানব মমতার ছলনা জ্ঞানদাচরণ, কখন যে আপনার অজ্ঞাতসারে পথ ভুল করেছি, বুঝতেই পারি নি। ভ্রম ভাঙল যখন, তখন দেখলাম, কীর্ত্তিহাটের হাটের চালার ধারে আমি। মনে মনে হেসে ফিরে যাচ্ছিলাম। পথে শুনলাম; দুটি ছেলে বলছে, রায়কর্ত্তা ধনদাবাবুকে কালী বাগদী খুন করেছে, তাই পুলিস তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে রায়-বাড়ির কাছারিতে। কালীবাড়ির ঘাটে এসে দাঁড়ালাম। (হাসিয়া) দাড়ি-গোঁফ দেখে, হিন্দী কথা শুনে পূজক ভটচাজ আমাকে চিনতে [illegible]রলে না। (সহসা সচকিতভাবে) চাঁদ উঠছে জ্ঞানদাচরণ [illegible] যাই।

[illegible]র ওই মেয়েটার জন্যে—মানে কালীচরণদের জন্যে [illegible] বাবা? আমি স্থির করেছি, ওদের গ্রাম থেকে

প্রমদা। কই, [illegible] ওদের উচ্ছেদ করব।

[illegible] হুজুর। [illegible]দা, সে কাজ ক'রো না। তুমি [illegible]

ধনদা। শুনলাম, কালীচরণ গঙ্গার চর ভেঙে জমি তৈরি করেছিল, সে জমি তুমি কেড়ে নিয়েছ ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ।

ধনদা। অন্যায় করেছ, মহা অন্যায় করেছ। সে জমি তাকে ফিরিয়ে দিও।

জ্ঞানদা। আপনার সম্পত্তির অধিকার আমি ত্যাগ করছি। আপনি ইচ্ছামত বন্দোবস্ত ক'রে যান।

ধনদা। কেন জ্ঞানদাচরণ ?

জ্ঞানদা। না। পিতৃ-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি বাধ্য, সে আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাঞ্চনমূল্যে প্রায়শ্চিত্তবিধানে আমি বিশ্বাস করি না। আপনার অন্যায়ের জন্যে আমি কালীচরণকে ঘুষ দিতে পারব না। না, সে আমি পারব না। (ধনদা মাথা হেঁট করিলেন)

জ্ঞানদা। তা ছাড়া কালীচরণের মত অপরাধপ্রবণ লোককে সমাজের ব্যাধি ব'লে আমি মনে করি। তাদের আমি নির্মূল করব। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

ধনদা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর জ্ঞানদা। (প্রস্থানোদ্যত। পুনরায় ফিরিয়া) কালীচরণের জমি তুমি রেশম-কুঠীর সায়েবদের বন্দোবস্ত করেছ না ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ, তারাই সকলের চেয়ে উচ্চমূল্য দিয়েছে।

ধনদা। দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক তোমার। (প্রস্থান)

জ্ঞানদাও অন্য দিকে প্রস্থান করিল। প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। কে ? কে ? কে ? (সে দাঁড়াইল স্তম্ভিতের মত

কুঞ্জর প্রবেশ

কুঞ্জ। হুজুর !

প্রমদা। চুপ।

কুঞ্জ। ([illegible]) পদ্ম—

প্রমদা। পদ্ম ! পদ্ম কি, ... দিল

কুঞ্জ। কালীকে আজ খুব মদ খা

প্রমদা। চল স্বরু, চল। এ আগুনে হয় পুড়ে ছাই হব, নয় আজ জল দেব। চল। আমার পিস্তল ? এই যে। চল।

উভয়ের প্রস্থান

পল্লীর মেয়েরা ব্রত সারিয়া গান গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া গেল

প্রবেশ করিল জয়া। সে স্থির দৃষ্টিতে যে মেয়েগুলি চলিয়া গেল তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর সে সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ করিল তারাচরণ

তারা। (চলিতে চলিতে জয়ার কাছে আসিয়া সচকিতভাবে) কে ?

জয়া। (ক্ষিপ্রভাবে উঠিয়া পিছাইয়া গিয়া) কে ?

তারা। কে, জয়া ?

জয়া। (উল্লসিতভাবে) তুমি, তুমি ? ওগো, তুমি ফিরে এসেছ ? আঃ! ওগো, আমি তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

তারা। ওরে বাপরে! (বাঁ হাত গালে দিয়া ডান হাতখানি জয়ার মুখের কাছে ধরিয়া) আহা-

থির দিঠিতে পথের পানে চেয়ে
চোখের কাজল ধুয়ে গেল জলের ধারা বেয়ে!

জয়া। (হাসিয়া) থাম কবিয়াল, থাম। এখন কবিগান ক'রে কি আনলে তা দাও।

তারা। কি আনলাম ? এনেছি অনেক।

জয়া। দাও, দাও। (হাত পাতিয়া) কেমন রাঙা হাত পেতেছি [illegible]। দাও।

[illegible] তোর হাত দুখানা চুমো দিয়ে ভ'রে দিই।

[illegible] হাসিঠাট্টা নয়। ওগো, আমার কান্না পাচ্ছে।

[illegible]মদা। কই, [illegible]ফল না। তা হ'লেই আর কান্না পাবে না।

[illegible] হাসি আমার আসছে না। কি এনেছ দাও।

হুজুর!

কই, গেল [illegible]বা মেয়ে, সবুর। আগে [illegible]। কবিয়াল কি

(ছড়ায়) "সমুদ্র মন্থন হৈল রত্নাকরের বাড়ি,
উজাড় কৈরা উঠে এল ধনরত্নের কাঁড়ি।
রাজা উজীর দেবতা সে সব করিলেন সাবাড়।
ভিখারী ভাঙড় শিব চাটেন বিষের ভাঁড়।"

বিষ খেয়ে এসেছি জয়া; সে তো উগরে দেবারও উপায় নাই।

জয়া। কি বলছ তুমি? আজ পোষ মাসের সংক্রান্তি। ঘরে ঘরে পোষ-পার্ব্বণ হ'ল, আমাদের ঘরে আজ হাঁড়ি চাপে নি। তার ওপর বাবুরা থানা-পুলিস ক'রে শ্বশুরকে পিসেমশাইকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল।

তারা। ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল?

জয়া। হ্যাঁ। কিন্তু সে মিটে গিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে। এখন কি এনেছ দাও, চাল কিনে আন, পোষ-পার্ব্বণের যোগাড় কর। ওগো, সকল ঘরে পৌষ-পূজো হ'ল, আমাদের ঘরে হোক। কি এনেছ দাও।

তারা। কি এনেছি? বললাম তো জয়া, বিষ খেয়ে এসেছি। ভদ্রলোক কবিয়ালদের সঙ্গে পারলাম না, হেরে গেলাম।

জয়া। হেরে গেলে?

তারা। পাল্লায় নয়, খেউড়ে। যে খেউড় তারা ধরলে, আমি বাগদীর ছেলে হয়েও সে খেউড়ের জবাব আমি গাইতে পারলাম না। আমি একবার গাইলাম—পেয়েছ মানব-জনম মন, ভগবানের নাম কর। আমাকে লোকে 'দুও' ক'রে তাড়িয়ে দিলে। একটা পয়সাও পেলা আমি পাই নি। শুধু হাতে গালাগাল খেয়ে ফিরে এসেছি।

জয়া স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

জয়া! এমন ক'রে চেয়ে রয়েছিস কেন জয়া?

জয়া। আমার ইচ্ছে করছে, তোমার দুই গালে ঠাস্ ঠাস ক'[illegible] চড় বসিয়ে দিই।

তারা। মার জয়া, তাই মার। আজ আর আমি আট[illegible]

জয়া। যে মরদ মা-বাপ-পরিবারকে খেতে দিতে পা[illegible]

[illegible] নাকি?

কুক। [illegible] বল?

প্রমদা। পদ্ম! পদ্ম কি, [illegible] এক

কুক। কালীকে আজ খুব [illegible]

ভ'রে খেতে দে, শখ মিটিয়ে পরতে দে, আমার এই গোরো গা গয়না দিয়ে ঢেকে দে। নইলে কিসের সোয়ামী তুই? কোথায় পাবি তুই, আমি কি জানি?

তারা। জয়া! জয়া!

জয়া। শাশুড়ী কাঁদছিল, ঘরে পোষ-পার্ব্বণ হ'ল না। পিসেস মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে। আমি বড় মুখ ক'রে বললাম, ভেবো না ঠাকরুণ, আজ তোমার ছেলে সাঁঝাসাঁঝি ফিরবেই। রোজকার ক'রে আনবে। পোষ-পার্ব্বণ হবে, তুমি ভেবো না। ছি! ছি! ছি!

জয়া মুখে কাপড় দিয়া প্রায় ছুটিয়া অন্য দিকে বাহির হইয়া গেল

তারা। (চীৎকার করিয়া বলিল) আমি ফিরে চললাম জয়া। রোজকার যদি করতে পারি, তবেই ফিরব।

তৃতীয় দৃশ্য

কালীচরণের বাড়ি। কাল—রাত্রি

বাহিরে চারিপাশে শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনির সংমিশ্রণে একটি সঙ্গীতময় শব্দ। আবছা অন্ধকারের মধ্যে কালী বাগদীর বাড়ি প্রায় নিস্তব্ধ। সঙ্গীতধ্বনি স্তব্ধ হইয়া গেল। দাওয়াতে পূর্ব্ব হইতেই বসিয়া ছিল, টগর ও পদ্ম। ধীরে ধীরে চাঁদের আলো ফুটিল

পদ্ম। আঃ, চাঁদ উঠল। বাঁচলাম, অন্ধকারে জীবনটা যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল।

... আমার কপাল। আজ পোষ-সংক্রান্তির সন্ধ্যে, ঘরে আমার ... না, হাঁড়ি চড়ল না। তবে যে বিপদ থেকে আজ ...

মদা। কই, ... ঠাকুর, সেই আমার মহাভাগ্যি। কে?

জয়ার প্রবেশ

হুজুর! ... আমি ঠাকরুণ।

কই, গেল

জয়া। না। (সে ঘরের ভিতরে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল)

পদ্ম। ব'স বউমা, এইখানেই ব'স। অন্ধকার ঘর, ঘরে গিয়ে কি করবে ?

জয়া। আমার মাথা ধরেছে পিসেস, আমি শোব। বসতে আমি পারছি না। (ভিতরে চলিয়া গেল)

টগর। বউমা! বউমা! মাথা কি বেশি ধরেছে মা ? (অনুসরণ করিল)

কালীচরণের প্রবেশ, সে মদ খাইয়াছে, উদ্‌ভ্রান্ত। মোটা গলায় গাহিতে গাহিতে ঢুকিল

কালী। (ছড়ার সুরে) ও মা দিগম্বরী, নাচ গো শ্যামা রণমাঝে।

পদ্ম। (চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) দাদা!

কালী। (ছড়ায়) কোন্ হ্যায় তোম্ ?

ভাঁড়ে মা ভবানী, ভোলা বোম্ বোম্ বোম্!

বাবা বোম্ বোম্ বোম্!

পদ্ম। (কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া ডাকিল) দাদা! দাদা!

কালী। কে ? কে ? ও—ও; পদ্ম ! ও! আমার সোনার পদ্ম!

পদ্ম। আজ লক্ষ্মীর দিন, তুমি মদ খেয়েছ দাদা ?

কালী। হুঁ, খেলাম বোন, খেলাম। ফুরু—ফুরু, ওই ফুরু দিলে।

টগর বাহির হইয়া আসিল

টগর। কে ? কে দিলে ?

কালী। ফুরু—ফুরু। ছিঁচকে চোর হোক, ফুরু লোক ভাল। আমাকে কত খাতির করলে।

টগর। ছি! ছি! ছি! তার চেয়ে তুমি বিষ খেলে না কে

কালী। ক্ষিদেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছিল টগরবউ, দুঃখে করছিল।

টগর। তাই ফুরুর কাছে তুমি মদ খেয়ে এলে ?

পদ্ম। ভাজ-বউ! ভাজ-বউ!

ফুরু। [illegible] থাম। আজ দেড়

প্রমদা। পদ্ম! পদ্ম [illegible] এক [illegible] পায়ে [illegible] দিল

ফকু। কালীকে আজ খুব মদ খা[illegible]

সে জমি কেড়ে নিলে, সেও সহ্য করেছি, লুকিয়ে রেখেছি, এ পাপ কথা পুরুষকে বলি নি। আজ আবার বিনা দোষে পুলিসের হাতে অপমান, খুন-অপবাদ দিয়ে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা! না, আর লুকিয়ে রাখব না আমি।

কালী। কি বলছিস টগরবউ, কি লুকিয়ে রেখেছিস?

টগর। ওই ফুকু, যার মদ তুমি খেয়ে এলে, ও ওই বড়-খোকাবাবুর গুপ্ত কোটাল। আজ দেড় বছর পদ্মকে জ্বালাচ্ছে।

কালী। (চমকিয়া উঠিল) টগর? কি বলছিস টগর?

টগর। তোমার পেট জ্ব'লে যাচ্ছে, বুক হু-হু করছে। মদ খেয়ে এলে তুমি। ঘরে দুধের মেয়ে বউ নেতিয়ে প'ড়ে আছে, বোন দাঁতে দাঁত টিপে ব'সে রয়েছে, ক্ষিদের জ্বালায় ঘুম পর্যন্ত চোখে আসে না। তোমার ছেলে ঘুরছে চাদর গলায় দিয়ে কবিরালি ক'রে। তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ, কোথায় গাঙের ধারে চর পড়েছে—জমি করবে, চাষ করবে, ফসল হবে, ক্ষেত করবে, খামার করবে, ঘর-বাড়ি—

কালী। টগরবউ, টগরবউ, জোড় হাত করছি, থাম থাম, ওরে তুই থাম। (স্তব্ধভাবে কয়েক মুহূর্ত থাকিয়া) পদ্ম, তোর সেই ছোরাটা কই রে?

পদ্ম। দাদা!

কালী। (হাত বাড়াইয়া) দে তো বোন, কোনও জায়গায় বিঁধে নেশাটা ছুটে যাক। আঃ ছি! ছি! ছি! (একবার পদচারণা করিয়া) বউমা আমার ক্ষিদেয় নেতিয়ে পড়েছে টগর? মাথা ধরেছে? আঃ ছি! ছি! ছি! আসছি আমি।

[illegible] কোথায় যাচ্ছ দাদা? না না।

[illegible] পথ ছাড় পদ্ম, নেশা আমার ছুটে গিয়েছে। ফুককে কিছু [illegible] আমি। ওরে—ওরে, আমি দেখি যদি কিছু যোগাড়

[illegible]দা। কই, [illegible]রি। পথ ছাড়।

[illegible] পথ সরিয়া দাঁড়াইল। কালী চলিয়া গেল

[illegible] হুজুর!

[illegible]দা [illegible] কই, গেল [illegible]স পদ্ম। বউটার ক্ষিদে [illegible] হেচাক উঠছে। আমি কেলো [illegible] কোথায় [illegible] [illegible] দুপাড়ায় কেউ কিছু দেবে

না। আমি একবার শেখপাড়াটা দেখে আসি। রাজা বেটার ঘর থেকে আসি আমি। (প্রস্থান)

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই উঁকি মারিল যুক্কর মুখ

পদ্ম। কে?

ফুক্কর মুখ অদৃশ্য হইয়া গেল

ফুক্ক। (নেপথ্য হইতে) কালীদা'দা রইছ নাকি? কালীদাদা?

পদ্ম ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল। যুক্কর মুখ আবার উঁকি মারিল, কাহাকেও না দেখিয়া সে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল

ফুক্ক। (এদিক ওদিক চাহিয়া চাপা গলায় ডাকিল) পদ্ম। পদ্ম। বাবু বলেছে, তোকে সোনার চুড়ি গড়িয়ে দেবে। পদ্ম।

পদ্ম বাহির হইয়া আসিল, তাহার হাতে ছোরা

পদ্ম। তোর পরিবারের বড় দুঃখ। সাতটা ছেলের একটা নাই। তাই তোকে এতদিন কিছু বলি নাই। আজ তোকে—

দাওয়া হইতে লাফ দিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ফুক্ক দ্রুত লঘুপদে পলাইয়া গেল

ফুক্ক। মেরে ফেলালে বাবু, মেরে ফেলালে। (পলায়ন)

পদ্ম। অদৃষ্টের পাপকে আমি বিদেয় করব। (অনুসরণে অগ্রসর হইল)

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রবেশ করিল প্রমদাচরণ

প্রমদা। পদ্ম।

পদ্ম। (চমকিয়া দাঁড়াইল) তুমি?

প্রমদা। সন্ধ্যার বউ একদিন বলেছিল, তুই বাঘিনী। মিথ্যে নি। (হাসিল)

পদ্ম। বড়-খোকাবাবু—

প্রমদা। নাঃ। খোকাবাবু নয়, বাবু, প্রমদাবাবু, বড়বাবু

পদ্ম। ছোট জাত ব'লে কি আমাদের ধর্ম্ম নাই, সক্ক [illegible]

প্রমদা। (অট্টহাস্যে চীৎকার করিয়া উঠিল) ক [illegible]

পদ্ম। তোমার বাবা তাঁর [illegible] তোম [illegible] দিল

জন্যে দিয়ে গিয়েছে। আমার হাতে সেই ছোরা, তুমি আর এগিও না বড়-খোকাবাবু?

প্রমদা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল

পদ্ম। তা ছাড়া দাদা আমার এখুনি ফিরবে।

প্রমদা। (পিস্তল বাহির করিয়া) কেলেকে আমি গুলি ক'রে মারব।

পদ্ম। বড়-খোকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরে যাও।

প্রমদা। পদ্ম পদ্ম, তোর জন্যে আমি জাত-ধর্ম্ম সব ছাড়ব।

পদ্ম। কিন্তু আমি তো ছাড়তে পারব না বড়-খোকাবাবু। আমার জাত-ধর্ম্ম রাখতে হয় আমি তোমাকে মারব, নয় আমি নিজে মরব। এখনও বলছি, তুমি চ'লে যাও এখান থেকে।

প্রমদা। পদ্ম!

পদ্ম। তারাচরণকে যেমন মায়া করি বড়-খোকাবাবু, তোমাকেও আমি তেমনই মায়া করি। মায়ের দুধকে তুমি বিষ ক'রে দেবে বড়-খোকাবাবু?

প্রমদা। (অস্থিরভাবে বলিয়া উঠিল) না না না না পদ্ম, না।

কালীচরণ। (নেপথ্য হইতে) কে? কে? কে ওখানে? কে?

পদ্ম। বড়-খোকাবাবু পালাও।

প্রমদা। (দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া) কালীচরণ, কেলে।

সে পিস্তল তুলিয়া লক্ষ্য করিল

পদ্ম চট করিয়া ছোরা ফেলিয়া দাওয়ার উপর হইতে একটা ছোট লাঠি—দুইহাত আন্দাজ লম্বা—লইয়া প্রমদার হাতের উপর বসাইয়া দিল, প্রমদার হাতের পিস্তল পড়িয়া গেল এবং আওয়াজ হইল

পদ্ম। প্রাণে মারতে এখনও মায়া হচ্ছে আমার। পালাও, এখনও [illegible]ও।

[illegible] রক্ত [illegible] ফুক[illegible]ন। (সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

[illegible]দা। কই, [illegible] কালীচ[illegible] হা-হা করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিল

[illegible]। (উচ্চহাস্য) ওই লাঠিটা পদ্ম, লাঠিটা!

[illegible] হুজুর!

[illegible]দা। কই, গেল [illegible] লাঠিটা লইয়া [illegible] লক্ষ্য স্থির [illegible] প্রমদার গমনপথের দিকে

কালী। আ! (বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

পদ্ম। দাদা! দাদা!

টগরের প্রবেশ

টগর। কি হ'ল? কি হ'ল পদ্ম?

পদ্ম। বলতে পারছি না ভাজ-বউ, বলতে পারছি না। সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। বড়-খোকাবাবুকে দাদা ফাবড়া ছুঁড়ে মেরেছে। সে পড়েছে। দাদা ছুটে গেল। (সে কাঁপিতে লাগিল)

টগর। কোন্ দিকে পদ্ম, কোন্ দিকে?

পদ্ম। ওই ওই—

টগর। ওগো! ওগো! (অগ্রসর হইল)

কালীচরণের প্রবেশ. তাহার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হাতে সোনার চেন, বোতাম, আংটি

কালী। নে পদ্ম, ধর।

পদ্ম। (চমকিয়া উঠিয়া কাঁপিতে লাগিল) দাদা! কি করলে দাদা? তারাচরণকে কি তুমি এমনই ক'রে—উঃ!

টগর। খুন ক'রে ওইগুলো তুমি নিয়ে এলে?

ধনদা। (নেপথ্য হইতে) কালীচরণ!

সে ডাক কাহারও চেতনা-সঞ্চার করিতে পারিল না

কালী। ধর ধর। (সেও কাঁপিতে লাগিল) নিয়ে যা সাউ-মহাজনের বাড়ি, কিছু চাল-ডাল নিয়ে আয়। দেবে সে সোনা পেলে। লোক লক্ষ্মীর দিন, দেবে দেবে। নিয়ে যা। ধর ধর।

টগর। না না না।

কালী। ধর ধর। আর একটু জল-

ধনদার প্রবেশ - বড়বাবু

ধনদা। কালীচরণ! তোর সঙ্গে দেখা না [illegible]
এ কি, তোর হাতে রক্ত! ও কি?
কালীচরণ! কালী!

ফুরু। (নেপথ্যে হইতে) এই আসুন হুজুর, এই আসুন।

জ্ঞানদা। (নেপথ্যে হইতে) দাদা! দাদা!

ধনদা। জ্ঞানদা!

জ্ঞানদা। (নেপথ্যে হইতে) বাবা!

ধনদা। প্রমদা আমার সঙ্গে তীর্থভ্রমণে চলল জ্ঞানদা। তার উপলব্ধি হয়েছে আজ, আপনার ভুল বুঝতে পেরেছে। মুক্তির পথে বেরিয়েছে সে। তুমি ওইখান থেকে ফের। এখানে এসো না। আমার শেষ অনুরোধ জ্ঞানদা, ফের।

নেপথ্যে জ্ঞানদা। বাবা!

ধনদা। পেছু ডেকো না, ফিরে যাও। কালীচরণ, এইবার আমাকে ক্ষমা কর।

কালী। বড়-খোকাবাবুর আমি শোধ নিয়েছি বড়বাবু, শোধ। কিন্তু তোমাকে—? না।

অস্বীকার করিয়া ঘাড় নাড়িল

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চক্রবৎ

হৃদয়-গগনে নেমেছে বাদলধারা,
উতলা বাতাস বেদনায় কেঁদে সারা—
ঘন তমসায় দিক্‌দিগন্ত ম্লান
আলোকের [illegible] মেঘছায়ে অবসান।
[illegible] কেঁদে ওঠে দশ দিক—
[illegible] হেরিল নির্নিমিখ,
একটি ধ্বনি[illegible] শেষে নিবিড় গগনকোণে
[illegible]-শোভা উদ্ভিল সঙ্গোপনে।

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার

হুজুর!
কই, গেল

প্রাচীন পারসীক হইতে

১

যে-স্বর্গ হ'ল না গড়া, তারি তরে সখী,
জন্মান্তরে, আমাদের হবে কি মিলিতে?
যে-স্বপ্ন হ'ল না দেখা, তারে কি পরখি
হেরিব না সাম্মিলিত আঁখির জ্যোতিতে?

কামনা-সঙ্গম-নীরে জাগিল না দ্বীপ,
তবু সে স্বপনের গর্ভে উঠিতেছে জ'মে?
শতলক্ষ জীবনের দেয়ালী প্রদীপ
জ্বালিব দুজনে মিলে জনমে জনমে?

ভবিষ্যৎ বাঁধা দিয়ে সুখী যারা হয়,
হায় সখী, এ অধম সে দলের নয়।

পরজন্ম আছে বটে, কিন্তু কি তখন
চিনিতে পারিব তোমা? তাই যদি হবে,
সে জন্মের ছিল যারা, রয়েছে এখন
তাহারা অপরিচয়ে গুপ্ত কেন তবে?

ভালবাসিবে না সখী, এই কথা দুটি
বল দেখি ভাষ্য করি; কোমল অধরে
কঠিন ভাষণখানি কিবা শোভা ধরে,
মৃণাল-অঙ্গুলে যথা হীরার আঙুটি।

ভাল না বাসিয়া মোরে রাগো দেখি, অয়ি,
ঝঙ্কারিয়া চ'লে যাও; পাণ্ডুর কপোলে
ঘুটুক অরুণ-চিহ্ন-দ্যুতি পলে পলে,
নন্দনের পারিজাত মর্ত্ত্যে দেখে লই।

প্রেম তব সরোবর; কিন্তু চাতকের
তৃষার নিদান কভু সে শীতল জল,

বাজে লেখা

ক্রমাগত কয়েকদিন চেষ্টা ক'রে এ লেখাটা আমি ছেড়ে দিলাম। আর হয় না, ওটাকে আমি আর কিছুতেই দাঁড় করাতে পারছি না। অনেকবার কাটাকুটি করলাম, অনেক পাতা ছিঁড়লাম, ফেলে দিলাম দূর ক'রে, বেরিয়ে এলাম বাইরে বারান্দায়। উত্তরের উঁচু পাহাড়ের চূড়া তিব্বতের মেঘে লুপ্ত হয়ে গেছে সে দিকটায় তাকিয়ে রইলাম। কি দেখলাম, কি দেখব, কি দেখতে চাই—কিছুই মনে পড়ল না, কিছুই মনে ঢুকছে না—সেই ছেঁড়া পাতা কটা, সেই কাটা লাইনগুলি, আঁকাবাঁকা সেই অক্ষরের সারি আমার মাথায় তখনও ভিড় ক'রে আছে; তাদের মৃদু কোলাহল তখনও শুনতে পাচ্ছি। চোখে এই হিমালয়ের নিষ্প্রভ নির্দ্দেশ ঠেকলেও মগজে তা পৌঁছতে পারছে না। যে স্নায়ুতন্ত্রী বেয়ে বাইরের বস্তু আমার মস্তিষ্কে প্রতিভাসিত হবে, সে স্নায়ুতন্ত্রী হয়তো তেমনই তার প্রবাহ মনের দুয়ারে পৌঁছে দিচ্ছে, তা গ্রহণও করছে মস্তিষ্কের বীক্ষণ-প্রকোষ্ঠের উত্তেজিত কোষগুলি—হাঁ, নিশ্চয়ই তা গ্রহণ করছে। আমার দৃষ্টিশক্তি ওই উত্তরের পথে দূরযাত্রী, কিন্তু আমার চিৎশক্তি সে খোঁজ রাখে না, বীক্ষণ-প্রকোষ্ঠের কোষগুলির উপরে এখনও রয়েছে সর্পিলগতি লেখার দাগ, মাটির উপরে যেমন প'ড়ে থাকে সরীসৃপের গতিরেখা। মেঘ নয়, ওই পাহাড়ের চূড়া নয়,—চোখের আরসিতে বৃথা তাদের ছায়াপাত, স্নায়ু বৃথা তাদের দৌত্য বহন করছে; আমার চোখের সামনে এখনও জাগছে সেই আমার হস্তাক্ষর—আমারই হাতের লেখা, শ্রান্ত হাতের লেখা—আমার অশান্ত মস্তিষ্কের অশান্ত মননক্রিয়ার স্বাক্ষর। আমি তা ফেলে দিয়ে এসেছি; না [illegible]র দিয়ে উপায় ছিল না। [illegible] আমি বার বার চেষ্টা করলাম আমার [illegible] বারে [illegible] আমার শাসন অগ্রাহ্য করলে। এক, [illegible]ক্কির রঙ মেখে [illegible] হয়—আপনার গতিতে আপনি চলে, কই, [illegible] অনুভূতি-লো[illegible]র ক'রে যায়। কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠে দেখি, [illegible] একটি ধ্বনি [illegible] রয়েছে, আমার চিন্তা তার আবরণে আবছায়া [illegible]জুর! কই, গেল [illegible] দৃ[illegible]তা আর দেখা যায় [illegible] চেনা যায় না, আর

ভাবের উষালোকে প্রথম যে মূর্ত্তি আমার মানস-সীমান্তে পদার্পণ করেছিল, তখনও তাব মূর্ত্তি রহস্যময়, তখনও তার রূপ আমি প্রত্যক্ষ করি নি, কিন্তু তার পদস্পর্শে জেগেছে মনে শিহরণ—কৈশোরের প্রথম প্রণয়ের মত কাঁচা, ভীরু, গোপন সেই মুহূর্ত্তটি, যখন আমি প্রথম অনুভব করলাম। এই নতুন আবির্ভাব প্রণয়েরই মত তা আমাকে টেনে নিলে। আমি কলম নিয়ে বসলাম, জানি তার স্বরূপ এখনই আমার সম্মুখে প্রকাশিত হবে, এখনই গলে পড়বে তার অবগুণ্ঠন, এখনই খুলে পড়বে তার শৃঙ্খল, তাব বসন। রেখার টানে টানে, অক্ষরের আলোকে এখনই সে মূর্ত্তি আপনাব সম্মুখে ফুটে দাঁড়াবে—মুক্তা অনাবৃতা, আমাব চোখেব সম্মুখে, আব পৃথিবীব চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হবে তার রূপ, চিরদিনের মত স্থির, রূপে রেখায় সুনির্দ্ধারিত স্পষ্ট, উজ্জ্বল পরিপূর্ণ, আপনার প্রকাশ-মহিমায় এক বিস্ময়, এক রহস্য, অথচ তার রহস্য কারও চোখে ঠেকবে না। সে প্রতিদিনকার পরিচিত ব'লে মনে হবে। একেবারে বরাবরের চেনা, যাকে জন্ম থেকে দেখেছি, যাকে প্রতি নিমেষে দেখি, উঠতে বসতে শুতে ঘুমুতে। কেউ সন্দেহ করবে না, এ নতুন; আমাব মনের আকাশে এর আবির্ভাব হবার পূর্ব্বে ঐ ছিল সকলের অজ্ঞাত, আমারও অজ্ঞাত। কেউ ভাববে না, আমি তাকে এনেছি আমার অস্পষ্ট ভাবালোকের প্রদোষান্ধকার থেকে উদ্ধার ক'রে, তার জন্য আমার মস্তিষ্কের ধূমায়মান গহ্বরে, আমি তাকে উৎসারিত করেছি আমার কল্পনায় আর কালিতে মিশিয়ে কাগজের আঁকে আঁকে, দুনিয়ার অনাবৃত আলোকের সম্মুখে তাকে আমিই করলাম প্রতিষ্ঠিত, যে আকাশের নীলিমায় ছিল মিলিয়ে বাতাসের প্রবাহে ছিল গা এলিয়ে, জ্যোৎস্নায় নেমে আসতে চাইত আমার সম্মুখে, যে কেঁদে বেড়িয়েছে নিখিল [illegible]র অনন্ত [illegible]শের

যে অপ্রকাশের বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে,

কাছে, যে চেয়েছে প্রাণস্পর্শ, চেয়েছে [illegible], বড়[illegible],

আপনাকে প্রকাশিত করতে। অতি-পরিচিত [illegible]

তাকে দেখে কেউ [illegible] না। [illegible]তবু তার

যে কোনদিন পেয়েছে নিজের চেতনায় এমনই পাদস্পর্শ, সে বুঝবে অব্যক্তের রূপায়ন-রহস্য। আমি তার সে স্পর্শ অনুভব করেছিলাম, নিয়ে বসলাম কালি আর কলম। জানি সে ফুটে উঠবে।

কলম বয়ে চলল শান্তগতি, সংশয়হীন। ঋজু, স্থির আমার হাতের লেখা। একটু একটু ক'রে সে আপনার শক্তি সংহত ক'রে নিচ্ছে; সংগ্রহ ক'রে নিচ্ছে আমার মন আপনার আহৃত শব্দ-সম্পদকে—যেমন ক'রে বাষ্প পুঁজি ক'রে নেয় ইঞ্জিন। তার প্রথম যাত্রা ধীর, অনুত্তেজিত; শুধু একটি মুভমেণ্ট—স্থিরতা, নিশ্চয়তা আছে এই সূচনায়। তার পর জেগে ওঠে তার দেহ জুড়ে শক্তির স্রোত, প্রত্যেক শিরা বেয়ে, প্রত্যেক রক্ত-প্রণালী দিয়ে তা ছুটে চলে। সমস্ত দেহ হয়ে ওঠে উত্তেজিত, উন্মত্ত, উদ্দাম। লেখা তার তাপ সঞ্চয় ক'রে নিয়ে একটু একটু ক'রে এগিয়ে চলল। তার গতিবেগ জাগবে, এখনই জাগবে। আমার সন্দেহমাত্র নেই, সে সাড়া দিয়েছে, যে প্রথম স্পর্শ তার দরকার, সে তা লাভ করেছে। তার দেহ কাঁটা দিয়ে উঠছে প্রণয়ের প্রথম স্পর্শে। আমার সংশয় নেই, সে সাড়া দিচ্ছে, প্রথম যেমনই দেয় দেহমন, ভীত, চকিত, শঙ্কায় সঙ্কুচিত। তার মুখে এখুনি ফুটে উঠবে কথা।

কথা ফুটল। আমার কথা জেগে উঠতে লাগল। আমার কলম এগিয়ে চলল, আমার লেখা হয়ে উঠল সহজ, নির্ভয়। অকুণ্ঠিত স্থির নিয়মে আমার কথা স্তরে স্তরে সাজানো হচ্ছে, অক্ষরের পাশে দাঁড়াচ্ছে অক্ষর, শব্দের পাশে শব্দ। বহুদিনকার পরিচয়ে তারা পরস্পরের চেনা, বহুকালের আত্মীয়তা তারা নতুন ক'রে সন্ধান পেল আমার প্রসাদে, [illegible] আমারই কলমের কৃপায়। [illegible] বা আমারই মনের মধ্যস্থতায়। [illegible] নের [illegible] তা অব [illegible] বহু বহু যুগের পুরানো তাদের [illegible] দ্ধির রঙ মেখে [illegible], অচ্ছেদ্য। বহু পুরুষের অনুভূতির [illegible] দা। কই, [illegible] অনুভূতি-লো [illegible] নির্দ্ধারিত হয়েছে। উপলব্ধি আবিষ্কার [illegible] একটি ধ্বনি [illegible] ব মূর্ত্ত হয়েছে ভাষায়, বোধ শব্দে। কত [illegible] হুজুর! [illegible] সে নির্ভয়ে আমি ব্যবহার [illegible] ছি।

[illegible] কই, গেল [illegible]

ক্ষুদ্র অক্ষরগুলো ক্ষুদ্রতর হয়ে উঠছে, ভাবটা এখানেই পূর্ণ করতে হবে। এই পাতাতেই তার সীমা, কিছুতেই অন্য পাতায় তাকে আমি যেতে দেব না। আমার চোখে এক-একটা পাতা যেন একটা সম্পূর্ণ জিনিস। একটা ভাব দু-পাতায় ছড়িয়ে পড়লে যেন তার ঐক্য নষ্ট হয়, তার অভ্যন্তরীণ মিল ভেঙে যায়—আমার মনের কোথায় গোপনে এমনই একটা ধারণা আছে। আমার লেখার এক একটি গ্রন্থি শেষ হয় এক একটি পাতায়। তার শেষ যতি পাতার সীমা ছাড়িয়ে অন্য পাতার শিখরে পড়লে আমার মন স্বস্তি পায় না। টেনে বুনে যে ক'রেই হোক পূর্ব্বেকার পাতায় তাকে শেষ করতেই হয়। নইলে কোথায় যেন অসঙ্গতি ঘটে ব'লে মনে হয়। অথচ পাতার কোনও মূল্য নেই, লেখার পাতা তো ছাপার পাতা নয়। এখানে যা দু পাতায় ছড়িয়ে পড়ল, ওখানে তা এক পাতাও ভ'রে তুলতে পারবে না। এখানে যার শুরু হ'ল পত্রের চূড়ায়, ওখানে হয়তো তার স্থান হবে পত্রের পদপ্রান্তে। পাতা জিনিসটা লেখার দিক থেকে অবাস্তব। শব্দসংখ্যার থেকে তো আরও বেশি অবাস্তব, যে শব্দসংখ্যা গুনে আজকালকার দিনে লেখার পরিমাণ করা হয়, অবশ্য ছাপার পাতাটা অবাস্তব জিনিস নয় (বিশেষ এখনও বাংলায় পাতা গুনেই দক্ষিণা স্থির হয়, শব্দ গুনে নয়) সেখানে 'টিপ' পাওয়ার জন্য প্রয়াস সব লেখারই আছে। আর কোনও লেখা ছাপার পাতার মাথায় সমাপ্ত হ'লে মনে হয় তা অসমাপ্ত, তবু খাতার পাতার প্যাডের কাগজের সীমাও মধ্যে রয়েল আটপেজি বা ডবলক্রাউন ষোলপেজির এক একটি পিঠে আইডিয়াকে পূর্ণতা দিতে হবে এমন পাগলামো আর কি আছে? লেখার ইউনিট হচ্ছে প্যারা, এক-একটি ভাবের এক একটি সুস্থির বাহন। আমি চাই প্যারা আর পাতার মিলন ঘটাতে অন্তত কোনও প্যারাকে অন্যে [illegible] অন্য পাতায় যেতে দি[illegible] কুণ্ঠিত। তাই পাতা শেষ হয়ে [illegible] যার [illegible]

ঠাস-বুনোনিতে ভারী। আর আমি [illegible]

টেনে সংযত ক'রে নেয়। তার মনে [illegible] বড় [illegible]

পদচারণায় পাতার সীমা ডিঙোতে বাধ্য হ[illegible]

বসলাম। সমস্ত পাতাটার দিকে প্রসন্ন চিত্তে একবার তাকিয়ে দেখলাম, তারপর অস্ফুট গুঞ্জনে পড়তে শুরু করলাম আমার লেখা পাতাটা। শব্দের ওপরে শব্দ লাফিয়ে পড়ছে, ঢেউয়ের গায়ে যেমন পড়ে ঢেউ। বাক্যের ভারসাম্য অটুট রেখে ব'য়ে চলেছে বড় ছোট মাঝারি নানা জাতের ধ্বনি। তার তাল লক্ষ্য করবার দরকার নেই, সে তাল কাটলে আমার কানে লাগবেই; আর যতক্ষণ এই অসম মাত্রার শব্দমালা সে তাল অব্যাহত রাখবে, ততক্ষণ 'ঠেকা' দিয়ে গেলেই চলবে—দেখা দরকার শুধু রাগ-রাগিণী রূপ পেল কি না। আমি প'ড়ে চললাম অস্ফুট স্বরে—পাতার শেষে এগোতে এগোতে সন্দেহ জাগল—কিন্তু রূপ? কোথায় সে রূপ? কিছু কি রূপ লাভ করেছে? রূপ তো এখনও চোখে ঠেকছে না! প'ড়ে চললাম। আমার মনের সংশয় শঙ্কায় পরিণত হতে লাগল—কোথায়, কোথায় সেই রূপ? শব্দের পরে শব্দ, ধ্বনির পিছনে ধ্বনি, তালে কাটে নি, বাক্যের গতি-ভঙ্গি বাধা পায় নি—কিন্তু রূপ? যে রূপ আমার মানস-সীমায় পদার্পণ করেছিল, কোথায় তার দেহরেখা? পাতাটা পড়া হয়ে গেল, আমি বুঝলাম, আমি তার নাগাল পাই নি। এ পাতায় তার পদচিহ্ন পড়ে নি। না, তার আভাসও আমার শব্দচিত্রে এখনও জাগে নি। পাতাটা ছেড়ে আবার দৃষ্টি গেল সামনে, মন ফিরে গেল পিছনে।

আবার আমি ফিরে গেলাম আমার চৈতন্যের রহস্যের পুরীতে, যেখানে গহন নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন থাকে অসংখ্য ভাব, অসম্ভব স্বপ্নে যেখানকার দিগন্ত ছাওয়া। ওরই হাজার মহলের এক মহলে এক বন্দিনী রাজকন্যা, কত লক্ষ লক্ষ যুগ থেকে সে অপেক্ষা ক'রে আছে—[illegible] তার ঘুমের আলস্য, কিন্তু [illegible] তার জাগরণের আকাঙ্ক্ষা—আমি [illegible] দেহের [illegible], তার সকরুণ চোখের একটুখানি [illegible]দ্ধির রঙ মেখে [illegible]গেছিল শিহরণ, আমার বুকে এসেছিল কই, [illegible] অনুভূতি-লো[illegible] আমায় উদ্ধার করতে হবে এই রাজ-[illegible] একটি ধ্বনি[illegible]তল থেকে সেই মূর্তিকে টেনে তুলতে হবে,

দুয়ার খুলে গেল। সন্ধ্যা-তারার প্রদীপে তার মহল আলো করা—কোমল, মোলায়েম, স্নিগ্ধ সে আলো, আঁধারের মত নরম, আঁধারের মতই। প্রায় আঁধারই। সামনের লেখা পাতাটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—না, সে মূর্ত্তি ওখানে নেই, ওই লেখায় মধ্যে। বরং শব্দের জালে সেখানে তার দেহাভাসও ঢাকা প'ড়ে গেছে, তার চোখের দৃষ্টিও আর ফুটে বেরুতে পায় না। চৈতন্যের এ মহল এখনও বন্ধ হয়ে যায় নি, এখনও সেদিকে তাকালে আমি তার নির্দ্দেশ পাই; কিন্তু শব্দের ধারা ব'য়ে চলেছে চৈতন্যের অন্য মহলের দিকে। সে আমাকে ব'য়ে নিয়ে চলছে আর কোন্ এক অপরিচিত দুয়ারের দিকে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য এই শব্দের খেলা—কোথা থেকে আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে এই শব্দমালা! আমি বেরিয়েছিলাম কার পিছনে, আর আমি ব'য়ে চলেছি কার সন্ধানে! কোন্ রূপ আমি চেয়েছিলাম প্রত্যক্ষ করতে, আর কোন্ অ-রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে চাইছে এই শব্দ-বন্ধনে! আবার পাতার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আমার সেই ভাবলোকের অস্পষ্ট মূর্ত্তি অস্পষ্টতর হয়ে উঠছে এই লেখায়। শুধু অস্পষ্ট নয়, তার সম্মুখে নেমেছে নূতন এক আবরণ। তার রহস্য ঘনতর হয়ে উঠতে পারে নি, বরং তার আভাস ক্ষীণতর হয়ে উঠছে: আশ্চর্য্য; আশ্চর্য্য এই শব্দ! যে শব্দের সরণী বেয়ে ভাবলোক থেকে আমার কল্পনা আসছিল রূপলোকের দিকে, তা-ই তাকে নিয়ে গিয়েছে ভিন্ন পথে, আঁধারহীন আদিম তমোলোকে—কেয়স্-এর তীরে। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য, এই শব্দ—এই আঁকাবাঁকা লেখা, ওই অক্ষরের সারে-বাঁধা ধ্বনি, যে ধ্বনি শুধু প্রতীক, আমাদের ভাবলো[illegible] সংকেতমাত্র[illegible] সে [illegible] ঢেকে দেয় তার মূল উদ্দিষ্টকে।

অথচ এই প্রতীকের আড়ালে মূল উদ্দিষ্টই দুনিরীক্ষ্য হয়ে ওঠে, এ কেমন অদ্ভুত ভাষার ছলনা! সামনেকার শব্দগুলোর দিকে আমি বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলাম, আমার ভাবলোকের দূত কেমন ক'রে আমাকে পথ-ভুলিয়ে দিয়েছে, গুলিয়ে দিয়েছে আমার ভাবকে; তা আর রূপগ্রহণ করতেই পারে নি। আমার কল্পনা যে প্রতীক আশ্রয় করলে আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য, সে প্রতীকই তাকে আচ্ছাদিত করলে, আমার মন থেকে প্রায় তাকে অপসারিত করতে যাচ্ছে। এখনও তা মিলিয়ে যায় নি, কিন্তু তার আয়োজন হয়েছে। শব্দের পর শব্দ, ধ্বনির পিছনে ধ্বনি, আমার কানের ভিতরে প্রবেশ করেছে। পটহে তাদের মৃদু আঘাত লাগছে; ঢেউ উঠছে সেখানকার ক্ষুদ্র তড়াগে, তার পার্শ্বে শুয়ে পড়ছে মাথা এলিয়ে এক একটি আণবিক কলচি (Colchi), জাগছে স্নায়ুতে কম্পন, মস্তিষ্কের শব্দ-প্রকোষ্ঠে সে স্পর্শ ফুটে উঠছে ধ্বনির লেখায়। তার সাড়া একটু একটু ক'রে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। বড়, আরও বড় হচ্ছে তার পরিধি। মস্তিষ্কের যে কোটরে এতক্ষণ ব'সে ছিল ভাবময়ী প্রথম কল্পনা, যেখানে তার ছাপ পড়েছিল, সেখানে এল এই নতুন তরঙ্গ। একটু একটু ক'রে শব্দাবেগ মুছে ফেলছে সেই পুরানো দাগ, তা ঝাপসা হয়ে উঠছে। শব্দের সঙ্গে জুড়িয়ে নতুন অস্পষ্ট, অনুদ্দিষ্ট ভাব সেখানে স্থান নেবার জন্য এগিয়ে আসছে। যে সব ভাবকে আমি চাই নি, জানি না, এই শব্দের প্রতীক আশ্রয় ক'রে তারাই এসে উপস্থিত। অথচ, এই শব্দ আমিই ডেকে এনেছি আমার জ্ঞানলোক থেকে আমার ভাবলোকের সেই অর্দ্ধস্ফুট রহস্যকে মূর্ত্ত করতে, আমার সে-ই উপলব্ধির সঙ্কেত হবার জন্যই এ কথার জন্ম, তার সৃষ্টি, আর সে আমাকেই করছে ছলনা, আমার সেই উপলব্ধিকেই দিচ্ছে অপসৃত ক'রে। এ অসম্ভব কি ক'রে সম্ভব হ'ল? এ ভাষা কি আমার নয়?

সত্যসত্যই [illegible] তটুকু [illegible] এ ভাষা! লক্ষ যুগের মানুষের বুদ্ধির রঙ মেখে [illegible] আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। কত কই, অনুভূতি-লো[illegible] একটু একটু ক'রে এর বিকাশ হয়েছে। একটি ধ্বনি [illegible] অস্থিমজ্জা। নব নব অভিজ্ঞতা নব নব ব্যঞ্জনায়

ছাড়িয়ে নতুন নতুন ইঙ্গিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এককালে যিনি ছিলেন 'রুদ্র', ঝড়, বিদ্যুৎ, মেঘের ও মরুতের দেবতা,—হয়তো যিনি ছিলেন দ্রাবিড়ের জঙ্গলে-ভরা দেশের 'রক্তবর্ণ দেব',—আজও 'শিব' বললে তিনি আমার চোখে ধ্বংসের দেবতারূপে দেখা দেন, আবার তিনিই কল্যাণময় হন। তিনিই হন সন্ন্যাসী, তিনিই আবার উমাপতি মহেশ্বর, ক্ষ্যাপা ভোলানাথ,—ডোমপাড়ায় তিনিই কুচ্‌নীর পিছনে ফিরেন। এক 'শিব' কথাটির আড়ালে তাঁর কত রূপ রয়েছে আবৃত। মানুষের কত বিচিত্র অনুভূতির বিভিন্ন উপলব্ধির ইতিহাস ওই একটি শব্দ-সঙ্কেতে জমা হয়ে আছে। এক একটি শব্দ এমনই ক'রে একাধিক ভাবের বাহন হয়ে উঠেছে। তার সামান্য অর্থ ছাপিয়েও তার ব্যঞ্জনা দূরে দূরে আমাদের প্রাণকে পৌঁছে দেয়। 'রাগ' আজ আমাদের কাছে ক্রোধ। তার সামান্য অর্থ উত্তেজনাও চলতে পারে, আর সঙ্গীতের পারিভাষিক অর্থও তার অটুট আছে। কিন্তু তার রাঙা আভা আজও লোপ পায় নি, আমাদের চোখের তারায় তা ধরা পড়ে, আর চোখেরও অতীত মনের এক দীপ্তিময় অনুভূতি ওই শব্দে এখনও আপনাকে প্রকাশিত করতে পারে, এখনও 'রাগ' শব্দটির বর্ণে ব্যঞ্জনা আছে। এমনই প্রত্যেক শব্দেরই অর্থকেন্দ্র ছাড়িয়ে তার ইঙ্গিত নানা দিকে চ'লে গেছে—মানব-অভিজ্ঞতার বিচিত্রতায় তা এমনই বিচিত্র ও বিস্তৃত হয়েছে। অর্থ তো শব্দের সামান্য গুণ, তার অসামান্য গুণ তার ব্যঞ্জনা। একই শব্দের দেহমধ্যে রয়েছে বহু অনুভূতির বহুতর উপলব্ধি। শব্দ পরিমিত, অনেক সময়েই পুরানো, কিন্তু অভিজ্ঞতা অশেষ, বিচিত্র এবং নিত্য নতুন। তাই, এই চির-নবীন ও চির-বিচিত্র উপলব্ধির জন্য শব্দের ভাণ্ডার খুঁজতে গিয়ে হতাশ হতে হয়—ঠিক সেই [illegible] এক্সপিরিয়েন্স [illegible]কাশিত হবে এমন শব্দ কোথায়? আর পৃথিবী[illegible] [illegible]ম্যাত্রেরই [illegible]ভিজ্ঞতা বিচিত্র, তার প্রত্যেক উপলব্ধিই ইউনিক। একই [illegible]র, বড় [illegible]ও দেখি, রবীন্দ্রনাথও দেখেছেন, আর শত শত লোকও দেখেন। [illegible] [illegible]খের ওপরে [illegible] বাইরের দৃশ্য যে আঘাত দেয়, সম্ভবত তা সবারই [illegible] [illegible] রকম। চক্ষুর স্নায়ু বেয়ে এ বেদনা মস্তিষ্ককোষে সঞ্চারিত হ[illegible] দিল[illegible] বাস্তব অনুভূতি, জাগে, তাও সাধারণের একই [illegible] কারও কোন[illegible] [illegible]খের দোষ' না

থাকে। কিন্তু তা থেকে যে উপলব্ধি আমি লাভ করি, তাতে মনে হয় ওর সঙ্গে আমার জীবন কেমন ক'রে জড়িয়ে আছে, ও আমার আপনার, আমার আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি অন্য ধরনের, তাঁর সে ধরনও তাঁর কবিতার মারফৎ হয়তো আমার উপলব্ধির মধ্যে অজ্ঞাতে খানিকটা মিশিয়ে আছে। শিলাইদহ কোনও চাষীর বা তারপাশার কোনও মাঝির উপলব্ধি অবশ্য আর এক ধরনের—তা থেকেও কি আমি একেবারে বঞ্চিত? কিন্তু প্রত্যেকেরই এই উপলব্ধি একটি অভিজ্ঞতায় পৌঁছচ্ছে—কেউ তা জানি, কেউ তা জানি না। আর প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই স্বতন্ত্র, ইউনিক, তার সেই অসামান্যতা আমাদের নিকট বহন করবার ভার শব্দের উপর, ভাষার উপর, কথার উপর। কিন্তু কথা যদি অসামান্য না হয়, শুধু তার সামান্য অর্থের কেন্দ্রে আবদ্ধ থাকে, তা হ'লে সে উপলব্ধির অসামান্যতাও প্রকাশ পায় না, নূতন সৃষ্টি হয় না। তার অভাবে সামান্য কথা নিয়েই কারবার করতে হয়। উপলব্ধিও তার বিশিষ্টতা হারায়, হয়ে উঠে সামান্য। জীবনে প্রতিদিন আমরা এমনই সামান্য কথায় অসামান্য অভিজ্ঞতার ধার খুইয়ে চলি। ভাবি যে, যে অভিজ্ঞতাই বুঝি সামান্য। হয়তো তাতে জীবন-যাত্রা সহজ হয়েছে, ইউনিককে অ্যাভারেজের দরে পেয়ে আমরা হাটে-মাঠে সহজে কারবার করতে পারি। এমন কি মনের এলাকায়ও যথাসম্ভব এই অ্যাভারেজ দরেই আদান-প্রদান চালাই। এতে আমরা বেঁচেছি। আমাদের জীবন সাধারণ চালে, সাধারণ ভাবে চলে। আমরা পেয়েছি একটা মানদণ্ড, অ্যাভারেজ। তা না পেলে আমরা পদে পদে ইউনিকের ঠোক্কর খেয়ে ঘায়েল হতাম, জীবন-যাত্রা অচল হয়ে পড়ত। কিন্তু এই সামান্যতার স্রোতে তবু অসামান্য [illegible]বারে তলিয়ে যায় না। হঠাৎ তা সচেতন হয়, [illegible] সামান্য [illegible]ঠতে তৃপ্ত হতে পারে না, আপনার প্রকাশ সে কামনা করে, [illegible] উপলব্ধি চায় তার ভাষা। তখন ভাষার সামান্য গুণ ছা[illegible] হঠাৎ তাতে অসামান্য দ্যোতনা দেখা দেয়, অর্থ ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনা [illegible] ধ্বনিতে আর ভাবেতে হয় স্বপ্ন-মিলন, পূর্ণ

We are such stuff
As dreams are made on, and all our life
Is rounded with sleep.

কিংবা

The still sad music of humanity.

আর আমরা ?—যাদের সামান্যের চেনা মুখ নিয়ে কারবার, তারা ? আমরা এই অসামান্য প্রকাশে কি করি ?

Then felt I like some watcher of the skies
When a new planet swims into his ken.

সত্যি সত্যিই নূতন নক্ষত্র উদিত হয়। জীবনের যত অভিজ্ঞতা নিবে গিয়েছিল তাদের আলো হঠাৎ যেন আবার দপ ক'রে জ্ব'লে উঠে, যেসব জ্যোতিষ্ক পুড়ে ছাই হয়ে গেছে হঠাৎ যেন তারা এই দীপ্তি পেয়ে নতুন জ্যোৎস্না ঢালতে থাকে।

আমার কোনও উপলব্ধিরই প্রকাশ সামান্য ভাষায় সম্ভব নয়—যে ভাষা তার অর্থের কেন্দ্রে আবদ্ধ, তা দিয়ে চলে না। শব্দের মধ্যে যে বহু দিকের ইঙ্গিত ঘুমন্ত আছে তার স্থির সন্ধান জানা দরকার, আর উপলব্ধির প্রয়োজনমত ঠিক তার সেই বিশেষ কোনটিকেই উদ্ভাসিত করতে হবে, যেখানকার সঙ্গে ওই বিশেষ উপলব্ধি জড়িত। একই শব্দে অনেক ছেঁড়া ছেঁড়া উপলব্ধির সুতো এসে গ্রন্থি বেঁধেছে। কিন্তু দরকার সেই সুতোটিকে, যেটি বিশেষ উদ্দিষ্টের দিকে আমাকে এগিয়ে দেবে, যেটি একান্তভাবে আমার এই অভিজ্ঞতাকেই নির্দ্দেশ করবে। এই একান্ত জিনিসটি পেলে আমার কথার সুতো ভাবের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলবে, তা দশ মুখে দশ দিকে ছড়িয়ে পড়বে। আর নইলে আমি কথার গ্রন্থিতে কেবলই দেব নতুন গ্রন্থি, কেবলই বাড়াব জটিলতা। তখন আমার উদ্দিষ্ট অভিজ্ঞতা ঘুলিয়ে যাবে, কথা কুয়াশার মত আবৃত ক'রে ফেলবে আমার ভাবকে, [illegible] গায়ে আসবে শব্দ, ধ্বনির 'পরে ভিড় ক'রে আসবে ধ্বনি, কিন্তু [illegible] অভিজ্ঞতার আভাস বহন করতে পারবে না, কথা বাণী হয়ে উঠবে [illegible] কথা হয়ে। কথা আর কথা, আর কথা—words, words, words.

পাতাটা ছিঁড়ে কুটি কুটি ক'রে ফেলে দি[illegible]।

১৩৩৩ গোপাল হালদার

মড়ার দেশ

সমাধিভূমি, চতুষ্পার্শ্বে বালির চরা ধুধু করিতেছে। আবেষ্টনী নিস্তব্ধতা ও কুহেলিকায় নিমজ্জিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া এইখানে মানুষ মানুষকে মাটির তলায় অন্তিম শয্যায় শোয়াইয়া আসিতেছে। যে কয়টি কবরের উপর কোন সময় ইটের স্থাপত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই কালের ধ্বংসলীলায় ভূমিসাৎ হইয়াছে। কোন কোনটায় কয়েক স্তর ইট এখনও থাকিলেও লোনায় ঝরিতেছে। যথাসময়ে স্মৃতির শেষ সম্বলটুকুও নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

মারাত্মক শীতকাল। গোরস্থানের নিকটেই অতিকায় কয়েকটি গাছ —পাতা নাই, কঙ্কালসার ভীতিপ্রদ আকার লইয়া অসাড়ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ণিমার আলো, পাতলা কুয়াশা ভেদ করিয়া কবর ও আশেপাশের বৃক্ষের শুষ্ক ডালগুলিতে আসিয়া পড়িয়াছে। গৃধিনীর বিষ্ঠায় মাঝে মাঝে ডালগুলি সাদা হইয়া গিয়াছে, চিতার অর্দ্ধদগ্ধ শবের অস্থির মত।

থাকিয়া থাকিয়া দূরে পূতি-মাংসভুক হায়েনার কর্কশ স্বর নিস্তব্ধতাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। এমনই একটি স্থানে হায়েনার আগমন-বার্ত্তার সহিত নিকটে নরকণ্ঠস্বর শুনা গেল।

মানুষ কাসিতেছিল, কাসির আওয়াজ শ্লেষ্মাপূর্ণ যক্ষ্মারোগীর মত। মৃতের সহিত মরণোন্মুখের যেন জানাশোনা চলিয়াছে। কাসি থামিতে মাটি খোঁড়ার শব্দ স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

হয়তো কাহার কবরের ব্যবস্থা চলিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও তো দেখা যায় না। রাত্রি গভীর হ[illegible]ছে, আলো না লইয়া কোন্ গ্রামবাসী এই ভয়[illegible] স্থানে [illegible]ব? যদি কোনও কারণে আলো নিবিয়া গিয়াও থাকে, [illegible]ধক মানুষকে দেখা যাইবে, কিন্তু কেহ তো নাই! তবে কি [illegible]টই হায়েনা মাটি খুঁড়িতেছে, সদ্যপ্রোথিত শবদেহকে বাহির করিয়া [illegible]নিবার জন্যই? হঠাৎ আলেয়ার আলো জ্বলিয়া উঠিতে দেখ[illegible] মৃৎখননকারী হায়েনা নহে, মানুষ, বিকলাঙ্গ—

দুইটি পাই হাঁটুর নিকট দোমড়ানো, হামাগুড়ি দিয়া চতুষ্পদের মত চলে। এই কারণে হাত দুইটা পেশীবহুল হইয়া গিয়াছে, অন্য অঙ্গের সহিত তুলনায় সামঞ্জস্যহীন দেখায়। সমাধি-খননকারী মাটি তুলিতে তুলিতে মাঝে মাঝে হিংস্র পশুর মতই চতুষ্পার্শ্বে সন্দিগ্ধভাবে দেখিয়া লইতেছে—নিশ্চিন্ত হইলে পুনরায় দ্রুত মাটি তুলিয়া যাইতেছে।

ইতিমধ্যে বুভুক্ষু হায়েনার রব দূর হইতে নিকটে আসিতেছিল। মানুষটা কবর-খোঁড়া খোন্তা আরও দ্রুত চালাইয়া দিল। মাটি বালি-মিশ্রিত হওয়ায় গহ্বর অল্পকালের ভিতর গভীর হইয়া গেল। হঠাৎ খোন্তা জোরে নরদেহ আঘাত করিল। পরক্ষণেই মানুষটি হুমড়ি খাইয়া কি পরীক্ষা শুরু করিয়া দিল। যাহা পরীক্ষা করিতেছিল, তাহা দুইটি পা—পা দুইটি নারীর পা। পায়ের উপর যেখানে আঘাত পড়িয়াছিল, সেই স্থানটিতে গভীর ক্ষত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এক বিন্দুও রক্ত নাই, বেদনার অনুভূতি নাই; পা অসাড়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটিতে রূপার চুটকি রহিয়াছে। মানুষটি সে দুইটা শুধু হাত দিয়া খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। মাংস ধাতুর মতই শক্ত হইয়া গিয়াছে, বাহির হইবে কেমন করিয়া? কিন্তু খোন্তা ছাড়াও অন্য অস্ত্র ছিল, যাহার দ্বারা চুটকি দুইটি দেহচ্যুত করিতে সময় লাগিল না। চুটকি ট্যাকে গুঁজিয়া পুনরায় নারীর দেহ হইতে মাটি সরাইতে লাগিল। অল্প চেষ্টাতেই সমস্ত দেহ মাটির আবরণ মুক্ত হইয়া গেল। চক্ষু দুইটি গহ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যে বিভীষিকা দেখিয়াছিল, তাহারই প্রতিবিম্ব মুখের প্রতিটি রেখায় স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সামনের দন্তগুলি বিকশিত, নীচের ঠোঁট বাঁকিয়া এক দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। জীবিতাবস্থায় নারী[illegible] উষ্ণ বক্ষ, মৃত্যুর পর বরফের মত শীতল এবং পাষাণের ন্যায় [illegible] হইয়া গিয়াছে। মৃৎখননকারী তাহার দেহ নত করিতে কঠিন স্তনদ্বয়ে[illegible] স্পর্শে কাঁপিয়া উঠিল, ভয়ে নয়—শীতে।

হায়েনার কর্কশ রব আর শোনা যাইতে[illegible] আলেয়ার আলোয় নিশ্চয় সে একলা মানুষটিকে দেখিয়াছে; শব্দ[illegible]র কারণ আর কিছুই নয়, শিকারের সান্নিধ্য। বাঁচা মানুষকে উহারা ভয় করিলেও একলা

পাইলে ধারালো নখ ও দন্তের দ্বারা ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহার পর নরমাংস ভক্ষণ করিয়া নিজেদের অনশন হইতে বাঁচায়।

হায়েনার নির্ব্বাক হইবার কারণ কি, খোঁড়া জানিত। অকস্মাৎ মাটি খোঁড়া বন্ধ করিয়া মুখ নীচু করিয়া বিলাতী বোর-হাউণ্ডের অনুকরণে বহুবার বিকট শব্দ করিল—একাধিক কুকুর একই সঙ্গে আততায়ীকে আক্রমণ করিবার সময় যেরূপ আওয়াজ করে, খোঁড়া তাহারই অনুকরণ করিল। হরবোলার এই অপূর্ব্ব শক্তি আয়ত্ত করিতে কতদিনের সাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল অনুমান করা শক্ত। মানুষটা কুকুরের অনুকরণে বিকট চীৎকার করিয়া বোধ হয় কতটা নিজেকে নিরাপদ ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছিল। আজ যে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সে এখানে আসিয়াছে, তাহা শুধু উদরান্নের নয়, অন্য ক্ষুধাও তাহাকে উন্মত্ত করিয়াছে। সারাটা জীবন অতৃপ্ত লালসা লইয়া সে বাঁচিয়া আছে। জীবন্ত নারীর সহজ সান্নিধ্য সে কখনও ভোগ করে নাই, কারণ তাহার মুখাকৃতি ও দেহগঠন ভয়ঙ্কর; নাক নাই, কান নাই, গা নোংরা রোগে গলিয়া গিয়াছে। গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইলে ছোট ছেলেরা ভয়ে নিকট হইতে পলাইয়া যায়। বাড়ির কর্ত্তা তাহাকে দেখিলে লাঠি লইয়া তাড়া করে। দোকানীর নিকট দাম দিয়া খাদ্য ক্রয় করিলেও লোকগুলা খাদ্য ঠোঙায় পুরিয়া দূরে রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। খাদ্য তাহাকে পশুর মতই কুড়াইয়া খাইতে হয়। খোঁড়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া যায় শবদেহ সন্ধানে। পুরুষকে তাহার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহারা গহনা পরে না। গৃহস্থ লগুড়াঘাত করিয়াই তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু রাজপুরুষ তাহাকে দেখিতে পাইলে গারদখানায় না পুরিয়া নিশ্চিন্ত হয় না। প্রহার খোঁড়া[illegible]ট সহনীয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বন্দী হইয়া বাঁচা [illegible] আতঙ্কের বিষয়। তাই সে নিজেকে দিনের আলো হই[illegible]য়া রাখে। মানুষ হইয়াও তাহার মানুষের নিকট থাকিবার [illegible]কার নাই। বাঁচার সার্থকতা কি, তাহা সে জানে না, তথাপি [illegible]র নিয়মে তাহাকে প্রাণ ধারণ করিতে হয়। অন্নের সন্ধানে মড়ার দে[illegible] সে নিঝুম রাতে ঘুরিয়া বেড়ায়। মৃতার অলঙ্কার অপহরণ তাহার পেশা—কারণ অপহরণকালে শবদেহ বাধা

দেয় না, নালিশ করে না। খোঁড়া অপহৃত অলঙ্কার অতি সাবধানে উপযুক্ত ব্যবসায়ীর নিকট সামান্য মূল্যে বেচিয়া দেয়, এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সামান্য যাহা পায়, তাহারই দ্বারা আহারের ব্যবস্থা করে, এই কারণে তাহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয় সুস্থ মানুষ ও বলিষ্ঠ কুকুরের অশুভ দৃষ্টি এড়াইয়া।

সে খুঁজিতে থাকে কোন স্ত্রীলোক মরিয়াছে কি না, সমাধির অনুষ্ঠান চলিতেছে কি না।

কবর হইতে বহিষ্কৃত রমণীকে আজ প্রাতে সে দেখিয়াছিল! যুবতীর গঠনে একটি মাদকতাপূর্ণ আকর্ষণ ছিল। কামক্ষুধাতুর পঙ্গু লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। জীবিত যুবতীর দেহস্পর্শে কোন্ জাতীয় পুলক সুস্থ পুরুষ ভোগ করিয়া থাকে, খোঁড়ার জানা ছিল না। জানিবার সুযোগও কখনও সে পায় নাই। সেই কারণে নিরালায় স্ত্রীলোকটিকে পাইয়া হঠাৎ আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল এবং চকিতে পৃষ্ঠদেশে কবর খোঁড়ার শাণিত খোন্তাটা গভীরভাবে বিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

নিশাবসানে ভোরের আলো সমাধি-ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রভাতের ক্ষীণ সূর্য্যকিরণে কুয়াশা অপসৃত হইতে দেখা গেল, দীর্ঘকায় বৃক্ষের আঁকাবাঁকা সরীসৃপের মত শিকড়ের নিকটে উন্মুক্ত কবর, আর দুইটি দেহের সম্পূর্ণ কঙ্কাল।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

কিন্তু—

হেথা জীবিতের [illegible] লেগেছে খাওয়াখাওয়ি সাধনা,
রাঁধনা, বাঁধনা-চুল, না[illegible] উন্মাদনা।
কাঁদনার ছাঁদ নানা, আরা[illegible]ঘুরে—
রগ্তানি বেশি চেয়ে যতখানি হয় [illegible] না।
অতএব, মড়াখেকো জীবিতেরা তবু [illegible] সুখে তো,
যারে লয়ে কারবার অন্তত তার নাই [illegible]।

ডায়ালেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌

(Greek Philosophers, Hegel, Marx ও Feuerbachকে)

আকাশ আঁধার হ'ল, দীপশিখা কাঁপিছে তিমিরে,
কুটিরের কোণখানি কেঁপে কেঁপে করিতেছে আলো ;
সহসা আসিলে, ঝড়, আলোড়ি জীবন-বারিধিরে,
আকাশের অন্ধকার এলে আরো করিয়া ঘোরালো—
কাঁপে ভীরু গৃহদীপ, তারেও তো বাসি আমি ভালো।

ঝড়, মোরে দয়া কর, নাহি হব নীড়হারা পাখী,
শাখার আশ্রয় ত্যজি আকাশে উড়িব সাধ্য নাই
শঙ্কিত শাবকদলে বহুযত্নে কুলায়েতে রাখি
ক্লান্ত পক্ষে করি ভর নভোনীলে দিশা না হারাই।
লাগিলে তোমার ছোঁয়া ফিরিবার পথ নাহি পাই

সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে যুঝিয়াছি এই বুক পাতি,
ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রাঘাতে হেলা করি বাঁধিয়াছি ঘর,
জটিল অরণ্যশাখে যাপিয়া অনেক দীর্ঘ রাতি
মিলেছে সাথীর দেখা, মিলিয়াছে মন্ত্রের স্বাক্ষর।
তুমি নাড়া দিও নাকো [illegible] থাকো সর্ব্বনাশা ঝড়

শিখেছি বাসিতে [illegible]া, বুঝিয়াছি ঘর ও বাহির,
জেনেছি, আপন[illegible]র বহু জন্মে বার বার মরি।
অনুভবে বুঝি[illegible]ছি আছে বিধি এই ধরিত্রীর—
ধরিলে যায় না ধরা, মনে শুধু নাম-জপ করি।

তোমার গর্জ্জন-বাণী, ঝড়, আমি বুঝিতে যে পারি—
আশাহীন, গৃহহীন ক্ষুব্ধ তব গতি অবিরাম ;
অবিশ্রাম ডাকিতেছ, "এস, এস, সুখনীড় ছাড়ি,
আরামের পঙ্ককুণ্ডে জীবনের মিলিবে না দাম—
সুখ নয়, শান্তি নয়, নিঃশেষে মরণ এর নাম।"

যুক্তির নাহিকো পার, নিঃশ্বাসের নাহি কোনো দায়,
জীবনেরে ভালবাসি, মরণেও নাই তাই ভয়—
আশা, বাসা যদি ভাঙো, বলু তবে ভালবাসা যায় ?
মৃত্যু আনো, ক্ষতি আনো, শুধু তুমি এনো না সংশয়
মিলনেরে ভয় করি, সংগ্রামে ঘটুক পরিচয়।

আকাশ-বিলাসী

মৃত্তিকায় স্থান জানি তবু আমি আকাশ-বিলাসী ;
শ্মশানে বসিয়া থাকি অমারাত্রে শবাসন 'পরে
অমৃত আকাঙ্ক্ষা করি ; ইন্দ্রত্বের আমি অভিলাষী
রিক্ত দীন দরিদ্র তাপস ; অবিচল নিষ্ঠা-ভরে
অসম্ভব স্বপ্ন দেখি। নহি আমি সামান্য শিকারী,
ভূমারে করেছে বন্দী জাল মোর, মোর তীক্ষ্ণ বাণে
পশু নয়—পশুপতি আহত যে ; কৃপার ভিখারী
দেবতা আপনি আসি তুষ্ট মোরে করে বর-দানে।
আমার আদর্শ-লোকে [illegible] হয় কল্পতরু,
বশিষ্ঠ তপস্যা করে, বি[illegible]মানে পরাজয়,
জানি আমি যাব সেথা উল্ল[illegible]গিরি, মরু ;
অনিবার্য্য গতি মোর মানিবে না কোন বিঘ্ন-ভয়।
জরায় জর্জ্জর দেহ যৌবনের টীকা[illegible] শোভে,
পঙ্কস্নান করি আমি শতদল পঙ্কজের [illegible]ভে।

"বনফুল"

ইঞ্জিন

প্রায় ছয় মাস হইতে চলিল। শরীরটা কিছুতেই ভাল হইতেছে না। গায়ে বল পাই না, ভাল ঘুম হয় না, পরিপাকটাও ঠিকমত হইতেছে না। প্রথমটা পাড়ার ঘনশ্যাম ডাক্তারের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইয়াছিলাম, কোন ফল হইল না। কিছুদিন কবিরাজিও করিয়াছি। বর্ত্তমানে অ্যালোপ্যাথি চলিতেছে। আমাদের চিকিৎসা সাধারণত যে পর্য্যায়ে হইয়া থাকে, অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমিক, কবিরাজি, অ্যালোপ্যাথি, মাদুলি, স্বস্ত্যয়ন, আমিও অনেকটা তাহাই অনুসরণ করিতেছি। ডাক্তার বলে, আপনার অসুখ ওষুধে সারবে না। স্থান-পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আর দরকার ভাল খাওয়া।

তাহা তো বুঝিলাম। স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, প্রথমে চাই ছুটি। অফিস ছুটি দিবে না। ছুটি দূরে থাকুক, রবিবারে কাজ করিতে পারিলেও ভাল হয়। তারপর কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে সপরিবারে বাস করিতে যে ব্যয়ের প্রয়োজন, তাহারও সংস্থান নাই। সুতরাং ও ব্যবস্থা পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই দ্বিতীয় ব্যবস্থাটার সম্বন্ধে একটু অবহিত হইয়াছি। সুপাচ্য সুখাদ্য খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। ডাক্তারের ব্যবস্থা—দুধ, ঘি, মাখন, ছানা, মাংস, ডিম, বেদানা, বাদাম, পেস্তা ইত্যাদি। এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে আমার পক্ষে এই সকল দ্রব্য আহরণ অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে। তথাপি মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু সংগ্রহ করিতেছি এবং নিজেকে ও ডাক্তারকে সান্ত্বনা দিতেছি।

একদিন অফিস হইতে ফিরিবার পথে শরীরটা একটু বেশ খারাপ মনে হইতে লাগিল। সেদিন পকেটে কিছু ছিল, তাহাই দিয়া কিছু মাখন, গোটা দুই আপেল, কিছু আঙুর, কিছু খেজুর প্রভৃতি কিনিয়া বাসায় ফিরিলাম। গৃহিণীকে বলিলাম, আজ আর ভাত-টাত কিছু খাব না। এই নাও, এইগুলো ঘরে একটু গুছিয়ে দিও—কিছু এখন, কিছু রাত্রে।

রাত্রে আর কিছু না খেলে চলবে?

চলবে।

আমি মধ্যে মধ্যে যে সব জিনিস পথ্য হিসাবে কিনিয়া আনি, তাহা রোগীর পথ্য হইলেও সুস্বাদু আহার্য্য। সুতরাং তাহার প্রতি ছোট ছেলেমেয়েদের লোভ খুবই স্বাভাবিক। খাইবার সময়ে প্রায়ই কিছু কিছু ভাগ দিতে হয় ওই ছেলেমেয়ে দুইটিকে। গৃহিণী বলেন, ওই তো সামান্য জিনিস। ওর থেকে ওদের দিতে গেলে তোমার থাকবে কি?

আমি বলি, সামনে পড়ে। বোঝই তো!

সেদিন আমি আর কিছু খাইব না বলিয়া গৃহিণী আমার আনা সবগুলি জিনিসের সবটাই আমার জন্য গুছাইয়া দিলেন। আমি খাইতে বসিলাম। মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া বায়না ধরিল, আঙুর খাব।

গৃহিণী ধমক দিয়া বলিলেন, যা এখান থেকে।

খুকী কাঁদিয়া পুনরায় বলিল, আমি আঙুর খাব।

গৃহিণী বলিলেন, যা এখান থেকে, নইলে মার খাবি। যা।

খুকী তবু আবদার করে আমি আঙুর খাব।

আমি গৃহিণীকে বললাম, এই নাও, এই চারটে আঙুর দাও ওর হাতে।

না, ওই তো জিনিস। ওই খেয়ে তো থাকতে হবে তোমাকে। তুমি খাও। আমি খুকীকে নিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে।

না না। তুমি দাও এ চারটে আঙুর ওর হাতে।

কেন তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ? ওরা তো খেয়েই থাকে। তোমার দরকার কত বেশি। ইঞ্জিনে কয়লা না দিলে, সমস্ত গাড়িই যে অচল হয়ে যাবে। বোঝ না কেন [illegible] খাও।

গৃহিণী রোরুদ্যমান খুকীকে [illegible] গিয়া একটা ছোট বাটিতে কিছু মুড়ি এবং গুড় দিয়া বসাইয়া দিলেন। খানিকক্ষণ কান্নাকাটি করিবার পর খুকী মুঠা মুঠা করিয়া তাহাই খাইতে লাগিল এবং ছড়াইতে লাগিল।

আমি আস্তে আস্তে ইঞ্জিনে কয়লা দিতে লাগিলাম।

সংবাদ-সাহিত্য

ইংরেজী ১৩ এবং বাংলা ৪৯-এর সংমিশ্রণে যে বৎসর আবির্ভূত হইয়াছিল, আর এক মাস পরেই তাহার তিরোধান ঘটিবে। পাশ্চাত্য অমঙ্গল এবং প্রাচ্য উন্মত্ততা মিলিয়া আমাদিগকে যে নাড়া দিয়া গেল, সাড়ে চারি মাস পরে আমরা তাহার ফল ভোগ করিব কি না, শ্রীশ্রীচেতাবনীই বলিতে পারেন। আগামী বৎসরে উনপঞ্চাশ হইতে পঞ্চাশে পা দিয়া প্রাচ্য বাতুলতাটুকু হয়তো কাটিয়া যাইবে, কিন্তু পাশ্চাত্য অমঙ্গল যেমনকার তেমনই রহিয়া গেল যে!

* * *

ওয়াকিবহাল মহল সন্দেহ করিতেছেন, ভারতবর্ষে অচিরকাল মধ্যে লেবুর (মোসাম্বি) রস সম্পর্কে একটি অর্ডিন্যান্স জারি হইবে।

* * *

বাংলা দেশে চালের দর সাংঘাতিক হইয়াছে। সায়েস্তা খাঁ এক দিনেও সায়েস্তা না হইয়া থাকিলে আমরা নাচার। কয়েক শতাব্দী পরে ফজলুল হকের আমলও হয়তো সমান প্রসিদ্ধ হইবে, কে জানে!

* * *

গবর্মেণ্ট কণ্ট্রোল বা "কায়দা" করিয়া যে উদ্দেশ্যে চালের দর বাড়াইতেছেন, সে উদ্দেশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ধরিতে পারিতেছেন বলিয়াই দেশে এখনও অশান্তি দেখা দেয় নাই। দেশবিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসার অতিরিক্ত এই জাতীয় কৌশল অবলম্বন করিয়া অনেক সময় অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। একবার একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার (যুবতী) কনুইয়ের কব্জায় হঠাৎ খিল ধরিয়া যাওয়াতে তিনি "বাধ্যত[illegible]" ভাবে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পড়েন। ডাক্তার বাঁড়ুজ্জে 'কল' পাইয়া তো[illegible]লেন, রোগিণীকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, হুঁ। খানিক পরেই ডাক্তারের হুকুম হইল, মাত্র রোগিণী ও তিনি একটি ঘরে থাকিবেন, আর কেহ নহে। কিয়ৎকাল পরে ডাক্তারের আহ্বানে রোগিণীর আত্মীয়স্বজনরা ঘরে ঢুকিয়া অবাক। রোগিণী ঘোমটা টানিয়া অধোবদনে শুধু দাঁড়াইয়া নাই, অধোবাহুও হইয়াছেন, অর্থাৎ কনুইয়ের কব্জা আবার কাজ করিতেছে। ডাক্তার কি কৌশলে রোগিণীর হাতটিকে পুনরায়

কার্য্যক্ষম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ইহা যাঁহারা বলিতে পারিবেন, বাংলা দেশ ও আসামে চালের দর বাড়াইবার রহস্য তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। না হয়, আর একটু খোলসা করিয়াই বলি। কবি কালিদাস উচ্চতার দিক দিয়া হিমালয়কে পৃথিবীর যাহা বলিয়াছেন, আহার্য্য-ভাণ্ডার হিসাবে আমরা ব্রহ্মদেশকে মাতা ধরিত্রীর তাহাই বলিতে পারি। সেখানে চাউলের প্রাচুর্য্য ও স্বল্পমূল্যতা সর্ব্বজনবিদিত। বাংলা দেশ ও আসামে চাউল যতই দুর্ম্মূল্য হইবে, ব্রহ্মদেশ পুনরাধিকারের সম্ভাবনাও তত বাড়িবে, ডাক্তার বাঁড়ুজ্জের মত ইঙ্গিত-কৌশল প্রদর্শন করিতে পারিলেই কাজ হইবে, সৈন্যসামন্ত গোলাবারুদের আবশ্যক হইবে না। যে পথ দিয়া ইভ্যাকুয়ীরা আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়াই বুভুক্ষু বাঙালী ও আসামী বীরেরা ব্রহ্মদেশে বিজয়-যাত্রা করিতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং চাউলের মূল্য বৃদ্ধিতে আমাদের মত দূরদর্শী যাঁহারা, তাঁহারা খুশিই হইতেছেন।

গোপালদা "মহাত্মা গান্ধী ও 'বাংলা' দেশ" শীর্ষক একটি থিসিস প্রস্তুত করিতেছেন। শুনিয়াছি সুভাষচন্দ্র বার্লিনে আছেন; সুতরাং পরীক্ষকের অভাবে উহা বাতিল হইবার আশঙ্কা আছে। থিসিসটিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই বিষয়গুলি নূতন সংযোজিত হইয়াছে।—১। অনশনের কালে বাঙালী-কন্যা সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়-নাইডু আগা খাঁ প্রাসাদের হেঁসেল তদারক করিয়াছিলেন, ২। বাঙালী চিকিৎসক বিধানচন্দ্রের হাতে চিকিৎসিত হইবার আকাঙ্ক্ষা গান্ধীজী স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছিলেন, ৩। অনশনের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি কয়েকটি বাংলা কথা বলিয়াছিলেন, এবং ৪। অনশনভঙ্গকালে সরোজিনী 'গীতাঞ্জলি' হইতে একটি গান আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

* * *

খবর পাওয়া গেল, ওয়াশিংটনে 'রক্তকরবী' অভিনয়ের আয়োজন হইতেছে; রাজার ভূমিকায় মার্শাল টিমোশেঙ্কোর নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাঁহার আমেরিকা যাওয়া সম্বন্ধে একটি সংবাদও প্রচারিত হইয়াছিল।

আমেরিকার দুইটি সভায় মাদাম চিয়াং কাইশেককে মূর্চ্ছা যাইতে দেখিয়া হলিউডের কয়েকজন তারকা-অভিনেত্রী শঙ্কিত হইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর অনশনকালে প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট ও প্রিমিয়ার চার্চিলের মধ্যে টেম্পারেচার-বিনিময় হইয়াছিল।

বোকাচ্চিও প্রণীত 'ডেকামেরনে'র একটি গল্পে একটি বৃক্ষের বিশেষ গুণ বর্ণিত হইয়াছে—তাহাতে আরোহণ করিয়া নিম্নে দৃষ্টি করিলে আরোহণকারী নানা অসম্ভব দৃশ্য দেখিতে পায়। আধুনিক সভ্যযুগের অস্বাভাবিক আইনের ভয়ে উক্ত বৃক্ষপ্রসঙ্গ বিশদভাবে বলা চলিবে না। বর্ত্তমান জগতে আমরা অনুরূপ একটি বৃক্ষের সন্ধান পাইতেছি—তাহার নাম মস্কো। উক্ত বৃক্ষের গুণাগুণ আমেরিকান রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের উপরেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ইঁহারা মস্কো-বৃক্ষে আরোহণকালে যাহা দেখিতে পান, বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলে আর তাহা দেখেন না। প্রমাণ, গত বৎসরে মিঃ উইল্কির বিবৃতি এবং এই বৎসরে গত ৯ মার্চ তারিখে মস্কো হইতে অ্যাডমিরাল ষ্ট্যাণ্ডলির উক্তি। উইল্কি গাছ হইতে নামিয়া তাজ্জব বনিয়া গিয়াছিলেন, ষ্ট্যাণ্ডলিও বনিবেন।

অ্যাডমিরাল তোজো তেজের সহিত বলিয়াছেন, এই বৎসরেই যুদ্ধ শেষ হইবে। যুদ্ধের গতি ভারতবর্ষে প্রচলিত সংবাদপত্র মারফৎ যাহা বুঝিতেছি, তাহা হইতে তোজোর কথার সদর্থ একমাত্র ইহাই হয় যে, এই বৎসরে জাপান সন্ধি করিবে। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা এই, মিত্র জার্মানির বিসমার্ক নামাঙ্কিত উপসাগরে জাপানী ডুবিতে বাধ্য হইয়াছে। কবি কিপলিঙের কথাই শেষ পর্য্যন্ত ঠিক—

"পূর্ব্ব হয় পূর্ব্ব আর পশ্চিম পশ্চিম,
দুয়ের মিলন হতে খাবে হিমশিম।"

অনুবাদ আমাদের; হিমসিম আমরাও কম খাইতেছি না।

শেক্সপীয়ার লিখিয়াছেন—

"Cowards die many times before their death"

কাপুরুষদের কথা বুঝিলাম, কিন্তু মৃত্যুর পরে হিরোদের যে কি দুরবস্থা হয়, তাঁহারা যে ফিরিয়া ফিরিয়া কতবার মরেন, স্বয়ং একজন হিরো ছিলেন বলিয়া মহাকবি, সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। চোখের উপরে একজন হিরোকেই মরিতে দেখিয়াছি—তিনি রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে তাঁহার প্রাত্যহিক মৃত্যু অতিশয় ক্লেশকর ঠেকে। পার্সীরা টাওয়ার অব সাইলেন্সে শকুনি-গৃধিনীদের হাতে আত্মীয়স্বজনের শবদেহ একেবারেই সমর্পণ করিয়া সম্ভবত এই জাতীয় ফাঁড়া চিরতরে কাটাইয়া দেন। বিশ্বভারতী অনুরূপ কোনও ব্যবস্থা এখনও করিতে পারেন না কি?

* *

ভগবান বা ঠাকুর-দেবতার নাম লইয়া চোরে চুরি করিতে বাহির হয়, জুয়াচোরে লোক ঠকায়। রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভালবাসি তিনি ভগবান ছিলেন না বলিয়া। সুতরাং চোর-জুয়াচোরেরা তাহাদের হেয় প্রয়োজন-সাধনের জন্য তাঁহার নাম ব্যবহার করিলে অসহ্য বোধ হয়। সম্প্রতি ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট বা জাতীয় সমর শক্তি কর্তৃক প্রকাশিত একটি জাপ-বিতাড়ন-বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের নাম অকারণে ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নোগুচিকে যে খোলা চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স্বভাবতই চীনের প্রতি জাপানের নৃশংসতার উল্লেখ আছে। অপ্রাসঙ্গিক ভাবে চিঠির সেই অংশ তুলিয়া জাপানের সহিত লড়াইয়ের কাজে লাগানো শুধু অন্যায় নয়, অধর্ম। রবীন্দ্রনাথ নোগুচির নিকট "বৃহত্তর মানব-ধর্ম্মে"র দোহাই পাড়িয়াছিলেন। ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট চিঠির সেই অংশটি রবীন্দ্রনাথের চিত্রসহ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"আজ গুরুদেবের এই 'বৃহত্তর মানবধর্ম্মে' নিজেকে দীক্ষিত করুন। ব্যক্তিগত সকল আদর্শবাদ বিসর্জ্জন দিন। দেশের বাইরে জাপানীদের ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য আপনার সাধ্যায়ত্ত সকল প্রকারে, এমন কি বৃটিশকেও সাহায্য করুন।"

"গুরুদেব" তো সামান্য সম্বোধন, ইঁহারা যে প্রয়োজনের খাতিরে রবীন্দ্রনাথকে "বাবা" সম্বোধন করেন নাই, তাহাই রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য বলিতে হইবে।

যে কোনও জাতির বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য এ যুগের যে কোনও লেখকের রচনা হইতে কন্‌টেক্‌স্‌ট বিবর্জ্জিতভাবে কোটেশন সংগ্রহ মোটেই দুরূহ নয়। সুখের বিষয়, বোম্বাইয়ের ঠাকুর-সোসাইটি ন্যাশনাল ফ্রণ্টের এই কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন। বিশ্বভারতী হইতেও প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

মৃত্যুর পরে উপরে উল্লিখিত অপমৃত্যু গ্লানিকর হইলেও অশাক্ত নয়; রবীন্দ্রনাথকে বেল্টের নীচে বীভৎস মার মারিয়াছেন বাংলা দেশের একটি সুপরিচিত আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান; একটি বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ছাপাইয়া তাঁহারা তৎসহ লিখিয়াছেন :—

"দাও রবীন্দ্রনাথের মত সন্তান।...বিবাহিত ও অবিবাহিত নির্বিচারে স্বাস্থ্যই নারীর রূপ এবং সেই স্বাস্থ্য প্রধানত নির্ভর করে সুস্থ ও নিয়মিত রজঃস্রাবের ওপর!"

এই বিজ্ঞাপন-পাঠের পর বাংলা দেশের মেয়েদের উচিত জাতিগতভাবে বাধক কামনা করা। গর্ভস্রাবের দল বাড়াইয়া কি হইবে? যে সকল পত্রিকা উক্ত বিজ্ঞাপন ছাপিয়াছেন তাঁহারাই বা কি।

* *

সুতরাং লণ্ডনে প্রস্তাবিত "টেগোর ইন্‌ষ্টিটিউটে"র সভ্য হিসাবে রবীন্দ্র-বিরোধী ইথেল ম্যানিন ও "অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ডক্টর ঘোষে"র নামোল্লেখে কলিকাতার শ্রীযুক্ত অমল হোমের প্রতিবাদে (১৪ই মার্চের সংবাদপত্রে) আমরা বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হই নাই। এই দেশের লোকের সহিত যখন "শান্তি-নিকেতনের বিশ্ববিদ্যালয়" সহযোগিতা করিতে বাধ্য হইতেছেন, তখন উক্ত "টেগোর ইন্‌ষ্টিটিউট"ই বা কি দোষ করিল? আগ্রার শ্রীদুর্ম্মুখ শর্ম্মা স্থানীয় "বেঙ্গলী ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাবে"র আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় (গত সরস্বতীপূজা উপলক্ষে) রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস" কবিতাটির লাঞ্ছনা-দৃষ্টে যে পত্রাঘাত

করিয়াছেন, তাহাও আমাদের সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বোধ হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে কি ভাবে একদিন রাজা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাসও তো সেদিন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের "আশুতোষ হলে" অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-পরিষদের উদ্বোধন-সভায় শুনিয়া আসিতে হইল! যদি বাঁচিয়া থাকি এবং চেতাবনী মতে সত্যযুগ না আসে, তাহা হইলে আরও কত নিগ্রহই যে কপালে আছে, কে জানে!

রোগীর রোগ যখন ধরা পড়িল, তখন আনুষঙ্গিক একটি উপসর্গ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। চিকিৎসকেরা মূল রোগ সারাইবার দিকে একান্ত দৃষ্টি দিতে গিয়া উপসর্গটি উপেক্ষা করিলেন, ফলে রোগী আসল রোগ হইতে আরোগ্যের পথে গিয়াও মারা পড়িল। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। সমগ্র ভারতবর্ষের কথা জানি না, আমাদের বাংলা দেশ উপসর্গের ঠেলায় মরিতে বসিয়াছে—বাঁচিবার কোনও আশা নাই। চিকিৎসক-রূপী কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের ব্যাপারে মাতিয়া খাদ্যাভাব-রূপ উপসর্গকে অবহেলা করিতেছেন—ইহা বলিলে সত্য কথা বলা হইবে না; উপসর্গটিকেই সাংঘাতিক করিয়া তুলিবার জন্য চারিদিকে প্রাণপণে আয়োজন চলিতেছে। বাংলা দেশে অবাধ লোভের এমন বিরাট মহিমা আর কখনও দেখা যায় নাই। "টপ টু বটম" সবাই টাকা মারিতেছে, বহু ভাগ্যবান দরিদ্র এই ঠেলায় ধনী হইয়া গেল। গল্পে আছে, রাজার দুধে জল মিশ্রণ নিবারণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবার পরে দুধের সঙ্গে শ্যাওলা পর্যন্ত রাজাকে হজম করিতে হইয়াছিল। তত্ত্বাবধায়কের ঘুষের বরাদ্দ বজায় রাখিতে গিয়া দুধে জলের বরাদ্দ স্বভাবতই বাড়াইতে হইয়াছিল। এখানেও এখন চারিদিকে লোক-দেখানো যত বাঁধাবাঁধি হইতেছে, আমাদের দুরবস্থার পরিমাণ ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। কারণ, যত অধিক লোক নিযুক্ত হইতেছে তত অধিক লোকের আত্মীয়স্বজন, অনুগৃহীত বন্ধুবান্ধবের সুবিধা করিয়া দিতে গিয়া সাধারণের অভাব তত বাড়ানো হইতেছে। তাহা ছাড়া "কায়দা" করিতে আসিয়া যাঁহারা সাধারণকে বেকায়দায় ফেলিতেছেন, তাঁহাদের বেতন যোগাইতেই

তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে। ইহা অপেক্ষা কণ্ট্রোলহীন অব্যবস্থায় সমস্ত ব্যাপারটা রাখিয়া দিলে এই সকল সাধু কর্ম্মচারীদের মাহিনা বাবদ সমস্ত টাকা সাধারণের খাতে জমা তো হইতই, চোরের সংখ্যা কম হওয়াতে সাধারণের ভাগে মালও বেশি পড়িত। এখন চারিদিকে কি লজ্জাকর ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা দেখিয়া লজ্জা পাইবার মত একজন সাধু লোকও কি বাংলা দেশের ভাগ্যবিধাতাদের মধ্যে নাই? এই কথাগুলি অত্যন্ত ধিক্কারের সঙ্গেই বলিতেছি, কারণ, এই সকল চোরেদের অধিকাংশই আমাদের স্বদেশীয়। আমরা চিরটা কাল মরিতে বসিয়াও চুপ করিয়া থাকিয়াছি বলিয়া যুগে যুগে আমাদের মৃত্যুটাই সহজ হইয়াছে। চুপ করিয়া মরাই আমাদের উচিত ছিল। কিন্তু বাংলা দেশের চারিদিকে যে অকথিত দুরবস্থা চোখ মেলিয়া দেখিতেছি, তাহাতে শাসনের ভয়েও আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। চুপ করিয়া থাকিলে শাসন-কর্ত্তাদেরও অমঙ্গল কম হইবে না। রুদ্ধ আগুন ফাটিয়া বাহির হইয়া সমগ্র দেশে আগুন জ্বালিতে পারে। কণ্ট্রোলের প্রহসন গবর্মেণ্ট এখনও যদি ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে আমাদের মত বহু নিরীহ প্রজাই অবাধ্যতা করিয়া চেঁচাইতে বাধ্য হইবে।

*

এই প্রহসনের একটা দৃশ্য মনে পড়িতেছে।—কিছুকাল পূর্ব্বে, "খাদ্যশস্য বাড়াও" শীর্ষক একটি সরকারী প্রদর্শনীতে আমরা কয়েকজন সাংবাদিক নিমন্ত্রিত হইয়া চা কেক পুডিং খাইয়া আসিয়া সরকারের এই চেষ্টার তারিফ করিয়াছিলাম। তখন শুনিয়াছিলাম, সারা বাংলা দেশে ইহারা ১৮ লক্ষ টাকার বীজধান দরিদ্র চাষীদিগকে ধার দিবেন। ফসল যা[illegible] চাষীরা এই ধান শোধ করিবে। হঠাৎ সেদিন কৌতূহল হইল। সন্ধান লইয়া জানিলাম, প্রত্যেক চাষীকে এক মণ হিসাবে ১৮ লক্ষ টাকার বীজধানই বাংলা দেশে বণ্টিত হইয়াছে। প্রশ্ন করিলাম, চাষীরা ধার শোধ দিয়াছে কি? জবাব পাইলাম—"না"। কেন নয়? "দুই-একজন ভাগ্যবানের ভাগ্যে ছাড়া হাজার করা ৯৯৯ জন চাষীর ক্ষেত্রে বীজধান ফসলে পরিণত হয় নাই। সমস্তই বরবাদ হইয়াছে।" প্রশ্ন

করিলাম, টাকাটা তাহা হইলে গবর্মেণ্টের গেল? জবাব পাইলাম, "পাগল! প্রত্যেক চাষীর হিসাবে ৳ মণ সুদ সহ ১৳ মণ ঋণ লিখিত হইয়াছে; জমিনাদির ক্রোকে ফেলিয়া এই ঋণ আদায়েরও ব্যবস্থা হইবে।" অর্থাৎ প্রজারা মরিল, মাঝ হইতে কয়েকজন ফন্দিবাজ (যাঁহারা বুদ্ধি করিয়া বাজে বীজধান খরিদ করিয়াছিলেন) লাভবান হইয়া গেল।

এইরূপ ব্যাপার সর্ব্বত্রই ঘটিতেছে। কত দৃষ্টান্ত দিব? গোপালদা "গ্যাংগ্রীন, গ্যাংগ্রীন" বলিয়া পথে পথে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু পা নয়, হাত নয় যে, কাটিয়া ফেলিয়া পচন নিবারণ করিব। আমাদের মাথায় গ্যাংগ্রীন হইয়াছে। মৃত্যু আমাদের অবধারিত।

কাগজের বাজারের কদর্য্যতা প্রকাশ করিয়া বলিব না, লোকে বিশ্বাস করিবে না; কারণ কাগজ সাধারণের খাদ্য নয়। এ দুঃখ আমরা একা একা ভোগ করিতেছি। দেশের মালিকরা দেশের অবস্থা এমনই অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন যে, আজ যাঁহারা জেলে গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে হিংসা হইতেছে। আমাদের ভাতে মারিয়া কাগজের পনরো আনা কণ্ট্রোল করিয়া গবর্মেণ্ট সেই কাগজে যে লজ্জাকর প্রচার-কার্য্য চালাইতেছেন, তাহার প্রতিবাদ করিবারও লোক নাই। "গ্রো মোর ফুডে"র প্রচার-পত্র পড়িয়া দেখিলে মনে হইবে, বাংলা দেশে চাষ করিবার মত আর তিলার্দ্ধ স্থান অবশিষ্ট নাই। এমন কি, শাসন-পরিষদের সভ্যদের অসার মস্তকে চাষের কাজ চালানো যায় কি না, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাও ভাবিয়া দেখিতেছেন। রুশিয়া অথবা আমেরিকায় বাংলা দেশের এই সুজলাং সুফলাং মূর্ত্তি প্রকট করিতে [illegible] বাংলা দেশের সর্ব্বনাশ সাধন সহৃদয়তার চূড়ান্ত বটে! দেশের মৃতপ্রায় লোকের কাছে প্রত্যহ প্রত্যেক দৈনিকপত্রে নানাবিধ কেরামতির বিজ্ঞাপন দেখাইয়া যে টাকাটা ব্যয় হইতেছে, সেই টাকা দিয়া চাল অথবা বস্ত্র কিনিয়া বিতরণ করিলে আমরা সরকারের আরও বেশি স্তাবকতা করিতে পারিতাম। ইহার উপর মেদিনীপুরের কথা আর তুলিব না। গান্ধীজীর মৃত্যু হইলে আমাদিগকে কি করিতে হইবে, সে উপদেশ আমরা

বিস্তারিত পাইয়াছে; কিন্তু আমাদের মৃত্যু হইলে আমাদের পরিবারেরা কি করিবে, সে উপদেশ দেওয়ার লোক নাই। বিধবা-বিবাহও এদেশে ব্যাপক-ভাবে চলিল নাই।

'নির্বাণে' শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী কবিগুরুর "ইউরিনিমিয়া"র কথা যখন লেখেন, তখন ভাবিয়াছিলাম মুদ্রাকর-প্রমাদ। গান্ধীজীর উপবাসের পর এখন মনে হইতেছে ওই ব্যাপারটার মূলেই গোল আছে। নহিলে ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে' গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের খবরে বাহির হইল কেন—"evidence of euremia", এবং "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড"ই বা কেন লিখিলেন, "evidence of euraemia"—কথাটা যখন "uraemia"। সরকার বাহাদুর এবং ইংরেজ ডাক্তারেরাও এই ভুলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। মনে হইতেছে, এক্ষেত্রে সব মিয়াই সমান।

বাপের পয়সা থাকিলে, যেমন গাধাতেও সম্পাদক হইয়া মাসিকপত্র বাহির করিতে পারে, তেমনই মগজে বুদ্ধি থাকিলে সার্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের মত পিউরিটানের ঠিকানা হইতে প্রকাশিত মাসিকপত্রেও চরম অশ্লীলতাও করা যায়। যেমন শ্রীযুক্ত দুলাল বসু মাঘ-ফাল্গুনের যুক্ত সংখ্যা 'অলকা'য় করিয়াছেন—

"হঠাৎ কখন ঝড়ের জোয়ার আসে
লাল বেদুঈন দস্যুর মত ছুটে আসে লু-সওয়ার
বিক্ষত বুকে ওড়নার জোড় লাগে
বিক্ষত কুমারীত্ব আবার বেমালুম জুড়ে যায়!"

মেয়েদের বেলা এই সুবিধা আছে বটে, কিন্তু ছেলে বখিয়া গেলে সামলানো কঠিন হয়।

স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি, আমাদের গুরুতর অপরাধ হইয়াছিল। মাঘের 'শনিবারের চিঠি'র "সংবাদ-সাহিত্যে" আমরা বাক্তি রাখিয়া 'কবিতা'র

কবিতা প্রকাশের মিথ্যা গল্প প্রচার করিয়াছিলাম, পরে জানিতে পারিলাম তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত অমিতাভ সেন সিরিয়াস্লি কবিতা লিখিয়া 'কবিতা'য় পাঠাইয়াছিলেন এবং বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ও ইয়ার্কিহীন গাম্ভীর্য্যের সহিত তাঁহার দুইটি কবিতা গত কার্ত্তিকের 'কবিতা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন। আরও কয়েকটি মনোনীত করিয়াছিলেন—এরূপ সংবাদ পাইয়াছি। আমাদের ভ্রান্ত প্রচারে বুদ্ধদেববাবু সন্ত্রস্ত হইয়া সেগুলির প্রকাশ স্থগিত করিয়াছেন। আমরা পরে গম্ভীরভাবে পড়িয়া দেখিলাম, "মৌরীর হাঁড়ি" এবং "কাকের ঔরসে"র অতি সুগভীর অর্থ রহিয়াছে এবং ধ্যানচাঁদকে উদ্দেশ করিয়া লেখাও অসঙ্গত হয় নাই। অমিতাভবাবু যে আমাদের উপর মানহানির নালিশ না করিয়া তাঁহার একটি কবিতাস্ফুলিঙ্গ আমাদিগকে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বই প্রকাশ পাইতেছে। আমরা শুধু প্রায়শ্চিত্তস্বরূপই নয়, সানন্দে তাহা নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। বিলম্বে হস্তগত হওয়ার জন্যও বটে, পাঠকদের দৃষ্টি পূর্ণভাবে আকৃষ্ট করিবার জন্যও বটে কবিতা-স্ফুলিঙ্গটি "সংবাদ-সাহিত্য" বিভাগেই মুদ্রিত হইল। লেখক স্বয়ং যে বিজ্ঞপ্তিটি পাঠাইয়াছেন, তাহা কবিতার মাথায় বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে দেওয়া হইল।

* * *

ডাইন্যামিক কবিতা-স্ফুলিঙ্গ

কমরেড শ্রীমান অমিতাভ সেন*

[আমি কমরেড শ্রীমান অমিতাভ সেন অনাগত যুগের ডাইন্যামিক ষ্টাইলের কবিতা আবিষ্কার ও রচনা করছি। এখন পর্য্যন্ত কোন সম্পূর্ণ কবিতা লিখি নি। আমার মতে, জগৎ সেগুলোর জন্য এখনো প্রস্তুত নয়। আমি বর্ত্তমানে ডাইন্যামিক কবিতার এক একটি বাক্য মাত্র এক সময়ে রচনা ক'রে থাকি। এগুলোর নাম দেওয়া গেছে, "কবিতা-স্ফুলিঙ্গ"—"কামারশালায়, হাতুড়ির ঘায়",

---

* ঢাকা জেলা ছাত্র সমিতির ভূতপূর্ব্ব বৃষ্টি সম্পাদক ও ময়মনসিংহ সেক্রেটারিয়েট সুহৃদ সমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক।

(নীচে দেখুন) যেমন স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে। (এই ঝাস্তে-হাতুড়ির যুগে এই উপমাই সুপ্রশস্ততম)]

{ ধ্বংসগুচ্ছ: ভগ্নস্বরে হাসে / নগ্ন ঘরে কাসে / তারপরে কেঁপে ওঠে ত্রাসে ।*

চিলাক্ত আকাশ :

শৌনক বুড়ীরা চলে ঝঙ্কারিয়া কাঁথা ।*

রসনা ঘোষণা করে উৎপ্রেক্ষার স্বর্ণ সংবাদ ।*

জন্ম, মৃত্যু, আর জ্ঞানের আধার এই ভারতবর্ষ ।-

{ এক হাত থেকে ছুটে গিয়ে অন্য হাতে / নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পুস্তকের পাতে / বাক্সবন্দী হয়ে শেষে কুকুরের মত*

৫নং খোঁপার উপরে ।*

ফাটন্ত জলে চা ভিজিয়ে হো হো*

সবল রক্ত ঝরিছে শ্মশানে*

তারার মত এক বিন্দু উজ্জ্বল আকাশ ।*

সেই চপল বন্ধ্যা নারী*

বৃক্ষ হতে তারা খসে পড়ে ।*

"Q-Q-Q": শিশু ও ব্যাঙদের জন্য অতি পুষ্টিকর উপপাদ্য খাদ্য ।*

{ প্রারিক: এক প্রস্থ প্রেতাত্মার ছবি / দিনান্তের ভৌতিক স্পর্শধ্বনি / কাকস্পর্দ্ধ অসীমের মেয়ে / কর্ণচক্ষে দেখেছিল চেয়ে ।*

নগরতার্থপিটকাবলী ।*

{ বিষ্ণু দে আর কে. এম. দাশের এক প্রেতের বিবাদে আবহাওয়াই গেল শেষে জিতে ।*

অরিমারক এসে গেছে—এসে গেছে*

মদির পর্ণের তাবু গতিহীন*

মৃত্যু আজ নিঃস্বরিতপ্রায় ; / জীবনও ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় ;— / পর্দা তবে টানাব কোথায় ?*

শোঁও শোঁও শন্ শন্ শব্দ করে / অন্ধকার ওড়ে ঘরে ঘরে। / বীভৎস
গভীর শব্দে হায়, নিস্তব্ধতা ঘোরে বারান্দায়।

স্তনের ধ্বনির মত*

মৌন আজ / যৌনরাজ। / সৌধ-সাজ / লৌহ-কাজ।*

ভুষুণ্ডীর মাঠে / বিরাট জনসভা*

হিমালয়ের গা থেকে / আগ্নেয়গিরিরা গলে গলে পড়ে / লাভার মতন*

ঐ দেখ আঁধার দাঁড়ায়*

উদয়শঙ্করকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র ! / প্রাচীন তীব্বতের দুর্ভেদ্য পিরামিডে
বৈপ্লবিক পরিস্থিতি !!! / "কবিতা" মারফৎ সমবেদনা পাঠাচ্ছি।*

গর্ভের মতন সুখী সেই সব দেবতারা / ক্রমে ক্রমে বারবনিতা হয়ে যায়*

কচুর আদেশ / আত্মহত্যা করি ?/ কিন্তু আমি চিরব্রহ্মচারী / আত্মহত্যা
করিব কেমনে ?*

Sweeter than the softest bombs / Ever wafted by the
sourest breeze.*

পরীরা সিগারেট খায়*

পৃথিবী এক জালা, / সেই জালাতে শরবত ঢালে / হিটলার, বিলিয়ার্ড-
চ্যাম্পিয়নদের পরামর্শে। / সেই শরবত / ভল্‌কানোর লাভা হয়ে বেরোতেছে*

নরেশ বসুকে মনে পড়ে ? / আশ্বিনের ঝড়ে / গিয়েছিল কোনোদিন মারা /
কিন্তু তবু কার্তিকের রাতে / গিয়েছে বেড়াতে / সংসারে সম্বল করে শুধু তার
গামলার ঝুলি।*

তিনিদি'র টাঁকশালে আজ / ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝমাঝম্। / ধুম্‌ধুম্।*

কামারশালায় / হাতুড়ির ঘায় / আদা আর প্রেতের উপরে / চলেছে কবিতা
রচনা।*

বিধবারা এসে / গণিকাকে বিবাহ করিতেছে

সাতসমুদ্র তের নদীর পারে / গণিকালয়। সেখানে / সন্নাক্সের মত ভঙ্গীতে
সূর্য্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে / দাঁড়িয়ে আছে এক জবাফুল।*

চৌধুরীর রক্তমাংস ঘাড় বেয়ে বহে অবিরত / ঘাতুকের মত।*

হুস্ত হুস্ত শব্দ করে এক চ্যাটালো দাঁত / এগিয়ে আসে সুধা খেতে—
ক্ষুধুত্থিত অপূর্ব্ব আগ্রহে / তার পরে তুষ্ণীভূত পবিত্র বিরহে।*

Blackout ভিজিছে বর্ষায়।*

কাষ্ঠ কার / ওড়ে তুধার ?*

গ্রামের ভিতর বাথরুম / ঘর্ঘরিছে*

মদনের তূণে আজ ধরিয়াছে ঘুণ ; / তাই সে আর ধনু ব্যবহার না করে / Hand-Grenade ব্যবহার করে /, সেই সব সুক্ষ্মতর hand-grenadeগণ আসলেতে যুবতীর স্তন*

ধ্রুবতারা খেয়ে নেও খেয়ে নেও, তাড়াতাড়ি খেয়ে নেও।*

মঙ্গলগ্রহের গন্ধে চৌদিক আমোদিত—প্রস্ফুটিত।*

পিয়াসী যখন কত শ্লথ কথা ভণে / সেই ক্ষত ক্ষণে / এসেছিলে তুমি, প্রিয়ে।*

"মনোমুগ্ধকর কত শোক"—জবাবিল স্তামত দেবতা।*

ওরে মোর প্রাণের কানাই / ধানাই পানাই / করিস না রে ! / Lactometer/ ভেঙ্গে আর / ফেলিস না রে !!*

Singapore থেকে Napoleon পর্য্যন্ত একটা রেলপথ*

শ্রমিকের ঘরে ক্ষুধার প্রদীপ জ্বলে*

আমরা আশা করি, আমাদের এই ভ্রান্তি-স্বীকারের পর বুদ্ধদেববাবু নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার 'কবিতা'র সৌষ্ঠব বাড়াইতে পারিবেন।

চৈত্রের 'প্রবাসী' দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, 'প্রবাসী'র পুরুষ-বদল হইয়াছে, অর্থাৎ, প্রথম পুরুষের মমতা আর ইহাকে রক্ষা করিতেছে না। যিনি বুকের রক্ত জল করিয়া সারা জীবনের পরিশ্রমে একটি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকাকে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিলেন, তাঁহার দৃঢ় হস্ত শিথিল হইয়াছে। যে অনন্যচিন্তা এবং প্রবল নিষ্ঠা পশ্চাতে থাকিয়া সমস্ত বিচ্ছিন্নতা ঐক্যবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিত, তাহা আর নাই। অনেক দুঃখেই এ কথা বলিতে হইতেছে।

'প্রবাসী'র কর্ণধারগণের মধ্যে দরদী কেহ থাকিলে "সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনা"-জাতীয় শিশুসুলভ প্রলাপ কখনই প্রকাশিত হইত না। লেখিকা শ্রীসুলতা করের বয়স কত জানি না, দেখিতেছি তিনি এম. এ. পাস করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.—আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই!

* * *

এই লেখাটি সম্বন্ধে কিছু বলিলেই ইহাকে সম্মান করা হইবে। আমরা লেখা ও লেখিকার কথা ভাবিতেছি না, ভাবিতেছি, 'প্রবাসী'র কথা। স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের 'কুমড়ো পটাশ' যাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া লেখা, লেখিকা সেই শ্রেণীভুক্ত; সুতরাং তিনি নিজে হাস্যরসের খোরাক হইলেও হাস্যরস বিচারের অধিকারী নহেন। তাঁহার ধৃষ্টতার কিছু পরিচয় দিতেছি—

"অঙ্গদ রাবণের সভায় উপস্থিত হ'লে তাকে অপ্রতিভ করবার জন্য সভাসুদ্ধ সকলে রাক্ষসী মায়ায় রাবণরূপ ধারণ করল। কেবল ইন্দ্রজিৎ পিতৃরূপ ধারণ করা অন্যায় ভেবে নিজরূপেই রহিলেন। তখন—

অঙ্গদ বলে সত্য ক'রে ক'বে ইন্দ্রজিতা।
এই যত সব বসে আছে সবাই কি তোর পিতা।...

পিতার সম্বন্ধ নিয়ে পুত্রের সঙ্গে এভাবে রসালাপ করা কোন মতেই সুরুচির পরিচয় দেয় না।"

"এত বড় কবি [ভারতচন্দ্র] রসিকতার নামে যে বিকৃতরুচি আর অশ্লীলতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে সুন্দর রাজসভায় ভাবী শ্বশুরের কাছে নিজের পরিচয় দিচ্ছে—

শুন শ্বশুর ঠাকুর, শুন শ্বশুর ঠাকুর।
আমার পিতার নাম বিদ্যার শ্বশুর।

ভাবী শ্বশুরের কাছে জামাতার এই উক্তি পরিহাসচ্ছলেও কত দূর অমার্জ্জিত রুচির পরিচয় দেয় তাহা সহজেই বুঝা যায়।"

'প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয় সুস্থ থাকিলে এত সহজে ইহা বুঝিতেন না।

* * *

তিনি আরও বুঝিতেন না শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের "জাতির জীবনে রক্তের মূল্য", যাহাতে বলা হইয়াছে, "নারীকে আলিঙ্গন ক'রে আমরা হাতের মধ্যে স্বর্গ পাই।" শুধু হাতে পাই কি ?

তাই বলিতেছিলাম—বলিতেছিলাম, বড় কষ্ট হয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র ২২ ও ২৩ নং গ্রন্থ যথাক্রমে 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' ও 'মধুসূদন দত্ত'-র প্রকাশ এই মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অল্পসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের এই দুই জন প্রধান সাধকের জীবনের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যই শুধু এই দুইখানিতে দেওয়া হয় নাই, বাংলা সাহিত্যে তাঁহাদের দানের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনীগুলির সাহায্য লইয়া ও তৎসহ নূতন আবিষ্কৃত তথ্য যোগ করিয়া জীবনী দুইটিকে যতদূর সম্ভব নির্ভরযোগ্য করা হইয়াছে। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স কর্ত্তৃক ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের 'হিন্দুস্থান ইয়ার বুক' কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সঙ্কলনকর্ত্তা এস. সি. সরকার এটিকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় সংবাদে ভরিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ সংক্রান্ত অনেক নূতন খবর এই বৎসর যোজিত হইয়াছে। আরও কয়েকটি পুস্তক আমরা পাইয়াছি, যেগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিলে আনন্দিত হইতাম। ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলেই সেগুলির পরিচয় দিব। কয়েকটির নাম করিতেছি—

১। মার্ক্সীয় দর্শন—শ্রীসরোজ আচার্য্য, পুঁথিঘর, কলিকাতা। ২। বাংলা সাহিত্যের কথা—শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, বিশ্বভারতী, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা ৬। ৩। সোভিয়েট সভ্যতা ২য় ভাগ—শ্রীবিনয় ঘোষ, সমবায় পাবলিশার্স, কলিকাতা। ৪। মাতৃমঙ্গল, জন্ম-বিজ্ঞান ও সুসন্তান লাভ—আবুল হাসানাৎ, ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাইব্রেরি, ঢাকা। ৫। বিনয় সরকারের বৈঠকে—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা।

নাটক-উপন্যাস-কবিতার মধ্যে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের ডাক' নাটক (কাত্যায়নী বুক ষ্টল); 'বনফুলে'র 'মধ্যবিত্ত' নাটক (ডি. এম. লাইব্রেরি); সোমেন চন্দের 'সংকেত' (প্রতিরোধ পাবলিসার্স) শ্রীবাণীকুমার দের 'অভিচার' উপন্যাস (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স); শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষের 'উলুখড়', কাব্য (কবিতা ভবন); শ্রীরাইচরণ চক্রবর্ত্তীর 'পুষ্পাঞ্জলি' কাব্য (বীণা লাইব্রেরি); আবুল হাসানাতের 'কবির প্রেম' গল্প (ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাইব্রেরি); শ্রীবিমলেশ দের 'জনম অবধি' কাব্য (ভারতী ভবন) এবং শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের 'স্বপ্নমায়া' নাটিকা (সুবর্ণ সংঘ) আমরা পাইয়াছি।

কাগজের অভাবে আমরা গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার পর ধারাবাহিক উপন্যাস-গুলি ছাপা বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এই অপরাধে নানা দিক হইতে পত্রাঘাতে আমরা জর্জ্জরিত হইতেছি এবং স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি, বাংলা দেশে সাময়িক পত্র চালাইতে হইলে উপন্যাসের বরাদ্দ রাখিতে হয়। সুতরাং আমরা স্থির করিয়াছি আগামী বৈশাখ সংখ্যা হইতে আবার শুরু হইবে। কিন্তু ঐ মাস হইতে মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। যদি কাগজ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে আগামী সংখ্যা হইতে ৭ ফর্ম্মা পঠিতব্য মাল সরবরাহ করিয়া প্রতি সংখ্যা ।৵০ মূল্য দাবি করিব, বার্ষিক গ্রাহকেরা ৪৸০ এবং ষাণ্মাসিক গ্রাহকেরা ২।৵ (সডাক) দিবেন। অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত 'পিশাচ' এবং 'প্রেম' ধারাবাহিক ভাবে চলিতেছিল। আমরা দেবীপ্রসাদের 'পিশাচ'কে ইতিমধ্যে পুস্তকাকারে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছি, সুতরাং বৈশাখ হইতে 'প্রেম' চলিবে। এই সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে ইহাও জ্ঞাপন করিতেছি যে, বাংলা দেশের একজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'মহাস্থবির জাতক' বৈশাখ হইতে ধারাবাহিকভাবে বাহির হইবে। যদি কাগজ বাড়ানো সম্ভব না হয়, তাহা হইলে লেখাগুলিকে 'বেলিং' করিয়া পূর্ব্ব মূল্যেই চেষ্টা করিব। মোটের উপর আগামী নূতন বৎসর হইতে চারিদিক দিয়াই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ইহার জন্য সকলে প্রস্তুত থাকিবেন, ঘাবড়াইবার কারণ নাই। প্রসিদ্ধ গণৎকারদের দ্বারা গণনা করাইয়া দেখিয়াছি, বাংলা দেশের এই অঞ্চলে আমাদের সুবিধাই হইবে।

মেদিনীপুরের আর্ত্তদের সাহায্যার্থ আমরা যে টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহাতে হায়দারাবাদের কিং এণ্ড কোম্পানির শ্রীযুক্ত সুধীর মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ ছাড়াও লাহোরের শ্রীযুক্তা নমিতা সেনগুপ্ত সাহায্য পাঠাইয়াছেন। সংগৃহীত অর্থ আমরা যথাস্থানে দাখিল করিয়াছি।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি

ষাণ্মাসিক সূচী

বৈশাখ—আশ্বিন ১৩৪৯

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

ষাণ্মাসিক সূচী

কার্ত্তিক—চৈত্র, ১৩৪৯